ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

লেখক পরিচিতি

ড. রাগিব সারজানি

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধ্যাপক, আরববিশ্ব যাকে চেনে বিশিষ্ট ইতিহাসগবেষক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও দাঈ হিসেবে।

অধ্যাপক ড. রাগিব সারজানি ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদ থেকে এক্সিলেন্ট গ্রেড নিয়ে স্নাতক করেন। ১৯৯১ সালে পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। ১৯৯২ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক্সিলেন্ট গ্রেড নিয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৯৮ সালে ইউরোলজি ও কিডনি সার্জারির ওপর ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইসলামি ইতিহাস ও গবেষণানির্ভর বিভিন্ন বিষয় তার বুদ্ধিবৃত্তিক পদচারণার মূল অঙ্গন। ইসলামি ইতিহাসকেন্দ্রিক সর্ববৃহৎ ওয়েবসাইট www.islamstory.com-এর তত্ত্বাবধায়ক।

অনবদ্য লেখনীগুণে তিনি লাভ করেছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার। সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠনের সাথে।

লেখক-আলোচক ড. রাগিব সারজানির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—তিনি কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন না বরং ইতিহাসের ধারাবিবরণী থেকে তুলে আনেন সুপ্ত নানা শিক্ষা ও নির্দেশনা, আগামীর পথচলার পাথেয় এবং জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চিরন্তন সব সূত্র। তার চিন্তা, গবেষণা, লেখালেখি, দাওয়াতি কার্যক্রম, লেকচার-বক্তৃতা ইত্যাদি কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য—

> মুসলিমজাতির জাগরণের কার্যকারণসমূহ নির্ণয় ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সেগুলোর সদ্ব্যবহার। উম্মাহর সদস্যদের হৃদয়জগতে দ্বীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ও প্রত্যাশা তৈরি করা। তাদেরকে চিন্তা ও চেতনা, জ্ঞান ও কর্মে অগ্রবর্তী হতে পথনির্দেশ করা। ইসলামি ইতিহাসের সঠিক ও প্রকৃত রূপ উন্মোচন করা। সভ্যতার বিনির্মাণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অবদান সুস্পষ্ট করা।

অপর ফ্ল্যাপ দ্রষ্টব্য
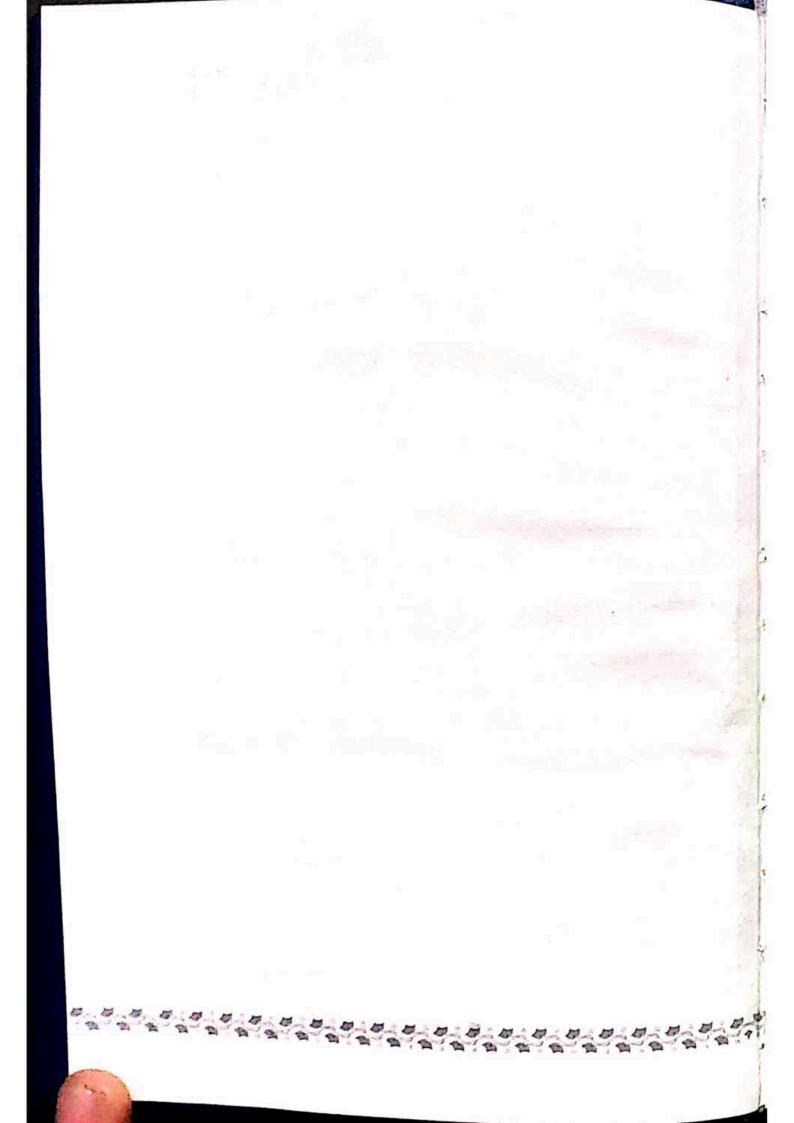
ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

প্রথম খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (১ম খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২/ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০

মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-64-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২৯০০/- টাকা মাত্র [চার খণ্ড একত্রে]

MuslimJati Bisshoke ki Diyece (1st Part)
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

মূল আরবি গ্রন্থ : মা-যা কাদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম

লেখক : ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ : আবদুস সাত্তার আইনী (১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড)
উমাইর লুৎফর রহমান (৩য় খণ্ড)

সম্পাদনাপর্ষদ : আতাউস সামাদ, আব্দুর রহীম আল-আজহারী, মাহমুদুল হাসান, মিশকাত আহমদ, রেদওয়ান সামী, সদরুল আমীন সাকিব, সাকিব আবদুল্লাহ

বানান সমন্বয় : খন্দকার আব্দুল গাফফার, মাসউদ আহমাদ, মুনতাসির বিল্লাহ, নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মুহিব্বুল্লাহ মামুন

চিত্রবিন্যাস : আখতারুজ্জামান, উজ্জ্বল আহমেদ

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আফিফ মাহমুদ

প্রচ্ছদ : আখতারুজ্জামান

সার্বিক সমন্বয় : সুফিয়ান আহমেদ

প্রকাশক : মো. রাকিবুল হাসান খান

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

অধিকার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান-সংস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং জ্ঞানের নতুন দর্শন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং বিজ্ঞানীদের চিন্তার পরিবর্তন

চিত্র সূচি

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। তাঁর প্রশংসিত রাসুল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বর্ষিত হোক রহমত ও শান্তিধারা।

মানুষ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জমিনে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি তাদের প্রেরণ করেন। মানুষের সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে পৃথিবীর সকল-কিছু তাদের অধীন করে দেন এবং পৃথিবীজুড়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যুগে যুগে নবী-রাসুল ও কিতাব পাঠান। তারপর মানবসম্প্রদায় সে অনুযায়ী আল্লাহপ্রিয় দেশ, জাতি ও সমাজ গঠন করে এবং তার উন্নয়নকল্পে চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয়ের মাধ্যমে চমৎকার এক পৃথিবী সাজায়।

ইসলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা এবং এই ধর্মের অনুসারী মুসলিমজাতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। কেননা মানবজাতির কল্যাণেই তাদের আবির্ভাব। তাদের সর্বপ্রধান কীর্তি হচ্ছে, মহান রবের প্রতি আত্মনিবেদিত মানবজাতি গঠনে তারা অনন্যসাধারণ। তবে মুসলিমজাতির অবদান শুধু রবের সাথে মানবজাতির সেতুবন্ধন সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানবকল্যাণের প্রতিটি শাখাতেই তাদের অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। হাজার বছরের ইতিহাস তাদের কৃতিত্বে ভরপুর। তবে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে এই জাতির অধিকাংশ সদস্যই তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আবিষ্কার-উন্নয়ন সম্পর্কে অবগত নয়। যে কারণে তারা হীনম্মন্যতার শিকার। নিজ জাতির গৌরবময় অধ্যায় না জানার কারণে পশ্চাৎপদতার আঁধার তাদের যেন কাটে না।

ড. রাগিব সারজানি সাম্প্রতিক সময়ের বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদ। ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে লিখে ইতিমধ্যে তিনি বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তার বদ্ধপরিকর চিন্তা-চেতনা হচ্ছে মুসলিমজাতির মাঝে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া। জাতির সন্তানদের মাঝে তাদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা ও তাদের আত্মপরিচয়ে বলীয়ান

করা। সে ধারারই এক মূল্যবান উপহার *মা-যা কাদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম* নামক গ্রন্থ, যা আজ অনূদিতরূপে পাঠকের হাতে। ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি পাঠকমহলে সমাদর লাভ করে। জাতিগঠন ও জগদ্বিনির্মাণে মানবেতিহাসের পরতে পরতে মুসলিমদের আবিষ্কার, উন্নয়ন ও অবদানের বীরত্বগাথা নিয়ে এটি এক অনন্য রচনা।

চমৎকার বিষয়বস্তু, নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত, মানোত্তীর্ণ উপস্থাপনা সব মিলিয়ে এটি লেখকের অনবদ্য এক সৃষ্টি। রচনামানে উত্তীর্ণ হয়ে তা 'মুবারক অ্যাওয়ার্ডের' জন্য শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে মনোনীত হয়। বাংলাভাষী পাঠকসমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ এ ধরনের গ্রন্থশূন্যতা অনুভব করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ পাঠকের সেই শূন্যতা পূরণে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করি।

গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম ও সম্পাদনার পেছনে দীর্ঘ সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে। সম্মানিত অনুবাদকদ্বয় ও সম্পাদনাপর্ষদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তা আজ পাঠকের হাতে। গ্রন্থটির বৈষয়িক গুরুত্ব বিবেচনা করে একে যথাসম্ভব নির্ভুল ও সুন্দর করার প্রচেষ্টা ব্যয় হয়েছে। আমরা আশা করি, এটি পাঠককে তৃপ্ত করতে সক্ষম হবে। তবুও মানবীয় দুর্বলতাহেতু এতে কোনোপ্রকার ভুলভ্রান্তি ও অসৌন্দর্য থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই পাঠকের নজরে কোনোপ্রকার ত্রুটি গোচরীভূত হলে নসিহাস্বরূপ আমাদের তা জানানোর অনুরোধ থাকল। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

সম্পাদনাপর্ষদ

মাকতাবাতুল হাসান

জুমাদাল উলা, ১৪৪২ হি.

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর অশেষ রহমতে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হলো। ড. রাগিব সারজানি কর্তৃক রচিত এটি তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বলা যায়, এই গ্রন্থ তাকে খ্যাতির চূড়ায় আসীন করেছে এবং তাকে প্রভূত সম্মান এনে দিয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামি সভ্যতার যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তা অনন্য ও তুলনারহিত। কিছু কিছু জায়গা সংক্ষিপ্ত হলেও গ্রন্থটির চমৎকার বিন্যাস তা পুষিয়ে দিয়েছে। প্রথমে তিনি ইসলামপূর্ব বিশ্ব ও অন্যান্য সভ্যতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তারপর ইসলামি সভ্যতার উদ্ভব, উৎস ও বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর আলোকপাত করেছেন। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার দিক থেকে ইসলামি সভ্যতাই যে অগ্রগামী তা তিনি জোরালো ভাষায় প্রমাণ করেছেন। মানবাধিকার, চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতা, মুসলিম পরিবার ও সমাজের কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে দালিলিক আলোচনা করেছেন। ইসলামি সভ্যতার যুদ্ধকালীন আচরণ ও নৈতিকতা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন।

ইসলামি সভ্যতায় জ্ঞানের ব্যাপকতা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের দর্শন, জ্ঞানী সমাজের চিন্তার পরিবর্তন, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ইত্যাদি বিষয় লেখক হৃদয়গ্রাহীরূপে তুলে ধরেছেন। জ্ঞানের পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি ও প্রায়োগিক দিকের ওপর যেমন আলোকপাত করেছেন, তেমনই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন : চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, রসায়নশাস্ত্র, ওষুধবিজ্ঞান, বীজগণিত ও যন্ত্রপ্রকৌশলে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অনন্য আবিষ্কার ও অবদান তুলে ধরেছেন।

সভ্যতা বিনির্মাণে আকিদা-বিশ্বাসের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার অবদান অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে লেখক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। জ্ঞানের উদ্ভাবন, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস, স্রষ্টা-সম্পর্কিত ধারণার সংশোধন ইত্যাদির

পাশাপাশি ইসলামি দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজবিদ্যার ওপর আলোকপাত করেছেন।

সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামি সভ্যতার অবদান কী তা অত্যন্ত দালিলিক বয়ানে তুলে ধরেছেন লেখক। বিচারবিভাগ, প্রশাসন, স্বাস্থ্যবিভাগ, পান্থনিবাস, মুসাফিরখানা—এগুলোর উন্নতি ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষেরই পরিচায়ক। ইসলামি শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা, অলংকরণশিল্প, আরবি লিপিকলা, তৈজসপত্রের নান্দনিকতা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সৌন্দর্য, পরিবেশের সৌন্দর্য, বাগানচর্চা—এগুলোর আলোচনায় ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্যপ্রিয়তাই ফুটে উঠেছে। চারিত্রিক সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং নাম ও উপাধির নান্দনিকতাও সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা ছিল অনন্য।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও সভ্যতার বিকাশে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব ও অবদান অনস্বীকার্য। চিন্তা ও বিশ্বাস, জ্ঞানবিজ্ঞান, ভাষা-সাহিত্য ও শিল্প—সব ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব রয়েছে। ইসলামি সভ্যতাই মূলত ইউরোপীয় সভ্যতার পথ রচনা করে দিয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত মনীষীরা এসব বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে। ড. রাগিব সারজানি উপর্যুক্ত বিষয়গুলো প্রামাণিকতাসহ প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বাংলাভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ নেই বললেই চলে। গ্রন্থটির অনুবাদ এই সময়ের একটি যৌক্তিক দাবি ছিল। আমরা এই দাবি পূরণ করতে পেরে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদে আমি সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করেছি। প্রতিটি বক্তব্য পাঠকের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। সহজবোধ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও টীকা সংযোজন করেছি। গ্রন্থটির পাঠে পাঠকশ্রেণি উপকৃত হবেন আশা করি এবং এতেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আবদুস সাত্তার আইনী
পন্তারী, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর গুণগান গাই, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের অন্তরের এবং কর্মরাশির অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই। বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিগণ এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁর পথে আহ্বানকারীদের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত।

আমি যেসব বিষয়ে লিখতে উৎসাহী ছিলাম এবং এখনো আছি, তার অন্যতম হলো ইসলামি সভ্যতা। মানব-প্রকৃতির কালযাত্রা বোঝার জন্য অবশ্যই ইসলামি সভ্যতার গভীর পাঠ নিতে হবে। এটা শুধু এ কারণে নয় যে, ইসলামি সভ্যতা মানবেতিহাসের একটি পর্যায় এবং শুধু এ কারণেও নয় যে, তা প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নতুন সভ্যতার মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে; বরং মানবসভ্যতায় মুসলিমদের রয়েছে বিপুল ও বিশাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ইসলামি সভ্যতার পাঠ নেওয়া ছাড়া মানবসভ্যতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কী উৎকর্ষ সাধন করেছে তা অনুধাবন করা অসম্ভব। মানবসভ্যতার ইতিহাস জানতে হলে নবুয়তের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতাকে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ জানতে হবে। কেননা, মানবেতিহাসে এটি এক স্বর্ণোজ্জ্বল সময়।

ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি উগ্র আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে লেখালেখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও বেড়ে গেছে। এই আক্রমণের ব্যানার ও বিষয় হলো মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া ও পশ্চাৎমুখিতা এবং নিশ্চলতা ও বর্বরতার অপবাদ দেওয়া, সন্ত্রাস ও সহিংসতা মুসলিমদের মৌলিক চারিত্র ও স্বভাব বলে দাবি করা। অধিকাংশ মুসলিমই এসব অপবাদের সামনে হাত গুটিয়ে জিহ্বা মুখের ভেতর পুরে দাঁড়িয়ে আছেন; তারা সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর দিতে পারছেন না, প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও নিতে পারছেন না। এই

মৌনতাবলম্বন মূলত আমাদের শেকড় ও ইতিহাস এবং আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মারাত্মক অজ্ঞতার ফল।

যে অজ্ঞতা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনাকে অবরুদ্ধ রেখেছে, তার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার এই যে হতাশা ও নৈরাশ্য মুসলিমদের চেতনাশক্তিকে বিকল করে দিয়েছে। এই হতাশা ও নৈরাশ্য মুসলিম উম্মাহর বর্তমান যুগের কিছু কার্যকলাপের প্রতিফল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান অনেকের হৃদয়ে যাতনার সৃষ্টি করবে, যেমন শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এমনকি চারিত্রিক অবস্থা এতটা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যা মুসলিম উম্মাহর মতো একটি সভ্য উন্নত জাতির জন্য মোটেই মানানসই নয়। এ বিষয়গুলো স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আমাদের চিত্তকে এমন হতাশা ও অবসন্নতায় ডুবিয়ে দেয় যা গ্রহণযোগ্য নয়, উপযোগীও নয়।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো আমাদের শেকড়ে ফিরে যাওয়া; আমাদের ইতিহাস পাঠ করা, আমাদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতার কার্যকারণগুলো অনুধাবন করা। এই উম্মাহর সূচনাকাল যা-কিছু দ্বারা উৎকর্ষমণ্ডিত হয়েছিল, তার পরবর্তীকালও সেসব বিষয় দ্বারাই উৎকর্ষমণ্ডিত হবে। এ কারণে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন বা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চায় কাজে লাগানোর জন্য এই ইতিহাস পাঠ করব না এবং এই সভ্যতায় পাণ্ডিত্য অর্জন করব না; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, সেই ভিত্তিভূমিকে ফিরিয়ে আনা, ভেঙে পড়া টুকরোগুলোকে পুনর্নির্মাণ করা এবং মুসলিমজাতিকে সঠিক গন্তব্যপথে ফিরিয়ে আনা। একইভাবে আমাদের লক্ষ্য হলো, মানবসভ্যতার যাত্রায় আমাদের অবদান এবং মানবজীবনে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করা। এটা অনুগ্রহ ফলানো নয় এবং অহংকারেরও বিষয় নয়। বরং এটা সত্যকে তার উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো, যে ধর্ম বিশ্বমানবের জন্য একটি সর্বোত্তম জাতি নির্মাণ করেছে।

বিষয়টি অত্যন্ত প্রিয় হওয়া এবং এ বিষয়ে লিখতে আমার আগ্রহ-উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও আমি প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে গোপন করব না যে, এ বিষয়ে কলম ধরা অত্যন্ত শক্ত কাজ।

বিভিন্ন কারণে এই কাঠিন্য সৃষ্টি হয়েছে : সভ্যতার সংজ্ঞা নির্মাণে চিন্তাবিদ ও লেখকগণের মতভিন্নতা, মানবসভ্যতার শত শত বিষয়ে মুসলিমদের ব্যাপক অবদান, যে সময়কে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি তার বিপুল বিস্তৃতি, কারণ আমরা চৌদ্দ শতাব্দীরও বেশি সময়ের প্রচেষ্টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। আরও একটি কারণ এই যে, আমরা পশ্চিমের দেশ স্পেন থেকে নিয়ে প্রাচ্যের দেশ চীনসহ অসংখ্য ভূখণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করব, যেখানে মুসলিমগণ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বংশবিস্তার করেছেন। এসব জটিলতা বইটিতে বারবার বিন্যাস-পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য করেছে। যখনই আমি বইটির অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো বিন্যাসের একটি রূপরেখা দাঁড় করেছি, আমাকে অন্য একটি রূপরেখা দাঁড় করাতে হয়েছে। অবশেষে এটি বক্ষ্যমাণ অবস্থায় রূপ নিয়েছে। আমার মনে হয়, যদি আরেকবার দৃষ্টি বোলাতাম, তবে আমাকে আরেকবার বিন্যস্ত করতে হতো।

সম্ভবত এ বিষয়বস্তুতে সবচেয়ে জটিল ব্যাপার হলো সভ্যতার সংজ্ঞায়নে চিন্তাবিদদের মধ্যে স্পষ্ট মতভিন্নতা, সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও পরিচয়। পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের কাছে সভ্যতা বলতে কেবল 'নগরে বাসস্থান'-ই বোঝাত। আর নগর বলতে মরুভূমি বা গ্রাম এলাকার বিপরীত বিষয় বোঝানো হতো। এ ব্যাপারে ইবনে মানযুর[১] বলেছেন, সভ্যতা হলো নগরে বসবাস। তাদের মতে নাগরিক মানুষ এবং যাযাবর ও গ্রাম্য মানুষ এক নয়।[২]

কিন্তু এরপরে সভ্যতার উল্লিখিত অর্থের বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছে এবং শিল্প, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, আইনকানুন, মোটকথা নাগরিক মানুষেরা যা-কিছু উপভোগ করে তার সব অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ, গ্রামীণ বা যাযাবর মানুষের জীবনাচারে এসব উপকরণ থাকে না, কিন্তু এসব বিষয় নাগরিক মানুষের জীবন সুন্দর ও সুচারু করে তোলে। অর্থাৎ, বর্ণিত সংজ্ঞায়

---

১. ইবনে মানযুর : আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলি, জামালুদ্দিন ইবনে মানযুর আল-আনসারি আর-রওয়াইফিয়ি আল-ইফরিকি (৬৩০-৭১১ হিজরি/১২৩২-১৩১১ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী। মিশরে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ বলেছেন তার জন্ম ত্রিপোলিতে। তিনি কায়রোর ইনশা দপ্তরে চাকরি করেন। এরপর ত্রিপোলিতে বিচারক পদে নিযুক্ত হন। আবার মিশরে ফিরে আসেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি, *আল-'আলাম*, খ. ৭, পৃ. ১০৮।

২. ইবনে মানযুর : *লিসানুল আরব*, حضر মূলধাতু, খ. ৪, পৃ. ১৯৬।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো জীবনের জন্য আবশ্যক নয় বরং সৌন্দর্যবর্ধক। ইবনে খালদুন[৩] সভ্যতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, কোনো বসতির প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বাভাবিক প্রচলিত অবস্থা। বিলাসব্যসনের পার্থক্যের দ্বারা অতিরিক্ত বিষয়গুলোর পার্থক্য নির্ণীত হয়। এ ক্ষেত্রে জাতিসমূহের মধ্যে স্বল্পতায় ও আধিক্যে সীমাহীন পার্থক্য রয়েছে।[৪]

সম্ভবত সভ্যতার মূল শব্দটি ইউরোপীয় পরিভাষায় একই অর্থ বুঝিয়ে থাকবে। সভ্যতার ইংরেজি প্রতিশব্দ civilization ল্যাটিন শব্দ civis থেকে এসেছে। শব্দটি নাগরিক বা নগরের অধিবাসী বোঝায়।[৫] অর্থাৎ, শব্দটি ইউরোপীয়দের কাছে যারা শহরে বাস করে তাদের বোঝায়। পরবর্তীকালে অন্যদের কাছে যেমন শব্দটি ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লাভ করেছে, তেমনই ইউরোপীয়দের কাছেও শহরে বসবাসকারী মানুষের অবস্থাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এ শব্দটি অর্থগত বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ কারণে চিন্তাবিদদের কাছে সভ্যতা ও নাগরিক জীবন শব্দ দুটি অনেকাংশে সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে, যদিও এগুলোর অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

কিন্তু এই ভাষাগত মৌলিক অর্থ চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের সর্বসম্মত চিন্তা ও অভিমতকে প্রতিফলিত করে না। কারণ তাদের পরস্পর বিপরীতমুখী ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। এই মতভিন্নতা কেবল (সভ্যতা শব্দটির) ভাষাগত ভিন্নতা বোঝায় না; বরং চিন্তাগত, আদর্শগত, চরিত্রগত এমনকি বিশ্বাসগত ভিন্নতাও বোঝায়।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ মানুষকে সভ্যতার বিষয়বস্তু করেছেন এবং মানুষের চারিত্রিক, নৈতিক ও আচরণগত উৎকর্ষকে সভ্যতারূপে বিবেচনা করেছেন। সন্দেহ নেই যে, এটি একটি চমৎকার অভিমত। এতে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় এবং তাকে বস্তুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়। এখানে একইসঙ্গে মানুষের চিন্তা ও আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উদাহরণত,

---

৩. ইবনে খালদুন : আবু যায়দ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮ হিজরি/ ১৩৩২-১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ)। ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী। জন্ম ও বেড়ে ওঠা তিউনিসিয়ায়। দেখুন, ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, খ. ৭, পৃ. ৭৬ এবং আস-সাখাবি, *আদ-দাওউল লামিউ*, খ. ৪, পৃ. ১৪৫-১৪৯।

৪. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৩৬৮, ৩৬৯।

৫. তাওফিক আল-ওয়ায়ি, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা মুকারিনাতুন বিল হাদারাতিল গারবিয়্যাহ*, পৃ. ৩১।

এই ঘরানার চিন্তাবিদদের একজন হলেন মালেক ইবনে নবি[৬]। তিনি সভ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'চিন্তাগত অনুসন্ধান ও আত্মাগত অনুসন্ধান' হিসেবে।[৭] একইভাবে সাইয়িদ কুতুব[৮] এই অর্থকেই জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন, সভ্যতা হলো যা মানবজাতিকে চিন্তাভাবনা, আদর্শ-মতাদর্শ এবং মানুষের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মূল্যবোধ দান করে।[৯] এই দুইজনের পূর্বে অ্যালেক্সিস ক্যারেল[১০] অনুরূপ লক্ষ্যপানে এগিয়েছেন এবং সভ্যতাকে চিন্তাগত ও আত্মিক

---

৬. মালেক ইবনে নবি (১৯০৫-১৯৭৩ খ্রি.) : আলজেরিয়ান চিন্তাবিদ, দার্শনিক। বর্তমান যুগের ইসলামি চিন্তাবিদদের অন্যতম। ইসলামি সভ্যতা ও রেনেসাঁস সম্পর্কে লিখে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। প্যারিস, কায়রো ও আলজেরিয়ায় বসবাস করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

الظاهرة القرآنية، شروط النهضة، وجهة العالم الإسلامي.

৭. মালেক ইবনে নবি, *শুরুতুন নাহদা*, পৃ. ৩৩।

৮. পুরো নাম সাইয়িদ কুতুব ইবরাহিম হুসাইন আশ-শারিবি। মিশরের আসইয়োত জেলার মুশা গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা উসমান হুসাইন এবং মা ফাতিমা। কুতুব তার বংশীয় অভিধা। গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন শরিফ হিফয করেন। ১৯২২ সালে কায়রোর মাদরাসাতুল মুআল্লিমিন আল-আওয়ালিয়্যা (আবদুল আযিয)-এ ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে এখানে তিন বছরের কোর্স সমাপ্ত করে ১৯২৫ সালে মাদরাসা-ই-তাজহিযিয়্যাতে ভর্তি হন। এখানে চার বছরের শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯২৯ সালের শেষ দিকে দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের পাঠ সম্পন্ন করেন। একই বছরের ডিসেম্বরে তাহজিরিয়্যা দাউদিয়্যাতে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আরও তিনটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ বছরের ১ মার্চ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে মন্ত্রণালয় তাকে আমেরিকায় প্রেরণ করে। ১৯৫০ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালের ১৮ অক্টোবর তিনি মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। কিন্তু মন্ত্রী তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি। ১৯৫৪ সালের ১৩ জানুয়ারি সাইয়িদ কুতুবের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে তিনি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালে সরকারবিরোধী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকেই সম্পৃক্ত থাকলেও সাইয়িদ কুতুব ১৯৫৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৫৫ সালের ১৩ জুলাই পিপল্‌স্ কোর্ট সাইয়িদ কুতুবকে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯৬৪ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২১ আগস্ট সাইয়িদ কুতুবসহ সাতজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ২৯ আগস্ট ভোর রাতে সাইয়িদ কুতুব ও তার দুই সঙ্গীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

৯. সাইয়িদ কুতুব, *আল-মুসতাকবালু লি হাযাদ-দ্বীন*, পৃ. ৬৩।

১০. অ্যালেক্সিস ক্যারেল (Alexis Carrel 1873-1944) : ফরাসি চিকিৎসক ও চিন্তাবিদ। ফ্রান্সে ও যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করেছেন। ১৯১২ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদানের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। *Man, The Unknown* গ্রন্থটি লিখে তিনি চিন্তার জগতে বিশিষ্টতা অর্জন করেন।

অনুসন্ধান এবং মানুষের মানসিক, জৈবিক ও মানবিক সৌভাগ্যের জন্য নিয়োজিত জ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[১১] গুস্তাভ লি বোঁ[১২] প্রায় একইরকম সংজ্ঞা দিয়েছেন, সভ্যতা হলো চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও বিশ্বাসের পরিপক্বতা এবং মানুষের অনুভূতি-উপলব্ধির উৎকর্ষ সাধন।[১৩] এসব সংজ্ঞায় মানুষের অভ্যন্তরীণ জগৎ, তার চিন্তাভাবনা ও চরিত্রকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ সভ্যতা বলতে মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট ও উৎপাদিত বিষয় ও বস্তুকে বুঝিয়েছেন। উপর্যুক্ত চিন্তাবিদদের মতো তারা মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। বরং তারা মানবগোষ্ঠী সমাজে কী উৎপাদন করেছে তার প্রতি লক্ষ রাখেন। জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের উৎপাদিত বিষয়সমূহকে তারা সম্যক দৃষ্টিতে দেখতে চান অথবা তারা একটি দিকের বিবেচনায় অপর একটি দিককে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। যেমন ড. হুসাইন মুনিস[১৪] মনে করেন, জীবনকে সুন্দর ও সুচারু করার জন্য মানবমণ্ডলী যে প্রচেষ্টা ব্যয় করে তার ফলাফলই সভ্যতা। চাই ওই ফল অর্জনের জন্য উদেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচেষ্টা ব্যয়িত হোক অথবা বস্তুগতভাবে ও পরোক্ষভাবে অর্জিত হোক।[১৫] তিনি মানুষের প্রচেষ্টা ও তার উৎপাদনের প্রতি সম্যক দৃষ্টিপাত করেছেন। একইভাবে উইল ডুরান্ট[১৬] চিন্তা ও

---

১১. *Man, The Unknown*, পৃ. ৫৭।

১২. গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon 1841-1931) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো : *The World of Islamic Civilization (1974)*। গ্রন্থটিকে আরবীয় ইসলামি সভ্যতা বিষয়ে সাম্প্রতিকালে ইউরোপে প্রকাশিত অন্যতম মৌলিক বই হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৩. গুস্তাভ লি বোঁ, *Psychologie du Socialisme*, আরবি অনুবাদ *রুহুল জামাআহ* থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৭।

১৪. হুসাইন মুনিস (১৯১১-১৯৯৬ খ্রি.) : কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ও আরবি ভাষাসংঘের সদস্য ছিলেন। মাদ্রিদে অবস্থিত ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক ছিলেন। মিশর থেকে প্রকাশিত *আল-হিলাল* পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন কিছুদিন। ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ে আরবি, ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষায় রচিত তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে।

১৫. হুসাইন মুনিস, *আল-হাদারা দিরাসাতুন ফি উসুলি ওয়া আওয়ামিলি কিয়ামিহা ওয়া তাতাউরিহা*, পৃ. ১৩।

১৬. উইল ডুরান্ট (১৮৮৫-১৯৮১ খ্রি.) : বিখ্যাত মার্কিন ইতিহাসবিদ। তার সর্ববৃহৎ গ্রন্থ হলো ৪২ খণ্ডে প্রকাশিত *The Story of Civilization* (সভ্যতার গল্প)। এটাতে তিনি সূচনালগ্ন থেকে

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানব-উৎপাদনকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। জীবনের অন্যান্য কার্যকারণকে এই উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সভ্যতা হলো সামাজিক শৃঙ্খলা, যা মানুষকে চারটি উপাদানের দ্বারা সাংস্কৃতিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উপাদান চারটি এই : অর্থনৈতিক উৎস, রাজনৈতিক সংগঠন, স্বভাবগত ধ্যানধারণা এবং জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চা।[১৭]

কোনো কোনো চিন্তাবিদ সভ্যতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করে থাকেন। তারা সভ্যতাকে মানবজীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের স্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ বিষয় ও বস্তু বলে আখ্যায়িত করেন। তারা মানবের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তা এবং চরিত্র ও আদর্শেরও মূল্য নেই তাদের কাছে। এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে দুটি ঘরানা রয়েছে। একদল হলো বস্তু পূজারি, জাতি বা সমাজ বিনির্মাণে আদর্শ ও মূল্যবোধ একটি মৌলিক চালিকাশক্তি—এ বিষয়টিকে তারা চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রীরা ও পুঁজিবাদীরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তারা সভ্যতা ও নাগরিক সমাজব্যবস্থাকে সমার্থক বলে বিবেচনা করেন। ড. আহমাদ শালবি[১৮] তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন, নাগরিক সমাজব্যবস্থার সংজ্ঞা হলো, বৌদ্ধিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, তথা চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, কৃষি, শিল্প ও যন্ত্রের উদ্ভাবনবিদ্যা ইত্যাদির উৎকর্ষ।[১৯]

এই দলেই কেউ কেউ আছেন যারা চরিত্র ও চারিত্রিক গুণাবলিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। যেমন নিৎশে[২০] এবং এমন অন্য

নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এটি আরবিতে *কিসসাতুল হাদারাহ* নামে অনূদিত হয়েছে।

১৭. উইল ডুরান্ট, *The Story of Civilization*, আরবি অনুবাদ *কিসসাতুল হাদারাহ* থেকে উদ্ধৃত, খ. ১, পৃ. ৯।

১৮. আহমাদ শালবি (১৯১৫-২০০০ খ্রি.) : সমকালীন মিশরের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের দারুল উলুমে পড়ালেখা শেষ করেন। মিশরের ও আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মাউসুআতুত তারিখিল ইসলামিয়্যি*, এবং *মাউসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*।

১৯. আহমাদ শালবি, *মাউসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ২০।

২০. নিৎশে : ভাববাদী জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ ভিলহেল্ম নিৎশে (Friedrich Wilhelm Nietzsche) ১৮৪৪ সালের ১৫ অক্টোবর জার্মানির প্রুশিয়ার অন্তর্গত রকেন গ্রামের এক প্রোটেস্ট্যান্ট পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বন ও লাইপৎসিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব ও

দার্শনিকগণ যারা বলেন, সভ্যতা হলো মধ্যপন্থা ও চরিত্রের বিনাশ ঘটানো এবং যা-ইচ্ছা-তাই করার ক্ষেত্রে আমাদের মুক্ত-স্বাধীন স্বভাবের লাগাম ছেড়ে দেওয়া। তারা আরও বলেছেন, চরিত্র দুর্বল মানুষদের উদ্ভাবন ছাড়া কিছু নয়। যাতে তারা এর দ্বারা শক্তিমানদের রাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারে। আমরা চরিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।[২১]

আরেক দল বস্তুবাদী আছেন যারা চরিত্রের ভূমিকাকে খাটো করতে চান না, তবে তারা সভ্যতাকে চূড়ান্তরূপে বস্তুবাদী বিষয় মনে করেন। তাদের লেখা থেকে এটাই বোঝা যায়। মানবচরিত্রের সঙ্গে সভ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন ইবনে খালদুনের নিম্নলিখিত বক্তব্য থেকে এই ধরনের অর্থই ফুটে ওঠে,

> সভ্যতা হলো বিলাসব্যসনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, তার অবস্থার উৎকর্ষ সাধন—রন্ধন, পোশাক-আশাক, গৃহসজ্জা, গৃহনির্মাণ, আসবাব ও তৈজসপত্র—যা-কিছু জীবনকে সুন্দর ও সুচারু করে এমন শিল্পমণ্ডিত বস্তুরাশিতে আসক্তি। এই রুচিশীলতা অসংখ্য শিল্পবস্তুর নির্মাণ আবশ্যক করে তোলে।[২২]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবনে খালদুন চরিত্র ও মূল্যবোধকে সভ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাননি, বরং তিনি জাতি বিনির্মাণে চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাব্যস্ত করেছেন। তবে আমরা যেমন বলেছি, তিনি এখানে সভ্যতা শব্দটিকে নাগরিক জীবন ও তার অনুগামী বিষয়সমূহের বিশেষণ বলে বিবেচনা করেছেন।

ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভাষাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের সমস্যাবলিতেও তার আগ্রহ দেখা যায়। প্রচলিত নৈতিক ধারণা সম্পর্কে নিৎশের অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত। তার দর্শন স্বাতন্ত্র্যবাদী, অতিমানবে বিশ্বাসী, সাম্যবাদের বিরোধী ও খ্রিষ্টধর্মের পরিপন্থী। সমাজতন্ত্রে আতঙ্ক, জনগণের প্রতি ঘৃণা, যেকোনো মূল্যে পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য বিনাশ প্রতিরোধের প্রয়াস হিসেবে তার মতবাদ চিহ্নিত হয়ে আসছে। বিশ শতকে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির উত্থানের পেছনে নিৎশের দর্শনের প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। তার রচনাবলিতে কাব্যময়তা ও আবেগপূর্ণ স্নিগ্ধ মাধুর্যের পাশাপাশি ব্যাধিগ্রস্ত মনের সংবেদনশীলতাও লক্ষণীয়। *'জরথুস্ত্রের বাণী'*, *'ভালোমন্দের অতীত'*, *'নীতির পরিবর্তন'* এবং *'খ্রিষ্ট-বিরোধ'* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিৎশে ২৫ আগস্ট ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যুবরণ করেন।

[২১]. আন্দ্রে ক্রিসঁ, *Le problème moral et les philosophes* (১৯৩৩), আরবি অনুবাদ *আল-মুশকিলাতুল আখলাকিয়্যা ওয়াল-ফালাসিফাহ* থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩২।

[২২]. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ২, পৃ. ৮৭৯।

আমরা যেমন দেখছি, সভ্যতার অনেক সংজ্ঞা ও পরিচয় রয়েছে। অর্থাৎ, চিন্তাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। এটা যেমন এদিকে ইঙ্গিত করে যে, শব্দটি নতুন উদ্ভাবিত এবং এ কারণে প্রত্যেক চিন্তাবিদের কাছে তার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে তেমনই তা মানবচিন্তার প্রতিটি ঘরানার ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও আইডিয়োলজির প্রতি ইঙ্গিত করে। এসব সংজ্ঞা বিপরীতমুখী হোক বা সম্পূরক, সভ্যতা সম্পর্কিত আলোচনাকে জটিল করে তুলেছে। এ বিষয়ে যারা আলোচনা করতে চান তাদের প্রত্যেকের বিশেষ চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমি মনে করি, সভ্যতা হলো স্রষ্টার সঙ্গে এবং বসবাসরত মানবমণ্ডলী ও ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্মাণে মানুষের শক্তি ও যোগ্যতা।

আমার মতে, যখনই এই সম্পর্কের উন্নতি ঘটে তখনই সভ্যতার অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর যখনই এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে ও দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই মানুষ পিছিয়ে পড়ে, তার অধঃপতন ঘটে।

সুতরাং সভ্যতা হলো প্রথমত মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার ক্রিয়াকর্মের, দ্বিতীয়ত সমাজে বসবাসরত অন্য মানবমণ্ডলীর সঙ্গে তাদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার আচার-আচরণের, তৃতীয়ত মানুষ ও পৃথিবীর পরিবেশের—যেখানে আছে পশুপাখি, মাছ, বৃক্ষরাজি, ভূমি, খনিজ সম্পদ, অন্যান্য ঐশ্বর্যসহ যাবতীয় সৃষ্টি—মধ্যকার সম্পর্কের ফলাফল।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনটি সম্পর্ক দাঁড়াল। সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখর হলো মানুষের পক্ষে উল্লিখিত তিনটি পর্যায়ে সর্বোত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারা। আর অসভ্যতা ও অধঃপতনের চূড়ান্ত স্তর হলো একইসঙ্গে তিনটি সম্পর্কের অবনতি ঘটা। এ সম্পর্ক তিনটির উঁচু-নিচু বিভিন্ন স্তর রয়েছে, এসব সম্পর্কের স্বরূপ ও প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজের প্রেক্ষিতে সভ্যতার স্তর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এই সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে অনেক সভ্য সমাজ রয়েছে, কিন্তু সভ্যতার একটি দিকের বিবেচনায় তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলেও সভ্যতার অন্যান্য দিকের বিবেচনায় তারা অসভ্যতা ও পশ্চাৎপদতার চরমতম পর্যায়ে রয়েছে।

যে মানবগোষ্ঠী সুখসৌভাগ্য ও আরাম-আয়েশ নিশ্চিত করার জন্য বস্তুরাশিকে যথার্থরূপে কাজে লাগাতে পারে, হাতিয়ার ও উপকরণ তৈরি করে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্রমশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে এবং পরিবেশ-পৃথিবীর অন্যান্য উপাদানের কোনোরূপ ক্ষতি না করেই এ সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারে, তারা একটি সম্পর্কের বিবেচনায় সভ্য মানবগোষ্ঠী। এটিকে আমি উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় তৃতীয় পর্যায়ের সম্পর্ক বলে উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ, মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক। কিন্তু এই মানবগোষ্ঠীই স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকতে পারে অথবা স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ ও তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টিকে তারা অবজ্ঞা করতে পারে এবং একজন বান্দারূপে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক নির্মাণে যে চাহিদা তা তারা পূরণ নাও করতে পারে। এ দিকটির বিবেচনায় এই মানবগোষ্ঠী অসভ্যতা ও অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আবার এমন হতে পারে, কোনো মানুষ স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব ভালো আচরণ করে, তাদের সঙ্গে উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট মূল্যবোধের পরিচয় দেয়। এ দিকটির বিবেচনায় সে সভ্য মানুষ। কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে তার কার্যকলাপ খুব খারাপ, পশুপাখি ও বৃক্ষরাজির প্রতি তার কোনো মনোযোগ নেই, সেগুলোকে কষ্ট দেয়, ধ্বংস করে এবং সীমালঙ্ঘন করে। এই দিকটির বিবেচনায় সে পশ্চাৎপদ ও অধঃপতিত।

এমনকি মানুষ কোনো পর্যায়ের এক দিকের বিবেচনায় সভ্য ও অন্যদিক বিবেচনায় অসভ্যও হতে পারে। যেমন সে নিজের আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। এ দিকটির বিবেচনায় সে সভ্য। কিন্তু ভিন্ন সমাজ ও গোত্রের লোকদের সঙ্গে তার আচরণ খুবই খারাপ, নিজের পরিবারের সঙ্গে যে ন্যায়সংগত আচরণ করে তাদের সঙ্গে তা করে না এবং নিজ গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে যে মমতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, ভিন্ন গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে সে সম্পর্ক নেই। এই দিকটির বিবেচনায় সে অসভ্য। তার জুলুম অনুযায়ীই তার পশ্চাৎপদতা এবং তার দুষ্কৃতি অনুযায়ীই তার অসভ্যতা।

যে মানুষ উন্নত হাতিয়ার উদ্ভাবন করে তা আত্মরক্ষা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ব্যবহার করে সে সভ্য; কিন্তু জুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নে তা ব্যবহার করলে সে অসভ্য মানুষ।

উল্লিখিত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে আমাদের চারপাশে বিরাজমান সমাজব্যবস্থার প্রতি আমাদের অনেক সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারি। যে-সকল রাষ্ট্রকে বর্তমানে সভ্য রাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে, যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও এরকম অন্যান্য রাষ্ট্র, তারা পৃথিবী-পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিবেচনায় সভ্য। মানবাধিকার ও প্রাণী-অধিকারের কিছু বিষয় বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতেও তারা সভ্য। কিন্তু তারা তাদের সমাজের ভেতরে ও বাইরে কিছু চারিত্রিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে অসভ্য ও পশ্চাৎপদ। যে মানুষটি বিবাহিত জীবনের বলয়ের বাইরে যৌন-সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অশ্লীলতার প্রসার, অবাধ যৌনতাচর্চা, নারী-পুরুষের নির্লজ্জ মেলামেশা, বংশকৌলিন্য বিনাশ করে সন্তান নষ্ট করাসহ সমাজে বিভিন্ন ফেতনা-ফ্যাসাদের জন্ম দেয় তার পক্ষে সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। যে লোকটি মা-বাবাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার পক্ষেও সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। যে লোকটা মদ্যপান করে, সুদি লেনদেন করে, মাদক সেবন ও চালানের সঙ্গে যুক্ত, জুয়া খেলে, লাম্পট্য ও দুশ্চরিত্রতায় মত্ত সে কখনো সভ্য হতে পারে না। যে মানুষ দ্বৈত নীতি অবলম্বন করে, দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়, গরিব মানুষের অর্থসম্পদ লুণ্ঠন করে, তারও পক্ষে কখনো সভ্য হওয়া সম্ভব নয়।

উপরন্তু উপর্যুক্ত জাতি-গোষ্ঠীগুলো মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে চরমতম পশ্চাৎপদ। স্রষ্টা আছেন বলে যাবতীয় সুস্পষ্ট প্রমাণ, তাঁর মুজিযা ও কুদরতের কারিশমা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কিছুতেই সভ্য হতে পারে না। একইভাবে যারা মানুষপূজা, পাথরপূজা ও গরুপূজার বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে তাদের পক্ষেও সভ্য হওয়া সম্ভব নয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে, জীবনের অন্যান্য দিকের বিবেচনায় তাদের সভ্য হওয়ার বিষয়টি আমরা অস্বীকার করছি। তারা উপকারী ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে, উপকারী হাতিয়ার ও যন্ত্র তৈরি করেছে, অন্য অবদানও আছে। কিন্তু এটা হলো বিবেচনাযোগ্য যেসব দিক আছে তার একটি দিকমাত্র।

উপর্যুক্ত মানদণ্ডসমূহের প্রেক্ষিতে কোনো ধরনের পক্ষপাত ছাড়াই আমি বলতে পারি যে, পৃথিবীর বুকে ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা যা তিনটি সম্পর্কের প্রতিটির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন করেছে। এখানে স্রষ্টা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সত্যনিষ্ঠ ধারণা রয়েছে, কীভাবে তার যথাযথ আনুগত্য ও ইবাদত করা যায় সেটাও বোঝা আছে। এই সভ্যতাই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরে চারিত্রিক গুণাবলির পরিপূর্ণতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কাছের বা দূরের উম্মতের সকল সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ও আচার-আচরণে উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। যারা শত্রুপক্ষ ও বিরুদ্ধতাবাদী তাদের সঙ্গে উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। বরং ইসলামি সভ্যতাই যুদ্ধকালীন চরিত্রের বিবেচনাকে মানবিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে। অর্থাৎ, মুসলিমগণ অন্যদের সঙ্গে চরম বিরোধকালে, এমনকি যুদ্ধের সময়ও চারিত্রিক মানদণ্ডের প্রতি সম্মান বজায় রাখেন। মুসলিম হিসেবে যে সভ্য আচরণ তাদের পক্ষে সম্ভব সে আচরণই তারা করে থাকেন। ইসলামি সভ্যতাই বিড়ালকে বেঁধে রেখে মেরে ফেলার কারণে এক নারীর জাহান্নামি হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে[২৩] এবং এই সভ্যতাই পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে এক পুরুষের[২৪] বা (অন্য বর্ণনামতে) দুশ্চরিত্রা নারীর জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে।[২৫] ইসলামি সভ্যতাই জীবনমুখী জ্ঞান–চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা,

---

[২৩]. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে এক নারীকে আযাব দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে খাবার দেয়নি, পানি দেয়নি, এমনকি জমিনের ঘাস খেয়ে বাঁচার জন্য ছেড়েও দেয়নি।' *বুখারি*, কিতাব : আল-মুসাকাত, বাব : ফাদলু সাকয়িল মা, হাদিস নং ২২৩৬; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : তাহরিমু কাতলিল হিররাহ, হাদিস নং ২২৪২।

[২৪]. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একজন লোক দেখল যে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে কাদামাটি খাচ্ছে। সে তার মোজা খুলে তাতে পানি ভরে কুকুরটিকে পান করিয়ে তৃপ্ত করল। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।' *বুখারি*, কিতাব : আল-উযু, বাব : আল-মাউল লাযি ইয়ুগসালু বিহি শারুল ইনসান, হাদিস নং ১৭১; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল-বাহায়িমিল মুহতারামাহ ওয়া ইতআমুহা, হাদিস নং ২২৪৪।

[২৫]. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বনি ইসরাইলের এক দুশ্চরিত্রা নারী তা দেখতে পেল। সে তার পাদুকা খুলে কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।' *বুখারি*, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : তুমি কি মনে করো যে কাহফ ও গুহার অধিবাসীরা..., হাদিস নং ৩২৮০; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল বাহায়িমিল মুহতারামাহ ওয়া ইতআমুহা, হাদিস নং ২২৪৫।

রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাকার অনেক জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এই দৃশ্যপটে ইসলামি সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা যা প্রতিটি পর্যায়ে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছে। অন্যান্য সভ্যতা কোনো-না-কোনো দিক বিবেচনায় ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। এ থেকেই আমরা আল্লাহর এই বাণীকে বুঝতে পারি,

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটেছে।[২৬]

এটা ভিত্তিহীন অহেতুক বিষয় নয়। বরং আমরা ইসলামের সুদৃঢ় আদর্শের ফলে এই সভ্য উন্নত উৎকর্ষমণ্ডিত অবস্থায় পৌঁছেছি। এর দ্বারা কেবল মুসলিমরা নয়, অমুসলিমরাও সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং সমস্ত বিশ্ববাসী উপকার লাভ করেছে। এ কারণে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি।

আমরাই একমাত্র জাতি যাদের রয়েছে জীবনাচারের সঠিক ও শুদ্ধ মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের দ্বারা আমরা যেকোনো ক্রিয়াকলাপ ভালো না মন্দ তা বিচার করতে পারি। অধিকাংশ মানুষ নামমাত্র উপাসনা করে, তাদের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। ইবাদতের সঠিক মানদণ্ড ও পদ্ধতি রয়েছে কেবল মুসলিমদের কাছে। অধিকাংশ মানুষ নির্দিষ্ট চারিত্রিক নীতি দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখে, কিন্তু এই চারিত্রিক নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। একটি সমাজব্যবস্থায় যেটাকে ন্যায়সংগত মনে করা হয় অন্য সমাজব্যবস্থায় সেটাকে জুলুম ও অন্যায় ভাবা হয়। কেউ কেউ যেটাকে দয়া ও অনুগ্রহ মনে করে, অন্যরা সেটাকে নৃশংসতা মনে করে। সঠিক চারিত্রিক নীতি ও মানদণ্ড ইসলাম ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা ইসলামি শরিয়তকে বিশ্ববাসীর জীবনবিধান মনোনীত করেছেন।

যে মতাদর্শ আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য নাযিল করেছেন তার কারণে সভ্যতার বা অসভ্যতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজের ওপর কর্তৃত্ব

---

২৬. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১১০।

করার যোগ্যতা তাদের দেওয়া হয়েছে, এই বক্তব্যের জোরালো সমর্থন আমরা পাই আল্লাহর এই বাণী থেকে,

﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির।[২৭]

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রোমানরা কোনো বিবেচনায় সভ্য হলেও অন্য বিবেচনায় সভ্য ছিল না। পারস্য বা ভারতীয় বা চৈনিক সমাজব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা সাক্ষী রয়েছি। একইভাবে আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজব্যবস্থার ব্যাপারেও আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। একইভাবে যেসব সমাজব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত হবে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সাক্ষী থাকব। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে-সকল সমাজব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও আমরা সাক্ষী। সেসব সমাজব্যবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি সত্য, তবে কুরআনুল কারিমে রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সেগুলোর সংবাদ আমরা জেনেছি। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ সংবাদ আমরা অবগত হয়েছি। হযরত আবু সাইদ খুদরি রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে আমরা এমনটাই বুঝে থাকি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»

কিয়ামতের দিন নুহ আ. ও তার উম্মত উপস্থিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। তারপর আল্লাহ তার উম্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি তোমাদের কাছে

---

২৭. সুরা হজ : আয়াত ৭৮।

আমার পয়গাম পৌছে দিয়েছিলেন? তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোনো নবী আসেনি। তখন আল্লাহ নুহ আ.-কে বলবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষী রয়েছে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মত। তখন আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, তিনি আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ কথারই উল্লেখ করেছেন, 'এইভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও।'[২৮], [২৯]

এই বইয়ে আমরা গড়পড়তা সাধারণ সভ্যতা নিয়ে—যার অনেক তুল্য ও সমকক্ষ রয়েছে—আলোচনা করব না, বরং আমরা 'নমুনা-সভ্যতা' সম্পর্কে আলোচনা করব, যার মানদণ্ডে নিজেদের যাচাই করা প্রত্যেক সমাজের উচিত।

এই বই পাঠে আমরা আবশ্যিকভাবে যা জানতে পারব, এগুলোতেই সভ্যতা সীমিত উদ্দেশ্য নয়, এটা অসম্ভবও। এখানে কিছু প্রবেশদ্বার উল্লেখ করব, কিছু দুয়ার উন্মুক্ত করব। যদ্দ্বারা কূলহীন ইসলামি সভ্যতার সাগরে প্রবেশ করতে পারি।

ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত সর্বজনবিদিত বিষয় যে, এই সভ্যতার উৎকর্ষ ও সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহর সঙ্গে গভীর ও দৃঢ় বন্ধন। এই দুটি উৎসই মুসলিম এবং তাদের প্রতিপালক, সমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ়ীকরণে সম্যক ভূমিকা রেখেছে। কুরআন ও সুন্নাহে আইনকানুন ও সূক্ষ্ম নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রতিটি ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নত সভ্যতা নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেছে। এমনকি বস্তুগত যাবতীয় বিষয়, বরং আনন্দ-বিলাসের বিষয়গুলোও কুরআন ও সুন্নাহর সংহত নীতি-আদর্শে আলোচিত হয়েছে। আরবদের ইসলামপূর্ব ইতিহাস কোনোভাবেই এদিকে ইঙ্গিত করেনি যে তারা একসময় পৃথিবীর নেতৃত্বে সমাসীন হবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে নামিদামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করবে। ইসলাম ও তার আইনকানুন আত্মস্থ ও আঁকড়ে ধরা ছাড়া

---

২৮. সুরা বাকারা : আয়াত ১৪৩।

২৯. *বুখারি*, কিতাব : আম্বিয়া, হাদিস নং ৩১৬১।

আরবদের উন্নতি ও উৎকর্ষের কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। উমর ফারুক রা. এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'আমরা ছিলাম হীন জাতি, আল্লাহ তাআলা ইসলাম দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ যা দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন তা ছাড়া অন্যকিছু দ্বারা যদি সম্মান চাই তবে আল্লাহ আমাদের অপদস্থ করবেন।'[৩০] যারা এই বই পড়বেন তাদের প্রত্যেকের মনে যে প্রশ্নের উদয় হবে, উমর ফারুক রা.-এর বক্তব্য থেকেই তার জবাব দিতে পারি। প্রশ্নটি এই, আমরা যদি উন্নতি ও উৎকর্ষের উচ্চতর শিখরে পৌঁছেই থাকি তবে বর্তমানে আমাদের অবস্থা করুণ কেন? কেন এই বিপর্যয়, দুর্দশা, জটিলতা, অধঃপতন ও পশ্চাৎপদতা?

এই প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ ও স্পষ্ট, মুসলিমগণ তাদের শক্তি ও ক্ষমতার উপকরণ পরিত্যাগ করেছে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবজ্ঞা করেছে। কুরআন-সুন্নাহর সংহত আইনকানুন ও অবিনশ্বর বিধানকে তারা অবহেলা করেছে। শুধু তাই নয়, মুসলিমগণ পশ্চিমাদের দ্বারা এমনভাবে প্রতারণার শিকার হয়েছে যে তারা পাশ্চাত্যসভ্যতায় তাদের উত্তরণ ও শক্তির উপকরণ খুঁজতে লেগে গেছে। তারা এটা বুঝতেও পারছে না যে, পশ্চিমা সভ্যতা কোনো প্রেক্ষিতের বিচারে উন্নতি লাভ করলেও অন্যান্য প্রেক্ষিতের বিবেচনায় অধঃপতিত ও পশ্চাৎপদ। কারণ চূড়ান্ত বিচারে সেটা মানবসৃষ্ট সভ্যতা এবং মানুষ সঠিক কিছু করে তো কিছু ভুল করে। একমাত্র ইসলামই সুসংহত ও সুগঠিত জীবনবিধান, এতে কোনো ভ্রান্তি নেই, কোনো ত্রুটি নেই।

আমাদের অবশ্যকর্তব্য আমাদের দ্বীন ও শরিয়তের প্রতি কার্যত আস্থা রাখা, যাতে আমরা ইসলাম নিয়ে গর্ববোধ ও সম্মানিত বোধ করতে পারি এবং অন্যান্য মানবসভ্যতার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ববোধ করতে পারি। এসব কথা অহংকার ও আত্মম্ভরিতাবশত নয়, বরং আমাদের যে বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে এবং চারপাশের মানবমণ্ডলীর প্রতি যে অনুগ্রহ ও ভালোবাসা রয়েছে তার কারণেই। মানুষ অনেক সময়ই নিজের অজ্ঞাতসারেই, অবচেতন মনেই বহুবিধ জটিলতা ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। তখন মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ব্যতীত অন্যকোথাও মুক্তি মেলে না। গুস্তাভ

---

৩০. মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ১৩০।

লি বোঁর কথায় উপর্যুক্ত বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি ইসলামি সভ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, আরব মুসলিমদের সভ্যতা ইউরোপীয় জংলি জাতিগুলোকে মনুষ্যত্বের জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবদের লিখিত গ্রন্থরাশি ছাড়া জ্ঞানের কোনো উৎসের খবর জানে না। আরব মুসলিমরা ইউরোপকে বস্তুগত, জ্ঞানগত ও চরিত্রগত দিক দিয়ে সভ্য করে তুলেছে। ইতিহাসে এমন কোনো জাতির কথা নেই যারা সভ্যতায় মুসলিমদের সমান অবদান রাখতে পেরেছে।[৩১]

উপর্যুক্ত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক আলোচনা এবং এই বই সম্পর্কে গভীর আলোকপাতের পর যে প্রশ্নটি আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় তা এই, এই বই পাঠের পর আমাদের কী করা উচিত? আমাদের পূর্বসূরি মনীষীবৃন্দ সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে যে শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তা জানার পর আমাদের কর্তব্য কী?

এটি গুরুত্বপূর্ণ, বরং চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সম্ভবত এই প্রশ্নের জবাব খোঁজাই আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে অবস্থা ও স্তর নির্ধারণ করেছেন সেখানে ফিরে আসার প্রথম পথ।

হ্যাঁ, এই প্রশ্নের জবাব আমি বইয়ের শেষে দেবো, ইসলামি ইতিহাসের শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে প্রমোদভ্রমণের পর আপনারা তা জানতে পারবেন।

আসুন, এবার বইটি পড়া যাক!

আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

—ড. রাগিব সারজানি

---

৩১. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ২৭৬।

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর তুলনায় ইসলামি সভ্যতা

ইসলামি সভ্যতা বিশ্বকে অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতা এবং মূল্যবোধ ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে উদ্ধার করেছে যা ইসলামপূর্ব বিশ্বকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি ও স্তম্ভ রচিত হয়েছে আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের সুন্নাহ থেকে, তারপর তা বিশ্বভূমির বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ-নির্বিশেষে সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। গোটা বিশ্বে নেতৃত্বের আসন দখল করার জন্য ইসলামি সভ্যতার এমন সব অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোনো সভ্যতার নেই। ইসলামি সভ্যতাই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা এ বিষয়েই আলোচনা করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের বিকাশলগ্নে বিশ্বসভ্যতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতার উৎস ও স্তম্ভ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ
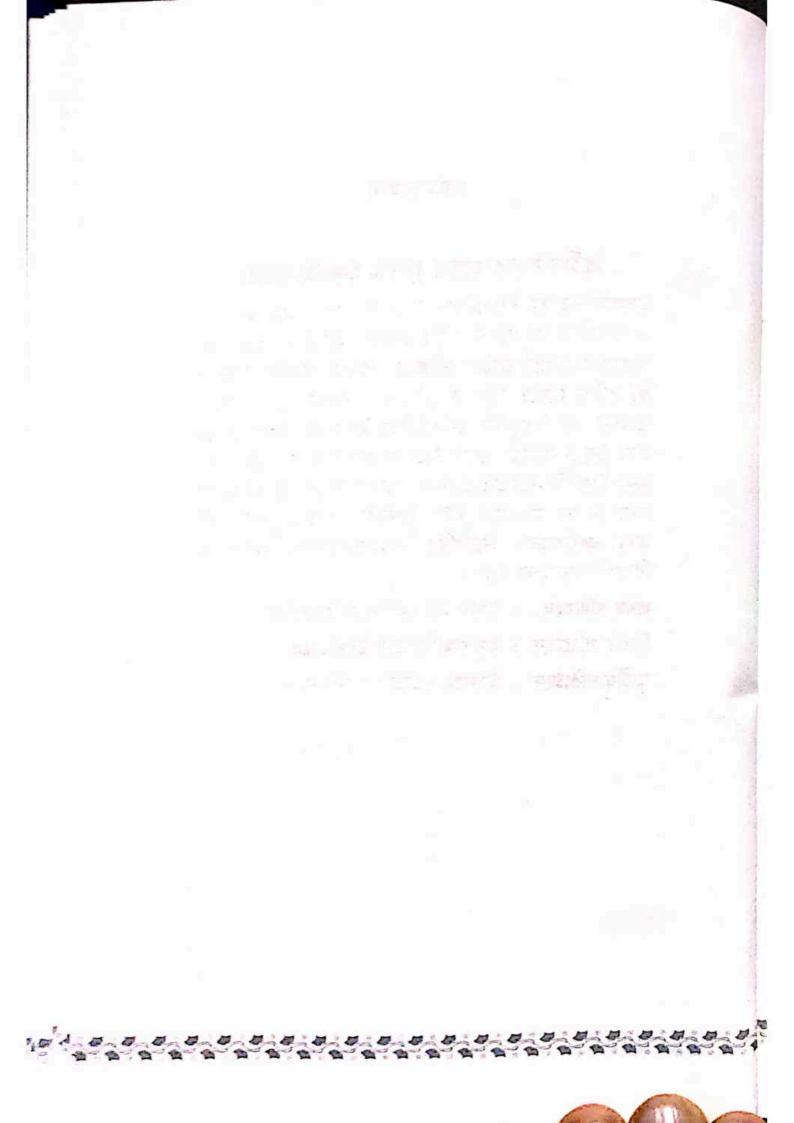
প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের বিকাশলগ্নে বিশ্বসভ্যতা

ইসলামপূর্ব বিশ্ব অনেকগুলো সভ্যতা যাপন করেছে। এসব সভ্যতা মানবজাতির বিকাশ ও উৎকর্ষে একটা পর্যায়ে অবদান রেখেছে, কিন্তু তার সবগুলোই প্রবৃত্তি ও ভোগের পেছনে ছুটেছে, ফলে তাদের শোচনীয় পতন ঘটেছে। এরপর আরও উন্নত মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, যা ওই সকল সভ্যতার যা-কিছু ভালো তার উত্তরাধিকার লাভ করেছে। এই সভ্যতার রয়েছে বিশেষ স্বাদ, রং ও ঘ্রাণ, যার আরামদায়ক ছায়ায় সবাই স্বস্তি ও সৌভাগ্যের সঙ্গে বসবাস করেছে। হ্যাঁ, তা হলো ইসলামি সভ্যতা।

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা সভ্যতাসমূহের প্রকৃতি বিচার করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : গ্রিক সভ্যতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ভারতীয় সভ্যতা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : পারস্যসভ্যতা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : রোমান সভ্যতা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ইসলামপূর্ব আরব

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : একনজরে ইসলামপূর্ব বিশ্ব

প্রথম অনুচ্ছেদ

গ্রিক সভ্যতা

গ্রিক সভ্যতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন বিশ্বসভ্যতা বিবেচনা করা হয়। দর্শন, জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পে গ্রিস উৎকর্ষ সাধন করেছিল। সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন অনেক বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক, যারা ছিলেন বিশ্বচিন্তার স্তম্ভ। যেমন সক্রেটিস[৩২], প্লেটো[৩৩], অ্যারিস্টটল[৩৪]।

---

৩২. ভাববাদী দার্শনিক সক্রেটিস (Socrates 469-399 BC) গ্রিসের অন্যতম প্রধান অ্যাপোলিক গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সাফ্রোনিস্‌ক্স ছিলেন একজন ভাস্কর এবং মা ফেনারিটি ছিলেন ধাত্রী। সক্রেটিসের চেহারা ছিল কিম্ভূত; বেঁটে ও মোটা ছিলেন, নাক ছিল ছড়ানো ও চ্যাপটা, চোখ দুটি ছিল কোটরের বাইরে। তার স্ত্রী জানথিপি ছিলেন খুব বদমেজাজি। সক্রেটিস জীবন রক্ষার জন্য জরুরি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ চাইতেন না। তার ছিল বিস্ময়কর রকম কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। খুব সাদামাটা পোশাক পরতেন। এমনকি জুতো পর্যন্ত পায়ে দিতেন না। বলতেন, পোশাক হলো বাইরের আবরণ, মানুষের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে তার জ্ঞান। দেশের তরুণদের বিপথগামী করা হচ্ছে এই অজুহাতে শাসকেরা সক্রেটিসকে বন্দি করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। শিষ্যেরা প্রহরীদের ঘুষ দিয়ে সহজেই তার পালানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু তিনি পালাননি, ক্ষমাও চাননি। দণ্ডাদেশ অনুযায়ী হেমলক বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলেছেন, সবাই মনে করে যে তারা সবকিছু জানে এবং কোনো সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তার সমাধানও করে ফেলে। কিন্তু আসলে তাদের দেওয়া সমাধানে অনেক ভুল, অনেক অপূর্ণতা থেকে যায়। তাদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, তারা জানে না যে তারা জানে না আর আমি জানি যে আমি কিছু জানি না।-অনুবাদক

৩৩. ৪২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম এরিস্টক্লস। প্লেটো শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশাল কাঁধ। বিশাল কাঁধের অধিকারী ছিলেন বলে তাকে প্লেটো বলে ডাকা হতো। তার গুরু হলেন সক্রেটিস এবং তার শিষ্য হলেন অ্যারিস্টটল। প্লেটোর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *রিপাবলিক*, *অ্যাপোলজি*, *ক্রিটো*, *ফিদো*, *পার্মিনাইদিস*, *থিটিটাস* ও *সিম্পোজিয়াম*। ৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সক্রেটিসকে দর্শনশাস্ত্রের জনক এবং প্লেটোকে তার পূর্ণতাদানকারী বলা হয়।-অনুবাদক

৩৪. অ্যারিস্টটল (AristotleBC-322 BC) সর্বকালের অন্যতম প্রধান দার্শনিক হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। জন্ম মেসিডোনিয়ার স্টাগিরা নামক স্থানে। পিতা চিকিৎসক। ১৭ বছর বয়সে প্লেটোর একাডেমিতে যোগ দেন। বিশ্বজয়ী বীর আলেকজান্ডারের শিক্ষক হিসেবে মেসিডোনিয়ায় যান। মতবিরোধ দেখা দিলে আবার এথেন্সে ফিরে আসেন। জীবন ও জগতের এমন কোনো দিক ছিল না যেদিকে তিনি গবেষকের দৃষ্টিতে তাকাননি। এজন্য তাকে জ্ঞানের সমুদ্র বলা হতো। বিজ্ঞান ও দর্শনে তার চিন্তা দেড় হাজারেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুদের প্রভাবিত করেছে। তিনি মনে করতেন, মাটি, বায়ু, আগুন ও পানি-এই চারটি

তারা ছাড়াও অনেক মনীষী ছিলেন। তারা কতিপয় সত্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব পালন এবং তাদের সমাজজীবনে কিছু মূল্যবোধের বীজ রোপণ করেছিলেন। এগুলো ছিল তাদের যৌক্তিক চিন্তারাশি, বাহ্যিক কার্যকারণ ও তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনার ফল।

গ্রিক সভ্যতা দর্শন ও চিন্তার ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ সাধন করেছিল এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের যে পরিপক্বতা অর্জন করেছিল, তাদের পূর্বে আর কোনো জাতি এ অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। কিন্তু এই সভ্যতা ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে এগিয়েছে। গ্রিক মনীষীরা যে ঐতিহ্য রেখে গিয়েছিলেন তা পরখ করে দেখলে আমাদের সামনে গ্রিক সভ্যতার পতনের কারণগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নোবল সিটি বা অভিজাত নগরী-সম্পর্কিত প্লেটোর ধারণা আমরা আলোচনা করতে পারি। তিনি মনে করতেন যে, অভিজাত নগরী তিন শ্রেণির মানুষ দ্বারা গড়ে উঠবে। প্রথম শ্রেণিতে থাকবে দার্শনিক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণিতে থাকবে সেনাসদস্যরা এবং তৃতীয় শ্রেণিতে থাকবে শ্রমিক ও কৃষকেরা। অভিজাত নগরীতে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন কেবল দার্শনিকেরা, তাতে সেনাশ্রেণি বা শ্রমিকশ্রেণির কোনো অধিকার থাকবে না। প্লেটো সেনাশ্রেণির জন্য চরম শৃঙ্খলা বিধিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি সৈনিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেছিলেন। সৈনিকদের মালিকানার অধিকার ছিল না, পরিবার গঠন করার অধিকারও ছিল না। তাদের স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত নারীরা হতো যৌথ বা এজমালি সম্পত্তি। এ সকল নারীর সন্তানদের পিতৃপরিচয় ছিল না, তারা হতো রাষ্ট্রের সন্তান। অভিজাত নগরীতে তৃতীয় শ্রেণি অর্থাৎ মজদুর ও কৃষকদের দায়িত্ব ছিল শাসকশ্রেণি ও সেনাশ্রেণির সেবা ও খেদমত নিশ্চিত করার জন্য শ্রম ব্যয় করা। এই শ্রেণির কোনো মানবিক অধিকারই ছিল না। প্লেটোর নগরীতে অসুস্থের কোনো ঠাঁই ছিল না। রাষ্ট্র তাদেরকে দূরে ছুড়ে দিত। এই হলো প্লেটোর অভিজাত নগরীর চিত্র।[৩৫]

মূল পদার্থে এই পৃথিবী বিভক্ত। অ্যারিস্টটলের সব চিন্তা সঠিক ছিল না। তবু তিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এ কারণে যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়ে তিনিই প্রথমে চিন্তার সূত্রপাত করেন।-অনুবাদক

৩৫. আহমাদ শালবি, *মাউসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, ১ম খ., পৃ. ৫৪।

প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ দাস হয়ে ওঠে এবং দাসত্ব দাস-মানবদের জন্য একটি বৈধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা, এ ব্যাপারে মহাদার্শনিক অ্যারিস্টটল আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং ইতিবাচক মত ব্যক্ত করেছেন। তার এই মত ছিল অপরিহার্য, ফলে সমাজে দুই শ্রেণির মানবের উদ্ভব ঘটেছিল—শাসক ও শাসিত। উঁচু শ্রেণির সদস্যদের দ্বারা নিচু শ্রেণির সদস্যদের শাসিত হওয়া ছিল অবধারিত। অ্যারিস্টটলের মতে, প্রকৃতি দাস-মানবদের দিয়েছে শক্তিশালী দেহ, পক্ষান্তরে স্বাধীন মানবদের দিয়েছে অসাধারণ বুদ্ধি ও পরিপক্ব চিন্তা। ফলে স্বাধীন মানব ক্ষমতাচর্চার জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠেছে, এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে, চিন্তা দেহকে পরিচালিত করে। অ্যারিস্টটলের অবস্থান ছিল প্রাকৃতিক অধিকারে সমতানীতির বিরুদ্ধে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতি এক শ্রেণির মানবকে বুদ্ধি ও চিন্তা দ্বারা (অন্যদের থেকে) বিশিষ্ট করেছে। আর অন্যদেরকে দেহের অঙ্গগুলো ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছে। এইভাবে প্রকৃতি মানবমণ্ডলীর স্বাধীন সদস্যদের দেহকে দাস সদস্যদের দেহ থেকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলেছে। দাস শ্রেণির সদস্যরা শ্রমসাধ্য কঠিন কর্মগুলো সম্পন্ন করার জন্য আবশ্যক শক্তি পেয়েছে, পক্ষান্তরে স্বাধীন সদস্যদের শরীর প্রকৃতিগতভাবেই ওইসব কঠিন কাজের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ তাদের সুঠাম শিরদাঁড়া ওইসব শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করার পক্ষে অনুপযুক্ত। বস্তুত প্রকৃতি মানবমণ্ডলীর স্বাধীন সদস্যদের প্রস্তুত করেছে কেবল নাগরিক বা শহুরে জীবনের দায়িত্ব পালনের জন্য।[৩৬]

গ্রিক চিন্তাধারা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সবাই এই চিন্তাধারার মূল্যায়ন করেছে এবং একে একপ্রকার প্রজ্ঞা বলে আখ্যায়িত করেছে। উইল ডুরান্ট এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, উত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রে গ্রিকরা দৃষ্টান্ত হতে পারে না। তিনি এর কারণ দেখিয়েছেন এই যে, তাদের চিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশ তাদের অধিকাংশকে চরিত্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ ছিল, চরিত্র বলতে কোনো বিষয় তাদের মধ্যে ছিল না। নিজেদের সন্তান ছাড়া আর কাউকে তারা প্রাধান্য দিত না। হৃদয়ের আবেগ ও যাতনা তারা কমই বুঝতে

৩৬. গানিম মুহাম্মাদ সালেহ, *আল-ফিকরুস সিয়াসিয়্যুল কাদিমু ওয়াল-ওয়াসিত*, পৃ. ১০৯-১১০।

পারত। তারা নিজেদের যতটা ভালোবেসেছে, প্রতিবেশীদের ততটা ভালোবাসার কথা চিন্তাই করতে পারত না।[৩৭]

গ্রিক সভ্যতার ক্রমান্বয় অধঃপতনের ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় যোগ করে নিন, তারা কামচরিতার্থে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং কেবল ইন্দ্রিয়সুখের পেছনে ছুটছিল। এটাই তাদের সভ্যতার অধঃপতন ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ, জৈবিক সম্পর্কের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল এবং তা সৎ মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমনকি দার্শনিকরা খাদ্যের উৎসগুলোতে অধিবাসীদের চাপ কমানোর অজুহাত দেখিয়ে শিশুহত্যা বৈধ করেছিল। এর ফলে নগর ও দেশ বিরান হয়ে পড়েছিল।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, নৈতিকতার শৃঙ্খল ছিন্নকরণ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মম্ভরিতার আস্ফালন গ্রিক সভ্যতার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। মেনানদার[৩৮] তার নাটকগুলোতে এথেন্সের জীবনকে চিত্রায়িত করেছেন, এথেন্সের জীবন ছিল চরিত্রহীনতা, ভ্রষ্টতা ও জৈবিক যথেচ্ছাচারে ভরপুর। তাই পতন ছিল স্বাভাবিক পরিণাম।[৩৯]

---

৩৭. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ৭, পৃ. ৯৩ ও তার পরবর্তী (কিছুটা পরিমার্জিত)।

৩৮. মেনানদার (Menander 342/41–290 BC) : গ্রিক নাট্যকার, তিনি ১০৮টি কমেডি নাটক রচনা করেন।

৩৯. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, পৃ. ৮৬।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ভারতীয় সভ্যতা

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে। মানবজাতির অভিযাত্রায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃত অবদান রয়েছে। অধিকাংশের মতে তারা গাণিতিক সংখ্যা (০-৯) আবিষ্কার করেছিল। ত্রিকোণমিতিতেও তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেড়, আড়াই, সাড়ে তিন (বিজোড় সংখ্যার অর্ধেক) ইত্যাদি সংখ্যাও প্রথম তারাই ব্যবহার করেছিল। জ্যামিতির ত্রিকোণমিতির[৪০] ক্ষেত্রে সাইন (sine) -এর সারণিও তাদের আবিষ্কার। একইভাবে ভারতীয় সভ্যতা চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় অবদান রেখেছে।[৪১]

ভারতীয় সভ্যতা উন্নতি ও উৎকর্ষের শিখরে পৌছা সত্ত্বেও খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবনতি ও অধঃপতনের পথে দ্রুত নেমে যেতে থাকে। এর কিছু কারণ ও হেতু ছিল।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি[৪২] রহ. খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় সভ্যতা কীরূপ ছিল তা আলোচনা করতে গিয়ে উল্লিখিত চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

৪০. ত্রিকোণমিতি : সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণ ও বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণদ্বয়ের একটির বিপরীত দিকের বাহুর দৈর্ঘ্যের অনুপাত।-অনুবাদক

৪১. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ৩, পৃ. ২৩৮।

৪২. আবুল হাসান আলি ইবনে আবদুল হাই ইবনে ফখরুদ্দিন আল-হাসানি জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, সংগ্রামী সাধক, বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক। সমকালীন বিশ্বের অন্যতম প্রধান ইসলামি চিন্তাবিদ আবুল হাসান আলি নদবি (জন্ম ৫ ডিসেম্বর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দুভাষী হওয়া সত্ত্বেও তার রচনাবলির প্রায় সবই আরবি ভাষায়। লখনৌ নদওয়াতুল উলামার মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপালনের পাশাপাশি ইউরোপ, আমেরিকা, ও মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। দুইশতাধিক গ্রন্থপ্রণেতা

اتفقت كلمة المؤلفين في تاريخ الهند على أن أحط أدوارها ديانة وخلقًا واجتماعًا، ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي.

ভারতবর্ষের ইতিহাস যারা রচনা করেছেন তারা এ বিষয়ে একমত যে, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়া থেকে যে সময়কালের সূচনা হয়েছে সেটাই ছিল ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সবচেয়ে অধঃপতিত যুগ।

আবুল হাসান আলি নদবি বিশ্বাসগত অরাজকতার চিত্র তুলে ধরার পর বলেছেন, ভারতে বর্ণবৈষম্যের নীতি পাশবিকভাবে চর্চিত হয়েছিল। পৃথিবীর কোনো মানবগোষ্ঠীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের চেয়ে চরম বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণে বর্ণে বিপুল পার্থক্য এবং মানবমর্যাদার ভয়ানক ভূলুণ্ঠন সম্পর্কে জানা যায়নি।

খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম-সভ্যতার সূচনা ঘটে। এতে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার জন্য নতুন নির্দেশনা প্রস্তুত করা হয়। এই নির্দেশনায় নাগরিক ও রাজনৈতিক আইন লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এ ব্যাপারে গোটা দেশ একমত হয়। ভারতীয়দের জীবনে এটিই হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রীয় আইন ও ধর্মীয় সূত্রসম্ভার। এটি বর্তমানে মনুশাস্ত্র (মনুসংহিতা) নামে পরিচিত। এই আইন দেশের অধিবাসীদের চার শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে। সেগুলো হলো :

১. ব্রাহ্মণ : গণক ও ধর্মীয় পুরোহিত শ্রেণি।
২. ক্ষত্রিয় : সৈনিক বা যোদ্ধা শ্রেণি।
৩. বৈশ্য : কৃষক ও বণিক শ্রেণি।
৪. শূদ্র : সেবক ও দাস শ্রেণি।

আল্লামা নদবির ৩ খণ্ডে প্রকাশিত আত্মজীবনী 'কারওয়ানে যিন্দেগি' এখন গোটা মুসলিমবিশ্বে সমাদৃত। গোটা মুসলিমবিশ্বের পাশাপাশি প্রায় গোটা পৃথিবীই তিনি ভ্রমণ করেছেন। একাধারে আধ্যাত্মিক নেতা, উচ্চ পর্যায়ের চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক ও আন্তর্জাতিক মানের সংগঠক হিসাবে তিনি তার সমকালীন বিশ্বের অভূতপূর্ব স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেন। ১৯৮৪ ও ১৯৯৪ সালে দুবার তিনি বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি ছিলেন শহিদে বালাকোট হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহিদ রহ.-এর অধস্তন ৫ম পুরুষ। উত্তর ভারতে শহিদ বেরেলবির পারিবারিক গোরস্থানেই আল্লামা নদবিও শায়িত আছেন।-অনুবাদক

মনুসংহিতা ব্রাহ্মণ শ্রেণির জন্য এমনসব মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে যা তাদেরকে দেবতাসনে আসীন করেছে। মনু বলেছেন, ব্রাহ্মণরা হলো ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তারাই সৃষ্টিজগতের দেবতা। পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাদের অধীন। তারা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। তারা তাদের দাস শূদ্রশ্রেণির সম্পদ থেকে যা খুশি নিতে পারবে। কারণ, দাস কোনোকিছুর মালিক হতে পারে না, তার সমস্ত সম্পত্তিই তার প্রভুর সম্পত্তি।

মনুসংহিতার আইনের ফলে ভারতীয় সমাজে শূদ্রশ্রেণি ছিল পশুর চেয়েও পতিত, কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। কুকুর, বিড়াল, ব্যাঙ, গিরগিটি, কাক ও পেঁচা হত্যার যে জরিমানা ছিল, শূদ্রশ্রেণির লোকদের হত্যার জরিমানাও ছিল একই।[৪৩]

ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থান[৪৪] ক্রীতদাসীর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। জুয়াখেলায় পুরুষেরা নিজের স্ত্রীকে বাজি রাখত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক নারীর একাধিক স্বামী হতো। আবার কারও স্বামী মারা গেলে সে চিরতরে বিধবা হয়ে যেত, কখনো দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারত না। তার জীবন হয়ে উঠত লাঞ্ছনা-যন্ত্রণার লক্ষ্যস্থল। সে মৃত স্বামীর বাড়িতে দাসী হিসেবে থাকত এবং স্বামীর ভাইবোনদের সেবা করে জীবন কাটাত। কখনো পার্থিব জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে আত্মাহুতি দিত।[৪৫]

ইসলামের পূর্বে এমনই ছিল ভারতীয় সভ্যতা। এমন লজ্জাজনক অজ্ঞতা, নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যে ছিল না। ইতিহাসেও এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আল-বিরুনি[৪৬] তার গ্রন্থে এসব বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর

---

৪৩. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৬৪-১৬৮।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৮৩।

৪৫. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৬৮-৭৬।

৪৬. আবু রাইহান আল-বিরুনি বা আবু রাইহান মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-বিরুনি আল-খাওয়ারিজমি (২৬২-৪৪০ হি./৯৭৩-১০৪৭ খ্রি.) ছিলেন মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত আরবীয় শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। খাওয়ারিজমের বাইরে বসবাস করতেন বলে সাধারণভাবে তিনি আল-বিরুনি (প্রবাসী) নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন গণিতবিদ, জ্যোতিস্পদার্থবিদ, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পারদর্শী। অধিকন্তু ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক, পঞ্জিকাবিদ, দার্শনিক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ ও

সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তার গ্রন্থটি হলো, تَحقِيق ما للهِند مِنْ مَقوْلة مَقبوْلة في العَقل أو مَرْذوْلة। অধিক জানতে আগ্রহী হলে এই গ্রন্থটি পড়ুন।

ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক। স্বাধীন চিন্তা, মুক্তবুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচনা ও সঠিক মতামতের জন্য যুগশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আল-বিরুনির কাল বলে উল্লেখ করা হয়। তিনিই প্রথম প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অধ্যাপক মাপার মতে, আল-বিরুনি শুধু মুসলিমবিশ্বেরই নন, বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন। তিনি একটি অতি সাধারণ ইরানি পারিবারে ৪ সেপ্টেম্বর ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম ২৫ বছর তিনি নিজের জন্মভূমিতে অতিবাহিত করেন। অধ্যয়নকালেই তিনি তার কিছু প্রাথমিক রচনা প্রকাশ করেন এবং প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ইবনে সিনার সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন। আল-বিরুনির মাতৃভাষা ছিল খাওয়ারিজমের আঞ্চলিক ইরানি ভাষা। কিন্তু তিনি তার রচনাবলি আরবিতে লিখে গেছেন। আরবি ভাষায় তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি আরবিতে কিছু কবিতাও রচনা করেন। অবশ্য শেষের দিকে কিছু গ্রন্থ ফারসিতে অথবা আরবি ও ফারসি উভয় ভাষাতেই রচনা করেন। তিনি গ্রিক ভাষাও জানতেন। হিব্রু ও সিরীয় ভাষাতেও তার জ্ঞান ছিল। তিনি ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শাহ আবুল হাসান আলি ইবনে মামুন কর্তৃক বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন। তিনি আলি ইবনে মামুনের পর তার ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং অনেক রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও রাজকীয় দৌত্যকার্যের দায়িত্বেও নিয়োজিত থাকেন। মামুন তার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ১০১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হওয়ার পর সুলতান মাহমুদ খাওয়ারিজম দখল করে নেন। গণিতবিদ আবু নাসের মানসুর ইবনে আলি ও চিকিৎসক আবুল খাইর আল-হুসাইন ইবনে বাবা আল-খাম্মার আল-বাগদাদির সঙ্গে গজনি চলে যান। এখানেই তার জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তখন থেকে তিনি গজনির শাহি দরবারে সম্ভবত রাজ-জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি কয়েকবার সুলতান মাহমুদের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এসেছিলেন। গজনির সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ভারতে প্রায় ১২ বছর অবস্থান করেন। এখানে সংস্কৃত ভাষা শেখেন এবং হিন্দুধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, দেশাচার, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ভারতীয় কিছু আঞ্চলিক ভাষাতেও জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি এই এক যুগের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা রচনা করেন তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *কিতাবু তারিখিল হিন্দ*। আল-বিরুনি ৬৩ বছর বয়সে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। তারপরও তিনি ১২ বছর বেঁচেছিলেন। ১৩ ডিসেম্বর ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। আল-বিরুনির সর্বমোট ১১৩টি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে ১০৩টি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ১০টি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয়, তার রচিত গ্রন্থের সর্বমোট সংখ্যা ১৮০টি।-অনুবাদক

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

পারস্যসভ্যতা

পারসিকরা বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সভ্য বিশ্বের কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে তারা ছিল রোমানদের সমান। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাসানীয় শাসনামলে (Sassanid dynasty) পারস্যসভ্যতার বিকাশ ঘটে। রাজনীতি, প্রশাসন, যুদ্ধজয়, বিলাসব্যসন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তারা উৎকর্ষ সাধন করে। তাদের একটি জাতিগত ধর্ম ছিল, তা হলো জরথুস্ত্রের ধর্ম। সাহিত্যরসমণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি ভাষাও তাদের ছিল, তা হলো পাহলভি ভাষা।[৪৭]

আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল এরূপ, প্রাচীন যুগে তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা দিত। এরপর তারা পূর্বসূরিদের মতো সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে মর্যাদা দিতে শুরু করে। এরপর সমাজসংস্কারকরূপে জরথুস্ত্রের (খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৬৬০-৫৮৩) আবির্ভাব ঘটে। তিনি দেশবাসীর ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শের সংস্কার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বলেন, বিশ্বজগতের যা-কিছু আলোকিত ও উদ্ভাসিত তার সবকিছুতে আল্লাহর নুর বিচ্ছুরিত হয়। তিনি নামায বা উপাসনার সময় সূর্য ও আগুনের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হতে নির্দেশ দেন (কারণ এতে আল্লাহরই উপাসনা করা হবে) এবং চারটি উপাদানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেন। উপাদান চারটি এই : আগুন, বায়ু, মাটি ও পানি। জরথুস্ত্রের মৃত্যুর পর যে-সকল মনীষীর আবির্ভাব ঘটে তারা জরথুস্ত্রপন্থীদের জন্য বিভিন্ন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। তারা তাদের জন্য এমনসব বিষয়ে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যেগুলোর জন্য আগুন অনিবার্য। (কারণ, এতে আগুনের অমর্যাদা হতে পারে।) ফলে তাদের কর্মকাণ্ড কৃষিকাজ ও ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আগুনকে এভাবে মর্যাদা দান ও উপাসনার সময় তাকে কেবলা হিসেবে

---

৪৭. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৬৭।

গ্রহণের কারণে মানুষ ধীরে ধীরে আগুনেরই উপাসনা করতে শুরু করে। অবশেষে তারা আগুনকে উপাস্য বানিয়ে নেয় এবং আগুনের জন্য তারা বেদি ও উপাসনালয় নির্মাণ করে। আগুনের উপাসনা বাদে সমস্ত আকিদা ও ধর্মীয় সংস্কারের বিলুপ্তি ঘটে।[৪৮]

আগুন যখন তার উপাসনাকারীদের কাছে শরিয়ত পাঠাল না, রাসুল প্রেরণ করল না, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করল না, অপরাধী ও পাপাচারীদের শাস্তি দিলো না তখন অগ্নি-উপাসকদের কাছে ধর্ম হয়ে দাঁড়াল কেবল কতিপয় আচার ও প্রথা যা তারা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত জায়গায় চর্চা করত। উপাসনালয়ের বাইরে ঘর-বাড়িতে, প্রশাসন ও বিচারালয়ে, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে, রাজনীতি ও সমাজে তারা ছিল স্বাধীন। তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা ও মনোবাসনা অনুযায়ী চলত, তাদের চিন্তা তাদের যেভাবে পরিচালিত করত অথবা তাদের হিতাহিত জ্ঞান যা নির্দেশ দিত তারা তা-ই করত। প্রতিটি যুগে প্রতিটি দেশে এটাই ছিল মুশরিকদের অবস্থা।[৪৯]

অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাদের নৈতিকতা ও চরিত্রের ভিত্তি ছিল নড়বড়ে ও ভঙ্গুর। এমনকি আত্মীয়তার পবিত্র (মাহরাম) সম্পর্কগুলোও–বিশ্বের সমস্ত মানুষই স্বভাবগতভাবে এ সম্পর্কগুলোকে পবিত্র এবং যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ককে ঘৃণ্য মনে করত–বিরোধ ও বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় ইয়াযদিগারদ[৫০], যিনি খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে সাসানীয় সম্রাট ছিলেন, নিজের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, তারপর তাকে খুনও করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সাসানীয় সম্রাট বাহরাম চুবিন[৫১] নিজের বোনকে বিয়ে করেছিলেন। ডেনমার্কের

---

[৪৮]. Shahin Makarios, *তারিখে ইরান*, পৃ. ২২১-২২৪।

[৪৯]. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৬৩-৬৪।

[৫০]. দ্বিতীয় ইয়াযদিগারদ (Yazdegerd II) : পারস্যের ষোড়শ সাসানীয় সম্রাট। রাজত্বকাল ৪৩৯ থেকে ৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। তার পূর্বসূরি সম্রাট তার পিতা পঞ্চম বাহরাম এবং তার উত্তরসূরি সম্রাট তৃতীয় হরমিযদ। বাইজান্টিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে তিনি বেশ পরিচিতি লাভ করেছিলেন।-অনুবাদক

[৫১]. বাহরাম চুবিন (Bahrām Chōbīn) : তিনি সাসানীয় সম্রাট দ্বিতীয় খসরু থেকে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং এক বছর (৫৯০-৫৯১ খ্রিষ্টাব্দ) তা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। এক বছর পর সম্রাট খসরু ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন।-অনুবাদক

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক ও ইরানের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ড. আর্থার ক্রিস্টেনসেন[৫২] বলেন, সাসানীয় যুগের সামসময়িক ইতিহাসবিদগণ—যেমন জাতহিয়াস ও অন্যরা—স্বীকার করেছেন যে, পারসিকদের মধ্যে রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়দের (যাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) বিয়ে করার প্রথা ছিল। সাসানীয় যুগের ইতিহাসে এ ধরনের বিয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পারসিকদের কাছে এ ধরনের বিবাহ অপরাধ বা পাপ বলে পরিগণিত হতো না। বরং এটা ছিল একটি পুণ্যময় কাজ, যার দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাইত। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং 'ইরানিরা বাছবিচারহীনভাবে বিয়ে করত' বলে সম্ভবত এমন বিবাহপ্রথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।[৫৩]

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে মানির[৫৪] আবির্ভাব ঘটে। তার আন্দোলন ছিল মূলত দেশে বিরাজমান যৌন অনাচার ও উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে এক স্বভাববিরুদ্ধ কঠিন প্রতিক্রিয়া। মানি এই লাগামহীন যৌনতাচর্চার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি অযৌন জীবনযাপন ও কুমারব্রত পালন করতে আহ্বান জানালেন এবং বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। তার অভিপ্রায় ছিল মানুষের বংশবিস্তার রোধ করা এবং তিনি মানবজাতির আসন্ন বিনাশ চেয়েছিলেন। সম্রাট বাহরাম ২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মানিকে হত্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ তো পৃথিবীকে বিরানভূমিতে পরিণত করার আহ্বান নিয়ে বেরিয়েছে। সুতরাং তার কোনো অভিপ্রায় সফল হওয়ার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে ফেলা উচিত।

---

৫২. ড. আর্থার ইমানুয়েল ক্রিস্টেনসেন (Arthur Christensen) : জন্ম ৯ জানুয়ারি ১৮৭৫ এবং মৃত্যু ৩১ মার্চ ১৯৪৫ খ্রি.। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরান-বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। ইরান-বিষয়ক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ। ইসলামপূর্ব ও ইসলামপরবর্তী ইরানের ইতিহাস যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে আর্থার ক্রিস্টেনসেনকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

৫৩. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, অধ্যায় : إيران والحركات الهدامة فيها. পৃ. ৫৬-৫৭; ড. আর্থার ক্রিস্টেনসেনের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। মূল গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় লিখিত। উর্দু অনুবাদ করেছেন ড. মুহাম্মাদ ইকবাল এবং আরবি অনুবাদ করেছেন ইয়াহইয়া আল-খাশশাব (দারুন-নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত)। অনুবাদক দুজন একই নাম দিয়েছেন : *ইরান ফি আহদিস সাসানিন*। আবুল হাসান আলি নদবি রহ. উর্দু অনুবাদের সহায়তা নিয়েছেন।

৫৪. মানি : মানিবাদের প্রবক্তা। জন্ম ইরানে, ২১৬ খ্রিষ্টাব্দে। ২৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার অনুসারীরা তাকে নবী মনে করে।

মানির মৃত্যু ঘটেছিল বটে, কিন্তু পারসিক সমাজে তার শিক্ষার প্রভাব ইসলামের বিজয়ধারার পরও টিকে ছিল।[৫৫]

এরপর পারসিকদের স্বভাবাত্মা মানির ধ্বংসাত্মক শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মাযদাকের[৫৬] আহ্বানে প্রবেশ করে। মাযদাকের জন্ম ৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ঘোষণা করেন যে, মানুষ সমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং তাদের উচিত সমতার সঙ্গে বসবাস করা, যাতে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকে। যেহেতু মানুষের মন নারী ও সম্পদ অধিকারে আনতে ও কুক্ষিগত করতে সবচেয়ে বেশি লালায়িত তাই মাযদাকের কাছে নারী ও সম্পদের ক্ষেত্রে সমতা ও যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আল্লামা শাহরাস্তানি[৫৭] বলেছেন,

وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال، ولما كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء وأباح الأموال، وجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ.

* মাযদাক মানুষকে পারস্পরিক বিরোধ, কলহবিবাদ ও যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছিলেন। এগুলোর বেশিরভাগ যেহেতু নারী ও সম্পদের কারণেই হয়ে থাকে, তাই তিনি নারীদের হালাল ঘোষণা করেছিলেন এবং সব ধরনের সম্পদ বৈধ ঘোষণা করেছিলেন।

---

৫৫. প্রাগুক্ত।

৫৬. মাযদাক (Mazdak) : বিখ্যাত পারসিক দার্শনিক ও জরথুস্ত্রীয় পুরোহিত। সাসানীয় সম্রাট ও প্রথম খসরুর পিতা প্রথম কুবায (Kavadh I 488-513)-এর যুগে তার আবির্ভাব ঘটে। মৃত্যু হয় সম্ভবত ৫২৪ বা ৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি কুবাযকে তার মতাদর্শের প্রতি আহ্বান করলে কুবায সাড়া দেন। পরবর্তীকালে খসরু মাযদাক তার ওপর অপবাদ দিয়েছেন বলে জানতে পারেন। ফলে তাকে ডেকে পাঠান এবং হত্যা করেন। মাযদাক নারী ও সম্পদ—এ দুটির বৈধতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

৫৭. আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল করিম ইবনে আহমাদ শাহরাস্তানি (৪৭৯-৫৪৮ হিজরি/ ১০৮৬-১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) : দার্শনিক ও আশআরি মতাদর্শের ধর্মতাত্ত্বিক। ধর্মতত্ত্ব, প্রচলিত ধর্ম ও দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الملل والنحل، نهاية الإقدام في علم الكلام، الإرشاد إلى عقائد العباد، تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام، مصارعات الفلاسفة، تاريخ الحكماء، المبدأ والمعاد، تفسير سورة يوسف، مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار في التفسير ইরানের শাহরাস্তানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। জীবনচরিত-রচয়িতা ইয়াকুত আল-হামাবি তার জ্ঞান-বিদ্যার উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন।

> পানি, আগুন ও ঘাসে যেমন মানুষের যৌথ মালিকানা রয়েছে তেমনই নারী ও সম্পদের ক্ষেত্রেও সবাইকে যৌথ অংশীদার বানিয়ে দিয়েছিলেন।[৫৮] *

মাযদাকের এই আহ্বান যুবকশ্রেণি, ধনিকশ্রেণি ও বিলাসভোগীদের জন্য অনুকূল হয়েছিল, তাদের মনোবৃত্তির সহায়ক হয়েছিল এবং রাজদরবারের সুরক্ষা লাভ করে সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েছিল। সাসানীয় সম্রাট প্রথম কুবায[৫৯] মাযদাকের আহ্বান ও তা প্রচারে সহায়তা দিয়েছিলেন, তা সংহতকরণে উদ্যমশীল হয়েছিলেন। ফলে এই আহ্বানের প্রভাবে পারস্য নৈতিক বিপর্যয় ও যৌন স্বেচ্ছাচারিতায় নিমজ্জিত হয়েছিল। ইমাম তাবারি রহ. বলেছেন,

> ইতর শ্রেণির লোকেরা এটার (মাযদাকের আহ্বান ও নীতি) সুযোগ গ্রহণ করল ও তা কাজে লাগাল। তারা মাযদাক ও তার সহচরদের ঘিরে ধরল এবং তাদের পিছু পিছু ছুটল। ফলে সাধারণ মানুষেরা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। ইতরদের শক্তি বেড়ে গেল, তারা লোকদের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের পরাস্ত করে ঘর-নারী-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে শুরু করল। কেউ তাদের বাধা দিতে পারল না। তারা সাসানীয় সম্রাট কুবাযকে এই ঘৃণ্য কাজ শোভনীয় করে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করল এবং এর বিপরীত হলে তাকে অপসারণ করা হবে বলে হুমকি দিলো। ফলে সবাই এই ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হলো, এমনকি বাবা তার সন্তানের পরিচয় জানল না এবং সন্তান তার বাবার পরিচয় জানল না। সাধারণ লোকদের সাধ্যের ভেতরে কিছু থাকল না।[৬০]

পারস্যসম্রাটগণ (কায়সারগণ) দাবি করতেন যে, তাদের ধমনিতে ঐশী রক্ত প্রবহমান এবং তাদের স্বভাবচরিত্রে রয়েছে উর্ধ্বজাগতিক পবিত্র উপাদান। পারস্যবাসীরাও তাদের এই দাবি মেনে নিয়েছিল। তাদেরকে তারা ঈশ্বর ও উপাস্যের স্থানে বসিয়েছিল। তাদের উদ্দেশে তারা প্রাণী উৎসর্গ করত। (কায়ানি পরিবারের ক্ষেত্রে) তারা বিশ্বাস করত যে, এ

---

৫৮. ইমাম শাহরাস্তানি, *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, খ. ১, পৃ. ২৪৮।
৫৯. পারস্যের সাসানীয় সম্রাট এবং প্রথম খসরুর পিতা। প্রথমবার রাজত্বকাল ৪৮৮-৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয়বার রাজত্বকাল ৪৯৮-৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ।
৬০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ১, পৃ. ৪১৯।

সকল সম্রাটই কেবল রাজমুকুট পরিধানের উপযুক্ত এবং তারাই কেবল ভূমিকর আদায় করতে পারেন। রাজ্য ও রাজ্যভান্ডারের ক্ষেত্রে এই নীতিই চলে আসছিল, উত্তরসূরি থেকে পূর্বসূরি, দাদা থেকে পিতা এই অধিকার প্রাপ্ত হতো। জালিম ছাড়া কেউ তাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়নি। নিকৃষ্ট জারজ সন্তান ছাড়া কেউ তাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করেনি। পারস্যবাসীরা রাজ্য ও রাজ-কোষাগারের ক্ষেত্রে রাজত্ব ও উত্তরাধিকারে বিশ্বাস করত। তারা এর কোনো পরিবর্তন চাইত না, এর কোনো বিকল্প তাদের কাম্য ছিল না।[৬১]

ইরানে মানুষের সামাজিক স্তরগুলোর মধ্যে বিরাট বৈষম্য ও ফাঁক থেকে গিয়েছিল। আর্থার ক্রিস্টেনসেন বলেছেন, ইরানের সমাজব্যবস্থা বংশমর্যাদা ও পেশার বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের সামাজিক স্তরগুলোর মধ্যে বিরাট খাদ ছিল, যার ওপর কোনো সেতু তৈরি করা যায়নি এবং কোনো বন্ধন তাদের সংযুক্ত করতে পারেনি।[৬২]

এমনই ছিল পারস্যসভ্যতা। জৈবিক বিলাস, যুদ্ধের জন্য শক্তি সঞ্চয় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। তারা সম্রাটদের গোটা জাতি ও সর্বস্তরের মানুষের উর্ধ্বে পবিত্র উপাস্যের স্থান দিয়েছিল।

---

৬১. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৫৯-৫৮।

৬২. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, অধ্যায় : তাফাউত বায়নাত-তাবাকাত, পৃ. ৬০; ড. আর্থার ক্রিস্টেনসেনের *ইরান ফি আহদিস সাসানিন* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

রোমান সভ্যতা

গ্রিক সভ্যতার পর রোমান সভ্যতাকে ইউরোপের সবচেয়ে বড় সভ্যতা মনে করা হয়। এই সভ্যতা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও নতুন নগরকেন্দ্রিতার সঙ্গে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে একটি হলো তাদের প্রণীত শাসনবিধি। এ শাসনবিধি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে রোমান চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। তাদের Legal status of persons (ব্যক্তির আইনগত অবস্থা)-য় আমরা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের প্রকৃতি, ব্যক্তির অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা পেয়ে যাই।

রোমানরা সভ্যতা ও অগ্রগতির সংহত পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং শক্তি ও প্রতাপের সঙ্গে সভ্য পৃথিবীকে শাসন করার ক্ষেত্রে তারা পারসিকদের অংশীদার হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের পূর্বে তা গভীর খাদে পৌঁছে গিয়েছিল। সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নৈরাজ্যের নিম্নতম স্তরে পতনোন্মুখ ছিল।

ড. আহমাদ শালবি রোমান সভ্যতার পরিস্থিতি ও অবস্থার সারসংক্ষেপ দাঁড় করিয়েছেন এবং বলেছেন, রোমানরা খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে আক্রমণ চালিয়ে ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর ৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে এবং ৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশর দখল করে নেয়। ফলে ইউরোপের ও প্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতাঞ্চলগুলো রোমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়। এই অঞ্চলগুলো রোমান শাসনাধীন থেকে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়, উদ্ভাবন ও চিন্তার শক্তি পর্যুদস্ত হয়। রোমানদের অত্যাচার ও জুলুমের জোয়ালের নিচে উৎকর্ষের অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য তাদের আধিপত্যাধীন এলাকাগুলোতে সভ্যতার মশাল বহন করে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ রোম কোনো কালেই চিন্তার কোনো কেন্দ্রভূমি ছিল না, যেমন প্রাচীন মিশরের কেন্দ্র ছিল আইনে শামস, বা গ্রিক সভ্যতার উত্থানের সময় কেন্দ্র

ছিল এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়া। এ কারণে সভ্যতার উদ্যম ও বিকাশ থেমে গিয়েছিল।[৬৩]

হযরত ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পরও সম্রাট কনস্টান্টাইনের (২৭২-৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনকাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল রোমানদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে পৌত্তলিকতা থেকে গিয়েছিল। সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩০৬ থেকে ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। এই সম্রাট কিছু নীতি ও কার্যাবলি গ্রহণ করেছিলেন যার দ্বারা মাসিহি ধর্মের (খ্রিষ্টধর্মের) কোমর মজবুত হয়েছিল। এরপর খ্রিষ্টধর্মের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল। সম্রাট কনস্টান্টাইন তখন মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু তিনি খ্রিষ্টধর্মের জন্য যা-কিছু করেছেন সেটাকে গির্জার কর্ণধারেরা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট মনে করেনি। তারা এই সম্রাটের নামে Donation of Constantine নাম দিয়ে একটি দলিল তৈরি করে। এই দলিল ঘোষণা করে যে, সম্রাট পোপকে পোপতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রভূত পার্থিব ক্ষমতা দিয়েছেন। এই পোপতন্ত্র ছিল মূলত পোপদেরই তৈরি। সমালোচকগণ সমালোচনার সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে এই দলিলের অসারতা প্রমাণ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপারে কনস্টান্টাইনের অবস্থান ধর্মগুরুদের অধিকতর কর্তৃত্বপরায়ণ হতে প্রলুব্ধ করেছিল। যা ধর্মের বিষয়াবলি অতিক্রম করে গিয়ে পার্থিব বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে গির্জার কর্ণধারেরা সফল হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে মিলানের বিশপ সম্রাট থিওডোসিয়াস (Theodosius I)-এর কতিপয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং অবশেষে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস মৃত্যুবরণ করেন।[৬৪]

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের শুরু থেকে গির্জা কর্তৃপক্ষ রোমান সাম্রাজ্যে বহুবিধ বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে, প্রধানত চিন্তাগত বিভিন্ন ধারায়। এ সকল চিন্তাধারার শেকড় ও ভিত্তি ছিল মিশরীয় অথবা ফিনিসীয়। এসব চিন্তাধারা ও শিক্ষাধারার ক্ষেত্রে গির্জার অবস্থান কী ছিল? নিম্নলিখিত কয়েকটি বিবেচনায় তাদের অবস্থান নির্ণয় করা যায় :

---

৬৩. আহমাদ শালবি, মাওসুআতুত তারিখিল ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫৬।
৬৪. আহমাদ শালবি, মাওসুআতুত তারিখিল ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫৬-৫৭।

ক) দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তার সব পবিত্র গ্রন্থের (বাইবেলের) দুই মলাটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থই সমস্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার ভিত্তি এবং কেবল গির্জার ধর্মগুরুরাই এ গ্রন্থের বাণীসমূহ ব্যাখ্যার অধিকার রাখেন। শুধু তাই নয়, জনমণ্ডলীকেও এই ব্যাখ্যা কোনো ধরনের চিন্তা ও বোঝাপড়া ব্যতীত মেনে নিতে হবে।

খ. উল্লিখিত বক্তব্য অনুসারে লোকদের প্রধান বিশ্বাস ছিল এই যে, পবিত্র কিতাব (বাইবেল) ব্যতীত সবকিছু সম্পূর্ণরূপে বাতিল। সুতরাং ভিন্নকিছুর সমর্থন ও পঠনপাঠন বৈধ নয়।

গ. গির্জার ধর্মগুরুরা এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি ও তাঁর আইন বাস্তবায়নকারী। সুতরাং যারা তাদের চিন্তাধারার বিরোধিতা করবে তাদের শাস্তি প্রদান এবং যারা তাদের আনুগত্য করবে তাদের পুরস্কার প্রদানের অধিকার গির্জার ধর্মগুরুদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআলার মানুষের ক্ষেত্রে এই দুটি কাজ সম্পূর্ণরূপে করে থাকেন।

ঘ. খ্রিষ্টধর্ম মাসিহ আলাইহি সালাম কর্তৃক আনীত মুজিযা ও অলৌকিক বিষয়াবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই মুজিযা ও অলৌকিক বিষয়াবলি প্রাকৃতিক নিয়মনীতি ও জ্ঞানগত মৌলিকতার বিপরীত ও বিরোধী হয়ে থাকে। আর খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা যেহেতু মুজিযা ও অলৌকিক বিষয়াবলি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করত, সেহেতু তারা এর পক্ষ নিয়ে জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কেননা, জ্ঞান অলৌকিকতার বিপরীত বিষয়।

ঙ. খ্রিষ্টধর্মের দলিলগুলো ছিল দেহ, সম্পদ ও ভোগসামগ্রীর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন দুনিয়াবিমুখতা এবং আসমানি রাজ্যের প্রতীক্ষার পক্ষে, আর প্রাচ্যে বিকশিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানরাশি ছিল পার্থিব জগতের সেবায় নিবেদিত, তাই খ্রিষ্টীয় ধর্মগুরুদের চিন্তাধারা এ সকল জ্ঞানের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৬৫]

এ কারণে গির্জা বহুবিধ জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, যেভাবে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া গির্জা কর্তৃপক্ষ কতিপয় চিন্তাধারাকে পবিত্র গ্রন্থের লাগাম পরিয়ে দেয় এবং সেগুলোকে

---

৬৫. আহমাদ শালবি, *মাওসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়া*, খ. ১, পৃ. ৫৭-৫৮।

নিজেরা কুক্ষিগত করে নেয়। তারা অসংখ্য চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার বিরোধী ছিল। তাই গির্জা এসব জ্ঞানধারার কিছু গ্রন্থকে পুড়িয়ে ফেলে এবং অবশিষ্ট গ্রন্থরাশিকে মাটির গর্ভে সমাধিস্থ করে। ফলে কেউ তার খোঁজ পায়নি, সবই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[৬৬]

গির্জা দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজনীতি চালায়। যখন স্বাধীনতার যুগ শুরু হলো এবং গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা ও জব্দ করার বিষয়টি তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল, তখন তারা কিছু সিদ্ধান্ত প্রকাশ করল, যা খ্রিষ্টানদের জন্য ওইসব গ্রন্থপাঠ নিষিদ্ধ করে, যে গ্রন্থগুলো ছিল তাদের ধর্মবিরোধী, ধর্মের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং গির্জার গুমোর ফাঁসকারী। পৃথিবী ঘুরছে এই মত যারা ব্যক্ত করেছিল তারা তাদেরকেও একইভাবে 'ধর্মচ্যুত' ঘোষণা করে। এভাবেই খ্রিষ্টধর্মের কর্ণধারেরা পৃথিবীতে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বিশাল সভ্যতার যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা ধ্বংস করে দেয়। অধিকন্তু এ সকল লোক ধর্মকে পুঁজিরূপে খাটায় এবং ধর্মের বিকৃতি সাধন করে। ধর্মকে আলোকবর্তিকা বানানোর বদলে তারা এটিকে মূর্খতা ও অন্ধকারের অবলম্বন বানিয়ে ফেলে।[৬৭]

অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের পার্শ্বিক বিষয়াবলিতে, এমনকি মৌলিক বিষয়সমূহে কূটতর্ক, গভীর বিবাদবিসংবাদের ঝড় শুরু হয়েছিল। তা জাতির চিন্তাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল, জাতির সন্তানদের বুদ্ধি-বিবেচনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল এবং তার জ্ঞানগত শক্তিকে গিলে ফেলেছিল। এসব বিষয় অনেক সময় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, হত্যা, বিনাশ, উৎপীড়ন, আক্রমণ, লুণ্ঠন ও গুপ্তহত্যার রূপ নিয়েছিল। শিক্ষালয়, উপাসনালয়, বাড়িঘর সবকিছু ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমরশিবিরে পরিণত হয়েছিল। গোটা দেশ গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই ধর্মীয় বিরোধের ভয়াবহ প্রকাশ ঘটেছিল সিরিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টানগোষ্ঠী এবং মিশরের খ্রিষ্টানগোষ্ঠীর মধ্যে। আরও সূক্ষ্মভাবে বললে এটি ছিল মুলকানিয়্যা (Melkite/রাজধর্ম) ও মানুফিসিয়্যা (Manichaeism/মানিবাদ) ধর্মাদর্শের বিরোধ। মুলকানিয়্যার মূলনীতি ছিল যিশুখ্রিষ্টের মানবিক সত্তা ও ঐশ্বরিক সত্তার

---

৬৬. ইবনে নুবাতা আল-মিসরি, সারহুল উয়ুন ফি শরহি রিসালাত ইবনে যায়দুন, পৃ. ৩৬; ইবনে নাদিম, আল-ফিহরিসত, পৃ. ৩৩৩।

৬৭. আহমাদ শালবি, মাওসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫৭-৬০।

মিলনে (দ্বৈতসত্তায়) বিশ্বাসস্থাপন এবং মানিবাদীরা বিশ্বাস করত যে, যিশুখ্রিষ্টের একটিমাত্র সত্তা রয়েছে, তা হলো ঐশ্বরিক সত্তা, তার ঐশ্বরিক সত্তায় তার মানবিক সত্তা বিলীন হয়ে গেছে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে এই গোষ্ঠী দুটির বিরোধ ও সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এমনকি তা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দুটি ভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুমুল লড়াই অথবা ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যকার বিবাদ। যেখানে ইহুদিদের দাবি নাসারারা কোনো ধর্মের ওপর নেই এবং নাসারাদের দাবি ইহুদিরা কোনো ধর্মের ওপর নেই।[৬৮]

সামাজিক দিক বিবেচনা করতে গেলে রোমান সমাজ দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল, অভিজাত শ্রেণি ও দাস শ্রেণি। যাবতীয় অধিকার ছিল অভিজাত শ্রেণির জন্য। আর দাস শ্রেণির জন্য কোনো ধরনের নাগরিক অধিকার ছিল না। সত্য এই যে, রোমান আইনকানুন দাস শ্রেণির ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি' শব্দটি প্রয়োগ করতে দ্বিধান্বিত ছিল। অবশেষে তার 'ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি' নামকরণ করে এই জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসে। রোমান অভিজাত শ্রেণির লোকেরা দাসদেরকে 'পণ্য' গণ্য করত। তাই তাদের মালিকানার অধিকার ছিল না, তারা কারও উত্তরাধিকারী হতে পারত না, তাদেরও কেউ উত্তরাধিকারী হতো না, তারা বৈধভাবে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত না। তাদের সব সন্তানসন্ততিকে অবৈধ সন্তান বলে গণ্য করা হতো। একইভাবে তারা দাসীদের সন্তানদেরকে দাস বিবেচনা করত, তাদের পিতা স্বাধীন ও অভিজাত শ্রেণির হলেও। অভিজাত শ্রেণির লোকদের জন্য আইনগত বন্দোবস্ত বা ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেই দাস ও দাসীদের সঙ্গে গর্হিত কাজ করার অধিকার ছিল। অন্যদিকে দাসদের জন্য জুলুম ও নির্যাতনের বিচার চাওয়ার অধিকার বা শক্তি ছিল না। দাসদের নির্যাতন করা হলে নির্যাতককে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য অধিকার প্রদানের বিষয়টি ছিল মনিবের হাতে। উপরন্তু মনিবই দাসদের প্রহার করত, বন্দি করে রাখত, বনেজঙ্গলে হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিত, ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করত, কোনো অজুহাতে বা অজুহাত ছাড়াই তাদের হত্যা করত। দাসদের মালিকদের পক্ষ থেকে গৃহীত সাধারণ মতামতের বাইরে দাস শ্রেণির তত্ত্বাবধানের জন্য আর কোনো ব্যবস্থা ছিল

---

৬৮. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৪৩।

না। কোনো দাস পালিয়ে যাওয়ার পর তাকে আটক করতে পারলে মনিবের অধিকার ছিল ওই দাসকে আগুনে ঝলসানোর অথবা শূলবিদ্ধ করে হত্যা করার। সম্রাট অগাস্টাস গর্ববোধ করতেন যে তিনি ত্রিশ হাজার পলাতক দাসকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছিলেন এবং দাবি করার মতো মালিক না পেয়ে তাদের শূলবিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন। উল্লিখিত নির্যাতনের ভয়ে বা অন্যকোনো কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত কোনো দাস যদি তার মনিবকে হত্যা করত তবে রোমান আইন ওই মনিবের সকল দাসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দিত। ৬১ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সিনেটর পেডানিয়াস সেকানদাস (Lucius Pedanius Secundus) তার এক দাস কর্তৃক নিহত হন। এ ঘটনার পর রোমান সিনেটররা রোমান আইন অনুযায়ী তার সকল দাসের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন। ফলে তার চারশ দাসকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক সিনেটর এই নির্দেশের বিরোধিতা করেছিলেন এবং একটি বিক্ষুব্ধ দল রাস্তায় নেমে ক্ষমা ঘোষণার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সিনেটর সভা এই আইন বাস্তবায়নে জোরজবরদস্তি করে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এমন নির্মম সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে মনিবরা তাদের দাসদের ব্যাপারে নিরাপত্তা বোধ করবেন না।[৬৯]

শুধু এটাই নয়, রোমান আইন মনিবকে এ অধিকার দিয়েছিল যে, সে তার দাসকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে অথবা জীবনদান করতে পারবে। ওই যুগে দাসের সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে, রোমান রাজ্যগুলোতে দাসের সংখ্যা স্বাধীন মানুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি ছিল।[৭০]

রোমান সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। ওই যুগের নারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, নারী ছিল আত্মাহীন কাঠামো। এ কারণে নারীর পরকালীন জীবন বলতে কিছু নেই। নারী ছিল অপবিত্র। তাই তাদের গোশত খাওয়ার অধিকার ছিল না, হাসারও অধিকার ছিল না। এমনকি

---

৬৯. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১০, পৃ. ৩৭০-৩৭১।
৭০. আহমাদ আমিন, *ফাজরুল ইসলাম*, পৃ. ৮৮।

কথা বলার অধিকারও ছিল না। তারা নারীর মুখে লোহার তালা লাগিয়ে দিয়েছিল।[৭১]

আমরা যা-কিছু উল্লেখ করেছি তার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। রোমান সভ্যতার নক্ষত্র অস্তমিত হতে শুরু করেছিল। মানবিক গুণাবলির ভিত্তিসমূহ ধসে গিয়েছিল। চরিত্র ও নৈতিকতার অবলম্বনগুলো ধ্বংস হয়ে পড়েছিল। এডওয়ার্ড গিবন তার লেখায় এসব বিষয় চিত্রায়িত করেছেন এবং বলেছেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে রোমান সাম্রাজ্য তার বিনাশ ও অধঃপতনের শেষ ধাপে পৌঁছে গিয়েছিল।[৭২]

---

৭১. আহমাদ শালবি, *মুকারানাতুল আদইয়ান*, খ. ২, পৃ. ১৮৮; আফিফ তাইয়ারাহ, *আদ-দীনুল ইসলামি*, পৃ. ২৭১।

৭২. এডওয়ার্ড গিবন, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, খ. ৫, পৃ. ৩৩, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৪৬।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ইসলামপূর্ব আরব

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব যে অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব ও ভিন্নতা স্বীকার করে নিয়েও আরবের ইসলামপূর্ব যুগ 'জাহিলিয়্যা' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তাই ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাসকে 'আত-তারিখুল জাহিলি' বা 'তারিখুল জাহিলিয়্যা' (অজ্ঞতার যুগের ইতিহাস/অন্ধকার যুগের ইতিহাস) বলা হয়। 'জাহিলিয়্যা' শব্দটি অন্ধকার ও অজ্ঞতা বোঝানোর পাশাপাশি যাযাবর জীবন ও পশ্চাৎপদতাও বোঝায়। যেমন আরবরা সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের চারপাশের মানুষদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। তাদের অধিকাংশই মূর্খতা ও উদাসীনতায় নিমজ্জিত গোত্রসমূহের জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বহির্বিশ্বেরও তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ ছিল না। তারা ছিল নিরক্ষর মূর্তিপূজারি, তাদের জ্ঞানগত পূর্ণতার কোনো ইতিহাস নেই।[৭৩]

জাহিলি যুগে বিশ্বের সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর তুলনায় আরবরা ছিল কিছু অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবগত যোগ্যতার অধিকারী। যেমন ভাষানৈপুণ্য ও বাগ্মিতা, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার প্রতি অনুরাগ, সাহসিকতা ও বীরত্ব, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, স্পষ্ট ভাষণ, অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি, সমতাপ্রেম ও ইচ্ছাশক্তি, প্রতিশ্রুতিপূরণ ও আমানত রক্ষা। কিন্তু নবুয়ত ও নবীগণের শিক্ষা থেকে তাদের কালগত দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এক আরব উপদ্বীপে আবদ্ধ ছিল এবং বাপদাদাদের ধর্ম ও জাতীয় আচার-সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ছিল। এসব কারণে শেষদিকে (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে) তারা ভীষণ ধর্মীয় অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল এবং চরম পর্যায়ের পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সামসময়িক

---

৭৩. জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৩৭।

কোনো জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যার দৃষ্টান্ত পাওয়া ছিল ভার। তা ছাড়া তারা নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে তারা নৈতিকভাবে চরম অধঃপতিত হয়ে পড়েছিল, তাদের সমাজ হয়ে পড়েছিল নষ্ট-ভ্রষ্ট, তাদের অবকাঠামো ছিল ভঙ্গুর ও পতনোন্মুখ। কারণ জাহিলি জীবনের নিকৃষ্ট দোষ-ব্যাধি তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছিল এবং তারা আসমানি ধর্মসমূহের গুণাবলি ও সৌন্দর্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।[৭৪]

ধর্মীয় দিক বিবেচনা করতে গেলে, গোটা আরব উপদ্বীপে প্রতিমাপূজা ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি প্রতিটি গোত্রে, তারপর প্রতিটি বাড়িতে প্রতিমা স্থান পেয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি আবু রাজা আল-উতারিদি রা. বর্ণনা করেন,

«كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ»

(ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা) পাথরের পূজা করতাম। যখন এটি অপেক্ষা অন্য একটি ভালো পাথর পেয়ে যেতাম তখন এটিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অন্যটি গ্রহণ করতাম (অন্যটির পূজা শুরু করতাম)। যখন কোনো পাথর পেতাম না, কিছু মাটি একত্র করে স্তূপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি ছাগী নিয়ে আসতাম এবং ওই স্তূপের ওপর ছাগীটিকে দোহন করতাম। (যাতে তা কৃত্রিম পাথরের মতো দেখায়।) তারপর স্তূপটির চারপাশে তাওয়াফ করতাম।[৭৫]

প্রতিমা ছাড়াও আরবদের আরও দেবতা ছিল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ফেরেশতা, জিন ও নক্ষত্র। তারা বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার কন্যা। তাই তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ফেরেশতাদের সুপারিশকারীরূপে গ্রহণ করে। এমনকি প্রার্থনা কবুলের মাধ্যম হিসেবেও ফেরেশতাদের গ্রহণ করে। একইভাবে তারা জিনদেরকেও আল্লাহর

---

৭৪. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৭৬-৭৭।

৭৫. *বুখারি*, হাদিস নং ৪১১৭।

তাআলার শরিক বানিয়ে তাদের অলৌকিক শক্তি ও প্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের পূজা করতে শুরু করে।[৭৬]

আরও একটি কারণ এই যে, ইহুদিরা তখন গোটা আরবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ইহুদিধর্মের নেতারা আল্লাহ তাআলাকে ব্যতিরেকে নিজেরাই প্রভুর আসনে সমাসীন হয়েছিল। তারা জনমণ্ডলীর ওপর খড়্গ ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং তাদের কাছে এমনকি মনের চিন্তা ও ঠোঁটের ফিসফিসানির জন্যও মানুষকে জবাবদিহি করতে হতো। তারা তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের পেছনে নিয়োজিত করেছিল। যদিও এতে ধর্মের বিনাশ ঘটেছিল এবং ধর্মহীনতা, অবিশ্বাস ও কুফরি ছড়িয়ে পড়েছিল।

অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্ম এক ভীষণ দুর্বোধ্য পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তা (ত্রিত্ববাদের ধারণার ফলে) আল্লাহ তাআলা ও মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। আরবের খ্রিষ্টধর্ম অনুসারীদের অন্তরে এই ধর্মের কোনোরূপ সত্যিকার প্রভাব ছিল না।[৭৭]

নৈতিক ও চারিত্রিক দিক বিবেচনায় তারা চরম অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকার হয়েছিল। মদ্যপান মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সমাজের গভীরতায় তার কঠিন শেকড় বিস্তার করেছিল। এ কারণে তখনকার কাব্যকলা, ইতিহাস ও সাহিত্যের একটি বিরাট অংশই ছিল মদের দখলে। একইভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জুয়া তার থাবা ছড়িয়ে দিয়েছিল। কাতাদা[৭৮] বলেন, জাহিলি যুগে মানুষ তার স্ত্রী ও সম্পদের ওপরও জুয়া খেলত, বাজি ধরত। তারপর রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে বেদনার্ত চোখে দেখত যে, তার স্ত্রী ও সম্পদ অন্যের হাতে চলে গেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে ভয়াবহ শত্রুতা ও কলহবিবাদ শুরু হতো।[৭৯]

---

৭৬. আবুল মুনযির হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব আল-কালবি, *কিতাবুল আসনাম*, পৃ. ৪৪।

৭৭. সফিউদ্দিন মুবারকপুরি, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃ. ৪৭।

৭৮. কাতাদা আস-সাদুদি (৬০-১১৭/১১৮ হিজরি) : বিশিষ্ট তাবেয়ি ও উঁচুস্তরের আলেম। আবু উবাইদা বলেন, প্রতিদিন বনু উমাইয়া এলাকা থেকে কোনো-না-কোনো ব্যক্তি কাতাদা আস-সাদুসির দরজায় কড়া নাড়তেন এবং তার কাছে হাদিস, বংশধারা বা কবিতা জানতে চাইতেন। তিনি ইরাকের ওয়াসিত জেলায় মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, ৪/৮৫-৮৬; যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১২২-১২৩।

৭৯. তাবারি, *জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন*, খ. ১০, পৃ. ৫৭৩; আযিমাবাদি, *আওনুল মাবুদ*, খ. ১০, পৃ. ৭৯।

একইভাবে আরবদের ও ইহুদিদের মধ্যে সুদি কারবার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সুদি কারবারের শেকড় অনেকদূর পর্যন্ত প্রোথিত ছিল। এমনকি তারা বলেছিল, বেচাকেনা তো সুদের মতোই। একইভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছিল। ব্যভিচার একটি প্রচলিত প্রথার রূপ ধারণ করেছিল। পুরুষ ইচ্ছে করলেই কয়েকজন উপপত্নী বা রক্ষিতা গ্রহণ করতে পারত, নারীরাও মনে ধরলে কয়েকজন উপপতি বা প্রণয়সঙ্গী গ্রহণ করতে পারত। এতে কোনো বৈধ বন্ধন বা চুক্তির প্রয়োজন হতো না। ওই যুগে কী ধরনের বিবাহ প্রচলিত ছিল তার প্রকারভেদ উল্লেখ করে সাইয়িদা আয়িশা রা. বলেন,

«إِنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ»

জাহিলি যুগে চার প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রকার : বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর অভিভাবকের কাছে তার অধীনে থাকা নারী অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দেবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে। দ্বিতীয় প্রকার : কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার মাসিক (ঋতুস্রাব) থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করো। এরপর স্বামী তার এই স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনো স্ত্রীসহবাস করত না, যতক্ষণ না তার এই স্ত্রী যে লোকটার সঙ্গে যৌনসঙ্গমে মিলিত হচ্ছে তার দ্বারা গর্ভবতী হতো। যখন তার গর্ভ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হতো তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার এই স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। স্বামী উন্নত ধরনের সন্তান প্রজননের আশায় এই কাজ করত। এ ধরনের বিবাহকে 'নিকাহুল ইসতিবদা' বলা হতো। তৃতীয় প্রকার বিবাহ : দশজনের কম সংখ্যক ব্যক্তি একত্র হয়ে পালাক্রমে একই নারীর সাথে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতো। যদি নারীটি গর্ভবতী হতো, তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছুদিন অতিবাহিত হতো, সেই নারী তার সঙ্গে সঙ্গমকারী সব পুরুষকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। তারা সবাই নারীটির সামনে সমবেত হওয়ার পর সে তাদেরকে বলত, তোমরা সকলেই জানো তোমরা কী করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং হে অমুক! এটা তোমারই সন্তান। ওই নারী যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন ওই পুরুষ নবজাতক শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং সে তা অস্বীকার করতে পারত না। চতুর্থ প্রকারের বিবাহ : বহু পুরুষ একজনমাত্র নারীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতো এবং ওই নারী তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে রমণসঙ্গী করতে অস্বীকার করত না। তারা ছিল বারবনিতা। বারবনিতারা তাদের চিহ্নরূপে নিজ নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছা করলে অবাধে তাদের সঙ্গে যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হতে পারত। যদি এসব নারীর মধ্যে কেউ গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌনসঙ্গমকারী সকল পুরুষ সমবেত হতো

> এবং 'কায়িফ'[৮০]-কে ডেকে আনত। এ সকল ব্যক্তি সন্তানটির সঙ্গে যে লোকটির সাদৃশ্য পেত তাকে বলত, এটি তোমার সন্তান। তখন ওই পুরুষটি নবজাতক সন্তানকে নিজের নয় বলে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না।[৮১]

নারীদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সারমর্মরূপে যে কথা বলেছেন সেটা উল্লেখ করাই সমীচীন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা জাহিলি যুগে নারীদের কোনোকিছুরূপে গণ্য করতাম না। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে যা নাযিল করলেন তা তো সবার সামনেই রয়েছে।'[৮২]

নারীদের কোনো উত্তরাধিকার ছিল না। উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরবরা বলত, আমাদের মধ্যে যারা তরবারি ধারণ করতে পারে এবং সম্পদ ও ভূখণ্ড রক্ষা করতে পারে তারাই কেবল উত্তরাধিকার পাবে। তাই কোনো লোক মারা গেলে তার পুত্রসন্তান উত্তরাধিকার পেত। পুত্রসন্তান না থাকলে তার নিকটাত্মীয় অভিভাবক তা পেত। পিতা বা ভাই বা চাচা, যে-ই হোক না কেন। আর মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও কন্যাদেরকে যে লোকটি উত্তরাধিকার পেয়েছে তার স্ত্রী ও কন্যাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হতো। তারা যা পেত, এরাও তা-ই পেত; তাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তাত এদের ওপরও একই দায়িত্ব বর্তাত। নারীর জন্য তার স্বামীর ওপর আদতেই কোনোরূপ অধিকার ছিল না। তালাকের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। পুরুষরা ইচ্ছামতো যে-কয়জন খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত, নির্ধারিত কোনো সংখ্যা ছিল না। আরবদের একটি জঘন্য প্রথা ছিল এমন, কোনো লোক তার স্ত্রী এবং এই স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীদের সন্তান রেখে মারা গেলে তার বড় পুত্রসন্তান তার পিতার স্ত্রীর ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার

---

৮০. যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সন্তানের গোপন চিহ্ন দেখে তার পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারতেন। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খ. ৯, পৃ. ১৮৫।

৮১. *বুখারি*, কিতাব : বিবাহ, বাব : মান কালা লা নিকাহা ইল্লা বি-ওয়ালিয়্যিন, হাদিস নং ৪৮৩৪; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২২৭২।

৮২. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাফসির, বাব : তাফসিরু সুরাতিত তালাক, হাদিস নং ৪৬২৯; *মুসলিম*, কিতাব : তালাক, বাব : ইলা ও ইতিযালুন নিসা ওয়া তাখইরিহিন্না, হাদিস নং ১৪৭৯।

পেত। সে তার পিতার অন্যান্য সম্পদের মতো স্ত্রীকেও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ মনে করত।[৮৩]

মেয়েদের প্রতি আরবদের ঘৃণা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তারা মেয়েদের জীবন্ত পুঁতে ফেলতে শুরু করল। মেয়েদের পুঁতে ফেলা ছিল জাহিলি যুগের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রথা। আরবের কোনো কন্যাসন্তান যদি মাটির গর্ভে প্রোথিত হওয়া থেকে কোনোক্রমে বেঁচে যেত, তবে তাকে এক অন্ধকারপূর্ণ দুর্বিষহ জীবনের অপেক্ষায় থাকতে হতো। আল-কুরআনুল কারিম এই অবস্থাকে বর্ণনা করেছে এভাবে,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপনে চলে যায়। সে চিন্তা করে, হীনতাসত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা অতি নিকৃষ্ট![৮৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জাযিরাতুল আরবের পরিস্থিতি এমনই ছিল।

---

৮৩. ড. মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম, *আল-মারআতু বায়না তাকরিমিল ইসলাম ওয়া ইহানাতুল জাহিলিয়্যা*, পৃ. ৫৭।

৮৪. সুরা নাহল : আয়াত ৫৮-৫৯।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

একনজরে ইসলামপূর্ব বিশ্ব

আমরা ইসলামপূর্ব বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছি। এখন আমরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে বিশ্ব, মানবমণ্ডলী ও মানবতার কী অবস্থা ছিল তার প্রতি সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করব। তার থেকে যে সারমর্ম আমরা পাই তা এই যে, স্তূপীকৃত গভীর অমানিশা চূর্ণবিচূর্ণ করার এবং মানবতার স্কন্ধমূলে আটকে পড়া যন্ত্রণা-দুর্দশাকে দূরীভূত করার জন্য ইসলামের আলো ও ইসলামি সভ্যতার প্রয়োজন প্রকট ছিল।

ইসলামপূর্ব বিশ্বের মোটামুটি অবস্থার প্রতি সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস উদ্ধৃত করছি। ইয়ায ইবনে হিমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

> আল্লাহ তাআলা জমিনের মানবমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তখন (তাদের চরম পথভ্রষ্টতার কারণে) কতিপয় আহলে কিতাব ব্যতীত আরব ও অনারব সকলের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।[৮৫]

মানুষের অবস্থা অধঃপতনের এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার ঘৃণা ও ক্রোধকে আবশ্যক করে তুলেছিল। হাদিসে ব্যবহৃত (مقت) 'মাক্ত' শব্দটি প্রচণ্ড ঘৃণা বোঝায়। কতিপয় আহলে কিতাবের কথা বলতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক (بقايا) 'বাকায়া' শব্দের ব্যবহার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত

---

৮৫. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জান্নাহ ওয়া সিফাতু নাইমিহা ওয়া আহলিহা, হাদিস নং ২৮৬৫।

করে। যেন তারা বহু প্রাচীন যুগের নিদর্শন, বাস্তবিক মানবমণ্ডলীর মধ্যে তাদের কোনো মূল্য নেই। অন্যদিকে এই কতিপয় আহলে কিতাব কখনোই পরিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে পারেননি, বরং তারা সমাজের মুষ্টিমেয় সদস্য বলেই গণ্য ছিলেন।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর বুকে না ছিল কোনো বোধসম্পন্ন বিবেকবান জাতি, না ছিল নীতিনৈতিকতা ও মর্যাদাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো সমাজ। দয়া ও ইনসাফের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো শাসনব্যবস্থা ছিল না, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান শাসকও ছিল না, নেতাও ছিল না। আর নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) আনীত বিশুদ্ধ ধর্ম একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল।[৮৬]

গোটা মানববিশ্বে পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল নষ্ট-ভ্রষ্ট, অধঃপতিত, বিনাশ-কবলিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়–জীবনের সব দিকে, সব ক্ষেত্রে সমানভাবে ফ্যাসাদ ও গোলযোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। দুনিয়াকে গ্রাস করেছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, মূর্খতা ও অজ্ঞতা দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল, যা দুনিয়াকে কুসংস্কার, অলিক ধ্যানধারণার সংঘর্ষপূর্ণ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিল। মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও রিপুই ছিল দুনিয়ার পরিচালক। তাই মানুষ পাথরের, সূর্যের, চন্দ্রের, আগুনের, এমনকি পশুর পূজা করত। গোটা মানবগোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দুইভাগে, শাসক শ্রেণি ও দাস শ্রেণি। তারা এতিম ও অসহায়দের সম্পদ আত্মসাৎ করত, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করত। তাদের পারস্পরিক লেনদেনই ছিল হানাহানি, লুণ্ঠন, ছিনতাই, রাহাজানি। শুধু তাই নয়, অপরাধ, পাপাচার ও গর্হিত কাজ করে তারা গৌরববোধ করত। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার মতো নিয়মনীতি বা আইন ছিল না, ছিল কেবল মাৎস্যন্যায়, পাশবিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং জোর যার মুল্লুক তার নীতি। শক্তিমানরা দুর্বলদের শোষণ ও উৎপীড়ন করত, ধনীরা গরিবদের দাস

---

৮৬. সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ., *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৯১।

বানিয়ে রাখত। সবাই বন্দি ছিল দুর্ভেদ্য অন্ধকারে, যার কোনো শেষ ছিল না, যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ ছিল না।

এসব পরিস্থিতি মানবমণ্ডলীকে উদ্‌ভ্রান্ত, হতাশ, রিক্ত-নিঃস্ব বানিয়ে দিয়েছিল। তাদের অন্তরে ভীতি ও আশঙ্কা ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের জ্ঞান ও চিন্তায় ছিল কেবল শূন্যতা, অলিক জল্পনাকল্পনা। ইসলামি সভ্যতার পূর্বে এটাই ছিল বিশ্বের মানবমণ্ডলীর অবস্থা!

ইসলামপূর্ব বিশ্বে এটাই ছিল অবস্থা, বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। বিশ্বসভ্যতাগুলো গুটিয়ে গিয়েছিল। সবকিছু ছিল অরাজকতার ধসোন্মুখ কিনারায়।

অধ্যাপক ডেনিসন এই অবস্থার চিত্রায়ণ করেছেন এভাবে,

> খ্রিষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সভ্য পৃথিবী ছিল অরাজকতার ধসোন্মুখ কিনারায়, কারণ যেসব বিশ্বাস সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়ক ছিল সেগুলোর বিনাশ ঘটে। এসব বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো উপযোগী কিছুই ছিল না। চারহাজার বছরের চেষ্টার ফলে যে বৃহৎ নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়ার উপক্রম ছিল। মানবতা যে বর্বরতা ও অসভ্যতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যেতে চাইছিল। গোত্রগুলো পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করছিল, রক্তপাত ঘটাচ্ছিল। কোনো আইন ছিল না, কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। খ্রিষ্টীয় মতবাদের ফলে যেসব শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল সেগুলো ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বদলে বিচ্ছিন্নতা ও ভাঙনের আগুনে ঘি ঢালছিল। ফলে যে সভ্যতা বিপুল ডালপালাসমৃদ্ধ বিশাল বৃক্ষের মতো ছিল, যার ছায়া ছড়িয়ে ছিল গোটা বিশ্বের ওপর তা শীর্ণকায় হয়ে হেলছিল। এতে তার দিকে ধেয়ে আসে ধ্বংস, এমনকি তার মজ্জাটুকুও শেষ হয়ে যায়।[৮৭]

ইসলামি সভ্যতার উষার উন্মেষ ও আলো ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত এরূপ অবস্থাই বিরাজমান ছিল। ইসলামি সভ্যতা মানবতার একটি উপহার, মনুষ্যকুলের জন্য পথনির্দেশনা।

---

৮৭. জন হপকিন্স ডেনিসন, *Emotion as the Basis of Civilization*; আহমাদ শালবি, *মাওসুআতুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, খ. ৬, পৃ. ৩৬-৩৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার মূলনীতি ও ভিত্তি

ইসলামের আবির্ভাব ছিল একটি আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তা দূরীভূত করেছিল মুমূর্ষু পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করা রাতের তিমির এবং নতুন পৃথিবীর সূচনা। তা ছিল ইসলামি সভ্যতার পৃথিবী। এভাবেই শুরু হয়েছিল ইসলামের সূচনার দিনগুলো, যা গোটা পৃথিবীর জন্য আলোকিত করে তুলছিল জীবনের মাইলফলক। পরিবর্তন করছিল চিন্তা, রাজনীতি, আইন ও শাসন, সমাজ ও অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ। এই সভ্যতা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এবং বিকাশ ও উৎকর্ষে ইসলামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ।

এটি কতিপয় অনন্য মূলনীতি থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কতিপয় মৌলিক ভিত্তির ওপর, পরিপুষ্ট হয়েছে সমৃদ্ধ উৎসসমূহের সহায়তায়। এর প্রত্যেকটিরই এই সভ্যতার বিকাশ, অনন্যতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। অন্যান্য জাতির সভ্যতা থেকে ইসলামি সভ্যতাকে উপাদানের দিক থেকে ভিন্ন, স্পষ্ট বিপরীতধর্মী করে তোলার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রভাব রয়েছে। গুস্তাভ লি বোঁ[৮৮] এই বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

> আরবজাতি দ্রুততম সময়ে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। পূর্বে যত সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল সেগুলোর সঙ্গে এই সভ্যতার অনেক বিপরীতধর্মিতা রয়েছে।[৮৯]

---

৮৮. গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon 1841-1931) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো : *The World of Islamic Civilization* (1974)।-অনুবাদক

৮৯. গুস্তাভ লি বোঁ, *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ., ১৫৩।

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে উপর্যুক্ত মূলনীতি ও ভিত্তি সম্পর্কে আমরা জানতে পারব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : আল-কুরআন ও সুন্নাহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি জাতি-গোষ্ঠী

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অন্য জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি উদারপন্থা অবলম্বন

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল-কুরআন ও সুন্নাহ

কুরআনুল কারিম এবং নবীর পবিত্র সুন্নাহকে সাধারণভাবে ইসলামি সভ্যতার দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বিবেচনা করা হয়। এ দুটি ইসলামি সভ্যতার ভিত্তিগত মূলনীতি।

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার মহিমান্বিত কিতাব, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ কিতাব সম্পর্কে বলেছেন,

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

> এই কিতাব প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত।[১০]

এই কিতাবের উদাহরণগুলো ও নির্দেশগুলো যে অনুধাবন করতে পারে তার জন্য শিক্ষাপূর্ণ ও পথপ্রদর্শকরূপে পর্যবসিত হয়। তাতে আল্লাহ তাআলা আবশ্যক বিধিবিধান বিবৃত করেছেন, হালাল ও হারামের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করে দিয়েছেন, অনুধাবনের জন্য উপদেশমালা ও ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাতে তিনি উদাহরণ পেশ করেছেন এবং অদৃশ্যের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

কিতাবে (কুরআনে) আমি কোনোকিছুই বাদ দিইনি।[১১],[১২]

আল-কুরআন ইসলামি সমাজের সংবিধান। কুরআন প্রতিটি বড় ও ছোট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে, মানবজাতির জন্য যা-কিছুতে কল্যাণ ও সৌভাগ্য

---

[১০]. সুরা হুদ : আয়াত ১।

[১১]. সুরা আনআম : আয়াত ৩৮।

[১২]. কুরতুবি, *আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ১।

রয়েছে তা নিয়ে এসেছে। কুরআন মানবজাতির জন্য যা-কিছু বিধিবদ্ধ করেছে তা দ্ব্যর্থহীন ও ব্যাপক এবং প্রতিটি স্থান ও কালের জন্য উপযুক্ত।[১৩]

আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন তাঁর দিক-নির্দেশনা দ্বারা জীবন ও মানবতার পথচলাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কুরআনেই ইসলামি সভ্যতার রহস্য ও তার বিশালতা নিহিত রয়েছে। তা আল্লাহর কিতাব যা ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (হেদায়েত করে সেই পথের দিকে যা সুদৃঢ়।)[১৪] অর্থাৎ, মানুষকে এমন পথে পরিচালিত করে যা অন্যসকল পথ থেকে শ্রেষ্ঠ, উত্তম ও যথার্থ। তা আল্লাহর এমন কিতাব যা ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না—অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাৎ থেকেও নয়। তা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।)[১৫] তা মানবজাতির জন্য আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, জ্ঞানগত, চিন্তাগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর। কুরআনের শিক্ষাতেই রয়েছে মানুষের সৌভাগ্য।

আল-কুরআনের অন্তর্গত সামগ্রিক নীতি ও বিভিন্ন বিধিবিধান আত্মার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, প্রতিপালকের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে সমাজের ও অন্য মানুষের সম্পর্ককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। কুরআন আহ্বান জানিয়েছে একত্ববাদের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার প্রতি। একইভাবে কুরআন পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণ শৃঙ্খলিত করেছে, সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছে মজবুত ভিত্তিসমূহের ওপর যা সমাজের জন্য নিরাপত্তা, প্রাচুর্য ও সৌভাগ্য নিশ্চিত করে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশে কুরআনের যা-কিছু সংক্ষিপ্ত তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, যা-কিছু জটিল তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা-কিছু সম্ভাবনাপূর্ণ তা সুনিশ্চিত

---

১৩. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৩৭।
১৪. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৯।
১৫. সুরা হা মিম আস-সাজদা : আয়াত ৪২।

করেছেন। তা এ কারণে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি যেন কুরআনের সঙ্গে বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় এবং তাঁর প্রতি দায়িত্বপ্রদানের মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

এবং আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।[১৬]

সুতরাং আল্লাহর কিতাব হলো মূল এবং রাসুলের সুন্নাহ হলো তার ব্যাখ্যা।[১৭]

ইসলামি সভ্যতার ভিত্তিসমূহ ও মূলনীতিসমূহের দ্বিতীয়টি হলো রাসুলের পবিত্র সুন্নাহ যা আল-কুরআনের পরে ইসলামের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন এমন সংবিধান যাতে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও আইনকানুন তথা ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস, আমল-ইবাদত, আখলাক ও শিষ্টাচার, লেনদেন এবং আদবকায়দা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুন্নাহ হলো এ সকল ক্ষেত্রে কুরআনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং কর্মে বাস্তবায়ন।

ইসলামি শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন ও উম্মাহকে এর ওপর পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসুলের বিস্তারিত কর্মপদ্ধতিই হলো সুন্নাহ। তা মূর্ত হয়ে উঠেছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে

---

১৬. সুরা নাহল : আয়াত ৪৪।
১৭. কুরতুবি, *আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ২।

> পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।[৯৮]

তা রূপ লাভ করেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায়, কাজে ও অনুমোদনে।[৯৯]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

> রাসুল তোমাদের যা দেন (যা-কিছুর নির্দেশ দেন) তা তোমরা গ্রহণ করো (পালন করো) এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।[১০০]

সুতরাং সুন্নাহ হলো কুরআনের পরিপূরক ও কুরআনের ব্যাখ্যা। ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা রাসুলের হাদিস আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। একবার এক লোক বলল, এগুলো থেকে আমাদের মুক্তি দিন এবং আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব নিয়ে আসুন। তখন ইমরান ইবনে হুসাইন রা. তাকে বললেন, 'তুমি একটা নির্বোধ। তুমি কি আল্লাহর কিতাবে নামায বিস্তারিতরূপে পাবে? তুমি কি আল্লাহর কিতাবে রোযা বিস্তারিতরূপে পাবে? কুরআন এগুলো বিধিবদ্ধ করেছে এবং সুন্নাহ এগুলোর সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছে।'[১০১]

ঐশী প্রত্যাদেশ থেকে প্রাপ্ত এই দুটি উৎস একটি অভিজাত আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করেছে। মানবজাতি এর কোনো নমুনা দেখেনি, যেমনটি আমরা দেখব এই কিতাবের যেকোনো এক অধ্যায়ে। আরবদের ইসলামপূর্ব অবস্থা ও ইসলাম-পরবর্তী অবস্থার প্রতি যিনি দৃষ্টিপাত করবেন এবং দুটি অবস্থাকে তুলনামূলকভাবে বিচার করবেন তিনি খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে যে দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন তা-ই একমাত্র অভিনব বিষয় ছিল যা তাদের মহান করেছিল। এই দ্বীনই তাদের চরিত্রকে মেরামত করেছিল,

---

৯৮. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪।

৯৯. ড. ইউসুফ কারযাবি, *মাদখাল লি-মারিফাতিল ইসলাম*, অধ্যায় : القرآن والسنة مصدرا الإسلام।

১০০. সুরা হাশর : আয়াত ৭।

১০১. জালালুদ্দিন সুয়ুতি, *মিফতাহুল জান্নাহ*, পৃ. ৫৯; সামআনি, *আদাবুল ইমলা ওয়াল-ইসতিমলা*, পৃ. ১০।

তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিল, তাদের একই কালিমাতলে একত্র করেছিল, তাদের সমাজ সংস্কার করেছিল, তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। এই দ্বীনের ফলে তারা একটি মূর্খ জাতি থেকে শিক্ষিত, বিভ্রান্ত জাতি থেকে সুপথপ্রাপ্ত এবং একটি অপরিচিত জাতি থেকে বিখ্যাত জাতিতে পরিণত হয়েছে।[১০২]

কুরআনুল কারিম ও নবীর পবিত্র সুন্নাহই যেহেতু জ্ঞান ও বিশ্বাস, আখলাক ও শিষ্টাচার, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ইসলামি সভ্যতার অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও অনুশাসন জারি করে ইসলামের সভ্যতাকে বিনির্মাণ করেছে, সুতরাং এ দুটির মধ্য থেকেই মানুষের এবং সমগ্র মানবসমাজের সৌভাগ্য উৎসারিত হয়।

---

১০২. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৬১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামি জাতি-গোষ্ঠী

ইসলাম স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্ব মানবসংহতি ঘোষণা করেছে। তা সত্য, কল্যাণ ও সৌজন্যবোধের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

হে মানুষ, তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।[১০৩]

এ কারণেই ইসলাম ইসলামি বিজয়গুলোর পর বিভিন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বংশধারার মধ্যে মিলন সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি জাতি ও গোষ্ঠীর সভ্যতার ঐতিহ্য ছিল, জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। আর এগুলো ছিল একটি অনন্য সভ্যতা নির্মাণের কার্যকারণ, যেখানে মানবিক ও স্বভাবগত শক্তি ও প্রতিভার বৈচিত্র্য ছিল। আর মুসলিম জাতি-গোষ্ঠী ও বংশের জ্ঞানগত সাংস্কৃতিক মানবিক শক্তি ও প্রতিভার বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপই হলো ইসলামি সভ্যতা।

শাস্ত্রীয়, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত যে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা, যা উপভোগ করছিল ইসলামি বিশ্বের পারসিক ও তুর্কির মতো কিছু জাতি, তা ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণে যুগপৎ সাহায্য করেছে এবং এক উৎকর্ষপূর্ণ বিশাল

---

১০৩. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩।

মানবসভ্যতা নির্মাণে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। এ কারণে ইসলামি বিশ্বের জাতি-গোষ্ঠীর বিচিত্রতা ও বহুরূপতা ইসলামি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি এবং সমৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিরূপে বিবেচিত হয়।

আমরা উদাহরণ হিসেবে পারস্যসাম্রাজ্যের কথা আলোচনা করতে পারি। আল্লাহ তাআলা যখন তা মুসলিমদের জন্য বিজিত করলেন, মুসলিমদের সঙ্গে পারস্যবাসীর সংমিশ্রণ ঘটল। তারা মুসলিমদের থেকে ইসলামধর্মের সৌন্দর্য, সৌজন্য ও মহানুভবতার অনেককিছু শিখল। তারা জানল যে ইসলাম হলো ভ্রাতৃত্ব, সমতা, ভালোবাসা, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহানুভূতি এবং একে অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার ধর্ম। ফলে তারা আল্লাহর দ্বীন ইসলামে দলে দলে প্রবেশ করল। আরবি ভাষা শিক্ষা ও এ ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। কারণ আরবি ভাষা তাদের ধর্মের ভাষা, যে ধর্মকে তারা ভালোবেসেছে, আলিঙ্গন করেছে। আরবি ভাষা তাদেরকে এই ধর্ম বুঝতে ও অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে।[১০৪]

এই ধর্ম ও তার ভাষার প্রতি তাদের ভালোবাসা এই দুটির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। ফলে অনতিকাল পরেই তারা জ্ঞান-আন্দোলন ও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে, বরং এ দুটির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। ইসলামি সভ্যতা তা থেকে পর্যাপ্ত উপকার লাভ করেছে। যেমন :

এক. ইসলামি সভ্যতার কতিপয় দিক ব্যক্ত করার জন্য কিছু শব্দ রয়েছে। তার সমার্থক শব্দ আরবি ভাষায় ছিল না। তখন ওই শব্দগুলোকেই আরবি ভাষায় আত্তীকরণ করা হয়। ফলে শব্দগুলো আরবি ভাষার শরীরে প্রবেশ করে। এর মধ্যে রয়েছে দিওয়ান (ديوان) ও বিমারিস্তান (بيمارستان) তথা, দফতর ও হাসপাতাল।

দুই. আরবি ভাষাজ্ঞান ও ইসলামি জ্ঞানের ময়দানে পারস্য থেকে বহু ক্ষণজন্মা প্রতিভা ও মনীষার জন্ম হয়েছে। হাদিসশাস্ত্রে শিখরে পৌছেছেন হাসান বসরি রহ., মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ., আবু আবদুল্লাহ বুখারি রহ. প্রমুখ। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

---

১০৪. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৬৭।

ফিকহশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন দুই ইমাম, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম লাইস ইবনে সাদ রহ.। তারা দুইজন এবং তাদের মতো আরও যারা রয়েছেন তাদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সাহিত্যে দক্ষতা ও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন আবদুল হামিদ আল-কাতিব এবং ইবনুল মুকাফফা প্রমুখ। কবিতায় বাশশার ইবনে বুরদ ও আবু নুওয়াস প্রমুখ। এ সকল কবি ও সাহিত্যিক কাব্য ও গদ্যে নতুন আঙ্গিক ও শৈলী, অভিব্যক্তি এবং প্রভূত কল্পনা ও চিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। আব্বাসি যুগে ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থরচনার বিপ্লব ঘটেছে। একইভাবে ভিনদেশি ভাষা থেকে অজস্র গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

পারসিক দেশগুলোর জাতি-গোষ্ঠীর অবদানের মতো প্রাচ্যীয় সভ্য জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় ও অন্যদের অবদানও রয়েছে ইসলামি সভ্যতায়। তা-ও জ্ঞানগত বিপ্লবের পথ ধরেই এসেছে।[১০৫]

উল্লেখ্য যে, এ সকল নতুন ইসলামি জাতি-গোষ্ঠীর সন্তানদের বিকাশ, উৎকর্ষ ও অবদান কেবল ধর্মীয় জ্ঞান ও আরবি ভাষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারা উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন এবং শিখর স্পর্শ করেছিলেন। যেমন চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগণিত, প্রকৌশল ইত্যাদি। যা ইসলামি সভ্যতার বিনির্মাণ ও গঠনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে এবং ইসলামি সভ্যতাকে অভাবিতরূপে সমৃদ্ধ করেছে। এ সকল জ্ঞানী মনীষীদের মধ্যে রয়েছেন আল-খাওয়ারিজমি, ইবনে সিনা ও আল-বিরুনি।

ইমাম যুহরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিশাম ইবনে আবদুল মালিক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মক্কার নেতৃত্ব দেন কে? আমি বললাম, আতা ইবনে রাবাহ। তিনি বললেন, আর ইয়ামেনে কে? আমি বললাম, তাউস ইবনে কায়সান। তিনি বললেন, শামবাসীদের মধ্যে কে? আমি বললাম, মাকহুল। তিনি বললেন, আর মিশরবাসীদের মধ্যে কে? আমি বললাম, ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবিব। তিনি বললেন, জাযিরাতুল আরবের বাসিন্দাদের মধ্যে কে? আমি বললাম, মাইমুন ইবনে মিহরান। তিনি বললেন, খুরাসানবাসীদের মধ্যে কে? আমি বললাম, দাহহাক ইবনে মুযাহিম। তিনি বললেন, আর বসরায় কে? আমি বললাম, হাসান ইবনে

---

১০৫. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৬৭, ৬৮।

আবুল হাসান (হাসান বসরি)। তিনি বললেন, কুফায় কে নেতৃত্ব দেন? আমি বললাম, ইবরাহিম নাখয়ি।

ইমাম যুহরি উল্লেখ করেছেন যে, হিশাম ইবনে আবদুল মালিক প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞেস করেছেন, তিনি কি আরব না আযাদকৃত দাস? তিনি বলেছেন, তারা সবাই আযাদকৃত দাস। কথোপকথন শেষ হলে হিশাম বললেন, হে যুহরি, আল্লাহর কসম! আযাদকৃত দাসেরা আরবদের ওপর নেতৃত্ব দিচ্ছে। এমনকি তারা মিম্বরে বসে আরবদের উদ্দেশে বক্তৃতা করে, আর আরবরা নিচে বসে থাকে। ইমাম যুহরি বলেন, আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন! তা হলো আল্লাহর হুকুম ও তাঁর দ্বীন। যারা তাঁর হুকুম ও দ্বীনের হেফাজত করবে তারা নেতৃত্ব দেবে এবং যারা বিনষ্ট করবে তাদের পতন ঘটবে।

ইসলামি সভ্যতা হলো ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন জাতি অর্থাৎ পারসিক, রোমান, গ্রিক, ভারতীয়, তুর্কি, স্প্যানিশ জাতির সম্মিলিত ফসল। তারা ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল এবং তাদের ভূমিকা পালন করে এই বিশাল অবয়বের জন্য শক্তির উৎস নির্মাণ করেছিল। তারা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়েছিল, যা ছিলো মুসলিম উম্মাহ ও তার সভ্যতা এবং মুসলিম উম্মাহর বিপুল বিস্তৃত ইতিহাসের উত্তরাধিকার।

প্রত্যেক সভ্যতা একটিমাত্র জাতি ও একটিমাত্র মানবগোষ্ঠীর প্রতিভাবান সন্তানদের নিয়ে গর্ব করতে পেরেছে। ইসলামি সভ্যতার কথা ভিন্ন। যে-সকল জাতি ও গোষ্ঠীর ওপর ইসলামের পতাকা উড়েছে তাদের যে-সকল প্রতিভাবান ইসলামি সভ্যতার অট্টালিকাকে নির্মাণ করেছে তাদের সবাইকে নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গর্ব করে। এখানে পারসিকদের পাশে আরবরা অবস্থান করেছে। একদিকে আমরা পাই ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম আহমাদ রহ. (চার ফিকহি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ)-কে, অন্যদিকে পাই খলিল ও সিবওয়াইহ (ভাষার স্থপতিগণ) এবং আরও অনেককে, যাদের জাতিসত্তা ভিন্ন, দেশ ভিন্ন। তাদের পরিচয় একটাই, তারা মুসলিম মনীষী। তাদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই মানবজাতি পেয়েছে ইসলামি সভ্যতা, যা মানুষের বিশুদ্ধ চিন্তার শ্রেষ্ঠ ফসল।[১০৬]

---

১০৬. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৩৬, ৩৭ (কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে)।

এমনই ইসলামি সভ্যতার স্বভাব ও প্রকৃতি, যা এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। তা জ্ঞান ও মহানুভবতার দ্বারা পৃথিবী আলোকিত করেছে। ইসলামি সভ্যতার ছায়ায় যারা বসবাস করে তাদের সবাইকে তা আপন করে নিয়েছে, ফলে তাদের প্রত্যেকেই ইসলামি সভ্যতাকে নতুন নতুন দিক থেকে উপকৃত করেছে এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
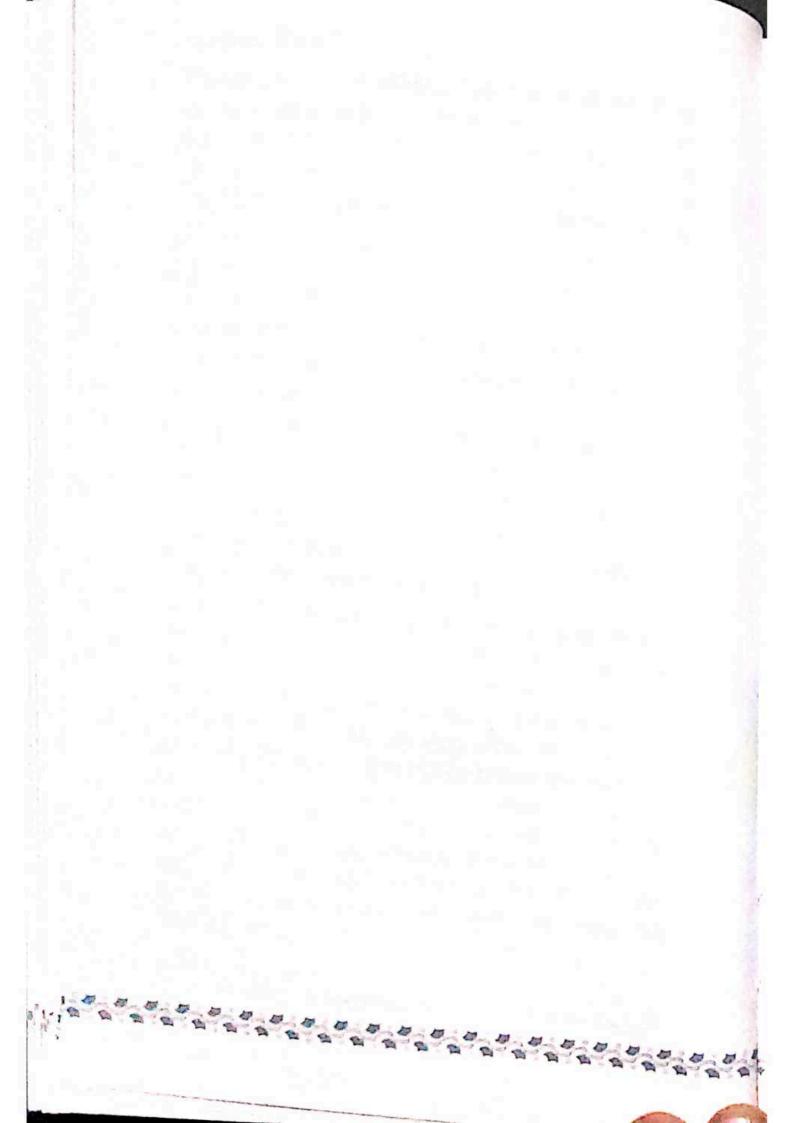
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অন্য জাতি-গোষ্ঠীর প্রতি উদারপন্থা অবলম্বন

বিশ্বের যে-সকল জাতি-গোষ্ঠী ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল তারা ছিল মানবসভ্যতার সমৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও উপাদান। একইভাবে অতীত যুগের জাতিগুলোর নির্মিত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও তা থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে মুসলিমদের উদারপন্থা গ্রহণও ছিল ইসলামি সভ্যতা ও তার বিপ্লবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ও সহায়ক।

মানবেতিহাসে প্রথমবারের মতো মুসলিমগণই অন্যান্য সভ্যতার প্রতি উদারপন্থা গ্রহণ এবং পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীর প্রচেষ্টাফল থেকে ঋণ গ্রহণের নীতিমালাগুলোর বাস্তবিক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এই উদারনীতির প্রবক্তা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণতামুক্ত, পক্ষপাতিত্বহীন। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হারিস ইবনে কালাদাহ আস-সাকাফির কাছে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল কত চমৎকার! তিনি ছিলেন একজন মুশরিক ডাক্তার। এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো দোষ মনে করেননি। কারণ চিকিৎসা একটি জীবনমুখী জ্ঞান, যা গোটা মনুষ্যজাতির উত্তরাধিকার। সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার শুশ্রূষার জন্য এলেন। তিনি আমার বুকের ওপর তাঁর হাত রাখলেন। এমনকি আমার হৃৎপিণ্ডে তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। তারপর তিনি বললেন,

«إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ»

তুমি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত। তুমি সাকিফ গোত্রের হারিস ইবনে কালাদাহর কাছে যাও। সে একজন চিকিৎসক। (পরে আবার বললেন,) সে যেন মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর বিচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়।[১০৭]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ ইবনে সাবিত রা.-কে সুরয়ানি ভাষা (Syriac language) শেখার জন্য যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা কত চমৎকার! তিনি ষাট দিনে সুরয়ানি ভাষা শিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ফারসি ও রোমান (লাতিন) ভাষাও শিখেছিলেন।

এই ধারা পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের ইতিহাসে স্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে ইসলামের পয়গাম পৌছে দেওয়া। তাই তারা এই পয়গাম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জাযিরাতুল আরব থেকে বেরিয়ে বিপুল বিশ্বের অভিমুখে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটেছিল নতুন নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। তারা সেসব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেননি বা বিলোপ ঘটাননি। বরং সেগুলোর পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং উপকারিতা লাভ করেছেন। যা কল্যাণকর ছিল এবং তাদের সত্য দ্বীনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তা গ্রহণ করেছিলেন। একটা সময় ছিল যখন গ্রিক সভ্যতা তার সন্তানদের ছাড়া অন্যকাউকে কিছু শিক্ষা দেয়নি এবং গ্রিক জ্ঞানী-মনীষী ছাড়া অন্যকারও থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। পারসিক, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতাও ছিল অনুরূপ। সম্ভবত কিছুকাল পর্যন্ত এসব সভ্যতার ক্ষেত্রে এই অবস্থা অবশিষ্ট ছিল। যেমন চৈনিক ও ভারতীয় সভ্যতা।

তবে মুসলিমগণ খুব দ্রুতই অন্যদের জ্ঞান ও চিন্তারাশি ভাষান্তরিত করার আন্দোলন সূচিত করেন। খালিদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া আল-

---

[১০৭]. হাদিসটি থেকে প্রথমত এটা প্রমাণিত হয় যে, রোগের চিকিৎসা করা বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যদিও সে অমুসলিম হয়। কারণ, হারিস ইবনে কালাদাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা নেই। দ্বিতীয়ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দান করে নিজেই তার ওষুধ নির্ণয় করেছেন। আর অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, এটাও এক প্রকারের মহৌষধ। তবে পদ্ধতিগতভাবে প্রস্তুত করা চিকিৎসকের কাজ।-অনুবাদক
সুনানে আবু দাউদ, কিতাব : চিকিৎসা, বাব : তামারাতুল আজওয়া : ৩৮৭৫। ইবনে হাজার আসকালানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। *হেদায়াতুর রুওয়াত*, খ. ৪, পৃ. ১৫৯। আবদুল হক আল-ইশবিলি *আল-আহকামুস সুগরা* গ্রন্থের ভূমিকাতে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদিসটির সনদ সহিহ। *আল-আহকামুস সুগরা*, পৃ. ৮৩৭।

উমাবি[১০৮] ছিলেন এই আন্দোলনের অগ্রপথিক। তিনি গ্রিক জ্ঞান ও চিন্তা আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজ শুরু করেন। এ সকল জ্ঞান ও তাদের বিকশিত ধারা থেকে উপকৃত হন। বিশেষ করে ওষুধশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র-সংক্রান্ত সমীকরণের জ্ঞান লাভ করেন।

উমাইয়া খেলাফত স্থায়িত্ব লাভ করল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করল। পারসিক ও রোমান রাজ্যগুলোর পতনের পর অনারবদের জ্ঞানের উত্তরাধিকার লাভ করল। তারপর মনোযোগ চিন্তার আন্দোলনের প্রতি নিবদ্ধ হলো। ফলে গ্রিক ও পারসিক সভ্যতাসহ পূর্ববর্তী সভ্যতাসমূহের বিপুল গ্রন্থ ও জ্ঞানভান্ডার আরবি ভাষায় রূপান্তরিত হলো। সভ্যতার প্রেক্ষিত বিবেচনায় তা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কারণ তা বিশাল বাতায়ন খুলে দিয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে আরব ও মুসলিম জ্ঞানানুরাগীগণ প্রথমবারের মতো বাইরের জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে চোখ মেলে তাকান।

ভাষান্তরিত জ্ঞানরাশির মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বিশেষ সমাদর লাভ করে। এগুলোর শীর্ষস্থানে ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র। এই যুগবিভাজনের আগে ইসলামি চিকিৎসাশাস্ত্র নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা ও ভেষজ ওষুধের ওপর নির্ভরশীল ছিল। যেমন সেঁক দেওয়া, রক্তমোক্ষণ (bloodletting) করা, শিঙা লাগানো, খতনা করা ও ছোট-বড় অস্ত্রোপচার করা। মুসলিম ও আরব চিকিৎসকগণ আলেকজান্দ্রিয়া মাদরাসা ও জুনদাইসাপুর[১০৯] মাদরাসার পাঠ্যসূচির সাহায্যে গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং এর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজে ব্রতী হলেন।[১১০] এই ক্ষেত্রে সে সময়ে তথা খলিফা মারওয়ান বিন হাকামের শাসনামলে (৬৪-৬৫ হিজরিতে) শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ছিলেন মাসারজাওয়াইহ

---

১০৮. খালিদ ইবনে ইয়াযিদ : আবু হাশিম খালিদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আল-উমাবি আল-কুরাশি। জ্ঞানশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কুরাইশ বংশের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। তার ওষুধ ও কিমিয়া প্রস্তুতপ্রণালি-সংক্রান্ত বক্তব্য ও মতামত গুরুত্ব বহন করে। তিনি ৯০ হিজরিতে (৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে) দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, খ. ১৩, পৃ. ১৬৪-১৬৬।

১০৯. খুরাসানের একটি শহর।

১১০. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রুউওয়াদু ইলমিত তিব্ব ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৮।

(Masarjawaih)। তিনি ছিলেন ইহুদি ধর্মাবলম্বী এবং খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকামের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তিনি *আল-কুন্নাশ* (الكناش) নামে একটি গ্রিক চিকিৎসা বিশ্বকোষ আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন।[১১১]

আব্বাসি খিলাফতকালে, বিশেষ করে পঞ্চম খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে (১৭০-১৯৪ হিজরি) অনুবাদ-কর্মকাণ্ড বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তিনি বাইতুল হিকমাহ নামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিকট প্রাচ্য ও কনস্টান্টিনোপল থেকে আরবি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থসমূহ দ্বারা তা সমৃদ্ধ করে তোলেন। সপ্তম আব্বাসি খলিফা মামুনও (১৯৮-২১৮ হিজরি) বাইতুল হিকমাহর ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বারোপ করেন এবং অনুবাদকদের ভাতা বাড়িয়ে দেন। তিনি বিভিন্ন শাখার জ্ঞানবিজ্ঞানের গ্রিক রচনাবলি যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করার জন্য কনস্টান্টিনোপলে প্রতিনিধিদল পাঠাতে শুরু করেন। মুসলিম খলিফাগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যেসব চুক্তি করতেন তার অধিকাংশের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করা হতো যে, মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা গির্জায় ও বাইজান্টাইনীয় প্রাসাদসমূহে যে-সকল গ্রন্থাগার রয়েছে সেগুলোতে প্রবেশ করতে পারবেন এবং সেখানে সংরক্ষিত গ্রন্থরাশির অনুবাদ করতে পারবেন। এমনকি মাঝে মাঝে খলিফাগণ গ্রন্থের দ্বারা বন্দি বিনিময়ও করতেন।[১১২]

ইবনে নাদিম[১১৩]/[১১৪] তার *আল-ফিহরিসত* গ্রন্থে অনুবাদক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, প্রকৌশলী ও জ্যোতির্বিদদের জন্য প্রায় সত্তরটি ভুক্তি রচনা করেছেন। তাদের জীবৎকালের বিস্তৃতি ছিল হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতক। যাদের অধিকাংশ ছিলেন সুরয়ানি অথবা পারসিক ও ভারতীয়

---

[১১১] তিনি গ্রিক সুরয়ানি ভাষা থেকে রূপান্তরিত করেছিলেন। দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আম্বা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ১৬৩; শামসুদ্দিন আশ-শাহারযুরি, *নুযহাতুল আরওয়াহ*, পৃ. [illegible]।

[১১২] নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ২৪৩; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. [illegible]।

[১১৩] আবুল ফারাজ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-বাগদাদি, মৃ. ৪৩৮ হিজরি/১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। তথ্য-সংগ্রাহক, শাস্ত্রীয় শিয়া ও মু'তাযিলা মতাদর্শী। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *লিসানুল মিযান*, খ. ৫, পৃ. [illegible]; খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৯।

[১১৪] [illegible] নাদিম তার উপাধি, তার পিতার নয়। তাই তাকে ইবনে নাদিম না বলে নাদিম বলাই সংগত। এ বিষয়ে জানতে দেখুন, শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর তাহকিককৃত *লিসানুল মিযান*, খ. ৬, পৃ. ৬১৪। -সম্পাদক

বংশোদ্ভূত মুসলিম। এটা এই উদ্যোগ ও তার প্রভাবের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে, তা হলো ইসলামি জ্ঞান-সভ্যতা বিনির্মাণ ও সমৃদ্ধিকরণে অমুসলিমদের ব্যাপারে এবং ইসলামপূর্ব যুগের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদার ও উন্মুক্ত নীতি গ্রহণ।

এখানে উল্লেখ্য যে, অন্যদের প্রতি মুসলিমদের এই উদারনীতি অন্ধ বা অজ্ঞতাপূর্ণ ছিল না। সিংহভাগ ক্ষেত্রে তা ছিল মুসলিমদের মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের সত্যধর্মের অনুকূল। গ্রিক সভ্যতার ক্ষেত্রে তারা উদারনীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারা তাদের আইনকানুন গ্রহণ করেননি এবং গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াডের অনুবাদ করেননি। উচ্চাঙ্গের পৌত্তলিক গ্রিক সাহিত্যেরও অনুবাদ করেননি। বরং তারা তথ্য-পুস্তক নথিভুক্তকরণের জ্ঞানলাভ এবং পদার্থবিজ্ঞানের অনুবাদকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। তারা পারসিক সভ্যতার প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সযত্নে তাদের ধ্বংসাত্মক ধর্মাদর্শ এড়িয়ে গেছেন। তবে পারসিক সাহিত্য ও তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ঋণ করেছেন। তারা ভারতীয় সভ্যতার প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের দর্শন ও ধর্মাদর্শকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তাদের গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা গ্রহণ করেছেন; তারা এ সকল জ্ঞানের সংরক্ষণ করেছেন, উন্নতি ও বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং অনেককিছু সংযুক্ত করেছেন।

তা ছাড়া মুসলিমগণ অন্য সভ্যতা থেকে যা গ্রহণ করেছেন তা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়েছে। কেউ এটাকে দোষ বলে গণ্য করেনি। অর্থাৎ, এতে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়েছে এবং তাদের মন ও মগজ অন্যদের জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়েছে। মানবসভ্যতায় অবদানের বিষয়টি যাদের দ্বারা শুরু হয় তাদের দ্বারা শেষ হয় না; একজন শুরু করে, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় অন্যরা। তারপর নতুন নতুন জিনিসের উদ্ভাবন ঘটে এবং পূর্ববর্তী সভ্যতায় শুরু হওয়া অগ্রযাত্রা পূর্ণতা পায়। যা আমরা আগামী অধ্যায়গুলোতে দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।
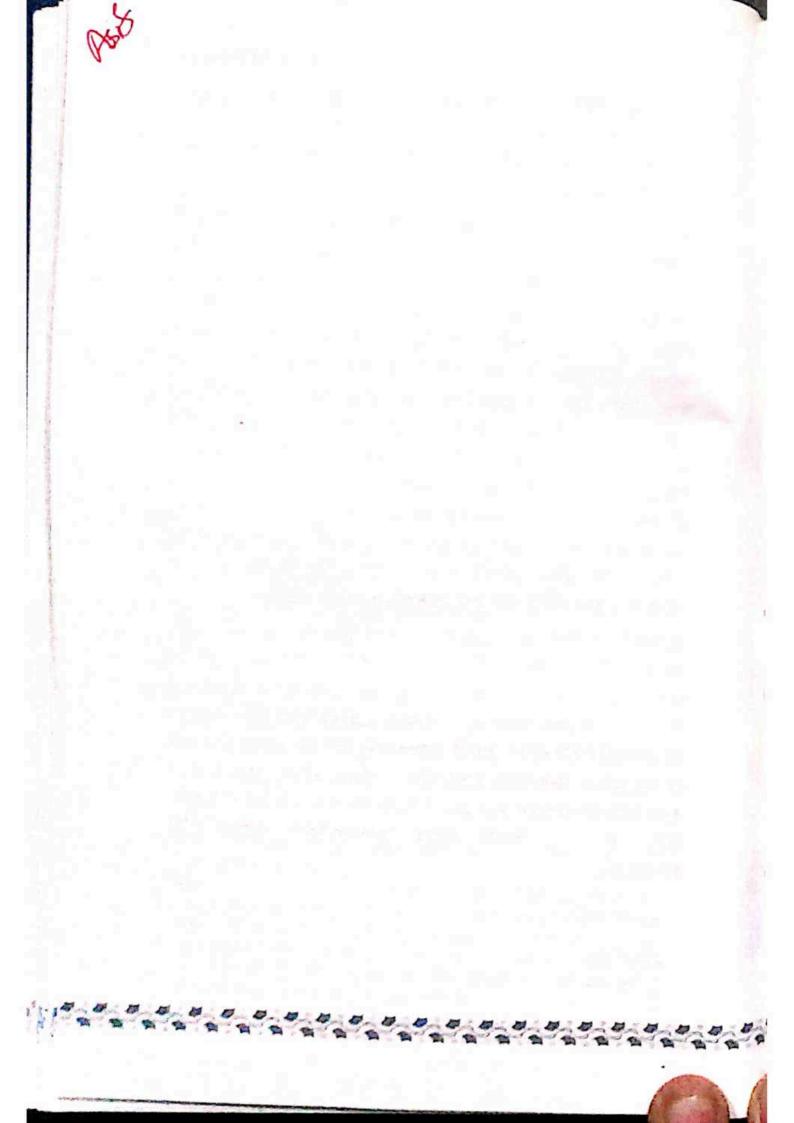
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রত্যেক সভ্যতার অনন্য, স্বতন্ত্র ও পার্থক্যসূচক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে মহিমান্বিত করে তোলা গ্রিক সভ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্য। দোর্দণ্ড প্রতাপ ও ক্ষমতার বিস্তার রোমান সভ্যতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। পারসিক সভ্যতার বিশেষ চরিত্র ছিল শারীরিক উপভোগ, সমরশক্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিক শক্তিতে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিল। ইসলামি সভ্যতারও রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় চরিত্র ও স্বতন্ত্র গুণাবলি। যা একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সভ্যতাগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট ও অসামান্য করে তুলেছে। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হলো আসমানি পয়গাম, অর্থাৎ ইসলামের মিশন। এই পয়গাম ও মিশন মানবিক, সর্বজনীন এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল একত্ববাদের অনুসারী। পরবর্তী আলোচনায় ইসলামি সভ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এই পরিচ্ছেদে চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বজনীনতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : একত্ববাদ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : নৈতিকতা
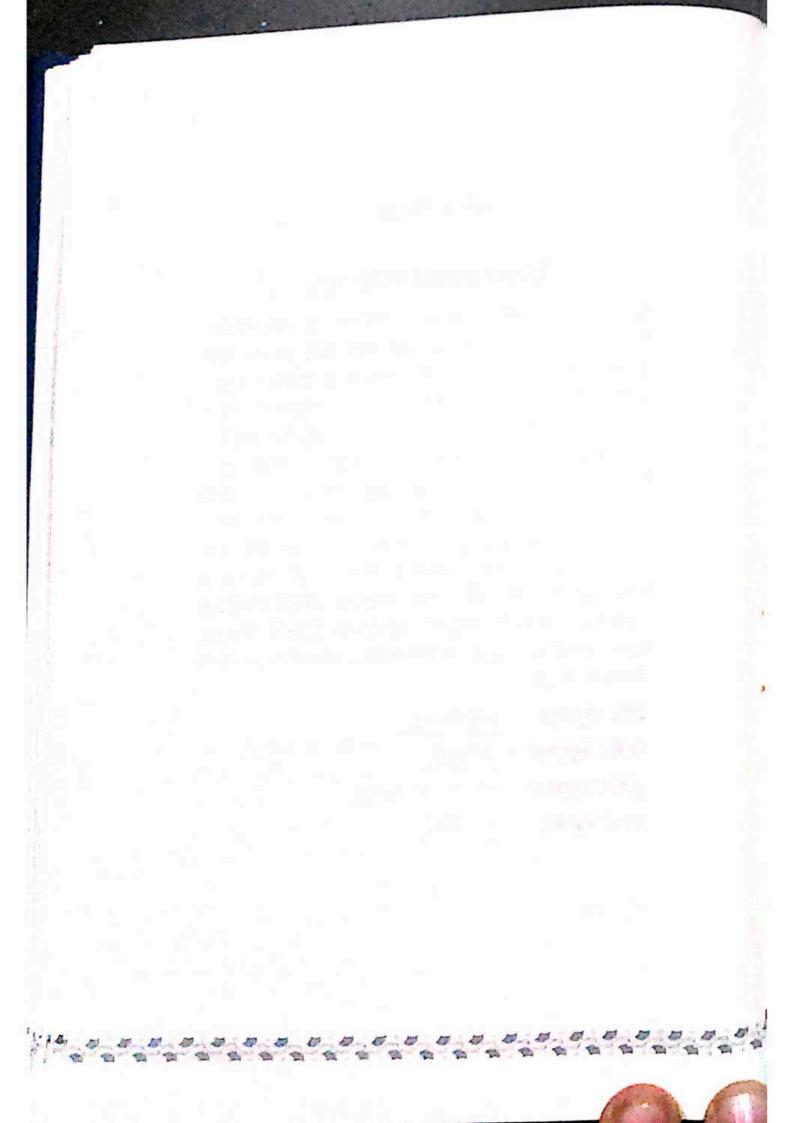
প্রথম অনুচ্ছেদ

বিশ্বজনীনতা

ইসলামি সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তার ব্যাপক বিস্তৃতি ও মিশনের বিশ্বজনীনতা। মানুষের বংশ, জন্মস্থান ও আবাসস্থল ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র কুরআন কর্তৃক মানবশ্রেণির একত্ব ও ঐক্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

হে লোকসকল, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ভাগ করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে পরহেযগার সেই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত।[১১৫]

কুরআন ইসলামি সভ্যতাকে একটি মালারূপে পেশ করেছে, যেখানে জাতি ও গোষ্ঠীর–যাদের ওপর ইসলামি বিজয়ের পতাকা পতপত করে উড়েছে–সকল প্রতিভাবানেরা মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে।[১১৬]

ইসলামি সভ্যতা মানবিক কল্যাণপ্রবণ। বিস্তৃতি ও ব্যাপকতায় বিশ্বজনীন। কোনো ভৌগোলিক অঞ্চল, কোনো মানবগোষ্ঠী বা ইতিহাসের কোনো পর্যায়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামি সভ্যতা সকল জাতি ও মানবগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তার ফল ও প্রভাব সকল এলাকা ও সকল ভূখণ্ডে বিস্তৃত। এই সভ্যতার ছায়ায় সকল মানুষ প্রশান্তি পেয়েছে, যেখানেই এই সভ্যতার অবদান পৌঁছেছে সেখানকার মানুষ তার উষ্ণতা উপভোগ করেছে। তার কারণ, ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

---

১১৫. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩।
১১৬. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৩৬।

এই নীতির ওপর যে, আল্লাহ তাআলার সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত, বিশ্বজগতে যা-কিছু আছে সবকিছু মানুষের বশীভূত, সকল মানবিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা তার সুখ, সৌভাগ্য ও স্বস্তি বিধানের জন্য। যে-সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য এই পরিণতিকে নিশ্চিত করে তা-ই প্রথম পর্যায়ের মানবিক কাজ।

বিশ্বজনীনতার নীতি সকল মানুষের মধ্যে সত্য, কল্যাণ, ন্যায়পরায়ণতা ও সমতার মূল্যবোধ দৃঢ়মূল করে। তাদের বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি, স্তর এখানে ধর্তব্য নয়। জাতিগত কৌলীন্য বা উপাদানগত আভিজাত্যের ধারণার প্রতি কোনো বিশ্বাসও নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য রহমত। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

আমি আপনাকে জগদ্‌বাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।[১১৭]

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

আমি আপনাকে সকল মানুষের উদ্দেশে প্রেরণ করেছি।[১১৮]

এ কারণে ইসলামি সভ্যতার মিশন হলো একটি বিশ্বজনীন মিশন, যার বাস্তবায়নে বংশ, বর্ণ ও ভাষাভেদে সকলে সমানভাবে অংশীদার।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহ ও তাঁর অবস্থান ছিল কুরআনের এই চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অনুকূল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ...»

---

১১৭. সুরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭।

১১৮. সুরা সাবা : আয়াত ২৮।

আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নবী এককভাবে তার কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছে আর আমি লাল ও কালো সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।[১১৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও কর্মরাশি ছিল নবুয়ত ও রিসালাতের বিশ্বজনীনতার মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেন,

«إِنَّ الرَّائِدَ لا يَكْذِبُ أَهْلَهُ. وَاللهِ لَوْ كَذَبْتُ النَّاسَ جَمِيعًا، مَا كَذَبْتُكُمْ، وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ، مَا غَرَرْتُكُمْ وَاللهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً»

নেতা কখনো তার পরিবারের সঙ্গে মিথ্যা বলেন না। আল্লাহর কসম! আমি যদি সকল মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলি, তারপরও তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলব না। যদি আমি মানুষদের ধোঁকা দিই, তোমাদের ধোঁকা দেবো না। আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসুল, বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি এবং সমগ্র মানবের প্রতি।[১২০]

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন দাওয়াতের মিশন শুরু করেছিলেন সেদিনই তার বিশ্বজনীনতার মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমের কায়সার, পারস্যের কিসরা, মিশরের সম্রাট মুকাওকিস ও হাবশার বাদশা নাজাশির কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। পারস্যসম্রাট কিসরার (খসরু পারভেজের) কাছে প্রেরিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি,

---

১১৯. *বুখারি*, কিতাব : আত-তায়াম্মুম, হাদিস নং ৩২৮; *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাহ, হাদিস নং ৫২১।

১২০. আলি ইবনে বুরহানউদ্দিন হালবি, *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ১১৪; মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস-সালেহি, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, ২য় খ., পৃ. ৩২২; ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ১, পৃ. ৫৮৫।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ،

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، إلى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسٍ، سَلامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الهُدَى وآمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وشَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُولُهُ، أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللهِ، فإني أنا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ويَحِقَّ القَوْلُ عَلى الْكَافِرِينَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ المَجُوسِ.

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্য-সম্রাট কিসরার (খসরু পারভেজের) প্রতি। সালাম তার ওপর যে সত্যের অনুসারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই। আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রাসুল, যারা জীবিত আছে তাদের সতর্ক করার জন্য। কাফেরদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করো, (সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে) নিরাপদ থাকবে। আর যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাকে অগ্নিপূজক জাতির পাপ বহন করতে হবে।[১২১]

এটাই ইসলামি সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামি সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার মাঝে স্বতন্ত্র অবস্থান ও বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। সত্যসত্যই তা হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন শ্রেষ্ঠ সভ্যতা।

---

১২১. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ১২৩; খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১, পৃ. ১৩২; মুত্তাকি আল-হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*, হাদিস নং ১১৩০২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

একত্ববাদ

ইসলামি সভ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তা আসমান জমিনের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তাআলা একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত ইলাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কর্তৃত্বে কারও কোনো অংশীদারি নেই। তাঁর রাজত্ব ও সাম্রাজ্যে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তিনিই সম্মানিত করেন, তিনি অপদস্থ করেন। যাকে ইচ্ছা অপরিসীম দান করেন। যাতে সৃষ্টিজীবের জন্য কল্যাণ ও উপযোগিতা রয়েছে তা-ই তিনি রীতিবদ্ধ করেছেন। সব মানুষ তাঁর দাস। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার ক্ষেত্রে সবাই সমান। এতে কোনো মানবিক বা পিরের ওসিলার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, তার আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং তাঁর নাযিলকৃত শরিয়া বাস্তবায়ন করা মানুষের জন্য আবশ্যক।

একত্ববাদের উপলব্ধির উচ্চমার্গীয়তা মানুষের ভেতর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এবং আল্লাহর সৃষ্টির কারও কাছে নতশির না হওয়ার চেতনা জাগ্রত রাখে। ফলে তার স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের পরিমণ্ডল প্রস্তুত হয়।

আল্লামা সাইয়িদ সুলাইমান নদবি রহ. লিখেছেন, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একত্ববাদের বিশ্বাসের যে প্রবর্তন ঘটিয়েছেন তা মানুষকে তার চেতনা ও বোধের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ভয়ভীতি থেকে মুক্তি দেয়। এ বিশ্বাসের কল্যাণে মানুষ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। কারণ ইতিপূর্বে যা-কিছুর উপাসনা করা হতো, সূর্য, পৃথিবী, নদী, সাগর, আগুন ইত্যাদি, তার সবকিছুকে আল্লাহ তাআলা মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। মানুষের কাছে রাজাবাদশাদের প্রতাপ ও ভয়ভীতি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ব্যাবিলন ও মিশরের দেবতারা, ইরান ও ভারতের দেবতারা মানুষের খেদমতগার, তাদের কল্যাণের রক্ষক এবং তাদের রাজ্যের পাহারাদার প্রমাণিত হয়।

দেবতারা রাজাবাদশাগণকে তাদের পদে আসীন করে না, বরং মানুষই রাজাবাদশাদের উপরের আসনে বসায় এবং টেনে নিচে নামায়। মনুষ্যসমাজ যে-সকল দেবতার কর্তৃত্বের অনুগত ছিল সেগুলো ছিল নষ্ট, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত। প্রচলিত কুসংস্কার মানুষকেও নানা স্তরে বিভাজিত করে রেখেছিল, মানুষের মধ্যে দুটি শ্রেণি নির্মাণ করেছিল, অভিজাত শ্রেণি ও নিম্নবর্গীয় শ্রেণি। প্রথম শ্রেণি অতি উঁচু স্তরের এবং দ্বিতীয় শ্রেণি অতি নিচু স্তরের। হিন্দু সম্প্রদায়েরর সবচেয়ে বড় দেবতা ব্রহ্ম। তার মাথা থেকে মানুষের এই শ্রেণিটাকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তারা অভিজাত ও মনিব; আর মানুষের ওই শ্রেণিটাকে তার পা থেকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তারা নীচ ও সেবাদাস। অবশিষ্ট সবাই বড় দেবতার হাতের সৃষ্টি, সুতরাং তারা মধ্যবর্তী স্তরের। স্বাভাবিকভাবেই এমন অপবিশ্বাসের পরিণতি ছিল মানুষের বংশ ও গোষ্ঠী অনুযায়ী নানা বর্ণে ও নানা স্তরে বিভক্ত সমাজ। মানুষের সমতার, মানবমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠত্বের এবং সমানাধিকারের মূলনীতির কোনো অর্থই এখানে প্রযোজ্য নয়। দুনিয়া তখন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রের আভিজাত্য প্রদর্শনের কুরুক্ষেত্র ছিল।[১২২]

সাইয়িদ সুলাইমান নদবি রহ. তারপর ইসলামের মহত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটল, অন্ধকার কেটে গেল। মানুষ প্রথমবারের মতো তাওহিদের বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারল। মানবিক ভ্রাতৃত্বের অর্থ তাদের বোধগম্য হলো, এ ভ্রাতৃত্ব মানুষের মধ্যে কোনো বিভাজন রাখে না এবং কৃত্রিম মানদণ্ডের বিনাশ ঘটায়। এই বিশ্বাসের কল্যাণে মানুষ সমতার ক্ষেত্রে তার লুণ্ঠিত অধিকারের কথা বুঝতে পারল। এই বিশ্বাসের কী ইতিবাচক কার্যকরী ফলপ্রাচুর্য রয়েছে তার ব্যাপারে ইতিহাস শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। যে-সকল জাতি-গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই বিশ্বাসের কল্যাণ মেনে নিয়েছে তাদের চিন্তাধারায়ও এর প্রভাব রয়েছে। যদিও তারা এর যাবতীয় তাৎপর্য ও বিদ্যমান মান ও মানদণ্ডের পরিবর্তনে এর বাস্তবিক প্রয়োগের ব্যাপারে অজ্ঞ রয়েছে। অর্থাৎ, যে-সকল জাতি-গোষ্ঠী তাওহিদের মূলনীতিতে বিশ্বাসী নয় তারা আজও পর্যন্ত মানবসমাজে সমতাবিধানের জন্য উপযোগী এই মূলনীতির অভাবে রয়েছে। আপনি তাদের সমাজব্যবস্থা ও সংঘ-সমিতিতে এ অভাবের রূপ দেখতে পাবেন।

---

[১২২]. সুলাইমান নদবি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৪, পৃ. ৫২৩; আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২৪-২৭।

এমনকি আপনি তাদের উপাসনালয়েও সমতা দেখতে পাবেন না, যেখানে তাদের নেতৃবৃন্দ মানুষকে তাদের অবস্থান অনুযায়ী মর্যাদা প্রদানের ভিত্তিগুলোর মুখোমুখি হয়ে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই যে মুসলিমরা ভালো অবস্থায় রয়েছে। তেরো শতাব্দী ধরে তারা এই মূলনীতির সঙ্গে পরিচিত। সর্বোচ্চ ও সর্বশক্তিমান রবের একত্বের ওপর বিশ্বাসের কল্যাণ তাদের সঙ্গে রয়েছে। মানুষের মধ্যে স্তরবিন্যাসের কৃত্রিম মানদণ্ড ও মানবসৃষ্ট নীতি থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ চিরুনির দাঁতের মতোই সমান ও সমকক্ষ। বর্ণ বা ভূমি তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করতে পারে না। যখন তারা তাদের রবের সামনে থাকে তখন তারা সিজদাবনত, বিনীত, রিক্ত ও দীন-হীন। আবার যখনই তাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করে তখন তারা সবাই সম্মানিত, সবাই সমান। ঈমান ও বিশ্বাস বাদে তাদের মধ্যে পার্থক্যের আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। আমল ছাড়া তাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্বও নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

> তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।[১২৩], [১২৪]

এই একত্ববাদের দ্বারা মুসলিমগণ তাদের স্রষ্টা, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও তার নিয়ন্ত্রকের কাছে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ফলে তাদের সভ্যতা ও মানবীয় জীবনযাত্রায় তাদের অবদানের ক্ষেত্রে এই একত্ববাদের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়।

---

[১২৩]. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩।

[১২৪]. সুলাইমান নদবি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৪, পৃ. ৫২৩, ৫২৪; আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২৪-২৭ থেকে উদ্ধৃত।

নিম্নবর্ণিত মূলনীতিগুলোর মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১. শাসককে দেবতার আসনে আসীন না করা

শাসককে দেবতার মর্যাদা দেওয়ার চিন্তা পূর্ববর্তী সময় ও সভ্যতার একটি প্রধান অনুষঙ্গ ছিল। এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, শাসকরা মানুষের সাধারণ গঠন-উপাদানের চেয়ে উৎকৃষ্ট গঠন উপাদানে তৈরি। এমন চিন্তা দূরীভূত হওয়ার ফলে মুসলিমদের জন্য শাসকদের ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের কারণে তাদেরকে জবাবদিহির মুখোমুখি করার সম্ভাবনা তৈরি হলো। মানুষ শাসকশ্রেণির ভয়ভীতি থেকে মুক্তি পেল। আল্লাহভীতি ছাড়া আর সব ভীতি দূরীভূত হলো। তিনি নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনি মানুষের জন্য শরিয়ত ও আইনকানুন বিধিবদ্ধ করেছেন। মানবজাতির জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলা এবং তাঁর নাযিলকৃত শরিয়া বাস্তবায়ন করা। এভাবে মানুষ তার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা বোঝে এবং উপলব্ধি করে যে সে আল্লাহ ছাড়া তাঁর সৃষ্টির কারও কাছে নতশির নয়। সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে ও কাজ করে। তার চিন্তায় ও কর্মে উদ্দেশ্য থাকে প্রকৃত মনিবকে সন্তুষ্ট করা। ফলে সে কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত থাকে এবং অকল্যাণ ও অসৎকর্ম থেকে দূরে থাকে। কুরআনের প্রতিটি আয়াত এই তাওহিদ ও একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ﴾

হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। আল্লাহ ব্যতীত কি কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ?[১২৫]

---

১২৫. সুরা ফাতির : আয়াত ৩।

২. মানুষের মধ্যে সমতা

সুতরাং মানুষের মধ্যে কেউ অভিজাত নয় এবং কেউ নিকৃষ্ট নয়। কেউ উচ্চস্তরের নয় এবং কেউ নিম্নস্তরের নয়। এখানে কোনো মানবিক বা পিরত্বের উসিলাও নেই। সবাইকে একজন স্রষ্টাই সৃষ্টি করেছেন এবং সবাই একই রবের ইবাদত করে। সব মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো সমান ও সমকক্ষ। বর্ণ, দেশ, জাতীয়তা বা অন্যকিছু তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। পার্থক্য নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো ঈমান ও তাকওয়া। এ কারণে মানুষের সমতার মানদণ্ড ও স্বাধীনতা তার মানুষ ভাইয়ের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থেকে অনেক উর্ধ্বে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায়ি ভাষণে এই শ্রেষ্ঠ মূলনীতি ঘোষণা করেছেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى...»

হে লোকসকল, জেনে রাখো, তোমাদের প্রতিপালক এক এবং তোমাদের পিতাও একজন। জেনে রাখো, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের এবং কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর গৌরবর্ণের এবং গৌরবর্ণের ওপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে কেবল তাকওয়ার দ্বারা...।[১২৬]

৩. প্রতিমা ও পৌত্তলিকতা থেকে মুক্তি

তাওহিদ বা একত্ববাদের বিশ্বাসের ফলে সব ধরনের পৌত্তলিকতা থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। পৌত্তলিকতার পুরোনো রূপ, অর্থাৎ মূর্তিপূজা ও প্রতিমাপূজা থেকে যেমন মুক্তি পেয়েছে তেমনই আধুনিক পৌত্তলিকতা, অর্থাৎ শোষক রাষ্ট্রকে পবিত্র ঘোষণা করা ও ব্যক্তিপূজা থেকেও মুক্তি পেয়েছে। এ কারণে ইসলামি সভ্যতার কোনো মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির

---

১২৬. *আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৫৩৬; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। *তাবারানি*, হাদিস নং ১৪৪৪৪; হাইসামি বলেছেন, এ হাদিসের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারীদের শর্তে উত্তীর্ণ। *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, খ. ৩, পৃ. ২৬৬।

কারও কাছে নতশির নয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত পেয়ে থাকেন।

৪. সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিজগৎ ও পরকালীন হিসাবনিকাশের সঠিক ধারণা

এই প্রেক্ষিতেই দুনিয়ায় বসবাস হবে, পৃথিবী আবাদ হবে এবং চোখ থাকবে হিসাব ও পুরস্কারের স্থান আখিরাতের প্রতি।

এভাবেই একত্ববাদ ইসলামি সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তা মানুষের সমতার মানদণ্ডের উন্নতি এবং উৎপীড়ন-নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তি সাধন করেছে। মানুষের দৃষ্টিকে এক আল্লাহ–বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালকের প্রতি নিবদ্ধ করেছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা

ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা ইসলামি সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের অর্থ হলো দুটি পরস্পর বিরোধী বা বৈপরীত্যপূর্ণ দিক বা পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। এমন নয় যে তার মধ্যে একটি প্রাধান্য পাবে, অপরটি বাদ যাবে। একপক্ষ তার সম্পূর্ণ অধিকার পাবে, অপরপক্ষ বৈষম্যের শিকার হবে ও তার অধিকার হারাবে। এরূপ ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা ইসলামের চিরস্থায়ী সর্বজনীন পয়গামেরই উপযুক্ত। এই পয়গাম সকল ভূখণ্ড ও সব যুগের জন্য প্রযোজ্য।

ইসলামি সভ্যতা আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে। আত্মার চাহিদা ও বস্তুর চাহিদাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। শরিয়তের জ্ঞান ও জীবনমুখী জ্ঞানের মধ্যে মিলন ঘটিয়েছে। দুনিয়ার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে, যেমন আখিরাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। চিন্তা ও ধারণা এবং বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে। তারপর, ইসলামি সভ্যতায় রয়েছে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য।

বৈপরীত্যপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার অর্থ হলো উভয় পক্ষকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে অধিকার প্রদান করা। সুতরাং কোনো বাড়াবাড়ি নয়, সংকীর্ণতা ও অবহেলাও নয়, সীমালঙ্ঘন নয়, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও নয়। আল্লাহ তাআলার কিতাব এ দিকেই ইঙ্গিত করেছে,

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾

> তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন না করো। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওজনে কম দিয়ো না।[১২৭]

আমরা ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা কী তা ব্যাখ্যা করতে চাই। পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, কেবল আধ্যাত্মিকতার দিকগুলো অথবা কেবল বস্তুগত দিকগুলো মানুষের সুখ-সৌভাগ্যের জন্য উপযুক্ত পন্থা নয়। আর এসব আধ্যাত্মিকতার পেছনে পড়ে নিজ ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্মশক্তির বিনষ্টি ও সেকেলে মনোভাব ছাড়া আর কিছুই অর্জন হবে না। এতে মানুষের মনুষ্যত্বকে হত্যা করা হয় এবং বিশ্বজগতের উপকারিতা ও কল্যাণের বিনাশ ঘটানো হয়। একইভাবে কেবল বস্তুবাদিতার পথে সীমালঙ্ঘন, জুলুম, দাসত্ব ও অপদস্থতা ছাড়া কিছু নেই। এ পথ আত্মা, সম্পদ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উৎপীড়ক স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া কিছু নয়।

এ ক্ষেত্রে চিরন্তন ইসলামি সভ্যতা আত্মার দাবিসমূহ ও বস্তুগত দাবিসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছে, বস্তুবাদ ও মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে ঐক্য সাধন করেছে। সুতরাং নির্ভেজাল অধ্যাত্মবাদ সুসভ্য বস্তুবাদের ভিত্তি রচনা করে। মানুষ ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা, স্বস্তি, দয়া ও ভালোবাসার ওপর নির্মিত নৈতিকতা-শিষ্টাচার ও ঈমানের পরিমণ্ডলে আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা, চিন্তা এবং প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল লাভ করে থাকে।

এরূপ ভারসাম্যের কাজ হলো মানুষের স্বভাব ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি ও সামঞ্জস্য বিধান করা, একইভাবে মানুষের চিন্তা ও ভাবনারাশি এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায়ের মধ্যে সংশ্লেষ ও প্রভাবপ্রবণতা সৃষ্টি করা।

শরিয়ার জ্ঞান ও জীবনমুখী জ্ঞানের মধ্যে মিলন ঘটানোর প্রেক্ষিতে বলতে পারি, ইসলাম তার উন্নত সভ্যতাকে জ্ঞান, শিক্ষা ও যুক্তি এবং অনুসন্ধান, উদ্ঘাটন, অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের ওপর নির্মাণ করেছে। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের ক্ষেত্রে জ্ঞানরাশির প্রাণশক্তিই প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে ইসলাম জ্ঞান ও জ্ঞানীদের সমৃদ্ধ করেছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে, যেখানে প্রতিটি প্রাপ্তি ও অর্জন মানবমণ্ডলীকে

---

[১২৭]. সুরা আর-রহমান : আয়াত ৭-৯।

জীবনে ইসলামের পয়গাম বাস্তবায়নে সহায়তা করে। তা হলো, পৃথিবীকে আবাদ করা এবং তার কল্যাণকর বস্তুরাশি ও ধনভান্ডার থেকে উপকৃত হওয়া।

'ইলম' বা 'জ্ঞান' শব্দটি আল্লাহ তাআলার কিতাবে ও রাসুলের সুন্নাহে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এর সঙ্গে কোনো শর্ত বা ক্ষেত্র নির্দেশ করা হয়নি। সুতরাং জমিনের আবাদ ও পৃথিবীর কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিটি উপকারী জ্ঞানই এর অন্তর্ভুক্ত..। যেসব জ্ঞানের উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ এবং এই গ্রহে মানব-প্রতিনিধিত্বের দায়দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন তা অধিকাংশ সময় জ্ঞানের দুটি শাখাকে বুঝিয়ে থাকে—শরয়ি জ্ঞান ও জীবনমুখী জ্ঞান..। জ্ঞানীদের জন্য যা-কিছু প্রশংসা করা হয়েছে তা প্রত্যেক জ্ঞানীর জন্যই প্রযোজ্য, যিনি তার জ্ঞানের দ্বারা মানবজাতির উপকার করেছেন। চাই তা শরয়ি জ্ঞান হোক, অথবা জীবনমুখী জ্ঞান। ইসলামি সভ্যতার ইতিহাস এ ব্যাপারে যথার্থ বিবরণ পেশ করেছে। আমি এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে জীবনমুখী জ্ঞানবিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান ও উদ্ভাবন প্রসঙ্গে যা-কিছু বলব তা সম্ভবত এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাক্ষী ও উত্তম পরিচায়ক হবে।

মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যের এই নীতি সেসব সভ্যতার জন্য এক বিরুদ্ধ ব্যাপার, যেখানে ধর্ম চিন্তাশক্তি ও কর্মসামর্থ্যের ওপর খড়ুগ উঁচিয়ে রেখেছে এবং জ্ঞান, চিন্তা ও যুক্তির প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রেক্ষিতে সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল হলো কুরআনের জুমার নামায-সংক্রান্ত আয়াতগুলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি করো।

> নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[১২৮]

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে মিলন ঘটানোর ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার কাজ এটিই। উপর্যুক্ত আয়াত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে তা (দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে মিলন-সাধন) এমনকি জুমার দিনেও পরিপালিত হবে : নামাযের আগে বেচাকেনা ও দুনিয়াবি কাজ করা; তারপর কেনাবেচা ও অনুরূপ দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো ত্যাগ করে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযের প্রতি ধাবিত হওয়া; তারপর নামায শেষে পুনরায় জমিনে ছড়িয়ে পড়া এবং রিযিক অন্বেষণ করা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল না হওয়া। এটাই সফলতা ও মুক্তির মূল ভিত্তি। এখানে আল্লাহর অনুগ্রহের অর্থ হলো রিযিক ও জীবিকা।

আরেকটি আয়াত দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড ও আখিরাতের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

> আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।[১২৯]

ইসলাম কোনো মুসলিম থেকে এটা দাবি করে না যে সে কোনো আশ্রমে সন্ন্যাসী হোক অথবা একান্ত নির্জনতায় ইবাদত করুক, যে সারারাত নামায পড়বে এবং সারাদিন রোযা রাখবে; জীবনে তার কোনো অংশই থাকবে না এবং তার কাছে জীবনের কোনো অংশ থাকবে না। বরং ইসলাম মুসলিম থেকে দাবি করে যে সে হবে জীবনোপযোগী কর্মোদ্যগী, জীবনকে নির্মাণ করবে, পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে এবং গোপনীয় ভান্ডার থেকে রিযিক অন্বেষণ করবে। ইসলামি সভ্যতার সন্তানেরা এমনই হয়ে থাকে,

---

১২৮. সুরা জুমুআ : আয়াত ৯-১০।

১২৯. সুরা কাসাস : আয়াত ৭৭।

তারা আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়াও অন্বেষণ করে, উভয় জীবনে কল্যাণ আশা করে, উভয় জাহানে সৌভাগ্য প্রত্যাশা করে।

যে ভারসাম্য ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তার আরেকটি দিক হলো উত্তম ও সংহত উপায়ে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে মিলন সাধন করা। ইসলাম একইসঙ্গে আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী ধর্ম। ইসলাম তার অনুসারীদের সবসময় পূর্ণতা ও উন্নত আদর্শের সন্ধান দেয়, কিন্তু সে নিজের মতো করে তার উপায় ও উপকরণ অন্বেষণ করে এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করে। ইসলাম কারও ওপর অন্যায়ভাবে কোনোকিছু চাপিয়ে দেয় না। এ কারণে ইসলামে চিন্তাকে বাস্তব থেকে এবং আদর্শবাদকে বাস্তববাদ থেকে পৃথক করা কঠিন। বরং এ দুটি মিলিয়ে মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতি যা তাদের সামনে কল্যাণের পথকে আলোকিত করে তোলে এবং আচার-আচরণের নীতিমালা ও লেনদেনের আইনকানুনকে চিত্রিত করে তোলে।

আদর্শবাদের প্রেক্ষিতে ইসলামি সভ্যতা মানুষকে সহজতা ও স্বস্তি এবং সুখ ও প্রশান্তির সর্বোচ্চ মানদণ্ডের সম্ভবপর শিখরে পৌঁছে দিতে আকাঙ্ক্ষী। বাস্তববাদের প্রেক্ষিতে ইসলামি সভ্যতা মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তার স্বভাব ও গঠনপ্রকৃতি, তার শক্তি ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা এবং তার জীবনের বাস্তবিকতার প্রতি লক্ষ রাখে।

ইসলামি সভ্যতায় কল্পনাপ্রসূত আদর্শবাদের–স্বপ্নের জগৎ ছাড়া কোথাও যার অস্তিত্ব নেই–কোনো স্থান নেই। যেমন প্লেটো অভিজাত নগরের যে পরিকল্পনা প্রদান করেছেন, যা মানবীয় বাস্তবিকতা থেকে সহস্র মাইল দূরে, যা সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত এবং যাতে রয়েছে ভ্রান্তি ও ত্রুটি।

একইভাবে ইসলামি সভ্যতায় বাস্তববাদিতা এমন নয় যে, বাস্তবিক ব্যাপারগুলোর অবস্থা ও অবস্থান যা-ই হোক না কেন তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। যেকোনোভাবে, যেকোনো রঙে-ঢঙে জীবনের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য বা বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়ার জন্য ইসলামি সভ্যতা যে তার মূলনীতিগুলো সহনীয় ও নমনীয় করে নেবে তাও নয়। মানুষের প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও প্রথাগুলো লালন করার জন্য অথবা তাদের পশ্চাৎপদ বিশৃঙ্খল অবস্থা ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ অন্ধ অনুসরণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার জন্য ইসলামি সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেনি। জাহিলিয়াতের সমস্ত রূপ ও প্রথাকে নিরর্থক করা এবং নিজের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে প্রবর্তন করার জন্য

ইসলামি সভ্যতা বিনির্মিত হয়েছে। এ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ও গৌণ বিষয়গুলোতে মানুষের বাস্তবিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতেও পারে, নাও হতে পারে।

আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতার যে সর্বনিম্ন স্তর বা মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে তার থেকে বেরিয়ে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ, মুসলিমের ব্যক্তিত্বকে একটি বোধগম্য পদ্ধতি ও পন্থায় গড়ে তোলার জন্য এরূপ মানদণ্ড আবশ্যক এবং তা মুসলিমরূপে গণ্য হওয়ার জন্য কোনো মুসলিম থেকে গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন স্তর। এই মানদণ্ড যে পথ ও কর্মের নির্দেশ দেয়, কল্যাণকর কাজের জন্য সামান্য প্রস্তুতি যার আছে এবং যে অন্যায় থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখেছে সেও ওই পথে পৌছতে পারবে এবং ওই কর্ম আঞ্জাম দিতে পারবে। ফরয ও ওয়াজিবের মতো আবশ্যক দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াবলির ওপর ভিত্তি করে এই মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব ফরয দায়িত্ব ও হারাম কাজগুলো এমনভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে যে যে-কেউ সেগুলোর দাবি ও চাহিদা পূর্ণ করতে পারে। প্রয়োজন ও জটিলতার সময়ে শরিয়ত ছাড় দিয়েছে এবং পরিমাণ ও পদ্ধতি বর্ণনা করে দিয়েছে।

এই যে বাধ্যতামূলক মানদণ্ড—যেখানে পৌছা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক—এর পাশাপাশি শরিয়ত আরেকটি মানদণ্ড (স্তর) স্থির করেছে, যা আগেরটির চেয়ে উঁচু পর্যায়ের ও ব্যাপক। শরিয়ত এই মানুষকে মানদণ্ডের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এতে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটি তাদের কাছে শোভনীয় করে তুলেছে। সকল নফল, মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় ও সুন্নাত কাজসমূহ এই মানদণ্ডের (স্তরের) অন্তর্ভুক্ত। শরিয়ত মানুষকে এগুলো পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। একইভাবে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় এবং সন্দেহযুক্ত কাজগুলোও এই মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে পরহেয করে চলা এবং এগুলো থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই উচিত।

কিন্তু উচ্চতর স্তরে ও মানদণ্ডে পৌছা প্রচণ্ড পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার, প্রতিটি মানুষের জন্য তা সহজ নয়। বরং তা বিশেষ যোগ্যতা ও বিশেষ প্রস্তুতির ওপর নির্ভরশীল, তা স্বল্প সংখ্যক মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এ কারণে ইসলাম উচ্চতর স্তরটিকে সকল মানুষের ওপর চূড়ান্তরূপে ফরয করে

দেয়নি। বরং একে মানুষের সামনে চিত্রিত করে তুলে ধরেছে এবং শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সুযোগ দিয়েছে।

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾–'আল্লাহ তাআলা কারও ওপর তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।'[১৩০] প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী যা-কিছু ভালো কাজ করবে তা তার থেকে গৃহীত হবে।

﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾–'প্রত্যেকের স্তর নির্ধারিত হবে তার আমল অনুযায়ী।'[১৩১]

সবশেষে যে ভারসাম্যের কথা বলতে চাই তা হলো অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য। ইসলামি সভ্যতা মনে করে যে, কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর অধিকার অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়া কিছু নয়। বিচারপ্রার্থীদের অধিকার মানে বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শ্রমিকদের অধিকার মানে মালিকদের আবশ্যক কর্তব্যসমূহ। সন্তানসন্ততির অধিকার মানে মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এইভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায় করা হয়।

ইসলাম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মাঝে অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রতি মনোযোগী রয়েছে। এতে ব্যক্তিগত প্রবণতা ও সামাজিক কল্যাণকামিতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয়। একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সমাজের অন্যান্য সদস্যের জীবনের চেয়ে পৃথক বা স্বাধীন নয়। বরং সে সামাজিক পরিমণ্ডলে বসবাস করতে, কল্যাণ ও উপকার বিনিময়ে এবং সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য। এ সকল অনুষঙ্গের ফলে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামি শরিয়া সেগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে।

এভাবেই ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

---

[১৩০]. সুরা বাকারা : আয়াত ২৮৬।

[১৩১]. সুরা আনআম : আয়াত ১৩২ ও সুরা আহকাফ : আয়াত ১৯

চতুর্থ অনুচ্ছেদ
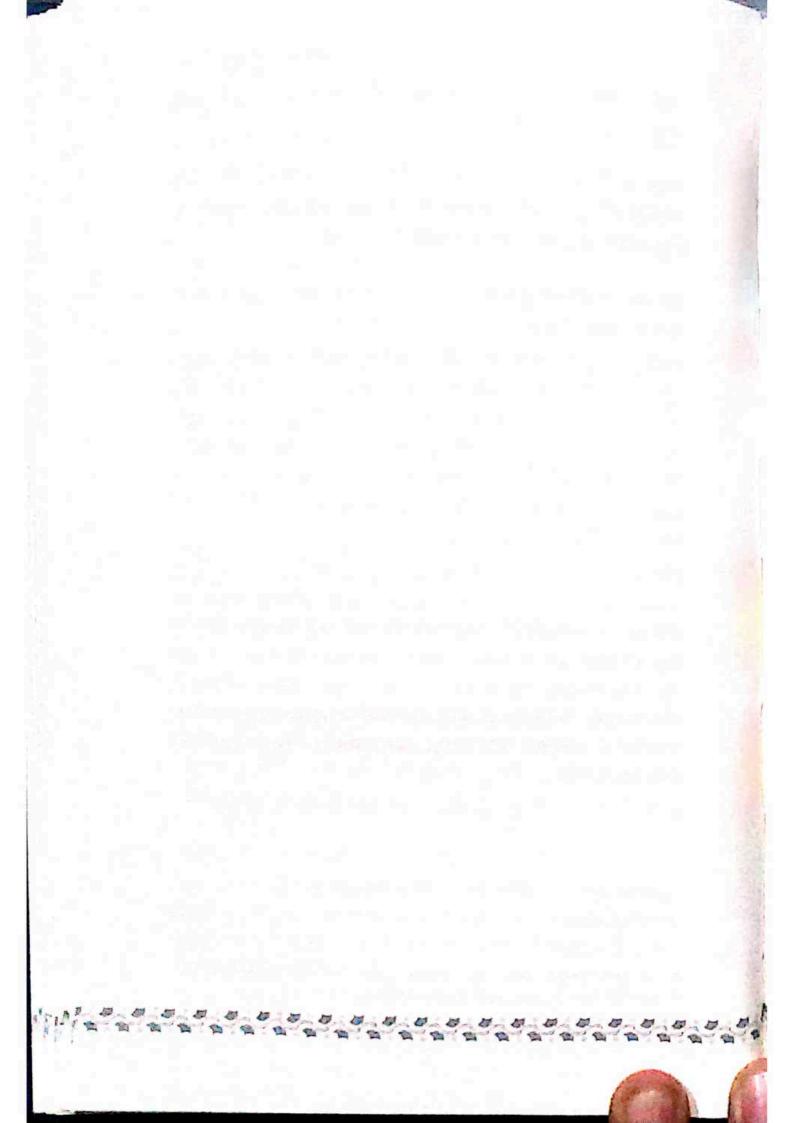
নৈতিকতা

বাস্তবিক অর্থেই নৈতিকতা ইসলামি সভ্যতার প্রাচীরস্বরূপ। নৈতিকতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামি সভ্যতা। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মূলনীতিগুলো জীবনের সব ধরনের ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্নমুখী তৎপরতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ব্যক্তির চালচলন, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিষ্টাচার ও নৈতিকতার পূর্ণতাদানের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»

সচ্চরিত্রতা ও নৈতিকতার পূর্ণতাদানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।[১৩২]

এই কয়েকটি শব্দ দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নবীরূপে প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল তাঁর উম্মত ও সকল মানুষের অন্তরে নৈতিকতার চেতনাকে বদ্ধমূল করে দেওয়া। তিনি চেয়েছিলেন মানবমণ্ডলী উত্তম চরিত্রের নীতির আলোকে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিক, কারণ, চারিত্রিক নীতির উর্ধ্বে আর কোনো নীতি নেই।

শাসন, জ্ঞান, বিধিবিধান, যুদ্ধ, শান্তি, অর্থনীতি, পরিবার.. অর্থাৎ ইসলামি সভ্যতার সব ক্ষেত্রে নৈতিক দিকগুলোকে আদর্শিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে মান্য করা হয়। এই জায়গাটায় ইসলামি সভ্যতা এক অনন্য

---

১৩২. আল-হাকিম কর্তৃক আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, *মুসতাদরাক*, কিতাব : তাওয়ারিখুল মুতাকাদ্দিমিন মিনাল আম্বিয়া ওয়াল-মুরসালিন এবং কিতাব : আয়াতু রাসুলিল্লাহিল লাতি হিয়া দালাইলুন নুবুওয়া, হাদিস নং ৪২২১। আল-হাকিম বলেছেন, হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ, যদিও তিনি হাদিসটি সংকলন করেননি। যাহাবি তাকে সমর্থন করেছেন। বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ২০৫৭১।

উচ্চতায় পৌঁছেছে যা আগে ও পরে আর কোনো সভ্যতার ভাগ্যে জোটেনি। নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শন ইসলামি সভ্যতাকে মানবজাতির জন্য অনন্য ও অবিমিশ্র সৌভাগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও অন্যসব সভ্যতাও মানুষের সুখ-সৌভাগ্যের ঠিকাদারি নিয়েছে।[১৩৩]

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতার উৎস হলো ওহি (আল্লাহর প্রেরিত বাণী)। এ কারণে তা প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ এবং স্থান ও কাল, লিঙ্গ ও গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য উপযোগী উন্নত আদর্শ। কিন্তু তাত্ত্বিক নৈতিকতার উৎস ভিন্ন। তা হলো মানুষের সীমাবদ্ধ বিবেক ও বুদ্ধি অথবা যার ওপর সমাজের মানুষ ঐকমত্য পোষণ করে। একে প্রথা বলা হয়। তাই তো এক সমাজের তাত্ত্বিক নৈতিকতা আরেক সমাজ থেকে ভিন্ন এবং একেকজন চিন্তাবিদের কাছে একেক রকম।

ইসলামি নৈতিকতার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার উৎস হলো আল্লাহর তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি ও উপলব্ধি। তাত্ত্বিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার উৎস হলো কেবল বিবেক অথবা করণীয় সম্পর্কে উপলব্ধি অথবা রাষ্ট্রের অবশ্যপালনীয় আইন। এ নৈতিকতাই সভ্যতার চলমানতা ও স্থায়িত্বের রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয় এবং একইসঙ্গে তা সভ্যতাকে বিকৃতি, হোঁচট ও অধঃপতন থেকে রক্ষা করে।

ইসলামি সভ্যতার ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রধান দিক হলো এর মানবিকতা। মানুষই ইসলামি সভ্যতায় মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং মানবিক কল্যাণ ও সম্মান সুরক্ষায় দৃঢ় খুঁটি। কারণ, জীবন ও সভ্যতা বিনির্মাণের প্রেক্ষিতে মানুষকেই দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। পবিত্র কুরআনে মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের ওপর গুরুত্বারোপ করে একের-পর-এক আয়াত এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

---

১৩৩. মুস্তফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৩৭।

আর নিঃসন্দেহে আমি আদমসন্তানদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের আমি উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের সবার ওপর আমি মানুষকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১০৪]

আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ, সৃষ্টির পর থেকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত মানুষের গঠন-উপাদান একই এবং মানুষের অন্যান্য পার্থক্য তার গঠন-উপাদানের কোনোকিছুকে পরিবর্তন করে না। প্রতিটি মানুষকে একই 'মূল' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই মর্যাদার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা দান করেছেন। এই বিশিষ্টতা ও মর্যাদা অন্য সৃষ্টিকুলের নেই। এই মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য বিশেষ সুরক্ষা। এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিপ্রায় ও স্বাধীনতার সুরক্ষা দিয়েছেন এবং ব্যক্তিসত্তা, সম্পদ ও সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রে তার অধিকারেরও সুরক্ষা দিয়েছেন।

এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামি সভ্যতা অনন্য ও অসাধারণ। ইসলামি সভ্যতা বিশ্বজনীন এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা অবলম্বনও ইসলামি সভ্যতার অনন্যতাকে ফুটিয়ে তোলে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিবেচনায়ও ইসলামি সভ্যতা তুলনারহিত। এ সকল কারণে ইসলামি সভ্যতা কোনো জাতীয়তাবাদী সভ্যতা নয়, কোনো বর্ণবাদী সভ্যতা নয় এবং মানব-প্রকৃতির বিরুদ্ধও নয়।

যে-সকল বৈশিষ্ট্যে ইসলামি সভ্যতা বিশিষ্ট ও অনন্য তা সত্য-সরল দ্বীনে ইসলামের মূলনীতি থেকে স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার চরিত্র লাভ করেছে। কারণ, ইসলামি সভ্যতা ইসলামের মূলনীতি থেকে উৎসারিত এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে ইসলামি সভ্যতা এক স্বকীয় ও অনন্য মৌলবস্তুর রূপ পরিগ্রহ করেছে, যার পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে না, যদিও কালের বিবর্তন সাধিত হয় এবং নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

---

১০৪. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০।
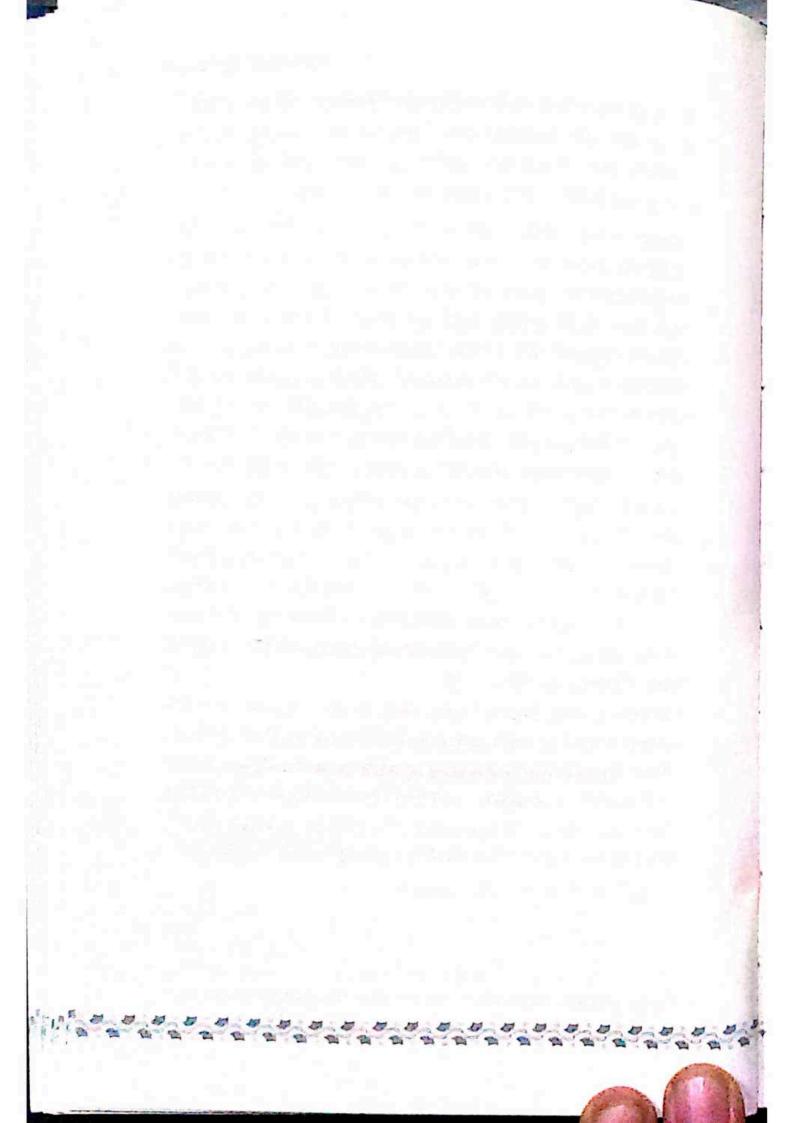
দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

মানবসভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক দিক বিবেচনা করা হয় এবং একইভাবে প্রতিটি সভ্যতার মৌলবস্তু ও ভিত্তি গণ্য করা হয়। ইতিহাস ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি সভ্যতার স্থায়িত্ব ও টিকে থাকার রহস্য নিহিত থাকে তার নৈতিকতা ও মূল্যবোধে। এই দিকটি যদি কোনোদিন অন্তর্হিত হয়ে যায় তাহলে মানুষ তার অন্তর্নিহিত উত্তাপ ও চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে, যা জীবন ও অস্তিত্বের আত্মা। একইসঙ্গে তার চিত্ত থেকে প্রেম ও দয়া মুছে যাবে, তার অস্তিত্ব ও মানস দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আঞ্জাম দিতে পারবে না। শুধু তাই নয়, মানুষ তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হয়ে পড়বে, আত্মার তাৎপর্য তো বটেই। বস্তুগত শেকলজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে, কোনোভাবেই তা থেকে মুক্তির পথ পাবে না।

আফসোসের ব্যাপার হলো, পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলো—ইতিপূর্বে যেগুলোর কথা বর্ণনা করেছি—এবং সামসময়িক সভ্যতা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বড় কোনো অবদান রাখেনি এবং স্পষ্ট ভূমিকা পালন করেনি। পশ্চিমাবিশ্বের পণ্ডিতবর্গ ও চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন। ব্রিটিশ দার্শনিক জোড[১০৫] বলেছেন,

---

১০৫. সিরিল এডউইন মিচিসন জোড (Cyril Edwin Mitchinson Joad, সংক্ষেপে : C. E. M. Joad) : জন্ম ১২ আগস্ট ১৮৯১ এবং মৃত্যু ৯ এপ্রিল ১৯৫৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিবিসি রেডিয়োতে 'দা ব্রেইন ট্রাস্ট' নামের একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি দর্শনকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং মানুষের কাছে তারকারূপে বরিত হন। তিনি একশরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেছেন। কয়েকটি হলো : ১. *The Story of Civilization* (1931) ২. *The Story of Indian Civilization* (1936), ৩. *Essays in Common-Sense Philosophy* (1919) ৪. *Guide to the Philosophy of Morals and Politics* (1938), ৫. *Philosophy For Our Times* (1940)।-অনুবাদক

আধুনিক সভ্যতায় শক্তি ও নৈতিকতায় ভারসাম্য নেই। জ্ঞান থেকে নৈতিকতা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞান (প্রকৃতিবিজ্ঞান) আমাদের ভয়ংকর শক্তি দিয়েছে; কিন্তু আমরা এই শক্তিকে বালকসুলভ চিন্তাভাবনা ও পাশবিক অবিবেচনার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছি। কেন এই অধঃপতন? কারণ, মানুষ বিশ্বজগতে তার অবস্থানের বাস্তবতা বুঝতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছে এবং মূল্যবোধের জগৎ অর্থাৎ কল্যাণকামিতা, সততা, অধিকারচেতনা ও সৌন্দর্যবোধকে অস্বীকার করেছে।[১৩৬]

অ্যালেক্সিস ক্যারেল[১৩৭] বলেছেন,

আমরা আধুনিক নগরীতে এমন মানুষ খুব কম দেখি যারা নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করেন। অথচ সচ্চরিত্রতা ও নৈতিকতার সৌন্দর্য জ্ঞান ও শাস্ত্র থেকে অনেক উর্ধ্বে এবং তা সভ্যতার ভিত্তি।[১৩৮]

সত্য এটাই যে, মুসলিমদের সভ্যতা ছাড়া অন্য কোনো সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দিকটি তার অধিকার পায়নি। ইসলামি সভ্যতা মৌলিকভাবেই নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের নবীকে বিশেষভাবে সচ্চরিত্রতা ও নৈতিক গুণাবলির পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। অথচ অন্যান্য জাতি ও সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ছিল খণ্ডিতরূপে, বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত।

---

১৩৬. আনওয়ার আল-জুনদি, *মুকাদ্দিমাতুল উলুমি ওয়াল মানাহিজ*, খ. ৪, পৃ. ৭৭০।

১৩৭. অ্যালেক্সিস ক্যারেল (Alexis Carrel) : অ্যালেক্সিস ক্যারেল ছিলেন একজন খ্যাতনামা ফরাসি চিকিৎসাবিদ। ফ্রান্সের লিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শারিরতত্ত্ববিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীকালে নিউইয়র্কের রকফেলার ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চের সদস্য মনোনীত হন। রক্তপ্রবাহ-সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি *Man, The Unknown* (মূল ফরাসি : *L'Homme, cet inconnu*) নামে একটি যুগান্তরকারী গ্রন্থ রচনা করেন। অ্যালেক্সিস ক্যারেল ১৮৭৩ সালের ২৮ জুন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৪ সালের ৫ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।-অনুবাদক

১৩৮. অ্যালেক্সিস ক্যারেল, *Man, The Unknown*, আরবি অনুবাদ, الإنسان ذلك المجهول, অনুবাদক আদিল শাফি, অনুবাদগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৫৩।

এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কখনো কালের ধারাবাহিকতায় চিন্তার যে বিকাশ ঘটেছিল তার ফল ও পরিণতি ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যাদেশ এবং ইসলামের রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়ত। সুতরাং গত পনেরোশ বছর ধরে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎস ছিল ইসলামি শরিয়ত।

এই অধ্যায়ে আমরা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মুসলিমগণ যে অবদান রেখেছেন তার কিছু দিক সীমিতরূপে পেশ করব। এ বিষয়গুলো মানবসভ্যতার মৌলবস্তুকে ফুটিয়ে তুলবে। এই অধ্যায়ে বিষয়গুলোর পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা কেবল প্রারম্ভিক বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করব, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যাব না। নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলো রয়েছে এই অধ্যায়ে—

প্রথম পরিচ্ছেদ : অধিকার
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পরিবার
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সমাজ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুসলিম এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
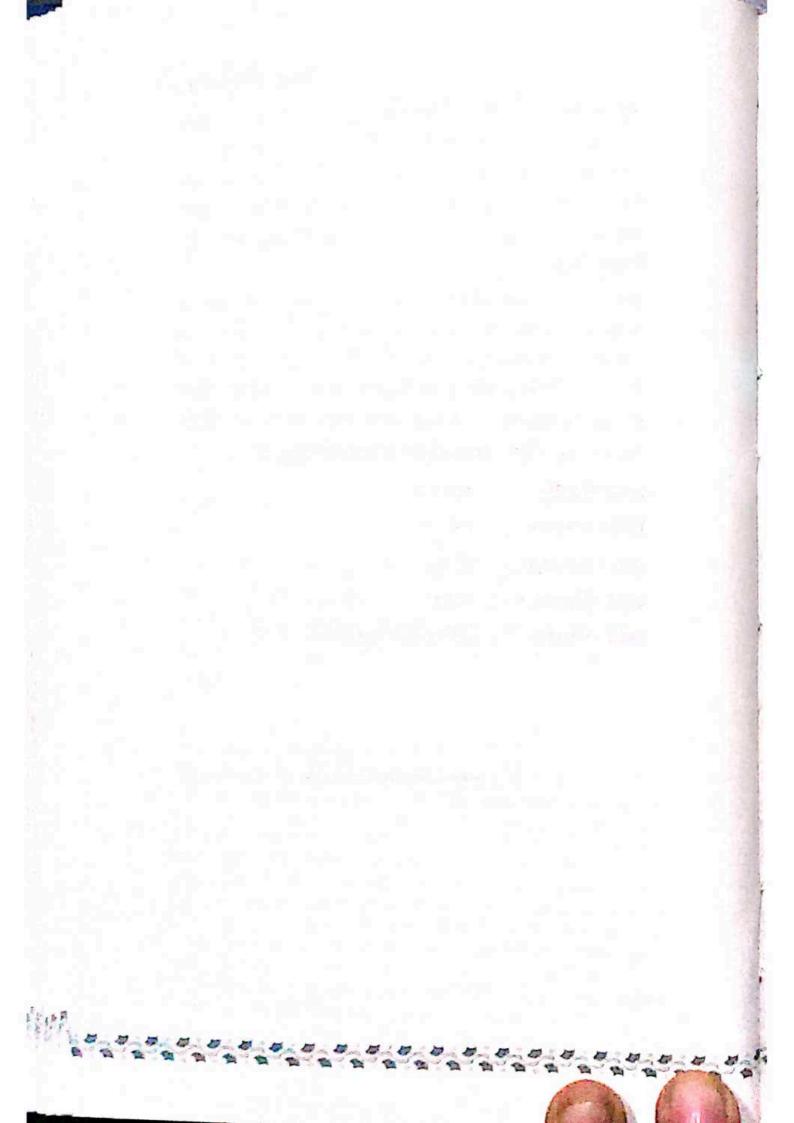
প্রথম পরিচ্ছেদ

অধিকার

পাশ্চাত্য দার্শনিক নিৎশে বলেছেন, অক্ষম দুর্বলদের ধ্বংস হয়ে যাওয়াই অনিবার্য! মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের যে প্রেম তার প্রথম ও প্রধান মূলনীতিই এটি। এভাবে ধ্বংস হওয়ার জন্য দুর্বলদের সহায়তা করাও উচিত।[১০৯]

কিন্তু ইসলামের দর্শন ও শরিয়ত কখনোই মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হয়নি। সকল মানবসন্তানের জন্য একগুচ্ছ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্ণ, ভাষা ও জাতের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে পার্থক্য করেনি। যে বলয়ে মানবসন্তানের ক্রিয়াকলাপ সচল থাকে তাও ইসলামি দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শরিয়তের কর্তৃত্বের মাধ্যমে অধিকারগুলোর সুরক্ষা প্রদান করবে, সেগুলো বাস্তবায়িত করবে এবং এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি বিধান করবে—এগুলোও ইসলামের দর্শনের মৌলিক কথা। নিম্নবর্তী অনুচ্ছেদসমূহের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : মানবাধিকার
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নারীর অধিকার
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কর্মজীবী ও শ্রমিকদের অধিকার
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : এতিম, নিঃস্ব ও বিধবার অধিকার
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : সংখ্যালঘুদের অধিকার
সপ্তম অনুচ্ছেদ : জীবজন্তুর অধিকার
অষ্টম অনুচ্ছেদ : পরিবেশের অধিকার

১০৯. মুহাম্মাদ আল-গাযালি, *রাকায়িযুল ঈমান বাইনাল আকলি ওয়াল-কলব*, পৃ. ৩১৮।
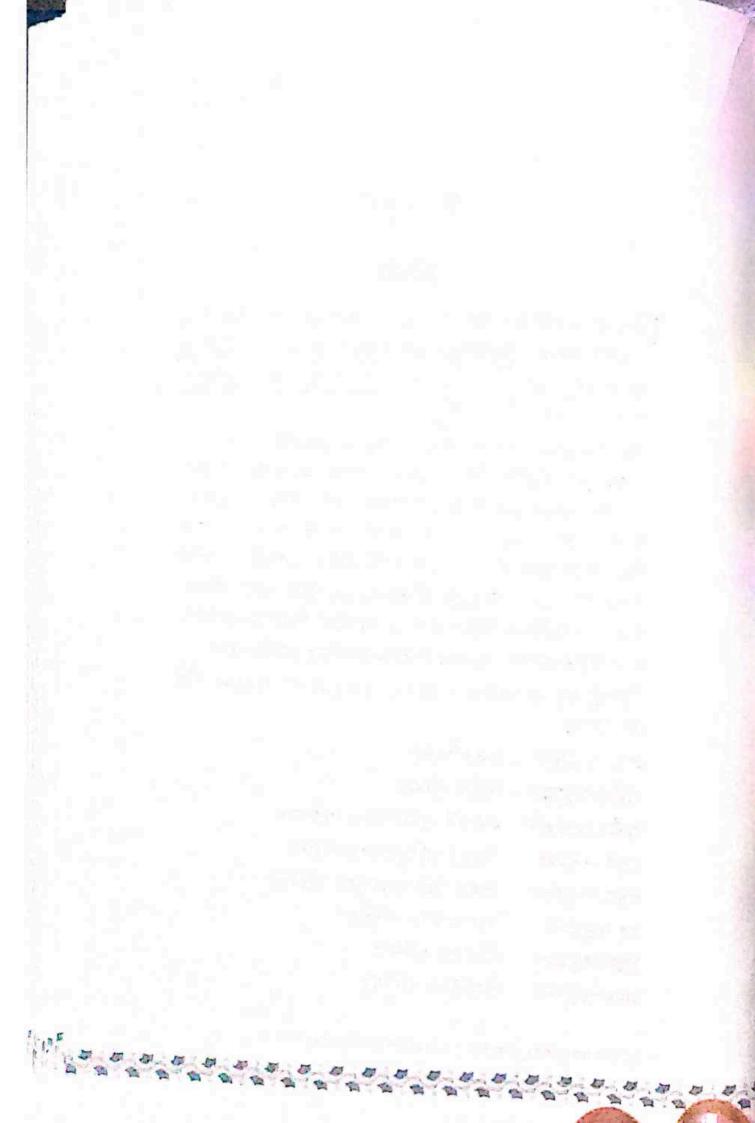
প্রথম অনুচ্ছেদ

১. মানবাধিকার

ইসলাম মানুষের প্রতি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

> আর নিঃসন্দেহে আমি আদমসন্তানদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে আমি উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[১৪০]

এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে মানবাধিকারকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই অধিকারগুলোর সামগ্রিকতা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তাগত সব ধরনের অধিকার ইসলামে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে এ সকল অধিকার বর্ণ, ভাষা ও জাত নির্বিশেষে মুসলিম ও অমুসলিম সকল মানুষের জন্য ব্যাপৃত। এ অধিকারগুলোকে বাতিল করার বা পরিবর্তন করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এগুলো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রত্যাদেশ ও শিক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে এসব অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই ভাষণ ছিল মানবাধিকারের সামগ্রিক স্বীকৃতি। তিনি বলেন,

---

১৪০. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০।

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ»

তোমাদের জীবন, সম্পদ (ও সম্মান) তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন, তোমাদের এই মাসে এই শহরে এই দিন পবিত্র। এই বিধান আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের মিলিত হওয়া পর্যন্ত।[১৪১]

নবীজির এই ভাষণ সামগ্রিক মানবাধিকারের ওপর জোর দিয়েছে, বিশেষ করে রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত-আবরুর পবিত্রতা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে সকল মানবাত্মাকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন এবং মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকারের সুরক্ষার কথা বলেছেন, তা হলো জীবনের বা বেঁচে থাকার অধিকার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বড় বড় পাপাচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বললেন, 'আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করা... কোনো মানুষকে হত্যা করা..।'[১৪২] হাদিসে নফস বা মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণভাবে, অন্যায় হত্যাকাণ্ডের শিকার যেকেউ তা হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়েও বেশিকিছুর অধিকার দিয়েছেন, যেহেতু তিনি মানুষকে আত্মরক্ষার অপরিহার্য বিধান প্রদান করেছেন। তা এই যে, তিনি আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»

---

১৪১. *বুখারি*, আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস। কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : আল-খুতবাহ আইয়ামা মিনা, হাদিস নং ১৬৫৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-কাসামাহ ওয়াল-মুহারিবিন ওয়াল-কিসাস ওয়াদ-দিয়াত, বাব : তাগলিযু তাহরিমিদ-দিমা ওয়াল-আরাদ ওয়াল-আমওয়াল, হাদিস নং ১৬৭৯।

১৪২. *বুখারি*, কিতাব : আশ-শাহাদাত, বাব : মা কিলা ফি শাহাদাতিয-যুর, হাদিস নং ২৫১০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৪০০৯; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৮৮৪।

যে লোক নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে, সে জাহান্নামে সবসময় ওইভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। আর যে লোক বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে সেও জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ওইভাবে নিজ হাতে বিষপান করতে থাকবে। আর যে লোক কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, জাহান্নামে তার হাতে ওই অস্ত্র থাকবে, তার দ্বারা সে তার পেট চিরতে থাকবে।[১৪৩]

ইসলাম একইভাবে জীবনের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে এমন সব কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছে। ভয় দেখানোর জন্য বা অপমান করার জন্য অথবা আঘাত দেওয়ার জন্য, যেকোনো কারণেই এমন কাণ্ড ঘটানো হোক না কেন তা ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম। হিশাম ইবনে হাকিম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا»

আল্লাহ তাআলা ওইসব লোকদের শাস্তি দেবেন যারা দুনিয়াতে মানুষকে শাস্তি দেয়।[১৪৪]

সাধারণভাবে সকল মানুষকে সম্মানিত এবং সবার রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সবাইকে জীবনের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তারপর সকল মানুষের মধ্যে সমতার অধিকারের ওপর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি ও দল, জাতি ও গোষ্ঠী, শাসক ও প্রজা, মনিব ও চাকর, নেতা ও নেতৃত্বাধীন মানুষ সকলের মধ্যে সমতার অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সমতার অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো

---

১৪৩. *বুখারি*, কিতাব : আত-তিব্ব, বাব : শুরবুস সাম্মি ওয়াদ-দাওয়ায়ি বিহি ওয়া বিমা ইয়ুখাফু মিনহু ওয়াল-খবিস, হাদিস নং ৫৪৪২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : গিলযু তাহরিমি কাতলিল ইনসান নাফসাহু.., হাদিস নং ১০৯।
ব্যাখ্যা : আত্মহত্যাকারী স্থায়ী জাহান্নামি নয়। যদি সে ঈমানের সঙ্গে আত্মহত্যা করে, তাহলে পরে একসময় জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। তবে এই হাদিসে خالدا مخلدا-এর অর্থ হলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। যেমন আমরা দোয়া করার সময় বলে থাকি خلد الله ملكه, অর্থাৎ, আল্লাহ তার রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন। অথবা, এখানে ওই ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে আত্মহত্যার পূর্বে তার ঈমানকেও ত্যাগ করে ফেলেছে।-অনুবাদক

১৪৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব : আল-ওয়ায়িদুশ শাদিদু লিমান আযযাবান নাসা বিগাইরি হাক্ক, হাদিস নং ২৬১৩; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩০৪৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৫৩৬৬।

শর্ত নেই, কোনো ব্যতিক্রম নেই। বিধিবিধান আরোপের ক্ষেত্রে আরব ও অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সাদা ও কালো এবং শাসক ও প্রজার মধ্যেও কোনো ব্যবধান নেই। মানুষের সম্মান ও মর্যাদার মানদণ্ড কেবল তাকওয়া ও খোদাভীরুতা। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى...»

হে লোকসকল, জেনে রাখো, তোমাদের প্রতিপালক এক এবং তোমাদের পিতাও একজন। জেনে রাখো, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর গৌরবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং গৌরবর্ণের ওপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে...।[১৪৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে সমতার মূলনীতিকে বাস্তবিক রূপ দিয়েছেন তা আমরা দেখতে পারি এবং তাঁর মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পারি। আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু যর রা. বিলাল রা.-কে তার মায়ের নাম ধরে কটু কথা বললেন। বললেন, হে কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের বেটা! বিলাল রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং তাঁকে ঘটনাটা জানালেন। শুনে তিনি খুব রাগান্বিত হলেন। কিছুক্ষণ পর আবু যর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। আর তিনি অভিযোগ সম্পর্কে জানতেন না। তাকে দেখতে পেয়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আবু যর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, নিশ্চয় আপনার কাছে আমার ব্যাপারে কোনো সংবাদ পৌঁছেছে, এ কারণে আপনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

---

১৪৫. আহমাদ, হাদিস নং ২৩৫৩৬; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। *তাবারানি*, হাদিস নং ১৪৪৪৪; হাইসামি বলেছেন, এ হাদিসের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারীদের শর্তে উত্তীর্ণ। *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৩ খ. পৃ. ৩৬৬।

«أَنْتَ الَّذِيْ تُعَيِّرُ بِلَالًا بِأُمِّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَحْلِفَ مَا لِأَحَدٍ عَلَيَّ فَضْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَطَفِّ الصَّاعِ»

তুমি বিলালকে তার মায়ের নাম তুলে কটু কথা বলেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যিনি মুহাম্মাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর কসম, (বা আল্লাহ যেমন চান তেমন কসম খেয়ে বললেন,) আমল ব্যতীত আমার কাছে কারও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর তোমরা হলে সমপর্যায়ের ভাই ভাই।[১৪৬]

সমতার অধিকারের সঙ্গে আরও একটি অধিকার যুক্ত রয়েছে, তা হলো ইনসাফ ও ন্যায়বিচার। এ ব্যাপারে একটি অনুপম দৃষ্টান্ত রয়েছে। মাখযুমি গোত্রের একজন নারীকে চুরি করার অভিযোগ সাব্যস্ত হওয়ায় হাত কাটার দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। উসামা ইবনে যায়দ রা. তার জন্য সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।[১৪৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

«فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»

নিশ্চয় পাওনাদার বা যার প্রাপ্য অধিকার রয়েছে সে তার বক্তব্য প্রদান করবে (চাইলে কড়া কথা বলবে)...।[১৪৮]

---

১৪৬. বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, পৃ. ৫১৩৫।

১৪৭. *বুখারি*, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : 'তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা...(সুরা কাহফ : আয়াত ৯), হাদিস নং ৩২৮৮; *মুসলিম*, কিতাব : হুদুদ বা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন অপরাধের দণ্ড, বাব : কাতউস সারিকিশ-শারিফ..., হাদিস নং ১৬৮৮।

মানুষের মাঝে বিচারের দায়িত্বভার যার ওপর রয়েছে বা যিনি বিচারক মনোনীত হয়েছেন তার উদ্দেশে বলেছেন,

«فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ»

যখন তোমার সামনে বাদী ও বিবাদী উভয়ে বসবে, তাদের একজনের কথা শুনে কোনো রায় দেবে না, বরং প্রথমজনের বক্তব্য যেভাবে শুনেছ, অনুরূপ অপরজনের বক্তব্যও শুনবে। তোমার কাছে মোকদ্দমার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে (ও সঠিক রায় প্রদানে) তা অধিকতর সমীচীন।[১৪৯]

একটি বিশেষ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়া অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানবরচিত কোনো বিধান এবং মানবাধিকারের কোনো ধারা সেদিকে দৃষ্টিপাত করেনি। তা হলো 'পর্যাপ্ততার অধিকার'। এর অর্থ এই যে, ইসলামি রাষ্ট্রের আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের পর্যাপ্ত জীবনোপাদান অর্জিত থাকবে। যাতে সে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে এবং তার জন্য জীবনধারণের উপযুক্ত সমতা নিশ্চিত হয়। এটা মানবরচিত বিধানগুলো জীবিকার যে ন্যূনতম সীমা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং যা মানবজীবনের সর্বনিম্ন স্তর বোঝায় তা থেকে ভিন্ন।[১৫০]

পর্যাপ্ততার অধিকার কর্মের দ্বারা অর্জিত হয়। ব্যক্তি কর্মে অক্ষম হলে যাকাত প্রদান করা হবে। মুখাপেক্ষীদের পর্যাপ্ততা পূরণ যাকাতে না কুলালে রাষ্ট্রীয় বাজেট তাদের জীবিকার এ পর্যাপ্ততা পূর্ণ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাই বলেছেন যখন তিনি ঘোষণা করেছেন,

«مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»

---

[১৪৮]. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ওয়াকালাহ, বাব : আল-ওয়াকালাহ ফি কাইদ-দুয়ুন, হাদিস নং ২১৮৩; *মুসলিম*, কিতাব : বাগান ও ফসলি জমির বর্গাচাষ, বাব : কোনো বস্তু ধার নিয়ে তার চেয়ে উত্তম বস্তু ফেরত দেওয়া, হাদিস নং ১৬০১।

[১৪৯]. *সুনানে আবু দাউদ*, আলি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আকদিয়া, বাব : কাইফাল কাদা, হাদিস নং ৩৫৮২; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩৩১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৮৮২। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি 'হাসান লি-গাইরিহি'।

[১৫০]. খাদিজা আন-নাবরাবি, *মাউসুআতু হুকুক্বিল ইনসান ফিল ইসলাম*, পৃ. ৫০৫-৫০৯।

কেউ সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের জন্য এবং কেউ ঋণ অথবা পরিবার-পরিজন ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু না রেখে মারা গেলে ওই ঋণের (ঋণ পরিশোধের) এবং পরিবার-পরিজন ও ছেলেমেয়েদের (খোরপোশের) দায়দায়িত্ব আমার ওপর।[১৫১]

এ অধিকারের ওপর জোর দিয়ে আরও বলেন,

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»

ওই লোক আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি যে পেট ভরে খেয়ে রাত যাপন করল, অথচ তার পাশে প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত এবং সে তা জানে।[১৫২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশংসা করে বলেন,

«إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»

আশআরি গোত্রের লোকজন যখন যুদ্ধের ময়দানে অনটনগ্রস্ত হয় অথবা মদিনাতে তাদের পরিবার-পরিজনের যখন খাদ্যসংকট দেখা দেয় তখন তাদের কাছে যা-কিছু থাকে তা এক কাপড়ে জড়ো করে নেয়। তারপর তা নিজেদের একটি পাত্র দ্বারা সমানভাবে বণ্টন করে দেয়। সুতরাং তারা আমার থেকে এবং আমি তাদের

১৫১. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাফসির, সুরা আহযাব, হাদিস নং ৪৫০৩; *মুসলিম*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : নামায ও খুতবা সংক্ষিপ্তকরণ, হাদিস নং ৮৬৭। উদ্ধৃত বাক্য *মুসলিম*-এর।

১৫২. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাব : সদাচার ও সম্পর্ক বজায় রাখা, হাদিস নং ৭৩০৭। তিনি বলেছেন, এই হাদিসের সনদগুলো সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিমে* তা সংকলিত হয়নি। তাকে ইমাম যাহাবি সমর্থন করেছেন। তাবারানি, *মুজামুল কাবির*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, হাদিস নং ৭৫০, উদ্ধৃত বাক্য এই কিতাবের। বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৩২৩৮।

থেকে (আমিও তাদের একজন এবং আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট)।[১৫৩]

ইসলামের কল্যাণে মানবাধিকার তার মহত্ত্বের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে তা নাগরিকদের ও যুদ্ধবন্দিদের যুদ্ধকালীন অধিকারের কথা বলে। কারণ যুদ্ধের সময়ে মানুষের প্রতিশোধস্পৃহা ও যুদ্ধংদেহি মনোভাব উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সেখানে কোনো মানবিকতা ও দয়া-মমতা থাকে না। কিন্তু ইসলামের মানবিক জীবনবিধানের ভিত্তি হলো দয়া-মায়া-মমতা। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا إِمْرَأَةً وَلَا شَيْخًا»

তোমরা কোনো শিশু, নারী ও বৃদ্ধকেও হত্যা করো না ।[১৫৪]

ইসলাম যা-কিছু মানবাধিকাররূপে স্থির করেছে ও আইন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তার কিছু উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো। তা সংক্ষিপ্তভাবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে–যা মুসলিম সভ্যতার আত্মা–প্রতিফলিত করছে।

---

১৫৩. *বুখারি*, আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : অংশীদারি, বাব : খাদ্য, পাথেয় ও দ্রব্যসামগ্রীতে অংশীদারি, হাদিস নং ২৩৫৪; *মুসলিম*, কিতাব : সাহাবাগণের মর্যাদা, বাব : আশআরিগণের মর্যাদা, হাদিস নং ২৫০০।

১৫৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : খলিফা কর্তৃক সেনাদলের আমির নির্বাচন এবং যুদ্ধের পদ্ধতি ও আচরণ সম্পর্কে তাদের উদ্দেশে উপদেশ, হাদিস নং ১৭৩১; তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৪৩১৩, উদ্ধৃতি এই গ্রন্থ থেকে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নারীর অধিকার

ইসলাম নারীকে পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার বেষ্টনে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। নারীকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছে এবং কন্যা, স্ত্রী, বোন ও মা হিসেবে সম্মান ও সদাচারের অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম প্রথমেই এই স্বীকৃতি দিয়েছে যে নারী ও পুরুষকে একই 'মূল' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾

> হে মানবসকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুইজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দেন।[১৫৫]

আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো যৌথ মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের মূলনীতির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনাকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

এসব মূলনীতির আলোকে ও নারীদের অবস্থার ব্যাপারে জাহিলি যুগের ও পূর্ববর্তী জাতিগুলোর রীতিনীতিকে অস্বীকার করে ইসলাম নারীকে যথাযথ সুরক্ষা প্রদান করেছে এবং তাকে সংহত অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো জাতির সভ্যতায় নারীজাতি এই সৌভাগ্য লাভ করেনি। ইসলাম চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে নারীর

---

১৫৫. সুরা নিসা : আয়াত ১।

অধিকার ঘোষণা ও বিধিবদ্ধ করেছে। এখন পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা এসব অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। কিন্তু তা সুদূরপরাহত!

ইসলাম শুরুতেই ঘোষণা করেছে যে, নারী মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ। তারা নারী হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি বলেন,

«إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»

নারীরাও পুরুষের অনুরূপ।[১৫৬]

এটাও প্রমাণিত আছে যে তিনি সবসময় নারীদের ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলতেন,

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

> তোমরা আমার থেকে নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ করো।[১৫৭]

বিদায়হজের ভাষণেও এই উপদেশের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেখানে তাঁর উম্মতের হাজার হাজার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

নারীর মর্যাদা ও উঁচু অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যেসব স্তম্ভ নির্মাণ করেছে তা আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই। তার আগে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে প্রাচীন জাহিলিয়াতের সময় নারীর অবস্থা কেমন ছিল এবং আধুনিক জাহিলিয়াতের যুগে কেমন আছে। যাতে আমরা নারী যে অন্ধকার যাপন করেছে এবং বর্তমান সময়ে করে চলেছে তার স্বরূপ দেখতে পাই। এতে আমাদের সামনে ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামি সভ্যতার ছায়ায় নারীর যে মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে তার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

---

১৫৬. *সুনানে তিরমিযি*, আবওয়াবুত তাহারাত (পবিত্রতা), বাব : কেউ ঘুম থেকে উঠে পরনের কাপড়ে বীর্যপাতের আর্দ্রতা দেখতে পেল, হাদিস নং ১১৩; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৩৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৬২৩৮; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৪৬৯৪।

১৫৭. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : নারীদের ব্যাপারে উপদেশ, হাদিস নং ৪৮৯০; *মুসলিম*, কিতাব : স্তন্যপান, বাব : নারীদের ব্যাপারে উপদেশ, হাদিস নং ১৪৬৮।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, আরবরা তাদের কন্যাসন্তানদের জীবন্ত পুঁতে ফেলত এবং তাদেরকে জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। এমন কাজকে পাপাচার ও নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়ে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কী কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?[১৫৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানহত্যাকে সবচেয়ে ভয়ংকর পাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম,

«أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বড় গুনাহ কোনটা? তিনি বললেন, আল্লাহর কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। বললাম, সেটা অবশ্যই জঘন্য। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটা? তিনি বললেন, তোমার সন্তান তোমার সঙ্গে খাবে এই ভয়ে সন্তান হত্যা করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, তারপর কোনটা? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।[১৫৯]

নারীদের জীবনের অধিকারকে সুরক্ষা দানে ইসলামের নির্দেশ সীমাবদ্ধ নয়, বরং কন্যাদের লালনপালন ও ভরণপোষণের ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১৫৮. সুরা তাকবির : আয়াত ৮-৯।
১৫৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : নিজের সঙ্গে খাবে এই ভয়ে সন্তান হত্যা করা, হাদিস নং ৫৬৫৫; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ৩১৮২; আহমাদ, হাদিস নং ৪১৩১।

«مَنْ بَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»

যে এ সকল কন্যাসন্তানের কারণে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, এরপর সে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়ালস্বরূপ হবে।[১৬০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের শিক্ষাদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ»

যে ব্যক্তির কাছে একজন ক্রীতদাসী আছে এবং সে তাকে উত্তমরূপে (দ্বীনের হুকুম-আহকাম) শিক্ষা দিয়েছে এবং সুন্দরভাবে আদবকায়দা শিখিয়েছে, তারপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করেছে, তবে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।[১৬১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দিন নির্দিষ্ট করে তাতে নারীদের উদ্দেশে ওয়াজ করতেন, উপদেশ দিতেন এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের নির্দেশ দিতেন।[১৬২]

মেয়েরা শিশু অবস্থা থেকে পূর্ণবয়স্কা হলে ইসলাম তাদের ইচ্ছাস্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। কারও জন্য বিয়ের প্রস্তাব এলে তাতে সমর্থন দেওয়ার অথবা তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে প্রতিটি পূর্ণবয়স্কা মেয়ের।

---

[১৬০]. *বুখারি*, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : সন্তানের প্রতি মমতা প্রদর্শন, তাকে চুমু খাওয়া ও জড়িয়ে ধরা, হাদিস নং ৫৬৪৯; *মুসলিম*, কিতাব : সদাচার, সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, বাব : কন্যাদের প্রতি সদাচারের প্রতিদান, হাদিস নং ২৬২৯।

[১৬১]. *বুখারি*, আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : দাসী গ্রহণ এবং নিজ দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করা, হাদিস নং ৪৭৯৫।

[১৬২]. আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নারীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। সুতরাং আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসিহত করলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন।' *বুখারি*, কিতাব : আল-ইলম, বাব : ইলম শিক্ষায় নারীদের জন্য কি আলাদা দিন ধার্য করা যায়?, হাদিস নং ১০১; *মুসলিম*, কিতাব : সদাচার, সম্পর্ক ও শিষ্টাচার, বাব : কারও সন্তান মারা গেলে সে ধৈর্য ধারণ করে প্রতিদানের প্রত্যাশা করল, হাদিস নং ২৬৩৩।

তাকে এমন পুরুষের কাছে গছিয়ে দেওয়া কিছুতেই বৈধ হবে না যাকে সে চায় না। এ ব্যাপারে জবরদস্তি কারও জন্য বৈধ নয়। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

বালেগা বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে তার ওলি বা অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার। আর বালেগা কুমারী থেকে তার ব্যাপারে তার নিজের মত গ্রহণ করা আবশ্যক। তার মত দেওয়া হলো চুপ থাকা।[১৬৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

«لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ»

বালেগা বিবাহিতা নারীকে তার স্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না। একইভাবে বালেগা কুমারীকেও তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাবে না। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তার অনুমতি কীভাবে বোঝা যাবে? (সে তো কথা বলবে না।) তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি।[১৬৪]

মেয়েরা যখন স্ত্রীরূপে বরিত হবে তখন ইসলাম তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার এবং তাদেরকে নিয়ে সুন্দরভাবে বসবাস করার নির্দেশ দিয়েছে। স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নারীর সঙ্গে সদাচরণ হলো পুরুষের আত্মসম্মান, মহত্ত্ব ও সৌজন্যবোধের দলিল। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের উৎসাহিত করে বলেন,

«إِذَا سَقَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْمَاءَ أُجِرَ»

---

১৬৩. *মুসলিম*, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : বিবাহে বিবাহিত নারী থেকে কথার দ্বারা এবং কুমারী থেকে মৌনতার দ্বারা সম্মতি গ্রহণ, হাদিস নং ১৪২১।

১৬৪. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : পিতা বা অন্য কেউ বিবাহিতা নারী ও কুমারীকে তাদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবে না, হাদিস নং ৪৮৪৩।

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে পানি পান করায়, সে প্রতিদান পাবে।[১৬৫]

আবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে বলেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ : الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ»

হে আল্লাহ, আমি দুই প্রকার দুর্বলের অধিকার (নষ্ট করা) নিষিদ্ধ করেছি, তারা হলো এতিম ও নারী।[১৬৬]

এই ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বাস্তবিক আদর্শ। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে চূড়ান্ত কোমল ও সহৃদয় আচরণ করতেন। এ বিষয়ে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ আন-নাখয়ি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আয়িশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি জবাব দিলেন,

«كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

রাসুলুল্লাহ পারিবারিক কাজ করতেন। অর্থাৎ পরিবারকে সেবা দিতেন। আর যখন নামাযের সময় হতো তখন নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।[১৬৭]

স্ত্রী যদি তার স্বামীকে অপছন্দ করতে শুরু করে এবং তাদের মধ্যে বনিবনা না হয় এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে ইসলাম তাকে স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করার অধিকার দিয়েছে। এটাকে 'খুলআ' বিচ্ছেদ বলা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত,

---

১৬৫. *আহমাদ*, ইরবায ইবনে সারিয়া থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ১৭১৯৫। শুআইব আরনাউত বলেছেন, সহিহ।

১৬৬. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৩৬৭৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ৯৬৬৪। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ শক্তিশালী। *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ২১১, তিনি বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ, যদিও তিনি তা সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবি '*তালখিস*'-এ বলেছেন, হাদিসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্ত পূরণ করেছে। *বাইহাকি*, হাদিস নং ২০২৩৯।

১৬৭. *বুখারি*, কিতাব : আল-জামাআত ওয়াল-ইমামাত, বাব : মান কানা ফি হাজাতি আহলিহি ফা উকিমাতিস-সালাহ ফাখারাজ, হাদিস নং ৬৪৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৪২৭২; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ২৪৮৯।

তিনি বলেন, সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি দ্বীন ও চরিত্রের কারণে সাবিতের ওপর ঘৃণা পোষণ করি না, বরং আমি কুফরির ভয় করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি তার বাগান তাকে ফিরিয়ে দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ফিরিয়ে দেবো। সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী তার বাগান ফিরিয়ে দিলেন এবং তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন।[১৬৮]

ইসলাম পুরুষের মতোই নারীদের সম্পদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও একচ্ছত্র মালিকানার অধিকার দিয়েছে। তার ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে, ভাড়া দেওয়ার ও ভাড়ায় গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, উকিল নিযুক্ত করার ও হেবা করার অধিকার রয়েছে। তার বুদ্ধিমত্তা ঠিক থাকলে এসব ব্যাপারে তার ওপর কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা বা বাধা আরোপ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

> এবং তাদের মধ্যে ভালো-মন্দের বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে।[১৬৯]

নারীদের মালিকানার স্বাধীনতাই এই আয়াতের ব্যাখ্যা।

উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রা. একজন মুশরিককে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তার ভাই আলি রা. তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত ছিল এরূপ,

﴿قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ﴾

> হে উম্মে হানি, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।[১৭০]

---

১৬৮. *বুখারি*, কিতাব : আত-তালাক, বাব : খুলআ তালাক ও এর পদ্ধতি, হাদিস নং ৪৯৭৩; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬১৩৯।

১৬৯. সুরা নিসা : আয়াত ৬।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হানিকে শান্তির অবস্থায় ও যুদ্ধাবস্থায় অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন।

ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামি সভ্যতার ছায়াতলে মুসলিম নারীরা এভাবেই সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে।

---

[১৩০]. *বুখারি*, উম্মে হানি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, আবওয়াবুল জিযয়া ওয়াল-মুওয়াদাআ, বাব : নারী কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান, হাদিস নং ৩০০০; *মুসলিম*, কিতাব : সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কাসরুহা, বাব : ইসতিহবাবু সালাতিদ-দুহা, হাদিস নং ৩৩৬।

৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ

কর্মজীবী ও শ্রমিকদের অধিকার

ইসলাম গৃহকর্মী ও শ্রমিকদের মর্যাদা প্রদান করেছে, তাদের অবস্থান বিবেচনা করেছে, তাদের সম্মানিত করেছে এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পূর্ববর্তী কোনো কোনো সমাজব্যবস্থায় কাজ ও শ্রমের অর্থ ছিল দাসত্ব ও গোলামি। কোনো কোনো সমাজব্যবস্থায় কাজের অর্থ ছিল হীনতা ও অপদস্থতা। কিন্তু ইসলাম সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলামি সভ্যতা কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণিকে যে মহৎ দৃষ্টিতে বিবেচনা করেছে সে ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন। তাঁর জীবনচরিতই ছিল শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রমিকদের প্রতি মানবিক সৌজন্যমূলক আচরণ করতে, তাদের প্রতি দয়া ও সদাচার করতে এবং তাদের ওপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিয়ে না দিতে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

জেনে রাখো, চাকরবাকরেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। এ কারণে যার ভাই তার অধীন থাকবে, সে নিজে যা খায় তাকে যেন তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে তাকে যেন তা-ই পরিধান করায়। তোমরা তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিয়ো না যা তাদের জন্য খুব

কষ্টকর। যদি তাদের কষ্টকর কাজ করতে দাও, তবে তোমরা নিজেরাও তাদের কাজে সাহায্য করবে।[১৭১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন যে, «إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ»–অর্থাৎ, 'চাকরবাকরেরাও তোমাদের ভাই।' এ কথা বলে তিনি শ্রমিক, গৃহকর্মীকে আপন ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী কোনো সভ্যতা এ ধরনের মহানুভবতা প্রত্যক্ষ করেনি।

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিকের ওপর আবশ্যক করে দিয়েছেন যে শ্রমিক ও কাজের লোকদের তাদের শ্রমের যথার্থ পারিশ্রমিক প্রদান করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করবে না, কোনো ধরনের টালবাহানার আশ্রয় নেবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

তোমরা শ্রমিকদের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করো।[১৭২]

ইসলাম শ্রমিকদের প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে কুদসিতে বলেন,

«قَالَ اللهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»

আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ধরনের লোকের প্রতিপক্ষ হব : ... এবং যে লোক কোনো শ্রমিককে কাজে

---

১৭১. *বুখারি*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : জাহিলি যুগের যেসব কাজ পাপ এবং কেউ শিরক ব্যতীত অন্য কোনো পাপে লিপ্ত হলে তাকে কাফের বলা যাবে না, হাদিস নং ৩০; *মুসলিম*, কিতাব : শপথ ও মানত, বাব : মালিক যা খায় চাকরবাকরকে তা-ই খাওয়ানো, হাদিস নং ১৬৬১।

১৭২. ইবনে মাজাহ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, হাদিস নং ২৪৪৩, *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং ২৯৮৭।

খাটিয়েছে এবং তার থেকে পূর্ণ শ্রম ও কাজ নিয়েছে, কিন্তু তাকে যথার্থ পারিশ্রমিক প্রদান করেনি।[১৭৩]

যে লোক চাকরবাকর ও শ্রমিকদের প্রতি জুলুম করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি তার প্রতিপক্ষ হবেন।

মালিকের উচিত নয় শ্রমিকের ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, যা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে এবং কাজের ক্ষেত্রে তাকে অসমর্থ বানিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ. كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ»

তুমি তোমার গৃহপরিচারক থেকে যতটুকু কাজের ভার লাঘব করে দেবে তা কিয়ামতের দিন তোমার আমলের পাল্লায় প্রতিদান হিসেবে যুক্ত হবে।[১৭৪]

যে-সকল অধিকারকে ইসলামি শরিয়ায় উজ্জ্বল নিদর্শন মনে করা হয় তার অন্যতম হলো পরিচারক ও চাপরাশিদের নম্রতা প্রাপ্তির অধিকার। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করে বলেন,

«مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا»

যার সঙ্গে তার গৃহকর্মী আহার গ্রহণ করে, যে লোক গাধার পিঠে চড়ে বাজারে যায় এবং যে লোক ছাগী ধরে নিয়ে এসে দুধ দোহন করে তারা অহংকারী হতে পারে না।[১৭৫]

---

১৭৩. বুখারি, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : ক্রয়-বিক্রয়, বাব : স্বাধীন মানুষকে বিক্রয়কারীর পাপ, হাদিস নং ২১১৪; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৪৪২; আবু ইয়ালা, হাদিস নং ৬৪৩৬।

১৭৪. ইবনে হিব্বান, আমর ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৪৩১৪; আবু ইয়ালা, হাদিস নং ১৪৭২; হুসাইন সালিম আসাদ বলেছেন, এ হাদিসের রাবিগণ বিশ্বস্ত।

১৭৫. ইমাম বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, খ. ২, পৃ. ৩২১, হাদিস নং ৫৬৮; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৮১৮৮।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ছিল তাঁর কথার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যা বলতেন তা করতেন। সাইয়িদা আয়িশা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

«مَا ضَرَبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِماً»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে কখনো কোনো প্রাণীকে, কোনো স্ত্রীর গায়ে এবং কোনো চাকরকেও প্রহার করেননি।[১৭৬]

আবু মাসউদ আনসারি রা. তার এক গোলামকে প্রহার করছিলেন। এই কাণ্ড দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যা বলেছিলেন তা এখানে স্মরণযোগ্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اَللهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ»

হে আবু মাসউদ, জেনে রাখো, তুমি তার ওপর যতটুকু ক্ষমতাবান, আল্লাহ তোমার ওপর তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী।

আবু মাসউদ রা. বলেন, এ কথা শুনে তাকিয়ে দেখি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তাকে আজাদ করে দিলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ»

তুমি যদি তা না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করত।[১৭৭]

---

১৭৬. *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাযায়িলু, বাব : পাপকাজ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু দূরে থাকা ..., হাদিস নং ২৩২৮; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭৮৬; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৯৮৪।

১৭৭. *মুসলিম*, কিতাব : আল-আইমান, বাব : ক্রীতদাসের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং দাসকে চপেটাঘাত করার কাফফারা..., হাদিস নং ১৬৫৯; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫১৫৯;

প্রহার করা বা চড় দেওয়া বা কিল-ঘুষি দেওয়া বা লাথি মারা—এসব দুর্ব্যবহার কাজের লোকদের জন্য চরম অপমানজনক। যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করেন। এ কারণে কঠিন-হৃদয় মনিব বা মালিকের উত্তম শাস্তি হলো তাকে তৎক্ষণাৎ তার মালিকানা থেকে বঞ্চিত করা। এটাই ইসলামের মহত্ত্ব এবং ইসলামি সভ্যতার মাহাত্ম্য।

এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম ও গৃহকর্মী আনাস ইবনে মালিক রা. সত্য ও যথার্থ সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। একদিন তিনি আমাকে কোনো কাজের জন্য পাঠাতে চাইলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই যাব না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে ছিল যে আল্লাহর নবী আমাকে যে কাজের জন্য যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আমি অবশ্যই সে কাজে যাব। আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং কয়েকটি বালকের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। তারা বাজারে খেলাধুলা করছিল। হঠাৎ টের পেলাম কেউ একজন পেছন থেকে এসে আমার দুই কাঁধের ওপর হাত রেখেছেন। তাকিয়ে দেখি তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি মুচকি হাসছেন। আমাকে স্নেহময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, «يَا أُنَيْسُ اِذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ»—'হে প্রিয় আনাস, আমি তোমাকে যে কাজে যেতে বলেছি সেখানে যাও।' আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এখনই যাচ্ছি, হে আল্লাহর রাসুল। আনাস রা. বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি সাত বছর (অথবা বলেছেন, নয় বছর) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো তিনি আমার কোনো কাজের ফলে বলেননি ওই কাজটি তুমি কেন করলে এবং কোনো কাজ না করার কারণেও বলেননি যে ওই কাজ তুমি কেন করলে না।[১৭৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহকর্মী ও পরিচারকদের ভালো-মন্দ এতটা খেয়াল করতেন যে তারা নিজেদের বিয়ের চেয়েও

সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ১৯৪৮; আহমাদ, হাদিস নং ২২৪০৪; আল-আদাবুল মুফরাদ, খ. ১, পৃ. ২৬৪, হাদিস নং ১৭৩; তাবারানি, মুজামুল কাবির, হাদিস নং ৬৮৩।

১৭৮. মুসলিম, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, হাদিস নং ২৩১০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৭৩।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য ও খেদমতকে প্রাধান্য দিতেন। রবিয়া ইবনে কাব আল-আসলামি রা. থেকে এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'হে রবিয়া, তুমি বিয়ে করবে না?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! আমি বিয়ে করতে চাই না। স্ত্রীকে ভরণপোষণের সামর্থ্যও আমার নেই। তা ছাড়া আমি চাই না কোনোকিছু আমাকে আপনার থেকে দূরে সরিয়ে দিক।' তিনি আমাকে আর কিছু বললেন না। আমি তার খেদমত করে যেতে থাকলাম। পরে আবারও একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'হে রবিয়া, তুমি বিয়ে করবে না?' আমি বললাম, 'আমি বিয়ে করতে চাই না। স্ত্রীকে লালনপালনের সামর্থ্যও আমার নেই। তা ছাড়া আমি চাই না কোনোকিছু আমাকে আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিক।' তিনি আমাকে আর কিছু বললেন না। এবার আমি মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, দুনিয়া ও আখিরাতে যা-কিছু আমার জন্য কল্যাণকর সে ব্যাপারে আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।' মনে মনে বললাম, যদি তিনি তৃতীয়বার আমাকে বিয়ে করতে বলেন, আমি অবশ্যই 'হ্যাঁ' বলব। তখন তৃতীয়বারের মতো তিনি আমাকে বললেন, 'হে রবিয়া, তুমি কি বিয়ে করবে না?' আমি বললাম, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল। আপনি আমাকে যা চান বা যা পছন্দ করেন তার আদেশ দিন।' তিনি বললেন যে, তুমি অমুক গোত্রে চলে যাও। অর্থাৎ, তিনি আনসারদের একটি গোত্রে চলে যেতে বললেন।[১৭৯]

শ্রমিক ও গৃহকর্মীদের প্রতি সদাচারের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার মহত্ত্ব ও উদারতা সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মুসলিম গৃহকর্মীদের প্রতিই নয়, বরং অমুসলিম গৃহকর্মীদের প্রতিও ছিলেন একইরকম স্নেহপরায়ণ ও মমতাবান। যে ইহুদি বালকটি তাঁর খেদমত করত তার সঙ্গে তিনি যে মমতাময় ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছেন তা আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে

---

[১৭৯]. *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৬২৭; *হাকিম*, হাদিস নং ২৭১৮; হাকিম বলেছেন, হাদিসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ, যদিও তিনি হাদিসটি সংকলন করেননি। *তায়ালিসি*, হাদিস নং ১১৭৩।

আছে। বালকটি একবার প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে যেতেন, তার শুশ্রূষা করতেন। ধীরে ধীরে সে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলো এবং মৃত্যুর উপক্রম হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন এবং তার শিয়রে বসলেন। তারপর তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ছেলেটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে তাকাল। তার বাবা বলল, আবুল কাসিম যা বলছেন তা শোনো। বাবার সম্মতিতে ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন,

«اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَنقَذَهُ مِنَ النَّارِ»

> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।[১৮০]

সত্য দ্বীন ইসলাম শ্রমিক ও গৃহকর্মীদের এসব অধিকারের শেকড় প্রোথিত করে দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথায় ও কাজের মাধ্যমে এসব অধিকার বাস্তবায়িত করেছেন। তা ছিল এমন এক যুগে যখন মানুষ শ্রমিক, গৃহকর্মী ও ভৃত্যদের প্রতি দুর্ব্যবহার, জুলুম ও অত্যাচার করা ছাড়া আর কিছু জানত না। ইসলাম ও মুসলিমদের সভ্যতা কতটা মানবিক, কতটা মহৎ ও উৎকর্ষমণ্ডিত তা এ আলোচনা থেকে যথার্থ উপলব্ধ হয়।

---

১৮০. *বুখারি*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : জানাযা, বাব : 'যখন কোনো শিশু ইসলাম গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করে...', হাদিস নং ১২৯০।

৪. চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার

অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের গুরুত্ব প্রদানে ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। এ কারণে তাদের প্রতি কতিপয় শরয়ি বিধান লাঘব করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ...﴾

অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়াদের জন্য দোষ নেই এবং রুগ্‌ণের জন্যও দোষ নেই...।[১৮১]

এই আয়াত দ্বারা তাদের অন্তরে আশা সঞ্চার করা হয়েছে এবং তাদের দৈহিক ও আত্মিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই জানতে পারতেন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে ছুটে যেতেন। এতে কোনো ধরনের লৌকিকতা ছিল না, কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি অসুস্থ ও রোগীর কাছে ছুটে যেতেন। কেন তা হবে না? কারণ তিনি অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ও তার শুশ্রূষা করা তার একটি অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ... وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ...»

এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছে : ...এবং অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া...।[১৮২]

---

১৮১. সুরা নুর : আয়াত ৬১; সুরা ফাতাহ : আয়াত ১৭।

১৮২. বুখারি, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাবুল জানায়িয, বাব : জানাযায় অংশগ্রহণের নির্দেশ, হাদিস নং ১১৮৩; মুসলিম, কিতাব : আস-সালাম, বাব : এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার হলো সালামের জবাব দেওয়া, হাদিস নং ২১৬২।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সকলের অভিভাবক এবং সবার আদর্শ। তিনি অসুস্থ ও রোগীর কাছে গিয়ে তার অসুস্থতা ও জটিলতাকে সহজ করে দিতেন। কোনো ধরনের ভণিতা ও লৌকিকতা ছাড়াই তার প্রতি সহানুভূতি, আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। এতে রোগী ও তার পরিবার নিজেদের সুখী ও সৌভাগ্যবান মনে করত। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, সাদ ইবনে উবাদা রা. অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে এলেন। তার সঙ্গে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে তাকে পরিবারের সেবা-শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি মারা গেছে?' ঘরের লোকেরা জবাব দিলো, 'না, হে আল্লাহর রাসুল।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তার কান্না দেখে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও কেঁদে ফেললেন। তখন তিনি বললেন,

«أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا - وَأَشَارَ إِلٰى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ»

তোমরা শুনে রেখো, চোখের অশ্রু ঝরানোর কারণে এবং হৃদয়ের বেদনার কারণে আল্লাহ তাআলা কাউকে শাস্তি দেন না, বরং তিনি শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন এর কারণে।—এ কথা বলে তিনি জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন।[১৮৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগাক্রান্তদের জন্য দোয়া করতেন এবং তারা রোগের কারণে যে সওয়াব ও প্রতিদান পাবে তার সুসংবাদ দিতেন। এতে রোগীদের কাছে রোগের ব্যাপারটা হালকা হয়ে যেত এবং তারা এই অবস্থায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করত। এ ব্যাপারে উম্মুল আলা রা.[১৮৪] থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ

---

১৮৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : অসুস্থের পাশে কান্না করা, হাদিস নং ১২৪২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না, হাদিস নং ৯২৪।

১৮৪. হাকিম ইবনে হিযাম রা.-এর ফুফু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ এবং বাইআত করেছিলেন। ইবনুল আসির, *উসদুল গাবাহ*, খ. ৭, পৃ. ৪০৫; ইবনে হাজার আসকালানি, *আল-ইসাবাহ*, খ. ৭, পৃ. ২৬৫।

ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এসে বললেন,

«أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ! فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»

হে উম্মুল আলা, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কোনো মুসলিম রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ তাআলা তার রোগের কারণে তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন, যেভাবে আগুন স্বর্ণ ও রুপার ভেজাল দূর করে দেয়।[১৮৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থের ওপর হুকুম-আহকাম সহজ করা এবং কোনো কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে না দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্গ্রীব ছিলেন। এ ব্যাপারে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমরা এক সফরে বের হলাম। আমাদের একজন সদস্যের মাথায় পাথরের আঘাত লাগল এবং যখম হয়ে গেল। তারপর তার স্বপ্নদোষ হলো। সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি আমার এ অবস্থায় তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে করো? তারা বলল, তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কারণ তুমি তো পানি পাচ্ছ। ফলে সে গোসল করল এবং গোসলের কারণে মারা গেল। তারপর আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তাঁকে সংবাদটি জানানো হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ (أَوْ يَعْصِبَ. شَكَّ مُوسَى) عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»

তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি দিন। তারা যখন নিজেরা জানে না তখন কেন অন্যদের থেকে জেনে নিলো না। নিশ্চয় অজ্ঞতার নিরাময় হলো জিজ্ঞাসা। তার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, সে তায়াম্মুম করে নিত এবং তার মাথার যখমে

---

১৮৫. সুনানে আবু দাউদ, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : নারীদের শুশ্রূষা, হাদিস নং ৩০৯২।

> একটি পট্টি বেঁধে নিত, তারপর পট্টির ওপর মাসাহ করত এবং বাকি শরীর ধুয়ে নিত।[১৮৬]

বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থের প্রয়োজনে তার ডাকে সাড়া দিতেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার তাঁর কাছে এক মহিলা এলো। তার মস্তিষ্কে কিছু ত্রুটি ছিল। সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার সঙ্গে আমার প্রয়োজন রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«يَا أُمَّ فُلاَنٍ! انْظُرِى أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ»

> হে অমুকের মা, তুমি যেকোনো গলি দেখে নাও, (তুমি ডাক দিলে সেখানে) আমি তোমার কাজ করে দেবো।

তারপর তিনি কোনো পথের মধ্যে মহিলার সঙ্গে দেখা করলে[১৮৭] সে তার প্রয়োজন সেরে নিলো।[১৮৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য চিকিৎসা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। কারণ শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুস্থতা ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ কারণে গ্রাম্য ব্যক্তিরা চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বলেন,

«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ»

---

১৮৬. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আত-তাহারাত, বাব : আহত ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে, হাদিস নং ৩৩৬, *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৫৭২; *আহমাদ*, হাদিস নং ৩০৫৭; *দারেমি*, হাদিস নং ৭৫২; *দারাকুতনি*, হাদিস নং ৩; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১০১৬।

১৮৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির সঙ্গে লোক চলাচলের রাস্তায় একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলেন এবং একান্তে মহিলার প্রয়োজনের কথা শুনেছিলেন। সবার চোখের অন্তরালে মহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তা নয়। কারণ, লোকেরা তাদের দুইজনকেই দেখতে পাচ্ছিল, যদিও তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না। কারণ মহিলার জিজ্ঞাসার ব্যাপারটি ছিল গোপনীয়। ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম*, খ. ১৫, পৃ. ৮৩।

১৮৮. *মুসলিম*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং তাঁর থেকে তাদের বরকত নেওয়া, হাদিস নং ২৩২৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৪০৭৮; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৫২৭।

> হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা রোগ-ব্যাধিতে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো, কারণ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন, কেবল বার্ধক্য ব্যতীত।[১৮৯] (জরা বা বার্ধক্য দূর করার কোনো ওষুধ নেই।)

একইভাবে মুসলিম নারী কর্তৃক মুসলিম পুরুষের চিকিৎসা করায় নিষেধাজ্ঞা ছিল না। রুফাইদা[১৯০] রা. আসলাম গোত্রের নারী ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে সাদ ইবনে মুআয রা. তিরের আঘাতে আহত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুফাইদাকে তার চিকিৎসায় নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করতেন। আর্ত মুসলিমদের সেবাযত্ন করাকে তিনি সওয়াবের উসিলা মনে করতেন।[১৯১]

বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনুল জামুহ রা.-এর সঙ্গে অধিকতর শিষ্টাচারপূর্ণ ও কোমল আচরণ করেছিলেন। আমর ইবনুল জামুহ রা. শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন। তিনি খঞ্জ বা খোঁড়া ছিলেন। তার খঞ্জত্ব ছিল প্রচণ্ড। তার সিংহের মতো চারজন পুত্র ছিলেন। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন তারা পিতাকে আটকে রাখতে চাইলেন। তাকে বললেন, বাবা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপারগ বানিয়েছেন। (সুতরাং আপনি বাড়িতেই থাকুন।) আমর ইবনুল জামুহ রা. তার পুত্রদের কথা শুনলেন

---

[১৮৯]. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : চিকিৎসা, বাব : পুরুষের চিকিৎসা গ্রহণ, হাদিস নং ৩৮৫৫; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২০৩৮; তিনি বলেছেন, এটি হাসান সহিহ। ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৪৩৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৮৪৭৭। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত এবং তাদের থেকে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন। *গায়াতুল মারাম*, হাদিস নং ২৯২।

[১৯০]. রুফাইদাহ আল-আসলামিয়্যাহ : ইসলামে প্রথম মুসলিম মহিলা নার্স ও চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন শল্য চিকিৎসক। খন্দক ও খাইবারের যুদ্ধে তিনি আহতদের চিকিৎসা ও সেবা দিয়েছেন। মসজিদে নববির পাশেই ছিল তার মেডিক্যেল ক্যাম্প। তার সেবা ও চিকিৎসার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদের সঙ্গে তাকেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ দেন।

[১৯১]. ইমাম বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, খ. ১, পৃ. ৩৮৫, হাদিস নং ১১২৯; ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ২৩৯; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৩, পৃ. ২৩৩।

না। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। বললেন, আমার ছেলেরা আমাকে আটকে রাখতে চায়। কারণ আমি খোঁড়া। অথচ আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করতে চাই। আল্লাহর কসম! আমি এই খঞ্জত্ব নিয়ে জান্নাতে পদচারণ করতে চাই। তার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, «أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ عَذَرَكَ اللهُ فَلَا جِهَادَ عَلَيْكَ»–'আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপারগ (মাযুর) বানিয়েছেন। সুতরাং আপনার ওপর কোনো জিহাদ নেই (জিহাদ ফরয নয়)।' তারপর তার সন্তানদের উদ্দেশে বললেন, «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَمْنَعُوهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ»–'তাকে আটকে না রাখাই তোমাদের জন্য সংগত। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাত দান করবেন।' ফলে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন এবং শহিদ হলেন। পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন,

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَطَأُ فِي الْجَنَّةِ بِعَرْجَتِهِ»

> যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, আল্লাহ সেই কসম পূর্ণ করেন। তাদের একজন হলো আমর ইবনুল জামুহ। আমি তাকে দেখেছি যে, সে জান্নাতে তার খঞ্জত্ব নিয়েই বিচরণ করছে।[১৯২]

ইসলামে ও ইসলামি সভ্যতার ছায়াতলে এমনই ছিল অসুস্থ, রোগী ও প্রতিবন্ধীদের অবস্থা।

---

১৯২. *ইবনে হিব্বান*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : সাহাবিগণের মর্যাদা সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, হাদিস নং ৭০২৪; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ 'জাইয়িদ' (উত্তম মানসম্পন্ন)। ইবনে সাইয়িদুন নাস, *উয়ুনুল আসার*, খ. ১, পৃ. ৪২৩; মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস-সালেহি আশ-শামি, *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ*, খ. ৪, পৃ. ২১৪।

৫. পঞ্চম অনুচ্ছেদ

এতিম, নিঃস্ব ও বিধবাদের অধিকার

ইসলামি শরিয়ার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তা এতিম, নিঃস্ব ও বিধবাদের অধিকার সুরক্ষিত করেছে এবং বস্তুগত ও আদর্শিক সুরক্ষাদানের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজে তাদের নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তাআলা এতিমদের প্রতি স্নেহ ও মমতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾

সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।[১১৩]

একইভাবে মিসকিন ও অভাবগ্রস্তদের আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾

আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত[১১৪] ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।[১১৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসকিন, নিঃস্ব ও বিধবাদের অধিকার অধিকতর সংহতকরণে তাঁর উম্মাহর সকল সদস্যকে তাদের প্রয়োজন পূরণে প্রচেষ্টা ব্যয় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং যারা বিধবা ও অভাবগ্রস্তদের খোঁজখবর রাখে ও দেখাশোনা করে তাদের অকল্পনীয় মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ»

---

১১৩. সুরা দুহা : আয়াত ৯।

১১৪. মিসকিন বা অভাবগ্রস্ত : নিজের আবশ্যক প্রয়োজন পূরণ করার মতো অর্থ যার কাছে নেই। দেখুন, ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, ভুক্তি : 'সিন', খ. ১৩, পৃ. ২১১।

১১৫. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২৬।

বিধবা ও নিঃস্বদের সহযোগিতাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মতো, অথবা (তিনি বলেছেন,) রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিবসে রোযা পালনকারীর মতো।[১১৬]

সুতরাং এর চেয়ে বড় প্রতিদান, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতিমদের প্রতি অনুগ্রহ করা, মমতা দেখানো ও স্নেহপরায়ণ হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এর জন্য মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে এতিমদের অধিকারের শেকড় প্রোথিত করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»—'আমি ও এতিমের লালনপালনকারী জান্নাতে এরূপ থাকব।'[১১৭]

এ কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

এতিমদের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের দয়া, মমতা ও স্নেহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাহর সদস্যদের এতিমদেরকে তাদের সন্তানদের সঙ্গে যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ»

যে ব্যক্তি কোনো এতিমকে দুজন মুসলিম মাতাপিতার পানাহারের সাথে যুক্ত করবে, যাতে তার সব প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে।[১১৮]

---

১১৬. বুখারি, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : ভরণপোষণ, বাব : পরিবারের জন্য খরচের ফজিলত, হাদিস নং ৫০৩৮; মুসলিম, কিতাব : আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়িক, বাব : বিধবা, মিসকিন ও এতিমের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচার, হাদিস নং ২৯৮২।

১১৭. বুখারি, সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : এতিমকে লালনপালনের ফজিলত, হাদিস নং ৫৬৫৯; মুসলিম, কিতাব : আয-যুহদ ওয়ার-রাকায়িক, বাব : বিধবা, মিসকিন ও এতিমের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচার, হাদিস নং ২৯৮৩।

১১৮. আহমাদ, হাদিস নং ১৯০৪৭, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি সহিহ লি-গাইরিহি...। আল-আদাবুল মুফরাদ, খ. ১, পৃ. ৪১, হাদিস নং ৭৮; তাবারানি, মুজামুল কাবির, হাদিস নং ৬৭০; আবু ইয়ালা, হাদিস নং ৯২৬।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ইসলামি ব্যবস্থা এতিম, মিসকিন ও বিধবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে না যে তাদের কেবল বস্তুগত চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন, বরং তাদের এভাবে মূল্যায়ন করে যে, তারা মানবমণ্ডলীর সদস্য কিন্তু ভালোবাসা ও মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুসারীদেরকে মিসকিন ও এতিমদের প্রতি কোমলহৃদয় ও মমতাময় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের কষ্ট ও দুঃখভার লাঘব করার আদেশ দিয়েছেন। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তার হৃদয়ের কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করেছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন,

«أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وتُدْرِكَ حَاجَتَكَ اِرْحَمِ الْيَتِيمَ وامْسَحْ رَأْسَهُ وأَطْعِمْهُ مِنْ طَعامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ وتُدْرِكْ حاجَتَكَ»

তুমি কি চাও তোমার অন্তর কোমল হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? তাহলে এতিমের প্রতি স্নেহশীল হও, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং তোমার খাবার থেকে তাকে খাওয়াও। তাহলে তোমার অন্তর কোমল হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।[১৯৯]

অন্যদিকে ইসলামি শরিয়ত এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ ও তাদের প্রতি জুলুম করার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ... وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ»

সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে থাকো ... এতিমের মাল আত্মসাৎ করা।[২০০]

শুধু তাই নয়, ইসলাম মিসকিন ও এতিমদের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১৯৯. আহমাদ, হাদিস নং ৭৫৬৬; বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৬৮৮৬; আবদ ইবনে হুমাইদ, হাদিস নং ১৪২৬।

২০০. বুখারি, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ওয়াসায়া, বাব : আল্লাহর বাণী : 'যারা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল গ্রাস করে...' (সুরা নিসা : আয়াত ১০), হাদিস নং ২৬১৫; মুসলিম, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : কবিরা গুনাহ এবং এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ, হাদিস নং ৮৯।

«وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطٰى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ»

এই সম্পদ হলো চিত্তমোহিনী ও সুস্বাদু[২০১]। সুতরাং সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম যে এই সম্পদ থেকে মিসকিন, এতিম ও মুসাফিরকে দান করে।[২০২]

নৈতিক দিক থেকে ইসলাম এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, যে ওলিমার ভোজে কেবল ধনীরা উপস্থিত হয়, গরিব ও এতিম-মিসকিনদের দাওয়াত দেওয়া হয় না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিন্দা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعٰى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِيْنُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ»

যে ওলিমার ভোজে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরিবদের দাওয়াত দেওয়া হয় না তা কত নিকৃষ্ট ভোজ! আর কেউ যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানি করল।[২০৩]

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, আমরা দেখি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে এতিম, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ভরণপোষণের দায়িত্বভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২০১. সতেজ-সবুজ ও সুস্বাদু : সম্পদের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা, লোভ ও লালসা থাকার কারণে একে সতেজ-সবুজ-সুস্বাদু ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শুকনো ও শক্ত জিনিসের চেয়ে সবুজ ও সতেজ জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। একইভাবে তিক্ত বস্তুর চেয়ে সুস্বাদু বস্তু বেশি লোভনীয়। দুটির তুলনা একসঙ্গে উপস্থিত করলে অধিকতর বিস্ময় ও অভিভূতি বোঝানো হয়। ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৬।

২০২. *বুখারি*, আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আয-যাকাত, বাব : এতিমদের জন্য সদকা, হাদিস নং ১৩৯৬; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ২৫৮১; *আহমাদ*, হাদিস নং ১১১৭৩।

২০৩. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হলো, হাদিস নং ৪৮৮২; *মুসলিম*, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : দাওয়াত প্রদানকারীর দাওয়াতে যাওয়ার নির্দেশ, হাদিস নং ১৪৩২।

«أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي، فَأَنَا وَلِيُّهُ»

মহা মহীয়ান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমি অন্যসব লোক অপেক্ষা মুমিনদের অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা নিঃসম্বল পরিজন রেখে গেলে তোমরা আমাকে ডাকবে, আমি তার অভিভাবক।[২০৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলতেন তা দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كَانَ لَا يَأْنَفُ وَلَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُمَا حَاجَتَهُمَا»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধবা ও মিসকিনদের সঙ্গে হাঁটতে তুচ্ছতা বোধ করতেন না এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন।[২০৫]

এইভাবে ইসলাম এতিম, বিধবা ও মিসকিনদের যাবতীয় নৈতিক ও বস্তুগত অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করেছে এবং মানবসভ্যতায় তাদের অবস্থান সংহত করেছে।

---

[২০৪]. *বুখারি*, কিতাব : আল-ফারায়িয, বাব : কোনো মেয়েলোকের দুজন চাচাতো ভাই, তাদের একজন যদি মা-শরিক ভাই হয় এবং অপরজন যদি স্বামী হয়, হাদিস নং ৬৩৬৪; *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ফারায়িয, বাব : কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা তার উত্তরাধিকারীদের, হাদিস নং ১৬১৯।

[২০৫]. *নাসায়ি*, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : খুতবা সংক্ষিপ্ত করা মুস্তাহাব, হাদিস নং ১৪১৪; *দারেমি*, হাদিস নং ৭৪; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৪২৩। শুআইব আরনাউত বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটির সনদ সহিহ। তাবারানি, *আল-মুজামুস সগির*, হাদিস নং ৪০৫। *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং ৫৮৩৩।
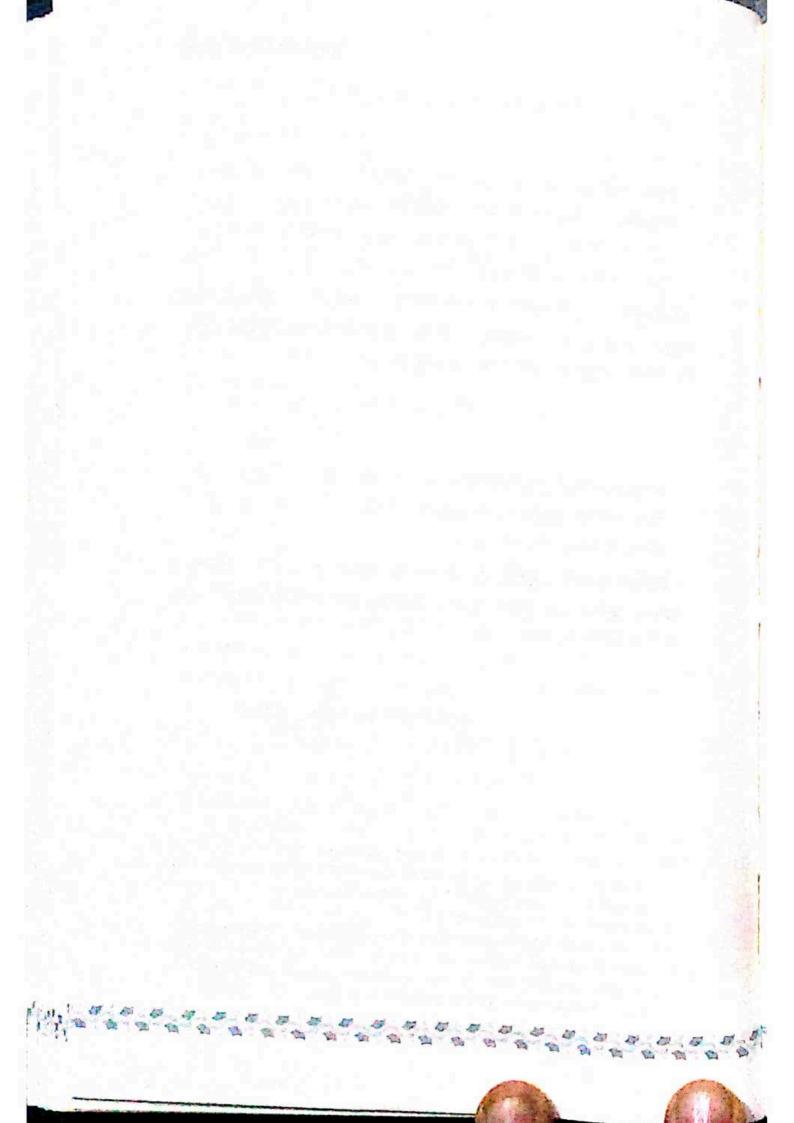
৬. ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

সংখ্যালঘুদের অধিকার

মুসলিম সমাজে ইসলামি শরিয়ার ছায়াতলে অমুসলিম সংখ্যালঘুরা যে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সংবিধানে অন্য সংখ্যালঘুরা এত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেনি। তার কারণ এই যে, মুসলিম সমাজ ও অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্পর্কের ভিত্তি ও নীতিমালা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

> দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।[২০৬]

মুসলিমরা অমুসলিমদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে তার নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি নির্দেশিত হয়েছে উল্লিখিত আয়াতে। অর্থাৎ, যারা শত্রুতা পোষণ করে না তাদের জন্য রয়েছে মহানুভবতা, সদাচার ও ন্যায়বিচার। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মানবজাতি এমন মৌলিক নীতির কথা শোনেনি। তারপর বহু শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, কিন্তু মানবজাতি এই মূলনীতির অভাবের ফলে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। আজও আধুনিক সমাজগুলোতে এমন মূলনীতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, কিন্তু তাতে সফল হওয়া যায়নি। কারণ কী? কারণ হলো পক্ষপাত, স্বজনপ্রীতি ও বর্ণবাদ।

---

২০৬. সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮।

উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামি শরিয়া অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য যে-সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশ্বাস ও মতাদর্শের স্বাধীনতা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾

> দ্বীনের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।[২০৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামেনের আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা)-এর উদ্দেশে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন, তাতে বিশ্বাস ও মতাদর্শের স্বাধীনতার ব্যাপারটি চমৎকারভাবে প্রতিভাত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> «وَإِنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ إِسْلَامًا خَالِصًا مِنْ نَفْسِهِ فَدَانَ دِينَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ أَوْ يَهُودِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا»
>
> কোনো ইহুদি বা খ্রিষ্টান যদি একনিষ্ঠভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের ওপর জীবনযাপন করে তবে; সে মুমিন ও মুসলিম গণ্য হবে। মুসলিমদের যেসব অধিকার রয়েছে তারও একই অধিকার থাকবে এবং মুসলিমদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে তারও একই দায়বদ্ধতা থাকবে। আর যারা তাদের খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদিধর্মের ওপর থেকে যাবে তাদেরকে ধর্মত্যাগের জন্য জোর করা হবে না।[২০৮]

---

২০৭. সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৬।

২০৮. আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ২৮; ইবনে যানজুইয়াহ, *আল-আমওয়াল*, খ. ১, পৃ. ১০৮; ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৫৮৮; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৫, পৃ. ১৪৬। ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, ইবনে যানজুইয়াহ *আল-আমওয়াল* গ্রন্থে নসর ইবনে আসিম, আওফ, হাসান বসরি রহ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র লিখলেন...। এভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এই মুরসাল হাদিসদুটি পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে। ইবনে হাজার আসকালানি, *আত-তালখিসুল হাবির*, খ. ৪, পৃ. ৩১৫।

ইসলামি শরিয়া অমুসলিমদেরকে কেবল বিশ্বাস ও মতাদর্শের স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দিয়েছে, এর বিপরীতে তাদের জীবন-সুরক্ষার বিধান দেয়নি তা কিন্তু নয়। মানুষ হিসেবে তাদের অস্তিত্বরক্ষা ও সুন্দর জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

যে ব্যক্তি এমন লোককে হত্যা করবে, যার সঙ্গে তার সন্ধি[২০৯] রয়েছে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[২১০]

যারা ইসলামি রাষ্ট্রে কর দিয়ে থাকে অথবা যাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি রয়েছে তাদের প্রতি জুলুম ও তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন না করতে সতর্ক করেছেন এবং নিজেকে তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করেছেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

যে ব্যক্তি এমন কোনো লোকের ওপর জুলুম করে, যার সঙ্গে তার সন্ধি হয়েছে, অথবা তার কোনোপ্রকার ক্ষতি সাধন করে অথবা সাধ্যের অতিরিক্ত তাকে কষ্ট দেয় কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কোনো জিনিস আদায় করে, কিয়ামতের দিন আমি (এমন মাজলুমের পক্ষ থেকে) প্রতিবাদ করব।[২১১]

---

২০৯. আরবি 'মুআহিদ' শব্দটি 'জিম্মি' শব্দ থেকে ব্যাপকার্থক। কাফেরদের মধ্যে যারা যুদ্ধত্যাগের ইচ্ছা করবে অর্থাৎ শান্তিচুক্তি করবে তাদের জন্যও শব্দটি প্রযোজ্য। ইবনুল আসির, *আন-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিস ওয়াল-আসার*, খ. ৩, পৃ. ৬১৩।

২১০. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, আবওয়াবুল জিযয়া ওয়াল-মুওয়াদাআহ, বাব : যার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে বিনা অপরাধে তাকে হত্যা করার পাপ, হাদিস নং ২৯৯৫; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৭৬০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৪৭৪৭।

২১১. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আল-খারাজ, বাব : তা'শির আহলিয যিম্মাতি ইযা ইখতালাফু বিততিজারাতি, হাদিস নং ৩০৫২; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৮৫১১।

খাইবারে আনসারদের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, তা এই ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। খাইবারে আবদুল্লাহ ইবনে সাহল আনসারি রা. নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড ইহুদিদের ভূমিতে সংঘটিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই অধিকতর সম্ভাবনা ছিল যে হত্যাকারী একজন ইহুদি। তা সত্ত্বেও এখানে এই ধারণার পক্ষে দলিল-প্রমাণ নেই। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের কাউকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি। বরং শুধু নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন হলফ করে বলে যে, তারা হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি বা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না। সাহল ইবনে আবু হাসমা রা. বর্ণনা করেন যে, তার গোত্রের একদল লোক খাইবার গমন করল এবং সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সঙ্গীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে হত্যা করিনি, তার হত্যাকারী সম্পর্কে জানিও না। এরপর তারা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গেল এবং বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা খাইবারে গিয়েছিলাম। তখন সেখানে আমাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলাম।' নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, الْكُبْرَ الْكُبْرَ—'তোমাদের বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও, তোমাদের বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও।' তারপর তাদের বললেন, «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ»—'তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে।' তারা বলল, 'আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই।' তিনি বললেন, «فَيَحْلِفُونَ»—'তাহলে ওরা হলফ করে নেবে।' তারা বলল, 'ইহুদিদের কসমে আমাদের আস্থা নেই।' এই নিহতের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাক তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ উট প্রদান করে তার রক্তপণ আদায় করলেন।[illegible]

এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন যা কেউ কল্পনাও করেনি। মুসলিমদের সম্পদ থেকে

[illegible]. বুখারি, কিতাব : রক্তপণ, বাব : শপথ, হাদিস নং ৬৮৯৮; মুসলিম, কিতাব : আল-কাসামা ওয়াল-মুহারিবিন ওয়াল-কিসাস ওয়াদ-দিয়াত, বাব : আল-কাসামা, হাদিস নং ১৬৬৯।

রক্তপণ আদায়ের জন্য তিনি নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এতে আনসারদের ক্রোধ প্রশমিত হলো এবং ইহুদিদের প্রতিও কোনো জুলুম করা হলো না। সন্দেহের তির ইহুদিদের দিকে থাকা সত্ত্বেও দণ্ডবিধি কার্যকর না করে ইসলামি রাষ্ট্র নিজের কাঁধে বোঝা তুলে নিয়েছে!

একইভাবে ইসলামি শরিয়া অমুসলিমদের সম্পদ সুরক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং যথাযথ হেতু ব্যতীত তাদের সম্পদ হস্তগত করা, কেড়ে নেওয়া বা আত্মসাৎ করা হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন চুরি করা, ছিনতাই করা বা ধ্বংস করে দেওয়া ইত্যাদি যেকোনো অনাচারমূলক পন্থা অবলম্বন করা। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নাজরানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ঘোষণার বাস্তবিক রূপ আমরা দেখতে পাই। বলা হয়েছে,

«وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيْهِمْ مِنْ قَلِيْلٍ أَوْ كَثِيْرٍ»

> নাজরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা ও আল্লাহর রাসুল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিম্মাদারি রয়েছে। এই নিরাপত্তা ও জিম্মাদারি তাদের সম্পদ, তাদের মতাদর্শ, তাদের উপাসনালয় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে তা কম বা বেশি হোক সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[২১৩]

এর চেয়েও চমৎকার ব্যাপার হলো ইসলামি রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। দরিদ্রতা, অপারগতা, বার্ধক্য ইত্যাদি যেকোনো মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামি রাজকোষ বা বাইতুল মাল থেকে তাদের খোরপোশ প্রদান করা হবে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

২১৩. বাইহাকি, *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, বাব : নাজরানের প্রতিনিধি, খ. ৫, পৃ. ৪৮৫; আবু ইউসুফ, *খারাজ*, পৃ. ৭২; ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৮৮।

> তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার অধীন লোকদের (প্রজাদের) ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।[২১৪]

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরাও মুসলিমদের মতোই সম্পূর্ণরূপে প্রজা। আল্লাহ তাআলার সামনে ইসলামি রাষ্ট্রকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

এ ব্যাপারে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। আবু উবাইদ[২১৫] তার *আল-আমওয়াল* গ্রন্থে বর্ণনা করেন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব[২১৬] রহ. বলেছেন,

«تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْيَهُودِ فَهِيَ تُجْرَى عَلَيْهِمْ»

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদি বাসিন্দাদের সদকা দিতেন। তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।[২১৭]

এ ব্যাপারে ইসলামের মহত্ত্ব ও ইসলামি সভ্যতার মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো সুন্নতে নববির গ্রন্থসমূহে বর্ণিত একটি ঘটনা। একবার নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে একটি জানাযা গেল। তিনি জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। তাঁকে বলা হলো, লোকটা তো ইহুদি। তখন তিনি বললেন, «أَلَيْسَتْ نَفْسًا»—'সে কি মানুষ নয়?'[২১৮]

ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতায় এমনই ছিল অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার। মূলনীতি হলো এই, প্রত্যেক মানবিক সত্তার প্রতি সম্মান বজায় রাখতে হবে, যতক্ষণ না সে জুলুম করে অথবা সীমালঙ্ঘন করে।

---

২১৪. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : দাসমুক্তি, বাব : গোলামের ওপর নির্যাতন করা এবং 'আমার গোলাম', 'আমার বাঁদি' বলা অপছন্দনীয়, হাদিস নং ২৪১৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইমারাহ, বাব : ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা এবং অপরাধীর শাস্তি, হাদিস নং ১৮২৯।

২১৫. আবু উবাইদ : আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সালাম আল-হারাবি (১৫৭-২২৪ হি./৭৭৪-৮৩৮ খ্রি.)। বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকিহ ও সাহিত্যিক। হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদ ও মিশরে ভ্রমণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন মক্কায়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ৪৯০-৪৯২।

২১৬. সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব : আবু মুহাম্মাদ সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ইবনে হুযন আল-কুরাশি (১৩-৯৪ হি./৬৩৪-৭১৩ খ্রি.)। সায়্যিদুত তাবিয়িন। মদিনার সাতজন ফকিহর অন্যতম। যেমন ছিলেন হাদিসশাস্ত্রবিদ ও বিদগ্ধ ফকিহ, তেমনই ছিলেন আল্লাহওয়ালা ও দুনিয়াবিমুখ। দেখুন, ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৫, পৃ. ১১৯-১৪৩।

২১৭. আবু উবাইদ, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ৬১৩।

২১৮. *মুসলিম*, কায়স ইবনে সাদ ও সাহল ইবনে হানিফ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো, হাদিস নং ৯৬১; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৮৯৩।

৭. সপ্তম অনুচ্ছেদ

জীবজন্তুর অধিকার

ইসলাম জীবজন্তু ও প্রাণিকুলের প্রতি বাস্তবিক ও সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়েছে। মানবজীবনে প্রাণিকুলের গুরুত্ব, মানুষের জন্য তাদের উপকার, জগৎ নির্মাণ ও জীবনের ধারাবাহিকতায় মানুষের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার ওপর এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি স্থাপিত রয়েছে। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সবচেয়ে বড় দলিল এই যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের অনেকগুলোর সুরার নামকরণ করেছেন জীবজন্তুর নামে। যেমন সুরা বাকারা, সুরা আনআম, সুরা নাহল ইত্যাদি।

জীবজন্তুর প্রতি যত্নশীল হওয়া ও সমাজে তাদের ভূমিকা এবং মানুষের পাশাপাশি তাদের অবস্থান কী সে ব্যাপারে কুরআন মাজিদে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ○ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে শীত নিবারক উপাদান এবং বহু উপকার। এবং তা থেকে তোমরা আহার করে থাকো। তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে সেগুলোকে চারণভূমি থেকে নিয়ে আসো এবং সকালে যখন সেগুলোকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা সেগুলোর সৌন্দর্য উপভোগ করো। তারা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে

যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।(২১৯)

ইসলামি শরিয়া প্রাণিকুলের অধিকারের ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রণয়ন করে দিয়েছে তা হলো তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণা না দেওয়া। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাধার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গাধাটির মুখে (পুড়িয়ে) দাগ দেওয়া ছিল। তিনি বললেন, «لَعَنَ اللهُ الَّذِى وَسَمَهُ»–'যে লোক গাধাটির মুখে দাগ দিয়েছে তাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন।'(২২০) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ»

যে লোক পশুর অঙ্গহানি ঘটায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অভিসম্পাত করেছেন।(২২১)

হাদিসের মর্ম এই যে, জীবজন্তু ও পশুপাখিকে কষ্ট ও শাস্তি দেওয়া এবং তাদের প্রতি দয়া-মমতা না দেখানো ইসলামি শরিয়ার দৃষ্টিতে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

একইভাবে ইসলাম প্রাণিকুলের আরেকটি মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করেছে, অর্থাৎ, প্রাণীদের আটকে রাখা ও তাদের ক্ষুৎপিপাসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تُسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

---

২১৯. সুরা নাহল : আয়াত ৫-৭।

২২০. মুসলিম, কিতাব : পোশাক ও সাজসজ্জা, বাব : জীবজন্তুর চেহারায় প্রহার করা ও ছ্যাঁকা দিয়ে দাগ লাগানো নিষিদ্ধ, হাদিস নং ২১১৭।

২২১. বুখারি, কিতাব : জবাই করা ও শিকার করা, বাব : পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তির দ্বারা হত্যা করা এবং চাঁদমারি করা নিন্দনীয়, হাদিস নং ৫১৯৬; সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ৪৪৪২; সুনানে দারেমি, হাদিস নং ১৯৭৩।

একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কেননা, সে বিড়ালটিকে পানাহার করায়নি, এমনকি ছেড়েও দেয়নি যাতে সে জমিনের ঘাস-লতাপাতা খেয়ে বাঁচতে পারে।[২২২]

সাহল ইবনে হানযালিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে গেলেন। দেখলেন যে, ক্ষুৎপিপাসায় উটটির পেট পিঠের সঙ্গে মিশে গেছে। তখন তিনি বললেন,

«اتَّقُوا اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً»

তোমরা এসব বোবা জীবজন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। পরিশ্রান্ত না করে তাদের পিঠে আরোহণ করো এবং সুস্থ রেখে তাদের গোশত আহার করো।[২২৩]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক প্রাণীকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে ওই কাজে ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। চতুষ্পদ জন্তুকে কাজে লাগানোর প্রধান উদ্দেশ্য কী তা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেছেন,

«إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ»

তোমরা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর পৃষ্ঠদেশকে মিম্বরে পরিণত করা থেকে দূরে থাকো। আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এ কারণে যে, তারা তোমাদের এমন জায়গায়

---

২২২. *বুখারি*, কিতাব : পানি সিঞ্চন, বাব : পানি পান করানোর ফজিলত, হাদিস নং ২২৩৬; *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আস-সালাম, বাব : বিড়াল হত্যা নিষিদ্ধ, হাদিস নং ২২৪২, হাদিসটির বাক্য *মুসলিম* থেকে চয়ন করা হয়েছে।

২২৩. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : জিহাদ, বাব : পশুপাখিদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে যে-সকল নির্দেশনা রয়েছে, হাদিস নং ২৫৪৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৭৬৬২; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ এবং রাবিগণ বিশ্বস্ত ও সহিহ হাদিসের রাবিদের মানে উত্তীর্ণ। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৪৬।

> পৌঁছে দেবে যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর ক্লেশ ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না।[২২৪]

ইসলামি শরিয়া জীবজন্তু ও প্রাণিকুলের যেসব অধিকারের শেকড় প্রোথিত করে দিয়েছে তারমধ্যে আরেকটি এই যে, ইসলামি শরিয়া কোনো প্রাণীকে তির নিক্ষেপের লক্ষ্য (চাঁদমারি) বানাতে নিষেধ করেছে। একবার আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কিছু তরুণকে দেখলেন, একটি পাখি বেঁধে রেখে সেটিকে তির নিক্ষেপের লক্ষ্য বানিয়েছে। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, যারা এমন কাজ করে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করুন।

> «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»
>
> নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে ব্যক্তি প্রাণবিশিষ্ট কোনোকিছুকে (তির ছোড়ার) লক্ষ্যবস্তু বানায়।[২২৫]

ইসলামি শরিয়া প্রাণিকুলের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। তা হলো তাদের প্রতি দয়া ও মমতা দেখানোর আবশ্যকতা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নবর্ণিত বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

> «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ

---

২২৪. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : বাহনজন্তুর ওপর অবস্থান করা, হাদিস নং ২৫৬৭; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১০১১৫।
ব্যাখ্যা : 'তোমরা তোমাদের বহনকারী জীবজন্তুকে দাঁড় করিয়ে তাদের পিঠের ওপর বসে থেকে কেনা-বেচা ও আলাপ-আলোচনা করো না। বরং তাদের পিঠ থেকে নামো, তোমাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করো, তারপর আরোহণ করো।' জীবজন্তুর পৃষ্ঠদেশকে বিনা প্রয়োজনে আসন হিসেবে ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। তবে কদাচিৎ কোনো প্রয়োজনে তা করা জায়েয আছে। দলিল : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটনীর উপরে বসে ভাষণ দিয়েছিলেন, তখন উটনীটি দাঁড়িয়ে ছিল। দেখুন, আজিমাবাদি, *আউনুল মাবুদ*, খ. ৭, পৃ. ১৬৯; মুনাবি, *ফাইজুল কাদির*, খ. ৩, পৃ. ১৭৪।

২২৫. *বুখারি*, কিতাব : জবাই করা ও শিকার করা, বাব : পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তির দ্বারা হত্যা করা এবং চাঁদমারি করা নিন্দনীয়, হাদিস নং ৫১৯৬; *মুসলিম*, কিতাব : শিকার করা ও জবাই করা এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, বাব : কোনো প্রাণীকে বেঁধে তাকে তিরের লক্ষ্যস্থল বানানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, হাদিস নং ১৯৫৮।

الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

পথে চলতে চলতে একজন লোকের ভীষণ পিপাসা লাগল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। কূপ থেকে বের হয়ে সে দেখতে পেল যে একটি কুকুর ভীষণ হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে (ভেজা) মাটি চাটছে। সে ভাবল, আমার মতো কুকুরটারও পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং তার মোজা ভরে পানি তুলল। মোজাটিকে মুখ দিয়ে ধরে[২২৬] উপরে উঠে এলো। এই পানি কুকুরটাকে পান করালো। আল্লাহ তাআলা তার আমল কবুল করলেন এবং তার পাপ মাফ করে দিলেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যেকোনো প্রাণীর উপকার করাতে সওয়াব রয়েছে।[২২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি সফরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর প্রয়োজনে (ইস্তিঞ্জার জন্য) দূরে সরে গেলেন। আমরা একটি 'হুম্মারা' (চড়ুই জাতীয় ছোট পাখি) দেখতে পেলাম। তার সঙ্গে দুটি ছানা রয়েছে। আমরা ছানাদুটিকে ধরে নিয়ে এলাম। একটু পরেই হুম্মারা পাখিটি এসে ডানা ঝাপটাতে লাগল। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তিনি পাখিটির অবস্থা দেখে বললেন,

«مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا»

---

২২৬. যেহেতু দুই হাত দিয়ে কূপের পার ধরে উঠতে হচ্ছিল।

২২৭. বুখারি, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মানুষ এবং পশুপাখিকে পানি পান করানো ও খাবার দেওয়ার ফজিলত, হাদিস নং ৫৬৬৩; মুসলিম, কিতাব : আস-সালাম, বাব : অবোধ জন্তুজানোয়ারের প্রতি দয়া, হাদিস নং ২২৪৪।

কে ছানাদুটি ধরে এনে পাখিটিকে ব্যথিত করেছে? ছানাদুটি তার কাছে ফিরিয়ে দাও।[২২৮]

প্রাণিকুলের অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে ইসলামি শরিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করেছে। এ কারণে গবাদি পশুর জন্য উর্বর এবং পানি ও ঘাসযুক্ত চারণভূমি নির্বাচন করতে বলা হয়েছে। যদি কাছাকাছি এমন চারণভূমি না পাওয়া যায় তাহলে গবাদি পশুপালকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هٰذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ، فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল, তিনি কোমলতা পছন্দ করেন এবং কোমলতায় আনন্দিত হন। তিনি কোমলতায় সাহায্য করেন, যা কঠোরতায় করেন না। সুতরাং তোমরা যখন এসব বাকশক্তিহীন জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করবে, তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে (যেখানে তাদের বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত ঘাস-পানির ব্যবস্থা আছে) থামাবে (স্বাভাবিক দূরত্বের বেশি চালিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না)। যেখানে অবস্থান করবে সেখানকার জায়গা ঘাসশূন্য পরিষ্কার হলে শীঘ্রই তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যাও, অন্যথায় তাদের হাড় শুকিয়ে যাবে। (অর্থাৎ, ঘাসশূন্য ও লতাপাতাহীন জায়গায় অবস্থান করলে এ প্রাণীগুলো না খেতে পেয়ে শুকিয়ে যাবে এবং পরে আর হাঁটতে পারবে না।)[২২৯]

প্রাণিকুলের প্রতি দয়া দেখানোর চেয়েও উচ্চ ও মূল্যবান আরেকটি স্তর রয়েছে। ইসলামি শরিয়া প্রাণীদের সঙ্গে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তা

---

[২২৮]. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : পিপীলিকা হত্যা করা, হাদিস নং ৫২৬৮; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৭৫৯৯। তিনি বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তা সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবি তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

[২২৯]. ইমাম মালিক, *মুআত্তা*, ইয়াহইয়া আল-লাইস খালিদ ইবনে মা'দান থেকে মারফুরূপে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিতাব : অনুমতি প্রার্থনা, বাব : সফরে যেসব কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হাদিস নং ১৭৬৭।

আবশ্যক করে দিয়েছে। তা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা এবং তাদের অনুভূতিকে সম্মান দেখানো। এই নীতির সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন তখনই ঘটেছে যখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোশত খাওয়ার জন্য প্রাণীদের জবাইয়ের সময় তাদের কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। চাই এ কষ্টদান জবাইয়ের নিকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন অথবা জবাইয়ের অস্ত্রের নিকৃষ্টতার কারণে শারীরিকভাবে হোক অথবা ছুরি-চাকু প্রদর্শন করে মানসিকভাবে হোক। এসব কারণে প্রাণীটিকে কয়েকবার হত্যা করা হয়!

শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুটি বিষয় আত্মস্থ করে রেখেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন কোনো ব্যক্তিকে (কিসাস বা এ রকম কোনো কারণে) হত্যা করবে, তাকে উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। যখন পশুপাখি জবাই করবে, উত্তম পদ্ধতিতে জবাই করবে। তোমরা অবশ্যই ছুরি ধার দিয়ে নেবে এবং জবাইকৃত পশুকে শান্তি দেবে।[২৩০]

অনুরূপ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক জবাই করার জন্য একটি ছাগল শোয়াল, তারপর তার ছুরি ধার দিতে লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থা দেখে বললেন,

«أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلاَّ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا»

২৩০. *মুসলিম*, কিতাব : শিকার করা ও জবাই করা এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, বাব : উত্তম পদ্ধতিতে জবাই ও হত্যা করা এবং ছুরি ধার দেওয়ার নির্দেশ, হাদিস নং ১৯৫৫; *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৮১৫; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১৪০৯।

তুমি কি প্রাণীটাকে কয়েকবার মারতে চাও? এটাকে মাটিতে শোয়াবার আগে তোমার ছুরিটাকে ধার দিয়ে নিতে পারলে না?[২৩১]

ইসলামে প্রাণীদের অধিকার এমনই, প্রাণীদের রয়েছে নিরাপত্তা ও শান্তির অধিকার, আরাম ও স্বস্তির অধিকার। ইসলামি সভ্যতার পতাকা যেখানে পতপত করে উড়েছে সেখানে এমনই ছিল পরিবেশ-পরিস্থিতি।

---

২৩১. মুসতাদরাকে হাকেম, কিতাব : কুরবানি, হাদিস নং ৭৫৬৩। তিনি বলেছেন, এ হাদিস ইমাম বুখারির শর্ত অনুযায়ী সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম হাদিসটি সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবি তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

৮. অষ্টম অনুচ্ছেদ

পরিবেশের অধিকার

আল্লাহ তাআলা যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা হলো পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও উপকারী। তিনি পরিবেশকে মানুষের অধীনে করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে মানুষের ওপর পরিবেশের প্রয়োজনীয় সুরক্ষাবিধান আবশ্যক করে দিয়েছেন। যেমন তিনি মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের নিদর্শনাবলি নিয়ে প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা করতে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। এ জগৎকে তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ○ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾

তারা কি তাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি, তা সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই? আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্‌গত করেছি সব রকম নয়নপ্রীতিকর উদ্ভিদ।[২৩২]

কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করেই মুসলিম মানব এবং প্রাণিকুল ও জড়পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত তার চারপাশের পরিবেশের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, পরিবেশ সুরক্ষায় পার্থিব জীবনে তার উপকারিতা রয়েছে, কারণ সে সুন্দর-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করতে পারবে এবং আখিরাতেও আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার।

---

২৩২. সুরা কাফ : আয়াত ৬-৭।

সৃষ্টিজগতের প্রতি কুরআনের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার সমর্থনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে এবং তার ভিত্তি এই যে, প্রকৃতির উপাদান ও মানুষের মধ্যে মৌলিক বন্ধন বিদ্যমান এবং তাদের মধ্যে রয়েছে আদান-প্রদানমূলক সম্পর্ক। মানুষ যখন প্রকৃতির কোনো উপাদানের অপব্যবহার করবে বা পুরো উপাদান নিঃশেষ করে দেবে তখন গোটা পৃথিবীই সরাসরি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এই বিশ্বাসই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তাভাবনার মূল পয়েন্ট।

এ কারণে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানবমণ্ডলীর জন্য সর্বজনীন নীতি প্রবর্তন করেছে ইসলামি শরিয়া। তা হলো এই ধরিত্রীর কোনো ধরনের ক্ষতি সাধন না করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ ضَرَرَ ولاَ ضِرَارَ»

কেউ কারও ক্ষতি করবে না ও কারও ক্ষতির সম্মুখীন হবে না।[২৩৩]

ইসলামি শরিয়ার ধারাবাহিক বিধানাবলি পরিবেশকে নোংরা করা এবং বিনষ্ট করার ব্যাপারে সতর্ক করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপ একটি বিধান দিয়ে বলেন,

«اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ»

তোমরা তিনটি অভিসম্পাতপূর্ণ কাজ–যাওয়া-আসার স্থানে, রাস্তার মধ্যস্থলে এবং গাছের ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকো।[২৩৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াকে রাস্তার অধিকার বলে ঘোষণা করেছেন। আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭১৯, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান। *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ২৩৪৫, তিনি বলেছেন, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটির সনদ সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিম* গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়নি।

২৩৪. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আত-তাহারাহ, বাব : আল-মাওয়াদিউল্লাতি নাহান-নাবিয়্যু আনিল-বাওলি ফিহা, হাদিস নং ২৬।

«إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ.. وَكَفُّ الأَذَى..»

তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, আমাদের তো রাস্তার ওপর বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, রাস্তায় আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্যই হও তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললেন, রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, ... এবং কাউকে (পথচারীকে) কষ্ট না দেওয়া...।[২০৫]

'কষ্ট না দেওয়া' কথাটি সামগ্রিক। অর্থাৎ, যেসব মানুষ সড়ক ও অলিগলি ব্যবহার করে তাদেরকে যেকোনো ধরনের কষ্টদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রতিদানপ্রাপ্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ»

আমার উম্মতের ভালো-মন্দ আমলসমূহ আমার কাছে উপস্থিত করা হয়, তখন আমি তাদের ভালো কাজসমূহের মধ্যে পেলাম রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং মন্দ কাজসমূহের মধ্যে পেলাম

---

২০৫. *বুখারি*, আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : আফনিয়াতুদ-দুর ওয়াল-জুলুস ফিহা ওয়াল-জুলুসু আলাস-সুউদাত, হাদিস নং ২৩৩৩; *মুসলিম*, কিতাব : আল-লিবাস ওয়ায-যিনাহ, বাব : আন-নাহয়ু আনিল-জুলুসি ফিত-তুরুকাতি ওয়া ইতাউত-তারিকি হাক্কাহু, হাদিস নং ২১২১।

কফ বা নাসা-শ্লেষ্মা মসজিদে ফেলা, যা (মাটিতে) পুঁতে ফেলা হলো না।[২৩৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবাসস্থল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ،... فَنَظِّفُوا بُيُوتَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন। ...সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো, ইহুদিদের মতো (অপরিচ্ছন্ন) রেখো না।[২৩৭]

এসব শিক্ষা ও বিধান কত উত্তম, যা সব ধরনের নোংরা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত পবিত্র জীবনের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এসব বিধানের মধ্য দিয়ে ইসলামি শরিয়া মানুষের আত্মিক ও স্বাস্থ্যগত সুখের সুরক্ষা দিয়েছে।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সুরক্ষাদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে আরও স্পষ্ট ও ব্যাপকার্থক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাপড়চোপড় সুন্দর, আমার জুতা সুন্দর এগুলো কি অহংকারের মধ্যে পড়ে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ؛ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»

---

২৩৬. *মুসলিম*, আবু যর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস-সালাত, বাব : আন-নাহয়ু আল-বিসাক ফিল-মাসজিদি ফিস-সালাতি ওয়া গাইরিহা, হাদিস নং ৫৫৩; *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৫৮৯; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৬৮৩।

২৩৭. *তিরমিযি*, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আন-নাযাফাহ, হাদিস নং ২৭৯৯; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৭৯০। *মিশকাতুল মাসাবিহ*, হাদিস নং ৪৪৫৫।

> নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্য অস্বীকার করা ও মানুষকে অবজ্ঞা করা।[২৩৮]

কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ যে প্রকৃতিকে রুচিস্নিগ্ধ ও নয়নাভিরাম করে সৃষ্টি করেছেন তা প্রকাশের আগ্রহও সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

একইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি ভালোবাসতেন এবং মানুষের মধ্যে সুগন্ধি ছড়িয়ে দিতে ও হাদিয়া দিতে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি পরিবেশ সুরভিত করে তুলতে ও নোংরা পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ»

> কাউকে সুগন্ধি (উপহার) দেওয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ, সুগন্ধি বহন করা সহজসাধ্য এবং ঘ্রাণও চমৎকার।[২৩৯]

ইসলামের একটি মহত্ত্ব এই যে, ইসলাম যেসব ব্যাপারে বিধান দিয়েছে তার মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কেও বিশেষ বিধান দিয়েছে। জমিনে বীজ বপন ও চারা রোপণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»

> যেকোনো মুসলিম কোনো ফলবতী গাছ লাগাবে, তা থেকে কিছু খাওয়া হলে তা তার পক্ষ থেকে দান স্বরূপ, তা থেকে কিছু চুরি হলে তাও দানস্বরূপ, বন্য জীবজন্তু তা থেকে যা খাবে তাও দানস্বরূপ, পাখপাখালি যা খাবে তাও দানস্বরূপ। অন্য কেউ

---

২৩৮. *মুসলিম*, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : তাহরিমুল কিবর ওয়া বায়ানুহু, হাদিস নং ৯১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৩৭৮৯; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৪৬৬।

২৩৯. *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আলফায মিনাল-আদাব ও গাইরিহা, বাব : ইসতি'মালুল-মিসক..., হাদিস নং ২২৫৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৭৯১।

> কোনো ক্ষতিসাধন করলে তাও দানস্বরূপ। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»–তা কিয়ামত পর্যন্ত দান হিসেবে থাকবে।[২৪০]

ইসলামের মাহাত্ম্য এই যে, পরিবেশ ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত সকলের জন্য উপকারী গাছ রোপণের সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে যতক্ষণ ওই গাছ উপকারে আসবে, যদিও ওই গাছের মালিকানা অন্য কারও হাতে চলে যায় বা রোপণকারী বা চাষি মারা যায়!

মানুষ অকর্ষিত বা অনুর্বর ভূমি কর্ষণ করে তাতে ফসল ফলিয়ে যে জীবিকা উপার্জন করে ইসলামি শরিয়া তার উচ্চ প্রশংসা করেছে। কারণ, গাছ রোপণ করা, বীজ বপন করা, শুকনো ও উষর ভূমিতে জল সিঞ্চন করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»

> যে ব্যক্তি অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করল তার জন্য এতে রয়েছে প্রতিদান এবং পশুপাখি তা থেকে যা খেল তা তার জন্য সদকা।[২৪১]

পানি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, তাই এতে মিতব্যয়িতা ও তার পবিত্রতা রক্ষা করা ইসলামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি পর্যাপ্ত পানি থাকলেও। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অজু করছিলেন। তিনি বলেন,

---

২৪০. *মুসলিম*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মুসাকাত, বাব : ফাদলুল-গারসি ওয়ায-যারয়ি, হাদিস নং ১৫৫২; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭৪০১।

২৪১. *সুনানে নাসায়ি*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : ইহ্‌ইয়াইল-মাওয়াত, বাব : আল-হাসসু আলা ইহ্‌ইয়াইল-মাওয়াত, হাদিস নং ৫৭৫৬; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫২০৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৪৩১০। শুআইব আরনাউত বলেছেন, এটা সহিহ হাদিস।

«مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»

হে সাদ, কেন এই অপচয়? সাদ বললেন, অজুতেও কি অপচয় হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমনকি তুমি প্রবহমান নদীতে অজু করলেও।[২৪২]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি নোংরা করতে নিষেধ করেছেন। স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[২৪৩]

পরিবেশের প্রতি এটাই হলো ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা উৎকৃষ্টরূপে যে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁর নীতি অনুযায়ীই পরিবেশ-প্রকৃতি তার নানাবিধ পরিপার্শ্ব নিয়ে আন্তঃক্রিয়া, পরিপূর্ণতা লাভ ও পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখে। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পরিবেশের সৌন্দর্য রক্ষা করা আবশ্যক করে দিয়েছে।

03.07.'21
6:45 pm

---

২৪২. *সুনান ইবনে মাজাহ*, কিতাব : আত-তাহারাত, বাব : মা জাআ ফিল-কাসরি ওয়া কারাহিয়াতি আত-তাআদ্দি ফিহি, হাদিস নং ৪২৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ৭০৬৫।

২৪৩. *মুসলিম*, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আত-তাহারাত, বাব : আন-নাহয়ু আন আল-বাওলি ফি আল-মায়ি আর-রাকিদ, হাদিস নং ২৮১; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৬৯; *তিরমিযি*, হাদিস নং ৬৮।
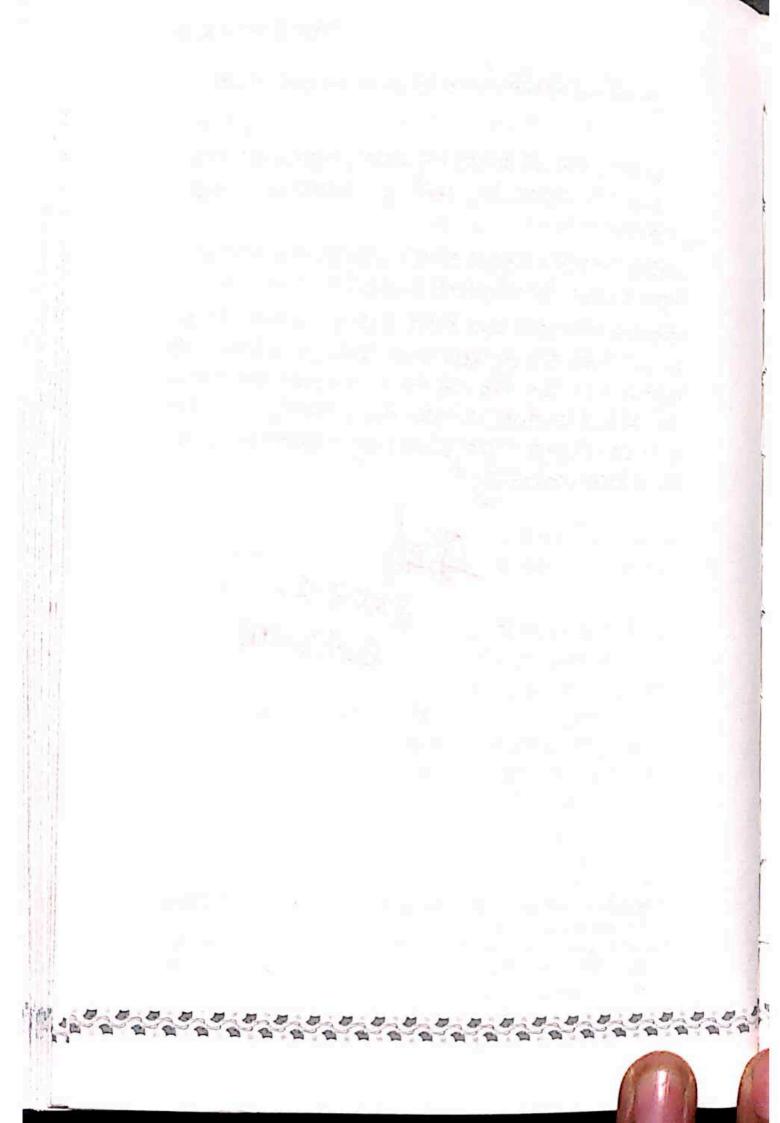
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা

ইসলাম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাকে একটি আসমানি নীতি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যাতে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্বাধীনতা কখনো সমাজ-বিকাশের কোনো ফল ছিল না, স্বাধীনতা-বঞ্চিতদের প্রার্থিত বিপ্লবের পরিণতিও ছিল না। সামসময়িক বহু জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে অনুরূপ অবস্থা এখনো বিদ্যমান।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোর আলোচনা এ বিষয়টি স্পষ্ট করবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বাসের স্বাধীনতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : চিন্তার স্বাধীনতা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মত প্রকাশের স্বাধীনতা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ব্যক্তি স্বাধীনতা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মালিকানার স্বাধীনতা

প্রথম অনুচ্ছেদ

১. বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে স্পষ্ট মৌলিক নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾

দ্বীন গ্রহণে জোরজবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।[২৪৪]

ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী মুসলিমগণ কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জবরদস্তিমূলক নির্দেশ দেননি। তেমনই মৃত্যু ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইসলামকে নিজেদের ধর্ম বলে প্রকাশ করতে মানুষকে বাধ্য করেননি। তা তারা কীভাবে করতে পারেন, অথচ তারা জানেন যে আখিরাতের হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ইসলামের কোনো মূল্য নেই এবং আখিরাতের দিকেই প্রত্যেক মুসলিম ধাবমান?!

উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযুল হিসেবে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, জাহিলি যুগে যদি কোনো নারী মৃতবৎসা (যে নারীর সন্তান জীবিত থাকে না) হতো, সে এরূপ মানত করত, যদি তার কোনো সন্তান জীবিত থাকে তাহলে তাকে ইহুদি বানাবে। অবশেষে বনু নাযিরকে যখন দেশান্তর করা হলো, তাদের মধ্যে আনসারদের ওই ধরনের কয়েকজন সন্তান ছিল। আনসাররা বললেন, আমরা আমাদের সন্তানদের ছাড়ব না। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন,

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ﴾

দ্বীন গ্রহণে জোরজবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।[২৪৫]

---

২৪৪. সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৬।

ইসলাম ঈমান পোষণ করা ও না করার বিষয়টিকে মানুষের অভিপ্রায় ও অভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

আর বলুন, সত্য আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, সুতরাং যার ইচ্ছা সত্য বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।[২৪৬]

আল-কুরআন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিকে এই বাস্তবিক সত্যের প্রতি আকর্ষণ করেছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, তাঁর দায়িত্ব হলো কেবল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, মানুষকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর ক্ষমতা তাঁর নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?[২৪৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾

আপনি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন।[২৪৮]

অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾

যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আমি আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কাজ তো কেবল বাণী পৌঁছে দেওয়া।[২৪৯]

---

[২৪৫]. সুনানে আবু দাউদ, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : ফিল-আসিরি ইয়ুকরাহু আলাল ইসলাম, হাদিস নং ২৬৮২; আল-ওয়াহিদি, *আসবাবু নুযুলিল কুরআন*, পৃ. ৫২; সুয়ুতি, *লুবাবুন নুযুল*, পৃ. ৩৭।

[২৪৬]. সুরা কাহফ : আয়াত ২৯।

[২৪৭]. সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৯।

[২৪৮]. সুরা গাশিয়া : আয়াত ২২।

[২৪৯]. সুরা শুরা : আয়াত ৪৮।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মুসলিমদের সংবিধান বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে এবং কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।[২৫০]

ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতিদান, অর্থাৎ বহুধর্মীয় অনুশীলনের অনুমোদন প্রদান বিষয়টির বাস্তব প্রয়োগ ঘটেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনার প্রথম সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি ইহুদিরা মুসলিমদের সঙ্গে মিলে একটি উম্মাহ গঠন করবে বলে অনুমোদন দিয়েছেন। একইভাবে মক্কা বিজয়ের সময়ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। যদিও তাঁর সক্ষমতা ছিল, বিজয়ী প্রতাপ ছিল। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশে বলেন,

﴿اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ﴾

তোমরা যাও, তোমরা মুক্ত।[২৫১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আল-কুদসের অধিবাসী খ্রিষ্টানদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, তাদের জীবন, উপাসনালয় (গির্জা) ও ক্রুশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন, তাদের কেউই ধর্মের কারণে ক্ষতি বা অপদস্থতার শিকার হয়নি।[২৫২]

ইসলাম বরং পারস্পরিক তিরস্কার ও গালিগালাজ থেকে মুক্ত থেকে বাস্তবিক ভিত্তির ওপর ধর্মীয় তর্কবিতর্কের অনুমোদন দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

---

২৫০. মাহমুদ হামদি যাকযুক, *হাকায়িকু ইসলামিয়্যা ফি মুওয়াজাহাতি হামলাতিত তাশকিক*, পৃ. ৩৩।

২৫১. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৪১১; তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৫৫; ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৪, পৃ. ৩০১।

২৫২. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১০৫।

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করো উত্তম পন্থায়।[২৫৩]

এই সমুন্নত নীতিমালার আলোকেই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে (ধর্মীয়) আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্কবিতর্ক হওয়া উচিত। এই নীতি অনুসারেই পবিত্র কুরআন আহলে কিতাবদের উদ্দেশে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

আপনি বলুন, হে কিতাবিগণ, এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোনোকিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত কাউকেও রব হিসেবে গ্রহণ না করি। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো যে আমরা মুসলিম।[২৫৪]

এই আহ্বানের অর্থ হলো, আলোচনা যদি ফলপ্রসূ না হয় এবং কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না যায়, তাহলে প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে, সে যে দ্বীনে সন্তুষ্টি বোধ করে সেই দ্বীন মান্য করার। সুরা কাফিরুনের শেষ আয়াত এ ব্যাপারটিই ব্যক্ত করেছে। সুরাটি মুশরিকদের উদ্দেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে আল্লাহর এই বাণীর দ্বারা শেষ হয়েছে,

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।[২৫৫]

---

২৫৩. সুরা নাহল : আয়াত ১২৫।

২৫৪. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৬৪।

২৫৫. সুরা কাফিরুন : আয়াত ৬।
মাহমুদ হামদি যাকযুক, *হাকায়িকু ইসলামিয়্যা ফি মুওয়াজাহাতি হামলাতিত তাশকিক*, পৃ. ৮৫-৮৬।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২. চিন্তার স্বাধীনতা

ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। বিষয়টি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কারণ, ইসলাম গোটা সৃষ্টিজগৎ, আকাশমণ্ডল ও জমিন নিয়ে চিন্তা করতে, বুদ্ধি খাটাতে আহ্বান জানিয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾

বলুন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখো।[২৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হলো বক্ষস্থিত হৃদয়।[২৫৭]

ইসলাম বরং যারা তাদের চিন্তাশক্তি ও অনুভূতিশক্তি কাজে লাগায় না তাদের মারাত্মকভাবে নিন্দা করেছে। তাদের জীবজন্তুর স্তরের চেয়েও নিচু স্তরে স্থাপন করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

২৫৬. সুরা সাবা : আয়াত ৪৬।

২৫৭. সুরা হজ : আয়াত ৪৬।

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা পশুর মতো, বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।[২৫৮]

যারা ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করে (ধারণা ও অনুমানের বশবর্তী হয়ে কর্মকাণ্ড করে) তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম কঠিন আক্রমণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, কিন্তু সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোনো মূল্য নেই।[২৫৯]

একইভাবে যারা তাদের বাপদাদা ও নেতারা সত্যের ওপর রয়েছে না মিথ্যার ওপর তা নিরীক্ষণ করা ছাড়াই তাদের অনুসরণ করে, তাদের প্রতিও কুরআন আক্রমণ হেনেছে। তাদের হীনতার দিকে ইঙ্গিত করে কুরআন বলে,

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾

তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম আর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।[২৬০]

ইসলামি আকিদা প্রমাণ করতে ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভর করেছে। এ কারণেই ইসলামের মনীষীগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্ণনামূলক জ্ঞানের ভিত্তি হলো বুদ্ধিমত্তা। আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণসাপেক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

---

২৫৮. সুরা আরাফ : আয়াত ১৭৯।

২৫৯. সুরা নাজম : আয়াত ২৮।

২৬০. সুরা আহযাব : আয়াত ৬৭

আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের বিষয়টিও প্রথমত বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে প্রমাণিত হয়েছে, তারপর মুজিযাসমূহ তাঁর নবুয়তের শুদ্ধতাকে প্রমাণসিদ্ধ করেছে। ইসলাম বুদ্ধি ও চিন্তাকে এভাবেই সম্মানিত করেছে।

চিন্তাভাবনা ইসলামের দৃষ্টিতে আবশ্যক দ্বীনি কার্য বলে বিবেচিত। যেকোনো অবস্থায়ই হোক এই দ্বীনি কর্তব্যকে অবহেলা করা কোনো মুসলিমের জন্যই জায়েজ নয়। দ্বীনি বিষয়সমূহে চিন্তাচর্চার জন্য ইসলাম বিশাল দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তার একটি কারণ হলো জীবনে যা-কিছু নতুন ঘটবে সেসবের শরয়ি সমাধান কী তা অনুসন্ধান করা। ইসলামের মনীষীগণ একে (শরয়ি সমাধান অনুসন্ধানকে) 'ইজতিহাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার অর্থ হলো, শরয়ি হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে চিন্তার ওপর নির্ভরশীল হওয়া।[২৬১]

মুসলিমদের কাছে ফিকহের পঠনপাঠন ও চর্চার ক্ষেত্রে এবং ইসলামের প্রথম যুগে যেসব সমস্যার কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না সেগুলোর দ্রুত সমাধান উদ্ভাবনে ইজতিহাদের—যা ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতাকে মূর্ত করে তুলেছে—গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ইজতিহাদের নীতিমালার ফলেই ইসলামি ফিকহের বিখ্যাত মাযহাবগুলোর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। ইসলামি বিশ্ব এসব মাযহাবের শিক্ষার ওপরই এখনো চলমান রয়েছে। মুসলিমদের নিজেদের চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভরশীলতা ছিল এমনই, যখনই তাদের কাছে দ্বীনের বা দুনিয়ার কোনো বিষয় জটিল বা সমস্যাপূর্ণ মনে হয়েছে, যে ব্যাপারে শরয়ি নুসুস (স্পষ্ট বক্তব্য) বর্ণিত হয়নি, তারা চিন্তাভাবনা করে তার সমাধান বের করেছেন। ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক গভীর অবস্থানের ক্ষেত্রে এটাই হলো প্রধান স্তম্ভ। এই বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, যার ওপর মুসলিমগণ ইসলামের ইতিহাসব্যাপী তাদের উৎকর্ষশোভিত সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২৬২]

---

[২৬১]. মাহমুদ হামদি যাকযুক, *হাকায়িকু ইসলামিয়্যা ফি মুওয়াজাহাতি হামলাতিত তাশকিক*, পৃ. ৫৩।

[২৬২]. মাহমুদ হামদি যাকযুক, আল-ইনসানু খলিফাতুল্লাহ-আত-তাফকির ফারিদাহ, *আল-আহরাম* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, রমযান ১৪২৩ হি.-নভেম্বর ২০০২ খ্রি.।

৩. মত প্রকাশের স্বাধীনতা

মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ হলো কোনো সাধারণ ব্যাপারে বা বিশেষ ব্যাপারে ব্যক্তির বিবেচনা অনুযায়ী মত নির্বাচন, মত প্রকাশ ও তা অন্যদের শোনানোর অধিকার। অর্থাৎ, অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন না করে নিজের অভিপ্রায় ও এখতিয়ার অনুযায়ী চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশে ব্যক্তির অধিকার।

এই অর্থে মত প্রকাশের স্বাধীনতা মুসলিমের জন্য ন্যায্য ও প্রতিষ্ঠিত অধিকার। কারণ, ইসলামি শরিয়া তার জন্য এই অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামি শরিয়া ব্যক্তির জন্য যা-কিছুর স্বীকৃতি দিয়েছে তা ক্ষুণ্ন করার বা ছিনিয়ে নেওয়ার অথবা অস্বীকার করার অধিকার কারও নেই। বরং মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব, কেউ তা উপেক্ষা করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর উপদেশদান, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ আবশ্যক করেছেন। মুসলিমরা মত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে না পারলে তাদের পক্ষে এসব শরয়ি অবশ্যকর্তব্যগুলো পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিমদের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা আবশ্যক দায়িত্ব পালনের একটি উপায়, আর যা ব্যতীত অবশ্যকর্তব্য পালন করা যায় না তাও অবশ্যকর্তব্য।

ইসলাম যাবতীয় পার্থিব বিষয়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বৈধতা দিয়েছে। তা সাধারণ (রাষ্ট্রীয়) বিষয় হতে পারে, সামাজিক বিষয়ও হতে পারে। উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাতফান গোত্রের সঙ্গে মদিনার (এক বছরের) এক তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদানের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি করতে চেয়েছেন, যাতে গাতফান গোত্র তাদের মিত্রদের থেকে সরে আসে এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে এবং এ ব্যাপারে সাদ ইবনে মুআয ও সাদ ইবনে

উবাদা রা.-এর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। তারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«جاء الحارث الغطفاني إلى النبي فقال: يا محمد، شاطرنا تمر المدينة. قال: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ السُّعُودَ. فبعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود، فقال: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ الْحَارِثَ يَسْأَلُكُمْ أَنْ تُشَاطِرُوهُ تَمْرَ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَدْفَعُوا إِلَيْهِ عَامَكُمْ هَذَا حَتَّى تَنْظُرُوا فِي أَمْرِكُمْ بَعْدُ. قالوا: يا رسول الله، أوحيٌ من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك، فرأينا تبع لهواك ورأيك. فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا؛ فوالله! لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرى أو قرى»

গাতফান গোত্রের নেতা আল-হারিস আল-গাতফানি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। বললেন, হে মুহাম্মাদ, মদিনার খেজুর অর্ধেক আমাদের দিন। তিনি বললেন, আমি সাদদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিই। তিনি সাদ ইবনে মুআয, সাদ ইবনে উবাদা, সাদ ইবনে রবি, সাদ ইবনে খাইসামা ও সাদ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর কাছে লোক পাঠালেন। তারা এলে তিনি বললেন, আমি তো জেনেছি যে, আরবরা একই তূণীর থেকে (সংঘবদ্ধ হয়ে) তোমাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে। অন্যদিকে হারিস তোমাদের কাছে মদিনার খেজুর অর্ধেক দিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। এখন যদি তোমরা তাকে এই বছরে উৎপন্ন খেজুর (খেজুরের অর্ধেক) দিয়ে দিতে চাও তাহলে তা চিন্তাভাবনা করে দেখো। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তা যদি আসমানের ওহি হয় তাহলে আল্লাহর নির্দেশই মেনে নেব। আর যদি আপনার অভিমত হয়, তাহলে তাও আমরা মেনে নেব। আর যদি বিষয়টা আমাদের ওপর ছেড়ে দেন, তাহলে বলব, আল্লাহর কসম! আমরা নিজেদেরও তাদের সমপর্যায়ের মনে করি।

ক্রয় বা (কোনোকিছুর) ভাড়া ছাড়া তারা আমাদের থেকে একটি খেজুরও পাবে না।[২৬৩]

কল্যাণকামনা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধে যেসব স্পষ্ট বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আল্লাহর এই বাণী,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে।[২৬৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী,

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিমদের ইমামদের জন্য ও তাদের সাধারণের জন্য।[২৬৫]

ইমাম নববি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলিমদের ইমামদের জন্য কল্যাণকামিতার অর্থ হলো সত্যের ব্যাপারে তাদের সাহায্য করা এবং সত্যের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা। তাদের সত্যের নির্দেশদান ও সত্যের বিপরীতগামিতায় তাদের বাধাদান এবং কোমল ভাষায় তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কোনো ব্যাপারে তারা উদাসীন হয়ে গেলে তা

---

২৬৩. তাবারানি, *মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৫৪১৬। হাইসামি বলেছেন, বাযযার ও তাবারানির বর্ণিত সনদে মুহাম্মাদ ইবনে আমর রয়েছে। তার বর্ণিত হাদিস হাসান। তিনি ব্যতীত অন্য রাবিগণ সিকাহ (তুলনামূলক অধিক নির্ভরযোগ্য)। *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ৬, পৃ. ১১৯; এবং ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মাআদ*, খ. ৩, পৃ. ২৪০।

২৬৪. সুরা তাওবা : আয়াত ৭১।

২৬৫. *মুসলিম*, তামিম আদ-দারি থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আদ-দ্বীনুন নাসিহাহ, হাদিস নং ৮২; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৯৪৪; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৪১৯৭, *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৯৮২।

তাদের জানিয়ে দেওয়া এবং মুসলিমদের যে অধিকারের কথা তাদের কাছে পৌঁছায়নি তা পৌঁছে দেওয়া।[২৬৬]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ»

সাবধান, কেউ যদি সত্য অবগত হয়ে থাকে তাহলে মানুষের ভয় যেন তাকে সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে।[২৬৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

শ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের বাণী উচ্চারণ করা।[২৬৮]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার আবশ্যকতা তাদের মতামতের স্বাধীনতা প্রদান করে। আল্লাহ তাদের আবশ্যক কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, তারা যা ভালো মনে করেন বা যা খারাপ মনে করেন এবং যা করতে নির্দেশ দেবেন বা যা থেকে বিরত থাকতে বলবেন সেসব ব্যাপারে তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার তাদের রয়েছে। একইভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি যাদের থেকে পরামর্শ নেবেন তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ দেবেন। এটাই মাশওয়ারা বা মতামত গ্রহণের আবশ্যকতা।

ইসলামের ইতিহাসজুড়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যথার্থ আনুকূল্য পেয়েছে। সম্মানিত সাহাবি হুবাব ইবনুল মুনযির রা. বদর যুদ্ধের সময় মুসলিমদের অবস্থান কী হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তা ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতের বিপরীত। তারপরও তিনি সাহাবির মত গ্রহণ করেছেন।

---

২৬৬. *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*, খ. ২, পৃ. ৩৮।

২৬৭. *তিরমিযি*, আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ফিতান, বাব : মা আখবারান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি-মা হুয়া কায়িনুন ইলা ইয়াওমিল-কিয়ামাহ, হাদিস নং ২১৯১; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৯৯৭।

২৬৮. *তিরমিযি*, আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ফিতান, বাব : আফদালুল জিহাদি কালিমাতু আদ্‌লিনদা সুলতানিন জায়ির, হাদিস নং ২১৭৪; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৩৪৪; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৪২০৯; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪০১১।

ইফকের ঘটনায়ও কতিপয় সাহাবি তাদের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছেন যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর স্ত্রী সাইয়িদা আয়িশা সিদ্দিকা রা.-কে তালাক দিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তবে কুরআন তাকে পবিত্র ঘোষণা করেছে। এসব ছাড়া আরও অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে সাহাবিগণ বা তাদের উত্তরসূরিগণ নিজেদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেছেন।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইসলামি শরিয়ায় একটি স্বীকৃত অধিকার। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে তার মত প্রকাশের জন্য শাস্তি দেওয়া বৈধ হবে না। কারণ, শরিয়ত তাকে মত প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। একজন নারী উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তিনি তখন মসজিদে দেনমোহর প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। উমর রা. তাকে বাধা দেননি, বরং স্বীকার করেছেন যে, সেই নারীই সঠিক। তিনি সেই নারীর বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করে বলেন, একজন নারী সঠিক বলেছে এবং উমর ভুল বলেছে।[২৬৯]

মুসলিমের জন্য কর্তব্য হলো মত প্রকাশের অধিকার কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমানত ও সত্যবাদিতাকে গুরুত্ব দেওয়া। সে যেটাকে সত্য মনে করে সেটাই বলবে, যদিও সেই সত্য তার নিজের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হলো সত্য ও সঠিক কথাটি বলা এবং শ্রোতাদের তা জানানো। তার অর্থ সত্য-মিথ্যায় গোলমাল পাকানো নয় বা সত্য গোপন করা নয়। মত প্রকাশের আরও একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হলো কল্যাণের অভিপ্রায় থাকা। লোক দেখানো, প্রশংসা কুড়ানো, হকদারের মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে দেওয়া, সত্য-মিথ্যায় প্যাঁচ লাগিয়ে দেওয়া, মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করা, দায়িত্বশীলদের খারাপ কাজকে ভালো করে দেখানো, তাদের ভালো কাজকে ছোট করে দেখানো এবং লাভবান হওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো এবং লোকদের তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে মত প্রকাশ বা বক্তব্য উপস্থাপন একেবারেই অনুচিত।

২৬৯. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ.৯৫।

এভাবেই ইসলামি শরিয়া মতামত প্রকাশের যে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে তা রক্ষিত হবে এবং এ কারণেই তা সভ্যতার অগ্রগামিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং ব্যক্তিসত্তার প্রকাশে প্রধান উপায়।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

৪ ব্যক্তি স্বাধীনতা

মানুষের জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে ইসলামের আগমন ঘটেছে। সকল মানবসন্তানের জন্য তা সমতার বিধান দিয়েছে। তাকওয়া ও পরহেযগারিতাকে তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর জাতিগত ও বর্ণগত পার্থক্য মুছে দিয়েছেন এবং চিরতরে গোষ্ঠীগত বৈষম্যের বিনাশ ঘটিয়েছেন। যখন তিনি তাওহিদের বাণী উচ্চারণরত বিলাল ইবনে রাবাহ রা.-কে কাবার ছাদে তুলে দিয়েছেন এবং তাঁর চাচা হামযা রা. ও তাঁর আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়দে রা.-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজে এইসব মূলনীতি ঘোষণা করেছেন,

«أَنْتُمْ بَنُوْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ وَ أَنَّه لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى»

তোমরা আদমসন্তান। আদম মাটির সৃষ্টি। জেনে রাখো, অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব হলো তাকওয়ার ভিত্তিতে।[২৭০]

এসব মূলনীতি ছিল ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা ও দাসত্বের বিনাশের প্রতি আহ্বান।

ইসলামে মূলনীতি এই যে, মানুষ স্বাধীন, তারা দাস নয়। তার কারণ, চূড়ান্ত বিচারে তারা একই পিতার সন্তান এবং জন্মগতভাবেই তারা স্বাধীন।

---

২৭০. *আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৫৩৬।

ইসলাম এই মূলনীতির স্বীকৃতি দিয়েছে এমন এক যুগে যখন মানুষ ছিল দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি। তারা ভোগ করেছে নানা ধরনের লাঞ্ছনা ও বিভিন্ন রকমের গোলামি।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মানবতা যে সমাজ ও সভ্যতার ছায়ায় বসবাস করেছে, উৎপীড়নমূলক নাগরিকব্যবস্থায় তার চেহারা ছিল কদর্য, এই নাগরিকব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পশ্চাৎমুখী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবদলগুলোকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্তকারী বিষম শ্রেণিগত বিভাজন। এই ব্যবস্থার চূড়ায় আসন পেতে বসে ছিল স্বাধীন লোকেরা, যারা নেতৃত্ব ও ক্ষমতার যাবতীয় অধিকার ভোগ করছিল এবং এর নিচে দাস শ্রেণির লোকদেরকে স্বাধীনতা ও সম্মানিত জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নির্মমভাবে পেষণ করা হচ্ছিল।

ইসলাম তার সূচনালগ্নেই মুমিনদেরকে দাস আযাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারটিকে শোভনীয় করে তুলেছে এবং একে অনুগ্রহ ও ক্ষমা বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলাম দাস আযাদ করাকে একটি বড় ইবাদত বলে বিবেচনা করেছে এবং মুমিনদেরকে বিশেষ সম্পদ দ্বারা দাসদের স্বাধীন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। দাসের মুক্তিকেই তার ওপর জুলুম বা তাকে প্রহার করার কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নির্ধারণ করেছে। দাসমুক্তিকে সুন্নত ও উত্তম কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। ভুলক্রমে হত্যা, যিহার, কসম ভঙ্গ করা, রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করা ইত্যাদির গুনাহের জন্য দাসমুক্তিকে কাফফারা সাব্যস্ত করেছে। দাসদের মধ্যে যারা (অর্থের বিনিময়ে) নিজেদের মুক্তির চুক্তি করতে চায় তাদেরকে সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলাম যাকাত প্রদানের একটি খাত দাসদের (মুক্তির) জন্য নির্ধারণ করেছে। মনিবের মৃত্যুর পর উম্মুল ওয়ালাদকে (মনিবের ঘরে যে দাসীর সন্তান হয়েছে) স্বাধীন ঘোষণা করেছে।

এই মানবিক সমস্যার সমাধানে ইসলামের প্রজ্ঞাপূর্ণ রূপরেখার সারমর্ম তিনটি পয়েন্টে নিয়ে আসা যায় :

১. ইসলাম দাসত্বের উৎসগুলো বন্ধ করে দিয়েছে এবং তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তবে যুদ্ধবন্দিদের বিষয়টি ভিন্ন।

২. দাসমুক্তির ব্যাপক খাত সৃষ্টি করেছে এবং

৩. মুক্তির পর দাসদের অধিকারসমূহের সুরক্ষা দিয়েছে।

ইসলামি শরিয়া নবগঠিত ও বিকাশমান মুসলিম সমাজকে দাসদের মুক্ত করতে ও তাদের স্বাধীনতা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর জন্য তাদের আখিরাতে বিরাট প্রতিদান দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ»

যে-কেউ একজন দাস মুক্ত করে দিলে আল্লাহ সেই দাসের প্রতি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন। এমনকি তার যৌনাঙ্গের বিনিময়ে তার যৌনাঙ্গকেও মুক্তি দেবেন।[২৭১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীদের মুক্ত করে দিয়ে তাদের বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ...»

যে-কেউ তার ক্রীতদাসীকে উত্তম শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, তারপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে বিবাহ করে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।...[২৭২]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»

---

২৭১. *বুখারি*, কিতাব : কাফফারাতুল আইমান, বাব : আল্লাহ তাআলার বাণী 'অথবা দাস মুক্ত করা' (সুরা মায়িদা : আয়াত ৮৯) ওয়া আয়্যুর-রিকাবি আযকা, হাদিস নং ৬৩৩৭; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইত্ক, বাব : ফাদলুল-ইত্ক, হাদিস নং ১৫০৯।

২৭২. *বুখারি*, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : ইত্তিখাযুস সারারি ..., হাদিস নং ৪৭৯৫।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রা.-কে স্বাধীন করে দিলেন এবং এই স্বাধীনতাকে তার বিয়ের মোহরানা ধার্য করলেন।[২৭৩]

দাসশ্রেণি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ উপদেশমালা ছিল তাদের মুক্ত ও স্বাধীন করার পথে সমাজ-সংস্কারের চাবিকাঠি। তিনি দাস-দাসীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি শব্দ-ব্যবহার ও বাগ্‌ভঙ্গিতেও শিষ্টাচার বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي. كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلاَمِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي»

তোমাদের কেউ 'আমার দাস', 'আমার বাঁদি' ইত্যাদি যেন না বলে। কেননা, তোমরা সকল পুরুষই আল্লাহর দাস এবং সকল নারীই আল্লাহর বাঁদি। বরং সে যেন বলে, 'আমার সেবক', 'আমার সেবিকা', 'আমার ছেলে', 'আমার মেয়ে'।[২৭৪]

একইভাবে ইসলাম গৃহবাসীরা যে আহার গ্রহণ করে ও যে পোশাক পরিধান করে তা দাস-দাসীদের খাওয়াতে ও পরাতে নির্দেশ দিয়েছে। তাদের ওপর সাধ্যের বাইরে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাস-দাসীদের কল্যাণ বিধানের উপদেশ দিয়ে বলতেন,

«فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللهِ»

তোমরা যা খাও তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও, তোমরা যে পোশাক পরিধান করো তাদেরকে তা থেকে পরিধান করাও এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তি দিয়ো না।[২৭৫]

---

[২৭৩]. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাগাযি, বাব : গাযওয়াতু খাইবার, হাদিস নং ৩৯৬৫; বাব : ফাজিলাহ ই'তাক আমাত সুম্মা ইয়াতাযাওওয়াজুহা, হাদিস নং ১৩৬৫।

[২৭৪]. *বুখারি*, কিতাব : আল-ইত্‌ক, বাব : কারাহিয়াতুত তাতাউল আলার-রাকিক..., হাদিস নং ২৪১৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আলফায মিনাল-আদাব ওয়া গাইরিহা, বাব : হুকুম ইতলাকু লাফযিল আবদি ওয়াল-আমাতি, হাদিস নং ২২৪৯।

[২৭৫]. *মুসলিম*, কিতাব : আল-আইমান, বাব : ইতআমুল মামলুকি মিম্মা ইয়া'কুলু..., হাদিস নং ১৬৬১; *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৫২১; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, খ. ১, পৃ. ৭৬।

একইভাবে ইসলাম দাস-দাসীদের অন্যান্য অধিকার ঘোষণা করেছে যা তাদের মানব-অস্তিত্বকে উন্নীত করেছে, যার সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সুযোগ নেই।

ইসলাম আরও গুরুত্ব দিয়ে দাস-দাসীদের কষ্টদান ও প্রহারের শাস্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছে তাদের মুক্ত ও স্বাধীন করে দেওয়াকে, যাতে মানবসমাজ সত্যিকার মুক্তি ও স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ হতে পারে। বর্ণিত আছে যে, একবার আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার একজন গোলামকে পেটালেন। তারপর ডেকে আনলেন, দেখলেন তার পিঠে (প্রহারের) দাগ পড়ে গেছে। তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি? গোলাম বলল, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি মুক্ত। তারপর তিনি মাটি থেকে একটি বস্তু তুলে নিলেন এবং বললেন, এতে (তোমাকে মুক্ত করে দেওয়ায়) এতটুকু ওজনের সওয়াবও মেলেনি। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»

যে লোক তার গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করল (অথবা অপরাধের চেয়ে বেশি শাস্তি দিলো) বা চড় মারল, তার কাফফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া।[২৭৬]

ইসলাম এই বিধানও দিয়েছে যে, একবার দাসমুক্তির কথা উচ্চারণ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর হয়ে যাবে। কথার কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ»

তিনটি বিষয়ে সত্য উক্তি ও হাসিঠাট্টার উক্তি উভয়টি সত্য উক্তি বলে বিবেচিত হবে : এক. তালাক, দুই. বিবাহ ও তিন. দাস-দাসী মুক্ত করা।[২৭৭]

---

২৭৬. *মুসলিম*, কিতাব : আল-আইমান, বাব : সুহবাতুল মামালিক ওয়া কাফফারাতু মান লাতামা আবদাহু, হাদিস নং ১৬৫৭; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫১৬৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ৫০৫১।

২৭৭. *মুসনাদ আল-হারিস*, হাদিস নং ৫০৩; বাইহাকি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে মাওকুফরূপে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। খ. ৭, পৃ. ৩৪১।

ইসলাম দাসমুক্তিকে পাপ মার্জনা ও গুনাহ থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় বলে আখ্যায়িত করেছে। তার কারণ এই যে, এতে অধিকাংশ দাস-দাসীরই মুক্তি ও স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। কারণ, পাপের কোনো শেষ নেই, আদমসন্তানের প্রত্যেকের থেকে পাপকাজ হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا»

কোনো মুসলিম কোনো মুসলিম দাসকে মুক্ত করলে সে হবে তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ, তার (মুক্ত দাসের) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (মুক্তিদাতার) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে। কোনো মুসলিম পুরুষ দুইজন মুসলিম দাসীকে মুক্ত করলে তারা হবে তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ, তাদের (দুই মুক্ত দাসীর) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। কোনো মুসলিম নারী কোনো মুসলিম দাসীকে মুক্ত করলে সে হবে তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ, তার (মুক্ত দাসীর) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার (মুক্তিদাতা নারীর) প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে।[২৭৮]

ইসলাম দাস-দাসীদেরকে লিখিত বিনিময়চুক্তির মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার সুযোগ দিয়েছে। তা হলো দাস বা দাসীকে তার মনিবের সঙ্গে নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ প্রদানের চুক্তি করবে এবং তার বিনিময়ে সে স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ক্ষেত্রে দাস বা দাসীকে সাহায্য করা মনিবের অবশ্যকর্তব্য বলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে। কারণ, মুক্তি ও

২৭৮. মুসলিম। কিতাব : আল-ইতক, বাব : ফাদলুল-ইতক, হাদিস নং ১৫০৯; তিরমিযি আবু উমামা থেকে, হাদিস নং ১৫৪৭; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৫২২।

স্বাধীনতাই হলো মৌলিক বিষয়, দাসত্ব হলো আপতিত বিষয়। এই ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আদর্শ। জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস রা.-এর বিনিময়চুক্তির সব টাকা পরিশোধ করে তিনি তাকে বিয়ে করেন।[২৭৯]

মুসলিমগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে জুওয়াইরিয়ার বিয়ের সংবাদ শুনে তাদের হাতে যত বন্দি ছিল সবাইকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, তারা তো রাসুলুল্লাহর শ্বশুরের গোষ্ঠী। জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিসের কল্যাণে বনু মুস্তালিক গোত্রের একশজন মানুষ মুক্তি পেল।[২৮০]

তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো, ইসলাম দাসমুক্তিকে যাকাতের একটি খাত বলে বিধান দিয়েছে। (দাসকে তার মুক্তির জন্য যাকাতের টাকা প্রদান করা যাবে।) আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾

সদকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য[২৮১], দাসমুক্তির জন্য।[২৮২]

---

২৭৯. বনু মুস্তালিক যুদ্ধে গোত্র-প্রধানের কন্যা জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস বন্দি হন ও তার স্বামী (ও তার চাচাতো ভাই) মুসাফি ইবনে সাফওয়ান ইবনে আবুশ শাফর নিহত হন। গনিমতের সম্পদ বণ্টনের সময় তিনি সাবিত ইবনে কাইস রা.-এর ভাগে পড়েন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। তিনি সাবিত ইবনে কাইসের সঙ্গে মুক্তির জন্য লিখিত বিনিময়চুক্তি করেন এবং এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য চান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুওয়াইরিয়ার সম্মতি নিয়ে তার বিনিময়চুক্তির টাকা পরিশোধ করে তাকে বিয়ে করেন।-অনুবাদক

২৮০. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস-সালেহি আশ-শামি, *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ*, খ. ১১, পৃ. ২১০; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ৩, পৃ. ৩০৩; সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ৪, পৃ. ১৮।

২৮১. যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার আশা আছে, তার মন জয় করার জন্য তাকে অথবা যে মুসলিমকে কিছু দিলে ইসলামের প্রতি তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার আশা আছে তাকে যাকাত দেওয়া যায়।

২৮২. সুরা তাওবা : আয়াত ৬০।

বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬৩ দাস-দাসীকে এবং আয়িশা রা. ৬৯ দাস-দাসীকে মুক্ত করেছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রা. অসংখ্য দাস-দাসীকে মুক্ত করেছিলেন। আব্বাস রা. ৭০ দাসকে এবং উসমান ইবনে আফফান রা. ২০ দাস-দাসীকে মুক্ত করেছিলেন। হাকিম ইবনে হিযাম রা. একশ দাস-দাসী এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এক হাজার দাস-দাসী মুক্ত করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. ত্রিশ হাজার দাস-দাসী মুক্ত করেছিলেন।[২৮৩]

দাস-ব্যবসার সংকোচনে ইসলামের উপর্যুক্ত নীতিসমূহ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এমনকি পরবর্তী সময়ে দাস-ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ইসলামি শাসনামলগুলোতে দেখা গেছে যে, দাসেরা দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বের শিখরে পৌঁছে গেছে। এই ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো মামলুক সাম্রাজ্যের শাসনামল। মুসলিম উম্মাহর বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল এবং তা প্রায় তিনশ বছর টিকে ছিল। সন্দেহাতীতভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

---

২৮৩. আল-কাত্তানি এসব সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, *আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা*, পৃ. ৯৪-৯৫।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫. মালিকানার স্বাধীনতা

মালিকানার প্রশ্নে প্রাচীন পৃথিবী ও আধুনিক পৃথিবীর অস্থিরতার শেষ নেই। এ ব্যাপারে নানা ধরনের মত এবং নানা পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে। কমিউনিজমের উদ্ভব ঘটেছে, যা ব্যক্তির মূল্য ও স্বাধীনতাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে কেউই কোনো ভূমির বা কারখানার বা স্থাবর সম্পত্তির বা অন্য কোনো উৎপাদন উপকরণের মালিক হতে পারবে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের শ্রমিক হয়ে কাজ করতে হবে, রাষ্ট্রই সকল উৎপাদন-উৎসের মালিক ও তাদের পরিচালক। ব্যক্তির জন্য পুঁজির মালিক হওয়া অবৈধ, যদিও পুঁজি বৈধ হয়।

একইভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে। পুঁজিবাদের ভিত্তি হলো ব্যক্তির মালিকানা-স্বাধীনতার পবিত্রকরণ ও তার লাগামহীনতা। ফলে ব্যক্তি যা ইচ্ছা তার মালিক হতে পারে এবং মালিকানাধীন সম্পদকে যেভাবে খুশি বৃদ্ধি করতে পারে এবং যেখানে খুশি তা খরচ করতে পারে। সম্পদের মালিক হওয়া, তা বৃদ্ধি করা ও তার খরচ করার যত ধরনের উপায় আছে সেগুলোতে কোনো বিধিনিষেধ নেই। ব্যক্তির সম্পদে সমাজের কোনো ধরনের অধিকারও নেই।

পুঁজিবাদ ব্যক্তি-মালিকানার বিষয়টিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলতে বাড়াবাড়ি করেছে এবং কমিউনিজম ব্যক্তি-মালিকানাকে বাতিল করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। ফলে এই দুটি অর্থব্যবস্থা সর্বদিক থেকে ক্ষতিকর ও অশুভ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম অর্থব্যবস্থায় মধ্যপন্থার কথা বলেছে, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করে। ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানার বৈধতা দিয়েছে এবং অন্যদের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা তৈরি করে দিয়েছে। যেমন গণমানুষের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বস্তুতে (ব্যক্তি) মালিকানার অধিকার নিষিদ্ধ করেছে এবং গণমালিকানা নিশ্চিত করেছে। এর অর্থ এই যে, ইসলাম ভারসাম্য ও

সমতা বজায় রাখতে ব্যক্তি-মালিকানার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং গণমালিকানার স্বাধীনতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইসলাম ব্যক্তিকে বস্তুর অধিকার লাভ এবং নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও নির্ধারিত মাত্রায় সেসব বস্তু ভোগ করতে মালিকানার অধিকার দিয়েছে। কারণ তা স্বাভাবিক প্রকৃতির চাহিদাগুলোর অন্যতম এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার একটি বৈশিষ্ট্য, বরং তা মনুষ্যত্বেরও অনন্য বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া ব্যক্তি-মালিকানা অধিক ও উত্তম উৎপাদনের একটি শক্তিশালী কারণ। ইসলাম এই অধিকারকে ইসলামি অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্থির করেছে। এই নীতির স্বাভাবিক ফলাফল, সম্পদকে তার মালিকের জন্য সুরক্ষিত রাখা এবং ছিনতাই, চুরি ও গচ্চা যাওয়া থেকে হেফাজত করা ইত্যাদি। ইসলাম এই অধিকারের নিরাপত্তা বিধান এবং ব্যক্তি তার বৈধ অধিকারের ক্ষেত্রে যেসব হুমকির সম্মুখীন হয় সেগুলোকে প্রতিহত করার জন্য যারা এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে তাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। ইসলাম মালিকানার অধিকারের অন্য পরিণতিও নিশ্চিত করেছে, তা হলো লেনদেনের স্বাধীনতা : বেচা-কেনা, ভাড়া দেওয়া, বন্ধক রাখা, (হেবা করা) উইল করা ও অন্যান্য বৈধ লেনদেনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।

তবে ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানাকে কোনো ধরনের শর্ত বা সীমারেখা ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়নি, বরং ব্যক্তি-মালিকানার জন্য শর্ত ও সীমারেখা নিরূপণ করেছে, যাতে অন্যদের অধিকার বিনষ্ট না হয়। যেমন সুদ, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, ঘুষ, মজুতদারি ইত্যাদি যেসব অশুভ কর্মকাণ্ড সমাজের কল্যাণ বিনষ্ট করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। ব্যক্তি-মালিকানার স্বাধীনতায় নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, এটিই আল্লাহ তাআলার নিম্নলিখিত বাণীর উদ্দেশ্য,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾

পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ।[২৮৪]

---

২৮৪. সুরা নিসা : আয়াত ৩২।

ব্যক্তি-মালিকানার আরেকটি শর্ত হলো ব্যক্তি তার সম্পদকে উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করবে। সম্পদ অনর্থক ফেলে রাখা তা তার মালিকের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনই সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যও ক্ষতিকর। আরেকটি শর্ত হলো সম্পদ নিসাব (যাকাত আবশ্যক হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ) পর্যন্ত পৌছলে এবং এক বছর পূর্ণ হলে তার যাকাত আদায় করা। যাকাত সম্পদের অধিকার।

ইসলামে রয়েছে গণমালিকানার বিধান। এ ধরনের মালিকানায় একটি বিশাল মানবসমাজের অথবা কয়েকটি মানব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ থাকে এবং সকল সদস্যই তার উপকারিতা লাভ করে। ব্যক্তি সমাজের সদস্য হওয়ার কারণেই গণমালিকানা থেকে উপকার পেয়ে থাকে, যদিও তার জন্য বিশেষ অংশ নির্ধারিত থাকে না। যেমন মসজিদ, পাবলিক হাসপাতাল, রাস্তা, নদী, সমুদ্র, ব্রিজ, সেতু ইত্যাদি। এগুলোর মালিক সমাজের সবাই এবং সকলের কল্যাণে এগুলো ব্যবহৃত হয়। শাসক বা শাসকের প্রতিনিধি বা পরিচালন-কর্তৃপক্ষ এগুলোর মালিক নয়, তাদের দায়িত্ব হলো সুচারুরূপে পরিচালনা করা এবং সঠিক নির্দেশনায় এগুলোর উন্নতি বিধান করা এবং এ দুটি দায়িত্বই মুসলিম সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

ইসলাম মালিকানা লাভে কতিপয় পন্থা ও উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং বাকি পন্থা ও উপায় নিষিদ্ধ করেছে। ব্যক্তি-মালিকানা লাভের উপায়গুলোকে দুটি গুচ্ছে ভাগ করেছে : এক. মালিকানায় অর্জিত সম্পদ, অর্থাৎ, যেসব সম্পদের মালিকানা রয়েছে। এসব সম্পদ শরয়ি কারণ বা উপায় ব্যতীত তার মালিকের মালিকানা থেকে অন্যের মালিকানায় আসবে না। যেমন উত্তরাধিকার, উইল বা ওসিয়ত, বিনিময়চুক্তি, অগ্রক্রয়াধিকার, হেবা ইত্যাদি। দুই. দ্বিতীয় গুচ্ছে রয়েছে বৈধ সম্পদ, অর্থাৎ যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানায় যায়নি। এসব সম্পত্তির মালিকানা নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ না কোনো কর্মের দ্বারা তা মালিকানায় ও অধিকারে আসে। যেমন মৃত ভূমি আবাদ করা, শিকার করা, খনিজ সম্পদ বা পদার্থ উত্তোলন করা, অথবা শাসক কর্তৃক এমন সম্পত্তির একটি অংশ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দান করা।

ইসলামে গণমালিকানার উপায়গুলো বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা যায়।

১. প্রাকৃতিক গণসম্পদ। রাষ্ট্রের সকল মানুষ কোনো ধরনের প্রচেষ্টা বা কর্ম ছাড়াই এগুলো লাভ করে থাকে। যেমন পানি, ঘাস, আগুন ও আনুষঙ্গিক বিষয়।

২. সংরক্ষিত সম্পদ। অর্থাৎ, রাষ্ট্র তা মুসলিম বা সকল মানুষের উপকারের জন্য সংরক্ষণ করে। যেমন কবরস্থান, সরকারি এলাকাসমূহ, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি, যাকাত ইত্যাদি।

৩. এমন সম্পদ যেখানে কারও হাত পড়েনি অথবা হাত পড়েছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এমনিতেই পড়ে আছে। যেমন অনাবাদি জমি বা খাস জমি।[২৮৫]

মালিকানা রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা সম্পদ পাহারা দেওয়ার ও হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। একইভাবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বৈধকৃত শাস্তির দ্বারা ইসলামি শরিয়ত মালিকানার অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে। যেমন চোরের হাত কাটা ইত্যাদি।

মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত বৈধ উত্তম সম্পদের ওপর, অন্যদের সম্পদ বা হিসাবের ওপর নয়। সুতরাং এতিমদের প্রতারণা করে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না, দরিদ্রদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে ফায়দা হাসিল করা যাবে না, মুখাপেক্ষীদের প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে সুদের মাধ্যমে তাদের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া যাবে না। জুয়ার দ্বারাও সম্পদ অর্জন করা যাবে না, জুয়া সমাজে শত্রুতা ও অরাজকতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।[২৮৬]

---

২৮৫. http://www.islamtoday.net/toislam/11/11.3.cfm

২৮৬. সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৮।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।[২৮৭]

মালিকানা যদি অবৈধ পন্থা বা উপায়ে অর্জিত হয় তাহলে ইসলাম তার স্বীকৃতি দেয় না এবং তার সুরক্ষারও দায়িত্ব নেয় না, বরং তা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আসল মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। যেমন চুরিকৃত মাল বা ছিনতাইকৃত মাল। এসব মালের মালিক পাওয়া না গেলে বাইতুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) রাখা হবে।

ইসলাম সম্পদ অর্জনের পন্থা ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন শর্ত ও শরিয়তসম্মত লেনদেনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। বাতিল পন্থায় ও হারাম উপায়ে বর্ধিত সম্পদের স্বীকৃতি ইসলামে নেই। যেমন সুদি কারবার থেকে বর্ধিত সম্পদ বা মদ ও মাদকদ্রব্য বিক্রির ফলে অর্জিত সম্পদ অথবা জুয়ার আসর বা জুয়ার ক্লাব থেকে অর্জিত সম্পদ। কারও মালিকানায় অর্থসম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছে গেলে সমাজের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক করা হয়েছে, যাকাত ও শরয়ি খরচাদির মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। একইভাবে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি সম্পদে ওসিয়ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকারীদের জন্য সুরক্ষিত থাকে।

ইসলাম অর্থসম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা অবলম্বনের শর্তারোপ করেছে। অপচয়ও করা যাবে না, কৃপণতাও করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾

এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।[২৮৮]

---

২৮৭. সুরা নিসা : আয়াত ২৯।

একইভাবে অবৈধ খাতে, ইসলামি শরিয়ত যেসব বিষয় হারাম করেছে সেসব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জনসাধারণের উপকারের স্বার্থে মালিককে ন্যায্য বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ নিয়ে নেওয়ারও বৈধতা দেওয়া হয়েছে। যেমন জনপথ প্রশস্ত করার জন্য সম্পদ অধিগ্রহণ করা।[২৮৯]

ইসলামি রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পদের এই অনুপম অনন্য ব্যবস্থা ভোগ করে থাকে, হোক তারা মুসলিম বা অমুসলিম। এভাবে তারা অনেক সম্পদের মালিকও হতে পারে। উদাহরণত, দশম আব্বাসি খলিফা মুতাওয়াক্কিলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও একান্ত বিশ্বাসভাজন খ্রিষ্টান বুখতাইশু ইবনে জিবরিল পোশাক-আশাকে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, ধনে-সম্পদে খলিফার মতোই ছিলেন।[২৯০] একই সময়ে এই সকল লোক গণমালিকানার কল্যাণে প্রাচুর্য ও বৈভব ভোগ করেছেন।

ইসলামে এমনই মালিকানার স্বাধীনতা। এটা সকলের জন্য সুনিশ্চিত অধিকার। কিন্তু শর্ত এই যে, এই অধিকার ব্যবহার করে গণকল্যাণের ক্ষতি করা যাবে না এবং অন্যদের ব্যক্তিগত কল্যাণ বিনষ্ট করা যাবে না।

---

২৮৮. সুরা ফুরকান : আয়াত ৬৭।

২৮৯. সুলাইমান ইবনে আবদুর রহমান আল-হাকিল, *হুকুকুল ইনসান ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৫৭।

২৯০. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৬৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবার

মুসলিম পরিবার ইসলামি সমাজের প্রাসাদে একটি ভিত্তি-ইটের ভূমিকা পালন করে। মুসলিম পরিবারই এই সমাজের রক্ষাদুর্গ এবং তার নিরাপত্তা ও শান্তির প্রহরী।

ইসলাম পরিবারকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং পরিবারের জন্য যৌক্তিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করেছে। পরিবারের ব্যক্তি সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করেছে। বিবাহ, খরচাদি, উত্তরাধিকার (মিরাস), সন্তান লালনপালন, মা-বাবার অধিকার ইত্যাকার কর্মনীতি প্রণয়ন করেছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা ও মায়া-মমতা দৃঢ়মূল করে দিয়েছে। তার কারণ এই যে, পরিবার শক্তিশালী হলে এবং পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ ও কাজকর্ম যথাযথ হলে সমাজও শক্তিশালী হয়, সমাজ সুন্দরভাবে গতিশীল থাকে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সৌজন্যবোধ জাগরূক থাকে। ইসলাম সমাজকে সভ্যতার আদলে যে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এভাবেই ইসলাম পরিবার ও সমাজকে অনর্থ, চারিত্রিক অধঃপতন ও বংশের বিনষ্টি থেকে সুরক্ষা দিয়েছে।

সামনের অনুচ্ছেদসমূহ থেকে পরিবারের ক্ষেত্রে চরিত্র ও মূল্যবোধের সভ্যতাকেন্দ্রিক বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রী বা দাম্পত্যজীবন

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সন্তান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মা-বাবা (ছোট পরিবার)

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : আত্মীয়স্বজন (বড় পরিবার)
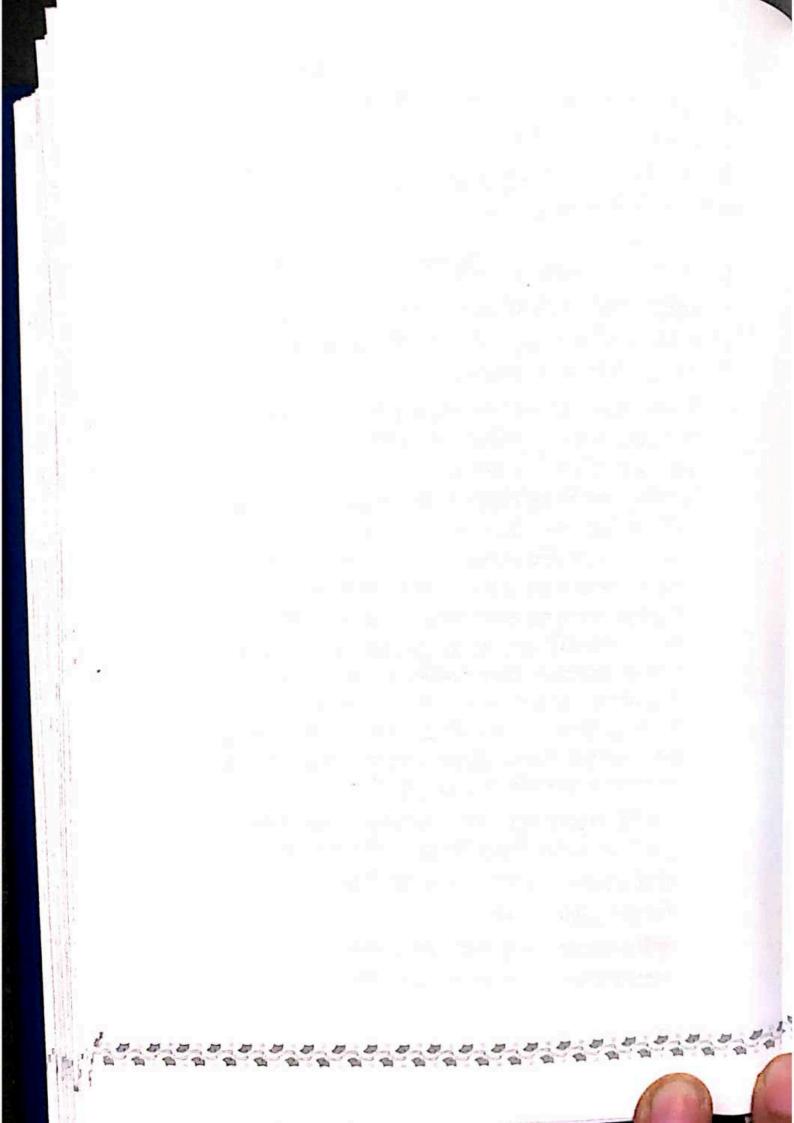
প্রথম অনুচ্ছেদ

১. স্বামী-স্ত্রী বা দাম্পত্যজীবন

পরিবার দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুটি স্তম্ভ পরিবারের ভিত্তি। তারা হলো পুরুষ ও নারী, অর্থাৎ, স্বামী ও স্ত্রী। তারা পরিবার নির্মাণ ও সন্ততি উৎপাদনের মূল ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রীই মানব বংশধারা চালু রাখে, যাদের দ্বারা সমাজ ও উম্মাহ গঠিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾

হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদের এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুইজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।[২৯১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾

এবং আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।[২৯২]

ইসলাম পরিবারের এই দুটি মৌলিক স্তম্ভের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। তাই দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

---

[২৯১]. সুরা নিসা : আয়াত ১।
[২৯২]. সুরা নাহল : আয়াত ৭২।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য অধিকারের ও দায়িত্বের সীমারেখা টেনে দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছে। যাতে তারা উভয়ে পরিবার নির্মাণ ও পরিচালনায় তাদের পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং অব্যাহতভাবে সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখতে পারে।

ইসলাম প্রথমেই বিবাহের বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করেছে। বিবাহের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে রক্ষা করা এবং সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সমাজকে সাহায্য করা। এই সৎ ব্যক্তিরা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং নির্মাণ ও আবাদির দায়িত্ব পালন করবে। এই দায়িত্ব পালনই খিলাফতের বা জমিনে মানুষের প্রতিনিধিত্বের দাবি। বিবাহের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমাজকে অনৈতিকতা ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করা। এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকদের উদ্দেশে বলেন,

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

হে যুব-সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা চোখকে আনত রাখে ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন রোযা রাখে, কেননা, রোযাই হলো তার জন্য খোঁজা হওয়ার মতো।[২৯৩]

কয়েকজন যুবক চিন্তা করেছিলেন যে তারা ইবাদতের জন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন এবং নারীদের পরিত্যাগ করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধমক দেন এবং তাদের এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেন। এই ঘটনা আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا

---

২৯৩. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : মান লাম ইয়াসতাতিল-বাআতা ফালইয়াসুম, হাদিস নং ৪৭৭৯; *মুসলিম*, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : ইসতিহবাবুন নিকাহ লি-মান তাকাত নাফসুহু লাহু, হাদিস নং ১৪০০।

فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

একবার তিনজন লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে এলো। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে তাদের বলা হলো তারা এটিকে কম মনে করল। এবং পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আমরা কোথায় আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় (তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনাই হয় না)? কারণ, তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল, আমি সবসময় রাতভর নামাজ পড়ব। আরেকজন বলল, আমি সবসময় দিনের বেলা রোযা রাখব, কখনো রোযা ভাঙব না। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা নারীদের থেকে দূরে থাকব, কখনো বিয়ে করব না। ঠিক এই সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, তোমরাই কি এমন এমন কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনো রোযা রাখি, কখনো বিরতি দিই; কখনো রাত জাগি (রাত জেগে ইবাদত করি), কখনো ঘুমিয়েও থাকি; আমি নারীদের বিবাহও করি (স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করি)। সুতরাং যারা আমার সুন্নাহ

(জীবনপদ্ধতি) থেকে বিরাগ হয় তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২১৪]

যারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে ও নিজেদের পক্ষ থেকে বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাদের এমন সংকীর্ণ চিন্তার ফলে মানবতার বিরুদ্ধে অনেক বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। পনেরো শতাব্দীব্যাপী সংকট ও অস্থিরতার অভিজ্ঞতা লাভের পর ইউরোপের জ্ঞানী সম্প্রদায় যখন দেখল যে সন্ন্যাসবাদ অন্ধকারে বিপর্যয় ঘটানো ছাড়া আর কিছুই করেনি, তারা এটিকে নিষিদ্ধ করল। দেখা গেছে যে, বহু সংখ্যক পুরোহিত, বিশপ, পাদরি মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুকে ধর্ষণের মতো অপরাধ ঘটিয়েছে। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকায় এই মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। শত শত বিশপ ও পাদরিকে পদচ্যুত করা হয়েছে। গির্জাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি হুমকির মুখে পড়েছে এবং যৌন বিকৃতি ও সীমালঙ্ঘনের ভয়াবহতা তাকে গ্রাস করেছে। আমাদের সত্যনিষ্ঠ দ্বীন আমাদেরকে এ ধরনের যাবতীয় বিকৃতি ও সীমালঙ্ঘন থেকে সুরক্ষা দিয়েছে এবং নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতা ও ইতর ব্যাধি থেকে স্বস্তি দিয়েছে।

বিবাহের পেছনে ইসলামের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির আত্মিক প্রশান্তি অর্জন। ব্যক্তির অন্তরে যে অনুভূতি ও আবেগ ক্রিয়াশীল থাকে তা উজাড় হয় বিবাহের কারণে। তা ছাড়া বিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সুখ-আহ্লাদেরও কারণ, তাদের একজন অপরজনকে সুখ দিয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রী যখন একত্রে থাকে তখন তারা পারস্পরিক উত্তম সঙ্গী, যখন তাদের একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (সফর বা অন্য কোনো কারণে) তখনও তারা উত্তম সঙ্গী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের যাতে

---

২১৪. বুখারি, কিতাব : নিকাহ, বাব : আত-তারগিব ফিন-নিকাহ, হাদিস নং ৪৭৭৬; মুসলিম, কিতাব : নিকাহ, বাব : ইসতিহবাবুন নিকাহ লি-মান তাকাত নাফসুহু ইলাইহি, হাদিস নং ১৪০১।

তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।[২৯৫]

উপর্যুক্ত আয়াতে যে তিনটি মৌলিক বিষয় (শান্তি, ভালোবাসা, দয়া) বিবৃত হয়েছে, এই তিনটি বিষয়ের দ্বারা ইসলামের কাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য সুখ ও সৌভাগ্য নিশ্চিত হয়।

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কে সুন্দর সঙ্গী নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত (তারা পুরুষ হোক বা নারী) তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[২৯৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষকে দ্বীনদার সতী নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

নারীকে (সাধারণত) চারটি গুণের কারণে বিয়ে করা হয় : তার ধনসম্পদের কারণে বা তার বংশগৌরবের কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে ও তার ধর্মপরায়ণতার কারণে। লাভবান হতে চাইলে

---

২৯৫. সুরা রুম : আয়াত ২১।
২৯৬. সুরা নুর : আয়াত ৩২।

ধর্মপরায়ণা নারীকে বিয়ে করো। আরে বোকা, তোমার হস্তদ্বয় ধূলিধূসরিত হোক।[২৯৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীকেও একই মানদণ্ড ও নীতির ভিত্তিতে স্বামী নির্বাচন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

যখন তোমাদের (মেয়েদের বিয়ে করতে) এমন লোক প্রস্তাব দেবে যার দ্বীনদারি ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তার কাছে বিয়ে দিয়ে দাও। তা না করলে জমিনে ফেতনা ও ব্যাপক অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে।[২৯৮]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উত্তম স্ত্রী বা স্বামী নির্বাচনের ফলে মানবসমাজ উপকৃত হয়। কারণ, সৎ ও ধার্মিক স্বামী-স্ত্রীর সন্তানসন্ততির দ্বারাই সৎ ও সুন্দর প্রজন্ম তৈরি হয়। এসব সন্তানসন্ততি ভালোবাসাপূর্ণ ও দয়াময় পরিবারে বেড়ে ওঠে এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিক অনুশাসনের ছায়ায় জীবনযাপন করে।

বিবাহবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন বা চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদন করার পূর্বে কিছু পালনীয় ভূমিকা রয়েছে, যা এই বন্ধনকে অটুট ও সুদৃঢ় রাখবে। বরং ইসলামি শরিয়তে যত ধরনের চুক্তি রয়েছে তার কোনোটির ক্ষেত্রেই বিবাহের মতো পূর্বপালনীয় কর্তব্য জুড়ে দেয়নি। শরিয়ত এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে এবং বিশেষ বিধান জারি করেছে। বিবাহবন্ধনের পূর্বপালনীয় কর্তব্যের মধ্যে একটি হলো 'খিতবাহ' বা 'প্রস্তাব'। প্রস্তাব-পর্যায়ে পারস্পরিক জানাশোনা ও নৈকট্য তৈরি হয়। এক

---

২৯৭. *বুখারি*, কিতাব : নিকাহ, বাব : আল-আকফাউ ফিদ-দ্বীন, হাদিস নং ৪৮০২; *মুসলিম*, কিতাব : আর-রাদাউ, বাব : ইসতিহবাবু নিকাহি যাতিদ-দ্বীন, হাদিস নং ১৪৬৬।

২৯৮. *তিরমিযি*, কিতাব : নিকাহ, বাব : মা জাআ ইযা জাআকুম মান তারযাওনা দ্বীনাহু ফাযাওয়িজুহু, হাদিস নং ১০০৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৯৬৭; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ২৬৯৫। হাকিম বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিমে* তা সংকলিত হয়নি।

পক্ষ অপর পক্ষকে ভালোভাবে জানতে-বুঝতে পারে। এর ভিত্তিতেই বিবাহ-কার্যক্রমের সূচনা হয় অথবা তা নাকচ করে দেওয়া হয়।

ইসলামি শরিয়ত বিবাহচুক্তির শুদ্ধতার জন্য আরেকটি বিষয় শর্ত করেছে। তা হলো তা প্রচার-প্রসার করা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কারণ, বিবাহের দ্বারা জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং তা প্রচার করাই সংগত, যাতে কুধারণার সৃষ্টি না হয় এবং কেউ সন্দেহ না করে।

ইসলাম বিবাহবন্ধনকে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যের ছকে বেঁধে দিয়েছে, যা স্বামী-স্ত্রীর সুখশান্তি নিশ্চিত করে এবং পরিবারের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। ইসলাম পুরুষ ও নারীকে যে শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছে তার ভিত্তিকে পুরুষকে নারীর অগ্রগণ্য বানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

> পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা তাদের সম্পদ থেকে খরচ করে।[২৯৯]

এই অগ্রগণ্যতার কারণে ইসলাম স্বামীর ওপর দেনমোহর ফরজ করেছে এবং একে স্ত্রীর অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

> তোমরা নারীদের তাদের দেনমোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে।[৩০০]

স্ত্রীর আরেকটি অধিকার হলো ভরণপোষণ প্রাপ্তি। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা ও অন্যান্য যত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে সব স্ত্রীর প্রাপ্য। যথাযথ ভালো ব্যবহার প্রাপ্তিও স্ত্রীর অধিকার। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

২৯৯. সুরা নিসা : আয়াত ৩৪।
৩০০. সুরা নিসা : আয়াত ৪।

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

স্ত্রীদের সঙ্গে যথাযথ ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমরা তাদের ঘৃণা করো, তাহলে তোমরা এমনকিছু ঘৃণা করছ যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৩০১]

এ সবকিছুর বিনিময়ে ইসলাম স্ত্রীর ওপর স্বামীকে আনুগত্যপ্রাপ্তির অধিকার দিয়েছে। স্ত্রীর ওপর স্বামীর যত অধিকার রয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আনুগত্য।

এভাবে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও পালনীয় দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং উভয়ের কাছে সদাচার ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ ও যৌথ জীবনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে দাবি জানিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ও জটিলতার সৃষ্টি হলে তার সুরাহার জন্যও যথার্থ পন্থা নির্দেশ করেছে। চরম পর্যায়ে, যখন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলা এবং দাম্পত্যজীবনে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নীতিমালা মান্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তালাকের বৈধতা দিয়েছে।[৩০২]

---

[৩০১]. সুরা নিসা : আয়াত ১৯।

[৩০২]. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু সালিহ, *হুকুকুল ইনসান ফিল-কুরআনি ওয়াস-সুন্নাহ ওয়া-তাতবিকাতুহা ফিল-মামলাকাতিল আরাবিয়্যাতিস সাউদিয়্যা*, পৃ. ১৩৫-১৩৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সন্তান

সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও শোভা। তারা চিত্তের আনন্দ ও চোখের শীতলতা। ইসলাম সন্তানদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামি শরিয়ত মাতাপিতার ওপর সন্তানের অধিকার ও সন্তানের প্রতি কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সন্তান মা-বাবার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার অন্তরে প্রাথমিক জীবনচিত্র অঙ্কন করে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»

> প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (আল্লাহপ্রদত্ত দ্বীন গ্রহণের স্বভাবের) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তার মা-বাবাই তাকে ইহুদি বা নাসারা বা পৌত্তলিক বানায়।[৩০৩]

সন্তানসন্ততির দ্বীনদারি ও চরিত্র গঠনে মা-বাবার বড় প্রভাব রয়েছে। মা-বাবার সততার ওপর নির্ভর করে সন্তানদের কল্যাণ ও উত্তম ভবিষ্যৎ। এ কারণে সন্তানদের অধিকার তাদের জন্মের পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে থাকে। যেমন সততাপরায়ণ মা ও সততাপরায়ণ বাবা নির্বাচন। ইতিপূর্বে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি।

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের উত্তম নির্বাচনের পর সন্তানের যে অধিকারটি সামনে আসে তা হলো তাকে শয়তান (শয়তানের প্রভাব) থেকে সুরক্ষিত রাখা।

---

৩০৩. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : আল-কাদ্‌র, বাব : আল্লাহু আ'লামু বিমা কানু আমিলিন, হাদিস নং ৬২২৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-কাদ্‌র, বাব : মা'না কুল্লু মাওলুদিন ইয়ুলাদু আলাল-ফিতরাহ ওয়া হুকমু মাওতি আতফালিল কুফফার ও ইয়া আতফালিল-মুসলিমিন, হাদিস নং ২২।

তা জরায়ুতে বীর্য স্থাপনের সময়। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহবাসের সময় যে দোয়া পাঠ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন তা থেকে তা স্পষ্ট হয়। এই দোয়ার ফলে গর্ভের ভ্রূণ শয়তানের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ»

যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার সময় এই দোয়া পাঠ করে, বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ, শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে সন্তান দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন। তাহলে তাদের যে সন্তান দান করা হয় শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।[৩০৪]

সন্তান মাতৃগর্ভে ভ্রূণে পরিণত হওয়ার পর তার জন্য ইসলাম যে অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে তা হলো জীবনের অধিকার। ইসলাম (চার মাসের) ভ্রূণ অবস্থায় গর্ভপাত নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামি শরিয়া মায়ের ওপর জন্মের আগেই ভ্রূণ ফেলে দেওয়া হারাম করে দিয়েছে। কারণ, এটি একটি আমানত, যা আল্লাহ তাআলা তার গর্ভে রেখেছেন। এই ভ্রূণের জীবনের অধিকার রয়েছে। সুতরাং একে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কষ্ট দেওয়া জায়েয হবে না। শরিয়ত এটিকে 'প্রাণ' বলে বিবেচনা করেছে। চার মাস অতিবাহিত হওয়ার ও এতে 'রুহ' ফুঁকে দেওয়ার পর ভ্রূণ হত্যা জায়েজ নেই। এমনকি ইসলামি শরিয়া ভ্রূণ হত্যাকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক করে দিয়েছে। মুগিরা ইবনে শুবা রা. থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা, হুযাইল গোত্রের এক লোকের দুজন স্ত্রী ছিল। তাদের একজন অপরজনকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে তাকে ও তার গর্ভের সন্তানকে মেরে ফেলল। নিহত মহিলার আত্মীয়স্বজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিচার চাইল। ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

---

৩০৪. *বুখারি*, কিতাব : নিকাহ, বাব : মা ইয়াকুলুর রাজুলু ইযা আতা আহলাহু, হাদিস নং ৪৭৬৭; *মুসলিম*, কিতাব : নিকাহ, বাব : মা ইয়ুসতাহাব্বু আন ইয়াকুলাহু ইনদাল জিমা, হাদিস নং ২৫৯১।

«ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا - قَالَ - وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ - قَالَ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ. قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ»

এক মহিলা তার সতিনকে তাঁবুর খুঁটি দ্বারা আঘাত করল। সে ছিল গর্ভবতী। (আঘাতকারী মহিলা আঘাতের দ্বারা) তাকে মেরে ফেলল। তাদের একজন ছিল লিহইয়ান গোত্রের নারী। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যাকারী মহিলার আসাবার (আত্মীয়স্বজনের) ওপর নিহত মহিলার দিয়ত (রক্তপণ) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং গর্ভের সন্তানের জন্য (ক্ষতিপূরণ হিসেবে) একটি দাস প্রদান করতে বললেন। হত্যাকারী নারীর এক আত্মীয় বলল, আমরা কি এমন শিশুর ক্ষতিপূরণ দেবো যে খায়নি, পান করেনি, এমনকি আওয়াজও করেনি? এমন বিষয় তো বাতিলযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ তো বেদুইনদের ছন্দযুক্ত বাক্যের মতো একটি বাক্য। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাদের ওপর দিয়ত (ক্ষতিপূরণ) সাব্যস্ত করলেন।[৩০৫] (অনুবাদক কর্তৃক ঈষৎ পরিমার্জিত)

ইসলামি শরিয়া গর্ভবতী নারীকে রমজানে পানাহারের অনুমতি দিয়েছে। গর্ভের সন্তানের সুস্থতা বজায় রাখাই এর উদ্দেশ্য। এমনকি গর্ভবতী নারীর ব্যভিচারের দণ্ডাদেশ বিলম্বে কার্যকরের অনুমতি দিয়েছে। গর্ভবতী নারী ব্যভিচারের দণ্ডে দণ্ডিত হলে সন্তান জন্মদান ও দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত দণ্ড কার্যকর করা যাবে না।

---

[৩০৫] *বুখারি*, কিতাব : আত-তিব্ব, বাব : আল-কাহানাহ, হাদিস নং ৫৪২৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-কাসামাহ ওয়াল-মুহারিবুন ওয়াল-কিসাস ওয়াদ-দিয়াত, বাব : দিয়াতুল-জানিন, ওয়া উজুবুদ-দিয়াত ফি কাতলিল খাতা ওয়া শিবহিল আমাদ আলা আকিলাতিল জানি, হাদিস নং ১৬৮২; *আবু দাউদ*, কিতাব : আদ-দিয়াত, বাব : দিয়াতুল-জানিন, হাদিস নং ৪৫৬৮; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৪৮২৫; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬০১৬।

জন্মের পর ইসলাম সন্তানদের জন্য জন্ম-সময় ও পরবর্তী সময়ে পালনীয় কিছু বিধান দিয়েছে। একটি হলো সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দচিত্তে সুসংবাদ গ্রহণ করা। ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন তাতে অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়,

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

যখন যাকারিয়া ইবাদতখানায় নামাযে দাঁড়িয়ে ছিল তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রীবিরাগী এবং পুণ্যবান নবীদের মধ্যে একজন।[৩০৬]

এই সুসংবাদ ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তান উভয়ের জন্য, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সন্তানের জন্মকালীন আরেকটি বিধান হলো তার ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেওয়া। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণেই এ বিধান পালন করতে হবে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইবনে আলি রা.-এর জন্মের সময় তার কানে আজান দিয়েছেন। তা উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - بِالصَّلَاةِ»

ফাতিমা রা. যখন হাসান ইবনে আলিকে প্রসব করলেন তখন আমি দেখেছি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কানে নামাযের আজানের মতো আজান দিলেন।[৩০৭]

---

৩০৬. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৯।

৩০৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আস-সাবিয়্যু ইয়ুলাদু ফাইয়ুআযযানু ফি উযুনিহি, হাদিস নং ৫১০৭।

সন্তানের জন্মকালীন আরেকটি অধিকার হলো তাকে খেজুর দ্বারা তাহনিক[৩০৮] করানো। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহনিক করেছেন। আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন,

«وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ»

আমার একটি ছেলে সন্তান হলো। আমি তাকে নিয়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহিম এবং তাকে একটি খেজুর দ্বারা তাহনিক করালেন। তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। তারপর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।[৩০৯] (উল্লেখ্য, ইবরাহিম রা. ছিলেন আবু মুসা আল-আশআরি রা.-এর বড় ছেলে।)

শিশুর জন্মকালীন আরেকটি অধিকার হলো তার মাথার চুল মুণ্ডন করা এবং চুলের সমপরিমাণ রুপা সদকা করা। এতে স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক উপকারিতা রয়েছে। স্বাস্থ্যগত উপকারিতা : নবজাতকের মাথা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, তার দুর্বল চুলগুলো ফেলে দিয়ে এটা করা যায়। ফলে মাথায় শক্ত চুল গজিয়ে উঠবে। সামাজিক উপকারিতা : মুণ্ডিত চুলের সমপরিমাণ রুপা সদকা করলে সমাজের সদস্যদের সহযোগিতা করা হয়, দরিদ্র মানুষদের সুখী করা হয়। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনুল হুসাইন থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

«وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতিমা রা. হাসান ও হুসাইন রা.-এর চুল ওজন করে সেই সমপরিমাণ রুপা সদকা করলেন।[৩১০]

---

৩০৮. খেজুর চিবিয়ে নরম করে নবজাতকের মুখে দেওয়া, যাতে কিছুটা তার পেটে প্রবেশ করে।

৩০৯. *বুখারি*, কিতাবুল আকিকা, বাব : তাসমিয়াতুল মাউলুদ হাদিস নং ৫০৪৫, *মুসলিম*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসতিহবাবু তাহনিকিল মাউলুদ, হাদিস নং ৩৯৯৭।

৩১০. মালিক, *মুআত্তা*, কিতাব : আল-আকিকাহ, বাব : মা জাআ ফিল-আকিকাহ, হাদিস নং ১৮৪০।

সন্তানদের জন্মের সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো ভালো নামে তাদের নামকরণ করা। মা-বাবার জন্য নবজাতকের সুন্দর নাম নির্বাচন করা আবশ্যক, যে নামে তাকে সবাই ডাকবে, চিনবে এবং অন্তরে শান্তি পাওয়া যাবে, মনে সুখ পাওয়া যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হারব' (যুদ্ধ) শব্দটি অপছন্দ করতেন, এ শব্দটি শুনতে চাইতেন না। একটি হাদিসে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَّةُ»

আল্লাহ তাআলার কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নাম সর্বাধিক প্রিয়। (অর্থ ও বাস্তবতার দিক থেকে) হারিস ও হাম্মাম সর্বাধিক সত্য নাম এবং সবচেয়ে মন্দ নাম হারব ও মুররাহ।[৩১১]

আলি ইবনে আবু তালিব রা. বলেন,

«لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ. فَقُلْتُ : حَرْبًا فَقَالَ : بَلْ هُوَ حَسَنٌ. ثُمَّ وُلِدَ الْحُسَيْنُ فَسَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ. فَقُلْتُ : حَرْبًا قَالَ : بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ. فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أُرَاهُ فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ. قُلْتُ : حَرْبًا قَالَ : بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ. ثُمَّ قَالَ : سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَّرٍ وَشَبِيرٍ وَمُشَبِّرٍ»

হাসানের জন্ম হলো। আমি তার নাম রাখলাম হারব। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। বললেন, আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, বরং সে হাসান। পরে যখন

৩১১. আবু দাউদ, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফি তাগরিরিল আসমা, হাদিস নং ৪৯৫০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৫৬৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯০৫৪; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮১৪।

হুসাইনের জন্ম হলো, আমি তারও নাম রাখলাম হারব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন এবং বললেন, আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছ? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, বরং সে হুসাইন। আমার তৃতীয় সন্তান হলে তারও নাম রাখলাম হারব। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে বললেন, আমার সন্তানকে (নাতিকে) দেখাও। তোমরা কী নাম রেখেছ তার? আমি বললাম, হারব। তিনি বললেন, বরং সে মুহাসসিন। তারপর বললেন, আমি তাদের হারুন আলাইহিস সালামের ছেলেদের নামে নাম রেখেছি : শাব্বার, শাবির ও মুশাব্বির।[৩১২]

সন্তানের জন্মের পর আকিকা করাও তার একটি অধিকার। তার অর্থ হলো নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে ছাগল জবাই করা। আকিকা করা সুন্নতে মুআক্কাদা। এটিও নবজাতককে পেয়ে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের একটি দিক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

আমি নাফরমানি পছন্দ করি না। আর কারও সন্তান হলে সে যদি তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করতে চায় তাহলে ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে দুটি পূর্ণবয়স্ক ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করবে।[৩১৩]

জন্মের পর সন্তানের আরেকটি অধিকার হলো মাতৃদুগ্ধপানের অধিকার। শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠনে মাতৃদুগ্ধপানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব

---

৩১২. *আহমাদ*, হাদিস নং ৭৬৯; *মুআত্তা মালিক*, হাদিস নং ৬৬০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৯৫৮; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৪৭৭৩, তিনি বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও মুসলিম তা সংকলন করেননি। যাহাবি তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন। বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮২৩; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ হাসান।

৩১৩. *আবু দাউদ*, কিতাব : আদ-দাহায়া, বাব : আল-আকিকাহ, হাদিস নং ২৮৪৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৮২২; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৭৫৯২, তিনি বলেছেন, এই হাদিসের সনদ সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি। যাহাবি তার বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

রয়েছে। মানবজীবনে এর সামাজিক প্রভাবও রয়েছে। ইসলামি শরিয়া মাতৃদুগ্ধপানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। মায়ের জন্য তার শিশুকে পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ পান করানো আবশ্যক। এটি শিশুর অন্যতম অধিকার বলে স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

> মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু-বছর দুধ পান করাবে। (এ সময়কাল) তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।[৩১৪]

আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে স্তন্যপানের দুই বছরের মেয়াদকাল শিশুর স্বাস্থ্যগত ও মনোগত উভয় দিক থেকে নিরাপদ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত জরুরি।[৩১৫] তবে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ মনোবিজ্ঞানী ও শিশু-প্রতিপালনবিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব গবেষণা হয়েছে এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তার অপেক্ষা করেনি। বরং আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহই অগ্রগামী। আমরা দেখতে পাই, শরিয়ত মাতৃদুগ্ধপানের ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে এবং একে শিশুর অন্যতম অধিকার সাব্যস্ত করেছে। তবে এই অধিকার কেবল মায়ের ওপর সীমাবদ্ধ নয়, পিতার কাঁধেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার রয়েছে। মাকে আবশ্যকভাবে খাদ্য ও বস্ত্র দানের মধ্য দিয়েই এই দায়িত্ব পালিত হয়। যাতে মা সন্তানের লালনপালন ও তাকে স্তন্যদানে ভাবনাহীন থাকতে পারেন। এভাবে মা-বাবার প্রত্যেকেই শরিয়তের নির্ধারিত কার্য-পরিমণ্ডলে থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। যত্ন ও সুরক্ষার মধ্য দিয়ে

---

[৩১৪]. সুরা বাকারা : আয়াত ২৩৩।

[৩১৫]. স্বাভাবিক স্তন্যপানের সময় কমপক্ষে ১২ মাস। তার চেয়ে ভালো হলো আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য-সংস্থা পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপানের যে বিশেষ নির্দেশনাবলি প্রদান করেছে সেগুলো মান্য করা। দেখুন, হাসান শামসি পাশা, الرضاعة من لبن الأم حولين كاملين, https://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php?t/60832-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করবেন। মাতাপিতার সামর্থ্যের মধ্যেই এসব দায়িত্ব সম্পন্ন হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾

কারও ওপর তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না।[৩১৬]

মা-বাবার ওপর সন্তানদের আরেকটি অধিকার হলো তাদের লালনপালন ও ভরণপোষণ। শরিয়ত মাতাপিতার ওপর সন্তানদের যত্ন নেওয়া, তাদের জীবন ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দেওয়া ও তাদের ভরণপোষণ বহন করার বিষয়টিকে আবশ্যক করে দিয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং সে তার অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (শাসক) একজন দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম (কর্মচারী) তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩১৭]

সন্তানদের আরেকটি অধিকার হলো শিষ্টাচার এবং জরুরি ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। সন্তানদের কার্যকরী শিক্ষাদান প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

৩১৬. সুরা বাকারা : আয়াত ২৩৩।

৩১৭. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : আল-ইত্‌ক, বাব : কারাহিয়াতুত-তাতাউল আলার-রাকিক, হাদিস নং ২৪১৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইমারাহ, বাব : ফাদিলাতুল ইমামিল আদিল ওয়া উকুবাতুল জায়ির, হাদিস নং ১৮২৯।

«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়স হলে নামাযের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়স হলে নামাযের জন্য তাদের শাসন করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।[৩১৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদের নিজেদের ও সন্তানদের কিয়ামতের দিন (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًاوقودها الناس والحجارة﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো জাহান্নামের আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[৩১৯]

এর পাশাপাশি সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক যত্নও নিতে হবে। তাদের স্নেহ করা, দয়ামায়া দেখানো, তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করা এবং তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করা শারীরিক ও মানসিক যত্নের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইবনে আলি রা.-কে চুমু খেলেন। সেখানে আকরা ইবনে হাবিস রা. উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু খাইনি। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন,

«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»

যে মমতা দেখায় না তাকে মমতা দেখানো হয় না।[৩২০]

---

৩১৮. *আবু দাউদ*, কিতাব : আস-সালাত, বাব : ই'মারুল গুলাম বিস-সালাত, হাদিস নং ৪৯৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৬৮৯; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৭০৮।

৩১৯. সুরা তাহরিম : আয়াত ৬।

৩২০. *বুখারি*, কিতাব : রহমাতুল ওয়ালাদ ওয়া তাকবিলুহু ওয়া মুআনাকাতুহু, হাদিস নং ৫৬৫১; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : রহমাতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস-সিবয়ান ওয়াল-ইয়াল, হাদিস নং ২৩১৮।

শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাতের কোনো এক নামাযের (মাগরিব বা এশার)[৩২১] সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর কাঁধে ছিল হাসান রা. বা হুসাইন রা.। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিয়ে মসজিদে এলেন এবং মেঝেতে নামালেন। তারপর নামাযের জন্য তাকবির বললেন। নামাজ পড়তে শুরু করলেন। নামাযের মধ্যে একটি দীর্ঘ সিজদা দিলেন। (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সিজদা দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি মাথা তুললাম এবং দেখলাম যে শিশুটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠের ওপর রয়েছে এবং তিনি সিজদায় রয়েছেন। আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি নামাযের মধ্যে একটি দীর্ঘ সিজদা দিয়েছেন, এমনকি আমরা ভেবেছি কোনো ঘটনা ঘটেছে বা আপনার প্রতি ওহি নাযিল করা হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»

তার কোনোটিই ঘটেনি, বরং আমার নাতি আমার পিঠের ওপর চড়ে বসে ছিল। আমি তাকে জোর করে নামিয়ে দিতে চাইনি, যতক্ষণ না তার প্রয়োজন পূরণ হয় (নিজেই নেমে যায়)।[৩২২]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ»

আমি অনেক সময় নামাযে প্রবেশ করি এবং ইচ্ছা পোষণ করি যে নামাজ দীর্ঘ করব। কিন্তু যখনই শিশুর ক্রন্দন শুনি, আমার নামাজ

---

৩২১. অন্য বর্ণনায় আছে, দ্বিপ্রহরের কোনো নামাযের, তথা যোহর বা আসর নামাযের সময়।

৩২২. *নাসায়ি*, হাদিস নং ১১৪১; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭৬৮৮; *হাকিম*, হাদিস নং ৪৭৭৫; হাকিম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং যাহাবি তাকে সমর্থন করেছেন। *ইবনে খুযাইমা*, হাদিস নং ৯৩৬; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ২৮০৫।

> সংক্ষিপ্ত করি। কারণ, আমি জানি যে, শিশুর ক্রন্দনে তার মায়ের মনের উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে।[৩২৩]

মেয়েদের সুন্দরভাবে লালনপালন করা ও তাদের যত্ন নেওয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এমনকি যারা তাদের মেয়েদের সুন্দরভাবে লালনপালন করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরাট প্রতিদান ও পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ»

> যে ব্যক্তি দুটি কন্যাকে তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালনপালন করবে, কিয়ামতের দিন সে আর আমি এভাবে উপস্থিত হব। তিনি তার আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।[৩২৪]

বোঝা গেল যে, মা-বাবার ওপর সন্তানদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রয়েছে। ইসলাম তাদের জন্য এসব অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মানবপ্রণীত যাবতীয় রীতিনীতি ও ব্যবস্থা এসব অধিকারের স্তর ও সামগ্রিকতাকে নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম সন্তানসন্ততির জীবনের প্রতিটি ধাপকে গুরুত্ব দিয়েছে। ভ্রূণ অবস্থায়, মাতৃস্তন্য পানকালে, শিশু বয়সে ও বয়ঃসন্ধিকালে তাদের যত্ন নেওয়ার প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করেছে। যতক্ষণ না তারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠে ততক্ষণ তাদের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নিতে হবে। এমনকি ইসলাম তাদের প্রতি মায়ের গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় আসার আগেও গুরুত্ব প্রদান করেছে। অর্থাৎ, সৎ ও চরিত্রবান মা ও বাবা নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করেছে। এর উদ্দেশ্য একটিই, মুসলিম সমাজের জন্য উত্তম নারী-পুরুষের বিস্তার, যে সমাজ পরিচালিত হয় নৈতিকতা ও উন্নত সভ্যতার মূল্যবোধ দ্বারা।

---

৩২৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-জামাহ ওয়াল-ইমামাহ, বাব : মান আখাফফাস-সালাতা ইনদা বুকাইস সাবিয়্যি, হাদিস নং ৬৭৭; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৯৮৯; *ইবনে খুযাইমাহ*, হাদিস নং ১৬১০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ২১৩৯; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৩১৪৪; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ১১০৫৪।

৩২৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : আল-ইহসান ইলাল বানাত, হাদিস নং ২৬৩১; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৯১৪; *হাকিম*, হাদিস নং ৭৩৫০; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮৯৪।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩. মা-বাবা (ছোট পরিবার)

এখানে মা-বাবা বলতে স্বামী-স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ যাদের সন্তান দান করেছেন, যাদের বংশধর রয়েছে। যারা সন্তানদের জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন, তাদের আরাম-আয়েশের জন্য অসংখ্য বিনিদ্র রাত যাপন করেছেন, তাদের হকসমূহ আদায় করেছেন এবং জীবনযাত্রার পথে তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দিয়েছেন।

ইসলাম সৌজন্যের প্রতিদান, সদাচারের কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহস্বরূপ সন্তানদের ওপর পিতামাতার কিছু অধিকার সাব্যস্ত করেছে। বিশেষ করে যখন তারা বার্ধক্যে পৌঁছে যান এবং দুর্বল হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ, কোমল আচরণ ও সদ্ব্যবহার করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। ঠিক তেমনই, যেমন তারা তাদের সন্তানদের শিশুকালে লালনপালন করেছেন।

মা-বাবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো আনুগত্য, সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিকার। আল্লাহ তাআলার পর সবচেয়ে বেশি সম্মান ও সদাচার পাওয়ার উপযুক্ত মা-বাবা ছাড়া কেউ নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মা-বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণ ও তাদের যত্ন-আত্তিকে তাঁর ইবাদত ও ইখলাসের সাথে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের উফ[৩২৫] বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো। তাদের সামনে ভালোবাসার সঙ্গে বিনয়াবনত হও এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবকালে আমাকে লালনপালন করেছেন।[৩২৬]

মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবাধ্য হতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি 'উফ' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে তাদের অনুভূতিকে আহত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এসব শব্দ তাদের প্রতি বিরক্তি-প্রকাশক। আল্লাহ তাআলা কখনোই ছোট ও নত হওয়ার প্রশংসা করেননি এবং কারও সামনে তাঁর বান্দাদের ছোট ও নত হওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে স্বীকৃত নয়, তবে মা-বাবার অবস্থান ভিন্ন। উপর্যুক্ত শেষ আয়াতে যা এসেছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾

তাদের সামনে ভালোবাসার সঙ্গে বিনয়াবনত।[৩২৭]

মা-বাবা উভয়ে বা তাদের একজন যখন বার্ধক্যে পৌঁছে যান তখন উত্তম ব্যবহার ও সদাচারের বিষয়টি অবধারিতভাবে চলে আসে। কারণ, তখন তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, কখনো অক্ষমও হয়ে পড়েন। আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলতে, তাদের কোমলভাবে সম্বোধন করতে, তাদের ভালোবাসতে, তাদের প্রতি সদাচার করতে। একইসঙ্গে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দয়া প্রার্থনা করতে, যেমন তারা আমাদের শিশুকালে দুর্বলতার সময়ে আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। তা ছাড়া মা-বাবাকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক বাক্য বেশি বেশি শোনাতে হবে। আল্লাহ তাআলা মা-বাবার প্রতি

---

৩২৫. বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোনো কথা।-অনুবাদক
৩২৬. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২৩-২৪।
৩২৭. সুরা ইসরা : আয়াত ২৪

কৃতজ্ঞতাকে তাঁর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।[৩২৮]

মা-বাবার প্রতি সদাচার কল্যাণের সবচেয়ে বড় দরজা। তা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ : الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ»

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, সময়মতো নামাজ আদায় করা। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[৩২৯]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন,

«أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ. قَالَ: فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟

৩২৮. সুরা লুকমান : আয়াত ১৪।

৩২৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আল-বির্রু ওয়াস-সিলাহ, হাদিস নং ৫৬২৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু কাওনিল ঈমান বিল্লাহি তাআলা আফদালুল আ'মাল, হাদিস নং ১৩৭।

قَالَ: نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا. قَالَ: فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا»

একজন লোক নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের বাইআত হব। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার মাতাপিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ, বরং তারা দুজনই জীবিত আছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় আকাঙ্ক্ষা করছ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাতাপিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দুজনের সঙ্গে সদাচারপূর্ণ জীবনযাপন করো।[৩৩০]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে,

«فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»

তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করো।[৩৩১]

ইসলাম সন্তানদের ওপর মা-বাবার জন্য যেসব অধিকার বিধিবদ্ধ করেছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো যে, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে,

«أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي. قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ»

একজন লোক নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে এবং আমার বাবার আমার সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে (তিনি তা

---

৩৩০. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : বিররুল ওয়ালিদাইন ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, হাদিস নং ৬; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৫২৮; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৪১৬৩; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৪৯০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪১৯।

৩৩১. *বুখারি*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : আল-জিহাদ বি-ইযনিল আবাওয়াইন, হাদিস নং ২৮৪২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : বিররুল ওয়ালিদাইন ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, হাদিস নং ২৫৪৯।

খরচ করতে চান)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য।[৩৩২]

আবু হাতিম ইবনে হিব্বান[৩৩৩] বলেন, এর অর্থ এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে যে আচরণ করে তার পিতার সঙ্গে সেই আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। পিতার সঙ্গে কথায় ও কাজে সদাচার ও কোমলতা অবলম্বন করতে এবং প্রয়োজনে পিতার জন্য সম্পদ ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি লোকটিকে বলেছেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য।' তবে এর অর্থ এই নয় যে, পুত্রের জীবদ্দশায় তার সম্মতি ছাড়াই পিতা তার সম্পদের মালিক হয়ে যাবেন।[৩৩৪]

অসংখ্য হাদিস ও অগুনতি আসারে মা-বাবার সঙ্গে সদাচার ও সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে অবাধ্যাচরণ না করতে সতর্ক করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, জ্যোতির্ময় শরিয়ত সমাজের মৌলিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে কতটা গুরুত্বারোপ করেছে, যাতে সেগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, বিনষ্ট না হয়।

---

৩৩২. *ইবনে মাজাহ*, কিতাব : আত-তিজারাত, বাব : মা লির-রাজুলি মিন মালি ওয়ালিদিহি, হাদিস নং ২২৯১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৯০২; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪১০।

৩৩৩. আবু হাতিম : পূর্ণ নাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ। (মৃ. ৩৫৪ হিজরি, ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) ইতিহাসবিদ, মহাপণ্ডিত, ভূগোলবিদ ও মুহাদ্দিস। জন্ম ও মৃত্যু সিজিস্তানের বুস্ত নগরীতে, তাই তাকে বুস্তি বলা হয়। আস-সুবকি, *তাবাকাত শাফিইয়্যাহ*। খ. ৩ পৃ. ১৩১।

৩৩৪. *সহিহ ইবনে হিব্বান*, খ. ২, পৃ. ১৪২।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ
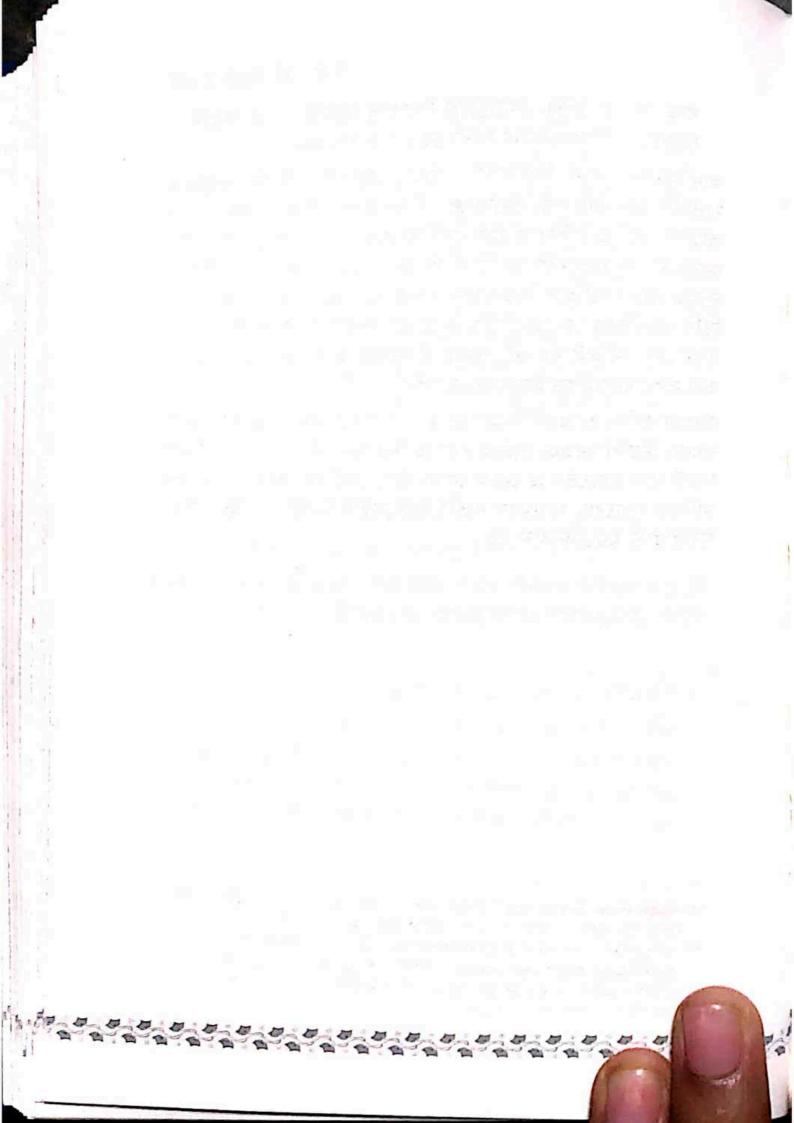
৪. আত্মীয়স্বজন (বড় পরিবার)

ইসলাম যা-কিছুর প্রবর্তন করেছে তার একটি মহত্ত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এখানে পরিবারের ধারণা মা-বাবা ও সন্তানদের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এত বিস্তৃত যে তা ভাইবোন, চাচা-ফুফু ও মামা-খালা এবং পুত্রকন্যাসহ যত নিকটাত্মীয় আছে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। তারা সবাই এই পরিবারের সদস্য। তাদের সকলের সুসম্পর্ক ও সদাচারের অধিকার রয়েছে। ইসলাম আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং একে ফজিলত ও সওয়াবের একটি মৌলিক বিষয় বলে গণ্য করেছে। আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখলে অশেষ সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যেমন, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের ভয়াবহ শাস্তির হুমকি দিয়েছে। কেউ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখলে আল্লাহ তার সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখেন এবং কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

ইসলাম কিছু বিধান ও ব্যবস্থা নির্দেশ করেছে, যা এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন অব্যাহত থাকার বিষয়টিকে আবশ্যক করে। এই পরিবারে সবাই আত্মীয়স্বজন, তারা একে অপরের সমর্থন-সহযোগিতা করবে, একজন অপরজনের হাত ধরবে। ইসলামের নির্দেশিত ব্যবস্থার ফলে ভরণপোষণ, মিরাস, রক্তপণের দায়ভার বর্তায়। রক্তপণের দায় বলতে বোঝানো হয়েছে যে, ভুলবশত হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর নিকটাত্মীয়দের ওপর দিয়াত বা রক্তপণের দায়ভার বণ্টিত হবে। (তারা সবাই মিলে রক্তপণ আদায় করবে।)[৩৩৫]

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হলো এই সকল নিকটাত্মীয়ের প্রতি সদাচার করা এবং যতটুকু সম্ভব হয় তাদের জন্য কল্যাণ করা এবং তাদের থেকে অকল্যাণ ও ক্ষতি প্রতিহত করা। তাদের কাছে বেড়াতে

---

৩৩৫. ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, *আল-ইসলাম হাদারাতুল-গাদ*, পৃ. ১৮৫।

যাওয়া, কুশল জিজ্ঞেস করা, ভালো-মন্দ অবস্থা জানতে চাওয়া, উপহার দেওয়া, দরিদ্র আত্মীয়দের দান-সদকা করা, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তারা দাওয়াত দিলে তা কবুল করা, তাদের মেহমানদারি করা, তাদের সম্মান করা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা, হাসি-আনন্দে তাদের সঙ্গে শরিক হওয়া, শোক ও যাতনায় তাদের সান্ত্বনা দেওয়া ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া যা-কিছু এই ছোট সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনকে বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করে তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এটা ব্যাপক কল্যাণের উৎস। এতে ইসলামি সমাজের ঐক্য ও বন্ধন দৃঢ় হয়, এই সমাজের সদস্যদের অন্তরসমূহ দয়া ও স্বস্তির অনুভূতিতে পূর্ণ হয়। মানুষ সর্বদা একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, তার আত্মীয়স্বজনরা ভালোবাসায় ও মমতায় তাকে ঘিরে আছে, প্রয়োজনে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

আল্লাহ তাআলা নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদাচার ও অনুগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়, যাদের সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

> তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনোকিছুকে তাঁর শরিক করবে না এবং পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথি, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।[৩৩৬]

আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীর সঙ্গে তাঁর (রহমতের) সম্পর্ককে আবশ্যক সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণেই তিনি তাকে ধারাবাহিকভাবে অনুগ্রহ করেন, কল্যাণ দান করেন, তার ওপর নেয়ামত

---

৩৩৬. সুরা নিসা : আয়াত ৩৬।

বর্ষণ করেন। নিম্নবর্ণিত হাদিসে কুদসি থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«قَالَ اللهُ أَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِيْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ»

> আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি রহমান এবং তা হলো রহিম (আত্মীয়তার বন্ধন), আমি আমার নাম থেকে তার একটি নাম নিঃসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে আমি তার সঙ্গে আমার (রহমতের) সম্পর্ক অটুট রাখব এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তাকে আমার সম্পর্ক (রহমত) থেকে ছিন্ন করব।[৩৩৭]

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রিযিকের ব্যাপকতা ও বয়সের বরকত বৃদ্ধির সুসংবাদ দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

> যে ব্যক্তি তার জীবিকার প্রশস্ততা ও মরণে বিলম্বতা কামনা করে সে যেন তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখে।[৩৩৮]

আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বৃদ্ধির অর্থ হলো বয়সে বরকত, বেশি বেশি আনুগত্যের সুযোগ, আখিরাতে উপকারী কাজের জন্য সময় ব্যয় এবং অনর্থক কাজে সময় নষ্ট না হওয়া।[৩৩৯]

অন্যদিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে স্পষ্ট নস (কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য) এসেছে এবং একে

---

৩৩৭. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আয-যাকাত, বাব : সিলাতুর-রাহিম, হাদিস নং ১৬৯৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৮০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৪৩; *হাকিম*, হাদিস নং ৭২৬৫। হাকিম বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিমে* তা সংকলিত হয়নি।

৩৩৮. *বুখারি*, কিতাব : আল-বুয়ু, বাব : মান আহাব্বাল-বাসতা ফির-রিয্ক, হাদিস নং ১৯৬১ এবং কিতাব : আল-আদাব, বাব : মান বুসিতা লাহু ফির-রিয্কি বি-সিলাতির-রাহিম, হাদিস নং ৫৬৩৯; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বির্রু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব : সিলাতুর-রাহিম ও তাহরিমু কাতিআতিহা, হাদিস নং ২১।

৩৩৯. ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনিল-হাজ্জাজ*, খ. ১৬, পৃ. ১১৪।

বিরাট পাপ গণ্য করা হয়েছে। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দ্বারা মানুষের মধ্যকার সম্পর্কই নষ্ট করে ফেলা হয়। শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন ভেঙে পড়ে। আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষণ এবং চোখ ও অন্তর অন্ধ হয়ে পড়ার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন,

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾

তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই লানত করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।[৩৪০]

জুবাইর ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»

আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩৪১]

আত্মীয়তা ছিন্ন করার অর্থ হলো আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং তাদের সদাচার ও অনুগ্রহ না করা। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ যে কত বড় ও ভয়ংকর এ ব্যাপারে অনেক নস রয়েছে। এসবের মর্মার্থ হলো একটি সহযোগিতাপূর্ণ, সহানুভূতিশীল ও সহৃদয়তাপূর্ণ পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্কের সমাজ নির্মাণ করা। এই সমাজ কেমন হবে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় ব্যক্ত হয়েছে,

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও দয়া-অনুগ্রহে মুমিনদের উদাহরণ হলো একটি দেহের মতো; যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।[৩৪২]

---

৩৪০. সুরা মুহাম্মাদ : আয়াত ২২-২৩।

৩৪১. বুখারি : ৫৯৮৪, মুসলিম : ১৯।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ

ইসলামি সমাজ বলতে একটি বড় পরিবারকে বোঝায়, যে পরিবার ভালোবাসা, যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রেম ও দয়ার বন্ধনে আবদ্ধ। ইসলামি সমাজ আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা, নৈতিকতা ও ভারসাম্যপূর্ণ। এই সমাজের সদস্যরা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির সঙ্গে সহাবস্থান করে এবং ইনসাফ ও পরামর্শের ভিত্তিতে পারস্পরিক কার্য সম্পাদন করে। ইসলামি সমাজে বড়রা ছোটদের স্নেহ করে, ধনীরা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, শক্তিমানেরা দুর্বলদের সাহায্য করে; বরং তা একটি দেহের মতো, তার কোনো একটি প্রত্যঙ্গ পীড়িত হলে গোটা দেহই পীড়িত বোধ করে; তা একটি অট্টালিকার মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় রেখেছে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে ইসলামি সমাজের মৌলিক উপাদান ও স্তম্ভগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : ভ্রাতৃত্ব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সহযোগিতা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সুবিচার ও ইনসাফ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : দয়া

---

[৩৪২]. বুখারি : কিতাব : আল-আদাব, বাব : রহমাতুন নাসি ওয়াল-আজায়িমি, হাদিস নং ৫৬৬৫; মুসলিম, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : তারাহুমুল মুমিনিনা ওয়া তাআতুফুহুম ওয়া তাআদুদুহুম, হাদিস নং ২৫৮৬।
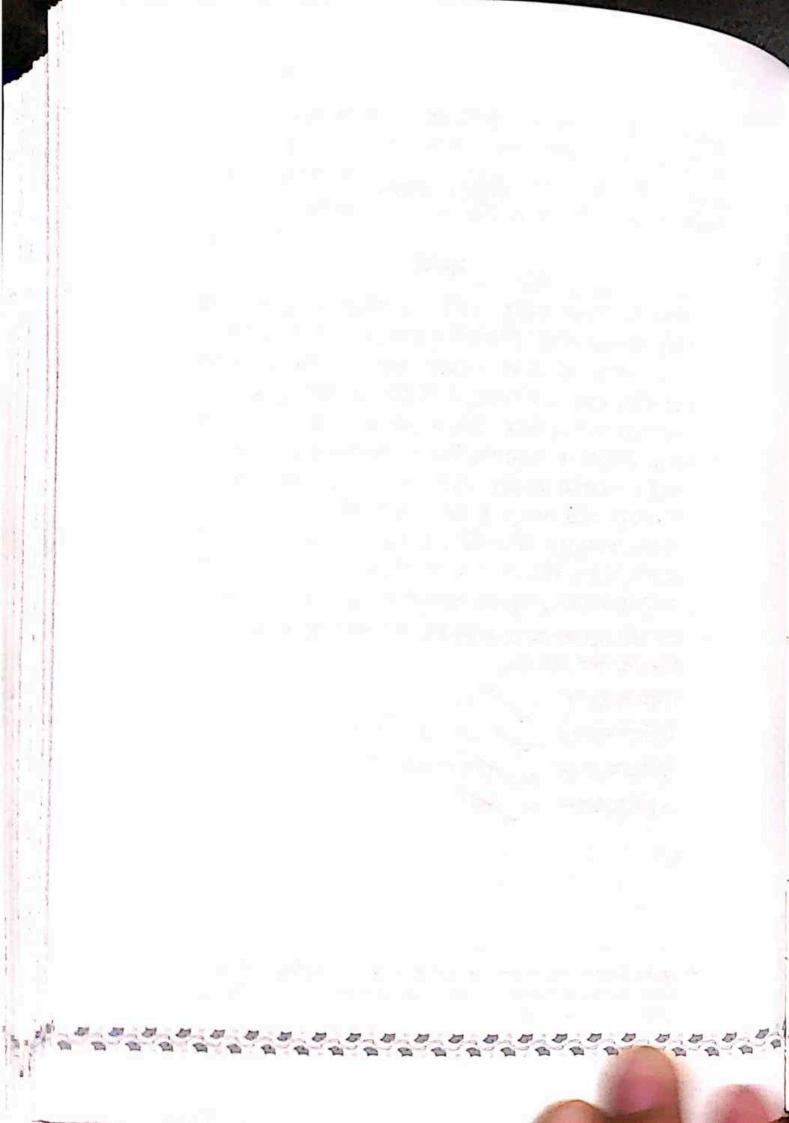
প্রথম অনুচ্ছেদ

ভ্রাতৃত্ব

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের[৩৪৩] দপ্তরের উচ্চতর কর্মকর্তা (উপদেষ্টা) লি অ্যাটওয়াটার[৩৪৪] লাইফ ম্যাগাজিনের ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বলেছেন,

> আমার অসুস্থতা আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছে যে, সমাজে যা অনুপস্থিত ছিল তা আমার মধ্যেও অনুপস্থিত ছিল : এতটুকু প্রেম ও ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব।[৩৪৫]

ভ্রাতৃত্ব বা ভ্রাতৃবন্ধন শ্রেষ্ঠ মানবিক মূল্যবোধ। সমাজের অস্তিত্বের সুরক্ষার জন্য ইসলাম তার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত করেছে। ভ্রাতৃত্ব সমাজকে একতাবদ্ধ ও সংহত রাখে। এই মূল্যবোধ কোনো সমাজে পাওয়া যায়নি, প্রাচীন সমাজেও নয়, আধুনিক সমাজেও নয়; অর্থাৎ, সমাজের মানুষেরা পারস্পরিক ভালোবাসায়, বন্ধনে, সাহায্য-সহযোগিতায় বসবাস করে; একই পরিবারের সন্তানদের মতো অনুভূতি তাদের একীভূত রাখে, যে পরিবারের এক অংশ অপর অংশকে ভালোবাসে, এক অংশ অপর অংশকে সংহত রাখে। তার প্রত্যেক সদস্য অনুভব করে যে, তার ভাইয়ের শক্তিই হলো তার শক্তি, তার ভাইয়ের দুর্বলতাই হলো তার দুর্বলতা এবং সে একাকী নগণ্য ও তার ভাইদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৩৪৬]

ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ দৃঢ়ীকরণ, তার অবস্থানের ওপর জোর দেওয়া ও মুসলিম সমাজ নির্মাণে তার প্রভাব প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিল রয়েছে। যা-কিছু এই মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে তার প্রতি উৎসাহিত

---

[৩৪৩]. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম রাষ্ট্রপতি (২০ জানুয়ারি ১৯৮১-২০ জানুয়ারি ১৯৮৯)।

[৩৪৪]. লি অ্যাটওয়াটার (১৯৫১-১৯৯১ খ্রি.) : আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টির রাজনৈতিক পরামর্শক ও কৌশলবিদ। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ও জর্জ এইচডব্লিউ বুশের রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

[৩৪৫]. আবদুল হাই যালুম, *ইমবারাতুরিয়্যাতুশ-শাররিল-জাদিদাহ*, পৃ. ৩৯৭।

[৩৪৬]. ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, *মালামিহুল-মুজতামাইল-মুসলিম আললাযি নুনশিদুহ*, পৃ. ১৩৮।

করা হয়েছে এবং যা-কিছু তা ক্ষুণ্ন করে তার থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।[৩৪৭]

এখানে জাতিগত বা বর্ণগত বা বংশগত পার্থক্যকে বিবেচনায় আনা হয়নি। এই নীতির ভিত্তিতেই সালমান ফারসি রা., বিলাল হাবশি রা. সুহাইব রুমি রা. তাদের আরব ভাইদের সঙ্গে একত্র হয়েছেন ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন।

পবিত্র কুরআন এই ভ্রাতৃত্বকে আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।[৩৪৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মদিনায় হিজরতের পর—যখন মুসলিম সমাজের সূচনা হলো—মসজিদ নির্মাণের পরপরই সরাসরি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন শুরু করলেন। কুরআনুল কারিম এই ভ্রাতৃত্বকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, যা ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

---

৩৪৭. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১০।
৩৪৮. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৩।

আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।[৩৪৯]

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ফলে ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের যেসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এক আনসারি ভাই তার মুহাজির ভাইয়ের জন্য তার অর্ধেক সম্পত্তি এবং দুই স্ত্রীর একজনকে তালাকের পর বিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন! এই ঘটনা আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

«قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ...»

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. যখন মদিনায় আগমন করলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ও সাদ ইবনে রবি আল-আনসারি রা.-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। সাদ রা. তার সম্পত্তি ভাগ করে অর্ধেক সম্পত্তি এবং দুজন স্ত্রীর একজনকে (তালাক দেওয়ার পর) নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রহমানকে অনুরোধ জানালেন। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে স্থানীয় বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন...।[৩৫০]

সমাজ-কাঠামোকে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তাই আল্লাহ তাআলা ইসলামি ভ্রাতৃত্বকে ক্ষুণ্ন করে বা

---

৩৪৯. সুরা হাশর : আয়াত ৯।

৩৫০. *বুখারি*, কিতাব : ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব : কাইফা আখান-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইনা আসহাবিহি, হাদিস নং ৩৭২২; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১৯৩৩; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৩৮৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১২৯৯৯।

ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন সব কাজের ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾

হে মুমিনগণ, কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।[৩৫১]

একইভাবে আল্লাহ তাআলা দোষারোপ, নিন্দা ও বংশগৌরব ফলানো নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তওবা না করে তারাই জালিম।[৩৫২]

আল্লাহ তাআলা গিবত, পরচর্চা, কুধারণাও নিষিদ্ধ করেছেন। এসব কর্মকাণ্ড সমাজকে ধসিয়ে দেওয়ার নিকৃষ্ট কার্যকারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾

৩৫১. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১১।
৩৫২. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১১।

> হে মুমিনগণ, তোমরা নানারকম অনুমান থেকে দূরে থাকো, কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।[৩৫৩]

ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেলে, কলহবিবাদ লেগে গেলে ইসলাম যা-কিছু চিত্তের বন্ধন অটুট রাখে এবং ঐক্যের ভিত্তিকে সংহত রাখে তার প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং এ কারণে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করতে আহ্বান জানিয়েছে। সদ্ভাব বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝাতে এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلَى. قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ»

> আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেবো না, যার মর্যাদা রোযা, সদকা এবং নামায থেকে উত্তম? আমরা বললাম, হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন, বিবদমানদের মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়া। পক্ষান্তরে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ধ্বংসাত্মক (কল্যাণমূলক কাজসমূহ ধ্বংস করে দেয়)।[৩৫৪]

এমনকি ইসলাম বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে আপস করার জন্য বানিয়ে কথা বলার বৈধতা দিয়েছে। কারণ তা ইসলামি সমাজকাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে তা রোধ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا»

---

৩৫৩. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১২।

৩৫৪. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসলাহ যাতিল-বাইন, হাদিস নং ৪৯১৯; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৫০৯; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭৫৪৮, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫০৯২।

যে ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়। বস্তুত সে ভালো কথা বলে এবং উত্তম কথাই আদান-প্রদান করে।[৩৫৫]

তা ছাড়া ইসলাম ভ্রাতৃত্বসুলভ সকল অধিকার ও দায়দায়িত্ব আরোপ করেছে। ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিম এগুলো মান্য করবে। ঋণ মনে করে এসব বিষয়ের দায়িত্ব নেবে, যার জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তার কাছে আমানত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা আদায় করা জরুরি। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেন,

«لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»

তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর শত্রুতা করো না, একে অন্যের পেছনে লেগো না, একজনের কেনা-বেচার ওপর আরেকজন কেনা-বেচা করো না। বরং তোমরা এক আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, কাজেই তার ওপর জুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হেয় মনে করবে না। আল্লাহভীতি এখানে—এ কথা বলে তিনি তিনবার নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি আরও বলেন, কোনো ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজের কোনো মুসলিম

---

৩৫৫. বুখারি, কিতাব : আস-সুলহ, বাব : লাইসাল কাযযাবুল-লাযি ইয়ুসলিহু বাইনান-নাস, হাদিস নং ২৫৪৬। মুসলিম, হাদিস নং ২৬০৫।

ভাইকে হেয় মনে করে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য হারাম। অর্থাৎ, তার জানমাল ও ইজ্জত-আবরু।[৩৫৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'তাকে লজ্জিত করবে না' কথাটির ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেছেন, লজ্জিত করার অর্থ তাকে সাহায্য না করা, তার প্রতি সহযোগিতার হাত না বাড়ানো। অর্থাৎ, জুলুম বা জালিমকে প্রতিহত করার জন্য সাহায্য চাইলে তাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে, সম্ভব হলে এবং তার কোনো শরয়ি ওজর না থাকলে।[৩৫৭]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ»

তোমার ভাইকে সাহায্য করো জালিম অবস্থায় অথবা মাজলুম অবস্থায়। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, সে যখন জুলুমের শিকার হয় তখন তাকে সাহায্য করতে পারব, কিন্তু সে যদি নিজেই জুলুমকারী হয়ে থাকে তাহলে তাকে কীভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তাকে জুলুম থেকে বাধা দেবে বা বিরত রাখবে, এটাই তাকে সাহায্য করা।[৩৫৮]

আমরা কি এমন মানবসমাজ দেখতে পাই যা তার প্রত্যেক সদস্যকে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বাধ্য করতে সক্ষম, যে তার ভাইকে সাহায্য করবে মাজলুম অবস্থায় এবং জালিম হলে তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে?!

---

৩৫৬. *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমু যুলমিল-মুসলিম ওয়া খাযলুহু ওয়া ইহতিকারুহু ওয়া দামুহু ওয়া ইরদুহু ওয়া মালুহু, হাদিস নং ২৫৬৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ৭৭১৩; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১১৮৩০।

৩৫৭. নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ*, খ. ১৬, পৃ. ১২০।

৩৫৮. *বুখারি*, কিতাব : আল-ইকরাহ, বাব : ইয়ামিনুর-রাজুলি লি-সাহিবিহি আন্নাহু আখুহু ইযা খাফা আলাইহিল-কাত্‌লা আও নাহওয়াহু, হাদিস নং ৬৫৫২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২২৫৫; *আহমাদ*, হাদিস নং ১১৯৬৭; *দারেমি*, হাদিস নং ২৭৫৩।

এই অবস্থা পাওয়া যাবে কেবল ইসলামি সমাজে। কারণ এখানে রয়েছে উন্নত ভ্রাতৃত্ববন্ধন এবং বোধ ও অনুভূতির ঐক্য। ইসলামি সমাজের প্রত্যেক সদস্য তার ভাইয়ের বিপদ দূর করে ও সংকট-সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং সাহায্য ও সহযোগিতার অবস্থানে থাকে, হিংসাত্মক ও শত্রুতামূলক অবস্থানে থাকে না। তারা সবসময় ইতিবাচক মনোভাব ধারণ করে। এভাবেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন ইসলামি সমাজের কাঠামো ও সংহতির ভিত্তিরূপে রয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পারস্পরিক সহযোগিতা

শরিয়ত তার অনুসারীদের ওপর আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সাহায্য-সমর্থন আবশ্যক করে দিয়েছে। দৈনন্দিন প্রয়োজন ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা তো বলাই বাহুল্য। এ কারণে এই দ্বীনের কল্যাণে তারা একটি মজবুত অট্টালিকার মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। আবু মুসা আশআরি রা. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য গৃহ-কাঠামোর মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় রাখে।[৩৫৯]

অথবা, মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের মতো, তার এক অঙ্গ অসুস্থ হলে দেহের সব অঙ্গই জ্বর ও অনিদ্রায় ভোগে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও দয়া-অনুগ্রহে মুমিনদের উদাহরণ হলো একটি দেহের মতো। যখন দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।[৩৬০]

---

৩৫৯. *বুখারি* : কিতাব : আল-আদাব, বাব : তাআউনুল মুমিনিনা বা'দুহুম বা'দা, হাদিস নং ৫৬৮০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বির্‌রু ওয়াস-সিলাহ, বাব : তারাহুমুল মুমিনিনা ওয়া তাআতুফুহুম ওয়া তাআদুদুহুম, হাদিস নং ২৫৮৫।

এ কারণে ইসলামে সামাজিক সহযোগিতা কেবল বৈষয়িক উপকারিতাতেই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও তা ইসলামে একটি মৌলিক স্তম্ভ, বরং এই সহযোগিতা সমাজের যাবতীয় প্রয়োজনে ব্যাপ্ত। চাই তা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা দলবদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে হোক, চাই সে প্রয়োজন বৈষয়িক হোক বা মানসিক অথবা চিন্তাগত হোক। সহযোগিতার এসব ক্ষেত্র যতটা বিস্তৃত ততটাই এর অন্তর্ভুক্ত। এভাবে তা উম্মাহর অভ্যন্তরে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যাবতীয় মৌলিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ইসলামের সব শিক্ষাই মুসলিমদের মধ্যে সামগ্রিক অর্থে পারস্পরিক সহযোগিতাকে জোরদার করেছে। আপনি দেখবেন যে, ইসলামি সমাজে স্বাতন্ত্র্য, আমিত্ব ও নেতিবাচকতা বলতে কিছু নেই; বরং ইসলামি সমাজে সর্বদাই রয়েছে সত্য ভ্রাতৃত্ব, উত্তম দান এবং কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা।[৩৬১]

ইসলামে সামাজিক সহযোগিতা কেবল মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে যুক্ত মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ধর্ম, গোত্র, বিশ্বাস নির্বিশেষে ইসলামি সমাজে বসবাসকারী সকলের জন্য পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।[৩৬২]

---

৩৬০. *বুখারি* : কিতাব : আল-আদাব, বাব : রহমাতুন-নাসি ওয়াল-আজায়িমি, হাদিস নং ৫৬৬৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : তারাহুমুল মুমিনিনা ওয়া তাআতুফুহুম ওয়া তাআদুদুহুম, হাদিস নং ৬৫।

৩৬১. মুহাম্মাদ আদ-দাসুকি, *আল-ওয়াকফু ওইয়া দাওরুহু ফি তানমিয়াল মুজতামাল ইসলামি, সিলসিলা কাদায়া ইসলামিয়্যা*, সংখ্যা ৪৬, আল-মাজলিসুল আ'লা *লিশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা*, প্রথম অংশ, পৃ. ৫।

৩৬২. সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮।

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি হলো মানুষের সম্মান ও মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

> আর নিঃসন্দেহে আমি আদমসন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদের আমি উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদের সৃষ্টি করেছি অনেকের ওপর আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[৩৬৩]

ইসলামি সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে যত ব্যাপকার্থক আয়াত রয়েছে তার অন্যতম হলো এ আয়াতটি,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

> সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। এবং আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।[৩৬৪]

ইমাম কুরতুবি বলেছেন, সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ সৃষ্টিজগতের সকলের জন্য। অর্থাৎ, তাদের একে অপরকে সাহায্য করবে।[৩৬৫]

আল-মাওয়ারদি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সৎকাজে সহযোগিতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং একে তার তাকওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ, তাকওয়ায় রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সৎকাজে রয়েছে মানুষের সন্তুষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের সন্তুষ্টি একত্রে অর্জন

---

৩৬৩. সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০।
৩৬৪. সুরা মায়িদা : আয়াত ২।
৩৬৫. *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৬, পৃ. ৪৬-৪৭।

করল তার জন্য সৌভাগ্য পূর্ণতা পেল এবং তার নেয়ামতসমূহ ব্যাপক হলো।[৩৮৬]

আল-কুরআনুল কারিম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, ধনীদের সম্পদে মুখাপেক্ষীদের জন্য নির্ধারিত হক রয়েছে, তা তাদের দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

আর যাদের অর্থ-সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে ভিখিরি ও বঞ্চিতের।[৩৮৭]

শরিয়ত-প্রবর্তক নিজেই এই হকের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ধনাঢ্যদের বদান্যতা, অনুগ্রহকারীদের করুণা এবং তাদের অন্তরে যে দয়া, তাদের হৃদয়ে সৎকাজ ও পরোপকারের যে আগ্রহ ও কল্যাণকর কাজের যে প্রেম রয়েছে তার জন্য তা বাদ দেননি।[৩৮৮]

কারা এই হকদার-মুখাপেক্ষী তাদের আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের আয়াতে,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

সদকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের[৩৮৯] জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য[৩৯০], দাসমুক্তির জন্য, ঋণ-ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর

---

৩৮৬. আনবুদ দুনিয়া ওয়েদ-দ্বীন, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

৩৮৭. সুরা মাআরিজ : আয়াত ২৪-২৫।

৩৮৮. হুসাইন হামেদ হাসসান : আত-তাকাফুলুল ইজতেমাই *ফিশশারিআতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮।

৩৮৯. যাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণে নিয়োজিত কর্মচারী।-সম্পাদক

৩৯০. যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের আশা আছে, তার মন জয় করার জন্য তাকে অথবা যে মুসলিমকে কিছু দান করলে ইসলামের প্রতি তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার আশা আছে

পথে ও মুসাফিরদের জন্য[৩৭১] তা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৩৭২]

এই আয়াত থেকে যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। কারণ, যাকাতের খাতসমূহে সমাজের অধিকাংশ সদস্যই অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া সহযোগিতা ও সাহায্য-সমর্থনের দিকটি সামলানোর জন্য এটি প্রধান মৌলিক উৎস। যাকাত ইসলামের ফরজগুলোর মধ্যে তৃতীয় ফরজ (ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ)। কেউ যাকাত অস্বীকার করলে তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। যাকাত তার মালিকের (প্রদানকারীর) চিত্তকে পরিচ্ছন্ন করে এবং আত্মাকে পবিত্র করে। যাকাত যাদের দেওয়া হয় তাদের উপকারের চেয়ে আদায়কারীর উপকারই আগে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।[৩৭৩]

কোনো সন্দেহ নেই যে, যিনি যাকাত দেন তা তার অন্তর থেকে কৃপণতা, লোভ, কুক্ষিগত করে রাখার মনোভাব ইত্যাদি দূরীভূত করে দেয়। একইভাবে তা দরিদ্র, মুখাপেক্ষী ও যাকাতের হকদারের অন্তর থেকে হিংসা, বিদ্বেষ এবং ধনিক শ্রেণি ও সম্পদশালীদের প্রতি যে ঘৃণা তা দূর করে দেয়। ফলে যে সমাজে এই মহান ফরজটি আদায় করা হয় সেখানে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালোবাসা, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও দয়া-মমতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

শরিয়ত রাষ্ট্র-প্রধানকে ধনীদের থেকে দরিদ্রদের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। প্রত্যেকের থেকে তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করা হবে। মুসলিম সমাজে এ ব্যাপারটি জায়েয নেই যে, কিছু মানুষ ভরা-পেটে তৃপ্ত হয়ে রাত কাটাবে এবং তাদেরই পাশে তাদের প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকবে। সামগ্রিকতার বিবেচনায় সমাজের ওপর

তাকে যাকাত থেকে দেওয়া যায়, ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার কারণে বিধানটি বর্তমানে রহিত।-অনুবাদক

[৩৭১]. সফরে থাকাকালে কোনো অবস্থায় অভাবগ্রস্ত হলে।-অনুবাদক

[৩৭২]. সুরা তাওবা : আয়াত ৬০।

[৩৭৩]. সুরা তাওবা : আয়াত ১০৩।

এটা আবশ্যক যে, ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে তাদের একে অপরকে সাহায্য করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»

> ওই লোক আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি যে পেট ভরে খেয়ে রাত যাপন করল, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত এবং সে তা জানে।[৩৭৪]

ইমাম ইবনে হায্ম এ ব্যাপারে বলেছেন, প্রত্যেক দেশের ধনীদের জন্য ফরজ (আবশ্যক) হলো দরিদ্রের (ভরণপোষণের) দায়িত্ব গ্রহণ করা। শাসক তাদের তা করতে বাধ্য করবেন। যদি যাকাত তাদের জন্য পর্যাপ্ত না হয়।[৩৭৫] ...তখন তাদের জন্য আবশ্যক খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, শীতের পোশাক এবং অনুরূপ গ্রীষ্মের পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঝড়বাদল, রোদ-তাপ ও যাতায়াতকারীদের দৃষ্টি থেকে হেফাজতকারী বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৭৬]

বৈষয়িক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনগ্রস্তদের ন্যূনতম প্রয়োজন সুন্দরভাবে পূরণ করে দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর বক্তব্য থেকে এ মর্মার্থই প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন,

«كَرِّرُوا عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ، وَإِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ»

> তোমরা তাদের বারবার সদকা দাও, এমনকি তাদের একেকজন একশটি করে উট পেলেও।[৩৭৭]

অসংখ্য হাদিসে নববি মুসলিম সমাজের তাকাফুল বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

---

৩৭৪. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাব : আল-বির্‌রু ওয়াস-সিলাহ, হাদিস নং ৭৩০৭। তিনি বলেছেন, এই হাদিসের সনদগুলো সহিহ, যদিও *বুখারি* ও *মুসলিমে* তা সংকলিত হয়নি। তাকে ইমাম যাহাবি সমর্থন করেছেন। তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৭৫০, উদ্ধৃত বাক্য এই কিতাবের। বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৩২৩৮।

৩৭৫. ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের জন্য যাকাতের বাইরেও হক রয়েছে।

৩৭৬. *আল-মুহাল্লা*, খ. ৬, পৃ. ৪৫২, মাসআলা নং ৭২৫।

৩৭৭. প্রাগুক্ত।

ইসলামে এর গুরুত্ব কতটুকু সে ব্যাপারে একটি হাদিস, আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেছেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»

আশআরি গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদিনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনদের খাবার কমে যায়, তারা তাদের যা-কিছু সম্বল থাকে তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।[৩৭৮]

ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারিতে* বলেছেন, অর্থাৎ তারা আমার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে।[৩৭৯] এটা যেকোনো মুসলিমের জন্য চূড়ান্ত সম্মান।

অনুরূপ আরেকটি হাদিস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই, সে তার ওপর জুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাআলা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোনো একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি

---

৩৭৮. *বুখারি*, কিতাব : আশ-শিরকাহ, বাব : আশ-শিরকাহ ফিত-তাআম, ওয়ান-নাহদ ওয়াল-উরুদ, হাদিস নং ২৩৫৪; *মুসলিম*, কিতাব : ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব : ফাযায়িলুল আশআরিয়্যিন, হাদিস নং ২৫০০।

৩৭৯. *ফাতহুল বারি*, খ. ৫, পৃ. ১৩০।

ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।[৩৮০]

ইমাম নববি বলেছেন, উপর্যুক্ত হাদিসে মুসলিমকে সাহায্য করা, তার সংকট দূর করা ও তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার মাহাত্ম্য ও ফজিলত প্রকাশ পেয়েছে। কেউ সম্পদ দিয়ে বা সামর্থ্য দিয়ে বা সহযোগিতা দিয়ে সংকট দূর করলে সে সংকট থেকে উদ্ধারকারী ও আপদে সাহায্যকারী বিবেচিত হবে। আর এটা প্রকাশ থাকে যে, কেউ বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে, মতামত জানিয়ে সংকটে ও আপদে সাহায্য করলেও অনুরূপ সাহায্যকারী গণ্য হবে।[৩৮১] এটাই মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মর্মার্থ।

অর্থাৎ, জাতির ব্যক্তিমণ্ডলী তাদের দল ও গোষ্ঠীর সহযোগিতায় থাকবে। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি সমাজে কল্যাণকর কাজের জিম্মাদার হবে। সমাজের মানবিক শক্তিগুলো ব্যক্তির কল্যাণ সংরক্ষণে ও ক্ষতি প্রতিহতকরণে সক্রিয় থাকবে এবং সমাজ-গঠন ও একে নিরাপদ ভিত্তিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্যা ও জটিলতা প্রতিহত করবে।[৩৮২]

অর্থাৎ, জনমণ্ডলী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এবং প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের দৃঢ় বন্ধনে একে অপরের সঙ্গে থাকবে।[৩৮৩]

তা ছাড়া নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখাপেক্ষীদের সাহায্য করার এবং আমরা যে সমাজে বাস করি তার সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীলতার অনুভূতিকে নিজের ওপর সদকা বলে গণ্য করেছেন। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত,

«عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ.
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: لِأَنَّ مِنْ

---

৩৮০. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : লা ইয়াযলিমুল মুসলিমু আল-মুসলিম ওয়া লা ইয়ুসলিমুহু, হাদিস নং ২৩১০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিরূরু ওয়াস-সিলাতি ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমুয-যুলম, হাদিস নং ২৫৮০।

৩৮১. আল-মিনহাজ, *শারহু সহিহ মুসলিম*, খ. ১৬, পৃ. ১৩৫।

৩৮২. মুহাম্মাদ আবু যাহরাহ, *আত-তাকাফুলুল-ইজতিমায়ি ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৭।

৩৮৩. আবদুল আল আহমাদ আবদুল আল, *আত-তাকাফুলুল-ইজতিমায়ি ফিল-ইসলাম*, পৃ. ১৩।

أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ ... وَتَهْدِي الْأَعْمَى وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَٰلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ...»

সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেক দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তার নিজের জানের সদকা রয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কোথা থেকে সদকা করব, আমাদের তো সম্পদ নেই? তিনি বললেন, কেননা, সদকার প্রকারসমূহের মধ্যে এগুলোও রয়েছে ... তুমি অন্ধকে পথ দেখিয়ে দেবে, বধির ও বোবাকে শুনিয়ে দেবে (কথাবার্তা বুঝিয়ে দেবে) যাতে সে বুঝতে পারে, কেউ তার প্রয়োজনে নির্দেশনা চাইলে তুমি তাকে পথ দেখিয়ে দেবে যা তোমার জানা আছে, সাহায্যপ্রার্থী আর্তমানবের সাহায্যে দৌড়ে যাবে, তোমার দুই হাত লাগিয়ে দুর্বলকে সাহায্য করবে–এগুলোর প্রত্যেকটি তোমার পক্ষ থেকে তোমার জানের ওপর সদকা।[৩৮৪]

এ সকল মূল্যবোধ শ্রেষ্ঠ সভ্যতার আলামত বলে বিবেচিত। ইসলাম এই ক্ষেত্রে যাবতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও মতাদর্শ থেকে অগ্রগামী; কারণ, অন্যরা এসব কাজের প্রতি অনেক পরে গুরুত্ব দিয়েছে। তা না হলে কে কবে অন্ধকে পথ দেখিয়ে দেওয়া এবং বধির ও বোবাকে কথা শোনানোর কথা শুনেছে?!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের প্রয়োজন পূরণে সামর্থ্যবানদের শৈথিল্য প্রদর্শনের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমর ইবনে মুররা রা. মুআবিয়া রা.-কে বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ»

৩৮৪. *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৫২২, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। ইবনে *হিব্বান*, হাদিস নং ৩৩৭৭; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৭৬১৮; নাসায়ি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ৯০২৭।

যেকোনো নেতা (রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত) মুখাপেক্ষী ও অভাব-অনটনগ্রস্ত লোকদের মুখের ওপর তার দরজা বন্ধ করে রাখে (তার কাছে আসতে বাধা প্রধান করে), আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন ও অভাব-অনটনের সময় আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে রাখবেন।[৩৮৫]

বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদিস শুনে মুআবিয়া রা. মানুষের প্রয়োজন পূরণে একজন লোক নিযুক্ত করলেন।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু তালহা আল-আনসারি (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ»

যেকোনো মুসলিম তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের এমন জায়গায় সাহায্য পরিত্যাগ করবে যেখানে তার সম্মানের লাঘব হচ্ছে বা ইজ্জতহানি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন যেখানে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর যেকোনো মুসলিম তার কোনো মুসলিম ভাইকে এমন জায়গায় সাহায্য করবে যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে বা অপদস্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সাহায্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে।[৩৮৬]

পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি দৃঢ়ীকরণে মুসলিম ফকিহগণের আশ্চর্যজনক বক্তব্য রয়েছে। তারা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো ওয়াজিব।

---

৩৮৫. *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩৩২; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৮০৬২; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ১৫৬৫।

৩৮৬. তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৪৭৩৫; *আল-আওসাত*, হাদিস নং ৮৬৪২; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৮৮৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৪১৫; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৭৬৩২।

বিপদ্গ্রস্ত, জলে নিমজ্জিত, অগ্নিদগ্ধ মানুষকে তাৎক্ষণিক উদ্ধারের জন্য নামাজ ভেঙে দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ, ধ্বংসাত্মক যেকোনো আপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি অপরের সাহায্য ছাড়াই বিপদ্গ্রস্তকে বিপদ থেকে উদ্ধারের সক্ষমতা রাখে, তাহলে তার জন্য বিপদ্গ্রস্তকে উদ্ধার করা ফরজে আইন। যদি ঘটনাস্থলে অন্য সক্ষম ব্যক্তি থাকে তাহলে তা ফরজে কেফায়া। এ ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।[৩৮৭]

এসব কারণেই পারস্পরিক সহযোগিতা ইসলামি সমাজের একটি মৌলিক ভিত্তি। বিপদ ও সংকট দূরীকরণে সাহায্য-সহযোগিতার অনেক পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। সাহায্য এগিয়ে দেওয়া, সুরক্ষা প্রদান করা, সমবেদনা জানানো, পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এগুলো করা যায়। যাতে নিরুপায় ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ হয়, দুশ্চিন্তাগ্রস্তের দুশ্চিন্তা দূর হয়, আক্রান্তের ক্ষত নিরাময় হয় এবং দেহ সব ধরনের ব্যাধি ও অসুস্থতা থেকে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

৩৮৭. আশ-শিরবিনি আল-খাতিব, *মুগনিল মুহতাজ*, খ. ৪, পৃ. ৫; ইবনে কুদামা, *আল-মুগনি*, খ. ৭, পৃ. ৫১৫ এবং খ. ৮, পৃ. ২০২।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সুবিচার ও ইনসাফ

ইসলাম যে-সকল মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের প্রবর্তন করেছে সুবিচার তার অন্যতম। সুবিচারকে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের উপাদান সাব্যস্ত করেছে। কুরআনুল কারিম মানুষের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে নবী-রাসুল প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য বলে স্থির করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

নিশ্চয় আমি আমার রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার (ইনসাফ) প্রতিষ্ঠা করে।[৩৮৮]

ইনসাফ ও সুবিচারই যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবী-রাসুল প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য তা এই মূল্যবোধকে সবচেয়ে বেশি জোরদার করেছে। ইনসাফের সঙ্গেই কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে এবং রাসুলদের প্রেরণ করা হয়েছে। ইনসাফের কারণেই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী টিকে আছে।[৩৮৯]

যাদের মধ্যে আমরা বিচার করব তাদের প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সুবিচার করা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৩৮৮. সুরা হাদিদ : আয়াত ২৫।
৩৮৯. ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, *মালামিহুল মুজতামাইল মুসলিম আল্লাযি নুনশিদুহ*, পৃ. ১৩৩।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।[৩৯০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।[৩৯১]

ইবনে কাসির[৩৯২] বলেছেন, কোনো গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বা শত্রুতা যেন তোমাদেরকে তাদের মধ্যে সুবিচার পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। বরং বন্ধু হোক বা শত্রু, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো।[৩৯৩]

ইসলামে সুবিচার কখনো ভালোবাসা বা শত্রুতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সুবিচারের ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা ও বংশগৌরবের কারণে পার্থক্য করা হয় না, সম্পদ ও প্রতিপত্তির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয় না। একইভাবে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। বরং ইসলামের ভূমিতে

---

৩৯০. সুরা নিসা : আয়াত ১৩৫।
৩৯১. সুরা মায়িদা : আয়াত ৮।
৩৯২. ইবনে কাসির : আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির আদ-দিমাশকি (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.)। হাদিসের হাফিয, ঐতিহাসিক, ফকিহ। সিরিয়ার বুসরার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, হুসাইনি, *যাইলু তাযকিরাতিল হুফফায*, পৃ. ৫৭-৫৮।
৩৯৩. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ২, পৃ. ৪৩।

বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই সুবিচার ভোগ করে থাকে। চাই পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা থাকুক বা শত্রুতা।

উসামা ইবনে যায়দ রা. বনু মাখযুম গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত নারীর জন্য মধ্যস্থতা করতে চেষ্টা করেন। তাকে চুরির অপরাধে হাত কাটার দণ্ড থেকে বাঁচাতে চান। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে রাজা-প্রজাসহ সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মাঝে সমতার ঘোষণা দিয়ে ইসলামের মানহাজ ও সুবিচার ব্যাখ্যা করেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

হে জনমণ্ডলী, জেনে রাখো, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এই আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত লোক চুরি করত, তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোনো অসহায় দুর্বল লোক চুরি করত, তারা তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে নিশ্চয় আমি তার হাত কেটে দিতাম।[(৩৯৪)]

ইমাম আহমাদ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা খাইবারকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গনিমত হিসেবে দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদেরকে ওখানেই থাকার অনুমতি দিলেন এবং খাইবারের সম্পদ তার ও তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে বলে স্থির করে দিলেন। (ফলের মৌসুম এলে) তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-কে পাঠালেন। তিনি ইহুদিদের জন্য খাইবারের খেজুরবাগানের ফলের

---

৩৯৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা... (সুরা কাহফ : আয়াত ৯), হাদিস নং ৩২৮৮; *মুসলিম* : কিতাব : আল-হুদুদ, বাব : কাতউস সারিকিশ-শারিফি ওয়া গাইরিহি, হাদিস নং ১৬৮৮।

পরিমাণ অনুমান করলেন।[৩৯৫] তারপর তাদের বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়, তোমরা আমার কাছে সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত, তোমরা আল্লাহ তাআলার নবীদের হত্যা করেছ এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করেছ। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা তোমাদের প্রতি সামান্য অবিচার করতে আমাকে প্ররোচিত করছে না। আমি খেজুরের পরিমাণ বিশ হাজার ওয়াস্‌ক[৩৯৬] অনুমান করেছি। তোমরা যদি চাও তা নিতে পারো। আর নিতে না চাইলে আমি নেব। ইহুদিরা বলল, এই সুবিচারের দ্বারা আকাশসমূহ ও জমিন টিকে আছে। আমরা তা গ্রহণ করলাম।[৩৯৭]

ইহুদিদের প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতি জুলুম করেননি। বরং তিনি তাদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের প্রতি সামান্যতম অবিচারও করবেন না। তারা খেজুরের বণ্টিত দুটি অংশের যেকোনোটি গ্রহণ করতে চাইলে গ্রহণ করুক।

এটাই ইসলামের ইনসাফ ও সুবিচার, এটাই জমিনের ওপর আল্লাহর মানদণ্ড। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে দুর্বলকে তার অধিকার প্রদান করা হয় এবং মজলুমের প্রতি, তার প্রতি যে জুলুম করেছে তার বিরুদ্ধে সুবিচার করা হয়। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে হকদার ব্যক্তি খুব সহজ পদ্ধতিতে ও সহজ পন্থায় তার অধিকার পেতে পারে। মুসলিম সমাজে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস থেকেই এই মূল্যবোধের বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটেছে। মুসলিম সমাজে বসবাসকারী সব শ্রেণির মানুষের সুবিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং সুবিচারে স্বস্তি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ইসলাম মানুষের সঙ্গে সুবিচার করতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই, যেমন আমরা প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে দেখেছি। এই সুবিচার কোনো খাতির বোঝে না, সুতরাং তা ভালোবাসা বা ঘৃণা ও শত্রুতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কারণ, ইসলাম প্রথমে নিজের থেকেই ইনসাফ শুরু

---

৩৯৫. خرص : গাছের ওপর খেজুর বা ফল অনুমানভিত্তিক পরিমাপ করা। দেখুন, আল-আজিম আবাদি, *আওনুল মাবুদ*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব* خرص মূলধাতু, খ. ৭, পৃ. ২১।

৩৯৬. ওয়াস্‌ক = ৬০ সা, সা = ৪ মুদ, মুদ = ৮১৭.৬৫ গ্রাম।-অনুবাদক

৩৯৭. *আহমাদ*, হাদিস নং ১৪৯৯৬; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫১৯৯; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ।

করতে নির্দেশ দিয়েছে। নিজের হক, রবের হক ও অন্য মানুষদের হকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে। আবুদ দারদা রা. তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ধারাবাহিকভাবে রোযা ও কিয়ামুল লাইলে (রাত জেগে ইবাদত) মশগুল থেকে তার হক ক্ষুণ্ণ করতে চাইলে সালমান আল-ফারসি রা. তাকে বললেন,

«إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»

নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার নিজেরও (শরীরেরও) হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারেরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক দাও।[৩৯৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান আল-ফারসি রা.-এর এসব কথা শুনে তাকে সত্যায়ন করলেন।

ইসলাম অনুরূপভাবে কথার ক্ষেত্রে ইনসাফ রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾

যখন তোমরা কথা বলবে ন্যায্য বলবে, স্বজনদের সম্পর্কে হলেও।[৩৯৯]

যেমন আল্লাহ তাআলা বিচারে ইনসাফ করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।[৪০০]

---

৩৯৮. *বুখারি*, কিতাব : আস-সাওম, বাব : মান আকসামা আলা আখিহি লি-ইয়ুফতিরা ফিত-তাতাওয়ুয়ি ওয়া লাম ইয়ারা আলাইহি কাযা ইযা কানা আওফাকা লাহু, হাদিস নং ১৮৩২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৪১৩।

৩৯৯. সুরা আনআম : আয়াত ১৫২।

৪০০. সুরা নিসা : আয়াত ৫৮।

একইভাবে সন্ধির ক্ষেত্রেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।[৪০১]

ইসলাম যে মাত্রায় সুবিচার ও ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছে এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, তারচেয়ে অধিক মাত্রায় জুলুমকে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং একে প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করেছে। চাই তা নিজের প্রতি জুলুম হোক, বা অন্যদের প্রতি। বিশেষ করে দুর্বলদের ওপর শক্তিমানদের জুলুম এবং দরিদ্রদের ওপর ধনীদের জুলুম এবং শাসিতদের ওপর শাসকদের জুলুমকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। মানুষ যত দুর্বল হবে তার প্রতি জুলুমের ভয়াবহতা ও পাপও তত তীব্র হবে। হাদিসে কুদসিতে রয়েছে (আল্লাহ তাআলা বলেন),

«يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»

হে আমার বান্দারা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও জুলুম হারাম সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম করো না।[৪০২]

---

৪০১. সুরা হুজুরাত : আয়াত ৯।

৪০২. *মুসলিম*, আবু যর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-বিরুর ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমুয-যুলম, হাদিস নং ২৫৭৭; *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৪৫৮; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৪৯০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬১৯; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৭০৮৮ ও *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১১২৮৩।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে বলেন,

«وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»

এবং বেঁচে থাকবে উৎপীড়িতের বদদোয়া থেকে। কেননা, উৎপীড়িতের বদদোয়া এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো আড়াল নেই।[৪০৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ : وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»

তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না : রোযাদারের দোয়া, যখন সে ইফতার করে; ন্যায়বিচারক শাসকের দোয়া এবং মাজলুমের দোয়া। আল্লাহ তার দোয়া মেঘের ওপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং রব বলেন, আমার ইজ্জত-সম্মানের কসম, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাহায্য করব, যদিও কিছু সময় পরে হয়।[৪০৪]

ইনসাফ ও সুবিচার এমনই হয়। এটাই ইসলামি সমাজে আসমানের মানদণ্ড।

---

৪০৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাগাযি, বাব : বা'সু আবি মুসা ওয়া মুআয ইলাল ইয়ামান কাবলা হাজ্জাতিল ওয়াদা, হাদিস নং ৪০০০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আদ-দুআ ইলাশ-শাহাদাতাইন ওয়া শারায়িয়িল-ইসলাম, হাদিস নং ২৭।

৪০৪. *তিরমিযি*, কিতাব : আদ-দাওয়াত, বাব : আল-আফউ ওয়াল-আফিয়া, হাদিস নং ৩৫৯৮, ইমাম তিরমিযি বলেছেন, এটা হাসান হাদিস। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৭৫২; *আহমাদ*, হাদিস নং ৮০৩০। শুআইব আরনাউত বলেছেন, এটি সহিহ হাদিস।
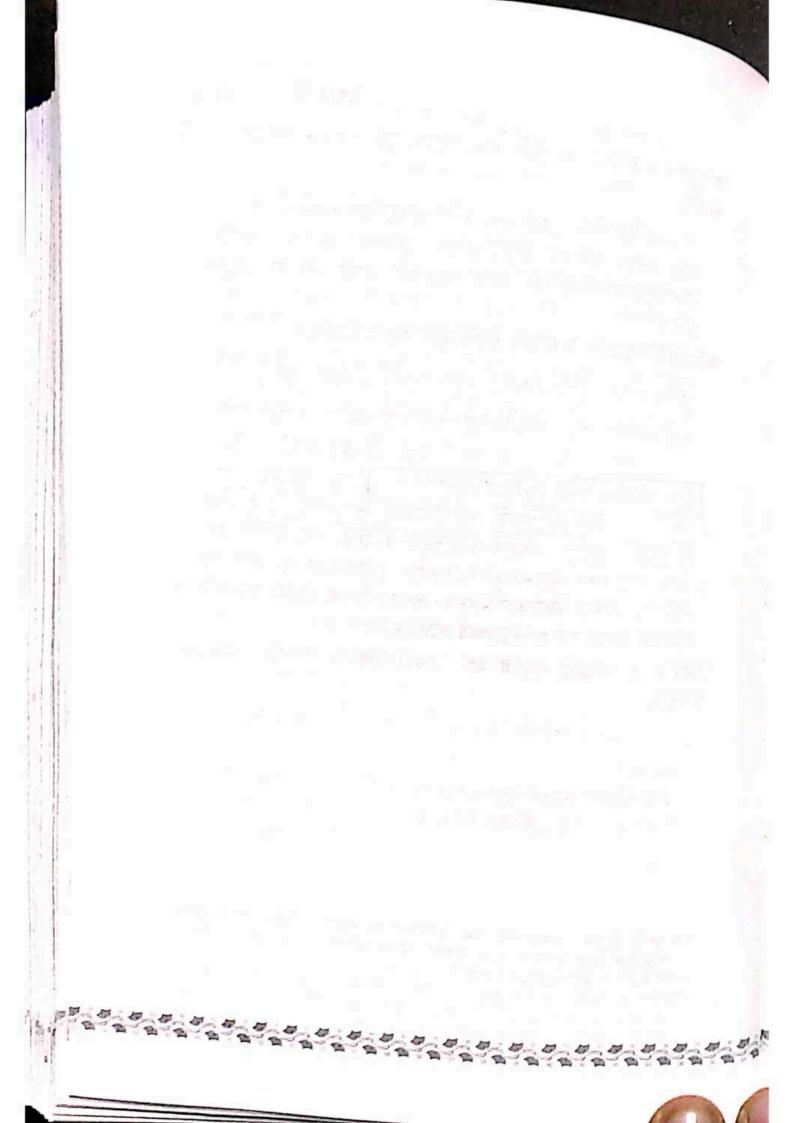
চতুর্থ অনুচ্ছেদ

দয়া

আল্লাহর কিতাব কুরআনই হলো মুসলিমদের সংবিধান এবং শরিয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আল্লাহর কিতাবে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই যা চোখে ভেসে ওঠে তা এই যে, সুরা তাওবা ব্যতীত সব সুরাই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দ্বারা শুরু হয়েছে। এতে আল্লাহর দুটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে : রহমান (পরম করুণাময়) ও রহিম (দয়ালু)। কারও কাছেই এটা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, প্রতিটি সুরা এই দুটি সিফাত বা গুণ দ্বারা শুরু করার বিষয়টি ইসলামি শরিয়ায় দয়ার গুরুত্বকেই প্রতীয়মান করে। এটাও কারও অজানা থাকার কথা নয় যে, রহমান ও রহিম শব্দ দুটির অর্থের মধ্যে নৈকট্য রয়েছে। শব্দ দুটির পার্থক্যের ক্ষেত্রে আলেমগণের ব্যাপক আলোচনা ও বিভিন্ন মত রয়েছে।[৪০৫]

এই সম্ভাবনাও ছিল যে আল্লাহ তাআলা রহমত গুণটির সঙ্গে তাঁর অন্য একটি গুণ যুক্ত করতে পারতেন। যেমন : আযিম (মহান), হাকিম (প্রজ্ঞাময়), সামি (সর্বশ্রোতা), বাসির (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা রহমত গুণটির সঙ্গে ভিন্নার্থক গুণবাচক শব্দও ব্যবহার করতে পারতেন, যা পাঠকের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো এবং রহমত গুণটিও অস্পষ্ট থাকত না। যেমন : জাব্বার (প্রতাপশালী), মুনতাকিম (শাস্তিদাতা), কাহহার (প্রবল)। কিন্তু দুটি পারস্পরিক (অর্থগতভাবে) নিকটবর্তী এই দুটি সিফাতকে কুরআনুল কারিমের প্রত্যেক সুরার শুরুতে একসঙ্গে ব্যবহার করার দ্বারা একটি স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তা হলো দয়া। গুণটি কোনোরকম বিরোধ ব্যতিরেকে অন্য সকল গুণ থেকে অগ্রবর্তী। দয়ার ভিত্তিতে সকল কার্য পরিচালনা করা এমন একটি মৌলিক নীতি যা কখনো বিনষ্ট হবে না এবং অন্য নীতিসমূহের সামনে নড়বড়ে হবে না।

---

৪০৫. ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯।

কুরআনুল কারিমের সুরাবিন্যাসে প্রথম যে সুরাটি আমরা দেখতে পাই তাই উপর্যুক্ত মর্মার্থকে শক্তিশালী করে, স্পষ্ট করে।[৪০৬] তা হলো সুরা আল-ফাতিহা। সুরাটি অন্যান্য সুরার মতো বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়েছে, এতে রহমান ও রহিম দুটি সিফাত রয়েছে। তারপর সুরার আয়াতের মধ্যেও দেখতে পাই যে রহমান ও রহিম সিফাত দুটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই সুরাটি দিয়ে কুরআনুল কারিমের সূচনা করাতেও স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। তা ছাড়া আমাদের জানা আছে যে, সুরা আল-ফাতিহা হলো সেই সুরা, যা প্রতিদিনের প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা মুসলিমের জন্য আবশ্যক। তার অর্থ এই যে, একজন মুসলিম (নামাযের প্রত্যেক রাকাতে) রহমান শব্দটি কমপক্ষে দুইবার উচ্চারণ করে এবং রহিম শব্দটি কমপক্ষে দুইবার উচ্চারণ করে। বান্দা নামাযের প্রত্যেক রাকাতে এই চারবার আল্লাহ তাআলার দয়া স্মরণ করে। অর্থাৎ, একজন মুসলিমের ওপর দৈনিক সতেরো রাকাত ফরজ নামাযে রহমত বা দয়া শব্দটি ৬৮ বার উচ্চারিত হয়। এ থেকে এই মহান গুণটি, অর্থাৎ রহমত গুণটি উদ্‌যাপনের একটি চমৎকার চিত্র আমরা পাই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে উচ্চারিত রাব্বুল আলামিনের সিফাত বর্ণনাকারী অনেক হাদিস থেকে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা আমরা পাই। যেমন : আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»

আল্লাহ তাআলা গোটা মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বে এ কথা লিখে রেখেছেন যে, 'আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর সর্বদাই

---

৪০৬. কুরআনুল কারিমের সুরাসমূহের বিন্যাস একটি ঐশী বিষয়; অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহি নাযিল করে আমাদের সামনে আজ কুরআনের যে সুরাবিন্যাস রয়েছে তা জানিয়েছেন। অথচ কুরআনের আয়াতসমূহ ও সুরাসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিন্যাসে নাযিল হয়েছে। আবু আব্দুল্লাহ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফি উলুমিল-কুরআন*, খ. ১, পৃ. ২৬০।

অগ্রগামী'; এই বাক্য তাঁর কাছে আরশের ওপর লিখিতভাবে রয়েছে।[৪০৭]

এতে এই স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, দয়া ক্রোধের ওপর অগ্রবর্তী এবং কোমলতা কঠোরতার ওপর অগ্রবর্তী।

অধিকন্তু নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানবতার ও বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।[৪০৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বে, সমানভাবে তাঁর সাহাবিদের ও শত্রুদের সঙ্গে আচার-আচরণে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়ার গুণ অর্জন করতে ও এই শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধে সজ্জিত হতে উদ্বুদ্ধ করে বলেন,

«لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ»

যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।[৪০৯]

এখানে 'নাস' বা মানুষ শব্দটি ব্যাপকার্থক, এটি প্রত্যেক মানব সদস্যকে বোঝায়। লিঙ্গ, বর্ণ ও ধর্মের কোনো পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে আলেমগণ

---

৪০৭. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাওহিদ, বাব : আল্লাহ তাআলার বাণী, 'বস্তুত তা সম্মানিত কুরআন, সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।' (সুরা বুরুজ : আয়াত ২১-২২), হাদিস নং ৭১১৫, উদ্ধৃত বাক্য *বুখারির*; *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাওবাহ, বাব : সিআতু রহমাতিল্লাহি তাআলা, হাদিস নং ২৭৫১। অন্য একটি রেওয়ায়েতে سبقت (অগ্রগামী) শব্দের বদলে غلبت (প্রাধান্য লাভ করেছে) শব্দ এসেছে। *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খালক, হাদিস নং ৩০২২।

৪০৮. সুরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭।

৪০৯. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাওহিদ, বাব : মা জাআ ফি দুআইন-নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতাহু ইলা তাওহিদিল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা, হাদিস নং ৬৯৪১; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : রহমাতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস-সিবয়ানা ওয়াল-ইয়ালা ওয়া তাওয়াদুউ ওয়া ফাদলু যালিকা, হাদিস নং ২৩১৯।

বলেছেন, এখানে দয়ার বিষয়টি ব্যাপক, তা শিশুদের ও অন্যদের স্নেহ-মমতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।[৪১০]

ইবনে বাত্তাল বলেছেন, এই হাদিসে সৃষ্টিজগতের সকলের সঙ্গে দয়াপূর্ণ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং মুমিন, কাফের ও চতুষ্পদ জন্তুও এর অন্তর্ভুক্ত। চতুষ্পদ জন্তু নিজের মালিকানাধীন হোক, বা মালিকানা ছাড়া হোক। চতুষ্পদ জন্তুকে খাদ্য ও পানি দান, তাদের ওপর বেশি বোঝা না চাপানো ও প্রহারে সীমালঙ্ঘন না করাও তাদের প্রতি দয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৪১১]

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কসম করে বলেন,

> «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَضَعُ اللهُ رَحْمَتَهُ إلا عَلَى رَحِيمٍ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّنَا يَرْحَمُ، قَالَ : لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ يُرْحَمُ النَّاسُ كَافَّةً»
>
> যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহ দয়ালু লোক ব্যতীত কাউকে তাঁর রহমত দেন না। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রত্যেকেই তো দয়ালু (মানুষের প্রতি দয়া করে)। তিনি বললেন, তোমাদের কারও তার সঙ্গীর প্রতি দয়ালু হওয়ার দ্বারা তো জগতের সকল মানুষের প্রতি দয়া করা হয় না।[৪১২]

মুসলিম সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল–শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মুসলিম ও অমুসলিম সকলের প্রতি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন,

> «اِرْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

---

৪১০. নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সাহিহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, খ. ১৫, পৃ. ৭৭।
৪১১. মুবারকপুরি, *তুহফাতুল আহওয়াযি বি-শারহি জামেইত-তিরমিযি*, খ. ৬, পৃ. ৪২।
৪১২. *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৪২৫৮; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ১১০৬০।

দুনিয়ায় যারা রয়েছে তাদের প্রতি দয়া করো, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[৪১৩]

এখানে 'مَنْ' বা যারা শব্দটি জমিনে যারা রয়েছে তাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মুসলিমদের সমাজে দয়া এমনই হয়ে থাকে। এটা আচরণগত সক্রিয় মূল্যবোধ, যার মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের হৃদ্যতা ও মমত্ববোধ। বরং এই দয়া ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নির্বিশেষে সকল মানুষকে ছাড়িয়ে মূক প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু, গবাদি পশু, পাখি, বৃক্ষ ও তৃণলতার প্রতি বিস্তৃত!

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, একটি নারী জাহান্নামে প্রবেশ করেছে এ কারণে যে, সে একটি বিড়ালের সঙ্গে নির্মম আচরণ করেছিল এবং তার প্রতি দয়া দেখায়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাবারও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যে জমিনের ঘাস-লতা-পাতা খেয়ে বেঁচে থাকবে।[৪১৪]

একইভাবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা একটি লোককে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যে লোকটি একটি কুকুরের প্রতি দয়া দেখিয়েছিল এবং তাকে পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ؛ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ

---

[৪১৩]. *তিরমিযি*, আমর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : মা জাআ ফি রহমাতিল মুসলিমিন, হাদিস নং ১৯২৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ৬৪৯৪; *হাকিম*, হাদিস নং ৭২৭৪। ইমাম তিরমিযি বলেছেন, এটা হাসান সহিহ হাদিস।

[৪১৪]. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খালক, বাব : খামসুন মিনাদ-দাওয়াব ইয়ুকতালনা ফিল-হারাম, হাদিস নং ৩১৪০; *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাওবাহ, বাব : সিআতু রহমাতিল্লাহি তাআলা ওয়া আন্নাহা সাবাকাত গাদাবাহু, হাদিস নং ২৬১৯।

هٰذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي - فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»

এক লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা পেল। সে কূপে নেমে পানি পান করল। কূপ থেকে বের হয়ে সে দেখতে পেল একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মতো পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি কামড়ে ধরে উপরে উঠে এলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তাআলা লোকটির আমল কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতে সওয়াব রয়েছে।[৪১৫]

বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশে ঘোষণা করেছিলেন যে, এক ব্যভিচারিণীর জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল, যার হৃদয় একটি কুকুরের প্রতি দয়ায় শিহরিত হয়ে উঠেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ»

পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে একটি কুকুর একটি কূপের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বনি ইসরাইলের এক দুশ্চরিত্রা নারী তা দেখতে পেল। সে তার পাদুকা খুলে কূপ থেকে পানি তুলে

---

৪১৫. *বুখারি*, কিতাব : আল-মুসাকাত ওয়াশ-শুরব, বাব : ফাদলু সাকয়িল মা, হাদিস নং ২২৩৪; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাক্য়ি বাহাইমিল-মুহতারামাহ ওয়া ইতআমিহা, হাদিস নং ২২৪৪।

কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[৪১৬]

মানুষ তো হতবিহ্বল হয়ে পড়ে যে, ব্যভিচারের পাপের বিপরীতে একটি কুকুরের পরিতৃপ্তি কী! কিন্তু কর্মের পেছনে রহস্য লুকিয়ে আছে। তা হলো মানুষের হৃদয়গত দয়া ও প্রেম এবং সেই আলোকে তার কাজকর্ম। মনুষ্য সমাজে এর মূল্য ও প্রভাব পরিপূর্ণভাবেই রয়েছে।

ইসলাম যে দয়া নিয়ে এসেছে তার প্রেক্ষিতে মূক প্রাণীর প্রতিও দয়া করতে আহ্বান জানিয়েছে। এগুলোকে যেন ক্ষুধার্ত না রাখা হয় এবং এগুলোর ওপর যেন মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া না হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দুর্বল শীর্ণ উটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পূর্ণ দয়া ও মমতার সঙ্গে বলেছিলেন,

«اتَّقُوا اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ ... فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً»

তোমরা এই সকল বোবা প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা সেগুলোর ওপর আরোহণ করো সুন্দরভাবে এবং সেগুলোকে খাও সুন্দরভাবে।[৪১৭]

একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, নিশ্চয় আমি ছাগল জবাই করার সময় তার প্রতি দয়া করি। জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ»

ছাগলের প্রতি যদি তুমি দয়া দেখাও আল্লাহও তোমার প্রতি দয়া দেখাবেন।[৪১৮]

---

৪১৬. *বুখারি*, কিতাব : আল-আম্বিয়া, বাব : 'তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও রাকিমের অধিবাসীরা... (সুরা কাহফ : আয়াত ৯), হাদিস নং ৩২৮০; *মুসলিম* : কিতাব : আস-সালাম, বাব : ফাদলু সাকিল বাহাইমিল-মুহতারামাহ ওয়া ইতআমিহা, হাদিস নং ২২৪৫।

৪১৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : মা ইয়ুমারু বিহি মিনাল-কিয়াম আলাদ-দাওয়াব ওয়াল-বাহায়িম, হাদিস নং ২৫৪৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৭৬৬২, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, অর্থাৎ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৪৬।

৪১৮. *আহমাদ*, হাদিস নং ১৫৬৩০; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৭৫৬২, তিনি বলেছেন, এটা সহিহ হাদিস, যদিও তা *বুখারি* ও *মুসলিমে* সংকলিত হয়নি। তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৫৭১৬।

ইসলাম কেবল চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া দেখানোর নির্দেশ দেয়নি, বরং ছোট ছোট পাখি, যেগুলোর দ্বারা মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মতো উপকৃত হয় না সেগুলোর প্রতিও দয়া দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে। আপনি দেখবেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চড়ুইয়ের ব্যাপারেও বলেন,

«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ»

কেউ অনর্থক একটি চড়ুইও হত্যা করলে সে আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের দিন অভিযোগ জানাবে, বলবে, হে আমার প্রতিপালক, অমুক লোক আমাকে অনর্থক হত্যা করেছে, সে আমাকে কোনো উপকারের জন্য হত্যা করেনি।[৪১৯]

ইতিহাস-লেখকেরা বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনুল আস রা. মিশর বিজয়ের সময় যে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন তার উপরে একটি কবুতর বাসা বেঁধেছিল। আমর রা. তাঁবু ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় সফরের সময় তা দেখতে পেলেন। তিনি তাঁবু খুলে ফেলে কবুতরটিকে কষ্ট দিতে চাইলেন না। তাঁবুটি যেভাবে ছিল সেভাবেই রেখে দিলেন। ধীরে ধীরে তার চারপাশে মানুষের বসবাস বাড়তে থাকল। একসময় তা শহরে পরিণত হলো এবং তার নাম হয়ে গেল ফুসতাত (তাঁবু)।

ইবনে আবদুল হাকাম[৪২০] খলিফায়ে রাশেদ উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর জীবনচরিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রয়োজন ছাড়া ঘোড়া ছোটাতে নিষেধ করেছেন। তিনি আস্তাবলের প্রধানের কাছে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কাউকে ভারী লাগামের সঙ্গে ঘোড়ায় না চড়ায় এবং কেউ যেন লোহার তীক্ষ্ণ ফলাবিশিষ্ট চাবুকের (বা লাঠির) দ্বারা ঘোড়াকে খোঁচা না দেয়। তিনি মিশরের আমিরের উদ্দেশে চিঠি লিখেছেন এই মর্মে যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে, মিশরে বোঝা বহনকারী

---

৪১৯. *নাসায়ি*, শারিদ ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৪৪৪৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯৪৮৮; ইবনে *হিব্বান*, হাদিস নং ৫৯৯৩; তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, খ. ৬, পৃ. ৪৭৯, শাওকানি বলেছেন, এই হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোনো কোনোটিকে ইমামগণ সহিহ বলেছেন। *আস-সাইলুল-জাররার*, খ. ৪, পৃ. ৩৮০।

৪২০. ইবনে আবদুল হাকাম (১৮৭-২৫৭ হি.) : আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম। ইতিহাসবিদ ও মালেকি মাযহাবপন্থী ফকিহ। মিশরে জন্ম ও মৃত্যু। দেখুন, খায়রুদ্দিন আয-যিরিকলি, খ. ৩, পৃ. ২৮২।

উটদের একেকটির ওপর এক হাজার রিতল বোঝা চাপানো হয়। আমার এই চিঠি তোমার কাছে পৌছার পর আমি যেন শুনতে না পাই কোনো উটের ওপর ছয়শ রিতলের বেশি চাপানো হয়েছে।[৪২১]

ইসলামি সমাজে দয়ার স্বরূপ এমনই। তা এ সমাজের সদস্যবৃন্দ ও তাদের বংশধরদের অন্তরে বদ্ধমূল। আপনি দেখবেন যে, তারা দুর্বলের প্রতি কোমলহৃদয়, দুঃখীর প্রতি সহানুভূতিশীল, অসুস্থের প্রতি সমবেদনাপূর্ণ, মুখাপেক্ষীর প্রতি দরাজদিল। এমনকি তা মূক প্রাণী হলেও...। এমন সজীব দয়াপূর্ণ হৃদয়সমূহের ফলেই সমাজ পবিত্র থাকে, অপরাধ থেকে মুক্ত থাকে এবং চারপাশে যারা ও যা-কিছু রয়েছে সকলের জন্য কল্যাণ, সদাচার ও শান্তির উৎসে পরিণত হয়।

---

৪২১. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম, *সিরাতু উমর ইবনে আবদুল আযিয*, খ. ১, পৃ. ১৪১।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ইসলামি সভ্যতায় রাষ্ট্রনীতিসমূহ কেবল ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মুসলিমদের ও অমুসলিমদের সমস্যাবলির সমাধানকল্পেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা অপরাপর জাতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক-ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্ব আরোপ করেছে। এখানে কিছু নীতি ও আদর্শ রয়েছে, যার ওপর এই সম্পর্কসমূহের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এসব নীতি শান্তির অবস্থায় ও যুদ্ধাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য। এখানেও ইসলামি সভ্যতার মাহাত্ম্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং তার মানবিকতার ঝান্ডা পতপত করে উড়েছে।

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে আমরা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ক. ইসলামে শান্তিই মূলনীতি

ইসলামে সত্যিকার অর্থে শান্তিই মূলনীতি। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ঈমানদার ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

> হে মুমিনগণ, তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৪২২]

এখানে ﴿السِّلْمِ﴾ মানে ইসলাম।[৪২৩] সিল্‌ম বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে এ কারণে যে তা মানুষের জন্য শান্তি। তা মানুষের জন্য অন্তরে শান্তি, ঘরে শান্তি, সমাজে শান্তি, চারপাশে যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে শান্তি—এটা শান্তির ধর্ম।

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, ইসলাম শব্দটি সিল্‌ম ﴿السِّلْمِ﴾ শব্দ থেকে নির্গত এবং শান্তিই ইসলামি নীতিমালার প্রধান নীতি। তা কেবল সাধারণভাবে প্রধান নীতি নয়, বরং তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা (সালাম বা শান্তি) মূলধাতুর বিবেচনায় স্বয়ং ইসলাম নামটিরই সমর্থক।[৪২৪]

শান্তিই হলো ইসলামের মৌলিক অবস্থা। যা সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, পরিচিতি ও কল্যাণ-বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়।

---

৪২২. সুরা বাকারা : আয়াত ২০৮।

৪২৩. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ১, পৃ. ৫৬৫।

৪২৪. মুহাম্মাদ আস-সাদিক আফিফি, *আল-ইসলামু ওয়াল-আলাকাতুদ-দাওলিয়্যা*, পৃ. ১০৬; যাফির আল-কাসিমি, *আল-জিহাদু ওয়াল-হুকুকুদ-দাওলিয়্যা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ১৫১।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম-অমুসলিম মানবিকতার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃতুল্য।[৪২৫] কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় মুসলিম-অমুসলিদের মধ্যে নিরাপত্তা বজায় থাকবে; এই নিরাপত্তা কোনো চুক্তি বা বিনিময়ের জন্য নয়। বরং এই ভিত্তিতে যে, শান্তিই মূলনীতি। মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা যদি এই ভিত্তি ভেঙে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।[৪২৬]

তখন মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হলো অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে ও অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা। যাতে মানব-ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকে এবং এই পবিত্র আয়াতের অর্থ বাস্তবিক হয়ে ওঠে,

﴿يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

> হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে আমি তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।[৪২৭]

সুতরাং জাতি-গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ও ধ্বংসের জন্য নয়। বরং তা পারস্পরিক পরিচিতি, প্রীতি ও ভালোবাসার প্রয়োজনে।[৪২৮]

কুরআনের একাধিক আয়াত উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এসব আয়াতে অমুসলিমদের সঙ্গে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তারা শান্তি ও সমঝোতার জন্য ঝোঁক দেখায় ও প্রস্তুতি নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

---

৪২৫. মাহমুদ শালতুত, *আল-ইসলাম আকিদাতান ও শারিআতান*, পৃ. ৪৫৩।
৪২৬. সুবহি আস-সালিহ, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা নাশআতুহা ওয়া তাতওয়ুরুহা*, পৃ. ৫২০।
৪২৭. সুরা হুজুরাত : আয়াত ১৩।
৪২৮. জাদুল-হাক্ক, *মাজাল্লাহ আল-আযহার*, পৃ. ৮১০, ডিসেম্বর ১৯৯৩ খ্রি.।

তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪২৯]

এই আয়াত সুনিশ্চিত আকারে প্রমাণ পেশ করছে যে, মুসলিমরা যুদ্ধ নয় শান্তিই ভালোবাসে এবং তারা শান্তির দিকটিই প্রধান্য দেয়। শত্রুরা যদি শান্তি ও সন্ধির প্রতি ঝোঁক দেখায়, মুসলিমরা তাতেই সন্তুষ্ট হয়, যতক্ষণ না এ ধরনের প্রচেষ্টার আড়ালে মুসলিমদের অধিকার বিনষ্ট হয় অথবা তাদের অভিপ্রায়ের মূল্য দেওয়া না হয়।

সুদ্দি[৪৩০] ও ইবনে যায়দ[৪৩১] বলেছেন, আয়াতটির অর্থ এই যে, তারা যদি আপনাদের সন্ধির প্রতি আহ্বান জানায় আপনি তাদের ডাকে সাড়া দিন।[৪৩২] এই আয়াতের পরবর্তী আয়াত জোরালোভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আগ্রহের কথা জানিয়ে দেয়, এমনকি শত্রুরা শান্তির কথা প্রকাশ্যে বলে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটি গোপন করলেও। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত রাসুলকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾

তারা যদি আপনাকে প্রতারিত করতে চায় তাহলে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি আপনাকে তাঁর নিজের সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।[৪৩৩]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আপনার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট।[৪৩৪]

---

[৪২৯]. সুরা আনফাল : আয়াত ৬১।

[৪৩০]. সুদ্দি : ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদ্দি, মৃ. ১২৮ হি./৭৪৫ খ্রি.। তাবেয়ি। হিজাযের বংশোদ্ভূত এবং কুফায় বসবাস। তার ব্যাপারে ইবনে তাগরি বারদি বলেছেন, তাফসির, মাগাযি (যুদ্ধ-ইতিহাস) ও জীবনচরিত রচয়িতা। ঘটনা ও দিনপঞ্জি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ইমাম ছিলেন। দেখুন, ইবনে তাগরি বারদি, *আন-নুজুমুয-যাহিরাহ*, খ. ১, পৃ. ৩৯০।

[৪৩১]. ইবনে যায়দ : আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসলাম, মৃ. ১৭০ হি./৭৮৬ খ্রি.। ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *আন-নাসিখ ওয়াল-মানসুখ* এবং *আত-তাফসির*। খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলের শুরুর দিকে ইনতেকাল করেছেন। দেখুন, ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, খ. ১, পৃ. ৩১৫।

[৪৩২]. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮-৩৪৪।

[৪৩৩]. সুরা আনফাল : আয়াত ৬২।

[৪৩৪]. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ৪০০।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তিকে মুসলিমদের কাঙ্ক্ষিত ও আল্লাহর কাছে একান্ত প্রার্থিত বিষয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলতেন,

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও স্বস্তি প্রার্থনা করি।[৪৩৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا»

হে লোকসকল, শত্রুর মোকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করো। তবে (শত্রুর বিরুদ্ধে) লড়াই সংঘটিত হলে ধৈর্যধারণ করো।[৪৩৬]

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ শব্দটি পর্যন্ত ঘৃণা করতেন। হাদিসে এসেছে,

«أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَّةُ»

আল্লাহ তাআলার কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নামই সর্বাধিক প্রিয়। এবং (অর্থ ও বাস্তবতার দিক থেকে) হারিস ও হাম্মাম সর্বাধিক সত্য নাম এবং সবচেয়ে মন্দ নাম হারব ও মুররাহ।[৪৩৭]

---

৪৩৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মা ইয়াকুলু ইযা আসবাহা, হাদিস নং ৫০৭৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৮৭১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৪৭৮৫, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৯৬১; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ১২০০; তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৩৭৯৬; নাসায়ি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১০৪০১।

৪৩৬. বুখারি, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : কানান-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইযা লাম ইয়ুকাতিলু আওয়ালান নাহারি আখখারাল কিতাল.., হাদিস নং ২৮০৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : কারাহিয়াতু তামান্নি লিকাইল-আদুওবি ওয়াল-আমরি বিস-সাবরি ইনদাল লিকা, হাদিস নং ১৭৪২।

৪৩৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফি তাগরিরিল আসমা, হাদিস নং ৪৯৫০; *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৫৬৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯০৫৪; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮১৪।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩৮. অমুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি

শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানকল্পেই অন্যদের সঙ্গে মুসলিমদের সন্ধিগুলো হয়েছিল। এসব সন্ধির আওতায় দুটি দল, মুসলিম ও অন্যরা, শান্তি বা যুদ্ধবিরতি বা মৈত্রীর অবস্থায় থেকেছে।

যেহেতু সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো শান্তি, তাই সন্ধিগুলো হয়েছিল আকস্মিক আপতিত যুদ্ধের সমাপ্তিতে ও সার্বক্ষণিক শান্তির অবস্থা ফিরিয়ে আনতে অথবা সেগুলো ছিল শান্তির অবস্থাকে আরও জোরালো ও শান্তিস্তম্ভগুলোকে আরও দৃঢ় করার জন্য। যাতে সন্ধির পর শত্রুতার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে। তবে সন্ধিভঙ্গের কারণ ঘটলে ভিন্ন কথা।[৪৩৮]

দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ধরে ইসলামি রাষ্ট্রগুলো অনৈসলামি রাষ্ট্রগুলোর সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি বাস্তবায়ন করে এসেছে। এসব সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তিতে কিছু কর্তব্য, নীতি, শর্ত ও আদর্শ ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে এগুলো উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে।

শুরুর দিকে সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তিগুলো ছিল মূলত সমঝোতা, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার, ইসলামি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় এসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। শেষ পর্যায়ে সন্ধিগুলোর নামকরণ করা হয় শান্তিচুক্তি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি বা সমঝোতা চুক্তি। এগুলোর দাবি ছিল যুদ্ধ পরিত্যাগে সকলের সঙ্গে আপস-মীমাংসা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

> তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবেন।[৪৩৯]

---

৪৩৮. মুহাম্মাদ আবু যাহরাহ, *আল-আলাকাতুদ-দাওলিয়া ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৭৯।

৪৩৯. সুরা আনফাল : আয়াত ৬১।

ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে যেসব সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত বা বাস্তবায়িত হয়েছে তার অন্যতম হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় আগমনের পর ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি। এই চুক্তির কিছু শর্ত নিম্নরূপ :

- ইহুদিরা যতদিন মুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করবে ততদিন তারা যুদ্ধের ব্যয়ও নির্বাহ করবে।
- বনু আওফের ইহুদিরা মুমিনদের সঙ্গে একই উম্মত গণ্য হবে।
- ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম এবং মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্ম। তাদের নিজেদের ও গোলামদের জন্য এ কথা প্রযোজ্য হবে। তবে যে লোক জুলুম বা অপরাধ করবে সে তার নিজেকে ও নিজ পরিবার-পরিজন ছাড়া আর কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।
- বনু নাজ্জারের ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের মতো অধিকার লাভ করবে।
- বনু হারিসের ইহুদিরা বনু আওফের ইহুদিদের সম-অধিকার লাভ করবে।
- বনু সাইদার ইহুদিরাও বনু আওফের ইহুদিদের সমান অধিকার পাবে।
- বনু জুশামের ইহুদিরাও বনু আওফের ইহুদিদের মতো অধিকার লাভ করবে।
- বনু আওসের ইহুদিরাও বনু আওফের ইহুদিদের মতো অধিকার পাবে।
- বনু শাতিবার ইহুদিদের জন্যও বনু আওফের ইহুদিদের সমান অধিকার থাকবে।
- ইহুদিদের শাখাগোত্রগুলোও তাদের মূল গোত্রের লোকদের সমান অধিকার লাভ করবে।
- ইহুদিদের ওপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার অর্পিত হবে এবং মুসলিমদের ওপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার অর্পিত হবে।
- যে-কেউ এই চুক্তিতে সম্মত কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে

পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও কল্যাণ কামনার সম্পর্ক থাকবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

- কোনো পক্ষ তার মিত্রপক্ষের অপকর্মের জন্য দায়ী হবে না এবং অত্যাচারিত সাহায্যের হকদার গণ্য হবে।
- কোনো পক্ষের আশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়দাতার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে, যে আশ্রিত কোনো ক্ষতিসাধন করবে না এবং অপরাধ করবে না।
- এ চুক্তিনামায় যা-কিছু রয়েছে তার প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়।
- এই চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াসরিব আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে।
- তাদেরকে সন্ধির জন্য আহ্বান জানানো হলে তারা সন্ধিবদ্ধ হবে। অনুরূপ তারা সন্ধির জন্য আহ্বান জানালে মুমিনদেরও সন্ধির আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। তবে কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তার ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য হবে না।
- প্রত্যেক পক্ষকে তার নিজের দিকের প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।
- জুলুমকারী বা অপরাধী ছাড়া কেউ চুক্তিনামার প্রতিবন্ধক হবে না।
- যে ব্যক্তি সদাচার করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, নিশ্চয় আল্লাহ তার সহায় রয়েছেন।[৪৪০]

এই চুক্তিনামা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তা ছিল ইহুদিদের ও মুসলিমদের মধ্যে শান্তির অবস্থাকে স্থিতিশীল করার জন্য। তা ছাড়া এটি ছিল তাদের মধ্যে যুদ্ধ না ঘটার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা। চুক্তির শর্তগুলো থেকে স্পষ্টই জানা যাচ্ছে যে, তা ছিল উত্তম প্রতিবেশিত্ব নিশ্চিত করা ও ইনসাফের স্তম্ভগুলোকে দৃঢ়মূল করার জন্য। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, চুক্তিতে মজলুম ও অত্যাচারিতদের সাহায্য করার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য

---

৪৪০. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৫০৩-৫০৪; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৩২২-৩২৩।

রয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠা, ইনসাফের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখা এবং দুর্বলকে সাহায্য করার জন্য এটা ছিল একটি নিরপেক্ষ ন্যায্য চুক্তি।

সিরাতের গ্রন্থগুলো এ ধরনের চুক্তিনামার উদাহরণের কয়েকটি ভান্ডার উপস্থিত করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন তা তার মধ্যে অন্যতম। তাতে বলা হয়েছে,

«وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَأَرْضِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ ... ، وكلما تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ...،»

> নাজরান ও তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের জন্য রয়েছে আল্লাহর আশ্রয় ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিম্মা (নিরাপত্তা)—তাদের নিজেদের ওপর ও তাদের সম্প্রদায়ের ওপর, তাদের ভূমি ও সম্পদের ওপর, তাদের অনুপস্থিত ও উপস্থিত সদস্যবর্গের ওপর এবং তাদের পরিবার-পরিজনের ওপর... এবং কম বা বেশি যা-কিছু তাদের আয়ত্তাধীন রয়েছে সেগুলোর ওপর...।[৪৪১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু দামরাহ[৪৪২]-এর সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করেছিলেন। সে সময় তাদের নেতা ছিলেন মাখশি ইবনে আমর দামরি। বনু মুদলিজের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ চুক্তি ছিল। বনু মুদলিজের লোকেরা ইয়ানবু এলাকায় বসবাস করত। হিজরি দ্বিতীয় বছরের জুমাদাল উলায় এই চুক্তি হয়েছিল।[৪৪৩] জুহাইনার গোত্রগুলোর সঙ্গেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি করেছিলেন। তারা ছিল কয়েকটি বড় গোত্র, মদিনা মুনাওয়ারার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত।[৪৪৪]

---

৪৪১. বাইহাকি, *দালাইলুন নুবুওয়া*, বাব : ওয়াফদু নাজরান, খ. ৫, পৃ. ৪৮৫; আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ৭২; ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৮৮।

৪৪২. বনি দামরাহ গোত্র : আদনান বংশোদ্ভূত একটি আরব গোত্র। মদিনার পশ্চিম দিকে ওয়াদান এলাকায় তারা বসবাস করত।

৪৪৩. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৩, পৃ. ১৪৩।

৪৪৪. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৭২।

ইসলামি মৈত্রীচুক্তির আরেকটি উদাহরণ হলো উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কর্তৃক ইলিয়ার (বাইতুল মুকাদ্দাসের) অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি।[৪৪৫]

এ সকল চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিমরা তাদের চারপাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রশান্ত ও স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করার চেষ্টা করেছে। তারা কখনোই যুদ্ধের চেষ্টা করেনি, বরং সর্বদাই শান্তিকে যুদ্ধের ওপর এবং মিল-মুহাব্বতকে ঝগড়া-বিবাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।

ইসলাম চুক্তি ও সন্ধির জন্য কিছু শর্ত ও নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে সেগুলো শরিয়ত ও যে উদ্দেশ্যে শরিয়ত প্রবর্তিত হয়েছে তার অনুকূল হয়।

আল-ইমামুল আকবার শাইখ মাহমুদ শালতুত রহ.[৪৪৬] বলেছেন, ইসলাম মুসলিমদের জন্য তাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে সন্ধি ও চুক্তি করার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত দিয়েছে। শর্ত তিনটি নিম্নরূপ :

প্রথম শর্ত : চুক্তিতে ইসলামের মৌলিক আইন ও তার সর্বজনীন শরিয়ত লঙ্ঘিত হবে না। সর্বজনীন শরিয়তের কারণেই ইসলামি স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য রয়েছে, তিনি বলেন,

«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»

যেকোনো শর্ত, যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল।[৪৪৭]

---

৪৪৫. চুক্তিটির শর্তসমূহ ও বক্তব্য জানতে দেখুন, তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৪৪৯-৪৫০।

৪৪৬. মাহমুদ শালতুত (১৩১০-১৩৮৩ হি./১৮৯৩-১৯৬৩ খ্রি.) : মিশরীয় ফকিহ ও মুফাসসির। বুহাইরায় জন্ম এবং আল-আযহারে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। শরিয়া অনুষদের ডিন ছিলেন। পরবর্তী সময়ে (১৯৫৮ খ্রি.) শাইখুল আযহার মনোনীত হন। মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

৪৪৭. *বুখারি*, কিতাব : আশ-শুরুত, বাব : আল-মাকাতিবু ওয়া মা লা ইয়াহিল্লু মিনাশ-শুরুতিললাতি তুখালিফু কিতাবাল্লাহ, হাদিস নং ২৫৮৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইত্‌ক, বাব : ইনমাউল ওয়ালা লি-মান আতাকা, হাদিস নং ১৫০৪; *ইবনে মাজাহ*, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ২৫২১।

তার অর্থ এই যে, আল্লাহর কিতাব যেসব শর্ত প্রত্যাখ্যান করে বা স্বীকার করে না সেগুলো বাতিল।

এই শর্তের মধ্য দিয়ে ইসলাম এমন চুক্তির বৈধতা স্বীকার করেনি যার ফলে ইসলামের স্বতন্ত্র সত্তা ঝুঁকির মুখে পড়ে এবং শত্রুদের জন্য ইসলামের বিভিন্ন দিকের ওপর আক্রমণ করার দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অথবা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে ও তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে তাদের শক্তি দুর্বল করে দেয়।

২. **দ্বিতীয় শর্ত :** চুক্তির ভিত্তি হবে উভর পক্ষের সম্মতি। উভর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে চুক্তি লিখিত হবে না। এই শর্তের আলোকে ইসলামে এমন চুক্তির কোনো মূল্য নেই যার ভিত্তি হলো জোরজবরদস্তি, প্রতাপ ও ষড়যন্ত্র। প্রত্যেক চুক্তির স্বভাবই এই শর্তটি নির্দেশ করে। যেকোনো পণ্যের বিনিময় চুক্তিতে ক্রয় বা বিক্রয়ে অবশ্যই (উভয় পক্ষের) সম্মতি থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾

কিন্তু তোমাদের পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।[৪৪৮]

তাহলে কীভাবে সম্মতি ব্যতিরেকে সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি বৈধ হবে? অথচ তা উম্মাহর জীবন ও মৃত্যুর চুক্তি।

৩. **তৃতীয় শর্ত :** চুক্তির উদ্দেশ্যগুলো হবে স্পষ্ট এবং রূপরেখা হবে পরিষ্কার। কর্তব্যাবলি ও অধিকারসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে, যাতে কোনো অপব্যাখ্যার বা শর্ত লঙ্ঘনের বা শব্দ নিয়ে ছিনিমিনির সুযোগ না থাকে। সভ্য হয়ে ওঠা রাষ্ট্রগুলো, যারা দাবি করে যে তারা শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে, তাদের চুক্তিসমূহ যে ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতার শিকার হয়েছে এবং ধারাবাহিক বিশ্ব-বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে, তা উপর্যুক্ত পন্থা অবলম্বনের ফলেই হয়েছে। অর্থাৎ, চুক্তির রূপদানে ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এ ধরনের চুক্তির ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৪৪৮. সুরা নিসা : আয়াত ২৯।

﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا

ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾

পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করো না, করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে।[৪৪৯]

এখানে (دَخَلًا) দাখাল-এর অর্থ হলো নিপুণ প্রতারণা। যে কাজেই এমন প্রতারণা থাকে তা ফলপ্রসূ হয় না।[৪৫০]

চুক্তি রক্ষা করার আবশ্যকতার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহে জোরালো বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوۡفُوا بِٱلۡعُقُودِ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো।[৪৫১]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُوا﴾

তোমরা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করো।[৪৫২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿وَأَوۡفُوا بِٱلۡعَهۡدِ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولًا﴾

এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করো, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।[৪৫৩]

---

[৪৪৯]. সুরা নাহল : আয়াত ৯৪।
[৪৫০]. তাওফিক আলি ওয়াহবাহ, *আল-মুআহাদাতু ফিল ইসলাম*, পৃ. ১০০-১০১।
[৪৫১]. সুরা মায়িদা : আয়াত ১।
[৪৫২]. সুরা আনআম : আয়াত ১৫২।
[৪৫৩]. সুরা ইসরা বা বনি ইসরাইল : আয়াত ৩৪।

এগুলো ছাড়াও বহু আয়াত রয়েছে যা দৃঢ়ভাবে চুক্তি রক্ষার নির্দেশ দেয়।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদিসও রয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا»

চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে পাক্কা মুনাফিক। স্বভাব চারটি এই : এক. সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; দুই. সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; তিন. যখন সে চুক্তি করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে; এবং চার. যখন কারও সঙ্গে কলহ করে, অশ্লীল ব্যবহার করে। যার মধ্যে এই চারটি স্বভাবের একটি থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে।[৪৫৪]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের একটি করে নিশানা থাকবে।[৪৫৫]

এই হাদিসও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنه حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُه أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»

---

৪৫৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-জিযয়া ওয়াল-মুওয়াদাআ, বাব : ইসমু মান আহাদা সুম্মা গাদারা, হাদিস নং ৩০০৭; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু খিসালিল-মুনাফিক, হাদিস নং ৫৮।

৪৫৫. *বুখারি*, কিতাব : আল-জিযয়া ওয়াল-মুওয়াদাআ, বাব : ইসমুল গাদির লিল-বার্‌রি ওয়াল-ফাজির, হাদিস নং ৩০১৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তাহরিমুল-গাদর, হাদিস নং ১৭৩৫।

> যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তার উচিত সে যেন তা ভঙ্গও না করে এবং তা শক্তও না করে, যে পর্যন্ত না চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। অথবা প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে চুক্তিভঙ্গের সংবাদ জানিয়ে না দেয়।[৪৫৬]

(অর্থাৎ, প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে যে, আমাদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল এখন থেকে তা আর অবশিষ্ট থাকল না।)

সুনানে আবু দাউদে রয়েছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> «أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

> যে ব্যক্তি এমন কোনো লোকের ওপর জুলুম করে, যার সঙ্গে তার সন্ধি হয়েছে, অথবা তার কোনোপ্রকার ক্ষতি সাধন করে অথবা সাধ্যের অতিরিক্ত তাকে কষ্ট দেয় কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কোনো জিনিস আদায় করে, কিয়ামতের দিন আমি (এমন মাজলুমের পক্ষ থেকে) প্রতিবাদ করব।[৪৫৭]

ফকিহগণ যদিও মনে করেন যে আমির সৎ হোক বা পাপী, তার নেতৃত্বে জিহাদ করা যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এই মত পোষণ করেন যে, যে আমির চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে দায়িত্বশীল নন বা তা গুরুত্বের সঙ্গে নেন না; তার নেতৃত্বে জিহাদ করা যায় না। যদিও তা আধুনিক সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থী। কারণ অবস্থার পরিবর্তনের ফলে চুক্তি ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। মুসলিমরা যদি বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তাদের নিজেদের কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাদের জন্য আবশ্যক হবে অপর পক্ষের কর্তব্যসমূহের প্রতি সযত্ন থাকা।

---

৪৫৬. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, আল-ইমাম ইয়াকুনু বাইনাহু ওয়া বাইনাল আদুওবি আহদ, হাদিস নং ২৭৫৯; *তিরমিযি*, আমর ইবনে আবাসা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ১৫৮০; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৯৪৫৫।

৪৫৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-খারাজ, বাব : তা'শিরু আহলিল জিম্মাহ ইযাখতালাফু বিত-তিজারাত, হাদিস নং ৩০৫২।

এই প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত ঘটনা বর্ণনা করা যায়। মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. হিমস জয় করে নিলেন, সেখানকার অধিবাসীদের থেকে জিযয়াও গ্রহণ করলেন। পরে তিনি হিমস ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। এজন্য হিমসের বাসিন্দাদের থেকে যে জিযয়া গ্রহণ করেছিলেন তা ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, আমরা তোমাদের মাল ফিরিয়ে দিলাম। কারণ আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, বিশাল সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য সমবেত হয়েছে। তোমরা আমাদের ওপর শর্ত দিয়েছিলে যে আমরা তোমাদের রক্ষা করব; কিন্তু আমরা তা পারলাম না...। তাই তোমাদের থেকে যা গ্রহণ করেছিলাম তা ফিরিয়ে দিলাম। তোমরা আমাদের যেসব শর্ত দিয়েছ তা মান্য করব এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যা লিখিত হয়েছে তা পালন করব, যদি আল্লাহ আমাদের তাদের ওপর বিজয়ী করেন।[৪৫৮]

ইসলামি ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন ও জাতীয় স্বার্থের ভিন্নতা ইসলামে চুক্তি ভঙ্গকে বৈধ করে না। মুসলিমরা যদি অপর পক্ষের বিপরীতে নিজেদেরকে শক্তিকেন্দ্রে প্রত্যক্ষ করে তবুও চুক্তি ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। এ ব্যাপারটিকে জোরালোভাবে সমর্থন করে কুরআনে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার করো এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিন করে দৃঢ় শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।[৪৫৯]

---

৪৫৮. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ৮১।

৪৫৯. সুরা নাহল : আয়াত ৯১।

এ বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, মুসলিমদের ওপর চুক্তি রক্ষার কঠোর নির্দেশ এসেছে এমন সময়ে ও এমন পরিবেশে যখন চুক্তি রক্ষার কোনো নীতি বা রীতি ছিল না।[৪৬০]

ইসলামি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি রক্ষার জন্য যে-সকল চুক্তি স্বাক্ষর করে তাতে এটাই হলো ইসলামের বিধান। আমরা চুক্তি পালন করতে ও চুক্তির শর্তসমূহ মান্য করতে আদিষ্ট, আমাদের থেকে এটাই চাওয়া হয়েছে। আমাদেরকে চুক্তি ভঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে শত্রুরা চুক্তি ভঙ্গ করলে ভিন্ন কথা। কিন্তু যতক্ষণ না তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতা শুরু করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হলো চুক্তি রক্ষা করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾

তবে মুশরিকদের যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে।[৪৬১]

শাইখ মাহমুদ শালতুত বলেছেন, চুক্তি রক্ষা করা একটি আবশ্যক দ্বীনি দায়িত্ব। আল্লাহর হক হিসেবে মুসলিমরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তা ছাড়া কোনো ধরনের চুক্তি লঙ্ঘন বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানত বলে বিবেচিত হবে।[৪৬২]

এসব দিক বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় চুক্তির আইন প্রণয়নে ইসলাম (মুসলিমরা) অন্য সকল জাতি থেকে অগ্রগামী হয়ে আছে। বরং ইনসাফ ও শত্রুর সঙ্গে উদারতা প্রদর্শনে ইসলাম অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই অগ্রগামিতা কেবল দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ছিল না, বরং

---

[৪৬০]. সালেহ ইবনে আবদুর রহমান আল-হুসাইন, *আল-আলাকাতুদ-দাওলিয়্যা বাইনা মানহাজিল-ইসলাম ওয়াল-মানহাজিল হাদারিল মুআসির*, পৃ. ৫১।

[৪৬১]. সুরা তাওবা : আয়াত ৪।

[৪৬২]. মাহমুদ শালতুত, *আল-ইসলাম আকিদাহ ওয়া শারিআহ*, পৃ. ৪৫৭।

প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের শুরু থেকে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে, তার পরবর্তী ইসলামি যুগসমূহে মুসলিমরা তাদের শত্রুদের সঙ্গে যেসব চুক্তি কার্যকর করেছে তা উপর্যুক্ত বক্তব্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।

দূতদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে : এ ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ার স্পষ্ট বিধান রয়েছে। দ্ব্যর্থহীন নুসুস ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, কোনো অবস্থাতেই দূতদের হত্যা করা বৈধ নয়। ইসলামি শরিয়ার ফকিহগণ মুসলিমদের ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) জন্য দূতদের নিরাপত্তা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা উপভোগের নিশ্চয়তা ও পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের সুযোগদান বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।[৪৬৩]

ব্যক্তি হিসেবে দূতের সুরক্ষার অর্থ হলো তাকে বন্দি হিসেবে গ্রেপ্তার করা বৈধ নয়। একইভাবে দূতের অনিচ্ছায় তাকে তার রাষ্ট্রের হাতে রাষ্ট্রের দাবি অনুযায়ী সোপর্দ করা যাবে না, এমনকি দারুল ইসলাম যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হলেও। কারণ তাকে তার রাষ্ট্রের কাছে সোপর্দ করার অর্থ হলো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। তা ছাড়া সে দারুল ইসলামে নিরাপত্তা ভোগ করছে।[৪৬৪]

দূতের যে দায়িত্ব তা পারস্পরিক সমঝোতায়, চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধ বন্ধে বড় ভূমিকা পালন করে। এ কারণে তার জন্য সব পথ খোলা থাকা উচিত, তার সব প্রয়োজন পূরণ করা উচিত। এটা কেবল তার ব্যক্তির জন্য নয়, বরং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালনের জন্যও। সে তার প্রেরকের প্রতিনিধিত্ব করছে। তার ভিন্ন মত থাকতে পারে; কিন্তু সে এই দায়িত্ব পালনে রাজি হয়েছে। যার কাছে দূত প্রেরণ করা হয়েছে তার এসব অবস্থা বিবেচনায় আনা উচিত।

আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত, একবার (কোনো এক কাজে) কুরাইশরা আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিল। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখতেই ইসলামের সত্যতা ও মহত্ত্ব আমার অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেল। ফলে আমি

---

৪৬৩. ইবনে হাযম, *আল-মুহাল্লা*, খ. ৪, পৃ. ৩০৭।

৪৬৪. আবদুল কারিম যাইদান, *আশ-শারিআতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-কানুনুদ দুয়ালিল আম*, পৃ. ১৬৯।

বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আমি আর তাদের (কুরাইশদের) কাছে কখনো ফিরে যাব না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلَكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الآنَ فَارْجِعْ»

> আমি চুক্তি ভঙ্গ করতে চাই না এবং কোনো দূতকেও আটক করি না। তবে তুমি এখন চলে যাও। তোমার অন্তরের মধ্যে এখন যা-কিছু আছে (ইসলাম কবুল করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা) তা যদি বহাল থাকে তাহলে আবার ফিরে আসবে।[৪৬৫]

হাইসামি[৪৬৬] তার কিতাব *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*-এ 'দূতদের হত্যায় নিষেধাজ্ঞা' শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এতে একাধিক হাদিস সংকলন করেছেন। তার মধ্যে এক হাদিস নিম্নরূপ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, যখন ইবনে নাওয়াহা নিহত হলো তখন তিনি বলেছেন,

«جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أُثَالٍ رَسُولَا مُسَيْلِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللهِ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا»

> ইবনে নাওয়াহা ও ইবনে উসাল নামক দুই ব্যক্তি (নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার) মুসাইলামার দূত হয়ে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসুল? তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুসাইলামা আল্লাহর

---

৪৬৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : আল-ইমাম ইয়ুসতাজান্নু বিহি ফিল-উহুদ, হাদিস নং ২৭৫৮; *আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৯০৮। শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

৪৬৬. ইবনে হাজার আল-হাইসামি : আবুল হাসান আলি ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান আশ-শাফিয়ি আল-মিসরি, (৭৩৫-৮০৭ হি./১৩৩৫-১৪০৫ খ্রি.)। হাফিযে হাদিস, মুহাদ্দিস। সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২৬৬।

রাসুল। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি কোনো দূতকে হত্যা করা আমার নিয়ম থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের হত্যা করতাম।[৪৬৭]

হাইসামি বলেছেন, এই ঘটনার পর থেকে এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, দূতকে হত্যা করা যায় না।[৪৬৮]

এভাবে ইসলাম দূতদের জন্য সভ্য মানবিক আইন প্রণয়নে পশ্চিমা সমাজগুলো থেকে চৌদ্দশ বছর এগিয়ে রয়েছে। ওইসব সমাজ নিকট অতীতকালেও এসব আইন ও নীতি স্বীকার করেনি![৪৬৯]

---

৪৬৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : আর-রুসুল, হাদিস নং ২৭৬১; *আহমাদ*, হাদিস নং ৩৭০৮। শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। *দারেমি*, হাদিস নং ২৫০৩। হুসাইন সালিম আসাদ বলেছেন, হাদিসটির সনদ হাসান, কিন্তু হাদিসটি সহিহ।

৪৬৮. *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৮।

৪৬৯. সুহাইল হুসাইন আল-কাতলাবি, *দিবলুমাসিয়্যাতুন-নাবিয়্যি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : দিরাসাহ মুকারানাহ বিল-কানুনিদ দাওলিল মুআসির*, পৃ. ১৮২।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৮. ইসলামে যুদ্ধের কারণ ও উদ্দেশ্য

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, ইসলামে শান্তিই মূলনীতি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন, দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশে বলেছেন,

«لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ»

তোমরা শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে স্বস্তি প্রার্থনা করো।[৪৭০]

মুসলিম কুরআনুল কারিম ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহের মধ্য দিয়ে যে তরবিয়ত ও নৈতিক শিক্ষা পেয়েছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই সে হত্যা ও রক্তপাত অপছন্দ করে। এ কারণেই তারা কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে না। বরং তারা যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়ানোর জন্য সর্ব পন্থায় সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহ এ বিষয়টিকে জোরালোভাবে প্রমাণ করে। কিতাল বা যুদ্ধের অনুমোদন তখনই দেওয়া হয়েছে যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে। সে সময় নিজেদের জান ও দ্বীন বাঁচানো অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তা না করা হলে চরিত্রে ভীরুতার কলঙ্ক লাগত, মনোবল নিস্তেজ হয়ে পড়ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ○ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ﴾

---

৪৭০. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : কানান-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইযা লাম ইয়ুকাতিল আওয়ালান নাহারি আখখারাল কিতাল হাত্তা তাযুলাশ শামস, হাদিস নং ২৮০৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : কারাহিয়াতু তামান্নি লিকাআল-আদুওবি ওয়াল-আমর বিস-সাবরি ইনদাল লিকা, হাদিস নং ১৭৪২।

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করতে সক্ষম, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।[৪৭১]

আয়াতের কিতাল বা যুদ্ধের কারণ স্পষ্ট। তা এই যে, মুসলিমদের ওপর জুলুম করা হয়েছে এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৪৭২]

কুরতুবি বলেছেন, এটিই প্রথম আয়াত যা কিতালের নির্দেশের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এতে কোনো মতবিরোধ নেই যে, হিজরতের পূর্বে কিতাল নিষিদ্ধ ছিল। তার দলিল হলো আল্লাহর এই বাণী,

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা।[৪৭৩]

এবং আল্লাহর বাণী,

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾

সুতরাং তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো।[৪৭৪]

---

৪৭১. সুরা হজ : আয়াত ৩৯-৪০।
৪৭২. সুরা বাকারা : আয়াত ১৯০।
৪৭৩. সুরা হা-মিম আস-সাজদা : আয়াত ৩৪।
৪৭৪. সুরা মায়িদা : আয়াত ১৩।

অনুরূপ যত আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে তাও এর দলিল। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর কিতালের নির্দেশ পান।[৪৭৫]

লক্ষণীয় যে, এখানে যুদ্ধের নির্দেশ এসেছে কেবল তাদেরই প্রতিহত করার জন্য যারা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে। যারা যুদ্ধে জড়ায়নি তাদের ব্যাপারে যুদ্ধের নির্দেশ আসেনি। ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾—'কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না' এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা এটাই দৃঢ়ভাবে বোঝানো হয়েছে।

তারপর মুমিনদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৪৭৬]

আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘন পছন্দ করেন না, তা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে হলেও। এতে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার পথ সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে। এটা বিশ্ব-মানবতার প্রতি বড় দয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾

তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে।[৪৭৭]

এখানে কিতাল শর্তযুক্ত, আমাদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সেনাসমাবেশ ও যুদ্ধ অনুযায়ীই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সেনাসমাবেশ ও যুদ্ধ হবে।[৪৭৮] আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে লড়াই করার কারণ হলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সর্বাত্মকভাবে লড়াই করা। সুতরাং মুসলিমদের জন্য স্পষ্ট কারণ ব্যতীত যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। যেমন মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন করা, তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া, অথবা কারও প্রতি জুলুম করা।

---

৪৭৫. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ৭১৮।
৪৭৬. সুরা বাকারা : আয়াত ১৯০।
৪৭৭. সুরা তাওবা : আয়াত ৩৬।
৪৭৮. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ৪৭৪।

মুসলিমরা এই জুলুম দূর করতে চাইবে। অথবা, মুশরিকরা যদি মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন প্রচারে বাধা দেয় এবং এই দ্বীন অন্য কারও কাছে পৌছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে।

পূর্বোক্ত আয়াতের মতো আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসুলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মুমিন হও।[৪৭৯]

'যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কার কাফেররা। তাদের কারণে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। তাই বের করার বিষয়টি তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মদিনা থেকে বের করে এনেছিল। হাসান বসরি রহ. উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ﴿وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾—'তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।' অর্থাৎ, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। তারা বনু খুযাআর বিরুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করেছে। কেউ বলেছেন, বদরের দিন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসায়িক কাফেলার উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন। তারা কাফেলাকে যখন নিরাপদ ও অক্ষত পেল, তারা মক্কায় চলে যেতে পারত। কিন্তু তারা বদরে পৌছে সেখানে মদ পান করার জন্য গোঁ ধরে...। কেউ বলেছেন, তাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বের করে দেওয়ার

---

৪৭৯. সুরা তাওবা : আয়াত ১৩।

অর্থ এই যে, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হজ, ওমরা ও তাওয়াফ করতে বাধা দিয়েছিল। এভাবে তারা বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল।[৪৮০]

কখন তারা শুরু করেছিল তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলা যায় যে, মুসলিমদের কাছে কিতাল বা যুদ্ধের কারণ স্পষ্ট। তা এই যে, তাদের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল।

এসব কারণেই মুসলিমদের যুদ্ধ করতে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে মুসলিমরা যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিল তা এ কথারই সত্যায়ন করে। মুসলিমরা দেশ বিজয়ে প্রথমে লড়াই শুরু করেনি এবং বিজিত দেশের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি। মুশরিকদের মধ্যে যারা তাদের মোকাবিলা করেছে তাদের সবাইকে হত্যাও করেনি। মুসলিমরা কেবল বিজিত দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছে। অন্য মুশরিকদের তাদের ধর্মীয় শান্ত অবস্থাতেই থাকতে দিয়েছে।

আমরা দেখি যে, যুদ্ধের এসব কারণ ও হেতুকে কোনো লেখকই অস্বীকার করেননি। কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তিও এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ তোলেননি। কারণ শত্রুদের প্রতিহত করা এবং জানমাল, পরিবার-পরিজন, স্বদেশ ও দ্বীন রক্ষার্থেই এমন যুদ্ধ করতে হয়। যে-সকল মুমিনকে কাফেররা তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের দ্বীন ও বিশ্বাসের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানও যুদ্ধের অন্যতম কারণ। দাওয়াতের সুরক্ষাও জরুরি, যাতে সকল মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া যায়। শেষে চুক্তি ভঙ্গকারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যও যুদ্ধ জরুরি।[৪৮১] দুনিয়াতে কে আছে যে যুদ্ধের এ সকল কারণ ও উদ্দেশ্য অস্বীকার করতে পারবে?

---

[৪৮০]. কুরতুবি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ৪৩৪।

[৪৮১]. আনওয়ার আল-জুনদি, *বি-মাযা ইনতাসারাল মুসলিমুন*, পৃ. ৫৭-৬২।

ঘ. ইসলামে যুদ্ধের নৈতিকতা

শান্তির সময়ে সব জাতিই সচ্চরিত্রতা, সহানুভূতি, দুর্বলের প্রতি দয়া, প্রতিবেশী ও নিকটজনদের সঙ্গে উদার আচরণ অবলম্বন করতে পারে, এমনকি বর্বর ও অসভ্য হলেও। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে সদাচার, শত্রুর প্রতি সহানুভূতিশীলতা, নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি দয়া, পরাজিতদের প্রতি উদারতা অবলম্বন সব জাতি করতে পারে না। সব যুদ্ধকালীন সেনাপতি এসব গুণে গুণান্বিত হতে পারে না। রক্তের দৃশ্যমানতা রক্তকে টগবগিয়ে তোলে। শত্রুতা বিদ্বেষ, ক্রোধ ও ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বিজয়ের নেশা বিজয়ীদের মাতাল করে ফেলে। ফলে তারাও প্রতিশোধ নেওয়ার বিভিন্ন বীভৎস পন্থা অবলম্বন করে। এটিই পৃথিবীর প্রাচীন কালের ও আধুনিক কালের ইতিহাস। বরং কাবিল কর্তৃক তার ভাই হাবিলের রক্তপাত ঘটানো থেকে শুরু করে এটাই মানবজাতির ইতিহাস। কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে,

﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

> যখন তারা উভয়ে কুরবানি করেছিল (আল্লাহর দরবারে কুরবানির বস্তু পেশ করেছিল।) তখন একজনের কুরবানি কবুল হলো এবং অন্যজনের (কুরবানি) কবুল হলো না। (যার কুরবানি কবুল হলো না) সে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই। অপরজন বলল, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করেন।[৪৮২]

এখানেই ইতিহাস আমাদের সভ্যতার সামরিক ও বেসামরিক নায়কদের এবং বিজয়ী ও শাসক নেতৃবৃন্দের মস্তকে অমরত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

---

৪৮২. সুরা মায়িদা : আয়াত ২৭।

কারণ তারা অন্য সব সভ্যতার মহামতিদের থেকে অনন্য, তারা বিভীষিকাপূর্ণ যুদ্ধেও এবং প্রতিশোধ, জিঘাংসা ও রক্তপাতে প্ররোচনা দানকারী উত্তেজক সময়েও ইনসাফপূর্ণ মানবিকতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করেছেন। আমি হলফ করছি, ইতিহাস যদি যুদ্ধকালীন নৈতিকতার ইতিবৃত্তে এসব অলৌকিক ঘটনার বিবরণ সত্যতার সঙ্গে উপস্থিত না করত, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাহলে অবশ্যই আমি বলতাম এগুলো রূপকথা ও কল্পকাহিনি ছাড়া কিছু নয়, যার ছায়া পর্যন্ত দুনিয়াতে নেই।[৪৮৩]

ইসলামে শান্তিই মূলনীতি এবং ইসলামে কিছু কারণ ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে যুদ্ধের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি। একইভাবে ইসলাম যুদ্ধকে শর্তহীন বা নীতিহীন রাখেনি। যুদ্ধকে তার সঙ্গে জুড়ে থাকা নানা ঘটনা থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। এভাবে যুদ্ধবিগ্রহকে নৈতিকতামণ্ডিত করেছে, যুদ্ধে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ রাখেনি। ইসলাম সীমালঙ্ঘনকারী ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী জালিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা দিয়েছে, শান্তিকামী নিরপরাধ মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা দেয়নি। যুদ্ধকালীন নৈতিক শর্তাবলির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সেনাপতিদের তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা আল্লাহ তাআলার পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। এভাবে তাদের যুদ্ধকালীন নীতি-আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাপতিদের শিশুহত্যা পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোনো সেনাদলের বা যুদ্ধাভিযানের আমির মনোনীত করেছেন, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের এবং তার সঙ্গে যে-সকল মুসলিম রয়েছে তাদের কল্যাণকামী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সেনাপতিদের উদ্দেশে যা বলতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো,

«وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا...»

---

৪৮৩. মুস্তফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৭৩।

এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না...।[৪৮৪]

আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً...»

(সাবধান!) অতিবৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং কোনো নারীকে হত্যা করো না...।[৪৮৫]

২. উপাসকদের হত্যা নিষিদ্ধ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সেনাদের প্রেরণ করার সময় তাদের বলতেন,

«لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ»

উপাসনালয়ে যারা রয়েছে তাদের হত্যা করো না।[৪৮৬]

মুতার উদ্দেশে প্রেরিত সেনাবাহিনীর প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ নির্দেশ ছিল নিম্নরূপ,

«اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اُغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، أَوِ امْرَأَةً وَلاَ كَبِيرًا فَانِيًا وَلا مُنْعَزِلاً بِصَوْمَعَةٍ»

তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হও, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খিয়ানত করো না, প্রতারণা করো না, মৃতদেহের বিকৃতি সাধন করো না, কোনো শিশুকে, নারীকে, অতিবৃদ্ধকে হত্যা করো না, উপাসনালয়ে আশ্রয় গ্রহণকারী কাউকে হত্যা করো না।[৪৮৭]

---

৪৮৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তা'মির আল-ইমাম আল-উমারা আলাল-বুউস ওয়া ওয়াসিয়্যাতিহি ইয়্যাহুম বি-আদাব আল-গাযবি ওয়া গাইরুহু, হাদিস নং ১৭৩১।

৪৮৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : দুআ আল-আদুওবি, হাদিস নং ২৬১৪; ইবনে আবি শাইবা, খ. ৬, পৃ. ৪৮৩; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৭৯৩২।

৪৮৬. *আহমাদ*, হাদিস নং ২৭২৮; আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ২১২।

৪৮৭. ইমাম মুসলিম হাদিসটি আহলে মুতার ঘটনা উল্লেখ করা ছাড়াই তার *জামে সহিহে* সংকলন করেছেন। কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তা'মিরুল ইমামিল উমারা আলাল বুউস ওয়া ওয়াসিয়্যাতিহি ইয়্যাহুম বি-আদাবিল গাযবি ওয়া গাইরুহু, হাদিস নং ১৭৩১; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৬১৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৪০৮; *বাইহাকি*, হাদিস নং ১৭৯৩৫।

৩. **প্রতারণা নিষিদ্ধ :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাভিযান প্রেরণ করতেন সেনাদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়ে,

«وَلاَ تَغْدِرُوا»

তোমরা প্রতারণা করো না।[৪৮৮]

এই বিশেষ নির্দেশ মুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ছিল না। বরং যে শত্রুরা তাদের জন্য ওত পেতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সমবেত হয়েছে এবং তারা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের প্রতারণা না করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে! এ বিষয়টির গুরুত্ব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এত বেশি ছিল যে, তিনি নিজেকে প্রতারকদের থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এমনকি প্রতারক মুসলিম হলেও এবং প্রতারিত কাফের হলেও। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَمَّنَ رَجُلا عَلَى دَمِهِ فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا»

কেউ কাউকে রক্তের (হত্যা না করার) নিরাপত্তা দেওয়ার পর তাকে হত্যা করলে আমি ওই হত্যাকারী থেকে দায়মুক্ত, নিহত ব্যক্তি কাফের হলেও।[৪৮৯]

ওয়াদা রক্ষা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের মূল্য সাহাবিদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার শাসনামলে একবার শুনলেন যে, একজন মুজাহিদ প্রতিপক্ষের এক অশ্বারোহী যোদ্ধাকে নিরাপত্তা দিয়ে বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই। তারপর তাকে হত্যা করলেন। উমর রা. ওই বাহিনীর সেনাপতিকে লিখলেন, আমার নিকট খবর এসেছে যে, তোমাদের কোনো কোনো লোক কাফেরদের অনুসন্ধানে থাকে কোনো কাফের যখন পাহাড়ে পলায়ন করে ও নিজেকে রক্ষা করার

---

৪৮৮. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তা'মিরুল ইমামিল উমারা আলাল বুউস, হাদিস নং ১৭৩১; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৬১৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৪০৮; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৮৫৭।

৪৮৯. বুখারি, *আত-তারিখুল কাবির*, খ. ৩, পৃ. ৩২২; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৯৮২; *বাযযার*, হাদিস নং ২৩০৮; তাবারানি, *আল-কাবির*, হাদিস নং ৬৪ এবং *আস-সাগির*, হাদিস নং ৩৮; তায়ালিসি, *মুসনাদ*, হাদিস নং ১২৮৫; আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আওয়ালিয়া*, খ. ৯, পৃ. ২৪, রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ থেকে আস-সুদ্দির সূত্রে বর্ণিত।

চেষ্টা করে, সে তাকে বলে, ভয় পেয়ো না। কিন্তু হাতের নাগালে পাওয়ামাত্র তাকে হত্যা করে ফেলে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমার কাছে কেউ এমন কাজ করেছে বলে যেন খবর না আসে। তাহলে আমি তার শিরশ্ছেদ করব।[৪৯০]

৪. জমিনে অরাজকতা সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ : মুসলিমদের যুদ্ধ ধ্বংসাত্মক ছিল না, দুনিয়াটাকে বিরান করার জন্য ছিল না। অথচ এখনকার যুদ্ধগুলো এই উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। অমুসলিম যুদ্ধবাজরা প্রতিপক্ষের জীবনের সবকিছু তছনছ করে দিতে বদ্ধপরিকর। মুসলিমরা বরং সব জায়গায় জনপদ ও জনপদবাসীদের রক্ষা করতে দৃঢ় ইচ্ছুক ছিলেন, এমনকি তা তাদের শত্রুদের দেশে হলেও। আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শামের উদ্দেশে প্রেরিত সেনাবাহিনীকে তিনি যে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন,

«لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»

তোমরা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না।

এ বিষয়টি সকল প্রশংসনীয় কাজের ধারক। ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হলে সবকিছু ঠিকঠাক সুন্দর থাকে। তাঁর আরও নির্দেশ ছিল,

«وَلَا تُغْرِقُنَّ نَخْلًا وَلَا تُحَرِّقُنَّهَا، وَلَا تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، وَلَا شَجَرَةً تُثْمِرُ وَلَا تَهْدِمُوا بَيْعَةً»

তোমরা খেজুরগাছ কেটো না, জ্বালিয়ে দিয়ো না; কোনো চতুষ্পদ জন্তুর পা কেটে দিয়ো না; কোনো ফলদার গাছ কেটো না, কোনো উপাসনালয় ধ্বংস করো না।[৪৯১], [৪৯২]

---

৪৯০. *আল-মুআত্তা*, ইয়াহইয়া আল-লাইসি থেকে বর্ণিত হাদিস, হাদিস নং ৯৬৭; বাইহাকি, *মা'রিফাস সুনান ওয়াল-আসার*, হাদিস নং ৫৬৫২।

৪৯১. বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৭৯০৪; তাহাবি, *শারহু মুশকিলিল আসার*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ২, পৃ. ৭৫।

৪৯২. তবে মুসলিমের ১৭৪৬ নং বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, উবনে উমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাযিরের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের গাছ জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকার বক্তব্য চূড়ান্ত নয়। এ কারণে ফকিহদের মাঝেও এ বিষয়ে ভিন্ন দুটি মত পাওয়া যায়।-সম্পাদক

জমিনে ফ্যাসাদ ও অরাজকতা সৃষ্টি না করার বিশেষ নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্য যে কী তা উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট। অর্থাৎ, সেনাপতি যেন এ কথা মনে না করে যে, কোনো জাতির প্রতি শত্রুতার ফলে কোনো ধরনের অরাজকতা বৈধ হয়ে গেছে। কারণ অরাজকতা তার যত ধরন ও রূপ আছে সবসহ ইসলামে প্রত্যাখ্যাত ও নিষিদ্ধ।

৫. বন্দিদের জন্য খরচ করা : বন্দিদের জন্য খরচ করা এবং তাদের সহায়তা করার ফলে মুসলিমরা সওয়াবের হকদার হবে। কারণ, বন্দিরা দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত এবং পরিবার-পরিজন ও নিজেদের জাতি-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের সহায়তা প্রাপ্তির প্রয়োজন তীব্র। কুরআনুল কারিম বন্দিদের প্রতি সদাচার ও অনুগ্রহকে এতিম ও মিসকিনদের প্রতি সদাচার ও অনুগ্রহের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

আহারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে আহার দান করে।[৪৯৩]

৬. মৃতদেহের বিকৃতি সাধন বা বিকলাঙ্গ করা নিষিদ্ধ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতদেহের বিকৃতি সাধন করতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ»

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিনতাই করতে ও জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৯৪]

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ»

---

৪৯৩. সুরা আদ-দাহর : আয়াত ৮।

৪৯৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : আন-নুহবা মিন গাইরি ইযনি সাহিবিহি, হাদিস নং ২৩৪২; তায়ালিসি, *মুসনাদ*, হাদিস নং ১০৭০; বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৪৪৫২।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং (কোনো জীবকে) বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করতেন।[৪৯৫]

উহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হামযার মৃতদেহের বিকৃতি সাধন করেছিল, তারপরও তিনি তাঁর নীতি-আদর্শ পরিবর্তন করেননি। বরং তিনি মুসলিমরা যেন শত্রুদের মৃতদেহের বিকৃতি না ঘটায় তার জন্য তাদের উদ্দেশে ভয়ংকর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ»

কিয়ামতের দিন যারা সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে তারা হলো : এক. যে লোককে কোনো নবী হত্যা করেছেন, দুই. যে লোক কোনো নবীকে হত্যা করেছে, তিন. পথভ্রষ্ট ইমাম (যে অন্যদের পথভ্রষ্ট করে) এবং চার. দেহের বিকৃতি সাধনকারী।[৪৯৬]

মুসলিমরা তাদের কোনো শত্রুকে বিকলাঙ্গ করেছিলেন বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেতিহাসে একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়নি।

মুসলিমদের কাছে এগুলোই হলো যুদ্ধের নীতি। এসব নীতির ফলে বিবাদের সময়ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না, আচার-আচরণে ইনসাফ ব্যাহত হয় না এবং যুদ্ধে ও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মানবিকতা অটুট থাকে।

---

৪৯৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জিহাদ, বাব : আন-নাহয়ু আনিল-মুসলাহ, হাদিস নং ২৬৬৭; *আহমাদ*, হাদিস নং ২০০১০; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৬১৬; আবদুর রাজ্জাক, *মুসনাদ*, হাদিস নং ১৫৮১৯।

৪৯৬. *আহমাদ*, হাদিস নং ৩৮৬৮, শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১০৪৯৭; বাযযার, *মুসনাদ*, হাদিস নং ১৭২৮।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান-সংস্থা

ইসলামি সভ্যতা বিশ্বের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা ও সংস্থা উপহার দিয়েছে। এসব ব্যবস্থা ও সংস্থা কর্মনৈপুণ্যে, শৃঙ্খলায় ও মানবজাতিকে যা-কিছু নতুন তা উপহারদানে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামি জ্ঞান-সংস্থা ইসলামি সভ্যতার অন্যতম আলোকোজ্জ্বল কীর্তি। পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় যেমন, তেমনই অনুশীলন ও প্রায়োগিক দিক থেকেও। তাই এই গৌরবদীপ্ত জ্ঞান-সংস্থা প্রসঙ্গে একটি অধ্যায় রচনা করা আমাদের জন্য আবশ্যক। নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলোতে তা বিবৃত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম এবং জ্ঞানের নতুন দর্শন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম এবং জ্ঞানীদের চিন্তার পরিবর্তন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় গ্রন্থাগার

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জ্ঞানী-সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং জ্ঞানের নতুন দর্শন

ইসলামপূর্ব যুগে বিশ্ব কয়েকটি সভ্যতা পেয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদানের জন্য এসব সভ্যতা বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন রোমান সভ্যতা, পারস্যসভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা ইত্যাদি। তবে ইসলাম জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে মৌলিক নীতি ও তাৎপর্য যোগ করেছে তা জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি বিশ্বের দর্শনে রূপান্তর ঘটিয়েছে। নিম্নবর্ণিত দুটি অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : জ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ নেই

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জ্ঞান সবার জন্য

প্রথম অনুচ্ছেদ

জ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বিরোধ নেই

জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রথম যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নাযিল হলেন তখন যে সত্য প্রতিভাত হলো তা চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিলো যে, নতুন দ্বীন (ইসলাম)-এর ভিত্তি হলো জ্ঞান। এখানে কোনোভাবেই ভ্রান্তি ও সন্দেহের কোনো স্থান নেই। ওহিরূপে প্রথম নাযিল হলো পাঁচটি আয়াত। আয়াতগুলো মোটামুটি একটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করল, তা হলো জ্ঞান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ○ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড (আলাক) থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[৪৯৭]

এই পন্থায় প্রথম কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হাজার হাজার বিষয় থেকে একটি বিষয় বেছে নিয়েছেন এবং তার দ্বারা কুরআন শুরু করেছেন। অথচ যাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হচ্ছে সেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উম্মি, পড়তেও জানতেন না এবং লিখতেও জানতেন না। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এই প্রথম বিষয়টিই (অর্থাৎ, জ্ঞান) এই দ্বীন বোঝার চাবিকাঠি, দুনিয়া বোঝারও

---

৪৯৭. সুরা আলাক : ১-৫

চাবিকাঠি, এমনকি যে আখিরাতে সকল মানুষ প্রত্যাবর্তন করবে সেই আখিরাত বোঝারও চাবিকাঠি।

আরও বিস্ময়কর এ কারণে যে, কুরআন নাযিল হওয়ামাত্রই এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে যে ব্যাপারে সেই সময় আরবরা কোনো গুরুত্ব দিত না। বরং রূপকথা, কল্পকাহিনি ও কুসংস্কারই তাদের আগাগোড়া জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। তাই জ্ঞানের সব ক্ষেত্রে তারা ছিল ভিখিরি। তবে অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যের কথা ভিন্ন। এই ময়দানে তারা ছিল শ্রেষ্ঠ। তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। এ কারণে কুরআন নাযিল হয়ে—এবং এটি অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার—তারা যে বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সে বিষয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তাদের উদ্দেশে ঘোষণা দিয়েছে যে, কুরআন সব ক্ষেত্রে জ্ঞানের ও জ্ঞানগত উৎকর্ষের আহ্বান জানায় সেই পন্থাতেই, তারা যাতে সিদ্ধহস্ত।

সেই যুগে ইসলামের আবির্ভাব ছিল বাস্তবিক অর্থেই জ্ঞান-বিপ্লব। সেই পরিবেশ জ্ঞানাত্মার অনুকূল ছিল না, উপযোগীও ছিল না। এমনকি কুরআনের প্রথম বাণী অবতীর্ণ হওয়ার আগের সময়টা পরিচিতি পেয়েছে 'জাহিলিয়া' নামে! ইসলামপূর্ব যুগ অজ্ঞতার বিশেষণেই বিশেষিত। তারপর জ্ঞানের সূচনা এবং দুনিয়াকে অলৌকিক হেদায়েতের আলোয় আলোকিত করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব ঘটল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

> তবে কি তারা জাহিলি যুগের বিধিবিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?(৪৯৮)

সুতরাং এই ধর্মে অজ্ঞতা, ধারণা, সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

এই অলৌকিক কিতাব (কুরআন)-এর কেবল সূচনাতেই জ্ঞান, জ্ঞানের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি, বরং এই অবিনশ্বর সংবিধানে জ্ঞানই সুদৃঢ় নীতি। কুরআনের কোনো সুরাই জ্ঞানের

---

৪৯৮. সুরা মায়িদা : আয়াত ৫০।

আলোচনামুক্ত নয়, সব সুরাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জ্ঞানের কথা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কিতাবে জ্ঞান শব্দটি বা জ্ঞানজাত শব্দ কতবার এসেছে তা গুনতে গিয়ে আমি বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। কুরআনে জ্ঞান শব্দটি এসেছে ৭৭৯ বার! এটি কোনো অতিরঞ্জন নয়, সত্যিই। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি সুরায় ইলম বা জ্ঞান শব্দটি প্রায় সাতবার এসেছে!

এই সংখ্যা ইলম (জ্ঞান) ও আইন-লাম-মিম ধাতুজাত শব্দের সমষ্টি। অন্যথায়, কুরআনে আরও অসংখ্য শব্দ রয়েছে যেগুলো জ্ঞান বোঝায় বা জ্ঞান নির্দেশ করে, যদিও তা ইলম শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ : ইয়াকিন (দৃঢ়বিশ্বাস), হুদা (পথনির্দেশ), আকল (বুদ্ধি, বিবেক), ফিকর (চিন্তা), নযর (দর্শন), হিকমাহ (প্রজ্ঞা), ফিকহ (উপলব্ধি), বুরহান (যুক্তি), দলিল (প্রমাণ), হুজ্জাহ (যুক্তি, প্রমাণ), আয়াত (নিদর্শন), বাইয়িনাহ (প্রমাণ, সাক্ষ্য) এবং অন্যান্য সমার্থবোধক শব্দ, যেগুলো জ্ঞান বোঝায় এবং জ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহে (হাদিসসমূহে) ইলম শব্দটি কতবার এসেছে তা গণনা করা দুঃসাধ্য।

আরও লক্ষণীয় যে, কুরআনের প্রথমবার নাযিল হওয়ার মুহূর্তেই যে জ্ঞানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা নয়, বরং মানব-সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনুল কারিমের আয়াতসমূহে তা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে জমিনের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন আদমকে সিজদা করতে, এর মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেছেন ও তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে ধরেছেন। আর আল্লাহ তাআলা এই সম্মান, মর্যাদা ও উচ্চগৌরবের কারণ আমাদের ও ফেরেশতাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তা হলো ইলম বা জ্ঞান। তা বিবৃত করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا
أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ○ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন (এমন সৃষ্টিকে প্রতিনিধি বানাতে চাচ্ছেন) যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার (জন্য) সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।[৪৯৯] তিনি বললেন, আমি জানি যা তোমরা জানো না। (সেই রহস্যের প্রতি আমার লক্ষ রয়েছে। সে সম্পর্কে তোমরা কোনো খবর রাখো না। এরপর আল্লাহ যা-কিছু ইচ্ছা করেছিলেন তা অস্তিত্বপ্রাপ্ত হলো এবং প্রকাশ পেল।) আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম[৫০০] শিক্ষা দিলেন। (এই অভ্যন্তরীণ উন্নতি লাভ করলেন যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সৃষ্টিজগতের যাবতীয় বস্তুর নাম জেনে নিলেন।) তারপর তিনি ওই সমুদয় (বস্তুকে) ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও।[৫০১] তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। (ফেরেশতারা যখন এভাবে নিজেদের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করে নিলো) তখন তিনি বললেন, হে আদম, তাদেরকে এ সকল (বস্তুর) নাম বলে দাও। সে তাদেরকে এই সকলের নাম

---

৪৯৯. খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী তা জানার জন্য ফেরেশতাগণ এ কথা বলেছিলেন।-অনুবাদক

৫০০. বস্তুজগতের জ্ঞান।-অনুবাদক

৫০১. সত্যবাদী হও তোমাদের বক্তব্যে।-অনুবাদক

বলে দিলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত করো বা (তোমাদের অন্তরে) গোপন রাখো তাও আমি জানি? আর (দেখুন,) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন (সঙ্গে সঙ্গে) ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে নির্দেশ অমান্য করল ও অহংকার করল। (সিজদার জন্য ইবলিসের ঘাড় নত হলো না।) এবং সে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে গেল।[৫০২]

এসব কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা অতিরঞ্জন গোছের কিছু নয়। তিনি একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন যে, এই গোটা দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই, এমনকি তা অভিশপ্ত, যদি না তা ইলম ও আল্লাহর যিকির দ্বারা সজ্জিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالاَهُ، أَوْعَالِمًا أَوْمُتَعَلِّمًا»

আল্লাহর যিকির এবং তাঁর আদেশপালন ও নিষেধ পরিহারকরণ এবং আলেম ও তালিবুল ইলম ব্যতীত দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়াতে যা রয়েছে তাও অভিশপ্ত।[৫০৩]

ইসলামি রাষ্ট্রে এ সবকিছুর (জ্ঞানের প্রতি এমন গুরুত্বারোপ ও জ্ঞানকে মহিমাময় করে তোলার) সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ময়দানে ব্যাপক উদ্যোগ ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিহাসে এমন উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার নজির নেই। ফলে মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের হাতে সভ্যতার ব্যাপক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। মানবজাতির উত্তরাধিকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভান্ডারে সমৃদ্ধ হয়েছে। গোটা পৃথিবী তার কাছে ঋণী হয়েছে।

---

৫০২. সুরা বাকারা : আয়াত ৩০-৩৪।

৫০৩. *তিরমিযি*, কিতাব : আয-যুহদ, বাব : হাওয়ানুদ-দুনিয়া আলা আল্লাহ, হাদিস নং ২৩২২, তিনি বলেছেন, এটি হাসান গরিব হাদিস। *দারেমি*, হাদিস নং ৩২২; তাবারানি, *আল-আওসাত*, হাদিস নং ৪০৭২; *বাযযার*, হাদিস নং ১৭৩৬; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ১৭০৮।

আমরা ইসলামে জ্ঞানের অবস্থান ও বিকৃত খ্রিষ্টধর্মে জ্ঞানের অবস্থান কী তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। আমরা দেখব যে মধ্যযুগে চার্চ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোমে খ্রিষ্টীয় চার্চের সূচনাকাল থেকেই তা নিজেকে গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। গোথদের[৫০৪] আক্রমণের ফলে রোমান সভ্যতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। প্রাচ্যীয় ক্যাথলিক চার্চ তার পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে পৌত্তলিক দার্শনিক ও জ্ঞানীদের ওপর প্রচণ্ড জুলুম ও অত্যাচার শুরু করেছিল। এথেন্সের শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়। আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রিক দর্শনের ওপর লৌহ দুরমুশ মেরেছিল। চার্চ মনে করল যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পথ একটিই, তা হলো ঈশ্বরের পথ। আর পবিত্র গ্রন্থের (বাইবেল) বাইরে সত্য খোঁজা এবং পার্থিব বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করা মানেই গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতা।[৫০৫]

এ সত্যটিকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন জার্মান প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে[৫০৬]। তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানের অবস্থান কী এবং মধ্যযুগে ইউরোপীয় পশ্চিমাঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের দৃষ্টিতে জ্ঞানের অবস্থান কী ছিল তার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বিবরণ দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে প্রত্যেক মুমিনকে—সে পুরুষ হোক বা নারী—জ্ঞান অর্জন করতে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞান অর্জনকে তিনি একটি ধর্মীয় অবশ্যকর্তব্য বলে স্থির করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুসারীদের সৃষ্টিজগৎ ও তার বিস্ময়কর বস্তুরাশি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা ও জ্ঞান অর্জনকে মহান স্রষ্টার কুদরত ও ক্ষমতাকে চেনার উপায় বিবেচনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর অনুসারীদের আর সব জাতির জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেও

---

৫০৪. গোথ : প্রথম দিকের জার্মান জনগোষ্ঠী। এরা দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল, ভিজিগোথ (Visigoths) ও অস্ট্রোগোথ (Ostrogoths)। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনে ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিকাশে তাদের ভূমিকা রয়েছে।-অনুবাদক

৫০৫. নাদিয়া হুসনি, *আল-ইলম ওয়া মানাহিজুল-বাহস*, পৃ. ১৩।

৫০৬. ড. সিগরিড হুংকে (Sigrid Hunke 1913-1999) : জার্মান নারী প্রাচ্যবিদ। হামবুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন করেন। ১৯৪১ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Allahs Sonne über dem Abendland: Unser arabisches Erbe* (1960). বইটির আরবি অনুবাদ : *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*।

নির্দেশ দিয়েছেন। সিগরিড হুংকে তার এই আলোচনার শেষে বলেছেন, তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গিয়ে সেন্ট পল (Paul the Apostle) বলেছেন, ঈশ্বর কি পার্থিব জ্ঞানকে নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকি বলে আখ্যায়িত করেননি?[৫০৭]

সেন্ট অগাস্টিন[৫০৮] জ্ঞানের বলয় নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ঈশ্বর ও (পবিত্র) আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞানই আমি চাই। সত্যের অনুসন্ধানের অর্থই হলো ঈশ্বর সম্পর্কে অনুসন্ধান। এর জন্য বাইরের কোনো সাহায্য বা উপকরণের দরকার পড়ে না। এই জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো পবিত্র কিতাব (বাইবেল)।[৫০৯]

সিগরিড হুংকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন, কীভাবে তারা (চার্চ-কর্তৃপক্ষ) এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে নতুন জ্ঞানগত চিন্তার অধিকারী বা দাবিদার যে-কাউকে পথভ্রষ্ট কাফের বলে আখ্যায়িত করত। যেমন পৃথিবীর গোলাকার হওয়া। হুংকে তার বক্তব্যের সপক্ষে চার্চের দীক্ষাগুরু লাকতানতিয়াসের[৫১০] বাণীর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যে-কতিপয় বিজ্ঞানী দাবি করতেন যে পৃথিবী গোলাকার তাদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে লাকতানতিয়াস বলেন, এটা কি বোধগম্য? বিশ্বাসযোগ্য? এটা কি বোধগম্য যে মানুষ এই পর্যায়ের পাগল হয়ে যেতে পারে? তাদের মগজে কীভাবে এটা ঢুকল যে পৃথিবীর অন্যপাশে শহর-নগর ও গাছপালা ঝুলে

---

৫০৭. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৬৯।

৫০৮. আউরেলিয়ুস আউগুস্তিনুস বা সেন্ট অগাস্টিন (Augustine of Hippo: জন্ম ১৩ নভেম্বর ৩৫৪ খ্রি., মৃত্যু ২৮ আগস্ট ৪৩০ খ্রি.) প্রাচীন যুগের খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ, চার্চ পদ্ধতির লাতিন গুরুদের অন্যতম এবং সম্ভবত স্বয়ং যিশুর কথিত শিষ্য সেন্ট পলের পরেই খ্রিষ্টধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তিনি রোমান অধ্যুষিত উত্তর আফ্রিকাতে বড় হয়েছেন এবং সেখানকার হিপ্পো রেগিয়ুস (বর্তমানে আলজেরিয়ার আন্নাবা শহর) নামক নগরীর বিশপ ছিলেন। তার রচিত বহু বইয়ের মধ্যে বিখ্যাত হলো *The City of God* এবং *Confessions.* বই দুটি বাইবেলের ভাষ্য হিসেবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং মধ্যযুগীয় ও এমনকি আধুনিক খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারারও ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

৫০৯. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৭০।

৫১০. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (২৫০-৩২৫ খ্রি.) : প্রাচীন খ্রিষ্টীয় লেখক এবং প্রথম খ্রিষ্টান রোম সম্রাট প্রথম কনস্টান্টাইন (বা মহান কনস্টান্টাইন)-এর উপদেষ্টা ছিলেন।

আছে এবং মানুষের পা তাদের মাথার উপরে উঠে গেছে।[৫১১] যে-কেউ প্রাকৃতিক ঘটনাবলির জ্ঞানগত ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে বা মেনে নেবে সে অভিশপ্ত। নক্ষত্রের আবির্ভাব ও নদীর জোয়ারভাটার প্রাকৃতিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করলে সে ঈশ্বরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে। এমনকি ভাঙা পায়ের চিকিৎসা এবং নারীর গর্ভপাতের বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করলে সেও ধর্মচ্যুত। এগুলো হলো ঈশ্বরের পক্ষ থেকে বা শয়তানের পক্ষ থেকে শাস্তি অথবা এমন অলৌকিক ব্যাপার যা আমাদের বোধগম্যতার বাইরে![৫১২]

এ কারণে ইউরোপে ধর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জ্ঞানান্দোলন ও জ্ঞানচাঞ্চল্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও জ্ঞানের জাগরণ এবং চার্চের বিরুদ্ধে বিপ্লব সূচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই অবস্থাই বিরাজমান থাকে।

কোপার্নিকাস[৫১৩] ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী ঘোরে এবং সূর্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, পৃথিবী নয়। অথচ ইতিপূর্বে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, পৃথিবীই বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং ঘোরে না। কোপার্নিকাসের এই সিদ্ধান্ত ইউরোপে দুর্যোগের সৃষ্টি করে। ইনজিল-ভিত্তিক সত্যের মানদণ্ডের বিচারে চার্চ এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে। চার্চ-কর্তৃপক্ষ মনে করে এই সিদ্ধান্ত তাদের বিশ্বাস-বিরোধী। কারণ, পৃথিবীকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র না ধরে তাকে বিশ্বজগতে একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড (গ্রহ) হিসেবে বিবেচনা করা কেবল বৈজ্ঞানিক উদ্‌ঘাটন নয়, খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মূলে কঠিন আঘাতও। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীর মুক্তির জন্য দেহলাভ করেছেন। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, এই পৃথিবী অন্য বড় বড় গ্রহনক্ষত্রের মাঝে একটি ছোট গ্রহ।

---

৫১১. পৃথিবীতে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে রয়েছে চিলি। বাংলাদেশ থেকে কল্পনা করলে বোঝা যায় চিলিতে ঘরবাড়ি ও গাছপালা যেন ঝুলে রয়েছে। আমাদের মাথা যেদিকে, সে দেশের মানুষের পা সেদিকে।-অনুবাদক

৫১২. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৭০।

৫১৩. ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus) পৃথিবীকে পরিক্রমণশীল গ্রহ হিসেবে দেখিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের আধুনিক ধারণার বিস্তার করেন। কোপার্নিকাস ১৪৭৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪৩ সালের ২৪ মে তার মৃত্যু হয়।

আর এটা তো অকল্পনীয় যে পৃথিবী সূর্যের অনুগামী হয়ে তার চারপাশে ঘুরছে। এ কারণে পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার ধারণা বোধগম্যভাবেই একজন ঈশ্বর বা দেবতার অনুকূলে ছিল, যিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে যাবতীয় বস্তু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এখন এ সকল মানুষ অনুভব করছে যে তারা একটি ছোট গ্রহের ওপর টলমল করছে, যার ইতিবৃত্ত বিশ্বজগতের ইতিহাসের মধ্যে একটি ছোট্ট পরিচ্ছেদে সংকুচিত হয়ে পড়েছে...। মানুষ যখন নতুন চিন্তা ও সিদ্ধান্তের মর্মার্থ অনুধাবন করবে, তারা অবশ্যই এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করবে যে, এই শৃঙ্খলিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা তার পুত্রকে এই ছোট আকারের গ্রহে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তাদের প্রশ্ন উত্থাপন অনিবার্য।

সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা প্রদানকারী জ্যোতির্বিজ্ঞানী মানুষকে স্রষ্টা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করলেন। খ্রিষ্টধর্মীয় ঈশ্বরত্ব ধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল![৫১৪] কোপার্নিকাস নিপীড়ন ও নিগ্রহের শিকার হলেন এবং তীব্র জঘন্য বিরোধিতার মুখে টিকে থাকতে পারলেন না। এভাবে বহু বছর কেটে গেল। অবশেষে তার এক ভক্তের দুঃসাহসের ফলে তিনি তার বইটি (*On the Revolutions of Heavenly Spheres*) প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এ বছরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য তিনি বইটিতে বেশ কিছু পরিমার্জন ও সংশোধন করেন এবং স্বীকার করেন যে, তার সিদ্ধান্ত অনুমানভিত্তিক এবং তা ভ্রান্তির সম্ভাবনা রাখে।[৫১৫] কিন্তু কোপার্নিকাসের মৃত্যুর আশি বছর পর ব্রুনো[৫১৬] তার সিদ্ধান্তকে সত্য ধরে নিয়ে তা মেনে নেন। তিনি কোপার্নিকাসের সিদ্ধান্তকে আরও বিকশিত ও উৎকর্ষমণ্ডিত করেন এবং

---

৫১৪. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৭, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

৫১৫. প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ১৩১-১৩৪।

৫১৬. জিয়োর্দানো ব্রুনো (Giordano Bruno) : ১৫৪৮ সালে নেপলিসের নোলা শহরে (বর্তমানে ইতালি) জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন দার্শনিক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী ও মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ। তিনি নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেন যে সূর্য একটি উজ্জ্বল তারকা ছাড়া কিছু নয় এবং তা নিজ কক্ষপথে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। তিনি দাবি করেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী ছাড়াও এমন আরও অসংখ্য গ্রহ আছে যেখানে বুদ্ধিমান প্রাণীরা বসবাস করছে। তার চিন্তা ও মতাদর্শের কারণে রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিযুক্ত তদন্ত-আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। ১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। তিনি ত্রিশটিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রুনোকে 'বিজ্ঞানের শহিদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

তার সঙ্গে নিজের মত যুক্ত করেন। ফলে হইচই শুরু হয়ে যায় এবং ইনকুইজিশন[৫১৭] বিচারসভা কোপার্নিকাসের গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে[৫১৮] এবং ব্রুনোকে খোলা মাঠে পুড়িয়ে হত্যা করে।[৫১৯]

কোপার্নিকাসের চিন্তারাশি গ্যালিলিও গ্যালিলির[৫২০] চিন্তারাশির সূচনা ও ভিত্তি ছিল। এ কারণে চার্চ কর্তৃক গ্যালিলিকে তার সত্তর বছর বয়সে

---

৫১৭. নির্দয় ধর্মীয় বিচার (The Inquisition) : 'ইনকুইজিশন' শব্দের অর্থ 'বিচারের জন্য অনুসন্ধান' হলেও ইউরোপের ইতিহাসে ইনকুইজিশন বলতে ধর্মান্ধতার যুগে ধর্মীয় প্রতিপক্ষ অথবা ধর্মীয় গোঁড়া সংস্কার ও বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও নির্দয় বিচারব্যবস্থাকে বোঝায়। ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচারের সূচনা ঘটে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে। খ্রিষ্টান যাজকগণ যাদেরকে অবিশ্বাসী বা খ্রিষ্টীয় ধর্মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করত তাদের বিচার করার জন্য তদন্তকারী ও বিচারক নিযুক্ত করত। খ্রিষ্টীয় যাজকদের এই বিচারব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রের খ্রিষ্টান সম্রাটগণ অনুমোদন করেন। যারা খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে অন্যকোনো ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণ করত তাদের বিরুদ্ধেও ইনকুইজিশন-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হতো। গোড়ার দিকে ধর্মত্যাগী বা অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা আদায় ছাড়া দৈহিকভাবে নিপীড়ন করা না হলেও ক্রমান্বয়ে কারাগারে বন্দি করে রাখা, নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচার, অভিযুক্তকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে হত্যা করা 'ইনকুইজিশন'-এর অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিচারব্যবস্থায় অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হতো না। দুজন লোকের গোপনীয় অভিযোগের ভিত্তিতে যেকোনো নাগরিককে এই ধর্মীয় তদন্ত-আদালতের কাছে সোপর্দ করে তাকে দণ্ডিত করা যেত। 'ইনকুইজিশন' চরম রূপ গ্রহণ করে স্পেনে, পঞ্চদশ শতকে। স্পেনীয় 'ইনকুইজিশন'-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল ওইসব ব্যক্তি যারা খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত বা ইহুদিধর্মে বিশ্বাস করত। স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলা যাকে প্রথম ইনকুইজিটার বা প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন সে তার কার্যকালে দুহাজার লোককে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেছিল। 'ইনকুইজিশন'-এর আতঙ্কে মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষকগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে বা মতামত প্রকাশ করতে সাহস পেতেন না। এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অনেক চিন্তাবিদ ও মুক্তবুদ্ধির মানুষকে এই ধর্মীয় বিচারের যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। তাদের মধ্যে ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের অন্যতম পুরোধা জিয়োর্দানো ব্রুনোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার যুক্তিবাদী ও স্বাধীন মতামতের জন্য তাকে ইনকুইজিশনের হুকুমে ১৬০০ সালে রোম শহরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।-অনুবাদক

৫১৮. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৭, পৃ. ১৩৮।

৫১৯. প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ২৮৮-৩০০, ব্রুনো ভুক্তি।

৫২০. রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei)-কে আধুনিক পরীক্ষণ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তিনি ১৫৬৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইতালির পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'দোলকের নিয়ম' আবিষ্কার করেন। শুরুতে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করলেও শেষে গণিত ও পদার্থবিদ্যাই তার বিষয় হয় এবং ২৫ বছর বয়সে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রাচীন গ্রিক আমল থেকেই বদ্ধমূল ধারণা ছিল, একই উচ্চতা থেকে ফেললে হালকা বস্তুর আগে ভারী বস্তু মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিও পড়ার গতির ত্বরণ সম্পর্কে তার নির্ভুল ধারণা থেকে দেখান যে নিচে পড়ার গতি ওজনের ওপর নির্ভর করে না। গ্যালিলিও

বিচারের মুখোমুখি করে অপমান-অপদস্থ করা হয়, যাতে তিনি তার যাবতীয় চিন্তা ও সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং সাত বছরব্যাপী প্রতিদিন সাতটি Book of Psalms পড়তে বাধ্য করা হয়।[৫২১]

এটা হলো সিন্ধু থেকে বিন্দু। এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। চার্চ কর্তৃপক্ষ কেবল কোপার্নিকাস, ব্রুনো ও গ্যালিলির শাস্তিবিধান করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকে ইনকুইজিশন নামক বিচারসভার মুখোমুখি করে। ইনকুইজিশন তার দায়িত্ব যথার্থভাবেই পালন করে। এই বিচারসভা মাত্র ১৮ বছরে–১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত–দশ হাজার দুইশ বিশ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং তাদের জীবন্তই পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ছয় হাজার আটশ ষাট ব্যক্তিকে শহরে চক্কর লাগানোর পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাদেরকে এভাবেই ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। তা ছাড়া, সাতানব্বই হাজার তেইশ ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তিতে দণ্ডিত করা হয়।[৫২২] গ্যালিলিও, জিয়োর্দানো ব্রুনো ও নিউটনের[৫২৩] গ্রন্থাবলি নিষিদ্ধ ঘোষণা

জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন এবং বেশ কিছু উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বৃহস্পতির চারটি চাঁদ তিনি আবিষ্কার করেন এবং শনিগ্রহের অদ্ভুত আকৃতিও তিনি প্রথম লক্ষ করেন। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী খ্রিষ্টান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ তাকে নিজের মত প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে এবং বাকি জীবন তাকে নিজ বাড়িতে নজরবন্দি হয়ে থাকতে হয়। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি তার মৃত্যু হয়। তিনি ফ্লোরেন্স নগরীতে সমাহিত হন।-অনুবাদক

[৫২১]. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৭, পৃ. ২৬৪-২৮০, গ্যালিলিও ভুক্তি।

[৫২২]. আল-ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহু, আল-ইদতিহাদ ফিন-নাসরানিয়্যাহ ওয়াল-ইসলাম, *আল-মানার* সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, ৫ম ভলিউম, পৃ. ৪০১।

[৫২৩]. স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪৩-১৭২৭ খ্রি.) প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, প্রাকৃতিক দার্শনিক এবং আলকেমিস্ট। ১৬৮৭ সালে তার বিশ্বনন্দিত গ্রন্থ ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা (লাতিন ভাষায় : *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, ইংরেজি ভাষায় : *Mathematical Principles of Natural Philosophy* প্রকাশিত হয়।) এতে তিনি সর্বজনীন মহাকর্ষ এবং গতির তিনটি সূত্র বিধৃত করেন। এই সূত্র ও মৌল নীতিগুলোই চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। তার গবেষণার ফলে উদ্ভূত চিরায়ত বলবিজ্ঞান পরবর্তী তিন শতকজুড়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জগতে একক আধিপত্য করেছে। তিনিই দেখিয়েছিলেন যে, পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের সকল বস্তু একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। কেপলারের গ্রহীয় গতিসূত্রের সঙ্গে নিজের মহাকর্ষ-তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার গবেষণার

করে ফরমান জারি করা হয়। নিউটনের অপরাধ ছিল তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (মহাকর্ষ সূত্র) কথা বলেছেন। বিচারসভা তাদের সব বই পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দেয়। কার্ডিনাল খিমনিস[৫২৪] গ্রানাডায় সত্যিই আট হাজার পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেন। কারণ এগুলোর বক্তব্য চার্চের মতামত ও সিদ্ধান্তের অনুকূলে ছিল না।[৫২৫]

ইউরোপ এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়ংকর অবস্থা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী যাপন করেছিল। একে অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়, মধ্যযুগও বলা হয় একে। মধ্যযুগীয় বর্বরতা কথাটা এখান থেকেই এসেছে। এই যুগ প্রায় এক হাজার বছর পরিব্যাপ্ত ছিল। এই বাস্তবিকতা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের (যেমন : দেকার্তে ও ভলতেয়ার) ও সাধারণ মানুষের মগজে একটি ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, চার্চের কর্তৃত্ব ধ্বংস করা ছাড়া অথবা অন্তর থেকে ধর্মবোধকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া ব্যতীত জ্ঞানচর্চা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের কোনো আশা নেই। তা ছাড়া নাস্তিক্যবাদ বলতে যা বোঝায় তার সবকিছুকে বরণ করে নিতে হবে। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা তাওরাত ও ইনজিলের মতো পবিত্র গ্রন্থাবলির বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন। কারণ, তাওরাত ও ইনজিল বৈজ্ঞানিক সত্য-বিরোধী বিষয়ে পরিপূর্ণ। তাদের এই বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, ধর্ম মানেই—যেমন তারা দেখেছিলেন—জ্ঞান ও জ্ঞানীদের বিনাশ এবং বুদ্ধি ও চিন্তার বন্ধ্যাত্ব। তারা ঐশী দলিল-প্রমাণের বিরুদ্ধে বুদ্ধি ও যুক্তিকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার আহ্বান জানাতে শুরু করলেন। তাদের বক্তব্যের ভিত্তি ছিল এই যে, বুদ্ধি ও যুক্তিই জ্ঞানগত সত্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে পারঙ্গম।

ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের সমর্থন জোগায়। ১৭৯০ সালে তারা একটি ফরমান জারি করে। ফরমানটির উদ্দেশ্য ছিল চার্চ কর্তৃপক্ষের কোমর ভেঙে দেওয়া। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি যাজক-যাজিকাদের বরখাস্ত করে এবং

ফলেই সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণার পেছনে সামান্যতম সন্দেহও দূরীভূত হয় এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়।-অনুবাদক

৫২৪. Francisco Jiménez de Cisneros.

৫২৫. মানি ইবনে হাম্মাদ, *আল-মাওসুউল মুইয়াসসারাহ ফিল-আদইয়ান ওয়াল-মাযাহিব ওয়াল-আহযাবিল মুআসিরাহ*, খ. ২, পৃ. ৬০৪।

চার্চ-কর্তৃপক্ষকে নাগরিক সংবিধান (Civil Constitution) মানতে বাধ্য করে। পোপের বদলে অ্যাসেম্বলি চার্চে কারা নিয়োগ পাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালে ফরাসি সরকার রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ পৃথক করার আইন পাস করে এবং রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে বলে ঘোষণা দেয়। এটি ছিল চার্চের বিরুদ্ধে চরম আঘাত। তা চার্চ-বিরোধীদের সাহস জোগায়, তারা পবিত্র গ্রন্থ (বাইবেল) ও চার্চের স্বাধীন সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, উপর্যুক্ত আইন চার্চ কর্তৃপক্ষকে জাতি, রাষ্ট্র ও নতুন নাগরিক সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ধীরে ধীরে এমন আইন ইউরোপের সব রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে রাজনীতি ও জ্ঞান বিষয়ে চার্চের যে কর্তৃত্ব ছিল তার মূলোৎপাটন ঘটে। চার্চের ক্ষমতা চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বন্দি হয়ে পড়ে। উপদেশবর্ষণ ও প্রার্থনাসংগীতেই তাদের সময় কাটে।[৫২৬]

কিন্তু দ্বীনে ইসলাম কখনোই চার্চের মতো ছিল না। কখনোই তা জ্ঞানচর্চায় মুসলিমদের পথে শত্রু বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। চাই তা চিন্তা ও গবেষণার দিক থেকে হোক বা প্রায়োগিক ও কার্যকরী দিক থেকে হোক। ইসলাম বরং মানুষকে জ্ঞানচর্চার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে। বুদ্ধি ও যুক্তির লাগাম খুলে দিয়েছে। স্বাধীন চিন্তা, দর্শন ও উপলব্ধির অবারিত সুযোগ দিয়েছে। এখানে প্রথা, অন্ধানুকরণ, প্রবৃত্তি ও ঝোঁক-প্রবণতার কোনো দখল ছিল না। তা কেন নয়, আল্লাহ তাআলা তো বুদ্ধি ও বিবেককে সম্বোধনের দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং একে দায়িত্ব আরোপের হেতু বানিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি চিন্তাধারা ও মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারার মধ্যে দীর্ঘতম ব্যবধান রয়েছে। ইসলামি চিন্তাধারা চিন্তাগত স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এখানে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো ধরনের মধ্যস্থতা ব্যতীত সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলামি চিন্তাধারা বুদ্ধি ও যুক্তিকে মর্যাদা দিয়েছে। মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় চিন্তাধারা চিন্তার স্বাধীনতাকে বাজেয়াপ্ত করেছে এবং চার্চের পুরোহিতকে বান্দাদের ও তাদের প্রভুর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী স্থির করেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পশ্চিমে ইউরোপীয় সভ্যতার পর্যায়ক্রমিক বিকাশসূচনার আগে হাজার বছর সময়ের কেন প্রয়োজন

---

৫২৬. *আল-মাওসুউল মুইয়াসসারাহ ফিল-আদইয়ান ওয়াল-মাযাহিব ওয়াল-আহযাবিল মুআসিরাহ*, খ. ২, পৃ. ৬০৪-৬০৫।

পড়েছে। অথচ ইসলামি আরবি সভ্যতার দুই শতাব্দী বা তিন শতাব্দী পূর্বেই ইউরোপীয় সভ্যতার বিকশিত হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ ছিল, তারপর সে তার বিপ্লব মুসলিমদের কাঁধের ওপর সংঘটিত করতে পারত।[৫২৭]

---

৫২৭. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩৭২-৩৭৩।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জ্ঞান সবার জন্য

ইসলামপূর্ব যুগে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ সাধারণ জনমানব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাদের ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান ছিল অলঙ্ঘনীয়। পারস্য বলি, রোম বলি বা গ্রিস বলি—সব জায়গাতেই জ্ঞানীরা সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতেন। তাদের নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও মুনাযারা অনুষ্ঠিত হতো এবং জ্ঞানের উত্তরাধিকার তাদের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। অন্যদিকে সাধারণ জনগণ অজ্ঞতার অন্ধকারে বসবাস করত। জ্ঞানের কোনো শাখার সঙ্গে তাদের ন্যূনতম সংযোগ ছিল না। কিন্তু ইসলাম ভিন্ন জিনিস!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বাক্যে ঘোষণা করেছেন,

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ»

জ্ঞান অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।[৫২৮]

ফলে জ্ঞান অর্জন একটি ধর্মীয় অবশ্যকর্তব্যে পরিণত হয়। বরং এটি জাতিগত দায়িত্বও, যা সকলের জন্য আবশ্যক। সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন আবশ্যক হলে সবাইকে অবশ্যই শিক্ষার্থী ও জ্ঞান-অন্বেষক হতে হবে, এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নীতির বাস্তবিক অনুশীলন করেছেন। বদর যুদ্ধে মক্কার অনেক মুশরিক মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়েছিল। তিনি তাদের অভিনব মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, বন্দিদের যে-কেউ মদিনার দশজন নারী-পুরুষকে পড়া ও লেখা শেখালে মুক্তি পেয়ে যাবে। এটা ছিল উন্নত সভ্যতার চিন্তা,

---

৫২৮. *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২২৪; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ২৮৩৭; সুয়ুতি, *আল-জামেউস-সাগির*, হাদিস নং ৭৩৬০।

যা সে সময়ে পৃথিবীর কেউ আদৌ কল্পনা করেনি, এমনকি তার পরের কয়েক শতাব্দীতেও তা ভাবেনি।

ইসলাম তার অনুসারীদের জ্ঞান-সাধনাকে তাদের জীবনে মৌলিক বিষয় হিসেবে নিতে নির্দেশ দিয়েছে। তাদেরকে আলেমদের বা জ্ঞানীদের এই পর্যায়ের মর্যাদা দিতে আদেশ দিয়েছে, যে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»

যে ব্যক্তি ইলম তলব বা জ্ঞান-অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথসমূহের একটি পথে পৌছে দেন এবং ফেরেশতারা ইলম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ডানা পেতে দেয়। তা ছাড়া যারা আলেম তাদের জন্য আসমানে ও জমিনে যারা রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করতে থাকে, এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থেকেও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আলেমদের ফজিলত (বে-ইলম) আবেদদের (সাধকদের) ওপর তেমনই যেমন পূর্ণচন্দ্রের ফজিলত তারকারাজির ওপর এবং আলেমরা হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ কোনো দিনার বা দিরহাম মিরাস (উত্তরাধিকার) রেখে যান না, তারা মিরাসরূপে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করেছে সে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে।[৫২৯]

---

৫২৯. আবু দাউদ, কিতাব : আল-ইলম, বাব : আল-হাসসু আলা তালাবিল-ইলম, হাদিস নং ৩৬৪১; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৬৮২; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২২৩; *আহমাদ*, হাদিস নং ২১৭৬৩; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৮৮। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর জাতীয় জ্ঞান-আন্দোলন অব্যাহত ছিল। তার উজ্জ্বল ফল ও পরিণতি আমরা দেখতে পাই। ইউরোপীয়দের জন্য এসব ব্যাপার স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। জাতীয় জ্ঞান-আন্দোলনের তিনটি পরিণতির কথা উল্লেখ করব। ইসলামই এগুলোর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

১. **গণগ্রন্থাগার :** দ্বীনের অন্তস্তল থেকে যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা রয়েছে তাতে উদ্দীপিত হয়ে মুসলিমগণ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারা সেখানে বিনামূল্যে পড়াশোনা করতেন, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে যা খুশি অনুলিপি করে নিতেন। শুধু তা-ই নয়, বড় বড় খলিফা ও আমির নানান দেশ থেকে বিদ্যার্থীদের এসব গ্রন্থাগারে আমন্ত্রণ জানাতেন, তাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের জন্য বিশেষ অর্থভাণ্ডার থেকে ব্যয় নির্বাহ করতেন। ইসলামি বিশ্বের সব শহরেই এসব গ্রন্থাগার অনেক ছিল। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হলো বাগদাদ গ্রন্থাগার, কর্ডোভা গ্রন্থাগার, সেভিল[৫৩০] গ্রন্থাগার, কায়রো গ্রন্থাগার, কুদ্স বা বাইতুল মুকাদ্দাস গ্রন্থাগার, দামেশক গ্রন্থাগার, ত্রিপোলি গ্রন্থাগার, মদিনা গ্রন্থাগার, সানআ গ্রন্থাগার, ফেজ গ্রন্থাগার ও কায়রাওয়ান গ্রন্থাগার।

২. **বড় বড় ইলমি মজলিস (জ্ঞানচর্চার আসর) :** ইসলামপূর্ব যুগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার মতো কোনো আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন না। এই মহান দ্বীনের আবির্ভাবের পর ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চলে ইলমি মজলিসের বিস্তার ঘটে। কখনো কখনো এসব মজলিসে এত বেশি সংখ্যক মানুষের সমাগম হতো যে তা কল্পনাও করা যেত না। উদাহরণ হিসেবে ইবনুল জাওযির[৫৩১] মজলিসের কথা বলা যায়। ইবনুল জাওযির মজলিসে এক লাখেরও বেশি মানুষ উপস্থিত হতেন। তারা সবাই ছিলেন সাধারণ মানুষ। হাসান আল-বসরি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, শাফিয়ি, আবু হানিফা, ইমাম মালিক—তাদের

---

৫৩০. স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর।-অনুবাদক

৫৩১. ইবনুল জাওযি : আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুরাশি আত-তাইমি (৫১০-৫৯২ হি.)। হাম্বলি মাযহাবপন্থী ফকিহ। ইতিহাসবিদ ও কোষগ্রন্থপ্রণেতা। জ্ঞানের বহু শাখায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাগদাদেই তার জন্ম এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২১, পৃ. ৩৬৫।

প্রত্যেকের মজলিসেই বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হতেন। কখনো কখনো একটি মসজিদে একই সময়ে একাধিক ইলমি মজলিস বসত। কোনোটা তাফসিরুল কুরআনের মজলিস, কোনোটা ফিকহের মজলিস, অন্যটা নবীজির হাদিসের মজলিস, চতুর্থটা আকিদার মজলিস হলে পঞ্চমটা চিকিৎসাবিদ্যার মজলিস।

৩. **জ্ঞানের জন্য ব্যয় করা সদকাও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বলে বিবেচিত হতো :** এই চিন্তা ও অনুভূতি থেকে উম্মাহর ধনী মানুষেরা মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতেন। এমনকি তারা তালিবুল ইলম ও শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থাগার নির্মাণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বহু সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন। এভাবে জ্ঞানের জন্য ব্যয় করা কেবল বিদ্যার্থীদের জন্য নয়, অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের জন্যও কল্যাণের দ্বাররূপে উন্মোচিত হয়।

ইসলামি বিশ্বে জ্ঞান-সম্পৃক্ততা ছিল ব্যাপক। সকলের কাছেই জ্ঞানচর্চা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ ও অবশ্যকর্তব্য। এ কারণেই গ্রন্থাগারের বিস্তার ঘটে এবং বিপুল সংখ্যক ইলমি মজলিস ও জ্ঞানচর্চার আসর অনুষ্ঠিত হয়। অজ্ঞতা, মূর্খতা দূরীভূত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম এবং বিজ্ঞানীদের চিন্তার পরিবর্তন

আগের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সভ্যতাসমূহের বিপরীতে জ্ঞানের একটি নতুন দর্শন উপস্থিত করেছে। বিষয়টি এই পর্যায়েই থেমে থাকেনি। জ্ঞানের এই নতুন দর্শন মুসলিমদেরকে গবেষণা ও তত্ত্বালোচনার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের মৌল নীতিমালা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে। এটার অস্তিত্বও পূর্বে ছিল না!

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে আমরা সেসব মূলনীতির প্রতি আমাদের সাধ্যমতো ইঙ্গিত করার চেষ্টা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : প্রায়োগিক দিক

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিজ্ঞানী দল

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : জ্ঞানের আমানত
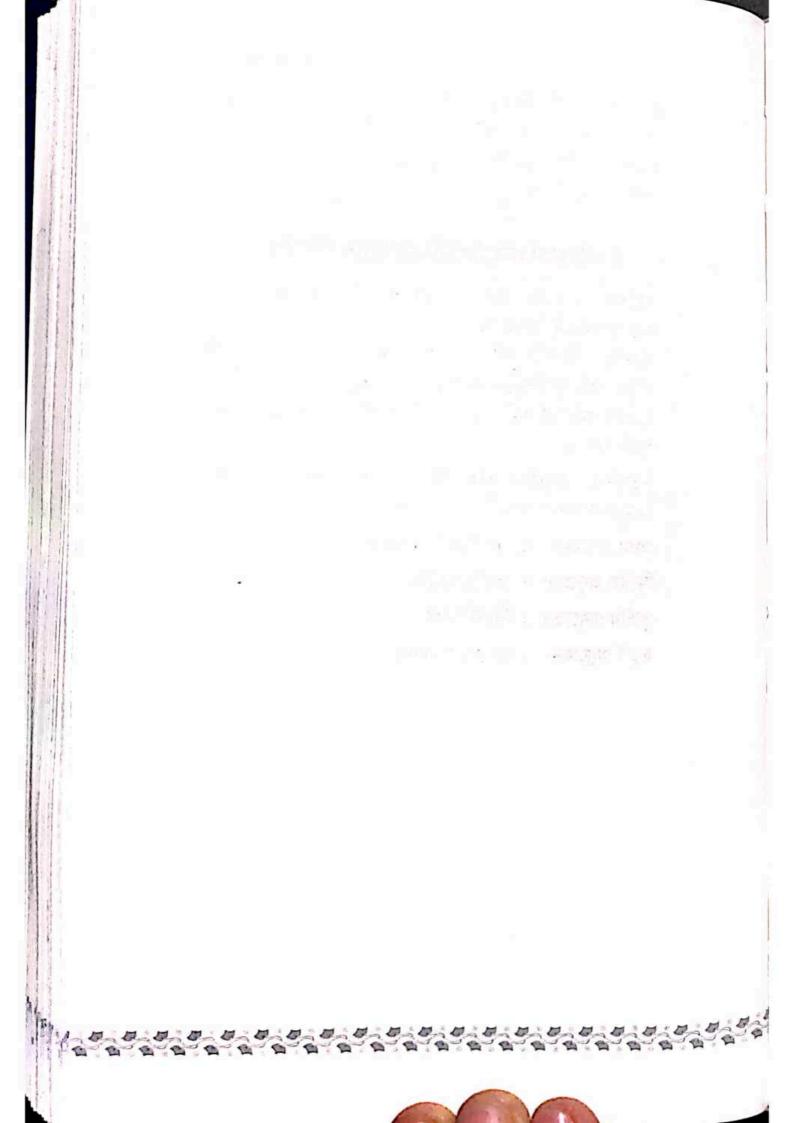
প্রথম অনুচ্ছেদ

পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতি

গবেষণার নিরিখে পরীক্ষাভিত্তিক জ্ঞান-পদ্ধতি বিশ্বের জ্ঞানযাত্রায় বিরাট ইসলামি সংযোজন বলে বিবেচিত হয়। এই জ্ঞান-পদ্ধতির ভিত্তি হলো অনুমান ও অনুসন্ধান, প্রমাণ, অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ।

গ্রিক বা ভারতীয় বা অন্যদের যে জ্ঞান-পদ্ধতি ছিল মুসলিমদের জ্ঞান-পদ্ধতি তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব সভ্যতা অধিকাংশ সময়ই কিছু তত্ত্বসমূহ নির্ধারণ করে নিয়ে তাতেই ক্ষান্ত থেকেছে। সেগুলোকে প্রায়োগিকভাবে পরীক্ষা করে দেখার বা প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি। এসবের সিংহভাগ ছিল তাত্ত্বিক দর্শন, সঠিক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোর কোনো প্রয়োগ ছিল না। ফলে শুদ্ধ তত্ত্ব ও ভ্রান্ত তত্ত্বের মধ্যে বিপজ্জনক সংমিশ্রণ ঘটে। মুসলিমগণ জ্ঞানগত দানসমূহ ও চারপাশের জাগতিক তথ্যসমূহ গ্রহণে পরীক্ষাভিত্তিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই পরীক্ষামূলক জ্ঞান-পদ্ধতির নীতিমালার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমকালীন জ্ঞানযাত্রাও সেই নির্দেশনা অনুযায়ী অব্যাহত রয়েছে।

মুসলিমগণ পূর্ববর্তী তত্ত্বসমূহের ওপর পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তত্ত্বের প্রবক্তা যতই বিখ্যাত হোক তারা তা বিবেচনায় আনেননি। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে অসংখ্য ভ্রান্তি উন্মোচিত হয়। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানী সম্প্রদায় এসব ভ্রান্তি যাপন করে আসছিলেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীগণ পূর্ববর্তী তত্ত্বসমূহের সমালোচনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন অনুমান স্থির করেছেন এবং সেগুলোকে পরীক্ষা করেছেন। সত্য ও বাস্তবের সঙ্গে অনুমানের নৈকট্য প্রমাণিত হলে তা তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর তারা এই তত্ত্বের পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। অবশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি সত্য ও বাস্তব, কোনো তত্ত্ব নয়। এই পন্থায় তারা ক্লান্তিহীনভাবে অসংখ্য পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হলেন জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-খাওয়ারিজমি, আল-রাযি, হাসান ইবনুল হাইসাম, ইবনে নাফিস এবং আরও অনেকে।

রসায়নবিদদের গুরু জাবির ইবনে হাইয়ান বলেছেন, এই শিল্পের মূল উৎকর্ষ হলো প্রয়োগ ও পরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট)। কেউ (বৈজ্ঞানিক নীতি) প্রয়োগ ও পরীক্ষা না করলে সে কোনোকিছুতেই সফল হতে পারবে না।[৫৩২] *আল-খাওয়াসুল কাবির* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, এই গ্রন্থে আমরা বস্তুর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি। আমরা কেবল এগুলো দেখেছি ও শুনেছি তা নয়, অথবা আমাদের বলা হয়েছে বা আমরা পড়েছি তাও নয়, বরং আমরা এগুলোর পরীক্ষা করেছি, অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। যা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে তা উপস্থাপন করেছি এবং যা ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করেছি। যে সিদ্ধান্ত বা ফলাফলে উপনীত হয়েছি সেটাও এই জাতির সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করেছি।[৫৩৩]

বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতিতে প্রায়োগিক পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার কথা যিনি প্রথম বলেন তিনি হলেন জাবির ইবনে হাইয়ান। এ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির নীতিমালার ভিত প্রস্তুত হয়। একে 'পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। জাবির বলতেন, যে বিজ্ঞানী পরীক্ষানিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেই প্রকৃত বিজ্ঞানী। যে বিজ্ঞানী পরীক্ষানিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) করে না সে কোনো বিজ্ঞানী নয়। প্রতিটি আবিষ্কারককে পরীক্ষানিরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। অভিজ্ঞতা অর্জনকারী আবিষ্কর্তা সফল হয় এবং অন্যরা ব্যর্থ হয়![৫৩৪]

জাবির ইবনে হাইয়ান পরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) ও অভিজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিক কর্মের ভিত্তি স্থির করেছেন এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কার্যপ্রণালি প্রদান

---

৫৩২. জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাব আত-তাজরিদ*, এরিক জন হোলমিয়ার্ড (Eric John Holmyard) কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত সংকলনগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। সংকলনগ্রন্থের নাম *The Alchemical Works of Geber*, অনুবাদক, রিচার্ড রাসেল, ১৬৭৮ সালে অনূদিত হলেও ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এটির ভূমিকা লিখেছেন টড প্রাটাম (Todd Pratum)।-অনুবাদক

৫৩৩. জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাব আল-খাওয়াস*, পৃ. ২৩২।

৫৩৪. জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাব আস-সাবয়িন*, পৃ. ৪৬৪।

করেছেন, যা তার পূর্বে গ্রিক বিজ্ঞানীরা পারেননি। তিনি কেবল চিন্তার ওপর নির্ভরশীল থাকেননি। কাদরি তাওকান বলেছেন, জাবির অন্যান্য বিজ্ঞানী থেকে অনন্য। কারণ তিনি যারা বৈজ্ঞানিক মূলনীতির আলোকে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই বৈজ্ঞানিক মূলনীতির ভিত্তিতেই আমরা ল্যাবরেটরিজ ও পরীক্ষাগারে কাজ করে থাকি। তিনি যেমন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনই ধীরতা-স্থিরতার সঙ্গে কাজ করতে, তাড়াহুড়া ও অস্থিরতা ত্যাগ করতেও আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রসায়নশাস্ত্রে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর অবশ্যকর্তব্য হলো তত্ত্ব প্রয়োগ করা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এ ছাড়া যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যাবে না।[৫৩৫]

সম্ভবত আল-রাযিই বিশ্বে প্রথম চিকিৎসক যিনি এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি প্রাণীদের ওপর বিশেষ করে বানরের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করে তা মানুষের ওপর প্রয়োগ করার আগে প্রাণীদের ওপর প্রয়োগ করেছেন এবং এভাবে কল্যাণকর চিকিৎসাপদ্ধতি নির্বাচন করেছেন। এটি উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ইদানীংকালে এই পদ্ধতির স্বীকৃতি মিলেছে, এর আগে বিশ্ব তার স্বীকৃতি দেয়নি। আল-রাযি চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে গবেষণা-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সে ব্যাপারে তিনি বলেছেন, আমরা যে ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি তা যদি প্রচলিত তত্ত্বের বিপরীত হয় তাহলে ঘটনাটি মেনে নেওয়াই জরুরি, এমনকি প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সমর্থন করতে গিয়ে সবাই প্রচলিত তত্ত্বকে গ্রহণ করে নিলেও।[৫৩৬] তিনি স্বীকারই করছেন যে, প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতামতের দ্বারা সকলেই বিভ্রমের শিকার হতে পারে এবং তারা তাদের তত্ত্ব গ্রহণ করে নিতে পারে। কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষার ফল (অভিজ্ঞতা) অনেক সময় তত্ত্বের বিপরীত হয়। এ কারণেই আমাদের জন্য আবশ্যক হলো তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করা—তা বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের হলেও—এবং অভিজ্ঞতা ও বাস্তবিক ঘটনাকে গ্রহণ করা এবং সেই ঘটনা বা অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ করা ও তা থেকে উপকার লাভ করা।

---

৫৩৫. কাদরি তাওকান, *মাকামুল আকলি ইনদাল আরাব*, পৃ. ২১৭-২১৮।

৫৩৬. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ৭৭-৭৮।

বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক (এক্সপেরিমেন্টাল) পদ্ধতি অবলম্বনের ফলেই ইবনুল হাইসামের গ্রন্থগুলোতে ইউক্লিড ও টলেমির তত্ত্বসমূহের প্রচুর সমালোচনা রয়েছে। যদিও প্রাচীন বিজ্ঞানে এই দুইজন সেরাদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল হাইসামের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতি তার *আল-মানাযির* গ্রন্থের (Book of Optics) ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার চিন্তালব্ধ আদর্শ গবেষণা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। ইবনুল হাইসাম বলেছেন, আমরা গবেষণার শুরুতে উপস্থিত বস্তুরাশি পরীক্ষানিরীক্ষা করি, স্পষ্ট দলিল-প্রমাণের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করি, আনুষঙ্গিক বিষয়াবলির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করি। দৃশ্যমান অবস্থায় বিশেষ কিছু চোখে পড়লে তা চয়ন করি, অর্থাৎ যা সাধারণ ও অপরিবর্তনশীল এবং স্পষ্ট অনুভবযোগ্য। তারপর পর্যায়ক্রমিক গবেষণায় ও পরিমাপ ব্যবহারে ধাপে ধাপে অগ্রসর হই, বস্তুর ভূমিকা পরীক্ষা করি, ফলাফল সংরক্ষণ করি। আমাদের সকল অনুসন্ধান, পরীক্ষানিরীক্ষা ও ফলাফল বিচারে ন্যায্যতা অবলম্বন করি, পক্ষপাত বা খেয়ালখুশির স্থান দিই না। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ও পরীক্ষিত সবকিছুতে সত্যকে খোঁজার চেষ্টা করি, প্রচলিত মতামতকে প্রাধান্য দিই না।[৫৩৭]

ইবনুল হাইসাম তার গবেষণায় অনুসন্ধান, অনুমান ও পরীক্ষানিরীক্ষার পন্থা অবলম্বন করেছেন। তার কোনো কোনোটির উদাহরণসহ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। এগুলোই হলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল উপাদান। যে-সকল মুসলিম বিজ্ঞানী পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ভিত রচনা করেছেন ইবনুল হাইসাম তাদের অন্যতম। তিনি ফ্রান্সিস বেকন থেকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে কেবল এগিয়েই নন, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি উঁচু আসনে রয়েছেন। তার বোধশক্তি ফ্রান্সিস বেকনের চেয়ে ব্যাপক ছিল এবং চিন্তাও ছিল গভীর। যদিও ইবনুল হাইসাম ফ্রান্সিস বেকনের মতো তাত্ত্বিক দর্শনকে তেমন গুরুত্ব দেননি।

অধ্যাপক মুস্তাফা নাজিফ এর চেয়েও এগিয়ে গিয়ে বলেন, বরং ইবনুল হাইসাম প্রথমবার যা ধারণা করতেন তাতেই চিন্তার এতটাই গভীরতায় পৌঁছে যেতেন যে ওই বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পারতেন। বিংশ শতাব্দীতে ম্যাক ও কার্ল পিয়ার্সন এবং অন্য আধুনিক বিজ্ঞানী-

---

৫৩৭. ইবনুল হাইসাম, *আল-মানাযির*, টীকা : আবদুল হামিদ সাবরাহ, পৃ. ৬২।

দার্শনিকেরা যা বলেছেন তা তিনি আগেই অনুধাবন করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঠিক প্রয়োগ এবং আধুনিক অর্থে ওই তত্ত্বের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন।[৫৩৮]

বরং কতিপয় মুসলিম বিজ্ঞানী পরীক্ষানিরীক্ষাহীন অনভিজ্ঞতাপূর্ণ রচনাকে অযথার্থ গণ্য করেছেন। হিজরি অষ্টম শতাব্দীর (খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর) বিশিষ্ট রসায়নবিদ ছিলেন জালদাকি। তিনি প্রখ্যাত রসায়নজ্ঞ তুগরায়ি (মৃ. ৫১৩ হিজরি) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তুগরায়ি ছিলেন প্রচণ্ড প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। কিন্তু তিনি সামান্যই পরীক্ষানিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) করেছেন। এই কারণে তার রচনাবলি অযথার্থ ও অসূক্ষ্ম থেকে গেছে।[৫৩৯]

এভাবে মুসলিমগণ পরীক্ষামূলক (এক্সপেরিমেন্টাল) জ্ঞানপদ্ধতিতে উপনীত হয়েছিলেন। এর ফলেই বিশ্বমানবমণ্ডলী জানতে পেরেছে কীভাবে নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে জ্ঞানগত বাস্তবতায় পৌছানো যায়। যেখানে কল্পনা, ধারণা ও খেয়ালখুশির কোনো মূল্য নেই।

---

৫৩৮. কাদরি তাওকান, *মাকামুল আকলি ইনদাল আরাব*, পৃ. ২২৩।

৫৩৯. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ২১৮।

বিজ্ঞানী-পরিচিতি[৫৪০]

জাবির ইবনে হাইয়ান : আবু মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুফি (মৃ. ২০০ হিজরি/৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন রসায়নবিদ ও দার্শনিক। সুফি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। কুফার বাসিন্দা হলেও খুরাসানি বংশোদ্ভূত। আরবের রসায়নবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। তিনি রসায়নবিদ্যা সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাতে রসায়ন ছাড়াও গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, সংগীত ও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা ছিল।[৫৪১]

আল-খাওয়ারিজমি : আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি (১৬০-২৩২ হি./৭৭৬-৮৪৭ খ্রি.) ছিলেন গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও ইতিহাসবিদ। তিনি সংখ্যাকে পাটিগাণিতিক চরিত্র থেকে বীজগাণিতিক সমীকরণে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বীজগণিত হলো ইসলামি সভ্যতায় তার শ্রেষ্ঠ অবদান। বীজগণিতকে আল-খাওয়ারিজমিই প্রথম গণিতশাস্ত্রের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলেন এবং এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বীজগণিতের ভিত্তি স্থাপন করে আধুনিক গণিতের পথকে অনেকটাই সহজ করে তোলেন। তাকে গণিতের অন্যতম জনক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আল-খাওয়ারিজমিই প্রথম ইসলামি জগতে দশমিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। আরবি ভাষায় তার রচিত গ্রন্থাবলি প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। পাশ্চাত্যসভ্যতায় ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমেই তার গবেষণার বিকাশ ঘটে। অ্যালগরিদমের উৎপত্তিই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাটিগণিতে আল-খাওয়ারিজমির অবদানের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। তবে যে ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় তাতে তার পাটিগণিত-বিষয়ক অধিকাংশ কাজই রয়েছে বলে মনে করা হয়। ১১২৬ সালে *'যিজ আস-সিন্দহিন্দ'*-এর স্প্যানিশ অনুবাদও করেন দার্শনিক

---

৫৪০. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

৫৪১. দেখুন, ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৪৯৮-৫০৩; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ১০৩।

অ্যাডিলার্ড অব বাথ। এই অনুবাদের চারটি কপির দুটি ফ্রান্সে, একটি মাদ্রিদে ও একটি অক্সফোর্ডে সংরক্ষিত আছে।

যিজ আস-সিন্দহিন্দে মোট ৩৭টি অধ্যায় এবং ১১৬টি 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবিল' বা জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় ছক রয়েছে। এসব সারণিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও বর্ষপঞ্জিকা-সম্পর্কিত তথ্যও রয়েছে। মূলত তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক সারণি তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হতো 'সিন্দহিন্দ'। এই সিন্দহিন্দের ওপর ভিত্তি করেই মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সারণি তৈরি করেছিলেন। আল-খাওয়ারিজমি তার ছকগুলোতে চন্দ্র-সূর্যের গতি ছাড়াও তখনকার সময়ে আবিষ্কৃত পাঁচটি গ্রহের গতি নিয়ে আলোচনা করেন। আল-খাওয়ারিজমির জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক কাজগুলোই পরবর্তীকালে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য পথিকৃৎ হয়ে থাকে।

ত্রিকোণমিতি নিয়ে আল-খাওয়ারিজমির কাজ কম হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ত্রিকোণমিতিক ফাংশন সাইন ও কোসাইন-এর অনুপাত নির্ণয় করেন এবং তার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সারণিতে সেগুলো সংযুক্ত করেন। গোলকাকার ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে একটি বইও লেখেন।

আল-খাওয়ারিজমি '*কিতাব সুরাতুল-আরদ*' বা *পৃথিবীর চিত্র* গ্রন্থটি লেখেন ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। 'জিয়োগ্রাফি' নামে পরিচিত এই বইটি টলেমির 'জিয়োগ্রাফি'-র ওপর ভিত্তি করে রচিত। বইটিতে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ভিত্তিতে আবহাওয়া অঞ্চল ভাগ করা হয়েছে। টলেমির তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে রচনা করলেও তিনি টলেমির ভ্রান্তিগুলো সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আল-খাওয়ারিজমি ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগর-সম্পর্কিত টলেমির ভুলগুলো সংশোধন করেন। '*কিতাব সুরাতুল-আরদ*'-এর একটি কপি বর্তমানে ফ্রান্সের স্ট্র্যাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

আল-রাযি : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-রাযি (২৫১-৩১৩ হি./৮৬৫-৯২৫ খ্রি.) ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। দুইশটির মতো গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন, যার প্রায় অর্ধেক চিকিৎসাশাস্ত্র-বিষয়ক। তার বহু গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে মধ্যযুগের বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার লেখাতেই প্রথম বসন্ত রোগের আনুপূর্বিক চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বাগদাদ শহরের প্রধান

হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক। প্লাস্টার অব প্যারিস জাতীয় পদার্থ তৈরি করে তার সাহায্যে ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পদ্ধতির আবিষ্কর্তাও তিনি। রসায়নশাস্ত্রেও তার বিশেষ আগ্রহ ছিল, রসায়নবিদ্যার গোপন কথা নিয়ে তিনি বইও লিখেছিলেন। সংগীত-বিষয়েও তিনি একটি কোষগ্রন্থ রচনা করেন। তার জন্ম রায় শহরে এবং মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে।

আল-হাসান ইবনুল হাইসাম : আবু আলি আল-হাসান ইবনে আল-হাসান ইবনুল হাইসাম (৩৫৪-৪৩০ হি./৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.) পশ্চিমা বিশ্বে তিনি আল-হাজেন নামে সমধিক পরিচিত। ইসলামি স্বর্ণযুগের তিনি ছিলেন একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। তাকে আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। আবহাওয়াবিজ্ঞান ও চক্ষুবিজ্ঞানে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মূলত কায়রোতে বসে তিনি তার গবেষণার কাজ করছিলেন। ইবনুল হাইসাম ইউক্লিডের জ্যামিতির বিস্তৃত পর্যালোচনা করে দুটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি ইউক্লিডের '*এলিমেন্টস*' গ্রন্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ এবং সমান্তরাল রেখার তত্ত্ব ও স্বীকার্য নিয়ে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন। তার শঙ্কুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ও ঘূর্ণায়মান বস্তুর আয়তন-সংক্রান্ত গবেষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনেও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি তার রচনায় আলোকবিজ্ঞানের যে পরিচিতি দিয়েছেন তা সেই সময়ের পক্ষে সবচেয়ে সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ বিবরণী। চোখের গঠন ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন তাও যথেষ্ট আধুনিক। বিজ্ঞানের ইতিহাসেও তার আগ্রহ ছিল। তার লেখায় এমন একটি যন্ত্রের আলোচনা করা হয়েছে যার সাহায্যে আলোকিত বস্তুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তুলাপাত্রসহ এমন একটি তুলারও বর্ণনা দিয়েছেন যা শতকরা ৯৯.৯ ভাগ নিখুঁত পরিমাপ দিতে পারত। যন্ত্রটি ব্যবহার করা হতো বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয় করার জন্য। আল-হাইসামের দার্শনিক রচনা থেকে তার নিজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা জ্ঞানপিপাসু, ধর্মপ্রাণ ও জীবনমুখী এক মানুষের।

ইবনে নাফিস (১২১৩-১২৮৮ খ্রি.) : আবুল হাসান আলাউদ্দিন আলি ইবনে আবুল হায্ম আল-খালিদি আল-কারশি আদ-দিমাশকি। বিখ্যাত আরব বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদ। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিশরের কায়রোতে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি প্রথম রক্ত-সঞ্চালন

সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা প্রদান করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও ব্যাকরণ, ফিকহ ও যুক্তিবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন তিনি।

ইবনে সিনার চিকিৎসাবিশ্বকোষ আল-কানুনের Anatomy অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে নাফিস লেখেন *'শারহু তাশরিহি কানুন'* (شرح تشريح القانون)। এতে তিনি হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল সম্পর্কে গ্যালেন ও ইবনে সিনার তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। মানবদেহে বায়ু ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন ইবনে নাফিস। তিনি মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি, ফুসফুসের গঠনপদ্ধতি, শ্বাসনালি, হৃৎপিণ্ড, শরীরের শিরা-উপশিরায় বায়ু ও রক্তের প্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দেন। ইবনে নাফিস *'আশ-শামিল ফিস-সানাআ আতিত-তিব্বিয়্যাহ'* নামে ৩০০ খণ্ডের এক বিশাল বিশ্বকোষ রচনার পরিকল্পনা করেন এবং খসড়াও তৈরি করেন। তিনি তার জীবদ্দশায় মাত্র ৮০ খণ্ড সমাপ্ত করে যেতে পেরেছিলেন। ইবনে নাফিস তার বিশ্বকোষের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি এবং সংগৃহীত সব গ্রন্থ আল-মানসুরি বিমারিস্তানে (হাসপাতালে) জমা দেন। এটি বর্তমানে 'কালাউন হাসপাতাল' নামে পরিচিত। ৮০ খণ্ডের মধ্যে মাত্র দুই খণ্ড এখন এই হাসপাতালে আছে, বাকি খণ্ডগুলো বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তার আরেকটি গ্রন্থ হলো *'বুগয়াতুত তালিবিন ওয়া হুজ্জাতুল মুতাতাব্বিন'*। এটি কয়েক শতাব্দীব্যাপী চিকিৎসাবিজ্ঞানের রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর তার আরেকটি কোষগ্রন্থ হলো *'আল-মুহাযযাব ফিল-কাহলিল মুজাররাব'*।

ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon 1561-1626) ইংরেজ আইনজ্ঞ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও নীতিজ্ঞ। বিজ্ঞানে বিপ্লবের কালে যাদের হাত দিয়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক প্রায়োগিক দিকটির সমৃদ্ধি ঘটেছে বেকন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রবক্তা। বেকন নিজেকে বিজ্ঞানী হিসেবে যতটা, তার চেয়ে বেশি সংস্কারের প্রবক্তারূপে দাবি করতেন। তিনি তার দার্শনিক সংস্কারের ঘোষণায় চারটি আদর্শের উল্লেখ করেন। তার প্রতি অভিযোগ রয়েছে যে,

তিনি তার লেখায় বিভিন্ন তত্ত্বের উৎস অকথিত রেখে নিজের মৌলিকতা অতিরঞ্জিত করেছেন। বেকনের জন্ম হয়েছিল অভিজাত পরিবারে। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তখনই অ্যারিস্টটলের দর্শনের প্রতি তার বীতস্পৃহা জন্মে। ফ্রান্সে কিছুকাল কাটিয়ে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যোগ দেন ও নাইট উপাধি পান। তিনি ইংল্যান্ডের সলিসিটর জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল ও লর্ড চ্যান্সেলররূপে কাজ করেন এবং স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ব্যারন উপাধি দেওয়া হয়। তার রচিত গ্রন্থ : *The Advancement and Proficience of Learning Divine and Human* (1605), *New Atlantis* (1626)।

মুস্তাফা নাজিফ (১৮৯৩-১৯৭১ খ্রি.) মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর তার লেখা গ্রন্থ (علم الطبيعة) ইলমুত *তাবিআ* ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর আরবিভাষায় লেখা এটি প্রথম গ্রন্থ। ১৯৩০ সালে তার আলোকবিজ্ঞানের ওপর ৮০০ পৃষ্ঠা সংবলিত বই প্রকাশিত হয়। এটিও আলোকবিজ্ঞানের ওপর আরবি ভাষায় প্রথম বই। মুস্তাফা নাজিফ ইবনুল হাইসামের রচনাবলি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন এবং রচনা করেন তার অবিস্মরণীয় গ্রন্থ (الحسن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية) *আল-হাসান ইবনুল হাইসাম : বুহুসুহু ওয়া কুশুফুহুল বাসারিয়্যা*। তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিশরীয় বিজ্ঞানী। তার আগ্রহ ও গুরুত্বের বিষয় ছিল ইসলামি সভ্যতায় বৈজ্ঞানিক পুনর্জাগরণ। তিনি আরবি ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ।

কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson 1857-1936) ইংরেজ গণিতবিদ, জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি প্রথমে ফলিত গণিত ও বলবিদ্যার এবং পরে ইজেনিক্সের অধ্যাপক হিসেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি হলেন জীবমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। '*বায়োমেট্রিকা*' নামে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। তার রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে : *Mathematical Contributions To The Theory of Evolution, Tables For Statisticians And Biometricians, The Grammar of Science*।

জালদাকি : ইযযুদ্দিন আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আইদামির আল-জালদাকি ছিলেন রসায়নবিদ ও দার্শনিক। তখনকার যুগে প্রখ্যাত রসায়নবিদদের অন্যতম। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

كنز الاختصاص في معرفة الخواص، البرهان في أسرار علم الميزان، كتاب المصباح في علم المفتاح، نهاية الطلب في شرح المكتسب وزراعة الذهب، لتقريب في أسرار التركيب في الكيمياء ।

তার অধিকাংশ গ্রন্থই বিশ্বের একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি খুরাসানের জালদাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৪২ হিজরি/১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৪২]

তুগরায়ি : আবু ইসমাইল আল-হুসাইন ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইস্পাহানি (৪৫৩-৫১৩ হিজরি/১০৬১-১১১৯ হিজরি), তুগরায়ি নামে পরিচিত। কবি ও রসায়নবিদ। ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। খলিফার প্রশাসনিক সচিব ছিলেন। রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা প্রসঙ্গে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৫৪৩]

---

৫৪২. দেখুন, হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ২, পৃ. ১৫১২; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৫।

৫৪৩. দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ১৮৫-১৯০; সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, খ. ১২, পৃ. ২৬৮-২৬৯।
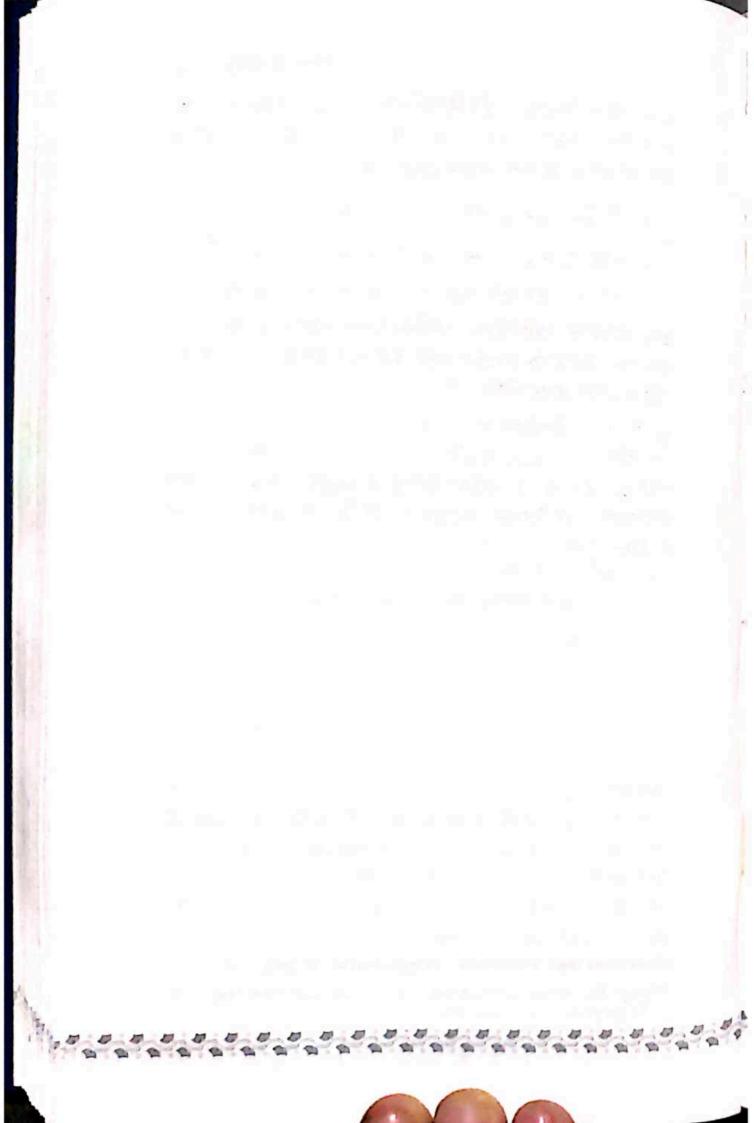
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

প্রায়োগিক দিক

'প্রায়োগিক দিক'-ও একটি নতুন পন্থা বলে পরিগণিত। মুসলিমদের যুগেই এই দিকটির বিকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে যখন গ্রিক ও ইউনানীয় সভ্যতার সঙ্গে মুসলিম সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে তখন এ দিকটি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

ইসলামপূর্ব প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে অনেক তত্ত্ব কেবল সঠিকই ছিল না, বরং প্রতিভাদীপ্তও ছিল। তা সত্ত্বেও, এসব তত্ত্বের অধিকাংশই—শুদ্ধ ও যথার্থ হলেও—খণ্ডের পর খণ্ড শুধু কাগজের পৃষ্ঠাই ভরিয়ে তুলেছে, মানবজীবনের বাস্তবিকতায় তার কার্যকরী কোনো প্রয়োগ ঘটেনি। জ্ঞানবিজ্ঞানে এই দিকটিকেই আমরা প্রায়োগিক দিক বুঝিয়েছি। যার ফলে তত্ত্বগুলো বাস্তবিক রূপ নিয়ে মানুষের কাজে লাগে, তাদের উপকার সাধন করে। এমনকি তা তাদের বিনোদনের উপাদান হলেও।

মুসলিমদের আবির্ভাব ও বিশ্বজুড়ে তাদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও সংস্কারকর্মের পর মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রতিটি সঠিক তত্ত্বকে উপকারী কার্যে রূপান্তরিত করেন। এতে মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

এই ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রদের উদ্ভাবনসমূহ। তারা সেচযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, পাহাড়ের উপরে পানি উত্তোলনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং সূক্ষ্ম সময়দায়ক ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন। অথচ তারা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। তা ছাড়া তারা নিজেরাই অনেক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। অবশেষে এসব তত্ত্বের তাড়নাতে কেবল চিন্তাভাবনাতেই ক্ষান্ত না থেকে তারা সমাজের বরং গোটা মানববিশ্বের উপকার সাধনে সর্বতোভাবে ব্রতী হয়েছিলেন!

আয-যাহরাবিও মানবকল্যাণসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি শল্যচিকিৎসার (অস্ত্রোপচারের) অসংখ্য যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। উদাহরণত, তিনি তাত্ত্বিকভাবে জানতেন যে ওষুধ যখন সরাসরি রক্তের সঙ্গে মেশে তা অতি দ্রুত ক্রিয়া করে। এ ব্যাপারটিই তাকে ইনজেকশন আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। যাতে কার্যতই ওষুধ দ্রুততার সঙ্গে রক্তে পৌছানো যায়।[৫৪৪]

ইবনুল বাইতারও তত্ত্বের বেড়াজালে বন্দি না থেকে মানবকল্যাণে কাজ করেছিলেন। তিনি আশিটিরও বেশি ওষুধ আবিষ্কার করে চিকিৎসাশাস্ত্রের ময়দানে বিশাল অবদান রেখেছিলেন।[৫৪৫] জাবির ইবনে হাইয়ান কয়েকটি রাসায়নিক সমীকরণ (যৌগ) ব্যবহার করে বৃষ্টি-নিরোধক কোট (রেইন কোট) আবিষ্কার করেছিলেন। একইভাবে অগ্নি-নিরোধক কাগজও তৈরি করেছিলেন। এই কাগজ আগুনে জ্বলত না। অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এতে লেখা হতো।[৫৪৬]

আমরা অব্যবহিত পরেই মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রায়োগিক গবেষণার মূল্য বুঝতে পারি। যখন দেখি যে, গ্রিক ও ইউনানীয় জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা অসংখ্য দার্শনিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছে, কিন্তু তারা তা বাস্তবিকতার বিচারে পরীক্ষানিরীক্ষা করেনি। ফলে এসব তত্ত্ব থেকে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হয়নি, মানুষও কোনো উপকার পায়নি।

---

৫৪৪. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৩১-৩৩২।
৫৪৫. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ২, পৃ.৬৯২।
৫৪৬. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৪৭৫-৪৭৬।

বিজ্ঞানী-পরিচিতি[৫৪৭]

মুসা ইবনে শাকির : বানু মুসা নামে বিখ্যাত তিন প্রকৌশলীর পিতা। যৌবনে তিনি দস্যু ছিলেন। তারপর তওবা করে ফিরে আসেন এবং খলিফা মামুনের সেবাজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি ২০০ হিজরি/৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার ছেলেরা ছিল ছোট। তাদেরকে বাইতুল হিকমায় ভর্তি করানো হয়। তার তিন পুত্র :

১. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির : জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী, ভূগোলবিদ ও শারীরবৃত্তবিদ।

২. আহমাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির : যন্ত্রপ্রকৌশলী।

৩. হাসান ইবনে মুসা ইবনে শাকির : প্রকৌশলী ও ভূগোলবিদ।[৫৪৮]

আয-যাহরাবি : আবুল আব্বাস খাল্ফ ইবনে আব্বাস আয-যাহরাবি আল-উন্দুলুসি (মৃ. ৪২৮ হি./১০৩৬ খ্রি.) ছিলেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী। ইসলামি যুগের শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক। তাকে শল্যচিকিৎসার জনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। ত্রিশ খণ্ডে রচিত (التصريف لمن عجز عن التأليف) *আত-তাসরিফু লি-মান আজাযা আনিত তালিফ* তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শল্যচিকিৎসা বিষয়ে তিনিই প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই প্রথম রক্তক্ষরণ বা রক্তক্ষরণপ্রবণতার (হিমোফিলিয়া) পরম্পরীণ প্রকৃতি আবিষ্কার করেন।[৫৪৯]

ইবনুল বাইতার : জিয়াউদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-মাকালি (৫৯৩-৬৪৬ হি./১১৯৭-১২৪৮ খ্রি.) ইবনুল বাইতার নামে পরিচিত ছিলেন। আন্দালুসীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাকে উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের

---

৫৪৭. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

৫৪৮. দেখুন, ইবনুল আবারি, *মুখতাসারুদ দুওয়াল*, পৃ. ২৬৪; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ৩২৩।

৫৪৯. দেখুন, ইবনে বাশকুওয়াল, *আস-সিলাতু ফি তারিখিল উন্দুলুস*, খ. ১, পৃ. ২৬৪; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ৩১০।

গুরু মনে করা হয়। ফার্মাসিস্ট, ভেষজবিজ্ঞানী। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে তার রচনাবলির সংকলন الجامع لمفردات الأدوية والأغذية বা الجامع في الأدوية المفردة। এটি লাতিন, ফরাসি, জার্মান ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি আন্দালুসের মাকালা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫০]

৫৫০. দেখুন, ইবনে শাকির কুতুবি, *ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*, খ. ২, পৃ. ১৫৯-১৬০।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বিজ্ঞানী দল

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী দলও একটি নতুন মৌলিক বিষয়। মুসলিমগণ বিজ্ঞানী দল গঠনের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের চিন্তাপদ্ধতি ও গবেষণারীতিতে পরিবর্তন এনেছেন। ইতিহাসে মুসলিমরাই প্রথমবার পরিপূর্ণ বিজ্ঞানী দল গঠন করেছেন। এই দলে ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের একাধিক বিজ্ঞানী। তারা অবশেষে আমাদের জন্য উপকারী আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি উপহার দিয়েছেন। একাধিক বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর সমন্বিত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে এসব কাজ সম্ভব হতো না।

চিত্র নং-১
মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রত্রয় রচিত 'আল-হিয়াল'

মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা (মুহাম্মাদ, হাসান ও আহমাদ) ইতিহাস বিখ্যাত প্রথম বিজ্ঞানী দল। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ছিলেন প্রকৌশল-বিজ্ঞানী, আহমাদ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং হাসান ছিলেন যন্ত্রবিজ্ঞানী। তারা যৌথভাবে *'আল-হিয়াল'* (কৌশল) গ্রন্থটি[৫৫১] রচনা করেন। এতে আক্ষরিকভাবেই বিজ্ঞানী দলের আত্মার স্ফুরণ ঘটেছে এবং দলভিত্তিক সমন্বিত যৌথ কার্যাবলির নীতি বাস্তবিক রূপ লাভ করেছে। বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দলবদ্ধ কাজের সাক্ষ্য বহন করেছে। উপর্যুক্ত গ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

মুহাম্মাদ, হাসান ও আহমাদ বলেছেন :

মডেল-১ : আমরা কীভাবে (কা'স্) বিকার[৫৫২] প্রস্তুত করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে চাই। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানীয় বা পানি ঢালা হয়। তারপর যদি এতে অতিরিক্ত সামান্য (মিসকাল) পরিমাণ পানীয় বা পানি ঢালা হয় তাহলে এতে যতটুকু আছে পুরোটাই উপচে পড়ে যায়।[৫৫৩]

মডেল-২ : খোলা নির্গমদ্বারযুক্ত পাত্র নির্মাণ করা হয় কীভাবে তা ব্যাখ্যা করতে চাই। এটিতে যতক্ষণ পানি ঢালা হয় ততক্ষণ নির্গমদ্বার দিয়ে কিছু বের হয় না, ঢালা বন্ধ করামাত্রই নির্গমদ্বার দিয়ে পানি বেরুতে শুরু করে, আবার ঢালা শুরু করলে পানি বেরুনো বন্ধ হয়ে যায়, ঢালা বন্ধ করে দিলে পানি বেরুতে শুরু করে, আবার ঢালতে শুরু করলে পানি বেরুনো বন্ধ হয়ে যায়।[৫৫৪] এভাবে চলতেই থাকে..।

মডেল-৩ : দুটি ফোয়ারা একইসঙ্গে কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করছি। এর একটি ফোয়ারা থেকে বর্শার মতো পানি নির্গত হয় এবং অপরটি থেকে আইরিস ফুলের মতো। এভাবে কতক্ষণ চলে। তারপর পরিবর্তন ঘটে। যে ফোয়ারা থেকে বর্শার মতো পানি বেরুচ্ছিল তা থেকে আইরিস ফুলের মতো পানি বেরোয় এবং যে ফোয়ারা থেকে আইরিস ফুলের মতো পানি বেরুচ্ছিল তা থেকে বর্শার মতো পানি বেরোয়। ঠিক

---

৫৫১. গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ : *Book of Ingenious Devices.*

৫৫২. বিকার (Beaker) : ঠোঁটওয়ালা বড় কাচের পাত্র। সাধারণত রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত।

৫৫৩. বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাব আল-হিয়াল*, টীকা : আহমাদ ইউসুফ হাসান ও অন্যরা, *মা'হাদুত তুরাসিল ইলমিল আরাবি*, ১৯৮১, টীকাকারের ভূমিকা, পৃ. ৫৭।

৫৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

আগের সময়ের অনুরূপ। যতক্ষণ পানির প্রবাহ থাকে ততক্ষণ এভাবে চলতে থাকে।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানী দল হিসেবে মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বৈদগ্ধ্য প্রমাণ করে। জ্ঞানের ময়দানে যূথবদ্ধতা বা যৌথ ও সমন্বিত কর্মের মূল্য ও গুরুত্বও বোঝা যায় এ থেকে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এই ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার সম্মিলন ও পূর্ণাঙ্গতা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারে সহায়ক হয়েছে। একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একাধিক বিজ্ঞানী ছাড়া এসব আবিষ্কার সহজ হতো না। যেমন : পৃথিবীর ব্যাসের সূক্ষ্ম অনুমান অথবা বিশাল আকার অ্যাস্ট্রোল্যাব[৫৫৫] প্রস্তুত করা, যার দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে গ্রহনক্ষত্রের চলাচলের হিসাব করা যায়।

এমন যৌথ গবেষণা কেবল এই অনন্য বিজ্ঞান-শাখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও তা বিস্তৃত ছিল। আমরা দেখতে পাই, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সহযোগিতামূলক সমন্বয়ের ভিত্তিতে গবেষণা হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ ও জ্যোতির্বিদেরাও সমন্বিত গবেষণা করেছেন।

বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী আল-রাযি ও তার শিষ্যদের মধ্যে যৌথ গবেষণার কাজ হয়েছে। ইবনে নাদিম[৫৫৬] তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল-রাযি ছিলেন তার যুগের অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব। তিনি পূর্ববর্তীদের জ্ঞান, বিশেষ করে চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞান সংকলন করেছেন। তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতেন...। তিনি মজলিসে বসতেন, তার সামনে তার ছাত্ররা থাকত। তার ছাত্রদের পেছনে তাদের ছাত্ররা থাকত। তাদের পেছনে থাকত অন্য ছাত্ররা। কোনো একজন অসুস্থ লোক এসে প্রথমে যাদের পেত তাদের কাছে রোগ-লক্ষণ বর্ণনা করত। তাদের কাছে সমাধান থাকলে তারা বলে দিত। অন্যথায় অসুস্থ লোকটি তাদের

---

৫৫৫. গ্রহনক্ষত্রের উন্নতি নির্ণয়ের জন্য মধ্যযুগীয় যন্ত্রবিশেষ।

৫৫৬. যেমনটি পূর্বে গিয়েছে, বিশুদ্ধ মতানুসারে তার নাম নাদিম, ইবনে নাদিম নয়। দেখুন, *লিসানুল মিযান*, খ. ৯, পৃ. ২১৪।

ডিঙিয়ে অন্যদের কাছে আসত। তারা সঠিক সমাধান দিলে তো ভালোই, অন্যথায় আল-রাযি সে ব্যাপারে কথা বলতেন। তিনি ছিলেন অমায়িক, সহানুভূতিশীল, দয়ালু। দরিদ্র ও রোগীদের প্রতি অত্যন্ত মমতাময় ছিলেন। প্রয়োজনে তিনি রোগীদের অস্ত্রোপচার করতেন এবং তাদের সুস্থ করে তুলতেন।[৫৫৭]

আল-রাযির ছাত্ররা ছিলেন অসংখ্য বিজ্ঞানী দলের মতো। প্রত্যেক দল উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে তার মত পেশ করত এবং অবশেষে তারা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছত। তাদের সবার শিরোভূষণ হয়ে বসে থাকতেন আল-রাযি, তিনি তাদের বক্তব্য শুনতেন, পর্যালোচনা করতেন এবং ভুল হলে ঠিক করে দিতেন। জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি তাদের সঙ্গে থাকতেন এবং তাদের সবকিছু বিস্তারিত বুঝিয়ে দিতেন।

জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যে কেবল বিজ্ঞানী দল ছিল তা নয়, শরিয়তের বিভিন্ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন দল ছিল। আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন ও সুন্নাহ, হাদিস, ফিকহ ও আকিদার নানা ধরনের সমস্যার সমাধানে আলেমদের বড় বড় দল একত্র হতেন এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। ফলে জ্ঞান-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং তা দ্রুতই পরিণতিতে পৌঁছে।

---

৫৫৭. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৫৬।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

জ্ঞানের আমানত

জ্ঞানের আমানত সুরক্ষার যে নীতি তাও একটি নতুন নীতি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এই নীতির কথা জানা ছিল না। কারণ ধর্মাদর্শ ও নৈতিকতার অনুপস্থিতিতে যে-কেউ মুনাফা ও খ্যাতির আশায় বিভিন্ন আবিষ্কার নিজের নামে চালিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

জ্ঞানগত আমানতের দাবি হলো চিন্তার ও জ্ঞানের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান। গবেষণা ও আবিষ্কার তার কর্তার নামেই যুক্ত হবে এবং তার নামেই পরিচিতি পাবে। কিন্তু মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা ও আবিষ্কার চুরি যাওয়ার ফলে বেশ দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। তাদের আবিষ্কার ও গবেষণা পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা মুসলিম বিজ্ঞানীদের কয়েক দশক বা কয়েক শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

আমাদের মহান বিজ্ঞানী ইবনে নাফিসের ক্ষেত্রে যে জঘন্য চুরির ঘটনাটি ঘটেছে তা কারও অজানা থাকার কথা নয়। তিনি ফুসফুসীয় (রক্ত) সংবহন (pulmonary circulation) আবিষ্কার করেন এবং তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে *'শারহু তাশরিহিল কানুন'* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তার এই আবিষ্কার কয়েক শতাব্দীব্যাপী অগোচরেই থেকে যায়। পরবর্তীকালে এই আবিষ্কার ভুলবশত ব্রিটিশ চিকিৎসাবিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ইবনে নাফিসের মৃত্যুর তিন শতাব্দীরও বেশি পরে রক্ত সংবহন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। মানুষ যুগের পর যুগ এই ভ্রান্তির মধ্যেই থেকে যায়, অবশেষে মিশরীয় চিকিৎসক মহিউদ্দিন তাতাবি এই সত্য উদ্‌ঘাটন করেন।

ইতালীয় চিকিৎসক আলাপ্যাগো ৯৫৪ হিজরিতে/১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে নাফিসের *'শারহু তাশরিহিল কানুন'* গ্রন্থের কিছু অংশ লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এই চিকিৎসক ত্রিশ বছরের বেশি সময় রুহায় অবস্থান করেন এবং আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আরবি থেকে লাতিনে অনুবাদ করা। তিনি যে অংশগুলো অনুবাদ করেন তাতে

ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন-সংক্রান্ত অধ্যায়টিও ছিল। তবে তার এই অনুবাদ হারিয়ে যায়।

كتاب شرح نفيسي عليه الرحمة

بسم الله الرحمن الرحيم

চিত্র নং-২
ইবনে নাফিস রচিত 'আশ-শিফা'

মাইকেল সারভেটাস (Michael Servetus 1511-1553) নামের একজন স্প্যানিশ বিজ্ঞানী–যিনি চিকিৎসক ছিলেন না–প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিনি আলাপ্যাগো কর্তৃক অনূদিত ইবনে নাফিসের কিতাবের সন্ধান পান। সারভেটাস খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস করতেন না এবং ত্রিত্ববাদের সমালোচনা করতেন। তিনি ভিন্নধর্মী চিন্তাভাবনা লালন করতেন। ফলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি বিভিন্ন শহরে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। ১০৬৫ হিজরিতে/১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সারভেটাসকে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তার অধিকাংশ পুস্তকও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় তার কিছু গ্রন্থ পুড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যায়। তার মধ্যে আলাপ্যাগো কর্তৃক অনূদিত ইবনে নাফিসের রক্ত সংবহন-সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপিটিও ছিল। গবেষকেরা বিশ্বাস করে বসলেন যে রক্ত সংবহন পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রথমত এই স্প্যানিশ বিজ্ঞানী সারভেটাসের এবং দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভের। ১৩৪৩ হিজরি/১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ধারণা চালু থাকল। অবশেষে মিশরীয় চিকিৎসক ড. মহিউদ্দিন তাতাবি এই ভুল ধারণা দূর করেন এবং প্রাপ্য অধিকার তার প্রাপককে ফিরিয়ে দেন। তিনি বার্লিনের গ্রন্থাগারে ইবনে নাফিসের *'শারহি তাশরিহিল কানুন'* গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন এবং এ বিষয়ে তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেন। তিনি এই মহাগ্রন্থের একটি বিশেষ দিকের প্রতি সযত্ন আলোকপাত করেন। তা হলো ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন পদ্ধতি। এটা ১৩৪৩ হিজরির/১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা।

তাতাবির গবেষণাপত্র দেখে তার শিক্ষক ও পর্যবেক্ষকগণ বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এতে যে তথ্য রয়েছে তা জেনে তারা হতচকিত হয়ে যান, যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। আরবি ভাষা তাদের জানা না থাকায় গবেষণাপত্রের একটি কপি জার্মান প্রাচ্যবিদ ম্যাক্স মেয়েরহোফের কাছে পাঠান। মেয়েরহোফ তখন কায়রোতে ছিলেন। তারা তার কাছে গবেষক তাতাবি যা লিখেছেন সে সম্পর্কে অভিমত চান। মেয়েরহোফ ড. তাতাবিকেই জোরালো সমর্থন করেন।

ড. তাতাবি তার একটি গবেষণায় লিখেছেন, আমাকে যে বিষয়টি বিস্ময়াভিভূত করে তা এই যে, সারভেটাসের বক্তব্যের কিছু কথা হুবহু ইবনে নাফিসের বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, বরং তার অনুরূপ ছিল, যার

আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে...। সারভেটাস স্বাধীন চিন্তার মানুষ ছিলেন, চিকিৎসক ছিলেন না। তিনি ইবনে নাফিসের ভাষাতেই ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন পদ্ধতির উল্লেখ করেন, অথচ ইবনে নাফিস তার দেড় শতাব্দীরও বেশি আগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

মেয়েরহোফ ইবনে নাফিসের প্রচেষ্টার যে সত্য আবিষ্কৃত হলো তা ঐতিহাসিক জর্জ সার্টনের কাছে পাঠিয়ে দেন। সার্টন তা তার বিখ্যাত গ্রন্থ হিস্ট্রি অব সাইন্সের (*History of Science*) শেষ খণ্ডে[৫৫৮] প্রকাশ করেন।[৫৫৯]

আলদো মিলি[৫৬০] উভয়ের মূল বক্তব্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলেন, ইবনে নাফিস ফুসফুসীয় সংবহনের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তা আক্ষরিকভাবে সারভেটাসের বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। সুতরাং স্পষ্ট সত্য এই যে, ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন পদ্ধতির আবিষ্কার ইবনে নাফিসেরই, সারভেটাস বা হার্ভের নয়।[৫৬১]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগত নিরাপত্তাহীনতা ও এমন সব চৌর্যবৃত্তির ঘটনা কম নয়। আমরা এখানে সেসবের প্রতি সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যাব :

- ফরাসি ইহুদি ডুরখেইমকে সমাজবিজ্ঞানের জনক অভিহিত করা হয়। অথচ যিনি এই বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা তিনি হলেন মুসলিম মনীষী ইবনে খালদুন। এই বিষয়ে আলোচনা আসছে।
- গতিসূত্রসমূহের (Laws of Motion) আবিষ্কর্তা বলা হয় আইজ্যাক নিউটনকে, অথচ দুই মুসলিম বিজ্ঞানী এসব সূত্র আবিষ্কার করেন।

---

৫৫৮. গ্রন্থটি ৯ খণ্ডে প্রকাশিত।-অনুবাদক

৫৫৯. মুহাম্মাদ আস-সাদিক আফিফি, তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন, পৃ. ২০৮; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, রুউওয়াদু ইলমিত তিব্ব ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল-ইসলামিয়্যা, পৃ. ৪৫১।

৫৬০. Aldo Mieli (১৮৭৯-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ) : ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। *La science arabe et son role dans l'evolution scientifique mondiale* (العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى) গ্রন্থের রচয়িতা।

৫৬১. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, রুউওয়াদু ইলমিত তিব্ব ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৪৫১।

তারা হলেন ইবনে সিনা ও হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা। পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

- আমরা রজার বেকনের[৫৬২] বিখ্যাত গ্রন্থ *Opus Majus*-এ একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় পাই—সেটি পঞ্চম অধ্যায়—যা ইবনে হাইসামের '*আল-মানাযির*' গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ ছাড়া কিছু নয়। অথচ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূল লেখকের প্রতি কোনো ইঙ্গিতও করা হয়নি।

এ সবকিছু মুসলিমদের সঙ্গেই ঘটেছে। অন্যদিকে মুসলিমদের নীতি ছিল ভিন্ন। তা হলো জ্ঞানের আমানত সুরক্ষা এবং গবেষণা ও কৃতিত্ব তার প্রাপককে প্রদানের নীতি। এই নীতির ফলে কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীই অন্যান্য সভ্যতার বিজ্ঞানীদের কারও কোনো আবিষ্কার বা কোনো তত্ত্ব নিজের বলে দাবি করেননি। বরং তারা যাদের তত্ত্ব উদ্ধৃত করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন, ঋণ স্বীকার করেছেন। ওইসব জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর নামে তাদের গ্রন্থাবলি ভরপুর। যেমন : হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল প্রমুখ। মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন, তাদের প্রাপ্য হক দিয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। গ্রন্থ রচনায় কিছুটা অবদান থাকলেও এবং সামান্য তথ্য নিলেও তাদের কারও নামই অনুল্লেখ থাকেনি।

উদাহরণস্বরূপ মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা (বানু মুসা) তাদের معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكروية *(The Book of the Measurement of Plane and Spherical Figures)* গ্রন্থে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তারা বলেছেন, আমাদের গ্রন্থে আমরা যা-কিছুর বর্ণনা দিয়েছি তা আমাদেরই গবেষণা। তবে ব্যাসের পরিধি নির্ণয়ের সূত্র আমাদের নয়। এটি আমরা আর্কিমিডিস থেকে নিয়েছি। (ত্রিভুজে অঙ্কিত বিভিন্ন পয়েন্টের) দুটি পয়েন্টের মধ্যে অঙ্কিত যেকোনো পরিমাণ একটি অনুপাত তৈরি করবে[৫৬৩]—এই সূত্র আমরা মেনেলাউস[৫৬৪] থেকে নিয়েছি।[৫৬৫]

---

৫৬২. Roger Bacon (১২১৪-১২৯২ খ্রি.) : ইংরেজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। মধ্যযুগে বিজ্ঞানের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত। দৃষ্টিবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের অন্যতম।

৫৬৩. এই সূত্র বুঝতে হলে মেনেলাউস কর্তৃক প্রদত্ত ত্রিভুজের সূত্র (Theorem of Menelaus) জানতে হবে।

মুসলিম মনীষী বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে কালজয়ী গ্রন্থ (الحاوي في الطب) *আল-হাবি ফিত-তিব্ব*-এর রচয়িতা আবু বকর আল-রাযি কী বলেছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তিনি বলেছেন, আমি এই গ্রন্থে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানাবিধ অসংখ্য বিষয় সংকলন করেছি। আমি প্রাচীন চিকিৎসক-দার্শনিকদের মধ্যে হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, আরমাসুস ও অন্যদের গ্রন্থাবলি থেকে তথ্য নিয়েছি এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন নতুন বিষয় সংযোজনকারী, যেমন পল[৫৬৬], আহারোন, হুনাইন ইবনে ইসহাক, ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়াইহ প্রমুখ।[৫৬৭]

আমরা ইসলামি গ্রন্থাগারগুলোতে ভিনদেশি বিজ্ঞানীদের অসংখ্য অনূদিত গ্রন্থ দেখতে পাই। সেগুলো তাদের নামেই অনূদিত হয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা সেসব গ্রন্থে টীকা ও বিশ্লেষণ যুক্ত করেছেন, অথচ মূল বক্তব্যে হাত দেননি। যাতে মূল লেখকের চিন্তাভাবনা অবিকৃতরূপে সুরক্ষিত থাকে। যেমন মুসলিম বিজ্ঞানী আল-ফারাবি অ্যারিস্টটলের *'মেটাফিজিক্স'* *(Metaphysics)* গ্রন্থে টীকা সংযুক্ত করেছেন।

জ্ঞানের সম্মানজনক আমানত সুরক্ষা কার্যতই মুসলিম বিজ্ঞানীদের সুকীর্তি। যেসব মৌলিক নীতি অনুসরণ করে মুসলিমগণ পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের চিন্তার রীতি ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্ঞানের আমানত সুরক্ষা। বিশেষ করে যখন অন্যান্য জাতির সামসময়িক প্রজন্ম তাদের পিতৃপুরুষদের ইতিহাস জানতে আগ্রহী ছিল না, তখন তাদের গবেষণা ও আবিষ্কার চুরি করাটা সহজ ব্যাপারই ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজ্ঞানীরা ছিলেন গভীর নীতিবোধ ও সততার ওপর অধিষ্ঠিত।

---

৫৬৪. Menelaus of Alexandria (৭০-১৪০ খ্রি.) : গ্রিক গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ। মুসলিমগণ গোলাকার কাঠামো মাপতে ও ল্যাবরেটরিতে তার রচনাবলি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। দেখুন, হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ১, পৃ. ১৪২।

৫৬৫. বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাবু মারিফাতি মাসাহাতিল আশকাল*, সম্পাদনা : নাসিরুদ্দিন তুসি, পৃ. ২৫।

৫৬৬. Paul of Aegina (৬২৫-৬৯০ খ্রি.) : বাইজান্টীয় গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী। *Medical Compendium in Seven Books* তার রচিত চিকিৎসা-বিশ্বকোষ।

৫৬৭. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ৭০।

ব্যক্তি-পরিচিতি[৫৬৮]

উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) : ইংরেজ চিকিৎসক ও শারীরবিজ্ঞানী। রক্ত সংবহন বিষয়ে হার্ভের বিখ্যাত গ্রন্থ *'De Motu Cordis'* প্রকাশিত হয় ১৬২৮ সালে। ইউরোপে তিনি ফুসফুসীয় রক্ত সংবহন ও হৃৎপিণ্ড যে পাম্পের মতো কাজ করে তার আবিষ্কর্তা বলে পরিচিত।

মহিউদ্দিন আত-তাতাবি : তিনি জার্মানির ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইবনে নাফিসের ওপর অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ইবনে নাফিস সম্পর্কে অজানা সব তথ্য তিনি আবিষ্কার করেন। তার জন্ম ১৮৯৬ সালে এবং ১৯৪৫ সালে তিনি টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

ম্যাক্স মেয়েরহোফ ১২৯১-১৩৬৪ হিজরি (Max Meyerhof 1874-1945) : জার্মান চক্ষু-চিকিৎসক ও প্রাচ্যবিদ। ইউরোপের বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদদের অন্যতম। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯০৩ সালে মিশর ভ্রমণ করেন এবং কায়রোতে অবস্থান করেন। কায়রোতেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

জর্জ সার্টন (George Sarton 1884-1956) : বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবেত্তাদের অন্যতম। বেলজিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। রসায়নবিদ, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি কার্নেগি ইনস্টিটিউট অব ওয়াশিংটনে গবেষণা সহকারী ছিলেন। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দিয়েছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *হিস্ট্রি অব সাইন্স*।

এমিল ডুর্খেইম (Émile Durkheim 1858-1917) : University of Bordeaux-এ এবং প্যারিসের সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে একটি বিধিবদ্ধ বিদ্যায়তনিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা

---

৫৬৮. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

করেন। পাশ্চাত্যে তিনি ম্যাক্স ওয়েবার, কার্ল মার্ক্সের সঙ্গে একত্রে সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত।

হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা : আবুল বারাকাত হিবাতুল্লাহ ইবনে আলি ইবনে মালকা আল-বালাদি আল-বাগদাদি (৪৮০-৫৬০ হি./১০৮৬-১১৬৫ খ্রি.)। 'আওহাদুয যামান' (যুগের অনন্য) উপাধিতে ভূষিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। পরে বাগদাদ ভ্রমণ করেন। ইহুদি ছিলেন, শেষ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আব্বাসি খলিফা মুসতানজিদ বিল্লাহ ও অন্য খলিফাদের প্রাসাদে কাজ করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

المعتبر في الحكمة، اختصار التشريح من كلام جالينوس، كتاب الأقراباذين، رسالة في العقل وماهيته، كتاب التفسيرا [৫৬৯]

হিপোক্রেটিস Hippocrates of Kos or Hippocrates of Cos II. (৪৬০-৩৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) : তার পিতার নাম Heraclides Ponticus এবং মায়ের নাম Praxitela। কোস দ্বীপের এক পুরোহিত-বৈদ্য পরিবারে তার জন্ম এবং পিতার কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে হাতেখড়ি। তারপর নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে তিনি রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ-নির্ভর তথ্যকে একটি নিয়মাবদ্ধ তাত্ত্বিক কাঠামোয় রূপ দিতে সচেষ্ট হন। এইভাবে তিনি হলেন বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে *'দা প্রগ্নস্টিকস'*, *'অন এয়ারস ওয়াটারস অ্যান্ড প্লেসেস'*, *'অন ফ্র্যাকচারস'*, *'অন সার্জারি'* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তার ছাত্র ও শিষ্যদের লেখা বহু গ্রন্থও তার নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকারণ ফলাফল, পারিবেশিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও নিদানিক পর্যবেক্ষণের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। তার আরেক কালজয়ী কীর্তি হলো চিকিৎসকদের জন্য রচিত শপথবাক্য, যা হিপোক্রেটীয় অনুজ্ঞা নামে পরিচিত এবং ডাক্তাররা আজও পেশায় প্রবেশ করার আগে এই শপথবাক্য পাঠ করে থাকেন। এই অনুজ্ঞা থেকে দায়িত্বসচেতনতা, নীতিবোধ ও মানবিকতার এক চমৎকার উদ্ভাস ঘটে।

---

৫৬৯. দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ৩১৩-৩১৬; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ৭৪।

সব মিলিয়ে পরবর্তী বিজ্ঞান ও বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর তার প্রভাব অনস্বীকার্য।

গ্যালেন (Galen Aelius Galenus or Claudius Galenus 129-200): গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শল্যচিকিৎসক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী। অঙ্গব্যবচ্ছেদবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিকাশ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। তিনি দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও করিন্থ পরিভ্রমণ করে ১৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমে চলে এসে রোমান সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হন। দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে তিনি প্রায় চারশটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেন।

আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) : একজন গ্রিক গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। যদিও তার জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে, তবুও তাকে ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পদার্থবিদ্যায় তার উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে রয়েছে স্থিতিবিদ্যা আর প্রবাহী স্থিতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন ও লিভারের কার্যনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রদান। পানি তোলার জন্য আর্কিমিডিসের স্ক্রু পাম্প, যুদ্ধকালীন আক্রমণের জন্য সিজ ইঞ্জিন ইত্যাদি মৌলিক যন্ত্রপাতির ডিজাইনের জন্যও তিনি বিখ্যাত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তার নকশাকৃত আক্রমণকারী জাহাজকে পানি থেকে তুলে ফেলার যন্ত্র বা পাশাপাশি রাখা একগুচ্ছ আয়নার সাহায্যে জাহাজে অগ্নিসংযোগের পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

হুনাইন ইবনে ইসহাক : আবু যায়দ হুনাইন ইবনে ইসহাক আল-ইবাদি (৮১০-৮৭৩ খ্রি.)। আরব নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টান। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, অনুবাদক, ঐতিহাসিক। ইরাকের হিরার অধিবাসী। খলিফা মামুনের সময়ে অনুবাদ বিভাগের প্রধান ছিলেন। গ্রিক ও ফারসি গ্রন্থাবলি আরবি ও সুরয়ানি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।[৫৭০]

---

৫৭০. দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ১২৮-১৩৭; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৪০৯।

ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়াইহ : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়াইহ বা ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.)। আসিরিয়ান নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টান, চিকিৎসক। ভেষজবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। সুরয়ানি বংশোদ্ভূত ও আরবে বেড়ে ওঠা। খলিফা হারুনুর রশিদ ও মামুনের চিকিৎসক ছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের যুগেও চিকিৎসা করেছেন। ইরাকের সামাররায় ৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে/২৪৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৩]

।। প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।।

---

৫৩. দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ১০৯-১২২; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৪১১।
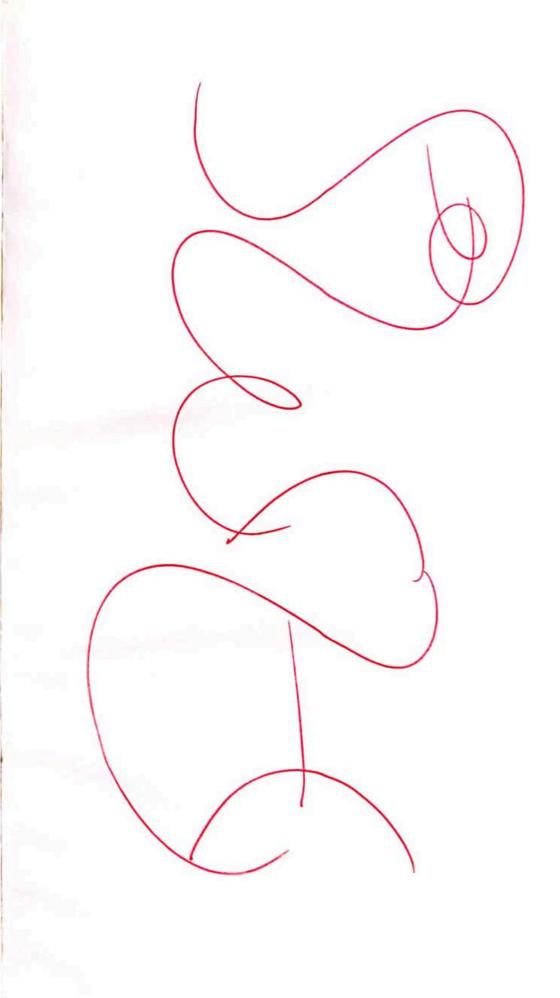
ড. রাগিব সারজানির প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক, যার বেশ কয়েকটি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইন্দোনেশীয়, রুশ ও তুর্কি ভাষায়। বাংলাভাষীদের জন্য ড. রাগিব সারজানির বইগুলো অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেয় মাকতাবাতুল হাসান। এর ধারাবাহিকতায় একে একে প্রকাশ হয়েছে ২৩টি বই। বাকি বইগুলো প্রকাশের পথে।

- আন্দালুসের ইতিহাস (২ খণ্ড)
- ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস (২ খণ্ড)
- তাতারীদের ইতিহাস
- তিউনিসিয়ার ইতিহাস
- উসওয়াতুল লিল আলামিন
- রুহামাউ বাইনাহুম
- ফজর আর করব না কাজা
- মানবীয় দুর্বলতায় নবিজির মহানুভবতা
- ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ
- শিয়া : কিছু অজানা কথা
- শোনো হে যুবক
- আমরা সেই জাতি
- এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান
- কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা
- কুরআন হিফজ করবেন যেভাবে
- তুর্কিস্তানের কান্না
- বয়কট
- পড়তে ভালোবাসি
- কে কিনবেন জান্নাত
- হজ-যে শিক্ষা সবার জন্য
- আমরা আবরাহার যুগে নই
- কে হবে রাসুলের সহযোগী
- ইসলামি ইতিহাস-সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ৫ খণ্ড (ভূমিকা)
- ফিতনার ইতিহাস (প্রকাশিতব্য)
- ছিলেন তিনি দয়াময় সা. (প্রকাশিতব্য)
- প্রাচ্যবিদদের চোখে ইসলাম (প্রকাশিতব্য)

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে ড. রাগিব সারজানির অনবদ্য রচনা। এতে লেখক ইসলামি সভ্যতার বিশ্বজয়ী অবদানগুলোর নানাদিক তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি ২০০৯ সালে (মিশর ধর্মমন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক অ্যাফেয়ার্সের পক্ষ হতে) 'মুবারক অ্যাওয়ার্ড' ফর ইসলামিক স্টাডিজ এবং ২০১৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনূদিত 'শ্রেষ্ঠ বই' পুরস্কারে ভূষিত হয়। ড. রাগিব সারজানির এ গ্রন্থটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার পাশাপাশি পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ইন্দোনেশীয়, মান্দারিন ও রুশ ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত হয়।

মাকতাবাতুল হাসান

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

অনুবাদক পরিচিতি

আবদুস সাত্তার আইনী

পিতা : হাফিজ উদ্দিন মুনশি, **মাতা :** সাহেরা বানু

ঠিকানা : পস্তারী, বড়হিত, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

শিক্ষা : তেরশিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর উত্তরা বাইতুস সালাম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে হিফ্‌জুল কুরআনসহ জালালাইন জামাত পর্যন্ত পড়েন। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর থেকে মিশকাত ও দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। জামিয়া দারুল মা'আরিফ, চট্টগ্রামে উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনা করেন। পুম্বাইল এফ.ইউ. ফাজিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল এবং সরকারি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন : কর্মজীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশে সহসম্পাদক ও বাংলাদেশ ল' রিসার্চ ও লিগ্যাল এইড সেন্টারে রিসার্চ ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

লেখালেখি : ছাত্রাবস্থায় লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকী ও মাসিক পত্রিকাগুলোতে লিখেছেন। অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২ এবং মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ২।
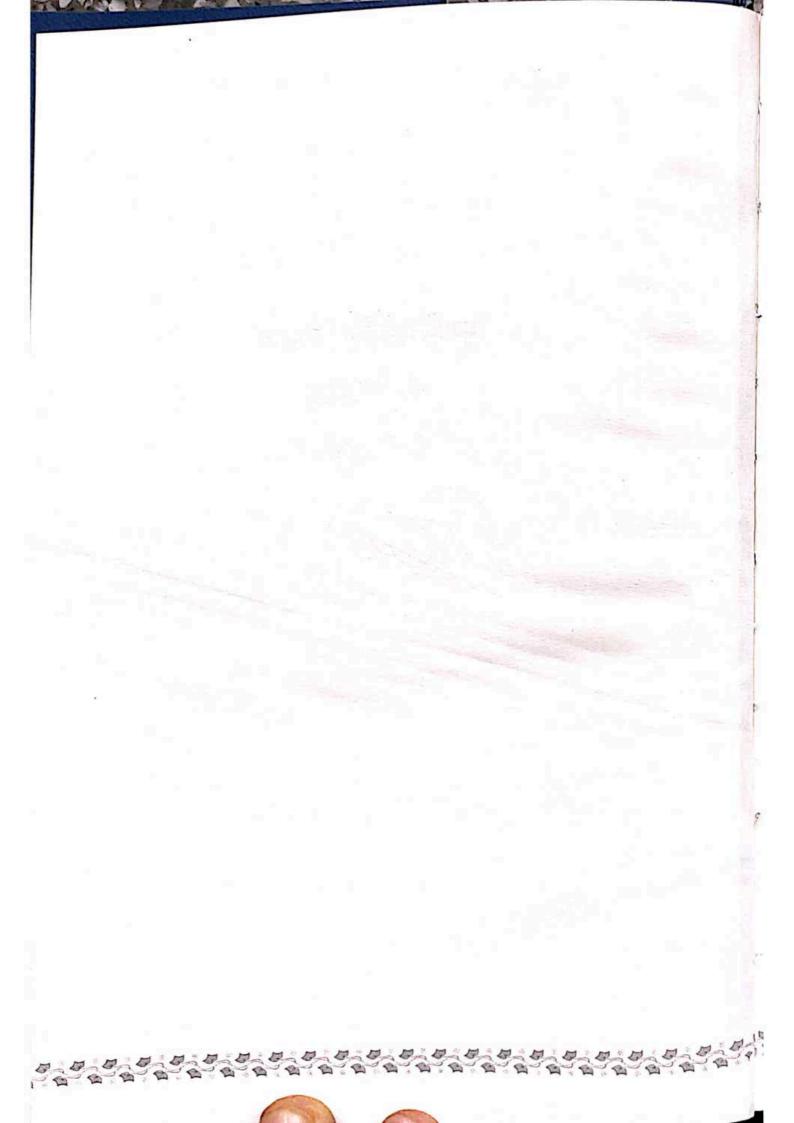
ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (২য় খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২/ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-64-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২৯০০/- টাকা মাত্র [চার খণ্ড একত্রে]

MuslimJati Bisshoke ki Diyece (2nd Part)
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

* * *

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।[১]

* * *

১. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪।

সূচিপত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় গ্রন্থাগার

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানী-সমাজ

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখাগুলোর বিকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

পঞ্চম অধ্যায়

আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন

চিত্র সূচি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ইসলামি সভ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সহায়তা করেছে। নাগরিক জীবনের সর্বস্তরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। মক্তব থেকে শুরু করে উচ্চ বিদ্যায়তন পর্যন্ত সবকিছুই ছিল। ইসলামি বিশ্বে ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মানমন্দির ও বড় বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল গবেষণা, পাঠদান ও মৌলিক লেখালেখির কেন্দ্র।

কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের আবির্ভাবটাই ছিল প্রকৃত অর্থে জ্ঞানবিপ্লব। কারণ তখনকার পরিবেশ জ্ঞান-প্রাণের অনুকূল ছিল না এবং উপযোগীও ছিল না। সেই পরিবেশ এতটাই শোচনীয় ছিল যে, কুরআনের প্রথম বাণীগুলো অবতীর্ণ হওয়ার আগের সময়টা জাহিলিয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামপূর্ব যুগটা ছিল অজ্ঞতা ও অন্ধকারের। তারপর ইসলাম এলো এবং জ্ঞানের অভিযাত্রা শুরু হলো, দুনিয়া ঐশী পথপ্রদর্শনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

ইসলামের আবির্ভাবের শুরুটাই হয়েছে কুরআন নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান শিক্ষার প্রতি আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। রিসালাত বা নবুয়ত ইসলামের নিদর্শন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে শুরু হয়নি। অর্থাৎ, বিশেষ অর্থে নামায, রোযা, হজ, যাকাতের আহ্বান জানায়নি। তা ইসলামের রুকন ও ভিত্তিসমূহের আলোচনার আহ্বান জানিয়েও শুরু হয়নি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও লেনদেন-নীতি, রাজনৈতিক জীবনের কাঠামো ও উপাদান, নৈতিক মূল্যবোধের বিবরণ, এমনকি আকিদার মূলনীতির আলোচনার দ্বারাও তার সূচনা ঘটেনি, বরং তার সূচনা হয়েছে এ

সবকিছুর চাবি ও সবকিছুর কেন্দ্রীয় বিষয়ের দ্বারাই—ইক্‌রা, পড়ো।[২]

সুতরাং শিক্ষার স্থান বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিকল্প ছিল না। এখানে শিক্ষার্থীরা শাইখ ও জ্ঞানীদের সাহচর্য পেয়েছে, তাদের থেকে দীক্ষা নিয়েছে এবং পরিতৃপ্ত হয়েছে। এসব স্থানে জ্ঞানবিজ্ঞান, আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মজলিস বসেছে। সেই পরিবেশে জ্ঞান-জীবন ছিল সজীব ও সতেজ। পরবর্তী আলোচনায় এমন কিছু শিক্ষাস্থান বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি আলোকপাত করব যেগুলো ইসলামি সভ্যতায় ছিল মৌলিক শিক্ষাকেন্দ্র।

প্রথম অনুচ্ছেদ : মক্তব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মসজিদ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মাদরাসা বা বিদ্যালয়

---

২. কুতুব মুস্তাফা সানু, *আন-নুযুমুত তালিমিয়্যাতুল ওয়াফিদাহ ফি ইফরিকা কিরাআতুন ফিল-বাদিলিল হাদারি*, পৃ. ১৭।

প্রথম অনুচ্ছেদ

মক্তব

মক্তব মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। কথিত আছে, আরবরা ইসলামপূর্ব কাল থেকেই মক্তবের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তবে তা ছিল অত্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ। হিজরি প্রথম শতকগুলোতে মক্তবের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কারণ মক্তবেই উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন হতো। মক্তব ছিল আমাদের আধুনিক যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো এবং সংখ্যায় ছিল প্রচুর। ইবনে হাওকাল[৩] জরিপ করেছেন যে, সিসিলির একটিমাত্র শহরেই তিনশ মক্তব ছিল।[৪]

মক্তব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শিশুদেরকে পড়া ও লেখা শেখানো এবং তাদের কুরআন হিফয করানো। এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। বদর যুদ্ধের পরে তিনি মুশরিক বন্দিদের নির্দেশ দেন যে, তাদের প্রত্যেকে দশজন বালককে লেখা শেখাবে। এই বিনিময়ে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই সময় একদল আনসারি বালকের সঙ্গে যায়দ ইবনে সাবিতও লেখা শেখেন।[৫]

মক্তবে শিশুরা আরবি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান শিখত। বিশেষ করে যখন তারা স্লেটে কুরআনুল কারিমের আয়াত বা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস লিখত। মহান সাহাবি আনাস ইবনে মালিক রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলির (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে মক্তবের শিক্ষকগণ

---

৩. ইবনে হাওকাল : আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে হাওকাল (মৃত্যু : ৩৫০ হিজরি)। পর্যটক, ভূগোলবিশারদ, ইতিহাসবিদ। তার উল্লেখযোগ্য কাজ হলো আবু ইসহাক আল-ইসতাখরির *'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক'* গ্রন্থের সম্পাদনা, পরিমার্জন ও টীকা সংযোজন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ১১১।

৪. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০০।

৫. সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ৩, পৃ. ১৩৫।

(আদব শিক্ষাদাতারা) কেমন ছিলেন? তিনি বললেন, মক্তবের শিক্ষকের একটি পাত্র থাকত। প্রত্যেক শিশু পালাক্রমে প্রতিদিন পরিষ্কার পানি নিয়ে আসত এবং ওই পাত্রে রাখত। এই পানি দিয়ে তারা স্লেট মুছত। শিশুরা মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ত এবং ওই পানি গর্তে ঢাললে তা শুকিয়ে যেত। লেখার কালি কি হাত-পায়ে লেগে যেত না? জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। লেখার কালি তারা পা দিয়ে মুছত না, বরং রুমাল দিয়ে বা এরকম কিছু দিয়ে মুছত।[৬]

সেই যুগের শিশুদের অন্তরে আরবি হরফের প্রতি যে কী সম্মান ছিল তা উপর্যুক্ত উজ্জ্বল চিত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন তারা ইলাহি ওহি (কুরআনের আয়াত) লিখত। তারা তা মোছার জন্য পবিত্র পানি আনত, মাটিতে গর্ত খনন করত এবং শুকিয়ে যাওয়ার জন্য তাতে ওই পানি ঢেলে দিত।[৭]

মক্তবের বহু শিক্ষক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং তাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফি[৮] একটি মক্তবে শিক্ষক ছিলেন। শিশুদের পড়াতেন এবং বিনিময়ে তারা তাকে রুটি দিত।[৯] দাহহাক ইবনে মুযাহিমের ব্যাপারে এটা বিদিত যে, তিনি কুফার একটি মক্তবে শিশুদের আদব শিক্ষাদাতা ছিলেন। তার কাছে ছিল তিন হাজার শিশু।[১০]

ইয়াকুত হামাবি[১১] *'মুজামুল উদাবা'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবুল কাসিম বালখির মক্তবে তিন হাজার ছাত্র ছিল। তার মক্তবটি ছিল বিশাল, তিন

---

৬. ইবনে সাহনুন, *আদাবুল মুআল্লিমিন*, পৃ. ৪০-৪১।
৭. আকরাম উমারি, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ*, পৃ. ২৮১।
৮. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফি : আবু মুহাম্মাদ আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইবনুল হাকাম আস-সাকাফি (৪০-৯৫ হি./৬৬০-৭১৪ খ্রি.)। সেনাপতি, খতিব। খলিফা আবদুল মালিক তাকে প্রথমে মক্কা, মদিনা ও তায়েফের গভর্নর এবং পরে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। মৃত্যুবরণ করেন ওয়াসিতে (কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী জায়গায়)। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১১, পৃ. ২৩৬-২৪১; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ১৬৮।
৯. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ৩০।
১০. যাহাবি, *আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার*, খ. ১, পৃ. ৯৪।
১১. ইয়াকুত হামাবি : আবদুল্লাহ ইবনে শিহাবুদ্দিন ইয়াকুত ইবনে আবদুল্লাহ আর-রুমি (৫৭৪-৬২৬ হি./১১৭৮-১২২৯ খ্রি.)। গ্রহণযোগ্য ইতিহাসবিদ। ভূগোলবিদদের অন্যতম পথিকৃৎ। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : معجم البلدان، إرشاد الأريب، معجم الأدباء।

হাজার ছাত্রের জায়গা সংকুলান হতো। এ কারণে মক্তবের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘোরা এবং সব ছাত্রের তদারকির জন্য বালখির গাধায় চড়ার প্রয়োজন পড়ত।[১২]

বড় বড় ফকিহ ও আলেমগণের অনেকেই শৈশবে মক্তবে পড়াশোনা করেছেন। ইমাম শাফিয়ি রহ. তার শৈশবে মক্তবে পড়াশোনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মায়ের কোলে থাকতেই এতিম হয়েছিলাম। তিনি আমাকে মক্তবে পাঠালেন। মক্তবে কুরআন খতমের (হিফযের) পর মসজিদে দরসে বসতে শুরু করলাম। আমি আলেমদের সঙ্গে ওঠাবসা করতাম।[১৩]

শাম বিজিত হওয়ার পর সেখানে দ্রুত মক্তবের বিস্তার ঘটে। বিজয়ীদের সন্তানেরা সেখানে পড়াশোনা করে। আদহাম ইবনে মুহরিয বাহিলি হিমসি[১৪] বলেন, আমি হিমসে জন্মগ্রহণকারী মুসলিমদের প্রথম সন্তান। আমিই প্রথম সন্তান যে কুরআনের লিখিত কপি বহন করে নিয়ে যেত। আমি বিভিন্ন মক্তবে গিয়েছি এবং কুরআন শিখেছি।[১৫] তখন মক্তবে আরও যারা পড়তেন তাদের মধ্যে ছিলেন বসরার বিখ্যাত কাজি ইয়াস ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানির শিশুপুত্র।[১৬]

পিতারা সবসময় চাইতেন যে তাদের সন্তানেরা ভালো শিক্ষকের কাছে যাক। শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ রকম শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান আবুল গানাইম (মৃ. ৫৪৪ হি.)। তার সম্পর্কে ইবনে আসাকির বলেছেন, তিনি শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানে ব্রতী হন। এই ক্ষেত্রে তার উত্তম প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভালো শিক্ষকতা ও গণিতে পারদর্শিতার কারণে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তার ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যায়।[১৭]

দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৬, পৃ. ১২৮।

১২. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল উদাবা*, খ. ১, পৃ. ৪৯১।

১৩. ইবনে আবদুল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদলিহ*, খ. ১, পৃ. ৪৭৩।

১৪. আদহাম ইবনে মুহরিয ইবনে উসাইদ আল-বাহিলি (১০০ হি./৭১৮ খ্রি.)। তাবিয়ি, অশ্বারোহী যোদ্ধা, বিশিষ্ট সেনাপতি। হিমসের কবি। শামের অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধা। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২৮২।

১৫. ইবনে বাদরান, *তাহযিবু তারিখি দিমাশক লি-ইবনি আসাকির*, খ. ২, পৃ. ৩৬৭।

১৬. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮০।

১৭. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৫৮, পৃ. ৭৪।

আমির ও খলিফাগণ শিক্ষকদের ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীদের সম্মান করতেন। তাদের দেখে সম্মানার্থে বাহন থেকে নেমে পড়তেন। এই কারণে শিক্ষকেরা সর্বস্তরের মানুষ থেকে প্রচুর সম্মান পেতেন। একবার খলিফা হারুনুর রশিদ ইমাম মালিক রহ.-কে ডেকে লোক পাঠালেন। যাতে খলিফার দুই ছেলে আমিন ও মামুন তার থেকে হাদিস শুনতে পারে। ইমাম মালিক অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, ইলমের কাছে সবাই আসে, ইলম কারও কাছে যায় না। খলিফা হারুন দ্বিতীয়বার লোক পাঠালেন। বললেন, আমি আপনার কাছে আমার দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দেবো, তারা আপনার ছাত্রদের সঙ্গে হাদিস শুনবে। ইমাম মালিক বললেন, তাহলে শর্ত এই যে, তারা মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে এসে বসবে না। বরং মজলিসে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসবে। খলিফা-পুত্রদ্বয় বর্ণিত শর্ত মেনে হাদিসের দরসে উপস্থিত হতো।[১৮]

মক্তবের শিক্ষাবিস্তারে প্রাথমিক যুগ থেকেই নারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। তাবিয়ি আবদু রাব্বিহি ইবনে সুলাইমান বলেছেন, উম্মুদ দারদা রা. যে স্লেটে আমাকে পড়ালেখা শেখাতেন তাতে লিখে দিলেন, তোমরা শৈশবে জ্ঞান শেখো এবং বড় হয়ে সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করো। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেকে ভালো বা মন্দ যে বীজ বপন করে তারই ফসল সংগ্রহ করে।[১৯]

ইসলামি বিশ্বে মক্তবে শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্যসূচি একইরকম ছিল না। বিভিন্ন স্থানে তা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যদিও সব জায়গায় পাঠ্যসূচিতে কুরআনুল কারিম, পাঠ ও লেখা, ইতিহাস ও কাহিনি, প্রাথমিক দ্বীনি হুকুম-আহকাম, কবিতা, প্রাথমিক গণিত, আরবি ভাষার ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মক্তবে শিশুদের বড়জোর পাঁচ-ছয় বছর পড়ালেখা করতে হতো। তারা পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে মক্তবে ভর্তি হতো। শিশুরা এই সময়ের মধ্যে পুরো কুরআন হিফয করত। কেউ কেউ অধিকাংশ সুরা বা কিছু সুরা হিফয করত। মক্তবে শিশুদের শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে এবং কুরআন হিফয

---

[১৮]. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৮, পৃ. ২৬৯।

[১৯]. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৭০, পৃ. ১৫৮।

সমাপ্ত হলে শিক্ষকেরা তাদের পরীক্ষা নিতেন এবং যাচাই-বাছাই করতেন। পরীক্ষা শেষ হলে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো।[২০]

শিশুদের শিক্ষাদান ও শিষ্টাচার শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের বড় বড় ফকিহ ও লেখক শিশুদের শিক্ষাদানের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা শিক্ষাদানের সেসব নীতি প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন যেগুলো শিক্ষকদের ও পিতাদের তাদের সন্তানদের শিক্ষাদান করতে সহায়ক হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালি রহ.[২১] তার অতি মূল্যবান গ্রন্থ *'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন'*-এ بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم (প্রাথমিক বেড়ে-ওঠার সময়ে শিশুদের প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি এবং তাদের শিষ্টাচার ও চরিত্র গঠনের উপায়) শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, জেনে রাখো, শিশুদের প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। শিশুরা তাদের মা-বাবার কাছে আমানত। তাদের অন্তর স্বচ্ছ নির্মল মুক্তোর মতো, তাতে কোনো দাগ নেই, কোনো চিহ্ন নেই। তাদের অন্তরে যা অঙ্কন করা হবে তারই জন্য প্রস্তুত। তাদের অন্তরকে যেদিকে ঝোঁকানো হবে সেদিকেই ঝুঁকবে। তাদের যদি যা-কিছু ভালো তার ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হয় এবং ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়, তারা তারই ওপর বেড়ে উঠবে। এতে দুনিয়াতেও সৌভাগ্যবান হবে, আখিরাতেও হবে। তাদের সওয়াবের অংশীদার যেমন তাদের মা-বাবারা হবে, তেমনই তাদের প্রত্যেক শিক্ষক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীও অংশীদার হবে। কিন্তু তাদের মন্দের ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হলে এবং জন্তুজানোয়ারের মতো অবহেলা দেখানো হলে তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে এবং ধ্বংস হবে। এই পাপ তাদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল সবাইকে বহন করতে হবে।[২২]

---

২০. রহিম কাযিম আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, ১৪৭-১৪৯।

২১. আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গাযালি আত-তুসি (৪৫০-৫০৫ হি./১০৫৮-১১১১ খ্রি.)। উপাধি : হুজ্জাতুল ইসলাম। শাফিয়িপন্থী ফকিহ। সুফিবাদী দার্শনিক। খুরাসানের তাবুরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২১৬-২১৮; আস-সুবকি, *তাবাকাত আশ-শাফিয়িয়্যাহ*, খ. ৬, পৃ. ১৯১-২১১।

২২. ইমাম গাযালি, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খ. ৩, পৃ. ৭২।

মক্তবের এ সকল শিক্ষক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলও তারা পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আসীন হয়েছিলেন, এমনকি মন্ত্রীও হয়েছিলেন। ইসমাইল ইবনে আবদুল হামিদ শিশুদের পড়াতেন। পরে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং তিনি মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের মন্ত্রী মনোনীত হলেন।[২৩] হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফিও মক্তবের শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের প্রভাবশালী মন্ত্রী হন।

মক্তবের অধিকাংশ শিক্ষক শিশুদের শিক্ষাদানের অনুরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শাইখ আবু আবদুল্লাহ আত-তাওয়াদি (মৃ. ৫৮০ হি.) যা করতেন তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি মরক্কোর ফাস শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শিশুদের শিক্ষাদান করতেন। ধনী শিশুদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন এবং দরিদ্র শিশুদের তা দিয়ে দিতেন![২৪]

মক্তবের কর্মঘণ্টা বা পাঠদানের সময়সীমা প্রাকৃতিক উপায়ে নির্ণীত হতো। সূর্যোদয়ের পর থেকে পাঠদান শুরু হতো এবং আসরের আজান পর্যন্ত চলত। সূর্যোদয়ের সময়ের কমবেশির ফলে পাঠদানের সময়েরও কমবেশি হতো।[২৫]

শিশুরা মসজিদেও শিক্ষাগ্রহণ করত। তবে সেটা সুশৃঙ্খলভাবে হয়নি। শিশুদের কারণে মসজিদে হইচই-চিৎকার বেড়ে গিয়েছিল। ফলে ৪৮৩ হিজরিতে শিশুদের শিক্ষকদের ব্যাপারে এই ফতোয়া চাওয়া হলো যে তারা যেন মসজিদে শিশুদের শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকেন। এতে মসজিদ সুরক্ষিত থাকবে। ফলে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ফতোয়া জারি করা হলো।[২৬]

মক্তবে পাঠদানের মাঝে মাঝে বিশ্রাম এবং ছুটির ব্যবস্থাও ছিল। পড়াশোনায় ক্লান্তি এসে গেলে শিশুদের বিশ্রামদানের ব্যাপারে মুসলিমরা গুরুত্ব দিতেন। এমনটাই পরিলক্ষিত হয়। ইবনুল হাজ আল-আবদারি (মৃ. ৭৩৭) মরক্কোর ফাস শহরের অধিবাসী ও মালেকি মাযহাবপন্থী

---

২৩. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ৬০।

২৪. আবুল আব্বাস আন-নাসিরি, *আল-ইসতেকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, খ. ২, পৃ. ২১০।

২৫. হাসান আবদুল আল, *আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি*, পৃ. ১৮৫।

২৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ১৬৮।

আলেম ছিলেন। তিনি বলেছেন, শিশুদের বিশ্রামদান মুস্তাহাব। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«رَوِّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ»

তোমরা আত্মাকে কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম দাও।[২৭]

তাই মক্তবের শিশুরা প্রতি জুমআয় (প্রতি সপ্তাহে) দুই দিন বিশ্রাম পেত, যাতে তারা সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে উদ্যমের সঙ্গে পড়াশোনা করতে পারে।[২৮] তা ছাড়া দুই ঈদের দিনগুলোতে ছুটি থাকত, কেউ অসুস্থ হলেও ছুটি পেত। শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল। বৃষ্টিবাদল ও ঝড়তুফানের সময়ও ছুটি হতো।

মক্তবের শিক্ষকের হঠাৎ কোনো ব্যস্ততা চলে এলে বা ছুটির প্রয়োজন হলে তাকে তার সমকক্ষ একজন ব্যক্তিকে রেখে যেতে হতো, যিনি তার অনুপস্থিতিতে শিশুদের পাঠদান করতেন। অনুপস্থিতি দীর্ঘ সময়ের জন্য না হলে এটা করা যেত...। শিক্ষক কোনো সফরে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত একজনকে রেখে যেতে হতো, যিনি তার পরিবর্তে সব দায়িত্ব পালন করতেন। অর্থাৎ, কাছাকাছি জায়গায় একদিন বা দুইদিন বা এরকম কয়েকদিনের আবশ্যক সফর হলে এটা করা যেত। আল্লাহ চাহে তো শিক্ষকের এই অনুপস্থিতি মক্তবের শিশুদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলত না। কিন্তু দূরবর্তী স্থানের সফর হলে অথবা নানা কারণে সফর বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা করলে শিক্ষক তা করতে পারতেন না।[২৯]

দামেশকে শিশুশিক্ষা কতটা পদ্ধতিগত উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে জুবায়ের[৩০]। তিনি তার ভ্রমণকাহিনিতে তা বিস্তারিত

---

[২৭]. *মুসনাদুশ শিহাব কুদায়ি*, হাদিস নং ৬২৯; আল-ইসফাহানি, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ. ৩, পৃ. ১০৪। *মুসলিমে* বর্ণিত, يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً—'হে হানযালা, কিছুক্ষণ পরপর নিজেকে বিশ্রাম দাও।' হাদিসটি এই হাদিসের সমার্থক। কিতাব : আত-তাওবা, বাব : ফাদ্‌লু দাওয়ামিয যিক্‌র ওয়াল-ফিক্‌র ফি উমুরিল আখিরাহ, হাদিস নং ২৭৫০।

[২৮]. ইবনুল হাজ আল-আবদারি, *আল-মাদখাল*, খ. ২, পৃ. ৩২১।

[২৯]. হাসান হাসানি আবদুল ওয়াহহাব, *মুকাদ্দিমাতু কিতাবি আদাবিল মুআল্লিমিন*, পৃ. ৫৭; আলি ইবনু নায়িফ শাহুদ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া-আমালিল মুসতাকবাল*, পৃ. ৩৮।

[৩০]. ইবনে জুবায়ের : আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে জুবায়ের আল-উন্দুলুসি (৫৪০-৬১৪ হি./ ১১৪৫-১২১৭ খ্রি.)। সাহিত্যিক, পর্যটক। তিন দফা প্রাচ্য ভ্রমণ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে *'রিহলাহ ইবনে জুবায়ের'* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি স্পেনের

বলেছেন, এই সকল প্রাচ্যীয় দেশে শিশুদের কুরআনশিক্ষা পুরোটাই তালকিন[৩১] ভিত্তিক। কবিতা ও অন্যান্য বিষয় লিখিয়ে তারা হস্তাক্ষর শিখিয়ে থাকেন। কিন্তু কুরআনের আয়াত লিখিয়ে শিশুদের হস্তাক্ষর শেখান না, কারণ তা রেখে দিতে হয় অথবা মুছে ফেলতে হয়। অধিকাংশ এলাকায় তালকিনকারী এবং হস্তাক্ষর শিক্ষাদানকারী আলাদাভাবে শিশুদের শিখিয়ে থাকেন। ফলে তালকিন (কুরআন শেখানো) ও হস্তাক্ষর শেখানোর আলাদা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে তাদের চমৎকার পদ্ধতি রয়েছে। এ কারণে শিশুরা সুন্দর হস্তাক্ষর শিখে থাকে। কারণ, যে শিক্ষক হস্তাক্ষর শিখিয়ে থাকেন তিনি আর কিছুতে ব্যস্ত হন না। হস্তাক্ষর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই তারা সব শ্রম ব্যয় করেন। শিশুরা পড়াশোনাতেই ব্যস্ত থাকে। এটা তাদের জন্য সহজও বটে। কারণ তারা আক্ষরিক অর্থে শিক্ষকদের অনুসরণ করে থাকে।[৩২]

সুতরাং মক্তবে শিশুশিক্ষা একটি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিভাজন মুসলিমদের জানাই ছিল। তারা প্রতিটি বিষয়ের জন্য ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। বরং প্রাচ্যবাসীরা তাদের সন্তানদের হস্তাক্ষর সুন্দর করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। এ দিকেই ইবনে জুবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং একে ইসলামি প্রাচ্যের শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে জুবায়ের শিশুশিক্ষার যে পদ্ধতি ও রীতির উল্লেখ করেছেন প্রাচ্যে শিশুশিক্ষা সেই পদ্ধতি ও রীতি অনুসরণ করেই এগিয়ে চলছিল। ইবনে জুবায়ের যে মন্তব্য করেছেন, ইবনে বতুতাও[৩৩] দেড়শ বছরের বেশি পরে

ভ্যালেন্সিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৩১৯-৩২০।

৩১. তালকিন : শিক্ষক উচ্চৈঃস্বরে পড়েন, ছাত্ররা তা শুনে শুনে পড়ে।

৩২. ইবনে জুবায়ের : *রিহলাহ ইবনে জুবায়ের*, পৃ. ২৪৫।

৩৩. ইবনে বতুতা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আত-তানজি (৭০৩-৭৭৯ হি./১৩০৪-১৩৭৭ খ্রি.)। পর্যটক, ইতিহাসবিদ। মরক্কোর তাঞ্জিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। মারাকেশে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে বতুতা সারা জীবন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পৃথিবী ভ্রমণের জন্যই তিনি মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন। একুশ বছর বয়স থেকে শুরু করে জীবনের পরবর্তী ৩০ বছরে তিনি প্রায় ৭৫,০০০ মাইল (১,২১,০০০ কি.মি.) পথ পরিভ্রমণ করেছেন। তিনিই একমাত্র পরিব্রাজক যিনি তার সময়কার সমগ্র মুসলিমবিশ্ব ভ্রমণ করেছেন এবং তৎকালীন সুলতানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বর্তমান পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করে মিশর, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, কাজাকিস্তান,

তার বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনিতে প্রাচ্যের শিক্ষা সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছেন। তিনি দামেশকের মসজিদে উমাইয়ার শিক্ষকদের সম্পর্কে বলেছেন, এই মসজিদে একদল শিক্ষক রয়েছেন যারা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেন। তাদের এক-একজন মসজিদের এক-একটি খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসেন এবং শিশুদের কুরআন তালকিন করান, তাদের থেকে কুরআন পাঠ শোনেন। শিশুরা আল্লাহর কিতাবের সম্মানার্থে তাদের স্লেটে কুরআনের আয়াত লেখে না। শিক্ষক কুরআন পাঠ করেন, শিশুরা তা শুনে শুনে পড়ে।[৩৪] হস্তাক্ষরের শিক্ষক ও কুরআনের শিক্ষক ভিন্ন। যিনি হস্তাক্ষর শেখান তিনি কুরআন শেখান না। কবিতা ও অন্যান্য বাক্য দিয়ে তাদের হস্তাক্ষর শেখান। শিশুরা কুরআন শেখার পর হস্তাক্ষর শিখতে যায়। এতে তাদের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হয়। কারণ, যিনি হস্তাক্ষর শেখান তিনি আর কিছু শেখান না।[৩৫]

লক্ষণীয় যে, শিশুরা মসজিদে কুরআনুল কারিম শিখত। তারপর তারা হস্তাক্ষর ও লেখার দরসে যেত। হস্তাক্ষর-শিক্ষকের কাছে শুদ্ধ লেখা ও পাঠ শিখত।

প্রহার ও মারধর করে শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যাপারে ফকিহগণ বিশেষ নীতি ও নির্দেশনা দিয়েছেন। মুসলিমরা সূচনাকাল থেকে শিশুদের শিক্ষা ও শিষ্টাচার শেখানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ইবনে মুফলিহ আল-মাকদিসি (মৃ. ৭৬৩ হি.) *'আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ'* গ্রন্থে বলেছেন, আবু আবদুল্লাহকে (ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল) শিক্ষক কর্তৃক শিশুদের প্রহার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তাদের অপরাধের মাত্রা অনুপাতে প্রহার করা যেতে পারে। শিক্ষক যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন প্রহার না করতে এবং যে শিশুরা ছোট ও অবুঝ তাদের প্রহার করবেন না।[৩৬]

অসংখ্য ফকিহ ও আলেম শিশুদের প্রহারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন না করতে শিক্ষকদের সতর্ক করেছেন। শিশুদের সঙ্গে রূঢ়

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীন ভ্রমণ করেছেন তিনি।-অনুবাদক। যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৩৫।

[৩৪]. অর্থাৎ, তালকিনের দ্বারা কুরআন শেখে।

[৩৫]. ইবনে বতুতা, *রিহলাহ ইবনে বতুতা*, পৃ. ৮৭।

[৩৬]. ইবনে মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শারইয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৬১।

আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল-আবদারি বলেছেন, এই যুগে (হিজরি অষ্টম শতক) কিছু শিক্ষক যা করছেন তা সম্পূর্ণ পরিহার করা উচিত। তারা শিশুদের প্রহার করতে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। যেমন শুকনো কাঠবাদামের লাঠি, খেজুরগাছের পাতাহীন ডাল, নুওবি[৩৭] চাবুক, দুই মাথায় রশিযুক্ত মোটা লাঠি ইত্যাদি। তারা নিজেরাও নতুন জিনিস উদ্ভাবন করেছেন। আরও অনেক কিছু। অথচ যারা পবিত্র কুরআন বহন করে তাদের জন্য কিছুতেই এগুলো উপযোগী নয়। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ فَكَأَنما أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُوْحَى إِلَيْهِ»

> যে কুরআন হিফয করেছে তার দুই কাঁধের মাঝখানে যেন নবুয়ত প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও তার নিকট ওহি প্রেরিত হয় না।[৩৮]

শিক্ষক তাদেরকে কুরআন হিফয যেমন করাবেন, তেমনই তাদের হস্তাক্ষর ও আয়াত বের করাও শেখাবেন। এতে তাদের হিফয ও বোধগম্যতার ওপর দখল বাড়বে। গ্রন্থ পাঠ ও মাসআলা-মাসায়েল বোঝার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত সহায়ক উপায়।[৩৯]

মক্তবের দায়দায়িত্ব কেবল শিশুদের পরিচর্যা ও শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকাও পালন করত। মক্তব ও সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা প্রতিবন্ধকতার কোনো সুযোগ রাখেননি মুসলিমরা। সমাজের সঙ্গে মক্তবের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল এবং মক্তব সমাজের দৈনন্দিন জীবনে অংশগ্রহণ করত।

জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের উপকার সাধনকারী কোনো বড় আলেম বা কর্মে ও চিন্তায় দেশের কল্যাণকারী কোনো রাষ্ট্রপ্রধান অথবা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী কোনো আমির মারা গেলে মক্তবগুলো ছুটি ঘোষণা করত এবং তাদের দাফনের দিন কোনো পড়ালেখা হতো না। মক্তবগুলো

---

৩৭. নুওবাহ : মিশরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি এলাকা।

৩৮. হাদিসটি এই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে : «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه» *মুসনাদে হাকিম*, হাদিস নং ২০২৮। তিনি বলেছেন, এটা সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তা সংকলন করেননি।

৩৯. ইবনুল হাজ আল-আবদারি, *আল-মাদখাল*, খ. ২, পৃ. ৩১৭।

এভাবে সাধারণ শোকে অংশগ্রহণ করত, সমবেদনা প্রকাশ করত এবং সৎ মানুষের কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত।[৪০]

মিশরের গভর্নর আহমাদ ইবনে তুলুনের[৪১] অসুস্থতা তীব্র হয়ে উঠলে এবং জ্বালা-যন্ত্রণা বেড়ে গেলে শিক্ষকেরা শিশুদের নিয়ে মরুভূমিতে বেরিয়ে পড়েন এবং তার আরোগ্যের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন।[৪২]

সমাজের সাধারণ সমস্যায় এবং বিপদে-দুর্যোগে মক্তবের শিশুরাও অংশগ্রহণ করুক তা আন্তরিকভাবে চাইতেন শিক্ষকেরা। ইবনে সাহনুন[৪৩] বলেছেন, মানুষ খরায় আক্রান্ত হলে এবং ইমাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলে মক্তবের শিক্ষকেরা যেসব শিশু নামায জানে তাদের নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। আল্লাহর কাছে কাকুতিমিনতি করে বৃষ্টি চাইতেন। আমার কাছে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা ওয়া আলাইহিস সালাম)-এর কওম শাস্তির মুখোমুখি হলে তারা শিশুদের নিয়ে ময়দানে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের নিয়ে আল্লাহর কাছে অনুনয় করে কেঁদেকেটে প্রার্থনা করে।[৪৪]

মক্তবের শিশুদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম যে গুরুত্ব দিয়েছেন তা দৃষ্টি এড়ায় না। তারা অসুস্থ শিশুকে তার সহপাঠীদের থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যাতে অন্যদের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে না পড়ে। ইবনুল হাজ আল-আবদারি বলেছেন, মক্তবে থাকা অবস্থায় কোনো শিশু যদি চোখের যন্ত্রণা বা শারীরিক সমস্যা ও অসুস্থতার কথা জানায় এবং জানা যায় যে সে সত্যই বলছে, তাহলে শিক্ষক তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে

---

৪০. হাসান হাসানি আবদুল ওয়াহহাব, *মুকাদ্দিমাতু কিতাবি আদাবিল মুআল্লিমিন*, পৃ. ৫৭।

৪১. আহমাদ ইবনে তুলুন (মৃ. ২৭০ হিজরি) ছিলেন শাম, উপকূলীয় এলাকা ও মিশরের গভর্নর। আল-মু'তায বিল্লাহ তাকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। ইবনে তুলুন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, বদান্য, সাহসী, বিনয়ী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। সব কাজ তিনি নিজে আঞ্জাম দিতেন, প্রজাদের খোঁজখবর করতেন, জ্ঞানীদের ভালোবাসতেন। দেশে সমৃদ্ধিসাধন করেছিলেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১, পৃ. ৮৭০।

৪২. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৫, পৃ. ৭৩।

৪৩. ইবনে সাহনুন : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস সালাম (সাহনুন) ইবনে সাইদ ইবনে হাবিব আত-তানুখি (২০২-২৫৬ হি./৮১৭-৮৭০ খ্রি.)। মালিকি ঘরানার ফকিহ, তার্কিক। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২০৪।

৪৪. ইবনে সাহনুন, *আদাবুল মুআল্লিমিন*, পৃ. ১১১।

দেবেন। তাকে মক্তবে বসিয়ে রাখবেন না।[৪৫] এতে শিশুটির পরিবার তার সেবাযত্নের সুযোগ পাবে এবং চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলবে। তা ছাড়া সে মক্তবে থেকে গেলে শিশুদের মধ্যে রোগের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মক্তবের শিক্ষকেরা শিশুদেরকে ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে খোলা খাবার বা মিষ্টান্ন খেতে দিতেন না। কোনো ফেরিওয়ালাকে মক্তবের সামনে শিক্ষকেরা দাঁড়াতে দিতেন না এবং শিশুদের কাছে কিছু বিক্রি করতেও দিতেন না। কারণ, ফেরিওয়ালাদের থেকে কিছু কিনে খেলে শারীরিক সমস্যা হতে পারে।[৪৬] বরং তারা শিশুদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে, প্রতি মাসে একজন ডাক্তার এসে মক্তবের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন।[৪৭]

ইসলামি সভ্যতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই শিশুদের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ এই সভ্যতা বড় ও ছোটর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। বরং ছোটদের প্রতিই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এটা জানা কথা যে, আজকের শিশুরা আগামী দিনের নেতা। তাই তাদের সুন্দর ও সৎভাবে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করেছে। অগুনতি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছে, যা আমাদের বর্তমান যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের ছিল। এসব মক্তব থেকে বড় বড় আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি তৈরি হয়েছে যারা মানবসভ্যতাকে উজ্জ্বল করেছেন কেবল উপকারী জ্ঞানের দ্বারা নয়, উৎকর্ষ ও অগ্রগতির দ্বারাও।

---

৪৫. ইবনুল হাজ আল-আবদারি, *আল-মাদখাল*, খ. ২, পৃ. ৩২২।

৪৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৩।

৪৭. আবদুল গনি মাহমুদ আবদুল আতি, *আত-তালিমু ফি মিসর যামানাল আইয়ুবিয়্যিনা ওয়াল-মামালিক*, পৃ. ১৪৫; ড. মুহাম্মাদ মুনির সাদুদ্দিন, *দাওরুল কুত্তাব ওয়াল মাসাজিদ ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৩।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মসজিদ

ইসলামি সমাজে শিক্ষার ইতিহাস মসজিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মসজিদ ছিল ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। একইসঙ্গে তা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার মসজিদকে শিক্ষাদানকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে সাহাবিরা সমবেত হতেন এবং তিনি যতটুকু কুরআন নাযিল হতো তা তাদের তিলাওয়াত করে শোনাতেন। বক্তব্য ও কর্মের দ্বারা তাদের দ্বীনের হুকুম-আহকাম শেখাতেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগেও এই মসজিদ তার দায়িত্ব পালন করেছে। উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফাদের যুগে ও তার পরেও মসজিদ তার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। আলেমগণ মসজিদটিতে সমবেত হতেন এবং হাদিসের আলোচনা করতেন ও কুরআনের আয়াতের তাফসির করতেন। বহু মুহাদ্দিস এই মসজিদে বসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ.। দামেশকের জামে মসজিদও মসজিদে নববির অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছে। এটি ছিল ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এতে জ্ঞানচর্চার বেশ কয়েকটি আসর বসত।[৪৮] মসজিদের কয়েকটি কোণে ছাত্ররা পাঠ গ্রহণ করত এবং পাণ্ডুলিপি কপি করত। এই মসজিদে খতিব বাগদাদির একটি বড় আসর ছিল। তিনি সেখানে দরস দিতেন। প্রতিদিনই তার কাছে লোকজন সমবেত হতো।[৪৯]

মসজিদে নববিতে সাহাবিদের কয়েকটি আসর বসত, তারা জ্ঞানচর্চা করতেন। মাকহুল এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা

---

৪৮. আবদুল্লাহ মাগুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৪।

৪৯. আহমাদ শালবি, *তারিখুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৯১।

মদিনার মসজিদে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আসরে বসে ছিলাম এবং ফাজায়েলে কুরআনের আলোচনা করছিলাম। এ সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর চমৎকারিত্ব-সম্পর্কিত হাদিস উল্লেখ করা হলো।[৫০]

মসজিদে নববিতে আবু হুরাইরা রা.-এর একটি আসর ছিল। এতে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস শিক্ষা দিতেন। এই আসরটি আবু হুরাইরা রা.-এর হিফযুল হাদিসের ব্যাপকতার প্রতিবিম্ব ছিল। তিনি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আবেগে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠতেন এবং ক্রন্দন করতেন। মুআবিয়া রা.-এর কাছে এক লোক এলো এবং বলল, আমি মদিনায় গিয়েছিলাম। আবু হুরাইরাকে মসজিদে বসে থাকতে দেখলাম। তার চারপাশে লোকজনের জটলা। তিনি তাদের হাদিস বর্ণনা করছেন। বললেন, 'আমার প্রাণপ্রিয় আবুল কাসিম আমাকে বর্ণনা করেছেন,' বলে কেঁদে উঠলেন। তারপর শান্ত হলেন। বললেন, 'আমার প্রাণপ্রিয় আল্লাহর নবী আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,' বলে কেঁদে উঠলেন। তারপর দাঁড়িয়ে গেলেন![৫১]

আবু ইসহাক সাবিয়ি বারা ইবনে আযিব রা.-এর মজলিসে ইলমি হালকার শৃঙ্খলা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা এক সারির পেছনে আরেক সারি করে বারা ইবনে আযিবের কাছে বসতাম।[৫২] তার এই কথা থেকে আসরটি যে বড় ছিল তা বোঝা যায়। মসজিদে নববিতে সে সময় আরও যেসব আসর পরিচিত ছিল তার অন্যতম হলো সাহাবি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারি রা.-এর আসর।[৫৩]

দামেশকের জামে মসজিদে মুআয ইবনে জাবাল রা.-এরও একটি বিখ্যাত হালকা বা আসর ছিল। আবু ইদরিস আল-খাওলানি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে প্রবেশ করে একজন যুবককে দেখতে পেলাম। তার দাঁতগুলো উজ্জ্বল। শান্ত স্বভাব। তার চারপাশে লোকজন রয়েছে, তারা আলোচনা করছে। কোনো বিষয়ে

---

৫০. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৭, পৃ. ২১৬।
৫১. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২, পৃ. ৬১১।
৫২. খতিব বাগদাদি, *আল-জামি লি-আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি*, খ. ১, পৃ. ১৭৪।
৫৩. আকরাম উমারি, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদা*, পৃ. ২৭৮।

তাদের মধ্যে বিরোধ হলে তার কাছে উত্থাপন করছে এবং তার মত জানতে চাচ্ছে। আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বলা হলো, তিনি হলেন মুআয ইবনে জাবাল রা.।[৫৪]

এ কারণে মসজিদের জ্ঞানচর্চার আসরগুলো আমাদের বর্তমান যুগের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার সমপর্যায়ের ছিল। ইসলামি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল। মুজতাহিদ, আলেম ও সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই সকল আসরে আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন, আলি ইবনে হুসাইন মসজিদে প্রবেশ করে লোকদের অতিক্রম করে এগিয়ে যেতেন এবং যায়দ ইবনে আসলাম রা.-এর আসরে বসতেন। নাফে ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতয়িম তাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি কুরাইশের নেতা তো বটেই, সাধারণ মানুষেরও নেতা। আপনি মসজিদে এসে বড় বড় জ্ঞানীদের আসর ডিঙিয়ে এই কালো দাসের[৫৫] সঙ্গে বসে পড়েন?! আলি ইবনে হুসাইন বললেন, মানুষ সেখানেই বসে যেখানে সে উপকৃত হয় এবং ইলম যেখানেই থাকুক অবশ্যই তা কাঙ্ক্ষিত।[৫৬]

ইসলামের ইতিহাসে অনেক ইলমি হালকা বা জ্ঞানচর্চার আসর বিখ্যাত হয়ে আছে। মসজিদে হারামে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল হিবরুল উম্মাহ (উম্মাহর জ্ঞানী) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর আসর। তার ইনতেকালের পর এই আসরে যোগ দিয়েছিলেন আতা ইবনে আবু রাবাহ রহ.।[৫৭]

এসব আসরে শিক্ষকের বয়স বেশি নাকি কম তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, বরং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আল্লাহভীরুতাই বিবেচ্য বিষয় ছিল। বয়সে ছোট না বড় সেটা কোনো কথা নয়। ইতিহাসবেত্তা হাফিজ আল-ফাসাবি (মৃ. ২৮০ হি.) মসজিদে ইলমি হালকার একজন পথিকৃতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এই মসজিদটি দেখেছি, এখানে কেবল মুসলিম ইবনে ইয়াসারের মজলিসেই ফিকহি আলোচনা হতো। এই

---

৫৪. ইয়াকুব আল-ফাসাবি, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

৫৫. যায়দের পিতা আসলাম ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আযাদকৃত দাস।

৫৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ১২৪।

৫৭. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩৭।

মজলিসে তার চেয়ে বয়সে বড় অনেক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার নামেই ছিল মজলিসটির নাম।[৫৮]

ইলমি হালকার শিক্ষকেরা কখনো কখনো অভিজ্ঞ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের অনুরোধ জানাতেন। ইবনে আসাকির[৫৯] বর্ণনা করেছেন, একজন লোক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে আবু ইদরিস আয়িযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ খাওলানিকে[৬০] দামেশকের মসজিদে দেখতে পান, তিনি একটি খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছেন। মসজিদের সব হালকাই কুরআন তিলাওয়াত করছে, কুরআন অধ্যয়ন করছে। যখনই কোনো হালকার সিজদার আয়াত পাঠের সময় হয়েছে, তারা আবু ইদরিসকে ওই আয়াতটি পাঠের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল। তিনি তা পাঠ করেছেন, সবাই তন্ময় হয়ে শুনেছে; তিনি সিজদা করেছেন, সবাই তার সঙ্গে সিজদা করেছে। কখনো কখনো তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে বারোটি পর্যন্ত সিজদা দিয়েছেন। তাদের সবার কুরআন পাঠ শেষ হলে তিনি কাহিনি শোনাতে দাঁড়িয়েছেন।[৬১]

এই ঘটনায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা তো জানিই, আবু ইদরিস খাওলানি দামেশকে ইলমুল কিরাআত (কুরআন পাঠবিদ্যা) সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এই কারণে দামেশকের মসজিদে শিক্ষকেরা তাকে পাশে রেখে নিজেরা সিজদার আয়াত পাঠ করতে অপারগ বোধ করতেন। বরং তারা তাকে (সিজদার আয়াত পাঠের ক্ষেত্রে) তাদের হালকায় শরিক করে নিতেন। এভাবে তাকে সম্মান

---

৫৮. ইয়াকুব আল-ফাসাবি, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, খ. ২, পৃ. ৪৯।

৫৯. ইবনে আসাকির : আবু কাসিম আলি ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ আদ-দিমাশকি (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ খ্রি.)। ইতিহাসবিদ, হাফেয, পরিব্রাজক। তিনি দিয়ারে শামিয়ার মুহাদ্দিস ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

تاريخ دمشق الكبير، الإشراف على معرفة الأطراف، تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، معجم الصحابة ।

দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২১, পৃ. ৪০৫।

৬০. আবু ইদরিস আয়িযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-খাওলানি আল-উযি আদ-দিমাশকি (৮-৮০ হি./৬৩০-৭০০ খ্রি.)। তাবিয়ি, ফকিহ। দামেশকের বাসিন্দাদের ওয়ায়েজ ছিলেন। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সময় তিনি তাদের শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনি বলতেন। বিচারকও হয়েছিলেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ২৩৯।

৬১. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ২৬, পৃ. ১৬৩।

জানাতেন, তার গভীর জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন এবং তার থেকে ফায়দা হাসিল করতেন।

কোনো কোনো ইলমি হালকার পরিচিতি ও খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এসে এসব হালকায় জড়ো হয়েছিল। সেই সময়ে মসজিদে নববিতে নাফে ইবনে আবদুর রহমান আল-কারির[৬২] হালকাটি ছিল আল্লাহর কিতাব (কুরআন) শেখার জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। সব জায়গা থেকে ছাত্ররা তার কাছে পড়তে আসত। ইমাম ওয়ার্‌শ মিশরি[৬৩] মসজিদে নববিতে ইমাম নাফে ইবনে আবদুর রহমানের হালকায় তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি নাফেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনানোর জন্য মিশর থেকে বের হয়ে পড়লাম। মদিনায় পৌঁছে নাফের মসজিদে (মসজিদে নববিতে) গেলাম। কিন্তু ছাত্রদের ভিড়ের কারণে তাকে তিলাওয়াত শোনানোর কোনো সুযোগই পেলাম না। তিনি ত্রিশজনকে পড়াচ্ছিলেন। আমি মজলিসের পেছনে বসলাম। একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, নাফের কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? লোকটি বলল, বড় জাফারি। আমি বললাম, কীভাবে তার কাছে যাব? লোকটি বলল, আমি তোমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাব। আমরা তার বাড়িতে পৌঁছলাম। একজন শাইখ বেরিয়ে এলেন। আমি বললাম, আমি মিশর থেকে এসেছি। নাফেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনাতে চাই। কিন্তু কোনো সুযোগই পাচ্ছি না। আপনি তার ঘনিষ্ঠজন বলে জেনেছি। আপনি আমার জন্য কিছু করুন, যাতে নাফের কাছে যেতে পারি। শাইখ বললেন, অবশ্যই। তিনি তার তায়লাসান[৬৪] নিলেন। আমাদের নিয়ে নাফের কাছে চললেন। নাফের দুটি উপনাম ছিল, আবু রুওয়াইম ও আবু আবদুল্লাহ। যেকোনো একটি

---

৬২. নাফে আল-কারি : নাফে ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু নাইম আল-মাদানি আল-কারি (৭০-১৬৯ হি./৬৮৯-৭৮৫ খ্রি.)। নাফে আল-মাদানি নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত সাত কারির অন্যতম এবং মদিনায় কারিদের ইমাম। তিনি ইস্পাহানি বংশোদ্ভূত।

৬৩. ওয়ার্‌শ : উসমান ইবনে সাইদ ইবনে আদি আল-মিশরি (১১০-১৯৭ হি./৭২৮-৮১২ খ্রি.)। একজন বিখ্যাত কারি। তার শারীরিক শুভ্রতার কারণে 'ওয়ার্‌শ' নামে খ্যাতি পেয়েছেন। কায়রাওয়ানি বংশোদ্ভূত। জন্ম ও মৃত্যু মিশরে। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২০৫।

৬৪. *তায়লাসান* : বুযুর্গ ব্যক্তিদের পরিধেয় সবুজ রঙের পোশাকবিশেষ।

নামে ডাকলেই তিনি সাড়া দিতেন। জাফারি আমাকে দেখিয়ে তাকে বললেন, আমি এর জন্য তোমার কাছে সুপারিশ করছি। সে মিশর থেকে এসেছে। ব্যবসার জন্যও আসেনি, হজের জন্যও নয়। সে কেবল কেরাত শেখার জন্য এসেছে। নাফে বললেন, মুহাজির ও আনসারদের সন্তানদের যে কী ভিড় তা তো তোমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। তার বন্ধু বললেন, তুমি তার জন্য একটি উপায় বের করে নেবে। নাফে আমাকে বললেন, তোমার পক্ষে কি মসজিদে রাত যাপন করা সম্ভব হবে? আমি বললাম, জি। আমি মসজিদেই রাত যাপন করলাম। ফজরের সময় নাফে এলেন। বললেন, আগন্তুক লোকটি কোথায়? আমি বললাম, আমি এখানেই আছি। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। তিনি বললেন, তুমিই কুরআন তিলাওয়াত করার অধিক হকদার। ওয়ার্‌শ বলেন, তা ছাড়া আমার কণ্ঠস্বর ছিল সুন্দর, হৃদয়কাড়া। আমি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলাম। আমার আওয়াজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ ভরে উঠল। আমি ত্রিশ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। তিনি ইশারায় আমাকে চুপ করতে বললেন, আমি চুপ হয়ে গেলাম। হালকা থেকে একজন যুবক উঠে এলো। বলল, উস্তাদজি, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন, আমরা তো আপনার সঙ্গেই থাকি। তিনি তো বিদেশি মানুষ। আপনাকে কুরআন তিলাওয়াত শোনানোর জন্যই এত দূর সফর করে এসেছেন। আপনি তাকে এক দশমাংশ পড়তে বলেছেন, তিনি দুই দশমাংশ পড়েই থেমে গেছেন। তিনি আমাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি পড়ো। আমি এক দশমাংশ পড়লাম। তারপর আরেকজন যুবক উঠে এলো এবং তার সহপাঠীর মতো আমার জন্য সুপারিশ করল। আমি আরও এক দশমাংশ পড়লাম, তারপর বসলাম। তাকে তিলাওয়াত শোনানোর মতো কোনো ছাত্র থাকল না। তিনি আমাকে বললেন, পড়ো। এভাবে আমাকে পঞ্চাশ আয়াত পড়ালেন। পরে আমি প্রত্যেকবারই পঞ্চাশ আয়াত করে পড়তে থাকলাম। মদিনা থেকে বেরিয়ে আসার আগে তাকে কয়েক খতম শোনালাম।[৬৫]

এই বর্ণনা হলো পরিশ্রমী ছাত্র ইমাম ওয়ার্‌শ আল-মিশরির, হিজরি দ্বিতীয় শতকে ইলমি হালকার স্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি অনেক কষ্ট

---

৬৫. যাহবি, *মারিফাতুল কুররায়িল কিবার আলাত তাবাকাতি ওয়াল আছার*, খ. ১, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

ও পথশ্রম ব্যয় করে মিশর থেকে মদিনায় গিয়েছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল একটিই, মদিনার ইমাম, ইমাম নাফে থেকে ইলমে কেরাত শেখা। শিক্ষক ও তার ছাত্রদের মধ্যে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাও তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তার বর্ণনা থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়, ইমাম নাফের হালকায় ফজরের পরপরই পাঠ-দিবস শুরু হতো।

ইলমি হালকা ছিল অসংখ্য। কারণ এক-এক হালকায় এক-এক বিষয়ে পাঠদান করা হতো। কিছু কিছু হালকায় ছাত্র ছিল প্রচুর। এসব হালকা ভিনদেশি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ইমাম আবু হানিফা আন-নুমানের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছিল। তিনি বলেছেন, আমি ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছি। ৯৬ হিজরিতে আমার বাবার সঙ্গে হজ করেছি। তখন আমার বয়স ১৬ বছর। মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে দেখি এক বিশাল হালকা। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই হালকাটি কার? বাবা বললেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে জুয্অ আয-যুবাইদির হালকা এটি। আমি এগিয়ে গেলাম। শুনলাম, তিনি বলছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب»

> যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন (দ্বীনের জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহই তার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাকে এমনভাবে রিযিক দান করেন যে সে তা ধারণাও করতে পারে না।[৬৬]

বাগদাদের মসজিদে চল্লিশটিরও বেশি ইলমি হালকা (জ্ঞানশিক্ষার আসর) ছিল। এ সমস্ত হালকা ইমাম শাফিয়ির অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কারণে তার হালকায় এসে মিশে গিয়েছিল। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ[৬৭] এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম শাফিয়ি যখন বাগদাদে এলেন তখন বাগদাদের জামে মসজিদে

---

৬৬. ইবনু আন-নাজ্জার আল-বাগদাদি, *যায়লু তারিখি বাগদাদ*, খ. ১, পৃ. ৪৯।

৬৭. আয-যাজ্জাজ : আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে আস-সারি ইবনে সাহ্ল (২৪১-৩১১ হি./ ৮৫৫-৯২৩ খ্রি.)। ভাষাবিদ ও ব্যাকরণ-পণ্ডিত। বাগদাদে জন্ম ও মৃত্যু। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تفسير أسماء الله الحسنى، معاني القرآن وإعرابه، ما ينصرف وما لا ينصرف، العروض، القوافي أو الكافي في أسماء القوافي। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৫, পৃ. ২২৮।

চল্লিশটিরও বেশি বা পঞ্চাশটি ইলমি হালকা ছিল। তিনি এক-একটি হালকায় যেতে লাগলেন এবং তাদের বলতে লাগলেন, আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর রাসুল বলেছেন। অথচ তারা বলছিল, আমাদের সঙ্গীরা বলেছে। অবশেষে এই মসজিদে ইমাম শাফিয়ির হালকা ছাড়া আর কোনো হালকাই থাকল না।[৬৮]

মিশরেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান ছিল। আমর ইবনুল আস রা. মসজিদে ইমাম শাফিয়ি রহ. তালিবুল ইলমদের সঙ্গে মিলিত হতেন। কিছু কিছু জামে মসজিদ জ্ঞানের নানান শাখায় পঠনপাঠনের ফলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এসব মসজিদে বহু বিশেষজ্ঞ শিক্ষকও ছিলেন। তা ছাড়া গভর্নরগণ অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিযুক্ত করতেন।

যেসব ইলমি হালকা ও মজলিস সমাজের অবস্থার সঙ্গে সমকাতারে থাকত না এবং সমাজের বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটে মাথা ঘামাত না সেগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আপত্তি জানাতে পারতেন। এটা ছিল তাদের নাগরিক অধিকার। কারণ, মানুষকে তাদের বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করা এবং বিদ্যমান অবস্থায় কোন জিনিসটি তাদের জন্য উপকারী তা তাদের জানানো সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয়।

আহমাদ ইবনে সাইদ উমাবি বর্ণনা করেছেন, মক্কায় আমার একটি ইলমি হালকা ছিল। আমি মসজিদুল হারামে বসতাম এবং আমার কাছে বিদ্যার্থীরা সমবেত হতো। আমরা একদিন ব্যাকরণের কিছু বিষয় ও ছন্দ নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলাম। একসময় আমাদের আওয়াজ উচ্চকিত হয়ে উঠল। ঘটনাটি ছিল খলিফা আল-মুহতা (মৃ. ২৫৬ হি.)-এর শাসনামলের। হঠাৎ এক পাগল কাছে এসে দাঁড়াল এবং আমাদের দিকে ভালো করে তাকাল। তারপর সে এই কবিতা আবৃত্তি করল,

أمـا تستحون الله يا معدن الجهل☆ شـغلتم بذا والنَّـاس في أعـظم الـشغل

إمـامكم أضـحى قتيـلا مجـدلا☆ وقـد أصبـح الإسـلام مـفـترق الـشمل

وأنتم على الأشعار والنحو عكفا ☆ تصيحون بالأصوات في استِ ام ذا العقل

---

৬৮. আল-মিযযি, *তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৪, পৃ. ৩৭৫।

হে মূর্খতার খনি, তোমরা কি আল্লাহকে লজ্জা পাও না? তোমরা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত রয়েছ, অথচ মানুষ ভয়াবহ সংকটে। তোমাদের নেতা তো পরাভূত-পরাজিত হয়ে পড়েছে, আর ইসলাম হয়ে পড়েছে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তোমরা কবিতা-ছন্দ-ব্যাকরণের সঙ্গে লেপটে আছ, হইহল্লা-চেঁচামেচি করছ, তোমরা তো বুদ্ধিমান নও।

এই কবিতা বলে পাগল লোকটা চলে গেল। আমরাও জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লাম। লোকটার বলা কথা আমাদের ভয় ধরিয়ে দেয়। আমরা কবিতাটি মনে রাখি।[৬৯]

উপর্যুক্ত কবিতা আবৃত্তির কারণ ছিল এই যে, লোকটি আলেমদের ও মজলিসে সমবেত লোকদের সতর্ক করতে চেয়েছে। তারা মজলিসে অহেতুক তর্কবিতর্কে লিপ্ত ছিল, অথচ রাজধানী বাগদাদে ভয়াবহ বিপর্যয় চলছে। তুর্কি সেনাপতি ও খলিফা আল-মুহতাদির সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত আছে। লোকটি চাচ্ছে যে, এখানে মজলিসে যারা আছে তারাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চারপাশের লোকদের সঙ্গে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করুক।

ইমাম আবুল ওয়ালিদ আল-বাজির[৭০] ইলমি হালকার খ্যাতি আন্দালুসের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি প্রাচ্যে ভ্রমণ করেছিলেন। হাফেয মুহাদ্দিসের অনন্য ব্যক্তিত্ব তার ছিল। আন্দালুসে মুহাদ্দিসদের ইমাম হওয়ার অধিকারও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আল-বাজির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তাকে পালমা[৭১] শহরে এসে মালিকি মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে

---

৬৯. খতিব আল-বাগদাদি, *তারিখু বাগদাদ*, খ. ৪, পৃ. ৫৫৭-৫৫৮।

৭০. আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি : সুলাইমান ইবনে খালফ ইবনে সাদ আত-তুজিবি আল-কুরতুবি (৪০৩-৪৭৪ হি./১০১২-১০৮১ হি.)। প্রখ্যাত মালিকি ফকিহ, মুহাদ্দিস, বিচারক ও কবি। তিনি আন্দালুসের বিতলিউস (Badajoz) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তার দাদা পরিবারসহ বাজায় চলে যান। সেখানেই তিনি বেড়ে ওঠেন। এ কারণেই তাকে আল-বাজি বলা হয়। এটি বর্তমানে পর্তুগালের বেজা (Beja) শহর। তিনি বাজার কাজি বা বিচারক ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনা :

الاستيفاء في شرح الموطأ، السراج في علم الحجاج ومسائل الخلاف، المهذب في اختصار المدونة، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تبيين المنهاج والتسديد إلى معرفة طريق التوحيد، فرق الفقهاء، التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح.

দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১২৫।

৭১. ميورقة, Palma de Mallorca.

ইবনে হাযমের[৭২] সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে আহ্বান জানানো হয়। তিনি পালমায় আসেন এবং শিক্ষাদানে ব্রতী হন। সেভিলেও[৭৩] যান এবং শিক্ষাদান করেন। মুরসিয়া[৭৪] শহরে গিয়ে মুআত্তার পাঠদান করেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আমি যেখানে থাকতাম সেখানকার মসজিদে আমার একটি ইলমি হালকা ছিল। মুআত্তার প্রসঙ্গে আলোচনা শুনতে লোকজন আমার কাছে সমবেত হতো। তিনি দানিয়া[৭৫] শহরেও গমন করেন এবং সেখানে অসংখ্য মানুষ তার কাছ থেকে *সহিহুল বুখারি* শ্রবণ করে। ৪৬৩ হিজরির রজব মাসে তিনি সারকাসতাহ[৭৬] শহর সফর করেন এবং ৪৬৮ হিজরিতে সফর করেন ভ্যালেন্সিয়ার[৭৭] রাহবাহ আল-কাজি মসজিদ। এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য শহর সফর করেন। হাফিজ আবুল ওয়ালিদের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে ছাত্ররা ছুটে আসত এবং তার থেকে ইলম অর্জনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। কাছাকাছি এলাকা তো বটেই, অধিকাংশ ছাত্র দূরদূরান্ত থেকে তার কাছে পড়তে এসেছে। দেশের ভেতরের ছাত্ররা যেমন এসেছে, দেশের বাইরের ছাত্ররাও এসেছে। যেমন : উরিহউলা[৭৮], সেভিল, শাবুনা (সুদান), রান্দা (জিবুতি), ভ্যালেন্সিয়া, বাগদাদ, তুতিলা (তুদেলা)[৭৯], আলেপ্পো, দানিয়া, তারতুসা[৮০] (স্পেন), তুলাইতালা (টলেডো)[৮১], লুরকা[৮২] (স্পেন), মালাগা[৮৩] (স্পেন), মুরবাতার[৮৪], মুরজিক ও মুরসিয়া...।[৮৫]

---

৭২. আবু মুহাম্মাদ আলি ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসি (৩৮৪-৪৫৪ হি.)।

৭৩. اشبيلية, Seville. আন্দালুসিয়ার সেভিল প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর।

৭৪. Murcia.

৭৫. Dénia.

৭৬. سرقسطة : Zaragoza.

৭৭. بَلَنْسِيَة : Valencia.

৭৮. أوريُولَة : Orihuela.

৭৯. تُطِيلَة : Tudela.

৮০. طرطوشة : Tortosa.

৮১. طُلَيْطِلَة : Toledo.

৮২. لورقة : Lorca.

৮৩. مالقة : Málaga.

৮৪. Sagunto. মুরবাতার প্রাচীন নাম।

৮৫. সুলাইমান ইবনে খালফ আল-বাজি, *আত-তা'দিল ওয়াত-তাজরিহ*, খ. ১, পৃ. ১০৬।

মসজিদের হালকাগুলোতে শিক্ষাদানে নারীদের যে ভূমিকা ও অবদান তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইতিহাসের পাতায় বহু নারী শিক্ষকের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে যারা মসজিদে পাঠদান করেছেন। নারীদের ছিল বিশেষ ইলমি হালকা। উম্মুদ দারদা রা. দামেশকের জামে মসজিদে একটি ইলমি হালকা পরিচালনা করতেন। তার আসল নাম হুজাইমা বিনতে হুওয়াই রা.। তিনি আবুদ দারদা রা., সালমান আল-ফারসি রা. এবং ফুযালা ইবনে উবাইদা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান উম্মুদ দারদা রা. থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি উম্মুদ দারদার দরসে নিয়মিত উপস্থিত হতেন, এমনকি আমিরুল মুমিনিন হওয়ার পরও তার দরসে উপস্থিত হতেন। তিনি দামেশকের মসজিদে শেষ প্রান্তে বসে ছিলেন। উম্মুদ দারদা রা. তাকে দেখে বললেন, শুনলাম আপনি ইবাদত-বন্দেগির পর এখন মদ পান করেছেন?

আবদুল মালিক বললেন, হ্যাঁ, তাই। রক্তও আমি পান করেছি। এ সময় তার একটি চাকর এসে উপস্থিত হলো। চাকরটিকে তিনি কোনো কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, এত দেরি কেন? তোর ওপর আল্লাহর লানত। উম্মুদ দারদা রা. বললেন, হে আমিরুল মুনিনিন, আপনি এভাবে অভিশাপ দেবেন না। আমি আবুদ দারদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«لا يدخل الجنة لعان»

অভিসম্পাতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না...।[৮৬]

ইবনে বতুতা তার ভ্রমণকাহিনিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দামেশকের উমাবি জামে মসজিদে শিক্ষিকা শাইখা যাইনাব বিনতে আহমাদ ইবনে আবদুর রহিমের কাছ থেকে *সহিহ মুসলিম* শুনেছেন। যাইনাব ৭৪০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। একইভাবে ইবনে বতুতাকে হাদিস বর্ণনার অনুমতি দেন বিশিষ্ট শাইখা আয়িশা বিনতে মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আল-হুররানি (মৃ. ৭৩৬ হিজরি)। তিনি ইমাম বাইহাকি রহ.-এর '*ফাযায়িলুল আওকাত*' (পুস্তিকাটি) বর্ণনা করেছেন।[৮৭]

---

৮৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ৬৬।

৮৭. ইবনে বতুতা, *রিহলাহ ইবনে বতুতা*, পৃ. ৭০; সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৬, পৃ. ৩৪৮।

সব এলাকা ও গোত্র থেকে শিক্ষার্থীরা এসব মসজিদে পড়তে আসত। তাদের জন্য সব ধরনের উপকরণ সরবরাহ করা হতো। যাতে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং এতে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। তাদের খাবার ও পোশাক সরবরাহ করা হতো, থাকার জন্য আলাদা বাসস্থান ছিল। তাদেরকে ভাতাও দেওয়া হতো।[৮৮] এ সকল জামে মসজিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

জামে আল-উমাবি : এটি দামেশকে অবস্থিত। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক এটি নির্মাণ করেছেন। এই মসজিদে ইলমি হালকা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। মালিকি মাযহাবপন্থীদের জন্য মসজিদের একটি কর্নার নির্ধারিত ছিল, একইভাবে শাফিয়ি মাযহাবপন্থীদের জন্যও। খতিব আল-বাগদাদিরও একটি হালকা ছিল। ছাত্ররা তার কাছে সমবেত হতো। তিনি তাদের হাদিসের দরস দিতেন। এই মসজিদের হালকাগুলো শুধু দ্বীনি ইলমের শিক্ষাব্যবস্থায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হতো।

চিত্র নং-১
আল-উমাবি জামে মসজিদ

---

৮৮. আবদুল্লাহ মাগুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৪৫।

জামে আমর ইবনুল আস রা. : এটি মিশরের ফুসতাতে অবস্থিত। এই মসজিদে চল্লিশটিরও বেশি পাঠদানের আসর ছিল। শিক্ষার্থী ও যারা গবেষণায় ব্রতী ছিল তারা এসব আসর পরিচালনা করত। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর আসর। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে এই মসজিদে পাঠদানের আসরের সংখ্যা একশ দশে পৌঁছায়। কয়েকটি হালকা ছিল মহিলাদের জন্য খাস। তারপর অনুমোদনদানের (হাদিস পাঠদানের ইজাযত বা উচ্চ সনদপত্রের) প্রথা চালু হয়। ইজাযত পাওয়ার পর ছাত্ররা তাদের উস্তাদের কিতাবপত্র ব্যবহার করতে পারত এবং তার থেকে হাদিস বর্ণনা করতে পারত।[৮৯]
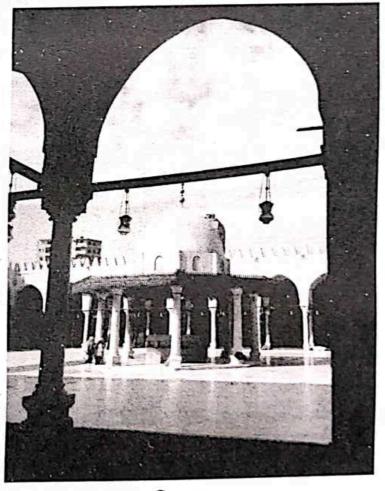
চিত্র নং-২
আমর ইবনুল আস রা. জামে মসজিদ

৮৯. রহিম কাযিম আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, ১৫০।

জামে আল-আযহার : ৩৬১ হিজরিতে জামে আল-আযহারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। ইসলামি বিশ্বের ছাত্রদের জন্য এটি একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়। খলিফাগণ জামে আল-আযহারের জন্য বহু সম্পত্তি ওয়াক্ফ করেছেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। জামে আল-আযহারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখানে শিক্ষার্থীরা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেত। ফলে মুসলিমবিশ্বের সব এলাকা থেকে এখানে ছাত্ররা পড়তে আসত। এমনকি ৮১৮ হিজরিতে (১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে) জামে আল-আযহারের ছাত্র-শিক্ষক ছিল মাকরিযির[৯০] বর্ণনামতে সাতশ পঞ্চাশজন। এখানে অনারব শিক্ষার্থী ছিল, সোমালিয়ার যাইলাআ (Zeila) অঞ্চলের শিক্ষার্থীও ছিল।[৯১] মিশরের গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থী যেমন ছিল, তেমনই মাগরিবের (মরক্কোর) শিক্ষার্থীও ছিল। প্রত্যেক গোত্রের আলাদা তাঁবু ছিল, তাঁবু দেখে তাদের চেনা যেত।

চিত্র নং-৩
আল-আযহার জামে মসজিদ

৯০. মাকরিযি : তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি আল-মাকরিযি (৭৬৬-৮৪৫ হি.)। মিশরীয় ইতিহাসবিদদের গুরু। মামলুকদের শাসনামলে জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন। তার কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ : السلوك لمعرفة دول الملوك، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار

৯১. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৩১০।

জামে আল-আযহার যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের কেন্দ্র ও আলোকবর্তিকা হিসেবে ধারাবাহিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি অসংখ্য মনীষীর জন্ম দিয়েছে, অজস্র গ্রন্থ এখানে রচিত হয়েছে। সত্যিকার অর্থেই জামে আল-আযহার এমন এক শিক্ষালয় যা জ্ঞান ও জ্ঞানার্থীর যুগপৎ মিলনস্থল।[৯২]

*জামে আয-যাইতুনা :** এই মসজিদ তিউনিসিয়ায় অবস্থিত। বনি উমাইয়ার খলিফাদের শাসনামলে (৭৯ হিজরিতে) এটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। জামে আয-যাইতুনার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইফ্রিকিয়ার গভর্নর আমির উবাইদুল্লাহ ইবনে হাবহাব। তিনি খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন। ২৫০ হিজরিতে (৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) কয়েকবার মসজিদটি সম্প্রসারণ করা হয়। যিয়াদাতুল্লাহ ইবনুল আগলাব—আগালিব রাজবংশের শাসনামলে—মসজিদটি সম্প্রসারণ করেন। এ মসজিদটিতে ইলমের বিভিন্ন শাখায় পাঠদানের কারণে এটির অবস্থান অনেক উঁচু। বহু বড় বড় আলেম এই মসজিদে পাঠদান করেছেন। যেমন আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ আল-মাআফিরি[৯৩]। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস (হাদিসবিশারদ) ছিলেন। আবু সাইদ সাহনুন আত-তানুখিও এখানে শিক্ষকতা করতেন। এখানে শিক্ষকদের মধ্যে আরও ছিলেন ইমাম আল-মাযিরি[৯৪] ও অন্যরা।

---

৯২. আবদুল্লাহ মাশুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৭।

৯৩. আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ : আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম আল-মুআফিরি আল-ইফ্রিকি (৭৫-১৬১ হি./৬৯৪-৭৭৮ খ্রি.)। তিনি শাসকদের সবসময় হুমকি-ধমকির ওপর রাখতেন। কড়া ভাষায় তাদের অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে বলতেন। এ ব্যাপারে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। বারকায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছেন। দুইবার কায়রাওয়ানের বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন।

৯৪. আল-মাযিরি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে উমর আল-মাযিরি (৪৫৩-৫৩৬ হি./১০৬১-১১৪১ খ্রি.)। মুহাদ্দিস, হাফিয, ফকিহ, আদিব। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : نظم الفرائد في علم العقائد، إيضاح المحصول من برهان الأصول، المعين على التلقين، المعلم بفوائد مسلم، أمالي على رسائل إخوان الصفا، الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء، في نقد كتاب إحياء علوم الدين للغزالي। দেখুন, যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৫২; উমর রেজা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ১১, পৃ. ৩২।

চিত্র নং-৪
আয-যাইতুনা জামে মসজিদ

জামে আয-যাইতুনায় সব এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করতে আসত। এখানে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাবলির পাঠদান করা হতো। আল-হাশাইশি[৯৫] জামে আয-যাইতুনায় জ্ঞানচর্চা ও পঠনপাঠনের যে অবস্থা ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জামে আয-যাইতুনা ছিল একটি জ্ঞানসমুদ্র। সব ধরনের জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল এখানে। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, এই মসজিদের প্রায় প্রত্যেক খুঁটির সামনে একজন করে শিক্ষক বসতেন। মসজিদটির ভান্ডারে ছিল দুই লাখেরও বেশি খণ্ডের কিতাব।[৯৬]

জামে আল-কারাউইন : মরক্কোর ফেজ শহরে জামে আল-কারাউইন প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪৫ হিজরিতে/৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। ইদরিসি রাজবংশের[৯৭] শাসনামলে এটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। যানাতি আমির আহমাদ ইবনে আবু বকর আয-যানাতি (৩২২ হিজরি/৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) মসজিদটি সমৃদ্ধ করেন এবং অনেকাংশে বর্ধিত করেন। হিজরি ষষ্ঠ শতকের শুরুতে জামে

---

৯৫. আল-হাশাইশি : মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আল-হাশাইশি আশ-শারিফ ফাদিল (১২৭১-১৩৩০ হি./১৮৫৫-১৯১২ খ্রি.)। তিউনিসের অধিবাসী। জামে আয-যাইতুনার গ্রন্থভান্ডার ঘাঁটাঘাঁটি করাই ছিল তার কাজ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৬৩।

৯৬. আবদুল্লাহ মাণ্ডখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৫।

৯৭. ইদরিসি রাজবংশ (الأدارسة) : ৭৮৮ খ্রি. থেকে ৯৭৪ খ্রি. পর্যন্ত মরক্কোর একটি রাজবংশ। হাসান ইবনে আলি রা.-এর প্রপৌত্র ইদরিস এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইদরিসিদেরকে সাধারণত মরক্কো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়। তারা ছিল শিয়া মতবাদের যায়েদি শাখার অনুসারী।

আল-কারাউইনের সম্প্রসারণকাজ সম্পন্ন হয় এবং এটির সীমানা বিস্তৃত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বিপুল খ্যাতি অর্জন করে। শিক্ষাদীক্ষায় উচ্চ অবস্থানের কারণে জামে আল-কারাউইন ছিল অনন্য ও অসাধারণ। বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসত। প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে তারা সব ধরনের খরচাদি পেত। জামে আল-কারাউইনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ছিল। কারণ ওয়াকফকৃত সম্পত্তির পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল আমির-উমারার অনুদান। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি ছিল বিপুল, এ কারণেও অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হতো। অন্যান্য দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসত। এমনকি ইউরোপের শিক্ষার্থীরাও এই জ্ঞানকেন্দ্রে আসতে শুরু করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশপ জার্বার্টাস (Gerbertus)[৯৮] কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পর জামে আল-কারাউইনে পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি ৯৯৯ খ্রি. থেকে ১০০৩ খ্রি. পর্যন্ত রোমের পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন তার নাম হয়েছিল দ্বিতীয় সিলভেসটার (Sylvester II)। তিনি Gerbert of Aurillac নামেও পরিচিত।[৯৯]

চিত্র নং-৫
আল-কারাউইন জামে মসজিদ

---

৯৮. বিস্তারিত দেখুন, আবদুল হাদি আত-তাযি, *আহাদু আশারা কারনান ফি জামিআতি কাযবিন*, পৃ. ১৯।

৯৯. আবদুল্লাহ মাগুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৬।
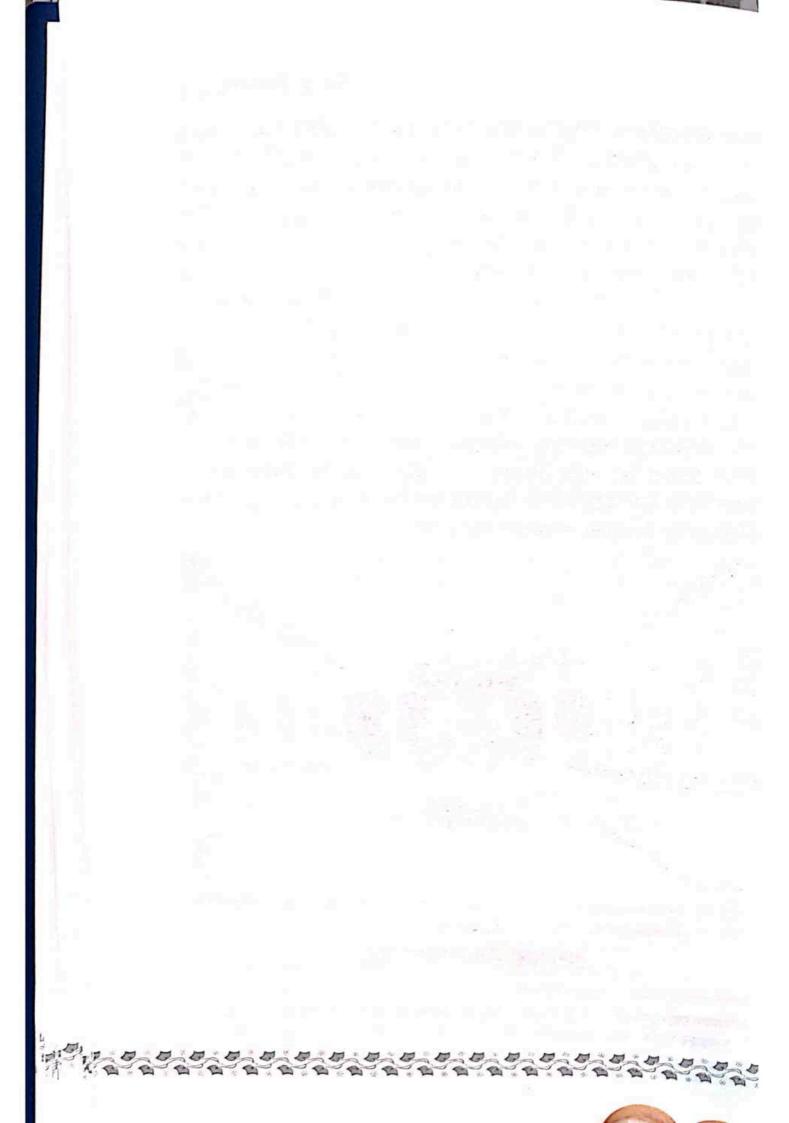
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মাদরাসা বা বিদ্যালয়

হিজরি পঞ্চম শতাব্দী থেকে ইসলামি সভ্যতায় মাদরাসা পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তার কারণ, মসজিদগুলোতে ইলমি হালকা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম যে মসজিদটি মাদরাসায় রূপান্তরিত করা হয় তা হলো জামে আল-আযহার। ৩৭৮ হিজরিতে এটিকে মাদরাসা বা বিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বের শহরগুলো মাদরাসায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ওপর এ সকল মাদরাসার ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনী নেতৃবৃন্দ, আলেম-উলামা, ব্যবসায়ী, আমির-উমারা ও বাদশাহ-উজিরদের ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে এসব মাদরাসা পরিচালিত হতো।

সত্যি বলতে, ইসলামি সভ্যতায় মাদরাসা এই সভ্যতার মতোই প্রাচীন। ইবনে কাসির ৩৮৩ হিজরি সালের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, উজির আবু নাসর সাবুর ইবনে আরদাশির[১০০] কারখে[১০১] একটি বাড়ি কিনলেন। বাড়িটির ইমারত নতুনভাবে সংস্কার করলেন। অসংখ্য বইপত্র এনে এতে জমা করলেন। তারপর বাড়িটি ফকিহদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। বাড়িটির নাম রাখলেন দারুল ইলম। আমি ধারণা করি এটিই প্রথম মাদরাসা যা ফকিহদের জন্য ওয়াকফ করা হয়। এটি বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বের ঘটনা।[১০২]

---

[১০০]. সাবুর ইবনে আরদাশির : আবু নাসর সাবুর ইবনে আরদাশির (মৃ. ৪১৬) বাহাউদ দাওলা আবু নাসর ইবনে আদুদ দাওলার উজির (মন্ত্রী) ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীদের অন্যতম ছিলেন। সাবুর ছিলেন দুঃসাহসী, তাকে দেখলেই সবার সমীহ জাগত। ছিলেন বদান্য ও সৌজন্যশীল এবং প্রশংসাভাজন। বাগদাদে দারুল ইলম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৭, পৃ. ৩৮৭; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ৩৫৪।

[১০১]. বাগদাদের পশ্চিম অর্ধাংশের ঐতিহাসিক নাম কারখ।

[১০২]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৩১২।

মাদরাসা-প্রতিষ্ঠা ব্যাপকতা লাভ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দামেশকে প্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৯১ হিজরিতে। এটি নির্মাণ করেন শুজা উদ-দাওলা সাদির ইবনে আবদুল্লাহ[১০৩]। মাদরাসাটির নাম রাখা হয় আল-মাদরাসাতুস সাদিরিয়্যাহ[১০৪]। তারপর তাকে অনুসরণ করেন দামেশকের কারি রাশা ইবনে নাযিফ[১০৫]। তিনি প্রায় চারশর মতো রাশায়ি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদে যেসব ইলমি হালকা বসত সেগুলো থেকে বেরিয়ে ছাত্ররা এসব মাদরাসায় ভর্তি হয়। বিশেষ শাখার জ্ঞান অর্জনের জন্য তারা নির্ধারিত স্থান পায়। ফলে এখানে ছাত্রদের জন্য এবং শাইখ ও শিক্ষকদের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। তাদের সকলের জন্য জ্ঞানচর্চার অবারিত উপকরণ মেলে।[১০৬]

প্রথম দিকে এসব মাদরাসা ছিল পারিবারিক বা ব্যক্তিগত। তারপর খিলাফত ও সরকারি প্রতিষ্ঠান মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। এ কাজটি শুরু হয় (সেলজুক সাম্রাজ্যের) প্রখ্যাত উজির নিজামুল মুলক আত-তুসির[১০৭] কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। তিনি তার শাসনকালে মাদরাসাগুলোকে সরকারীকরণ করেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানই মাদরাসার ব্যয়ভার বহন করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষক নিয়ে আসে।

তিনি বেশ কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে যে অবদান রেখেছেন তা তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মাবলির

---

১০৩. সাদির ইবনে আবদুল্লাহ : আল-মাদরাসাতুস সাদিরিয়্যাহর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দামেশকের জামে উমাবির (উমাবি জামে মসজিদের) পশ্চিম ফটকের সামনে বাবুল বারিদে ৪৯১ হিজরিতে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। দেখুন, ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ৫২, পৃ. ৪৬।

১০৪. আবদুল কাদির আন-নাইমি, *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, খ. ১, পৃ. ৪১৩।

১০৫. রাশা ইবনে নাযিফ : আবুল হাসান রাশা ইবনে নাযিফ ইবনে মাশাআল্লাহ আদ-দিমাশকি (৩৭০-৪৪৪ হি./৯৮০-১০৫২ খ্রি.)। কারি ও প্রখ্যাত আলেম। তিনি সিরিয়ার মাআররায় জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষা অর্জন করেন সিরিয়া, মিশর ও ইরাকে। দামেশকেই জীবন অতিবাহিত করেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ২১।

১০৬. আরিফ আবদুল গনি, *নুযুমুত তা'লিম ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৮৯।

১০৭. নিযামুল মুলক আত-তুসি : আবু আলি আল-হাসান ইবনে আলি আত-তুসি, উপাধি, নিযামুল মুলক (৪০৮-৪৮৫ হি./১০১৮-১০৯২ খ্রি.)। তুসের নুকান এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হন। সুলতান মুহাম্মাদ আলপ আরসালানের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি তাকে উজির নিযুক্ত করেন। বাগদাদের সবচেয়ে বড় মাদরাসা এবং অন্যান্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৯, পৃ. ৯৪; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২০২।

মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং তা তাকে অমরত্ব দিয়েছে। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন আল-মাদারিসুন নিযামিয়্যাহ। এসব মাদরাসাকে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম প্রকারের জ্ঞান-সংস্থা ও নিযামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা হয়। এসব মাদরাসার ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ও জীবনযাপনের সব রকমের উপকরণ সরবরাহ করা হতো। নিযামি মাদরাসাগুলো ছিল হাদিস ও ফিকহ পঠনপাঠনের জন্য বিশেষায়িত। এসব মাদরাসার ছাত্ররা খাবার ও আবাসন পেত, তাদের অনেককে মাসিক ভাতাও প্রদান করা হতো।

নিযামুল মুলকের উৎসাহ ও উদ্যম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফলে যা ঘটল তা অভাবনীয়। ডজন ডজন মাদরাসায় ইরাক ও খোরাসান ভরে গেল। এমনকি এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, ইরাক ও খোরাসানের প্রতিটি শহরে ও নগরে একটি করে মাদরাসা ছিল। নিযামুল মুলক শহরে তো বটেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি যে অঞ্চলেই কোনো আলেম পেয়েছেন এবং তাকে জ্ঞান-বিদ্যায় দক্ষ ও অনন্য দেখেছেন, তার জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। মাদরাসাটির জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন এবং গ্রন্থাগারও নির্মাণ করেছেন। এ সকল মাদরাসায় ছাত্ররা বিনা পয়সায় পড়াশোনা করত। তা ছাড়া দরিদ্র ছাত্রদেরকে তাদের জন্য গঠিত বিশেষ তহবিল/বরাদ্দ থেকে নির্ধারিত পরিমাণে ভাতা দেওয়া হতো।[১০৮]

নিযামুল মুলক যেসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাগদাদের আল-মাদরাসাতুন নিযামিয়্যাহ (নিযামিয়া মাদরাসা)। ৪৫৭ হিজরিতে মাদরাসাটির নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় ৪৫৯ হিজরিতে।[১০৯] আব্বাসি খলিফা মাদরাসাটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তিনি নিজে শিক্ষকমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। নিযামিয়া মাদরাসায় হাদিস ও ফিকহ পড়ানো হতো, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েরও পাঠদান করা হতো। জ্ঞান ও চিন্তার জগতে যে-সকল মনীষী তখন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছিলেন তারা নিযামিয়া মাদরাসায়

---

১০৮. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০৩-১০৪।

১০৯. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ৯২।

পাঠদান করেছেন। যেমন *'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন'*-এর লেখক হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ আল-গাযালি।[১১০] এই সময়ে নিশাপুরের নিযামিয়া মাদরাসায় আরেকজন মনীষী পাঠদান করতেন, তিনি হলেন ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলি আল-জুওয়াইনি[১১১]।[১১২]

বাগদাদ, ইস্পাহান, নিশাপুর ও মারভে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাদরাসাগুলো সুন্নি মাযহাবের নীতিমালার সুরক্ষা ও দৃঢ়ীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে সময়ে যে নানা প্রকারের বিদআত ও বিকৃত মাযহাবের সয়লাব ঘটেছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিল। নিযামুল মুলক প্রতি বছর মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, ফকিহ ও আলেমদের জন্য যে টাকা ব্যয় করতেন তার পরিমাণ ছিল তিন লাখ দিনার। সেলজুকি সুলতান জালালুদ দাওলা মালিক শাহ (ইবনে মুহাম্মাদ আলপ আরসালান) তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আমাকে যা দিয়েছেন তা আর কাউকে দেননি। আমরা কি তার বিনিময়ে আল্লাহর দ্বীনের ধারকবাহক ও তার কিতাবের হেফাজতকারীদের জন্য তিন লাখ দিনার ব্যয় করব না?[১১৩]

---

১১০. প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৬৯।

১১১. আবুল মাআলি আল-জুওয়াইনি : আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল-জুওয়াইনি (৪১৯-৪৭৮ হি./১০২৮-১০৮৫ খ্রি.)। উপাধি, ইমামুল হারামাইন, ফাখরুল ইসলাম। ইমামদের ইমাম। শাফিয়ি মাযহাবপন্থী বিখ্যাত ফকিহ। ইমাম গাযালির উস্তাদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব*। দেখুন, তাকিউদ্দিন আস-সিরফিনি রচিত *আল-মুনতাখাব মিন কিতাবিস সিয়াক লি-তারিখি নিসাবুর*, খ. ১, পৃ. ৩৬১।

১১২. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৯, পৃ. ১৬৭।

১১৩. আবদুল হাদি মুহাম্মাদ রেজা, *নিযামুল মুলক*, পৃ. ৬৫১।

চিত্র নং-৬
আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহ

হিজরি চতুর্থ ও খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে ইসলামি সভ্যতায় মাদরাসার বিস্তৃতি ঘটে। তা প্রমাণ করে যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা কতটা অগ্রগামী। জ্ঞানের এমন বিস্তৃতির সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসভ্যতা তখনও পরিচিত ছিল না। উল্লেখ্য সে সময়ে ইউরোপ জ্ঞানের যৎসামান্য অংশেরই অধিকারী ছিল। বরং সে সময় চার্চ জ্ঞানের সকল উপকরণ নিজেদের একচেটিয়া করে নিয়েছিল। তার পরিণাম ছিল এই যে, ইউরোপীয়রা যুগের পর যুগ অন্ধকার, অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতায় কাটিয়েছে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিরাজমান থেকেছে। বিশেষ করে জার্মান গোত্রগুলো একসময় রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং অন্যান্য সময় অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া বর্ণপ্রথা একটি পবিত্র রূপ নিয়ে তখন ইউরোপে জেঁকে বসেছিল। তার ফলে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা অবজ্ঞা ও উপেক্ষার শিকার হয়েছে।[১১৪]

---

১১৪. জোহান হুইজিঙ্গা, *The Waning of the Middle Ages* (১৯২৪), আরবি অনুবাদ, اضمحلال العصور الوسطى, পৃ. ১৭৫।

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক অবক্ষয়ের দিনেও জ্ঞান-আন্দোলন প্রভাবিত হয়নি। বরং তার বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। ৬৩১ হিজরিতে/১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় তাতাররা ইসলামি বিশ্বের পূর্বাঞ্চলকে তছনছ করে দিচ্ছিল। আব্বাসি খেলাফতকে সরাসরি হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। সবচেয়ে দুর্বল পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল আব্বাসি খেলাফত। তারপরও এই অবিনশ্বর মাদরাসাটির প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। ইবনে কাসির রহ. মাদরাসাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, মাদরাসাটি অভূতপূর্ব। এর আগে এমন মাদরাসা নির্মিত হয়নি। চার মাযহাবের প্রত্যেকটির জন্য ৬২ জন ফকিহ এবং চারজন সহকারী (পুনরাবৃত্তিকারী) আছেন। প্রত্যেক মাযহাবের একজন মুদাররিস, একজন শাইখুল হাদিস, দুইজন কারি এবং দশজন শ্রোতা আছেন। চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ আছেন একজন। চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চায় ব্রত আছেন দশজন মুসলিম। তাদের জন্য মাদরাসাটি ওয়াকফ করা হয়। এতিমদের জন্য আছে একটি মক্তব। মাদরাসাটির সকলের জন্য রুটি, গোশত ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খরচাদি নির্ধারিত রয়েছে। ৫ রজব বৃহস্পতিবার মাদরাসাটিতে দরস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহ নিজেও উপস্থিত হন। তার রাজ্যের আমির-উমারা, উজিরবৃন্দ, বিচারকবৃন্দ, ফকিহগণ, সুফিগণ ও কবিরাও উপস্থিত হন। তাদের কেউই বাদ পড়েননি। মাদরাসায় বিশাল দস্তরখানে ভোজের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত সকলেই খাদ্য গ্রহণ করেন। বাগদাদের প্রত্যেক গলিতে বিশেষ ও সাধারণ সকল মানুষের ঘরে এই দস্তরখান থেকে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়। মাদরাসার শিক্ষকদের, ফকিহদের ও সহকারীদের সবাইকে মূল্যবান বস্তু উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও মূল্যবান উপহার পান। দিনটি ছিল স্মরণীয়। কবিরা খলিফার প্রশস্তি ও স্তব বর্ণনা করে উৎকৃষ্ট মানের কবিতা আবৃত্তি করেন। ইবনুস সায়ি[১১৫] তার ইতিহাসগ্রন্থে এই ঘটনার বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন।

---

১১৫. ইবনুস সায়ি : আবু তালিব আলি ইবনে আনজাব ইবনে উসমান ইবনে আবদুল্লাহ (৫৯৩-৬৭৪ হি./১১৯৭-১২৭৫ খ্রি.)। বিখ্যাত ইতিহাসলেখক। বাগদাদে জন্ম ও মৃত্যু। আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহর গ্রন্থাগারের জিম্মাদার ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো পঁচিশ খণ্ডে রচিত *আল-জামিউল মুখতাছার ফি উনওয়ানিত তাওয়ারিখি ওয়া উয়ুনিস সিয়ার*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২৬৫।

মাদরাসাটিতে শাফিয়ি মাযহাবের পাঠদানের জন্য নিযুক্ত করা হয় ইমাম মুহিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইবনে ফাদলানকে[১১৬], হানাফি মাযহাবের পাঠদানের জন্য নিযুক্ত করা হয় ইমাম আল্লামা রশিদুদ্দিন আবু হাফস উমর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ফারগানিকে[১১৭] এবং ইমাম মুহিউদ্দিন ইউসুফ ইবনে শাইখ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযিকে[১১৮] নিযুক্ত করা হয় হাম্বলি মাযহাবের পাঠদানের জন্য। সেদিন তার অনুপস্থিতিতে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দরস দান করেন তার পুত্র আবদুর রহমান[১১৯]। মুহিউদ্দিন ইউসুফ কোনো সম্রাটের কাছে পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্বে ছিলেন। মালিকি মাযহাবের পক্ষে দরস দান করেন আশ-শাইখ আস-সালেহ আবুল হাসান আল-মাগরিবি আল-মালিকি। তিনিও অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দরস দান করেন। মালিকি মাযহাবের দরস দানের জন্য অন্য একজন শাইখকে নিযুক্ত করা হয়। গ্রন্থাগারও ওয়াকফ করা হয়। এটির গ্রন্থ-সমৃদ্ধি অভূতপূর্ব, কপিগুলোও চমৎকার, ওয়াকফকৃত গ্রন্থাবলিও অসাধারণ।[১২০]

আইয়ুবীয় সাম্রাজ্যে এত বেশি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তা আমাদের মনোযোগ দাবি করে। এসব মাদরাসা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল

---

১১৬. ইবনে ফাদলান : মুহিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইবনে ফাদলান আল-বাগদাদি আশ-শাফিয়ি (মৃ. ৬৩১ হি./১২৩৩ খ্রি.)। আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহর শিক্ষক, প্রধান বিচারক। শাফিয়ি মাযহাবের উঁচু স্তরের আলেম। খোরাসান ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার আলেমদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনায় অংশ নিয়েছেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৫, পৃ. ১৩২।

১১৭. আল-ফারগানি : উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আবু উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু নাসর আল-আন্দাকানি ৬৩২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে আবুল ওয়াফা আল-কুরাশি, *আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা ফি তবাকাতিল হানাফিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৬৬২-৬৬৩।

১১৮. ইউসুফ আল-জাওযি : মুহিউদ্দিন ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনুল জাওযি আল-কুরাশি আল-বাগদাদি (৫৮০-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.)। 'আস-সাহিব ইবনুল জাওযি' নামে পরিচিত। আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি নামে পরিচিত। তার পিতা ও অন্যদের কাছে জ্ঞান অর্জন করেছেন। বাগদাদের অন্যায়-প্রতিরোধ প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়াকফ-পরিদর্শক হিসেবেও কাজ করেছেন। তাতার ঘাতকরা তাকে হত্যা করে। তাদের প্রতিহত করতে গিয়ে তিনি ও তার তিন পুত্র শহিদ হন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ২৩৬।

১১৯. আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনুল জাওযি। তার পিতার সঙ্গে শহিদ হন। বাগদাদে হালাকুখানের অনুপ্রবেশের সময় (৬৫৬ হি./১২৫৮ খ্রি.) নিহত হন। তিনি তখন মাত্র পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। তার একটি কাব্যসংকলন আছে। দেখুন, উমর রেজা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৫, পৃ. ২০০।

১২০. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১৩, পৃ. ১৩৯-১৪০।

শিয়া মতাদর্শের মূলোৎপাটন, যা আইয়ুবি শাসনের পূর্বে উবাইদিয়া রাজবংশের শাসনামল থেকে মিশরে শেকড় বিস্তার করে ছিল।

এ কারণে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ মিশরের সকল প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাদরাসা-প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছিলেন মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ এবং নিরাপত্তা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। ইবনুল আসির[১২১] ৫৬৬ হিজরির ঘটনাবলির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, মিশরে দারুল মাউনা নামে একটি পুলিশ-কেন্দ্র ছিল। তারা যাকে চাইত তাকেই এতে বন্দি করে রাখত। সালাহুদ্দিন এটি গুঁড়িয়ে দেন এবং এটিকে শাফিয়ি মাযহাবের মাদরাসায় রূপান্তরিত করেন। এখানে যেসব জোরজুলুম ও অন্যায়-অবিচার হতো সেগুলোর অবসান ঘটান।[১২২]

ইসলামি মিশরের ইতিহাসে মাদরাসা-নির্মাণে যিনি প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন সালাহুদ্দিন। তিনি আল-মাদরাসাতুস সালাহিয়্যা, আল-মাদরাসাতুন নাসিরিয়্যাহ ও আল-মাদরাসাতুল কামহিয়্যাহ[১২৩] প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৪]

আমির-উমারা, ধনাঢ্য বক্তিবর্গ এবং ব্যবসায়ীরাও মাদরাসা-প্রতিষ্ঠায় প্রতিযোগিতা করতেন। মাদরাসাগুলো যাতে চালু থাকে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা এসে অবৈতনিকভাবে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করতেন। অসংখ্য মানুষ তাদের বাড়িকে মাদরাসায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তারা তাদের সংগৃহীত গ্রন্থাবলি ও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি মাদরাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াকফও করেছিলেন। এ

---

[১২১]. ইবনুল আসির, আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কারিম আল-জাযারি (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ খ্রি.)। বিখ্যাত ও বিদগ্ধ ঐতিহাসিক। জাযিরা ইবনে উমরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মসুলে মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الكامل في التاريخ, التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية, أسد الغابة في معرفة الصحابة, اللباب في تهذيب الأنساب। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২২, পৃ. ৩৫৪-৩৫৬।

[১২২]. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ১০, পৃ. ৩১-৩২।

[১২৩]. আল-মাদরাসাতুল কামহিয়্যাহ নামকরণের কারণ হলো এই মাদরাসায় নিযুক্ত ফকিহদের জন্য গমের (কাম্‌হ) চাষ করা হতো। মাদরাসাটির জন্য মধ্য মিশরের ফাইয়ুম এলাকায় এক বিশাল ভূমি ওয়াকফ করেছিলেন সালাহুদ্দিন। এখানে গমের চাষ হতো। দেখুন, ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজ আল-কুরুব*, খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

[১২৪]. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, খ. ৫, পৃ. ১৩৭।

কারণে প্রাচ্যে মাদরাসার সংখ্যা এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তা ছিল আশ্চর্যজনক ও হতবুদ্ধিকর। এমনকি আন্দালুসীয় পর্যটক ইবনে জুবায়ের প্রাচ্যে মাদরাসার আধিক্য ও মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়ের প্রাচুর্য দেখে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পশ্চিমের লোকদেরকে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাচ্যে আগমনের আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন, তাতে এ কথাও ছিল, প্রাচ্যের সব দেশেই শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। বিশেষ করে দামেশককে সবচেয়ে বেশি...। আমাদের পশ্চিমের (মাগরিবের) সন্তানদের মধ্যে যারা সফলকাম হতে চায় তারা যেন এসব দেশে ভ্রমণ করে। তারা তালিবুল ইলমদের জন্য সহায়ক বস্তুরাশির প্রাচুর্য এখানে পাবে। তার প্রথমটি হলো জ্ঞানচর্চার জন্য রুটিরুজির চিন্তামুক্ত হওয়া।[১২৫]

সুলতানগণ এবং আমির-উমারা যে মাদরাসা-নির্মাণ ও মাদরাসায় সাহায্য-সহযোগিতায় প্রতিযোগিতা করতেন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। গজনি ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সুলতান ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাসউদ নিজের জন্য কোনো ঘরও নির্মাণ করেননি, কিন্তু তিনি মাদরাসা-নির্মাণ ও সাহায্য-সহযোগিতায় সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।[১২৬]

ইসলামি সভ্যতায় নারীদেরও এই সভ্যতার ছেলে-মেয়েদের জন্য হিতকর মাদরাসা নির্মাণের অধিকার ছিল। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বোন সাইয়িদা রাবিয়া খাতুন বিনতে আইয়ুব হাম্বলি মাযহাবের পাঠদানের জন্য দামেশকের কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে আল-মাদরাসাতুস সাহিবিয়্যাহ (মাদরাসাতুস সাহিবাহ) প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১২৭]

বাগদাদে অবস্থিত মাদরাসাগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনে জুবায়ের বলছেন, বাগদাদে প্রায় ত্রিশটি মাদরাসা রয়েছে। সবগুলোই বাগদাদের পূর্বাংশে। প্রত্যেকটি মাদরাসার নির্মাণশৈলীর কাছে সুরম্য অট্টালিকাও তুচ্ছ। এসব মাদরাসার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত হলো নিযামিয়া মাদরাসা। এটি নির্মাণ করেছেন নিযামুল মুলক। ৫০৪ হিজরিতে মাদরাসাটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। এই মাদরাসার জন্য ওয়াকফের পরিমাণ বিপুল, ভূসম্পত্তিও প্রচুর। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে মাদরাসায় শিক্ষক

---

[১২৫]. ইবনে জুবায়ের : *রিহলাহ ইবনে জুবায়ের*, পৃ. ২৫৮।

[১২৬]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ১৫৭।

[১২৭]. প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩১৭।

হিসেবে নিযুক্ত ফকিহদের ব্যয়নির্বাহ করা হয় এবং অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়।[১২৮]

মিশরে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতা। তিনি বলছেন, মিশরে মাদরাসার সংখ্যা এত বেশি যে কেউ তার সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারবে না।[১২৯] আল-মাকরিযি উল্লেখ করেছেন যে, মিশরে সত্তরটিরও বেশি মাদরাসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।[১৩০]

সেই সময়ে ইসলামি বিশ্বে মাদরাসার অবস্থা কীরূপ ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় বুতরুস আল-বুস্তানি[১৩১] যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে তা থেকে। তাতে বলা হয়েছে, আরবদের মাদরাসাগুলো ছিল জ্ঞানে উজ্জ্বল, বাগদাদ থেকে কর্ডোভা পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল সেগুলো। তাদের মহাবিদ্যালয় ছিল সতেরোটি। কর্ডোভার মহাবিদ্যালয়টি ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। বলা হয়ে থাকে, এই মহাবিদ্যালয়ে যে গ্রন্থাগার ছিল তাতে ৬ লাখ কপি বই ছিল। তারা রূপমূলতত্ত্ব (ইলমুস সারফ), ব্যাকরণ, ছন্দতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করত। তাদের প্রত্যেক মসজিদের পাশে প্রাথমিক মাদরাসা ছিল। এতে তারা পাঠ ও হস্তলিপি শিক্ষা দিত।[১৩২]

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এসব মাদরাসায় পঠনপাঠন কেবল ধর্মীয় জ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি প্রকৃতিবিজ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া হতো। যেমন প্রকৌশল, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদি। বরং কিছু কিছু মাদরাসা এসব প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ায় বিশেষায়িত ছিল।

---

১২৮. ইবনে জুবায়ের, *রিহলাহ ইবনে জুবায়ের*, পৃ. ২০৫।

১২৯. *রিহলাহ ইবনে বতুতা*, পৃ. ২০।

১৩০. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, খ. ২, পৃ. ৩৬২-৪০০।

১৩১. বুতরুস আল-বুস্তানি (১৮১৯-১৮৮৩ খ্রি.) : বুতরুস ইবনে পল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কারাম আল-বুস্তানি। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি লেবাননের খারুব প্রদেশের দিব্বিয়ায় একটি ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দেখুন, উমর রেজা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৩, পৃ. ৪৮।

১৩২. বুতরুস আল-বুস্তানি, *দাইরাতুল মাআরিফ*, খ. ৬, পৃ. ১৬১-১৬২; আবদুল্লাহ মাওখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৯ থেকে উদ্ধৃত।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের জন্য কয়েকটি বিশেষ মাদরাসা ছিল। হাসপাতালগুলোতে তারা চিকিৎসাশাস্ত্র শেখাত।[১৩৩]

আন্দালুসে প্রাথমিক মাদরাসা ছিল অসংখ্য। তবে এসব মাদরাসায় শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়ার রীতি ছিল। এ কারণে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় হাকাম (মৃ. ৩৬৬ হি.) দরিদ্র মানুষের সন্তানদের বিনা পয়সায় শিক্ষাদানের জন্য সাতাশটি মাদরাসা বৃদ্ধি করেছিলেন। মেয়েরাও ছেলেদের মতো মাদরাসায় যেত, সমানভাবেই।

উচ্চশিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন স্বতন্ত্র পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। তারা এসব মাদরাসায় বক্তৃতা দিতেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ডরূপে যে শিক্ষাকাঠামো রয়েছে তা আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের সময় গঠিত হয়েছে। একইভাবে গ্রানাডা, তুলাইতালা (টলেডো), সেভিল, মুরসিয়া (Murcia), আলমেরিয়া, ভ্যালেন্সিয়া ও কাদিজে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১৩৪]

মাগরিবের আমির-উমারা ও সুলতানগণ মাদরাসা-নির্মাণে গুরুত্ব দিয়েছেন। মুরাবিত রাজন্যবর্গ নগরীতে ও প্রত্যন্ত এলাকায় বিশেষ করে সুস অঞ্চলে[১৩৫] বহু মাদরাসা নির্মাণ করেছেন। এসব মাদরাসা বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্ম দিয়েছে। এমন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক। তাদের জ্ঞান তাদেরকে ইসলামি বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষদের কাতারে জায়গা করে দিয়েছে। সুস অঞ্চলে মাদরাসা ছিল প্রায় চারশ। মুহাম্মাদ আল-মুখতার আস-সুসি[১৩৬] তার রচিত গ্রন্থ 'সুস আল-*আলিমা*'-য় সুসের প্রঞ্চাশটি মাদরাসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন[১৩৭]

---

১৩৩. প্রাগুক্ত।

১৩৪. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ৩০৬।

১৩৫. Souss-Massa-Drâa.

১৩৬. আল-মুখতার আস-সুসি : মুহাম্মাদ আল-মুখতার ইবনে আলি ইবনে আহমাদ আল-ইলগি আস-সুসি (১৩১৮-১৩৮৩ হি./১৯০০-১৯৬৩ খ্রি.) ছিলেন ইতিহাসবিদ, ফকিহ, আদিব। তিনি মুখে মুখে কবিতা বলতেন। ওয়াজির আত-তাজ হিসেবে পরিচিত। তার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : رجال العلوم العربية في سوس، خلال جزولة في أربعة أجزاء، المعسول في عشرين جزءا.।
দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ৯৩।

১৩৭. মুহাম্মাদ আল-মুখতার আস-সুসি, *সুস আল-আলিমা*, পৃ. ১৫৪-১৬৭।

এবং *'মাদারিস সুস আল-আতিকা'* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন একশটি মাদরাসা সম্পর্কে।[১৩৮]

মুসলিম গোত্রগুলোই এসব মাদরাসার অর্থায়ন করত। তাদের ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশের কিয়দংশ এসব মাদরাসার জন্য নির্ধারিত ছিল। মাদরাসার সুরক্ষা ও খরচাদির জন্য তারা মালিকানাধীন অনেক সম্পত্তি ওয়াকফও করে দিয়েছিল। মাদরাসার যাবতীয় ব্যয়ভার তারা বহন করত। সুস অঞ্চলের মুসলিম গোত্রগুলো পাহাড়ে ও সমতলভূমিতে মাদরাসা-নির্মাণের প্রতিযোগিতা করত। প্রত্যেক গোত্রেরই মাদরাসা থাকত একটি বা দুটি বা তিনটি। মুরাবিত রাজন্যবর্গের শাসনামলে যেসব মাদরাসা নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো—ইতিপূর্বে যেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও—'মাদারিসে সাবতা'[১৩৯]। এ ছাড়া তানজা[১৪০], আগমাত[১৪১], সিজিলমাসা[১৪২], তিলিমসান[১৪৩] ও মারাকেশে কয়েকটি বিখ্যাত মাদরাসা রয়েছে। এসব মাদরাসা কায়রাওয়ানের জ্ঞানসম্ভার এবং আন্দালুসের বিখ্যাত সংস্কৃতির আশ্রয়ে গড়ে উঠেছিল। বড় বড় মনীষীর জন্ম হয়েছে এসব মাদরাসা থেকে। তাদের মধ্যে রয়েছেন কাজি ইয়ায[১৪৪] এবং আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ[১৪৫]। তিনি *কিতাবুল মুকাদ্দিমাতিল আওয়ায়িলি লিল-মুদাওয়ানাতি*,

---

১৩৮. মুহাম্মাদ আল-মুখতার আস-সুসি, *মাদারিস সুস আল-আতিকা*, পৃ. ৯৩-১৩৪।

১৩৯. সাবতা : Ceuta, Spain.

১৪০. তানজা : Tangier, Morocco.

১৪১. আগমাত : Aghmat, Morocco.

১৪২. সিজিলমাসা : Sijilmassa, Morocco.

১৪৩. তিলিমসান : Tlemcen, Algeria.

১৪৪. কাজি ইয়ায : আবুল ফযল ইয়ায ইবনে মুসা ইবনে ইয়ায আল-ইয়াহসুবি আস-সাবতি (৪৭৬-৫৪৪ হি./১০৮৩-১১৪৯ খ্রি.)। হাদিস, ইলমুল হাদিস, ব্যাকরণ, ভাষা, আরবদের কথা, ইতিহাস ও বংশতালিকাবিদ্যা ইত্যাদিতে তার যুগের ইমাম ছিলেন। তার জন্ম সাবতায় এবং তিনি এখানকার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর তিনি গ্রানাডার বিচারকের দায়িত্বও পালন করেছেন। মারাকেশে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৪৮৩-৪৮৫।

১৪৫. ইবনে রুশদ : আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি (৫২০-৫৯৫ হি./১১২৬-১১৯৮ খ্রি.)। ইবনে রুশদ আল-হাফেয (নাতি ইবনে রুশদ) নামে বিখ্যাত। তিনি দার্শনিক ইবনে রুশদের নাতি। কাজি ইয়াযের শিক্ষক। কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কর্ডোভার প্রধান বিচারক ছিলেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২১, পৃ. ৩০৭-৩০৯; ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৪, পৃ. ৩৬৭।

আল-বায়ান ওয়াত-তাহসিল ওয়াত-তাওজিহ ওয়াত-তালিল ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৪৬]

যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার তা এই যে, প্রাচ্যের ও মাগরিবের (মরক্কোর) এসব শিক্ষার্থীরা পর্যাপ্ত ভরণপোষণ পেত। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় অর্থ—সবই পেত তারা। এ কারণেই ইসলামি সভ্যতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শহরের পরিচয় ঘটেছে পাশ্চাত্যের চেয়ে কয়েকশ বছর আগে। ৭২১ হিজরিতে মরক্কোয় মারিনীয়[১৪৭] সাম্রাজ্যের সুলতান আবু সাইদ উসমান ইবনে ইয়াকুব (মৃ. ৭৩১ হি.)[১৪৮] নতুন ফাসে (নিউ ফেজ) যে মাদরাসাটি রয়েছে তা নির্মাণের নির্দেশ দেন। একটি মজবুত ও সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। কুরআন অধ্যয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের ভর্তি করেন এবং শিক্ষকতার জন্য ফকিহদের নিযুক্ত করেন। তাদের জন্য মাসিক ভাতা, বেতন ও অন্যান্য খরচাদি নির্ধারণ করে দেন। মাদরাসাটির জন্য বাড়ি ও ভূসম্পত্তি ওয়াকফ করেন। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের আশাতেই তিনি এসব কাজ সম্পাদন করেন।[১৪৯]

মরক্কোর মারিনীয় যেসব সুলতান মাদরাসা-নির্মাণের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন সুলতান আবু সাইদ। ৭২৩ হিজরির শাবান মাসের শুরুতে সুলতান আবু সাইদ ফাসে জামে আল-কারয়িয়্যিনের পাশে (উত্তরে) সবচেয়ে বড় মাদরাসাটি নির্মাণের নির্দেশ দেন। সেটি আজ মাদরাসাতুল আত্তারিন নামে পরিচিত। মাদরাসাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শাইখ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে কাসিম আল-মিযওয়ার এবং একদল ফকিহ ও কল্যাণকামী ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে

---

[১৪৬]. হাসান আস-সায়িহ, *আল-হাদারাতুল মাগরিবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৬৪।

[১৪৭]. المرينيون/The Marinid Sultanate.

[১৪৮]. আবু সাইদ উসমান ইবনে ইয়াকুব ইবনে আবদুল হক (৬৭৫-৭৩১ হি./১২৭৫-১৩৩১ খ্রি.) ছিলেন মরক্কোর দশম মারিনীয় সুলতান। তিনি একুশ বছর চারমাস রাজত্ব পরিচালনা করেন। তিনি ১৩২৩-২৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাসাতুল আত্তারিন নির্মাণ করেন। এটি মরক্কোয় নির্মিত অন্যতম সুন্দর মাদরাসা। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে খালিদ আন-নাসিরি, *আল-ইসতেকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, খ. ৩, পৃ. ১০৩-১১৬; ইসমাইল ইবনুল আহমার, *রাওযাতুন নিসরিন ফি দাওলাতি বানি মারিন*, পৃ. ২৩-২৪।

[১৪৯]. আবুল আব্বাস আন-নাসিরি, *আল-ইসতেকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, খ. ৩, পৃ. ১১১-১১২।

সুলতান আবু সাইদ নিজেও উপস্থিত থাকেন। মাদরাসাটির নির্মাণকাজ সুলতানের উপস্থিতিতেই শুরু হয়। নির্মাণকাজ শেষ হলে এই মাদরাসা মারিনীয় সাম্রাজ্যের আশ্চর্যজনক স্থাপত্যে পরিণত হয়। তার আগে কোনো সুলতান এমন মাদরাসা নির্মাণ করেননি। মাদরাসার প্রাঙ্গণে সেখানকার ঝরনা থেকে প্রবহমান পানি আনার জন্য নালা তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি মুখরিত হয়ে ওঠে। সুলতান মাদরাসাটির জন্য একজন ইমাম, দুজন মুয়াজ্জিন ও একদল কর্মচারী নিয়োগ দেন। শিক্ষকতার জন্য ফকিহদের নিযুক্ত করেন। মাদরাসার প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেন পর্যাপ্তেরও বেশি ভাতা, বেতন ও খোরপোশ। কয়েকটি তালুক কিনে তা মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করেন এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই।[১৫০]

অসংখ্য মাদরাসা নির্মিত হয়েছে বলে মামলুক শাসনামলের খ্যাতি রয়েছে। মামলুক আমির-উমারা ও সুলতানরা ধর্মীয় ও সাধারণ মাদরাসা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করেছেন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অট্টালিকা ও ভবন নির্মাণ করেছেন। এসব মাদরাসায় তারা শ্রেষ্ঠ ও বড় বড় আলেমদের নিযুক্ত করেছেন। শাইখ ইযযুদ্দিন আবদুল আযিয ইবনে আবদুস সালাম[১৫১] ৬৫০ হিজরিতে বাইনাল কাসরাইন[১৫২]-এ অবস্থিত আল-মাদরাসাতুস সালাহিয়্যায় পাঠদান করেছেন।[১৫৩] এই মাদরাসায় ৬৮০ হিজরিতে পাঠদান করেছেন তাকিউদ্দিন ইবনে বিন্‌ত আল-আ'আয[১৫৪]। ৭৭৯

---

১৫০. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১২।

১৫১. আল-ইয ইবনে আবদুস সালাম : আবদুল আযিয ইবনে আবদুস সালাম আদ-দিমাশকি (৫৭৭-৬৬০ হি./১১৮১-১২৬২ খ্রি.)। তার লকব বা উপাধি হলো ইযযুদ্দিন। তিনি সুলতানুল উলামা (আলেমদের সম্রাট) হিসেবে পরিচিত। শাফিয়ি মাযহাবপন্থী ফকিহ, মুজতাহিদ পর্যায়ের আলেম। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছেন। মিশরের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *আত-তাফসিরুল কাবির*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২১।

১৫২. এটি ফাতেমীয় রাজবংশের শাসনামলের দুটি প্রাসাদের মধ্যবর্তী এলাকা বা ময়দান বা সড়ক। ময়দানের পুব পাশের বড় প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন খলিফা আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহ এবং পশ্চিম পাশের ছোট প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহর পুত্র খলিফা আল-আযিয বিল্লাহ। এই ময়দানে দশ হাজার সৈন্য কুচকাওয়াজ করতে পারত।-অনুবাদক।

১৫৩. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ৪৮৫।

১৫৪. তাকিউদ্দিন ইবনে বিন্‌ত আল-আ'আয : মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে খাল্‌ফ আল-আলায়ি (মৃ. ৬৯৫ হি./১২৯৬ খ্রি.), কাজি শিহাবুদ্দিন ইবনে কাজি আলাউদ্দিন ইবনে কাজিউল কুযাত তাজুদ্দিন, ইবনে বিন্‌ত আল-আ'আয আল-মিশরি আশ-

হিজরিতে আল-মাদরাসাতুন নাসিরিয়্যায় পাঠদান করেছেন সিরাজুদ্দিন আল-বুলকিনি[১৫৫]। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুর রহমান ইবনে খালদুন ৭৮৬ হিজরিতে পাঠদান করেছেন আল-মাদরাসাতুল কামহিয়্যায় এবং মামলুক রাজবংশের ইতিহাসজুড়ে প্রখ্যাত আলেম-উলামা এসব মাদরাসায় পাঠদান করেছেন।[১৫৬]

আলেম-উলামা, ফকিহগণ, সাধারণ মানুষ এবং তাদের সঙ্গে সুলতানরাও কোনো মাদরাসা উদ্বোধনের সময় বড় ধরনের মাহফিল ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। ৬৬১ হিজরিতে আল-মালিক আয-যাহির বাইবার্স আল-মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাহ উদ্বোধন করেন। বাইনাল কাসরাইন-এ মাদরাসা-ভবনের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে এখানে আলেম-উলামা সবাই সমবেত হন। কারিরা উপস্থিত হন এবং প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা তাদের জন্য নির্ধারিত হলঘরে বসেন। হানাফি মাযহাবের পাঠদানের সূচনা করেন মাজদুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনুস সাহিব কামালুদ্দিন ইবনুল আদিম, শাফিয়ি মাযহাবের পাঠদানের সূচনা করেন শাইখ তাকিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে রাযিন। কুরআনের দরসদানের সূচনা করার জন্য মনোনীত করা হয় ফকিহ কামালুদ্দিন আল-মাহাল্লিকে এবং হাদিসে নববির পাঠদানের সূচনা করার জন্য শাইখ শারফুদ্দিন আবদুল মুমিন ইবনে খাল্‌ফ আল-দিময়াতিকে মনোনীত করা হয়। তারা সবাই দরসদান করেন। দস্তরখানা বিছানো হয়। জামালুদ্দিন আবুল হাসান আল-জাযযার[১৫৭] কবিতা আবৃত্তি করেন ...। আরও কয়েকজন কবি কবিতা পাঠ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সিরাজ আল-ওয়াররাক, শাইখ

শাফিয়ি নামে পরিচিত। দেখুন, আল-ফাসি, *যাইলুত তাকলিদ ফি রুওয়াতিস সুনান ওয়াল আসানিদ*, খ. ১, পৃ. ৫২।

[১৫৫]. সিরাজুদ্দিন আল-বুলকিনি : আবু হাফ্‌স উমর ইবনে রাসলান ইবনে নাসির ইবনে সালিহ আল-কিনানি (৭২৪-৮০৫ হি./১৩২৪-১৪০৩ খ্রি.)। মুজতাহিদ, হাফেযে হাদিস, শাফিয়ি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম। মিশরের পশ্চিমাঞ্চল বুলকিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ৭৬৯ হিজরিতে শামের (সিরিয়ার) বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। জামে ইবনে তুলুন ও আল-মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাতে তাফসিরের পাঠদান করেন। তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৪৬।

[১৫৬]. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭: খ. ৫, পৃ. ১৬৩।

[১৫৭]. আল-জাযযার : ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল আযিম ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ (৬০১-৬৭৯ হি./১২০৪-১২৮০ খ্রি.)। মিশরের প্রখ্যাত কবি। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৫৩।

জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনুল খাশশাব। তাদের সবাইকে সম্মানসূচক পোশাক পরিধান করানো হয়। দিনটি ছিল স্মরণীয়। সুলতান এই মাদরাসাকে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থের ভান্ডারে পরিণত করেন। মাদরাসার পাশেই এতিমদের জন্য একটি মক্তব নির্মাণ করেন। মক্তবের এতিম শিশুদের জন্য প্রতিদিন রুটি এবং প্রত্যেক শীতে ও গ্রীষ্মে পোশাক বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দেন।[১৫৮]

অসংখ্য মামলুক আমির ছিল যারা তাদের বাড়ির পাশে মাদরাসা নির্মাণ করেছেন। মাদরাসার প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ থেকেই তারা এ কাজটি করেছেন। ৭৩০ হিজরিতে আমির আলাউদ্দিন মুগলতাই আল-জামালি[১৫৯] তার বাড়ির পাশে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। মাদরাসাটি কায়রোর দারব-মুলুখিয়ার কাছেই। তিনি এই মাদরাসার জন্য বহু সম্পত্তি ওয়াকফ করেন।[১৬০]

মামলুক শাসনামলে কিছু মাদরাসা পাঠদানের পাশাপাশি আরও একটি ভূমিকা পালন করত। এসব মাদরাসা বিচারালয় ও আদালত হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বড় বড় অপরাধের বিচার-মীমাংসা হতো। ইবনে সাবআ নামের এক লোক ছিল ভয়ংকর অপরাধী। তার বিচার হয়েছিল এমন একটি মাদরাসা-আদালতে। শাফিয়ি মাযহাবপন্থী ফকিহগণ তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাকে বন্দি করেন। অন্যদিকে মালিকি মাযহাবপন্থী ফকিহগণ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং হত্যা করার নির্দেশ দেন। বাইনাল কাসরাইন-এ অবস্থিত আল-মাদরাসাতুস সালাহিয়্যায় ৭৯১ হিজরিতে এই বিচারকার্য সম্পন্ন হয়।

---

১৫৮. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল* মুলুক, খ. ২, পৃ. ৩।

১৫৯. মুগলতাই : আবু আবদুল্লাহ আলাউদ্দিন মুগলতাই ইবনে কালিজ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মিসরি আল-হানাফি (৬৮৯-৭৬২ হি./১২৯০-১৩৬১ খ্রি.)। তুর্কি বংশোদ্ভূত আরব। হাফেযে হাদিস, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ, বংশতালিকাবিশেষজ্ঞ। হানাফি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম। মিশরের আল-মাদরাসাতুল মুযাফফারিয়্যায় হাদিসের দরসদান করেন। তিনি শাস্ত্রীয় সমালোচক ছিলেন। বহু মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদের বিপক্ষে তার সমালোচনামূলক বক্তব্য রয়েছে। একশরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য হলো বিশ খণ্ডে মুদ্রিত *সহিহুল বুখারির* ব্যাখ্যাগ্রন্থ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ২৭৫।

১৬০. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল* মুলুক, খ. ৩, পৃ. ১৩৩।

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental science) ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের (Applied Science) জন্য বিশেষায়িত কিছু মাদরাসাও ছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য কিছু বিশেষ মাদরাসা। যেমন দামেশকের আল-মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাহ আল-বারানিয়্যাহ। এই মাদরাসায় মুসলিমবিশ্বের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সমাবেশ ঘটেছিল। ৭২৪ হিজরিতে সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী নাজমুদ্দিন আবদুর রহিম ইবনে আশ-শাহহাম আল-মাওসিলি[১৬১] অতিথি শিক্ষক হিসেবে আল-মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাহ আল-বারানিয়্যাহতে যোগদান করেন। তার আগে তিনি উজবেকের (উজবেকিস্তানের) বিভিন্ন দেশে কয়েক বছরব্যাপী ভ্রমণ করে চিকিৎসাশাস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।[১৬২]

দামেশকে আল-মাদরাসাতুদ দাখওয়ারিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয় জামে আল-উমায়ির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই। এটি ছিল সিরিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত মাদরাসা ও চিকিৎসামহাবিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৬২১ হিজরিতে।[১৬৩] মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রখ্যাত শামীয় (সিরিয়ান) চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ আদ-দাখওয়ার আবদুর রহিম ইবনে আলি হামিদ[১৬৪]। তিনি ছিলেন এই মাদরাসার ওয়াক্‌ফকারী (মুতাওয়াল্লি) ও চিকিৎসা-বিভাগের প্রধান (শাইখুত তিব্ব)। বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে আবি উসাইবিআ[১৬৫] তার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি ছিলেন অনন্য ও যুগশ্রেষ্ঠ,

---

১৬১. আবদুর রহিম ইবনে আশ-শাহহাম আল-মাওসিলি : নাজমুদ্দিন ইবনে আশ-শাহহাম আশ-শাফিয়ি (৬৫৩-৭৩০ হি.) প্রাথমিক জীবনে ফিকহে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ৭২৪ হিজরিতে দামেশকে আসেন। খানকাহ আল-কাসরাইনের প্রধান শাইখরূপে বরিত হন। শাফিয়ি মাযহাবের স্বনামধন্য ফকিহ ছিলেন। ছিলেন চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, খ. ৩, পৃ. ১৫০।

১৬২. আবদুল কাদির আন-নুয়াইমি, *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, খ. ১, পৃ. ২৬১।

১৬৩. অন্যদিকে জামে আল-উমায়ির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় ৭১৫ হিজরিতে।

১৬৪. মুহাযযাবুদ্দিন আদ-দাখওয়ার : আবদুর রহিম ইবনে আলি ইবনে হামিদ আদ-দাখওয়ার (৫৬৫-৬২৮ হি./১১৭০-১২৩০ খ্রি.)। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। আইয়ুবীয় সুলতান আল-মালিক আল-আদিলের সঙ্গে দেখা করেন। তার চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ الجنينة (The Embryo) ও مختصر الحاوي للرازي। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৭।

১৬৫. ইবনে আবি উসাইবিআ : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনুল কাসিম ইবনে খলিফা (৫৯৬-৬৬৮ হি./১২০০-১২৭০ খ্রি.)। চিকিৎসক, ইতিহাসবিদ। *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি সিরিয়ার সারখাদে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, মুহাম্মাদ আল-খলিলি, *উদাউল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ৫২।

সমকালে তার মতো কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের শীর্ষগুরু এবং তিনি এর উপযুক্তও ছিলেন। চিকিৎসা-গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। অবশেষে যুগশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদে পরিণত হয়েছেন এবং রাজাবাদশাদের কাছে মূল্যায়ন পেয়েছেন।[১৬৬]

মিশরে কিছু মাদরাসা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের। এগুলোতে বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগ ছিল। যেমন আল-মাদরাসাতুল মানসুরিয়্যাহ। কায়রোর বাইনাল কাসরাইনে এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মিশরের সুলতান আল-মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন আল-আলফি। তাতে ফিকহি মাযহাবভিত্তিক পাঠদানের আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। প্রত্যেক মাযহাবের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও নির্ধারিত স্থান ছিল। একইভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠদানের জন্য আলাদা বিভাগ ছিল। হাদিস বিভাগ ছিল, তাফসিরুল কুরআন বিভাগ ছিল। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও পণ্ডিতগণ এসব বিভাগে পাঠদান করতেন।[১৬৭]

কতিপয় ঐতিহাসিক রচনায় প্রত্যেক শহরে অবস্থিত উপরিউক্ত মাদরাসাগুলোর হাল-হাকিকত বর্ণনার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মাদ আন-নুয়াইমি আদ-দিমাশকি (মৃ. ৯২৭ হি.) الدارس في تاريخ المدارس *(আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস)* নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত অধ্যায়গুলো রয়েছে :

فصل : دور القران الكريم (অধ্যায় : কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ)

فصل : دور الحديث الشريف (অধ্যায় : হাদিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ)

فصل : دور القرآن والحديث معا (অধ্যায় : কুরআন ও হাদিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ)

فصل : مدارس الطب (অধ্যায় : চিকিৎসা-বিদ্যালয়সমূহ)

فصل : الخوانق (অধ্যায় : খানকা)

فصل : الرباطات (অধ্যায় : রাবাত বা সুফিগৃহসমূহ)

---

[১৬৬]. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ৪, পৃ. ৩১৮।
[১৬৭]. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, খ. ৩, পৃ. ৪৮০।

فصل : الزوايا (অধ্যায় : যাবিয়াসমূহ)[১৬৮]

فصل : الترب (অধ্যায় : কবরস্থানসমূহ)

فصل : المساجد والجوامع (অধ্যায় : ছোট মসজিদ ও জামে মসজিদসমূহ)

এসব অধ্যায় ছাড়া তিনি একটি পরিশিষ্ট যুক্ত করেছেন। তার বর্ণনাশৈলী এরূপ : প্রথমে তিনি মাদরাসা বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেছেন, সেটির অবস্থান কোথায় তার যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন, তারপর প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তির সংখ্যা বর্ণনা করেছেন। তারপর লেখকের জীবদ্দশা পর্যন্ত মাদরাসায় যে-সকল শিক্ষক পাঠদান করেছেন তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উল্লেখ করেছেন। জ্ঞাতব্য যে, এই গ্রন্থে কেবল দামেশকের মাদরাসা ও মসজিদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, অন্যকোনো শহরের নয়।

আল-মাকরিযিও তার রচিত বিখ্যাত বিশ্বকোষ *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*-এ মাদরাসার অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এক বিরাট কীর্তি রেখে গেছেন। আইয়ুবি শাসনামল ও মামলুকি শাসনামলে কায়রোতে যত মাদরাসা ছিল তার সবগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন।[১৬৯]

মুসলিমরা ইসলামি সমাজের সর্বস্তরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সভ্যতা জ্ঞানকে যাবতীয় প্রগতি ও উন্নতির ভিত্তি বলে স্থির করেছে এবং ধনী ও দরিদ্র, বড় ও ছোট, পুরুষ ও নারী সকলের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফলে ইসলামি সভ্যতা কয়েক শতাব্দীব্যাপী জ্ঞানগত উৎকর্ষের চূড়ায় অবস্থান করেছে।

---

১৬৮. الزاوية এর বহুবচন الزوايا। এখানে এর অর্থ : জামে মসজিদ নয় এমন ছোট মসজিদ, যাতে মিম্বার নেই। অথবা, সুফি ও আবেদদের আশ্রয়স্থল। এগুলোতে জ্ঞানের চর্চা হতো।

১৬৯. ড. ফাতহিয়্যাহ আন-নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২২৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় গ্রন্থাগার

এটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নয় যে মুসলিম খলিফাগণ গণগ্রন্থাগার নির্মাণে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এসব গ্রন্থাগারে আরবির ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থের সমাহার ঘটিয়েছেন। নিশ্চয় ইসলাম—আমরা যেমন দেখেছি—জ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং জ্ঞান-অন্বেষণ, শিক্ষাগ্রহণ, পড়ালেখার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিমত্তাকে শাণিত ও আলোকিত করতে আহ্বান জানায়। একইভাবে জীবনের সব বিষয়ে চিন্তা ও বুদ্ধির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করে।

ইসলামে গ্রন্থাগারের ইতিহাস মূলত ইসলামি আরব সভ্যতার ও ইসলামি চিন্তার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধির ইতিহাস মানে সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস, গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি ও উৎকর্ষের ফলে সভ্যতার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, ইসলামি চিন্তা পেয়েছে পরিপক্বতা। গ্রন্থের ইতিহাস মুসলিমদের কাছে একটি মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবীয় জ্ঞানের যে বিকাশ তার তথ্যতালাশের জন্য এটা জরুরি। গ্রন্থপ্রেম, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান এবং জ্ঞানচর্চায় মুসলিমদের চেয়ে অগ্রগামী ও উন্নত কোনো জাতি নেই। যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের বিকাশে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামে গ্রন্থাগারের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। এটি চিরন্তন ইসলামি সভ্যতার একটি দান। সাধারণভাবে ইসলামি গ্রন্থাগারসমূহ যেসব পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে সেগুলো মূলত ইসলামি সভ্যতারই পর্যায়।[১৭০]

ইসলামি সভ্যতায় কয়েক ধরনের গ্রন্থাগার খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এসব গ্রন্থাগার সম্পর্কে জানব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : গ্রন্থাগার ও তার প্রকারসমূহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বাগদাদ গ্রন্থাগার (ক্রমবিকশিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়)

---

১৭০. সাইদ আহমাদ হাসান, *আনওয়াউল মাকতাবাত ফিল-আলামাইল আরাবি ওয়াল-ইসলামি*, পৃ. ২।

প্রথম অনুচ্ছেদ
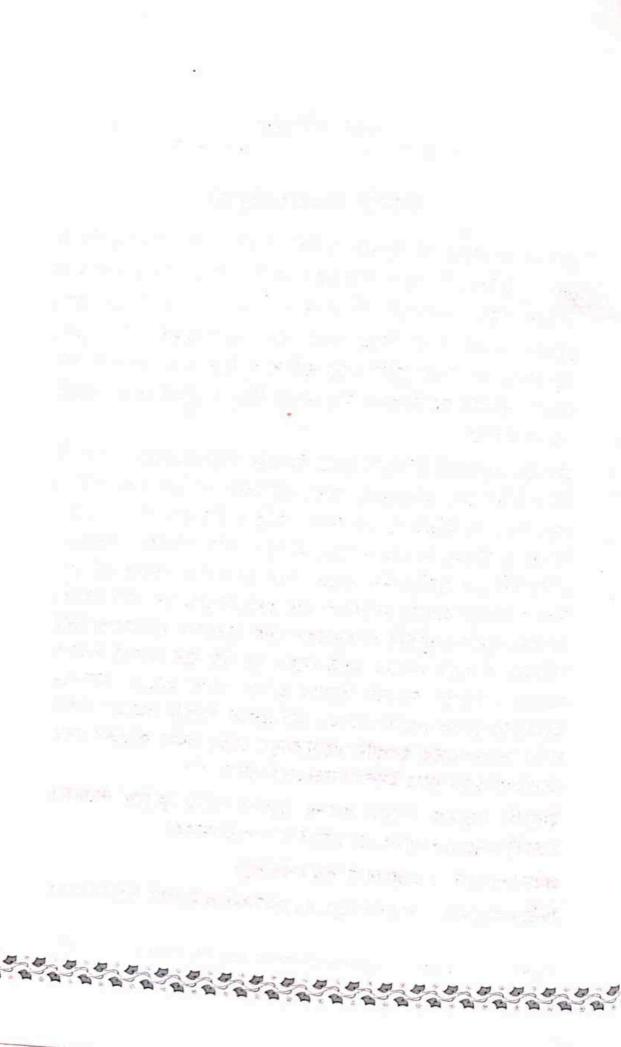
গ্রন্থাগার ও তার প্রকারসমূহ

ইসলামি সভ্যতা কয়েক ধরনের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচিত, যা অন্যকোনো সভ্যতার বেলায় ঘটেনি। ইসলামি সাম্রাজ্যের সব প্রান্তেই এসব গ্রন্থাগার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। খলিফাদের প্রাসাদে গ্রন্থাগার যেমন ছিল, তেমনই ছিল মাদরাসায়, মক্তবে ও মসজিদে। রাজ্যসমূহের রাজধানীতে গ্রন্থাগার যেমন পাওয়া যেত তেমনই পাওয়া যেত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও অজপাড়া গাঁয়ে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে এই সভ্যতার সন্তানদের অন্তরে জ্ঞানপ্রেম কতটা বদ্ধমূল ছিল। ইসলামি সভ্যতায় যেসব শ্রেণির গ্রন্থাগার পরিচিতি পেয়েছিল তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. একাডেমিক গ্রন্থাগার : এই শ্রেণির গ্রন্থাগার ইসলামি সভ্যতায় সবচেয়ে বিখ্যাত। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাগদাদ গ্রন্থাগার (বাইতুল হিকমা)। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

২. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার : ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চলে ও সব প্রান্তে এই শ্রেণির গ্রন্থাগার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। যেমন : ১. খলিফা আল-মুসতানসিরের গ্রন্থাগার[১৭১]। ২. ফাত্হ ইবনে খাকানের গ্রন্থাগার; খাকান যখন হাঁটতেন জামার আস্তিনে বই রাখতেন এবং তা দেখতেন।[১৭২] ৩. বুয়িহ রাজবংশের (Buyid dynasty) খ্যাতিমান উজির ইবনুল আমিদের গ্রন্থাগার। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে মিসকাওয়াইহ[১৭৩] উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এই ইবনুল আমিদ

---

১৭১. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১৩, পৃ. ১৮৬।

১৭২. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, খ. ১৮, পৃ. ৩৭৫।

১৭৩. ইবনে মিসকাওয়াইহ : আবু আলি আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে মিসকাওয়াইহ (৩২০-৪২১ হি./৯৩২-১০৩০ খ্রি.)। ইরানের রাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইস্পাহানে বসবাস করেন। ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, রসায়নশাস্ত্রবিদ। তিনি বিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন।-অনুবাদক

গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন। একবার ইবনুল আমিদের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এই বাড়িতেই তার গ্রন্থাগারটি ছিল। চুরির ঘটনার পর ইবনুল আমিদ তার গ্রন্থাগারের জন্য অত্যধিক বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তার ধারণা হয় অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার গ্রন্থাগারও চুরি হয়ে গেছে। ইবনে মিসকাওয়াইহের এই ঘটনার উল্লেখের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে ইবনুল আমিদের গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ ছিল এতে। ইবনে মিসকাওয়াইহ বলেছেন, ইবনুল আমিদের মন তার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। এগুলোর চেয়ে মূল্যবান ও দামি কিছু ছিল না তার কাছে। পাণ্ডুলিপি ছিল অনেক। সব ধরনের জ্ঞানরত্ন দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল এ পাণ্ডুলিপিগুলো। হিকমা, দর্শন ও সাহিত্যের পাণ্ডুলিপিও ছিল। একশটি বোঝা[১৭৪] তৈরি করে এগুলো বহন করা হতো। আমাকে দেখে তিনি গ্রন্থাগারের কী অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, গ্রন্থাগার সুরক্ষিত আছে। কেউ তাতে হাত দেয়নি। আমার কথায় তিনি সান্ত্বনা পেলেন। বললেন, তুমি সৌভাগ্যবান। অন্যান্য যত গ্রন্থাগার আছে সেগুলোর পরিপূরক বা বিকল্প আছে, কিন্তু আমার এই গ্রন্থভান্ডারের কোনো বিকল্প নেই। আমি তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখলাম। আমাকে বললেন, সকালে গ্রন্থভান্ডারের সব গ্রন্থ নিয়ে অমুক স্থানে যাবে। সকালে আমি তা-ই করলাম। তার গ্রন্থভান্ডার তার অন্যান্য সম্পদ থেকে আলাদা করে সুরক্ষিত রাখা হলো।[১৭৫] ৪. কাজি আবুল মুতাররাফের গ্রন্থাগার। তিনি তার এই গ্রন্থাগারে এত এত বই সংগ্রহ করেছিলেন যে তৎকালীন আন্দালুসের কেউই তা করতে পারেননি।[১৭৬]

৩. গণগ্রন্থাগার : এসব গ্রন্থাগার মূলত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা সংস্থা। এগুলোতে মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে। সর্বস্তরের, সব শ্রেণির, সব বয়সের, সব পেশার ও সব ধর্মের মানুষের নাগালে থাকে এসব গ্রন্থাগার। ইসলামি সভ্যতায় এসব গ্রন্থাগারও অনেক। যেমন কর্ডোভা গ্রন্থাগার। উমাইয়া খলিফা আল-হাকাম আল-মুসতানসির ৩৫০ হিজরিতে/৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভায় এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গ্রন্থাগারটির দেখভাল করার জন্য বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিযুক্ত

---

১৭৪. জন্তুর পিঠে বা মানুষের মাথায় চাপানোর জন্য তৈরি বোঝা।

১৭৫. ইবনে মিসকাওয়াইহ, *তাজারিবুল উমাম*, খ. ৬, পৃ. ২৮৬।

১৭৬. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, খ. ২৮, পৃ. ৬১।

করেন। অনুলিপিকারীদের নিয়ে আসেন। বহুসংখ্যক পুস্তক-বাঁধাইকারী নিয়োগ দেন। গ্রন্থাগারটি আন্দালুসে আলেম-উলামা ও বিদ্যার্থীদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ইউরোপীয়রাও এই গ্রন্থাগারের প্রস্রবণে পরিতৃপ্ত হতে এবং জ্ঞানের পাথেয় সংগ্রহ করতে আন্দালুসে আগমন করে। গ্রন্থাগারটিতে সুরক্ষিত বইপুস্তকের নামের তালিকা বা গ্রন্থসূচি ছিল চুয়াল্লিশটি, প্রতিটি তালিকায় পাতা ছিল বিশটি। এসব গ্রন্থসূচিতে কেবল নামাবলিই স্থান পেয়েছিল।[১৭৭] আরও একটি বিখ্যাত গণগ্রন্থাগার হলো শামের (সিরিয়ার) ত্রিপোলির বানি আম্মার গ্রন্থাগার (মাকতাবা বানি আম্মার)। তাদের প্রতিনিধিদল ছিল, তারা মুসলিমবিশ্বের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াত এবং মূল্যবান গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করে এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করত। গ্রন্থাগারটির অনুলিপিকারী ছিল পঁচাশিজন। তারা দিনরাত গ্রন্থের অনুলিপি তৈরিতে ব্যস্ত থাকত।

৪. মাদরাসার গ্রন্থাগার : ইসলামি সভ্যতা সব মানুষের শিক্ষাদীক্ষার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে এসব মাদরাসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে থেকেছে গ্রন্থাগার। এটা ছিল সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষে পরিপূর্ণতা দানকারী স্বাভাবিক বিষয়। ইসলামে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মাদরাসার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। বিশেষ করে ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও পার্শ্ববর্তী দেশের শহরগুলোতে। ইসলামি মাদরাসার অধিকাংশেরই ছিল নিজস্ব গ্রন্থাগার। নুরুদ্দিন মাহমুদ দামেশকে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন এবং এতে একটি গ্রন্থাগার যুক্ত করেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবিও মাদরাসার সঙ্গে গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন। সালাহুদ্দিনের উজির কাজি আল-ফাদিল কায়রোতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম দেন আল-মাদরাসাতুল ফাদিলিয়্যাহ। এই মাদরাসার সঙ্গে তিনি একটি গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রন্থাগারটিতে তিনি প্রায় দুই লাখ গ্রন্থের (খণ্ডসহ) সমাবেশ ঘটান। এসব গ্রন্থ তিনি ফাতেমি আমলের উবাইদি গ্রন্থভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেন। ইয়াকুত হামাবি উল্লেখ করেছেন যে, ইরানের মারভে কয়েকটি মাদরাসা ছিল, যেগুলোতে তার যুগে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। এসব গ্রন্থাগারের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।[১৭৮]

---

১৭৭. ইবনুল আব্বার, *আত-তাকমিলাতু লি-কিতাবিস সিলাতি*, খ. ১, পৃ. ১৯০।

১৭৮. রিবহি মুস্তাফা উলয়ান, *মাকতাবাতুন ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩৪।

৫. মসজিদ-গ্রন্থাগার : এসব গ্রন্থাগারকে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রন্থাগার বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ, মসজিদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে গ্রন্থাগারের বিকাশ ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে কায়রোর জামে আল-আযহার গ্রন্থাগার, কায়রাওয়ানের জামে আল-কাবির গ্রন্থাগার।[১৭৯]

এই তো গেল গ্রন্থাগারের শ্রেণিবিভাজন। তবে সব শ্রেণির গ্রন্থাগারের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তা এই যে, গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্য এসব গ্রন্থাগারের নামে বিপুল ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ছিল। রাষ্ট্র গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্টভাবে ওয়াকফ করত। ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষেরাও গ্রন্থাগারের জন্য ওয়াকফ করেছেন। এসব ওয়াকফ থেকেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হতো।[১৮০]

---

[১৭৯]. সাইদ আহমাদ হাসান, *আনওয়াউল মাকতাবাত ফিল-আলামাইল আরাবি ওয়াল-ইসলামি*, পৃ. ১৮-৭৮, ঈষৎ পরিবর্তিত।

[১৮০]. মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাসিনাহ, *আদওয়াউন আলা তারিখিল উলুমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৬১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বাগদাদ গ্রন্থাগার
(ক্রমবিকশিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়)

মানবসভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে ইসলামি গ্রন্থাগারসমূহের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এর ফলেই মানবসভ্যতা বর্তমান রূপ লাভ করেছে। কিন্তু সেসব গ্রন্থাগারের মধ্যে—কোনো সন্দেহ নেই যে—সবচেয়ে বিখ্যাত হলো বাগদাদের বাইতুল হিকমা গ্রন্থাগার। এটিকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র বিবেচনা করা হয়। না, এতে কোনো অতিরঞ্জন নেই। শুধু তাই নয়, এটি ইসলামি চিন্তাধারার ফলে সৃষ্ট প্রাচীন জ্ঞানভান্ডারগুলোর মধ্যে অন্যতম। যদিও ইসলামি চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চলেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ বাইতুল হিকমার ভূমিকা ভুলে গেছে, অথচ এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যাপীঠের সমপর্যায়ের। বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে ছুটে এসেছে। তারা বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছে, নানা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছে। বাইতুল হিকমার আলোকবর্তিকা প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপী মানবতাকে তার পথ দেখিয়েছে। তাতারদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আলো ছড়িয়েছে।

আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর খিলাফতের সময় রাজধানী বাগদাদে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিছু ভবন নির্দিষ্ট করে সেখানে অতি মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থাবলির সমাবেশ ঘটান। আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলি যেমন ছিল, তেমনই অন্যান্য ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থরাজিও ছিল। ১৭০ হিজরিতে খলিফা হারুনুর রশিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (১৯৩ হিজরি পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।) তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আব্বাসি খলিফা এবং ইতিহাসের পাতায় তিনিই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত ও নন্দিত। খলিফা হওয়ার পর তিনি খিলাফত-প্রাসাদে সুরক্ষিত অসংখ্য মূল ও অনুবাদকৃত গ্রন্থাবলি ও পাণ্ডুলিপি বের করে আনতে মনোযোগী হন। খিলাফত-প্রাসাদে

ছিল গ্রন্থরাজির বিপুল ভান্ডার। এখানে অসংখ্য সংকলনমূলক পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি ছিল মৌলিক ও অনূদিত পাণ্ডুলিপি। তিনি বাগদাদ গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ভবনে আলাদাভাবে এসব গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেন। ভবনটি ছিল বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ সংরক্ষণের উপযোগী। সকল ছাত্র ও বিদ্যার্থীর জন্য উন্মুক্ত ছিল এই ভবন।

তিনি গ্রন্থাগারের জন্য একটি বিশাল ভবন নির্মাণ করেন এবং সমস্ত গ্রন্থভান্ডার এখানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এটির নামকরণ করেন বাইতুল হিকমা (House of Wisdom)। সংগৃহীত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির অপরিসীম মূল্য ও গুরুত্বের কারণে তিনি এই নামকরণ করেন। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থাগার ক্রমবিকশিত হতে থাকে ও উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে এবং অবশেষে বিখ্যাত একাডেমিক জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়, যা ইতিহাসে সুপরিচিত।[১৮১] খলিফা আল-মামুনের যুগে গ্রন্থাগারটির সর্বাধিক উন্নতি হয়। তিনি বিখ্যাত অনুবাদক, অনুলিপিকারী ও লেখক জ্ঞানী-গুণীদের সমবেত করতে সক্ষম হন। এমনকি তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে গবেষক ও অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করেন। তার এসব কাজ এই জ্ঞানসুলভ অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নতি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১৮২]

বাইতুল হিকমার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার হিসেবে, তারপর তা অনুবাদকেন্দ্রের রূপ পায়, তারপর তা পরিণত হয় গবেষণা ও সংকলনকেন্দ্রে, অবশেষে তা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে পাঠদান ও ইজাযতদানের কার্যক্রম চালু হয়। তারপর এতে যুক্ত করা হয় একটি মানমন্দির (Astronomical observatory)। এভাবে বাইতুল হিকমা কয়েকটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়েছিল। তা নিম্নরূপ :

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান কাজ ছিল সম্ভাব্য সব এলাকা থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করা, সেগুলোকে তাকে তাকে সাজানো এবং যারা পড়তে চায় তাদের সরবরাহ করা। এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনুলিপি ও বাঁধাইকরণ অনুবিভাগ। এখানে অবস্থা অনুযায়ী গ্রন্থাবলির অনুলিপি তৈরি ও বাঁধাইয়ের ফরমায়েশ দেওয়া হতো। রক্ষিত গ্রন্থাবলির মধ্যে যেগুলো নষ্ট হওয়ার

---

[১৮১]. খিদির আহমাদ আতাউল্লাহ, *বাইতুল হিকমা ফি আসর আল-আব্বাসিন*, পৃ. ২৯।

[১৮২]. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৬।

উপক্রম করত সেগুলোকে মেরামত করার দায়িত্বও ছিল এই অনুবিভাগের। বাইতুল হিকমায় গ্রন্থ সংগ্রহের পন্থা ছিল অনেক। তার মধ্যে একটি হলো ক্রয় করা। খলিফা আল-মামুন কনস্টান্টিনোপলে সংগ্রাহক দল প্রেরণ করতেন এবং তাদেরকে যেকোনো প্রকারের গ্রন্থ সংগ্রহের নির্দেশ দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও সফরে বের হতেন এবং গ্রন্থাবলি ক্রয় করে তা বাইতুল হিকমায় পাঠাতেন। আরেকটি পন্থা ছিল উপঢৌকন গ্রহণ। খলিফাগণ বহির্দেশীয় রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতেন, ওইসব দেশের রাজাবাদশারা তাদেরকে গ্রন্থ উপহার দিতেন। কখনো কখনো যাদের ওপর জিযিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল তাদের থেকে বইপুস্তক গ্রহণ করা হতো। এটাও ছিল গ্রন্থ সংগ্রহের একটি পন্থা। খলিফা আল-মামুন শত শত অনুলিপিকারী, ব্যাখ্যাদাতা, বিভিন্ন ভাষার অনুবাদক নিযুক্ত করেছিলেন। অন্যান্য ভাষার গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করা হতো। সংকলন ও নতুন গ্রন্থ রচনাও ছিল আরেকটি পন্থা। এগুলো তো বটেই, গ্রন্থ সংগ্রহের আরও পন্থা ছিল। এ কারণে বাইতুল হিকমার গ্রন্থাবলি সংখ্যায় ও প্রকারে ছিল অভূতপূর্ব।

খলিফা আল-মামুন রোমান সম্রাটের কাছে চিঠি পাঠিয়ে আবেদন জানান যে, তার কাছে গ্রিকদের থেকে প্রাপ্ত যে প্রাচীন জ্ঞানভান্ডার রয়েছে তা যেন পাঠানোর অনুমতি দেন। রোমান ঐতিহ্যে তখন সেসব গ্রন্থের পাঠ অনুমোদিত ছিল না। সম্রাট কিছুকাল নীরব থেকে চিঠির জবাব দেন। আল-মামুন একটি জ্ঞান-অনুসন্ধানী দল প্রস্তুত করেন। এই দলে কয়েকজন অনুবাদককেও যুক্ত করেন। বাইতুল হিকমার গ্রন্থাগারিককে সেই দলের প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই অনুসন্ধানী দল রোমে গিয়ে বিভিন্ন রকমের বহু স্থানে ঘুরে। যেখানে মনে হয়েছে প্রাচীন গ্রিক গ্রন্থভান্ডার রয়েছে সেখানেই দলটি গিয়েছে। অনুসন্ধান শেষে তারা দুর্লভ ও অতি মূল্যবান গ্রন্থের ভান্ডার নিয়ে ফিরে আসে। দর্শন, প্রকৌশল, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ তাদের হস্তগত হয়। খলিফা আল-মামুন তার শাসনামলে অন্যান্য রাজাবাদশার কাছেও প্রাচীন গ্রন্থভান্ডার অনুসন্ধান ও খোঁজাখুঁজির জন্য অনুসন্ধানী দল প্রেরণের অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠান। একবার এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। একটি অনুসন্ধানী দল পারস্যে যায় এবং একটি প্রাচীন দুর্গের নিচে কয়েকটি

সিন্দুকের দেখা মেলে। এসব সিন্দুকে ছিল অসংখ্য গ্রন্থ। গ্রন্থগুলো পচে গিয়েছিল এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। অনুসন্ধানী দল এগুলো উদ্ধার করে এবং বাগদাদে নিয়ে আসে। এগুলো শুকাতে এক বছর লাগে। শুকিয়ে গেলে এগুলোতে পরিবর্তন ঘটে এবং দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। তারপর তারা গ্রন্থগুলোর পাঠোদ্ধারে উঠেপড়ে লাগে।[১৮৩]

অনুবাদকেন্দ্র

খলিফা আল-মামুনের কাছে প্রাচীন গ্রন্থাবলির বিশাল সম্ভারের সমাবেশ ঘটে। তিনি দক্ষ অনুবাদক, ব্যাখ্যাতা ও অনুলিপিকারীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। গ্রন্থাবলির মেরামত ও আরবিতে ভাষান্তরই ছিল এই কমিটির দায়িত্ব। তিনি প্রত্যেক অনারব ভাষার জন্য একজন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন যিনি ওই ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদকারীদের তত্ত্বাবধান করবেন। তাদের সবার জন্য বিরাট অঙ্কের বেতন নির্ধারণ করেন। কারও কারও জন্য মাসিক বেতন নির্ধারণ করেন পাঁচশ দিনার।[১৮৪] (যা দুই কেজি সোনার চেয়েও বেশি!)

অনুবাদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাবলি আরবিতে রূপান্তরিত করা এবং মাঝে মাঝে আরবি থেকে অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরিত করা। এই বিভাগে যেসব অনুলিপিকারী বা নকলনবিশকে নিযুক্ত করা হতো তারা ছিল গ্রন্থাগার বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের থেকে জ্ঞান ও যোগ্যতার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুবাদ বিভাগে যারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ, জিবরিল ইবনে বুখতিশু এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক। গ্রিক ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য হুনাইনকে রোমান দেশে ভ্রমণে পাঠানো হয়েছিল। ভিনদেশি গ্রন্থাবলি বাইতুল হিকমায় নিয়ে আসা হতো এবং সেখানেই অনুবাদ করা হতো। কতিপয় অনুবাদক বাইতুল হিকমার বাইরে থেকেও অনুবাদ করতেন এবং অনূদিত গ্রন্থ এখানে জমা দিতেন। খলিফা আল-মামুন অনুবাদকদের বড় হাতে সম্মানী দিতেন, এমনকি তিনি অনূদিত গ্রন্থের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণও দিতেন![১৮৫]

---

১৮৩. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩০৪; ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৭২।

১৮৪. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ১৩৩।

১৮৫. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৭২।

ইবনে নাদিম তার *'আল-ফিহরিসত'* গ্রন্থে কয়েক ডজন অনুবাদকের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা ভারতীয় ভাষা, গ্রিক ভাষা, ফারসি ভাষা, সুরয়ানি ভাষা (Syriac language), নাবাতি ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করতেন। তারা কেবল আরবিতে অনুবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং ইসলামি সমাজে যেসব ভাষা জীবন্ত ও ব্যাপ্ত ছিল সেগুলোতেও অনুবাদ করেছেন। যাতে ইসলামি সমাজে বসবাসকারী ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলেই এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারে। অনুবাদকদের কেউ মূল গ্রন্থটিকে তার মাতৃভাষায় অনুবাদ করতেন, তারপর অন্য একজন অনুবাদক তা আরবিতে ও অন্য ভাষায় অনুবাদ করতেন। যেমন ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ মূল গ্রন্থকে সুরয়ানি ভাষায় অনুবাদ করতেন, তারপর অন্যজন ওই অনুবাদকে আরবিতে রূপান্তর করতেন। সঙ্গে সঙ্গে মূল গ্রন্থও বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হতো।[১৮৬]

বাইতুল হিকমা থেকে সংরক্ষিত গ্রন্থতালিকা নিরীক্ষণ করলে যে-কেউ এ ব্যাপারে অসংখ্য ইঙ্গিত পাবে যে এখানে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থের নাবাতি কপি (নুসখা), কিবতি কপি, সুরয়ানি কপি, ফারসি কপি, ভারতীয় কপি, গ্রিক কপি ছিল। (কারণ, একেকটি গ্রন্থ বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।) মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীরা অনুবাদের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা এমনসব জ্ঞানভাণ্ডারের অনুবাদ করেছেন যা ধ্বংসই হতে যাচ্ছিল। তারা না থাকলে আধুনিক যুগের মানুষ প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয় মূল্যবান রচনাবলি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারত না। কারণ, এসব মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ করা হয়েছে যেসব দেশ থেকে তার অধিকাংশতেই এগুলোর পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। যেসব গ্রন্থ শাসকদের বা কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ত সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হতো। যেমন রোমান রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ একবার পনেরো বোঝা গ্রন্থ জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের গ্রন্থাবলিও ছিল।[১৮৭]

এই সকল আলেমের ভূমিকা কেবল অনুবাদে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা অনূদিত গ্রন্থাবলিতে টীকাও সংযোজন করেছেন। সেগুলোতে যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোকে

---

[১৮৬]. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩০৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

[১৮৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

প্রায়োগিক উপযোগিতার পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। অসম্পূর্ণ বিষয়গুলোর পূর্ণরূপ দিয়েছেন। ভ্রান্তি-বিভ্রাটের সংশোধন করেছেন। বর্তমান যুগে যাকে 'সম্পাদনা' বলা হয় তাদের কাজ ছিল তারই অনুরূপ। ওইসব গ্রন্থের কয়েকটিতে ইবনে নাদিম যে টীকাবলি সংযোজন করেছেন তা থেকে এটাই বোঝা যায়।[১৮৮]

কাজি সায়িদ আল-আন্দালুসি তার *'তাবাকাতুল উমাম'* গ্রন্থে বাইতুল হিকমায় অনুবাদ-পদ্ধতি কী ছিল সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। খলিফা আল-মামুন এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের প্রতি কতটা গুরুত্ব দিতেন সেটাও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব যখন তাদের (আব্বাসিদের) সপ্তম খলিফা আবদুল্লাহ আল-মামুন ইবনে হারুনুর রশিদের হাতে এলো... তিনি তার পিতামহ আল-মানসুর যেসব কাজ শুরু করেছিলেন সেগুলো সম্পন্ন করতে থাকলেন। যেখানে জ্ঞান রয়েছে বলে মনে করলেন সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। জ্ঞানের খনি থেকে জ্ঞান আহরণ করতে থাকলেন। তার ছিল দৃঢ় সংকল্প, উচ্চাকাঙ্ক্ষা; আত্মশক্তিও ছিল প্রবল। তিনি রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ও শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাদের জন্য মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠালেন। তাদের কাছে দর্শনশাস্ত্রের যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলো তার কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানালেন। তারা তা-ই করলেন। তাদের কাছে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, গ্যালেন[১৮৯], ইউক্লিড, টলেমি ও অন্যান্য দার্শনিক-বিজ্ঞানীর যেসব গ্রন্থ ছিল তা তারা পাঠিয়ে দিলেন। আল-মামুন এসব গ্রন্থের আরবি অনুবাদের জন্য দক্ষ অনুবাদকদল নির্বাচন করলেন। তাদেরকে এসব গ্রন্থের অনুবাদের নির্দেশ দিলেন। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে এসব গ্রন্থের অনুবাদ করা হলো। আল-মামুন এসব গ্রন্থ পাঠের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেন, এগুলোর পঠনপাঠনের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করে তুললেন। ফলে তার যুগে জ্ঞানের বাজার রমরমা হয়ে উঠল। জ্ঞান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। জ্ঞান অর্জন ও বিকাশে মেধাবীরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। কারণ তারা দেখলেন যে, খলিফা আল-মামুন জ্ঞান অর্জনকারীদের বিশেষভাবে গণ্য করেন, যারা জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত তাদের খাস লোক হিসেবে কাছে টেনে

---

১৮৮. প্রাগুক্ত, ৩৩৯ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।
১৮৯. Aelius Galenus or Claudius Galenus.

নেন। তাদের সঙ্গে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন, তর্কবিতর্ক করে আনন্দ পান, নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলে সুখ পান। তারা খলিফার কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন, উচ্চ পদ-পদবি ও বেতন-ভাতা পান।[১৯০]

কাজি সায়িদ আল-আন্দালুসির উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, খলিফা আল-মামুন বিভিন্ন শাখার জ্ঞানের অনুবাদের জন্য বিশেষ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই একাডেমির জন্য বিশ্বের সব অঞ্চল থেকে বড় বড় অনুবাদকদের এখানে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। গ্রিক বংশোদ্ভূত মনীষী আবু ইয়াহইয়া ইবনে আল-বিতরিক এখানে যোগ দিয়েছিলেন, আরও যোগ দিয়েছিলেন নাসতুরিয়ান খ্রিষ্টান বংশোদ্ভূত হুনাইন ইবনে ইসহাক। অনুবাদকদের মধ্যে আরও ছিলেন বিখ্যাত মনীষী ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ।[১৯১]

খলিফা আল-মামুনের শাসনামল শেষ হতে না হতে দেখা গেল যে, ইউনানি (গ্রিক), পারসিক ও অন্যান্য দেশের অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থ যথা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন ও প্রকৌশলবিদ্যা আরবিতে অনূদিত হয়ে নতুনরূপে বাইতুল হিকমার গ্রন্থাগারে উপস্থিত হলো। এ প্রসঙ্গে *স্টোরি অফ সিভিলাইজেশন* গ্রন্থের প্রণেতা উইল ডুরান্ট বলেছেন, মুসলিমরা পূর্ববর্তীদের থেকে জ্ঞানের যে উত্তরাধিকার লাভ করেছেন তার অধিকাংশ করেছেন ইউনান (গ্রিকদের) থেকে। ইউনানের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ভারত।[১৯২]

সংকলন ও গবেষণাকেন্দ্র

বাইতুল হিকমা গ্রন্থাগারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল সংকলন ও গবেষণাকেন্দ্র। রচয়িতারা এই গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ সকল রচয়িতা সংকলন ও গবেষণাকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বসেই তাদের কাজ আঞ্জাম দিতেন। কেউ কেউ গ্রন্থাগারের বাইরেও কাজ করতেন। তারপর তাদের রচিত বা সংকলিত গ্রন্থ এখানে পেশ করতেন। খলিফার পক্ষ থেকে প্রত্যেক লেখক ও রচয়িতাকে উদার হস্তে বড় ধরনের সম্মানী দেওয়া হতো।[১৯৩] বাইতুল হিকমার অনুলিপিকারদের মূলত

১৯০. কাজি সাইদ আল-আন্দালুসি, *তাবাকাতুল উমাম*, পৃ. ৪৯।
১৯১. মানসুর সারহান, *আল-মাকতাবাত ফিল-উসুর আল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫৬।
১৯২. উইল ডুরান্ট, *স্টোরি অফ সিভিলাইজেশন*, খ. ১৪, পৃ. ৪০।
১৯৩. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৩, পৃ. ১৩১।

বিশেষ কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে বাছাই করা হতো। যাতে অনুলিপিকারদের পক্ষ থেকে মূল রচনায় কিছু মিশে না যায় সেজন্য সতর্কতাবশতই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। এই কারণে আমরা দেখি যে, হিজরি তৃতীয় শতকের বিখ্যাত মনীষী আল্লান আশ-শাওবি খলিফা হারুনুর রশিদ ও খলিফা আল-মামুনের যুগে বাইতুল হিকমায় অনুলিপিকারের কাজ করতেন।[১৯৪]

জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক মানমন্দির

খলিফা আল-মামুন বাগদাদের কাছাকাছি আশ-শামাসিয়্যাহ মহল্লায় এই মানমন্দির নির্মাণ করেন। এটি ছিল বাইতুল হিকমারই অধিভুক্ত। তার এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বাইতুল হিকমায় প্রায়োগিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা। ছাত্ররা যেসব থিউরি ও তাত্ত্বিক বিষয় শিখছে তা যেন এখানে প্রয়োগ করে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এই মানমন্দিরে কাজ করতেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, ভূগোলবিদেরা ও গণিতজ্ঞরা।[১৯৫] তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আল-খাওয়ারিজমি, মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা ও আল-বিরুনি। খলিফা আল-মামুন এই মানমন্দিরে বিজ্ঞানীদের দুটি দলের গবেষণার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করতে সক্ষম হন।[১৯৬]

মাদরাসা

খলিফা হারুনুর রশিদের পরে যারা খলিফা হয়েছেন তারা তাদের যুগের খ্যাতিমান ও প্রসিদ্ধ আলেমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছেন। তারা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য এ সকল আলেমকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তাদেরকে উদার হস্তে উপঢৌকন দিয়েছেন। তাদের অন্যতম ছিলেন আল-কিসায়ি আলি ইবনে হামযাহ[১৯৭]। তিনি খলিফা আল-

---

১৯৪. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ৩৬৭।

১৯৫. ইবনুল আবারি, *মুখতাসারু তারিখিদ-দুওয়াল*, পৃ. ৭৫।

১৯৬. কর্নেলিয়াস ভ্যান অ্যালেন ভ্যান ডাইক (Cornelius Van Alen Van Dyck), *ইকতিফাউল কানুয়ি বিমা হুয়া মাতবুউন*, পৃ. ২৩৫। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ও টীকা সংযুক্ত করেছেন সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলি বিবলাবি।

১৯৭. আল-কিসায়ি : আবুল হাসান আলি ইবনে হামযাহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুফি ছিলেন ভাষা ও ব্যাকরণের ইমাম। প্রখ্যাত সাত কারির অন্যতম। তিনি হারুনুর রশিদের পুত্র আল-আমিনের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ইরানের রাইয়ে ১৮৯

মামুনের[১৯৮] কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিলেন। তিনি খলিফার দুই পুত্রকে ভাষা ও ব্যাকরণ শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যাকরণ ও ভাষা বিষয়ে তার বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। আরেকজন হলেন ইয়াকুব ইবনে আস-সিক্কিত[১৯৯]। তিনি জাফর আল-মুতাওয়াক্কিলের পুত্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন।[২০০]

অনেক আলেমেরই জ্ঞানের পরিধি ছিল অনেক বিস্তৃত এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের পারদর্শিতা ছিল। ফলে তাদের নাম ফকিহদের সঙ্গেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাদের কেউ কেউ সব শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ভাতা গ্রহণ করতেন। যেমন আবু ইসহাক আয-যুজাজ। তার নাম ফকিহদের সঙ্গেও ছিল, আলেমদের সঙ্গেও ছিল। উভয় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ভাতা তিনি গ্রহণ করতেন। ফলে প্রতি মাসে তিনি দুইশ দিনার ভাতা পেতেন।[২০১] ইবনে দুরাইদ[২০২] যখন কপর্দকশূন্য অবস্থায় বাগদাদে এসে উপস্থিত হন, খলিফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ তার জন্য মাসিক পঞ্চাশ দিনার ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[২০৩]

মাদরাসা নির্মাণের পর শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ দেওয়া হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে, তাদেরকে সাধারণ তহবিল থেকে মাসিক বেতন-ভাতা দেওয়া হবে, অথবা ওয়াকফকৃত সম্পত্তির প্রাপ্ত আয় থেকে তা দেওয়া হবে। অর্থাৎ,

---

হিজরিতে/৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে। দেখুন, হামাবি, *মুজামুল উদাবা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৩৭-১৭৫২; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২৯৫-২৯৬।

[১৯৮]. সঠিক তথ্য : খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে।

[১৯৯]. ইবনে আস-সিক্কিত : আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (১৮৬-২৪৪ হি./৮০২-৮৫৮ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। আব্বাসি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। খলিফা তার সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব দেন তাকে। শুধু তাই নয়, তাকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবেও গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য তাকে হত্যা করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫-৪০১।

[২০০]. সুয়ুতি, *বুগয়াতুল উআত ফি তাবাকাতিল লুগাবিয়্যিন ওয়ান-নুহাত*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৯।

[২০১]. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৪, পৃ. ৩৬০।

[২০২]. ইবনে দুরাইদ : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে দুরাইদ আল-বসরি (২২৩-৩২১ হি./৮৩৮-৯৩৩ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الجمهرة في علم اللغة، السرج الأشربة، الأمالي، واللجام، كتاب الخيل الكبير، كتاب الخيل الصغير، كتاب السلاح، كتاب الأنواء। দেখুন, হামাবি, *মুজামুল উদাবা*, খ. ৬, পৃ. ২৪৮৯-২৪৯৬; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ৩২৩-৩২৮।

[২০৩]. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ৮০।

যেসব ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় এসব খাতে ব্যয়ের জন্য সাধারণভাবে নির্ধারিত ছিল। শিক্ষকদের পদের ভিন্নতা এবং ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয়ের তারতম্যের কারণে তাদের বেতন-ভাতাও ভিন্ন ভিন্ন হতো। কিন্তু তার দ্বারা অবশ্যই সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করা যেত।[২০৪]

খলিফা হারুনুর রশিদ ও আল-মামুন উভয়ে বাইতুল হিকমায় ছাত্রদের জন্য যেমন, তেমনই শিক্ষকদের জন্য বাসভবন নির্মাণ করেছেন।[২০৫]

বাইতুল হিকমার শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত শিক্ষণব্যবস্থা দুটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতো : ১. শিক্ষক বক্তৃতা দিতেন, ছাত্ররা তা শুনত এবং ২. শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর হতো। শিক্ষক কখনো উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে বড় হলঘরে বক্তৃতা দিতেন। সহকারী তাকে সাহায্য করতেন। এসব বক্তৃতা শুনতে শত শত ছাত্র সমবেত হতো। তাদেরকে বক্তৃতার কঠিন কঠিন অংশগুলো ব্যাখ্যা করে দিতেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করতেন। কিন্তু শাইখ বা শিক্ষকই চূড়ান্ত জবাব ও সিদ্ধান্ত দিতেন। ছাত্ররা এক হালকা থেকে অন্য হালকায় যেত। এভাবে তারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনুশীলন ও চর্চা করত।[২০৬]

বাইতুল হিকমার মাদরাসায় জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য সব শাখারই পাঠদান করা হতো। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, বিভিন্ন ভাষা, যেমন আরবি ভাষার পাশাপাশি গ্রিক, ফারসি, ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষা।

বাইতুল হিকমা থেকে যারা কোনো বিষয়ের বা শাস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্ত করতেন শিক্ষক তাদেরকে ইজাযত বা অনুমতি দিতেন। অনুমতিপত্রে তিনি বলতেন যে, এই শিক্ষার্থী জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে। যারা মুমতায হতেন বা প্রথম বিভাগে পাশ করতেন তাদের সনদপত্রে উল্লেখ থাকত যে, এই সনদধারীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হলো। কেবল শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের অনুমোদন দিতে

---

২০৪. আবদুল কাদির আন-নুয়াইমি, *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, খ. ১, পৃ. ৪১৮; খ. ২, পৃ. ১৮, ৫২, ৩০৬।

২০৫. উইল ডুরান্ট, *স্টোরি অব সিভিলাইজেশন*, খ. ৪, পৃ. ৩১৯; আহমাদ শালবি, *তারিখুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৪; খিদির আহমাদ আতাউল্লাহ, *বাইতুল হিকমা ফি আসর আল-আব্বাসিন*, পৃ. ২৪৬।

২০৬. খিদির আহমাদ আতাউল্লাহ, *বাইতুল হিকমা ফি আসর আল-আব্বাসিন*, পৃ. ১৪০।

পারতেন। শিক্ষক ছাড়া অন্য কারও এই অধিকার ছিল না। অনুমোদনদানের পদ্ধতি এরূপ : শিক্ষক শিক্ষা সমাপনকারী শিক্ষার্থীর জন্য একটি অনুমোদনপত্র বা সনদপত্র লিখতেন, তাতে শিক্ষার্থীর নাম, তার শাইখের নাম, তার ফিকহি মাযহাব ও অনুমোদনদানের তারিখ উল্লেখ করতেন।[২০৭]

বাইতুল হিকমার পরিচালনাপর্ষদ বা প্রশাসন

বাগদাদের বাইতুল হিকমার প্রশাসনে কয়েকজন আলেম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিচালকের পদবি-নাম ছিল 'সাহিব'। তাই বাইতুল হিকমার পরিচালককে বলা হতো 'সাহিবু বাইতিল হিকমা'। বাইতুল হিকমার প্রথম পরিচালক ছিলেন সাহল ইবনে হারুন আল-ফারিসি (মৃ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.)। বাইতুল হিকমার গ্রন্থভান্ডার তত্ত্বাবধানের জন্য খলিফা হারুনুর রশিদ তাকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি যত পারসিক তত্ত্বজ্ঞান পেয়েছিলেন তা ফারসি থেকে আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন খলিফা হওয়ার পর সাহল ইবনে হারুনকে বাইতুল হিকমার পরিচালক নিযুক্ত করেন।[২০৮] এই পদে তাকে আরেকজন ব্যক্তি সাহায্য করতেন। তিনি হলেন সাইদ ইবনে হারুন। তিনি ইবনে হুরাইম নামে পরিচিত ছিলেন।[২০৯] বাইতুল হিকমার প্রশাসকদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হাসান ইবনে মাররার আদ-দাব্বি।[২১০]

এই তো গেল মোটামুটি কথা। আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি বাগদাদ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করে বলেন, ইসলামে সবচেয়ে বিশাল ও সমৃদ্ধ গ্রন্থভান্ডার তিনটি : ১. বাগদাদে আব্বাসি খলিফাদের গ্রন্থভান্ডার। এই গ্রন্থভান্ডারে এত বেশি গ্রন্থ ছিল, তা গুনে শেষ করা যায়নি। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারেও গ্রন্থভান্ডারটি ছিল অনন্য।[২১১] দ্বিতীয় গ্রন্থভান্ডারটি ছিল কায়রোতে, কর্ডোভায় ছিল তৃতীয়টি।

---

২০৭. উইল ডুরান্ট, *স্টোরি অব সিভিলাইজেশন*, খ. ১৪, পৃ. ৩৬।
২০৮. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪।
২০৯. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৫, পৃ. ৮৬।
২১০. মুহাম্মাদ ইবনে শাকির কুতুবি, *ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*, খ. ১, পৃ. ১২২।
২১১. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা ফি কিতাবাতিল ইনশা*, খ. ১, পৃ. ৫৩৭।

ইসলামি বিশ্বে আরও অনেক গ্রন্থাগার ছিল যেগুলো সমৃদ্ধিতে ও সমৃদ্ধ ভূমিকা পালনে বাগদাদ গ্রন্থাগার থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। তার কারণ এই যে, মুসলিম খলিফারা ও গভর্নররা গ্রন্থ সংগ্রহে ও সংরক্ষণে প্রতিযোগিতা করতেন। এমনকি আন্দালুসের খলিফা আল-হাকাম ইবনে আবদুর রহমান আন-নাসির প্রাচ্যের সব দেশে লোক পাঠিয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। তারা প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাবলি ক্রয় করে নিতেন।[২১২]

অন্যান্য অসংখ্য ইসলামি গ্রন্থাগারের সঙ্গে বাগদাদ গ্রন্থাগার শুরুর যুগের মুসলিমদের সব ক্ষেত্রে জ্ঞানগত জাগরণ সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য জাতির সন্তানদের মধ্যে যারা এ সকল মুসলিমের শিষ্যত্ব করেছেন তারাও এতে আলোকিত হয়েছেন। জ্ঞানের এই জাগরণ ছিল অভূতপূর্ব। আধুনিক যুগের আগে ইতিহাস কখনো এমন জাগরণ দেখেনি। গোটা মানবসভ্যতার ওপর এই জ্ঞান-জাগরণের বিপুল প্রভাব পড়েছিল। অথচ সেই সময়ে ইউরোপ ছিল চরম গ্রাম্য ও পশ্চাৎপদ অবস্থায়।[২১৩]

এখানে আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, বাগদাদ গ্রন্থাগার বহু জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর উৎকর্ষ ও পরিপক্বতালাভে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এসব জ্ঞানী-বিজ্ঞানী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আল-খাওয়ারিজমির নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি ছিলেন গণিতের আলজেবরা শাখার উদ্ভাবক। ইবনে নাদিম আল-খাওয়ারিজমির এই উদ্ভাবন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার বিস্তৃত অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, আল-খাওয়ারিজমি খলিফা আল-মামুনের গ্রন্থাগারে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তখনকার মানুষ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি (Astronomical monitoring machines) আবিষ্কারের আগে ও পরে তার প্রদত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় তারকা-সারণির[২১৪] ওপর নির্ভর করেছেন। এ দুটি 'যিজুস সিন্দহিন্দ' (السندهند) নামে পরিচিত।[২১৫]

২১২. ইবনুল আব্বার, *আত-তাকমিলাতু লি-কিতাবিস সিলাতি*, খ. ১, পৃ. ২২৬।
২১৩. কাদরি তাওকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির-রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল-ফালাক*, পৃ. ২৫০।
২১৪. আরবিতে একে الزيج الأول والزيج الثاني للخوارزي বলা হয়।-অনুবাদক
২১৫. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৩৩।

বাইতুল হিকমা বা বাগদাদ গ্রন্থাগারে অবস্থান করে গবেষণা করেছেন এমন কয়েকজন হলেন আল-রাযি, ইবনে সিনা, আল-বিরুনি, আল-বাত্তানি[২১৬], ইবনে নাফিস, আল-ইদরিস[২১৭]। এমন আরও শত শত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী রয়েছেন ইসলামি চিন্তাধারা যাদেরকে পরিপক্বতা দিয়েছে। আর এই চিন্তার ভিত গড়ে দিয়েছে বাগদাদ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ইসলামি গ্রন্থাগার।

কিন্তু যে কারণে চিত্ত ব্যথিত হয় এবং কপাল ঘেমে ওঠে তা এই যে, সভ্যতার এই নিদর্শন ও মিনার তাতারদের একের পর এক আক্রমণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্বরতা ও নৃশংসতাই ছিল তাদের চালিকাশক্তি। তাতাররা মূল্যবান গ্রন্থাবলি—লাখ লাখ মূল্যবান গ্রন্থ বহন করে নিয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সেসব গ্রন্থ দজলা নদীতে নিক্ষেপ

---

[২১৬]. বাত্তানি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল-হাররানি (জন্ম ৮৫৪ খ্রি. এবং মৃত্যু ৩১৭ হি./৯২৯ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও যন্ত্রপ্রকৌশলী। বাত্তানি মেসোপটেমিয়ার উচ্চভূমির অন্তর্গত হাররান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। জায়গাটি এখন তুরস্কে অবস্থিত। তার বাবা ছিলেন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বিখ্যাত নির্মাতা। তার উপাধি 'আস-সাবি' হওয়ায় অনেকে ধারণা করেন যে তার পূর্বপুরুষ সাবিয়িন গোত্রভুক্ত হতে পারে, তবে তার পুরো নাম পড়ে বোঝা যায় তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। কতিপয় পশ্চিমা ঐতিহাসিকের মতে তার পূর্বপুরুষ ছিল আরব রাজাদের মতো উচ্চবংশের। তিনি উত্তর সিরিয়ার অন্তর্গত রাক্কা শহরে বসবাস করতেন। জ্যোতির্বিদ্যায় বাত্তানির সর্বাধিক পরিচিত অর্জন হলো সৌরবর্ষ নির্ণয়। বাত্তানিই প্রথম নির্ভুল পরিমাপ করে দেখিয়েছিলেন যে, এক সৌরবৎসরে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড হয়, যার সাথে আধুনিক পরিমাপের পার্থক্য মাত্র ২ মিনিট ২২ সেকেন্ড কম। জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির আগের কিছু বিজ্ঞানীর ভুলও তিনি সংশোধন করে দেন। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত টলেমি যে মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, বাত্তানি তা ভুল প্রমাণ করে নতুন প্রামাণিক তথ্য প্রদান করেন। অনেক শতাব্দী পরে কোপার্নিকাস কর্তৃক আবিষ্কৃত বিভিন্ন পরিমাপের চেয়ে বাত্তানির পরিমাপ অনেক বেশি নিখুঁত ছিল। তিনি ত্রিকোণমিতি নিয়ে বিস্তর কাজ করেন এবং সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্ট, কোট্যানজেন্ট ইত্যাদি ধারণা নিয়ে কাজ করেন। বাত্তানি সামাররায় মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২, পৃ. ২০৯; জামালুদ্দিন আল-কিফতি, *ইখবারুল উলামা বি-আখবারিল হুকামা*, পৃ. ১৮৪-১৮৫।-অনুবাদক

[২১৭]. আল-ইদরিস : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইদরিস (৪৯৩-৫৬০ হি./১১০০-১১৬৫ খ্রি.)। ভূগোলবিদ। তিনি সিসিলিতে গমন করেন এবং সিসিলির নরমান সম্রাট দ্বিতীয় রজারের (Roger II of Sicily) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সম্রাটের তত্ত্বাবধানে نزهة المشتاق في اختراق الآفاق গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি *Tabula Rogeriana (The Map of Roger)* নামেও পরিচিত। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১, পৃ. ১৩৮।

করেছিল! কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা চরম নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকির পরিচয় দিয়েছিল।

ধারণা করা গিয়েছিল যে, তাতাররা এসব মূল্যবান গ্রন্থ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী কারাকোরামে নিয়ে যাবে এবং তারা যেহেতু সভ্যতার শৈশবকালে রয়েছে তাই এসব গ্রন্থ ও মূল্যবান জ্ঞানরাশির দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু তাতাররা একটি বর্বর-অসভ্য জাতি... তারা কিছু পড়েনি এবং শিখতেও চায়নি কিছু... যেন কেবল কামচরিতার্থ, সুখভোগ ও বিলাসব্যসনের জন্যই বেঁচে ছিল। তারা মুসলিমদের কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টা ও সাধনার ফসল দজলা নদীতে নিক্ষেপ করে। গ্রন্থাবলির কালিতে দজলা নদীর পানি কালো বর্ণ ধারণ করে। এমনকি এ কথাও প্রচলিত ছিল যে, তাতার ঘোড়সওয়ার গ্রন্থাবলির স্তূপের ওপর দিয়ে নদীর এ তীর থেকে ও-তীরে যেতে পারত। এটা ছিল গোটা মানবতার বিরুদ্ধেই বড় অপরাধ।[২১৮]

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এসব তাতার ও অন্য আক্রমণকারীদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে যে মুষ্টিমেয় গ্রন্থ ও রচনাবলি বেঁচে গিয়েছিল তা ইউরোপের আধুনিক রেনেসাঁস ও জ্ঞানের জাগরণের কার্যকারণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাশ্চাত্যের বহু ন্যায়পরায়ণ বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এভাবে বাগদাদের বাইতুল হিকমা মানবসভ্যতায় মহৎ অবদান রেখেছে এবং সভ্যতার অসংখ্য জ্ঞানকেন্দ্রের মধ্যে এটি তার যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে।

---

২১৮. রাগিব সারজানি, *কিসসাতুত তাতার মিনাল বিদায়াতি ইলা আইনি জালুত*, পৃ. ১৬১-১৬২।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানী-সমাজ

ইসলামি সভ্যতা হাজার হাজার বড় বড় আলেম ও জ্ঞানী-গুণীর জন্ম দিয়েছে। তারা এই সভ্যতার অগ্রযাত্রা ও উন্নতিতে অবদান রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক মানবসভ্যতার জ্ঞানী-সমাজ থাকে, যারা সেই সভ্যতাকে চিরস্থায়ী রূপ দেন এবং সকল জাতির মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন।

ইসলামি সভ্যতায় যে বিষয়টা আরও বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে তা এই যে, এই সভ্যতা নিজের জন্য উন্নত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছিল এবং সে তার সমৃদ্ধ যাত্রাপথে তা অবলম্বন করে এগিয়েছে। এই ব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন এবং এই সভ্যতার যাপিত জ্ঞানগত অগ্রযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মুসলিম আলেমসমাজ যে জ্ঞানের কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌছেছেন এবং বিপুল শূন্যতা পূরণ করেছেন তা বিলাসব্যসনে লিপ্ত থেকে হয়ে যায়নি, বরং তাদের জ্ঞানযাত্রায় রয়েছে অসংখ্য কষ্ট-যন্ত্রণা ও ধৈর্যধারণের কাহিনি। তারা যে অনন্য জ্ঞানশিখরে আরোহণ করেছেন তার জন্য তারা যাবতীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত ক্লেশভার বহন করেছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা এসব বিষয় আলোচনা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানী-সমাজের বিকাশ

প্রথমেই যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার তা এই যে, ইসলামি সভ্যতায় বিদ্যার্থীরা তাদের দৃষ্টির সামনে একটি মহান লক্ষ্য স্থির করেছেন তাদের সভ্যতাকে অপরাপর বিশ্ব-সভ্যতার কাতারে উন্নীত করা। তবে এই লক্ষ্য মৌলিকভাবে ততটা কাঙ্ক্ষিত ছিল না যতটা ছিল বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হিসেবে।

মানুষ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয় যখন তারা পড়ে যে, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় জ্ঞানী-গুণীরা সাধারণ মানুষের হাসির পাত্র ছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই সভ্যতায় হাস্য-পরিহাসের নির্লজ্জ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন।(২১৯)

তবে ইসলামি সভ্যতায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহি নাযিল হওয়ার শুরু থেকে এটা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে আলেমরাই বা জ্ঞানীরাই আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।(২২০)

ফলে এই ঐশী মূল্যবোধ এই সভ্যতার প্রত্যেক সদস্যের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। মুসলিমরা বিশ্বাস করেছে যে আলেমরা এই উম্মাহর প্রকৃত নেতা ও পথপ্রদর্শক। কারণ,

«اَلْعُلَمَاءُ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»

আলেমরাই নবীদের উত্তরাধিকারী।(২২১)

---

২১৯. Adam Mez, *Die Renaissance des Islâm*; আরবি অনুবাদ, মুহাম্মাদ আবদুল হাদি আবু রিদা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যাতু ফিল-কারনির রাবিয়ি হিজরিয়্যি*, খ. ১, পৃ. ৩২৭ (আরবি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত)।

২২০. সুরা ফাতির : আয়াত ২৮।

এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামি সভ্যতার হাজারো সন্তান তাদের শৈশবকাল থেকেই জ্ঞান অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক অঞ্চল থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে। এই সকল আলেমের উত্থান ও বিকাশ অনন্য দৃষ্টান্ত ও অবিনশ্বর কাহিনিতে পরিণত হয়েছে।

এই সভ্যতায় বিদ্যার্থীরা জ্ঞান অর্জনে বিনয় ও কঠোর অধ্যবসায়ের পথ অবলম্বন করেছে। এই উম্মাহর পণ্ডিত ও জ্ঞানী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর আমি একজন আনসারি ব্যক্তিকে বললাম, চলুন, আমরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের জিজ্ঞেস করে হাদিস জানি, এখন তো তাদের সংখ্যা অনেক। তিনি বললেন, তোমার প্রতি বিস্ময় বোধ করছি হে ইবনে আব্বাস, তুমি কি মনে করো লোকজন তোমার মুখাপেক্ষী (তোমার কাছে হাদিস শিখতে আসবে), অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য সাহাবি তাদের মধ্যে রয়েছেন? এ কথা বলে তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি একাই উদ্যোগী হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের থেকে হাদিস জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম। কারও কাছ থেকে হাদিসের কথা আমার কাছে পৌঁছলে আমি তার দ্বারে যেতাম। হয়তো তিনি দিবানিদ্রায় বিশ্রাম নিতেন। আমি আমার চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে তার দরজায় শুয়ে থাকতাম। বাতাস আমার গায়ের ওপর ধুলো ছড়িয়ে দিত। তিনি বের হয়ে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করতেন, হে আল্লাহর রাসুলের চাচাতো ভাই, কেন তুমি এসেছ? তুমি কি আমার কাছে কাউকে পাঠাতে পারলে না, আমিই তোমার কাছে যেতাম? আমি বলতাম, আমারই উচিত আপনার কাছে আসা। আমি তাকে হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। সে আনসারি ব্যক্তি তার জীবদ্দশাতেই দেখলেন যে লোকজন আমার চারপাশে সমবেত হচ্ছে এবং রাসুলের হাদিস ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞেস করছে। এই অবস্থা দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, এই যুবক আমাদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান।[২২২]

---

[২২১]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৬৪১; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ২৬৮২।
[২২২]. ইয়াকুব আল-ফাসাবি, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, খ. ১, পৃ. ২৯৮।

জ্ঞান অর্জনে সতীর্থ, বন্ধু ও সহপাঠীদের মাঝে প্রতিযোগিতা এই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামি সভ্যতার যেকোনো যুগের কথাই আমরা পড়ি না কেন, দেখব যে জ্ঞান অন্বেষণে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এ ব্যাপারে এমন সব ঘটনা ও কাহিনি রয়েছে যা চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর। মদিনার ফকিহ সালিহ ইবনে কাইসান (মৃ. ১৪০ হি.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ও যুহরি (ইবনে শিহাব) একত্র হলাম এবং জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা সুনান লিখব। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যত হাদিস পেলাম সব লিখলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, চলুন আমরা সাহাবিদের থেকে যত কথা বর্ণিত সেগুলো লিখি। সেগুলোও সুন্নাহ। আমি বললাম, সেগুলো সুন্নাহ নয়। আমরা তা লিখব না। তিনি সাহাবিদের কথা লিখতে শুরু করলেন, কিন্তু আমি তা করলাম না। ফলে তিনি সফলকাম হলেন এবং আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।[২২৩]

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খলিফারা ও আমিররাও শৈশব থেকে জ্ঞান অন্বেষণে ও জ্ঞান অর্জনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বরং আমরা দেখি যে, তাদের কেউ কেউ সেইসব সোনালি দিনে ফিরে যেতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। বিদ্যার্থীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত বোধ করেছেন, যারা দরিদ্র অথচ সন্দেহাতীতভাবে সৌভাগ্যবান। খলিফা আল-মানসুর (মৃ. ১৫৮ হি.) তরুণ বয়সে যেখানে জ্ঞান রয়েছে বলে ধারণা করেছেন সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। হাদিস ও ফিকহেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে বেশ ভালো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার কোনো আশা কি এখনো অপূর্ণ রয়েছে? কোনো আস্বাদ কি বাকি রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একটি বিষয় বাকি রয়েছে। সহচররা জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? তিনি বললেন, তা হলো মুহাদ্দিস কর্তৃক শাইখকে বলা, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। এ কথা শুনে তার উজিরবৃন্দ ও লেখকরা সমবেত হলেন এবং তার চারপাশে বসে গেলেন। তারা বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমাদের কিছু হাদিস শোনান। তিনি বললেন, তোমরা তো তারা নও (তোমরা তালিবুল ইলমদের মতো নও), তাদের

---

২২৩. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

বস্ত্র জীর্ণ, তাদের পা ফেটে গেছে, তাদের চুল লম্বা, তারা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অনুসন্ধানে বেরিয়েছে, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে, একবার ইরাকে গিয়েছে তো আরেকবার গিয়েছে হেজাযে, একবার শামে গিয়েছে তো আরেকবার গিয়েছে ইয়ামেনে, তারাই হাদিসের ধারক ও বাহক।[২২৪]

পিতারা সন্তানদের শিক্ষাদান, শৈশব থেকেই শিক্ষাগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করতে নির্দেশনা দান ইত্যাদি ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে আন্দালুসের আল্লামা আল-হুমাইদির (জন্ম ৪২০ হিজরির পূর্বে) ঘটনা চমকপ্রদ। তার পিতা তাকে হাদিস শোনানোর জন্য কাঁধে বহন করে নিয়ে যেতেন। এটা ৪২৫ হিজরির কথা। ৪৪৮ হিজরিতে তিনি জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণ করেন এবং মিশরে আগমন করেন। আন্দালুসে তিনি ইবনে আবদুল বার[২২৫] ও ইবনে হাযম থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। ইবনে হাযমের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন, তাকে তার রচনাবলি পাঠ করে শুনিয়েছেন এবং তার থেকে গ্রহণ করেছেন প্রচুর। ইবনে হাযমের সহচর হিসেবে খ্যাতিও পেয়েছেন এবং তার মাযহাবের অনুসরণও করেছেন। তবে তার মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেন না। আল-হুমাইদি দামেশক ও অন্যান্য শহরেও হাদিস শ্রবণ করেছেন। খতিব বাগদাদি থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তার অধিকাংশ রচনাবলি সম্পর্কে লিখেছেন। মক্কায় তিনি আল-যানজানি থেকে হাদিস শুনেছেন। বাগদাদ থেকে বেরিয়ে ওয়াসিতে কিছুকাল থেকেছেন। তারপর আবার বাগদাদে ফিরে এসে এখানেই স্থায়ী আবাস গড়েছেন। এই শহরে তিনি বহু হাদিস, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে লেখালেখি করেন এবং প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন। মেধায় ও জ্ঞানে, দক্ষতায় ও বলিষ্ঠতায়, বিশ্বস্ততায় ও সত্যবাদিতায়, নিষ্ঠায় ও মহানুভবতায়, ধার্মিকতায় ও তাকওয়ায় তিনি মুসলিমদের অন্যতম ইমাম। এমনকি কতিপয় মনীষী তার সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন, আমার দুই চোখ আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদির মতো

---

২২৪. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৩২, পৃ. ৩৩০।

২২৫. ইবনে আবদুল বার : আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বার আল-কুরতুবি আল-মালিকি (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১১৭১ খ্রি.)। হাদিস ও আসারে যুগের ইমাম। তাকে 'হাফিযুল মাগরিব' বলা হতো। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، جامع بيان العلم وفضله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৭, পৃ. ৬৬-৭১; যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ৩, পৃ. ২১৭-২১৮।

কাউকে দেখেনি, মর্যাদায় ও মহত্ত্বে, চিত্তের পবিত্রতায় ও জ্ঞানের গভীরতায়, জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহে ও পরিবারের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারে।[২২৬]

অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, পিতারাও জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সফরে তাদের সন্তানদের সঙ্গে শরিক হতেন। উবাদাহ ইবনুল ওয়ালিদ ইবনে উবাদাহ ইবনুস সামিত ও তার পিতা আল-ওয়ালিদের ক্ষেত্রে এ ঘটনাই ঘটেছে। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা জ্ঞান অন্বেষণের জন্য আনসারদের এই মহল্লায় বের হলাম। মহল্লাটি তখনও ধ্বংস হয়ে যায়নি। আমরা প্রথমে যার দেখা পেলাম তিনি হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি আবুল ইয়ুসের সঙ্গে, তার একটি ছেলে ছিল। তিনি আমাদের হাদিস শোনালেন।[২২৭]

জ্ঞান অন্বেষণে সন্তানদের সঙ্গে পিতাদেরও ভ্রমণ মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় একটি ইসলামি নবসংযোজন। এটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, অন্য কোনো জাতির এই বৈশিষ্ট্য নেই। আমিরুল মুমিনিন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক নিজে ও তার দুই পুত্র আতা রহ.-এর কাছে গেলেন। তার কাছাকাছি বসলেন। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তাদের দিকে ঘুরলেন। তারা তাকে হজের বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকলেন। তারপর তিনি অন্যদিকে ঘুরলেন। সুলাইমান তার দুই পুত্রকে বললেন, তোমরা দাঁড়াও। তারা দাঁড়ালেন। তখন তাদের বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্ররা, জ্ঞান অন্বেষণে অলসতা করো না।[২২৮] একইভাবে খলিফাতুল মুসলিমিন হারুনুর রশিদ তার দুই পুত্র আল-আমিন ও আল-মামুনকে নিয়ে ইমাম মালিক রহ.-এর মুয়াত্তা শোনার জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়েছিলেন।[২২৯]

কোনো কোনো পিতা তাদের সন্তানকে জ্ঞান অন্বেষণে বাধা দিতেন। তারা মনে করতেন, এতে তাদের জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে এবং তারা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।

---

২২৬. আবুল আব্বাস মাক্কারি, *নাফহুত তিব্ব*, খ. ২, পৃ. ১১৩।
২২৭. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, খ. ১, পৃ. ৩৪১।
২২৮. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৪০, পৃ. ৩৭৫।
২২৯. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, খ. ৪০, পৃ. ৪১।

তবে সমাজ এসব অধ্যবসায়ী অসাধারণ ছাত্ররা যাতে পড়াশোনা ও জ্ঞান অর্জন অব্যাহত রাখতে পারে তার জন্য সহায়তা করতে সদা প্রস্তুত ছিল। ইবনে কাসির একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, হাশিম ইবনে বাশির ইবনে আবু হাযিম আল-কাসিম আবু মুআবিয়া আস-সুলামি আল-ওয়াসিতির পিতা বাশির ইবনে আবু হাযিম ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফির বাবুর্চি। এই চাকরির পর তিনি আচার বিক্রি করতেন। তিনি তার ছেলে হাশিমকে পড়াশোনা করতে না দিয়ে তার কাজে সাহায্য করতে বলতেন। কিন্তু হাশিম হাদিস শোনা ছাড়া আর কোনো কাজ করতে অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওয়াসিতের কাজি (বিচারক) আবু শাইবা তাকে দেখতে এলেন। তার সঙ্গে বহু লোকজন এলো। বাশির কাজিকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। ছেলেকে বললেন, হে বৎস, তোমার সুনাম কি এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে স্বয়ং কাজি এসে আমার ঘরে উপস্থিত! না, আজ থেকে তোমাকে আর হাদিস শুনতে মানা করব না। হাশিম ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। তিনি মালিক, শু'বা[২৩০], সুফয়ান সাওরি[২৩১] এবং অন্য অনেকের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ ও আবেদ।[২৩২]

কোনো সন্দেহ নেই যে এই সামাজিক দায়িত্ববোধই শহরের কাজিকে এবং আরও অনেক পদস্থ ব্যক্তিকে একটি পীড়িত দরিদ্র তরুণের কাছে আসতে বাধ্য করেছে। যে তরুণ জ্ঞান অর্জনের জন্য অধ্যবসায় এবং এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রচেষ্টা ছাড়া দুনিয়ার সামান্য বস্তুরও মালিক নয়। এসব ঘটনা থেকে যে ব্যাপারটি প্রতিভাত হয় তা এই যে, ইসলামি সভ্যতা জ্ঞান ও জ্ঞান অন্বেষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শুরুটা হয়েছে বিদ্যার্থীদের দিয়ে এবং শেষ হয়েছে আলেম-উলামা, জ্ঞানী-গুণী

---

[২৩০]. শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ : আবু বুসতাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ ইবনুল ওয়ার্‌দ আল-আযদি আল-বসরি (৮২-১৬০ হি./৭০১-৭৭৬ খ্রি.)। হাদিস, কবিতা ও সাহিত্যের ইমাম। ইমাম শাফিয়ি রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, শু'বা না থাকলে ইরাকে হাদিস কী জিনিস তা জানা যেত না। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১৬৪।

[২৩১]. সুফয়ান আস-সাওরি : আবু আবদুল্লাহ সুফয়ান ইবনে সাইদ ইবনে মাসরুক আস-সাওরি (৯৭-১৬১ হি./৭১৬-৭৭৮ খ্রি.)। হাদিসের ক্ষেত্রে আমিরুল মুমিনিন। কুফায় জন্মগ্রহণ করেছেন ও বেড়ে উঠেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন বসরায়। রচিত গ্রন্থ : *আল-জামিউল কাবির*, *আল-জামিউস সগির*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১০৪।

[২৩২]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১৯৮।

ও শিক্ষকদের দিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও এসব দৃষ্টান্ত সন্দেহাতীতভাবে জানিয়ে দেয় যে, ইসলামি সভ্যতা বিদ্যার্থীদেরকে সমাজের উচ্চস্তরে আসন দিয়েছে। এ ব্যাপারটি আমরা বিশ্বের অন্য কোনো জাতির কাছে পাই না। কারণ তারা সম্পদ, ক্ষমতা, রাজত্ব, শক্তি, কর্তৃত্ব, প্রতাপ ও কুসংস্কার ইত্যাদি বস্তুবাদী বিষয়কেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে।

ইসলামি সভ্যতায় জ্ঞান অন্বেষণে সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতে মায়েরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তা অজ্ঞাত নয়। অনেক মা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় সেই শাশ্বত যুগে নারীরা কতটা সচেতন ছিলেন। এসব মহান মায়েদের একজন হলেন উম্মে রবিআতুর রাই[২৩৩] (রবিআতুর রাইয়ের মা)। রবিআতুর রাই ইমাম মালিকের শাইখ ছিলেন। উম্মে রবিআর স্বামী ফাররুখ উমাইয়া শাসনামলে খোরাসানে অভিযানে বেরিয়েছিলেন এবং রবিআকে তার গর্ভে রেখে গিয়েছিলেন। তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন ত্রিশ হাজার দিনার। যাতে রবিআর মা তার লালনপালন, তরবিয়ত ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। ফাররুখ সাতাশ বছর পর ফিরে আসেন। মজসিদে নববিতে প্রবেশ করে তিনি বড় একটি মজলিস দেখতে পান। তিনি মজলিসটির কাছে আসেন এবং দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন। মজলিসে উপস্থিত ছিলেন ইমাম মালিক, হাসান বসরি ও মদিনার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। তিনি মজলিসটির পরিচালক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেন এটি রবিআ ইবনে আবু আবদুর রহমানের (অর্থাৎ তার পুত্রের) মজলিস!

ফাররুখ ঘরে ফিরে এসে তার স্ত্রী ও সন্তানের মাকে বললেন, আমি তোমার ছেলেকে যে অবস্থায় দেখলাম কোনো আলেম বা ফকিহকে তেমন দেখিনি। তার স্ত্রী বললেন, তাহলে কোনটি আপনার কাছে প্রিয়, ত্রিশ হাজার দিনার নাকি আপনার ছেলে যে অবস্থায় আছে তা? ফাররুখ বললেন, ত্রিশ হাজার দিনার নয়—আল্লাহর কসম—এটাই আমার কাছে

---

২৩৩. রবিআতুর রাই : রবিআ ইবনে আবু আবদুর রহমান আত-তাইমি, রবিআতুর রাই নামে পরিচিত। ইবনে হাজার আসকালানি তার সম্পর্কে বলেছেন, বিশ্বস্ত রাবি ও বিখ্যাত ফকিহ। বিশুদ্ধ মতে তিনি ১৩৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, *তাকরিবুত তাহযিব*, পৃ. ২০৭; *তারিখে বাগদাদ*, খ. ৮, পৃ. ৪২০; আল-বাজি, *আত-তা'দিল ওয়াত-তাজরিহ*, খ. ২, পৃ. ৫৭৩।

প্রিয়। তার স্ত্রী বললেন, আমি সমস্ত টাকাই তার জন্য খরচ করেছি। ফাররুখ বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি তা বিনষ্ট করোনি![২৩৪]

সুফয়ান সাওরি ছিলেন আরবদের ফকিহ (ফকিহুল আরব) ও তাদের মুহাদ্দিস, হাদিসের ক্ষেত্রে আমিরুল মুমিনিন। যায়িদা[২৩৫] তার সম্পর্কে বলেছেন, আস-সাওরি হলেন মুসলিমদের নেতা।[২৩৬] আওযায়ি[২৩৭] তার সম্পর্কে বলেছেন, এই উম্মাহর সবাই যাদের ব্যাপারে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছে তাদের মধ্য থেকে সুফয়ান সাওরি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।[২৩৮] এই সুফয়ান সাওরির পেছনে রয়েছে তার আত্মত্যাগী পুণ্যবতী মায়ের অবদান। তিনি তার লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষা ও যাবতীয় খরচের দায়িত্ব বহন করেছেন। সুফয়ান সাওরি তারই ফল। আমরা এই নারীর আত্মত্যাগের ঘটনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই।

সুফয়ান সাওরি নিজেই তার ব্যাপারে বলেছেন, যখন আমি জ্ঞান অন্বেষণে বেরুতে চাইলাম, বললাম, হে আমার প্রতিপালক, আমার রুজি-রোজগার আবশ্যক। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, জ্ঞান হ্রাস পাচ্ছে ও বিলুপ্তি ঘটছে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, জ্ঞান অন্বেষণেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখব। আল্লাহর কাছে আমার প্রয়োজনীয় রুটিরুজির আরজি জানালাম। অর্থাৎ, আল্লাহ যেন যথেষ্ট রিজিকের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা তার মাকে প্রস্তুত করে দিলেন। তিনি তাকে বলেন, হে প্রিয়পুত্র, তুমি জ্ঞান অর্জন করো, আমি আমার তকলি (সুতা কাটার মাকু) দিয়ে তোমার যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করব।[২৩৯]

---

[২৩৪]. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২৮৯-২৯০।

[২৩৫]. যায়িদা ইবনে কুদামা আস-সাকাফি : তিনি হলেন আবুস সাল্‌ত আল-কুফি, বিখ্যাত তাবে তাবেয়িন। যাহাবি তার সম্পর্কে বলেছেন, বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য রাবি। রোমে ১৬১ হিজরিতে গাজি হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যাহাবি, *আল-কাশিফ ফি মারিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল-কুতুবিস সিত্তাতি*, খ. ১, পৃ. ৪০০; ইবনে হাজার আসকালানি, *তাকরিবুত তাহযিব*, ২১৩।

[২৩৬]. ইবনে আবি হাতিম, *আল-জারহু ওয়াত-তা'দিল*, খ. ১, পৃ. ১১৮।

[২৩৭]. আবু আমর আল-আওযায়ি : আবদুর রহমান ইবনে আমর (৮৮-১৫৭ হি.), হাদিস ও ফিকহের ক্ষেত্রে সমকালে শামের (সিরিয়ার) ইমাম। বৈরুতে বসবাস করেছেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন। দেখুন, ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৪৮৮; আল-মিযযি, *তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৭, পৃ. ৩০৮।

[২৩৮]. যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ২০৪।

[২৩৯]. আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ. ৬, পৃ. ৩৭০।

সুফয়ান সাওরির মা তকলিতে সুতা কেটে রোজগার করতেন এবং তার ছেলের জন্য কিতাবাদি ও পড়াশোনার খরচ দিতেন। এভাবে ছেলেকে নিশ্চিন্ত হয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেন। এর চেয়েও বড় ব্যাপার এই যে, তিনি ছেলেকে ইলম অর্জনে লেগে থাকার ও ইলম অনুযায়ী আমল করার উপদেশ দিয়ে যেতেন। একবার তিনি ছেলেকে বললেন, হে প্রিয়পুত্র, যখন তুমি দশটি অক্ষরও লিখবে, চিন্তা করে দেখবে যে তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি, প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য ও গাম্ভীর্য বেড়েছে কি না, যদি তা না দেখতে পাও তাহলে বুঝবে যে সেইসব অক্ষর তোমার ক্ষতিই করছে, কোনো উপকার করছে না।[২৪০]

এমনই ছিলেন সুফয়ান সাওরির মা, তাই তিনিও ছিলেন এমন! জ্ঞানের নেতৃত্ব ও দ্বীনের ইমামতের আসন লাভ করেছিলেন!

এখানে আমরা প্রখ্যাত ইমামদের জীবনে তাদের মায়েদের যে ভূমিকা ছিল তা উল্লেখ না করে পারব না। ইমাম বুখারি ছিলেন মুহাদ্দিসদের আমির। তিনি শিশুকালেই পিতাকে হারান। তার মায়ের কাছে লালিতপালিত হন। তার মা তাকে যথার্থরূপে বড় করে তোলেন, যথাযথ যত্ন নেন এবং দোয়া করেন। জ্ঞান ও সততা অর্জনের প্রতি তাকে উৎসাহিত করেন। তার সামনে কল্যাণের দ্বারসমূহ শোভনীয় হয়ে ওঠে। ইমাম বুখারির বয়স যখন ষোলো বছর তখন তার মা তাকে নিয়ে মক্কায় হজ করতে যান। তিনি ছেলেকে সেখানে রেখে দেশে ফিরে আসেন। তার উদ্দেশ্য, ছেলে সেখানে অবস্থান করে আরবিভাষীদের থেকে ইলম অর্জন করবে এবং 'ইমাম বুখারি' হয়ে ফিরে আসবে। মুসলিম মায়েদের, বিশেষ করে বিধবাদের শেখাতে, কীভাবে সন্তানদের লালনপালন করতে হয়, তাদের মানুষ করতে হয় এবং উম্মাহর জাগরণ ও উন্নতিতে মায়েদের ভূমিকা কী!

ইমাম শাফিয়ির বয়স দুই বছর হলে তার মা তাকে নিয়ে গাজা (শাফিয়ির জন্মস্থান) থেকে মক্কায় সফর করেন। যেখানে রয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যার চারপাশে মরুভূমি, যেখানে তার ছেলের ভাষা বিশুদ্ধ হবে।[২৪১] এই মহীয়সী নারীর প্রচেষ্টার ফলই হলেন ইমাম শাফিয়ি রহ.।

---

২৪০. ইবনুল জাওযি, *সিফাতুস সাফওয়াহ*, খ. ৩, পৃ. ১৮৯।

২৪১. মুস্তাফা আশ-শাকআহ, *আল-আয়িম্মাতুল আরবাআ* (ইমাম শাফিয়ির মায়ের প্রসঙ্গ), পৃ. ১০-১১।

জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণ ছিল একটি প্রিয় কাজ, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে চাইতেন। এ কারণে বিশিষ্ট তাবিয়ি মাকহুল আদ-দিমাশকি গর্ব করে বলেছেন, আমি জ্ঞানের অন্বেষণে গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেছি।[২৪২] এ কারণেই মাকহুল রহ. মুসলিমদের বড় আলেম ও মনীষী হতে পেরেছেন। তিনি এত বিশাল মাপের আলেম ছিলেন যে, তার সম্পর্কে আল-ইমামুল কাবির মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব আয-যুহরি বলেছেন, আলেম হলেন চারজন। হেজাযে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, বসরায় হাসান আল-বসরি, কুফায় শা'বি এবং শামে (সিরিয়ায়) মাকহুল।[২৪৩]

এ সকল আলেম তাদের জ্ঞান অন্বেষণমূলক ভ্রমণে অপরিসীম শ্রম ব্যয় করেছেন, কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। ইবনে আবি হাতিম তার '*আল-জারহু ওয়াত-তা'দিল*' গ্রন্থের ভূমিকায় তার পিতা আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আল-রাযি[২৪৪] জ্ঞান অন্বেষণে যে ক্লেশ ভোগ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি তার পিতা থেকে এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তার পিতা বলেছেন, প্রথম বছর হাদিস অন্বেষণে বের হয়ে আমি সাত বছর কাটাই। পায়ে হেঁটে আমি কতটা পথ অতিক্রম করেছি তার হিসাব রেখেছি। তা এক হাজার ফারসাখের চেয়েও অনেক বেশি। হিসাব রাখছিলাম, এক হাজার ফারসাখ[২৪৫] হয়ে যাওয়ার পর হিসাব রাখা বাদ দিয়েছি। এই সময়ে আমি যেসব এলাকা ভ্রমণ করেছি তা নিম্নরূপ : কুফা থেকে বাগদাদে যে কতবার গিয়েছি তার হিসাব নেই, মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছি অনেকবার, বাহরাইনের সাল্লা শহরের কাছাকাছি এলাকা থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে মিশরে গিয়েছি, মিশর থেকে গিয়েছি রামাল্লায়, রামাল্লা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে, রামাল্লা থেকেই গিয়েছি আসকালানে, সেখান থেকে গিয়েছি তাবারিয়ায়, তাবারিয়া থেকে গিয়েছি দামেশকে, দামেশক থেকে

---

[২৪২]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ৩৩৪।

[২৪৩]. প্রাগুক্ত।

[২৪৪]. আবু হাতিম আল-রাযি : মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস ইবনে মুনযির ইবনে দাউদ ইবনে মিহরান (১৯৫-২৭৭ হি./৮১০-৮৯০ খ্রি.) রায়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন বাগদাদে। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *তাবাকাতুত তাবিয়িন*, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম* ও *আ'লামুন নুবুওয়া*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৭।

[২৪৫]. ১ ফারসাখ = ৪.৮ কিলোমিটার।

গিয়েছি হিমসে, হিমস থেকে গিয়েছি আন্তাকিয়ায়, আন্তাকিয়া থেকে তারতুসে, তারপর তারতুস থেকে ফিরে এসেছি হিমসে, সেখানে আবুল ইয়ামেনের কাছে কিছু হাদিস শোনা বাকি ছিল, সেগুলো শুনেছি। হিমস থেকে বেরিয়ে পড়েছি বাইসানের উদ্দেশে, বাইসান থেকে গিয়েছি রাক্কায় (রাকায়), রাক্কা থেকে বেরিয়ে ফুরাত নদী পেরিয়ে গিয়েছি বাগদাদে। শামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ার আগে ওয়াসিত থেকে গিয়েছি নীলে, নীল থেকে গিয়েছি কুফায়। এসব ভ্রমণ আমি পায়ে হেঁটেই করেছি। এগুলো আমার প্রথমবার সফরের ঘটনা, তখন আমার বয়স বিশ বছর। সফরে বেরিয়ে সাত বছর ভ্রমণ করেছি। পারস্যের রায় (আমার জন্মস্থান) থেকে বেরিয়েছি ২১৩ হিজরিতে এবং ফিরে এসেছি ২২১ হিজরিতে। দ্বিতীয়বার সফরে বেরিয়েছি ২৪২ হিজরিতে এবং ফিরে এসেছি ২৪৫ হিজরিতে–তিন বছর ভ্রমণ করেছি।[২৪৬]

আন্দালুসীয় মুসলিমদের কাছে ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা ছাড়া আলেমগণের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণও ছিল এটি। আল-মাক্কারি আবু আমর আদ-দানি[২৪৭] সম্পর্কে বলেছেন, যারা আন্দালুস থেকে প্রাচ্যে ভ্রমণ করেছেন তিনি তাদের একজন। তাকে সবার চেয়ে এগিয়ে রাখা উচিত। তিনি এর উপযুক্ত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকলের কাছে পরিচিত। হাফিজ, কারি, ইমাম, আল্লাহওয়ালা। ৩৭১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইলম অর্জন করতে শুরু করেন ৩৮৭ হিজরিতে। ৩৯৭ হিজরিতে প্রাচ্যের উদ্দেশে ভ্রমণ করেন। কায়রাওয়ানে চার মাস অবস্থান করেন। ওই বছরেরই শাওয়াল মাসে মিশরে প্রবেশ করেন। মিশরে থাকেন এক বছর। তারপর হজ করেন। ৩৯৯ হিজরির জিলকদ মাসে আন্দালুসে ফিরে আসেন।[২৪৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানলাম যে এই সভ্যতা তার সন্তানদের অন্তরে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বদ্ধমূল করে

---

২৪৬. ইবনে আবি হাতিম, *আল-জারহু ওয়াত-তা'দিল*, খ. ১, পৃ. ৩৪০, ৩৫৯।

২৪৭. আবু আমর আদ-দানি : উসমান ইবনে সাইদ ইবনে উসমান, ডাকনাম ইবনুস সাইরাফি (৩৭১-৪৪৪ হি./৯৮১-১০৫৩ খ্রি.)। বনি উমাইয়ার আজাদকৃত দাস। হাদিসের হাফিয। ইলমুল কুরআন, রেওয়ায়েত ও তাফসিরের ইমামদের একজন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২০, পৃ. ২০; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২০৬।

২৪৮. আবুল আব্বাস মাক্কারি, *নাফহুত তিব্ব*, খ. ২, পৃ. ১৩৫।

দিয়েছে। সেই জ্ঞানের উৎস যেখানেই থাকুক। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, এই সভ্যতার হাজার হাজার সন্তান মৌমাছির মতো উদ্যম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে বা নির্দিষ্ট শাইখের কাছে বন্দি থাকেনি। এ ব্যাপারটি আমরা অন্যান্য সভ্যতার সন্তানদের মধ্যে পাই না। কারণ মুসলিমদের কাছে জ্ঞান একটি সর্বজনীন বিষয়। এই বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে দীর্ঘ বহু শতাব্দীব্যাপী অনন্য করে রেখেছে।

Asif Rahman

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামি সাম্রাজ্যে জ্ঞানী-গুণীদের অবস্থান

জ্ঞানী-সমাজের বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবারের ভূমিকার চেয়ে কম নয়। বরং রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় পরিবারের চেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্থান ও বিস্তৃতি, প্রগতি ও স্বাধীনতার পথে যাত্রা এবং অধীনতার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির জন্য আবশ্যক ছিল আলেম-উলামা ও জ্ঞানীদের দায়িত্ব গ্রহণ ও তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তাদের ভরণপোষণ ও সার্বিক অবস্থার খোঁজখবর রাখা।

সত্য এই যে, ইসলামি সাম্রাজ্য এই ক্ষেত্রে তার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব একদিনের জন্যও বিস্মৃত হয়নি, বরং অধিকাংশ সময় এটাই ছিল তার প্রধান দায়িত্ব। বরং আপনি দেখবেন যে, ইসলামি বিশ্বের দূরদূরান্তের শহরগুলোও মাদরাসায়, উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে, গণগ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিল। এই ক্ষেত্রে যে অসংখ্য মুসলিম খলিফা ও আমিরের বিরাট অবদান রয়েছে এবং তারা যে আলেম-উলামা এবং বিদ্যার্থীদের দেখাশোনা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করেছেন তা ইতিহাস অত্যন্ত বিস্ময় ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ রেখেছে।

এ সকল খলিফার মধ্যে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক[২৪৯] তার সম্পর্কে বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ এবং খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবিদের যুগের পরে খলিফা হারুনুর রশিদের যুগে সবচেয়ে বেশি আলেম দেখেছি, সবচেয়ে বেশি কুরআনের কারি দেখেছি এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতাকারী ও হালাল-হারাম মান্যকারী দেখেছি। আট বছরের বালকও কুরআন (কুরআনের ব্যাখ্যা) সংকলন করেছে।

---

২৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক : আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল-কুরাশি বিল-ওয়ালা (মৃ. ২৫৪ হি./৮৬৮ খ্রি.)। ইরাকের হালওয়ান শহরের বিচারক। হাফেযে হাদিস এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। দেখুন, ইবনে মাকুলা, *আল-ইকমাল*, খ. ৭, পৃ. ২৩৯; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২২২।

এগারো বছরের বালকও ফিকহ ও ইলমে গভীরতা অর্জন করেছে, হাদিস বর্ণনা করেছে, বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ সংকলন করেছে, শিক্ষকদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করেছে।[২৫০] এটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছে যে, খলিফা হারুনুর রশিদ জ্ঞান ও জ্ঞান অর্জনকারীদের পেছনে অঢেল খরচ করেছেন, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানীদের প্রতি মনোযোগী থেকেছেন এবং তালিবুল ইলমদের শৈশব থেকেই তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন!

ইসলামি সভ্যতা ও জাগরণের যুগে বিভিন্ন পর্যায়ের কী পরিমাণ মাদরাসা নির্মাণ করা হয়েছে এবং কী পরিমাণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে আপনি জানতে পারবেন আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের শৈশব থেকেই রাষ্ট্র তাদের প্রতি কী ভূমিকা পালন করেছে। কুরআনুল কারিমের পাঠদান ও তাফসির শেখার জন্য বহু মাদরাসা ছিল, হাদিস শেখার জন্যও ছিল বহু মাদরাসা, ফিকহ শেখার জন্য যেমন বহু মাদরাসা ছিল, তেমনই চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যও ছিল বহু প্রতিষ্ঠান। এতিমদের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। এই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

শৈশবকাল পেরোনোর পর রাষ্ট্র তার জ্ঞানী-গুণী সন্তানদের জন্য উপযোগী ও যথার্থ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, ভালো ভালো পদে নিযুক্ত করেছে। যা তাদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এগুলো ছাড়া তাদের বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যান্য ভাতাও দেওয়া হতো। এখানে শাইখ নাজমুদ্দিন আল-খাবুশানির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাকে সুলতান সালাহুদ্দিন মাদরাসাতুস সালাহিয়্যায় শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। শিক্ষকতার জন্য তিনি মাসিক চল্লিশ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেতেন এবং মাদরাসার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য পেতেন দশ দিনার। তা ছাড়া দৈনিক রুটি পেতেন ষাট মিশরীয় রিত্‌ল[২৫১] এবং নীলনদের পানি পেতেন দুই বাহন।[২৫২]

---

২৫০. আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি, *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু* গ্রন্থটি *তারিখুল খুলাফা* নামে পরিচিত, খ. ২, পৃ. ১৫৭।

২৫১. এক মিশরীয় রিত্‌ল = ৪৪৯.২৮ গ্রাম।

২৫২. সুয়ুতি, *হুসনুল মুহাদারাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৭।

আল-আযহারের শাইখগণ মাসিক বেতন পেতেন। তার মধ্যে তাদের বাহন ঘোড়া-খচ্চরের খরচও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ আল-আযহারের ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে একটি বিশেষ অংশ ছিল শাইখদের বাহনের খরচাদি বহনের জন্য।[২৫৩]

আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের যাতে কোনো ধরনের বৈষয়িক চিন্তা করতে না হয় সেজন্যই এমন ব্যবস্থা ছিল। যাতে তারা গবেষণা, লেখালেখি ও নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবনে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হতে পারেন, মানুষদের জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন, পার্থিব জীবন ও আখিরাত উভয় দিক থেকে জনগণের উপকার করতে পারেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলামি সভ্যতার সেই সূচনার যুগে শিক্ষকদের একটি সমিতি ছিল। শিক্ষকেরাই এই সমিতির সভাপতি মনোনীত করতেন। সুলতান শিক্ষক সমিতিতে কোনোভাবেই নাক গলাতেন না, তবে সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তিনি তা মীমাংসা করে দিতেন।

এ প্রসঙ্গে আবু শামা আল-মাকদিসি[২৫৪] আর-রাওদাতাইন গ্রন্থে মুকাল্লিদ আদ-দাওলায়ি থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, হাফেয মুরাদি যখন মারা যান তখন আমরা, মানে ফকিহের দল দুইভাগে বিভক্ত ছিলাম। এক দল হলো আরব, আরেক দল হলো কুর্দি। আমাদের মধ্যে কারও কারও মাযহাবের প্রতি ঝোঁক ছিল, তারা শাইখ শারফুদ্দিন ইবনে আবু আসরুনকে[২৫৫] ডেকে আনতে চাইল। তিনি মসুলে থাকতেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার যুক্তিতর্ক ও মতবিরোধের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। তারা কুতবুদ্দিন আন-নিশাপুরিকে ডেকে আনতে চাইল। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। তারপর অনারবদের দেশে আসেন। এ কারণে আমাদের মধ্যে কথা

---

২৫৩. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০২।

২৫৪. আবু শামা : আবদুর রহমান ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম (৫৯৯-৬৬৫ হি./১২০২-১২৬৬ খ্রি.)। মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, মূলনীতি-বিশেষজ্ঞ ও কারি। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই বড় হয়েছেন। দারুল হাদিস আল-আশরাফিয়্যার প্রধান শাইখ ছিলেন। দেখুন, ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ৬৬, পৃ. ৩; শাতিবি, *ইবরাযুল মাআনি মিন হিরযিল আমানি*, খ. ১, পৃ. ১।

২৫৫. ইবনে আবু আসরুন : আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হিবাতুল্লাহ আত-তামিমি (৪৯২-৫৮৫ হি./১০৯৯-১১৮৯ খ্রি.)। শাফিয়ি ফকিহ। মসুলে জন্মগ্রহণ করেন, তারপর বাগদাদে চলে যান। দামেশকে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ৫৭৩ হিজরিতে দামেশকের বিচারক নিযুক্ত হন। দামেশকের আল-আসরুনিয়্যা মাদরাসাটির নামকরণ তার নামেই হয়েছে।

কাটাকাটি শুরু হয়। ফকিহদের মধ্যে একটা ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির কানে যায়। তিনি আলেপ্পোর দুর্গে ফকিহদের ডেকে পাঠান। তার প্রতিনিধি হিসেবে মাজদুদ্দিন ইবনে দাব্বা তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো, বিদআতের মূলোৎপাটন করা, দ্বীনের বিজয় নিশ্চিত করা। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যা শুরু হয়েছে তা শোভনীয় নয় এবং আপনাদের সঙ্গে তা যায় না। নুরুদ্দিন বললেন, আমরা উভয় দলকে খুশি করে দেবো। দুই দলের দুই শাইখকে ডেকে পাঠাব। তিনি শাইখ দুজনকে ডেকে পাঠান। শাইখ শারফুদ্দিনকে তার নামে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটির দায়িত্ব দেন এবং শাইখ কুতবুদ্দিনকে দেন মাদরাসাতুন নাফারির দায়িত্ব।[২৫৬]

যে-সকল জ্ঞানী-বিজ্ঞানী উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতিও রাষ্ট্র পর্যাপ্ত আনুকূল্য দেখিয়েছে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। তৃতীয় মুওয়াহহিদি খলিফা আল-মানসুর ইয়াকুব ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মুমিন মেধাবী বিদ্যার্থীদের জন্য 'বাইতুত তালাবা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই এটির তত্ত্বাবধান করেন। এমনকি তার কিছু সহচর এই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থীদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। কারণ তারা খলিফার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তার ঘনিষ্ঠ ছিল। খলিফা তাদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হতেন এবং কথা বলতেন। সহচরদের হিংসার বিষয়টি তার কানে গেল। তিনি আশঙ্কা বোধ করলেন এবং তাদের উদ্দেশে বললেন, হে মুওয়াহহিদি গোষ্ঠী, তোমাদের নিজ নিজ গোত্র রয়েছে। তোমরা কোনো সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হলে তোমাদের গোত্রের কাছে আশ্রয় নাও। কিন্তু এই বিদ্যার্থীদের কোনো গোত্র নেই, আমি ছাড়া তাদের কেউ নেই। তারা কোনো সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হলে আমিই তাদের আশ্রয়স্থল। তারা আমার কাছেই তাদের ভয় ও আশঙ্কার কথা প্রকাশ করতে পারে। তারা আমার ওপরই নির্ভর করে...।[২৫৭] এইভাবেই মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিস্তৃত হয় এবং নেতৃত্ব দেয়।

---

২৫৬. আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, পৃ. ১৭।
২৫৭. আবদুল ওয়াহিদ আল-মারাকেশি, *আল-মু'জিব ফি তালখিছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ. ৮১।

আবদুল্লাহ ইবনে তাহিরের[২৫৮] সঙ্গে আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালামের[২৫৯] একটি চমৎকার ঘটনা ঘটেছিল। আমির-উমারা শ্রেণি জ্ঞানীদের মেধার প্রতি কতটা শ্রদ্ধা রাখতেন এবং কর্মতৎপর মেধাবীদের কতটা সম্মান করতেন তা এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম তার *'গারিবুল হাদিস'* গ্রন্থটি রচনা করার পর আবদুল্লাহ ইবনে তাহিরের কাছে পেশ করেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন এবং বলেন, যে মেধা তার বাহককে এই গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তার জীবিকা উপার্জনের মুখাপেক্ষী না হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। এই কথা বলে তিনি আবু উবাইদ আল-কাসিমের জন্য মাসিক দশ হাজার দিরহাম ভাতা জারি করেন।[২৬০]

বড় বড় উপঢৌকন ও মূল্যবান উপহার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল খুব প্রসিদ্ধ। খলিফা, গভর্নর ও প্রশাসকরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের এসব উপঢৌকন ও উপহার দিতেন এবং তাদেরকে আরও বেশি জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করতেন। অকল্পনীয় মূল্যবান ছিল এসব উপঢৌকন। এসব উপঢৌকনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অন্য ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুবাদককে অনূদিত বইয়ের সমওজনের স্বর্ণ প্রদান![২৬১]

এ কারণে অনুবাদ-তৎপরতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং এর ফলে মুসলিমরা বিপুল জ্ঞানরাশিতে সমৃদ্ধ হয়েছে।

উসমানি খিলাফত এই ক্ষেত্রে চমৎকার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তারা সব শহর ও এলাকা থেকে সেরা মেধাবীদের সমবেত করতে সফল হয়েছিল এবং তাদের পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল। ফলে তাদের প্রত্যেক সেরা

---

[২৫৮]. আবদুল্লাহ ইবনে তাহির : আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে তাহির ইবনুল হুসাইন আল-খুযায়ি *আল-খুরাসানি* (১৮২-২৩০ হি./৭৯৮-৮৪৪ খ্রি.)। আব্বাসি যুগের বিখ্যাত গভর্নরদের একজন। শাম (সিরিয়া), খুরাসান, মিশর, তাবারিস্তান, কিরমান ও রায়ের গভর্নর ছিলেন। নিশাপুরে মৃত্যুবরণ করেন। মারভে মৃত্যুবরণ করেছেন বলেও বর্ণনা রয়েছে।

[২৫৯]. আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম : আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম আল-হারাবি (১৫৭-২২৪ হি./৭৭৪-৮৩৮ খ্রি.)। হাদিস, আদব ও ফিকহের অন্যতম বড় আলেম। হিরাতে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই জ্ঞান অর্জন করেন। বাগদাদ ও মিশর ভ্রমণ করেছেন। মক্কা মুকাররমায় মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ৪৯০-৪৯২।

[২৬০]. খতিব বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ৪০৬; ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ৪৯, পৃ. ৭৪; ইবনে হাজার আসকালানি, *তাহযিবুত তাহযিব*, খ. ৮, পৃ. ২৮৪।

[২৬১]. ইবনে সায়িদ আল-আন্দালুসি, *তাবাকাতুল উমাম*, পৃ. ৪৮-৪৯।

মেধাবীই তার জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটি উসমানি সাম্রাজ্যকে সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উৎকর্ষের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল এবং তা বিশ্বের প্রধান সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

ইসলামি সাম্রাজ্য কেবল নিজ দেশের জ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধান করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং শাসকেরা অন্যান্য দেশ ও শহরের জ্ঞানী-গুণীদেরও আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়েছেন। তারা ভিনদেশি জ্ঞানীদের এভাবে সম্মানিত করতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছেন। আল-মুয়িয ইবনে বাদিস ছিলেন ইসলামি মরক্কোর সানহাজি রাজ্যের একজন আমির।[২৬২] তিনি যখনই কোনো শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীর নাম শুনতেন, তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতেন। শুধু তাই নয়, তাকে তার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন, তার মতামতের ওপর নির্ভর করতেন এবং তার জন্য উচ্চ ভাতা নির্ধারণ করে দিতেন।[২৬৩]

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ যখনই শুনেছেন যে, কোনো আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি সংকটে বা অভাবে পড়েছেন, তিনি তাকে সাহায্য করতে ছুটে গিয়েছেন এবং পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকাপয়সা ব্যয় করেছেন।[২৬৪]

মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ মৃত্যুশয্যায় তার পুত্রকে যে ওসিয়ত বা বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন তা থেকে এ চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওসিয়তে তিনি বলেছিলেন, ...আলেম-উলামা ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটি রাজ্যের সুদৃঢ় শক্তি। তুমি তাদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখবে এবং তাদের উৎসাহ দেবে। যখনই তুমি শুনবে অন্য দেশে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন, তাকে তুমি তোমার কাছে নিয়ে আসবে। ধনসম্পদ দিয়ে তাকে সম্মানিত করবে।[২৬৫]

---

[২৬২]. বনু যিরির আমির। যিরি রাজবংশ (Zirid dynasty) সানহাজি রাজবংশের একটি শাখা।

[২৬৩]. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি ইখতেছারি আখবারি মুলুকিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব*, পৃ. ১২৯।

[২৬৪]. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া-আসবাবুস সুকুত*, পৃ. ১৪০।

[২৬৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্রের আচরণের ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাপারটি লক্ষ করি তা এই যে, মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য ধর্ম, মতাদর্শ ও জাতি-গোষ্ঠীর জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো বৈষম্য করেনি। বুখতিশু নাসতুরি পরিবার[২৬৬] এই ক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ। এই পরিবারের সন্তানেরা প্রায় সত্তর বছর আব্বাসি খলিফাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর থেকে খলিফা আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ পর্যন্ত বুখতিশু পরিবারই ছিল তাদের চিকিৎসক। রাজদরবারে তাদের মর্যাদা ছিল বেশ, বিশেষ খাতির-যত্নও ছিল।[২৬৭] এই পরিবারের একজন চিকিৎসক হলেন জিবরিল ইবনে বুখতিশু ইবনে জর্জিস (মৃ. ২১৩ হি.)। তিনি খলিফা হারুনুর রশিদের চিকিৎসক ছিলেন এবং তার সহচর ও বন্ধু ছিলেন। এমনকি এ কথাও রটে গিয়েছিল যে, খলিফার কাছে তার অবস্থান দিন দিন দৃঢ়ই হচ্ছে। এমনকি হারুনুর রশিদ তার সঙ্গীসাথির উদ্দেশে একবার ঘোষণাও দিলেন, আমার কাছে তোমাদের কারও কোনো প্রয়োজন থাকলে তা জিবরিলকে বলো।[২৬৮]

একইভাবে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কাছে ইহুদি ইবনে মাইমুন আল-আন্দালুসি বিশেষ গুরুত্ব ও খাতির-যত্ন পেতেন। তিনি সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন![২৬৯]

শাসকেরা ও আমির-উমারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে টানতে না পারলে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। তা এই যে, তাদের কোনো গ্রন্থ রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কিনে নিতেন।

উদাহরণ হিসেবে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। আন্দালুসের উমাইয়া খলিফা আল-হাকাম আরবি সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ '*আল-আগানি*' রচনার কথা শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গ্রন্থটির রচয়িতা আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানির কাছে গ্রন্থটির একটি কপির মূল্য বাবদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন। যেন তিনি একটি কপি

---

২৬৬. নাসতুরি খ্রিষ্টান (Nestorian Christian) গোত্রের পরিবার। বনি বুখতিশু বা বনি আবদুল মাসিহ নামেও পরিচিত। বুখ্ত শব্দের অর্থ বান্দা বা দাস এবং ইয়াশু শব্দের অর্থ ইসা মাসিহ আ.।

২৬৭. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ৪৪-৪৫।

২৬৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১১।

২৬৯. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩২৯।

আন্দালুসে খলিফা আল-হাকামের কাছে পাঠিয়ে দেন। খলিফা যা চাইলেন তা-ই হলো। আবুল ফারাজ *আল-আগানি*র একটি কপি পাঠিয়ে দিলেন। লেখকের জন্মভূমি ইরাকে গ্রন্থটি পঠিত হওয়ার পূর্বে তা পঠিত হলো আন্দালুসে!!

ইসলামি সভ্যতায় খলিফাবৃন্দ, আমির-উমারা, ধনাঢ্য ও অভিজাত শ্রেণি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণা লাঘব করেছেন, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের জন্য তারা যেন নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করেছেন। এসব বিষয় প্রমাণ করে যে, এই সভ্যতা জ্ঞানী-গুণীদের কতটা আগলে রেখেছে, কতটা যত্ন নিয়েছে। এটা–কোনো সন্দেহ নেই যে–ইউরোপে আমরা যা দেখেছি তার বিপরীত। সেখানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের রচনাবলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃত্বকারী সংস্থাগুলো জাতিকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রসহ গির্জার কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইজাযত

ইজাযত বলতে বোঝায় ফাতওয়া বা শিক্ষকতার অনুমতি দান।[২৭০] মুহাদ্দিসগণ ও অন্যদের কাছে ইজাযতের সংজ্ঞা হলো, হাদিস বা কিতাব বর্ণনার অনুমতি প্রদান।[২৭১]

আলেমগণ বেশ কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন। এসব মানদণ্ড অতিক্রম করেই একজন তালিবুল ইলম বা শিক্ষার্থী শিক্ষার এই স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারত। এই স্তরে এসে সে পাঠদান বা ফাতওয়া প্রদানের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে যেত। এ কারণে 'ইজাযত' ছিল প্রধান ও চূড়ান্ত মানদণ্ড, যেখানে শিক্ষক তার শিষ্যকে এই স্বীকৃতি দিতেন যে সে ভিন্ন মজলিসে বসে পাঠদানে সক্ষম হয়েছে এবং সে বিভিন্ন জ্ঞানের নির্দিষ্ট শাখায় পারদর্শী হয়েছে।

ইজাযতের বিষয়টি অন্যদের কাছে জ্ঞান (কিতাব, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি) পৌঁছে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার মধ্য দিয়েই রূপায়িত হতো। শাইখ তার পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি বা কিছু অংশ তার ছাত্রকে বা কোনো আলেমকে দিতেন এই মর্মে যে এই পাণ্ডুলিপি তিনি নিজ হাতেই লিখেছেন। তা ছাড়া তিনি যে শাইখ থেকে এই জ্ঞান আহরণ করেছেন তার নামও তাদের জানিয়ে দিতেন। তারপর তাদেরকে তা অন্যদের প্রদান করার অনুমতি দিতেন। এভাবেই ইজাযতদানের বিষয়টি সম্পন্ন হতো।[২৭২]

ইসলামি সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই ইজাযতদানের বিষয়টি সুপরিচিত। শুরুর দিকে ইজাযতদানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহের মধ্যে যাতে মিশ্রণ না ঘটে এবং তা

---

২৭০. *হাশিয়া ইবনে আবিদিন*, খ. ১, পৃ. ১৪।

২৭১. মিশরীয় ওয়াক্‌ফ মন্ত্রণালয়, *আল-মাউসুআতুল ইসলামিয়্যাতুল আম্মাহ*, পৃ. ৪৩।

২৭২. কারাম হিলমি ফারহাত, *আত-তুরাসুল ইলমি লিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিশ শাম ওয়াল ইরাক খিলালাল কারনির রাবিয়িল হিজরি*, পৃ. ৬৯।

থেকে বেঁচে থাকা যায়। তাই হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ ইজাযতদানের পদ্ধতি স্থির করেন। এটা ছিল শিক্ষক ও শিষ্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা নিরূপণের একটি প্রকার।

বাস্তবিক পক্ষে 'ইজাযত' হাজার বছরের মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি সংযোজন। বস্তুত এটি ছিল বর্তমান সময়ে ছাত্ররা যে সত্যায়িত সনদ লাভ করে তারই নামান্তর।

এ কারণেই আমরা দেখি যে ইসলামের প্রত্যেক যুগে রাষ্ট্রের দৃশ্যমান পদে কোনো আলেমের নিযুক্তির জন্য 'ইজাযত' ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

আহলে সুন্নাহর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার পুত্র আবদুল্লাহকে ইজাযত দিয়েছেন, এই মর্মে যে, তিনি তার থেকে মুসনাদের ত্রিশ হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাস্বরূপ এক লাখ বিশ হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৭৩] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব আয-যুহরি রহ. ইমাম ইবনে জুরাইজকে[২৭৪] ইজাযত দিয়েছেন।[২৭৫]

ইসলামি সভ্যতার নারীদের অন্যতম অধিকার ছিল জ্ঞান অর্জন করা এবং শিক্ষাদান করা। এই ক্ষেত্রে তারা ছিল পুরুষের মতোই, সমান সমান। কোনো নারী আলেমদের থেকে ইজাযত হাসিল করা ছাড়া শিক্ষাদান বা পাঠদানের জন্য বসতে পারতেন না। এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে যে, ইমাম যাহাবির[২৭৬] দুধমা ও ফুফু সিত্তুল আহলি বিনতে উসমান ইবনে কাইমায যাদের থেকে ইজাযত গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন ইবনে আবুল ইয়ুস্‌র, জামালুদ্দিন ইবনে মালিক, যুহাইর ইবনে উমর আয-যারয়ি

---

২৭৩. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ, ১১, পৃ. ১০৯।

২৭৪. ইবনে জুরাইজ : আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযিয ইবনে জুরাইজ আর-রুমি (৭০-১৫০ হি.)। বনি উমাইয়ার আযাদকৃত দাস। ছিলেন অন্যতম জ্ঞানভান্ডার। হাদিসশাস্ত্রে তিনিই প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ১৬০; সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ১১৯-১২০।

২৭৫. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৩২।

২৭৬. যাহাবি : আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান ইবনে কাইমায (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি.)। হাফিযে হাদিস, ঐতিহাসিক, আল্লামা, টীকা-ভাষ্যকার। তুর্কমান বংশোদ্ভূত। দামেশকে জন্ম ও মৃত্যু। তার রচনাবলি বিশাল ও ব্যাপক, প্রায় একশ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ১৬০।

এবং আরও অনেক। তিনি উমর ইবনুল কাওয়াস প্রমুখ থেকে হাদিস শুনেছেন। ইমাম যাহাবি তার এই ফুফু থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৭৭]

ইজাযতের ব্যাপারটি কেবল কুরআন ও হাদিস এবং শরয়ি জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জীবনঘনিষ্ঠ সকল জ্ঞানই এর আওতাধীন ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের পঠনপাঠনের জন্যও অনুমতির প্রয়োজন হতো। হিজরি চতুর্থ শতকে প্রধান চিকিৎসাবিদ সিনান ইবনে সাবিত[২৭৮] যারা চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের ইজাযত প্রদান করেন। তবে তাদের প্রত্যেককে বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, যে ব্যক্তি যে শাখায় কাজ করতে চায় সে ওই শাখায় বিশেষজ্ঞ কি না তা যাচাই করা হয়।[২৭৯] একইভাবে দামেশকে আল-মাদরাসাতুল দাখওয়ারিয়্যাহর প্রতিষ্ঠাতা মুহাযযিবুদ্দিন আদ-দাখওয়ার ইজাযত দেন আল্লামা আলাউদ্দিন ইবনে নাফিসকে। তিনি এই ইজাযত লাভের পর তার যুগের সবচেয়ে বড় হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পান। এটি হলো দামেশকের আন-নুরি হাসপাতাল।[২৮০] চিকিৎসাবিদ আল-রাযি তার *'আল-হাবি'* গ্রন্থে বলেছেন, চিকিৎসার জন্য অনুমোদনপ্রার্থীর প্রথম পরীক্ষা হবে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা (anatomy) বিষয়ে। সে যদি এটা না জানে বা অনুত্তীর্ণ হয় তাহলে তার বিদ্যা রোগীদের ওপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই।[২৮১]

বড় আলেমদের থেকে ইজাযত ছিল ছাত্রদের জন্য গর্বের বিষয়। তারা তা জীবনভর মানুষের কাছে উল্লেখ করতেন। আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি তার যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম সিরাজুদ্দিন ইবনে মুলকিন থেকে ফিকহে শাফেয়ির ইজাযত নিয়েছিলেন। তিনি তার কোষমূলক গ্রন্থ صبح الأعشى في كتابة الإنشا *(সুবহুল আ'শা ফি কিতাবাতিল ইনশা)*-য় সেই 'ইজাযতবাণী' উল্লেখ করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি এই ইজাযত

---

২৭৭. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, সম্পাদনার ভূমিকা, খ. ১, পৃ. ১৭।

২৭৮. সিনান ইবনে সাবিত : আবু সাইদ সিনান ইবনে সাবিত ইবনে কুররাহ আল-হাররানি (মৃ. ৩৩১ হি./৯৪৩ খ্রি.)। চিকিৎসাবিদ, বিজ্ঞানী। আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাদিরের কাছে তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত উঁচুতে। তিনি তাকে চিকিৎসকদের প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৫, পৃ. ১৫২।

২৭৯. ইবনে আবি উসাইবিআ, *তাবাকাতুল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ২০৪।

২৮০. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ৫১, পৃ. ৩১২।

২৮১. আল-রাযি, *আল-হাবি ফিত-তিব্বি*, খ. ৭, পৃ. ৪২৬।

কতটা ভালোবাসেন, কতটা গর্ববোধ করেন এটা নিয়ে। তার ইজাযতবাণীর উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ :

আল্লাহ তাআলা আমাদের সাইয়িদ, আমাদের শাইখ, আমাদের বরকত, আল্লাহর মুখাপেক্ষী বান্দা, আশ-শাইখ আল-ইমাম আল-আল্লামা, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ, যুগশ্রেষ্ঠ ও অনন্য, জ্ঞানীদের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ, ফকিহদের ও সৎ ব্যক্তিদের অবলম্বন সিরাজুদ্দিন মুফতিউল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন আবু হাফস উমরকে কল্যাণ করুন। তিনি অমুককে (যার নাম আল-কালকাশান্দি)—আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত রাখুন—অনুমতি দিয়েছেন ও অনুমোদন করেছেন এই মর্মে যে, তিনি আল-ইমাম আল-মুজতাহিদ আল-আলিমুর রাব্বানি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আল-মাতলাবি আশ-শাফিয়ির মাযহাবের পাঠদান করতে পারবেন—আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে তার প্রত্যাবর্তনস্থল ও চিরস্থায়ী আবাস বানিয়ে দিন—এবং শাফিয়ি মাযহাব বিষয়ে লিখিত সব গ্রন্থ পাঠ করতে পারবেন এবং তার ছাত্রদের পড়াতে পারবেন; তিনি যতটা চান, যেখানে গমন করেন ও অবস্থান করেন সেখানেই, তার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই এবং যখন যেখানে খুশি সেখানেই তা করতে পারবেন; কেউ তার কাছে ফাতওয়া চাইলে তিনি লিখিতভাবে ও মৌখিকভাবে ফাতওয়া দিতে পারবেন, তার পবিত্র মাযহাবের দাবি অনুযায়ী তার জ্ঞান ও দ্বীনদারি, আমানতদারি, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, উপযুক্ততা ও পর্যাপ্ত চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে তিনি তা করবেন...।[২৮২]

উপরিউক্ত ঘটনাবলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে গোটা মানবসভ্যতার অভিযাত্রায় 'ইজাযত' এক অনন্য ও অগ্রগামী ইসলামি সংযোজন। ইউরোপের বড় বড় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়েরও দশ শতাব্দী পূর্বে ইজাযতের বিষয়টি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে নতুন বিষয় সংযোজনের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা কতটা অগ্রগামী ও শ্রেষ্ঠ তা সহজেই প্রমাণিত হয়। এই ইজাযত পদ্ধতি আজ গোটা বিশ্বের সব জাতিই অনুসরণ করছে।

---

২৮২. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

বিজ্ঞানের এ সকল শাখার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি নাম ব্যবহৃত হয়। যেমন মহাজাগতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, প্রায়োগিক বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ইত্যাদি। আমি এগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে 'জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞান' নামটাকে প্রাধান্য দিয়েছি। অর্থাৎ, এগুলো শরয়ি জ্ঞান নয়। কারণ, আমি মনে করি যে এসব জ্ঞান বা বিজ্ঞানের ফলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়েছে। আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, এগুলো হলো সেসব উপকারী জ্ঞান যা মানুষ তাদের চিন্তা, বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে। এসব জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে, পৃথিবীতে সম্ভব সবকিছুকে আয়ত্ত করেছে, প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের বহু কিছু আবিষ্কার করেছে। এসব জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৌশলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল, ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি। পৃথিবীতে যত প্রাণী ও বস্তু ছড়িয়ে আছে তাদের সবকিছু নিয়ে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা রয়েছে। মানবজীবনকে সুন্দর ও সুষম করতে মানুষের এসব জ্ঞানের প্রয়োজন।

ইসলামের ছায়াতলে জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এবং তা উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমনকি মুসলিমরাই এসব বিজ্ঞানে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছেন। মুসলিমরা যেমন পৃথিবীর নেতৃত্ব অর্জন করেছিলেন, তেমনই জ্ঞানবিজ্ঞানের নেতৃত্বও অর্জন করেছিলেন। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের জন্য সবসময়ই উন্মুক্ত ছিল, তারা এসব

জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের দেশ ছেড়ে প্রাচ্যে এসেছে। ইউরোপের রাজাবাদশা ও আমির-উমারা বরাবরই চিকিৎসা নেওয়ার জন্য মুসলিম দেশগুলোতে এসেছেন। ফরাসি প্রাচ্যবিদ গুস্তাভ লি বোঁ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিমরা যদি ফ্রান্সের ওপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করত তাহলে প্যারিসও মুসলিম স্পেনের কর্ডোভার মতো সমৃদ্ধিশালী হতো![২৮৩]

ইসলামের জ্ঞান-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, সভ্যতায় ইউরোপ মূলত আরব মুসলিমদের একটি শহর।[২৮৪]

এই অধ্যায়ে জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তাদের অবদানগুলোর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আমরা তুলে ধরব। আমরা দেখাব যে তারা যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন তা মানবসভ্যতার অভিযাত্রায় এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই অধ্যায় নিম্নবর্ণিত দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখাগুলোর বিকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

---

২৮৩. গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon), *The World of Islamic Civilization* (1974), আরবি অনুবাদ, আদিল যুআইতার, *হাদারাতুল আরব*, পৃ. ১৩, ৩১৭।

২৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখাগুলোর বিকাশ

সন্দেহ নেই যে, মুসলিমদের পূর্বে বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানের এসব শাখায় পূর্বতন সভ্যতাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি রয়েছে। তাদের কীর্তির ওপরই নির্ভর করে মুসলিমরা এগিয়েছেন। তারা গর্বের সঙ্গেই এ কথা স্বীকার করেন ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাদের জাগরণের সূচনা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্ববর্তী সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে তারা পূর্ববর্তী মানুষদের থেকে কেবল আহরণ করে ক্ষান্ত থাকেননি, তারা এসব জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে অসংখ্য নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন। এটাই তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মৌলিক নীতি। বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখায় মুসলিমগণ যেসব কীর্তি সাধন করেছেন তা স্বর্ণখচিত উজ্জ্বল ইতিহাস হয়ে রয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা এসব ব্যাপারে আলোকপাত করতে যাচ্ছি।

প্রথম অনুচ্ছেদ
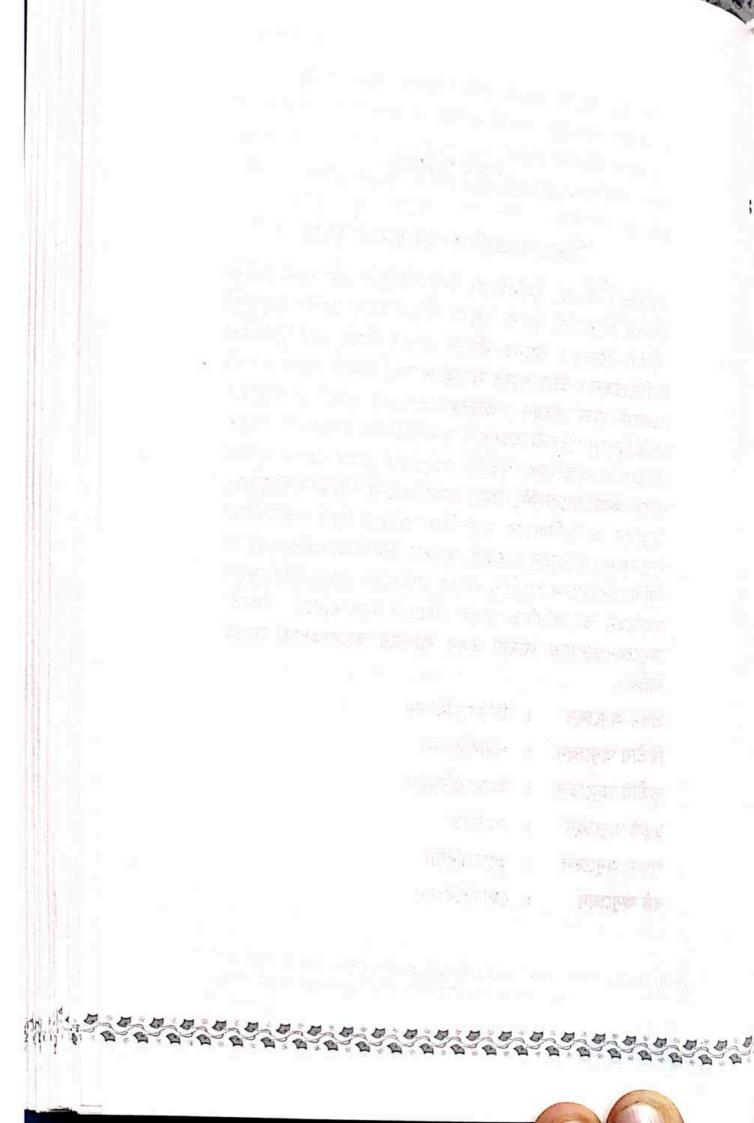
১. চিকিৎসাবিজ্ঞান

মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের যে শাখাটিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন তা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞান। এটিকে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্তৃত শাখা বিবেচনা করা হয় যেখানে মুসলিমরা তাদের সভ্যতার দীর্ঘ কালপর্বে শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের অবদানগুলো সব দিক থেকেই ছিল অভূতপূর্ব, অনন্যসাধারণ ও নবদিগন্তের পরিচায়ক। যে-কেউ মুসলিমদের এসব অবদান জানবেন তার মনে হবে মুসলিম সভ্যতার পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো অস্তিত্বই ছিল না!

রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাতেই তাদের গবেষণা ও উদ্ভাবন সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তারা এটিকে একটি মৌলিক পরীক্ষামূলক ভিত্তি দান করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষেধমূলক ও নিরাময়মূলক যত চর্চা আছে তার সব ক্ষেত্রে মুসলিমদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল অবদান রয়েছে। তারা ওষুধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছেন, চিকিৎসায় মানবিকতা ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামি অবদানের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব উজ্জ্বল হয়ে আছে এখানে যে, তা একদল বিস্ময়কর চিকিৎসা-প্রতিভাকে বের করে আনতে পেরেছিল। চিকিৎসাবিদ্যার গতিপথকে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিতে মহান আল্লাহর পরে এ সকল প্রতিভা সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। বর্তমান যুগ পর্যন্ত চিকিৎসক প্রজন্মরা এই পথ ধরে সামনে এগিয়ে চলেছে।

পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্ব প্রকাশমান হওয়ার পর থেকেই চিকিৎসাশিল্পের সূচনা ঘটেছে। মানুষ–তাদের প্রতিপালকের বাণী অনুসারে–তাদের বুদ্ধি, মেধা ও মানবিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিকিৎসার নানা পথ ও প্রকার আবিষ্কার করেছে। চিকিৎসার এসব প্রকার 'আদিম চিকিৎসা-পদ্ধতি' (Primitive Medicine) নামে পরিচিত।

মানবসভ্যতার স্তর বা পর্যায়ের সঙ্গে এই পদ্ধতি ছিল গতিশীল। এ কারণে আমরা দেখি যে ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন, ...যাযাবরদের যে চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ভিত্তি ছিল স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতা। গোত্রের প্রবীণ লোকদের থেকে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির চর্চা করত। কখনো চিকিৎসার কিছু বিষয় সঠিকও ছিল, তবে তা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ছিল না।[২৮৫]

জাহিলি যুগে আরবদেরও এ ধরনের চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল। পরপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেন। উসামা ইবনে শারিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ»

> তোমরা রোগ-ব্যাধিতে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো; কারণ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন, কেবল বার্ধক্য ব্যতীত।[২৮৬] (জরা বা বার্ধক্য দূর করার কোনো ওষুধ নেই।)

জানা গেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধু, খেজুর, ঘাস-লতা-পাতা ও প্রাকৃতিক উপাদানের দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের চিকিৎসা তিব্বে নববি বা নববি চিকিৎসা-পদ্ধতি নামে পরিচিত।

তবে মুসলিমরা নববি চিকিৎসা-পদ্ধতির সীমারেখায় আবদ্ধ থাকেননি। বরং শুরুতেই তারা অনুধাবন করেছেন যে জাগতিক জ্ঞানসমূহ–চিকিৎসাবিদ্যাও তার একটি–নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও চিন্তাভাবনার দাবি রাখে। অন্যান্য জাতির কাছে এসব জ্ঞানের কী রয়েছে সেটা জানা

---

২৮৫. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৬৫০।

২৮৬. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : চিকিৎসা, বাব : পুরুষের চিকিৎসা গ্রহণ, হাদিস নং ৩৮৫৫; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২০৩৮; তিনি বলেছেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৪৩৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৮৪৭৭। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত এবং তাদের থেকে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

জরুরি। কারণ ইসলাম সবসময় যা-কিছু কল্যাণকর ও উপকারী তা সমৃদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং জ্ঞান যেখানেই থাকুক তা অন্বেষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। তাই আমরা দেখি যে, মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা নতুন ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুলুক সন্ধান করেছেন। মুসলিম খলিফাগণও রোমান চিকিৎসকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাদের থেকে মুসলিম চিকিৎসকেরা জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেকোনো গ্রন্থ তাদের হাতে পড়েছে, তারা তা অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছেন। এটাকে উমাইয়া খিলাফতকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা একটি দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তা এই যে, তারাই প্রথম চিকিৎসাবিদ্যায় বা চিকিৎসকদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন চক্ষু-চিকিৎসক (ophthalmologist), শল্যচিকিৎসক (surgeon), রক্তমোক্ষণ-চিকিৎসক (phlebotomist), স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ (gynecologist) ইত্যাদি। ওই যুগের মহাচিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন আবু বকর আল-রাযি, তাকে অবশ্য ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানীও গণ্য করা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার এত বেশি অবদান রয়েছে যে এই গ্রন্থ তা বর্ণনা করতে অক্ষম!

আব্বাসি খিলাফতকাল থাকতে থাকতেই মুসলিমরা চিকিৎসাবিদ্যার প্রতিটি শাখায় সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। পূর্ববর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক ভুলত্রুটি সংশোধন করেন। তারা কেবল নকল ও অনুবাদে আবদ্ধ থাকেননি, বরং গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা অব্যাহত রাখেন এবং পূর্ববর্তীদের ভ্রান্তিসমূহের সংশোধন করেন।

চক্ষুবিজ্ঞান মুসলিমদের হাতে বিকাশ ও উন্নতি লাভ করে। এই ক্ষেত্রে কেউই তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তাদের পূর্ববর্তী গ্রিকরা নয়, তাদের সামসময়িক লাতিনরা নয়, তাদের কয়েক শতাব্দী পরে যারা এসেছে তারাও নয়, কেউই তাদের স্থানে পৌছতে পারেনি। কয়েক শতাব্দীব্যাপী চক্ষুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের রচিত গ্রন্থাবলিই ছিল একমাত্র দলিল। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, অনেক লেখকই চক্ষু-চিকিৎসাকে আরবীয় চিকিৎসা বলে গণ্য করেছেন। আলি ইবনে ঈসা

আল-কাহহাল[২৮৭] গোটা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুবিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তার রচিত *'তাযকিরাতুল কাহহালিন'* (تذكرة الكحالين) চিকিৎসাবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।[২৮৮]

আমরা যখন আল-রাযি ও ইবনে ঈসার সমৃদ্ধ রচনাবলি দেখি, আমরা নিজেদেরকে আরও একজন মহাচিকিৎসাবিজ্ঞানীর সামনে আবিষ্কার করি। তাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসকদের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি হলেন আবুল কাসিম আয-যাহরাবি (মৃ. ৪০৩ হি.)। তিনি শল্যচিকিৎসার প্রাথমিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে সক্ষম হন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে স্কালপেল (scalpel)[২৮৯] ও শল্যকাঁচি (Surgical scissors)। তা ছাড়া তিনি অস্ত্রোপচারের মূলনীতি ও কায়দা-কৌশল প্রস্তুত করেন। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো রক্তক্ষরণ বন্ধে শিরা বেঁধে রাখা। তিনি অস্ত্রোপচারের সুতাও আবিষ্কার করেন। রক্তের ঘনীভবন ঘটিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার পদ্ধতি আবিষ্কারেও তিনি সক্ষম হন।

আবুল কাসিম আয-যাহরাবিই প্রথম শরীরের অভ্যন্তরদর্শন-বিজ্ঞানের (surgical endoscope) প্রবর্তন করেন। তিনি সিরিঞ্জ আবিষ্কার করেন এবং মূত্রধানী (surgical urinals) ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম সত্যিকার অর্থে পিত্তথলীর পাথর চূর্ণ করতে সক্ষম হন। কাজটি তিনি এমন এক যন্ত্রের সাহায্যে করেন যা বর্তমান যুগের দর্পণযন্ত্রের (speculum) সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। তিনিই প্রথম যোনিপথের অভ্যন্তরদর্শনযন্ত্র (vaginal speculum/vaginoscope) আবিষ্কার করেন এবং তা সফলভাবে ব্যবহার করেন। তার রচিত গ্রন্থ التصريف لمن عجز عن التأليف ইউরোপে যারা শল্যচিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছেন তাদের কাছে একটি পরিপূর্ণ চিকিৎসাবিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটা তারা নিজেরাই স্বীকার

---

২৮৭. আলি ইবনে ঈসা আল-কাহহাল : আলি ইবনে ঈসা ইবনে আলি আল-কাহহাল (৪৩০ হি./১০৩৯ খ্রি.) ছিলেন চক্ষুরোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তারা চক্ষুচিকিৎসাকে 'সানাআতুল কাহল' নামে আখ্যায়িত করতেন। *'তাযকিরাতুল কাহহালিন'* গ্রন্থটি তাকে সমধিক খ্যাতি এনে দেয়। দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল-আনবা*, খ. ২, পৃ. ২৬৩; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ৩১৮।

২৮৮. ইবনে আবি উসাইবিআ, *তাবাকাতুল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ২৬৩।

২৮৯. শল্যচিকিৎসকের ছুরিবিশেষ।

করেছেন। ইতালীয় মনীষী Gerard of Cremona[২৯০] আয-যাহরাবির এই গ্রন্থ *ALTASRIF* নামে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেছেন।
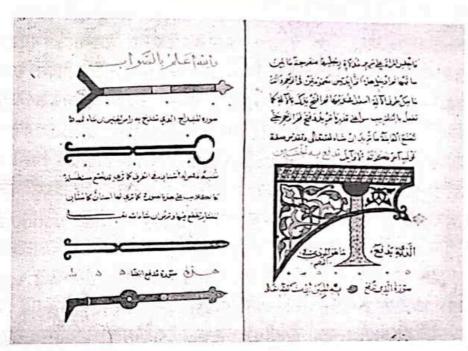
চিত্র নং-৭
'আত-তাসরিফ' গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

আয-যাহরাবি এই গ্রন্থের যে অংশে শল্যচিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্পর্কে কথা বলেছেন তা মূলত পূর্ববর্তীদের রচনাবলির প্রতিনিধিত্ব করে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শল্যচিকিৎসাবিদ্যায় এটিই ছিল শ্রেষ্ঠ দলিল। অর্থাৎ, গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পর থেকে পাঁচ শতাব্দীব্যাপী তার প্রভাব বজায় রেখেছিল। এই গ্রন্থে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির সচিত্র ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। দুইশরও বেশি যন্ত্রের সচিত্র বর্ণনা রয়েছে! আয-যাহরাবির উত্তরসূরি পশ্চিমা শল্যচিকিৎসকেরা এসব বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থেকে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ষোড়শ শতকে ইউরোপে যারা শল্যচিকিৎসাবিদ্যার সংশোধন করেছিলেন তাদের কাছে অস্ত্রোপচারের এসব যন্ত্রপাতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বিখ্যাত জার্মান শারীরবিজ্ঞানী আলব্রেখট ভন হেলার (Albrecht von Haller) যা বলেছেন তা

২৯০. Gerard of Cremona (১১১৪-১১৮৭ খ্রি.) ছিলেন ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। তিনি উত্তর ইতালির ক্রেমোনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আন্দালুসের তালিতালায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তিনি আরবি থেকে লাতিন ভাষায় মোট ৮৭টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

প্রণিধানযোগ্য, চতুর্দশ শতাব্দীর পর ইউরোপে যত শল্যচিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সবাই আয-যাহরাবির এই আলোচনা থেকে আহরণ করেছেন এবং পরিতৃপ্ত হয়েছেন।[২৯১]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ময়দানে আরও অনেক উজ্জ্বল ইসলামি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন ইবনে সিনা (মৃ. ৪২৮ হি.)। তিনি যা-কিছু আবিষ্কার করেছেন তাতেই মানবতার জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে বড় বড় আবিষ্কারের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তিনি এমন কিছু রোগ-ব্যাধির সন্ধান পেয়েছিলেন আজও যেগুলোর সংক্রমণ ঘটছে। তিনি প্রথমবারের মতো বড়শি-কৃমির (Ancylostoma duodenale) সন্ধান পান এবং এটির নাম দেন গোলাকার পোকা। এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তিনি ইতালীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী অ্যাঞ্জেলো দুবিনি (Angelo Dubini) থেকে নয়শ বছর এগিয়ে আছেন। ইবনে সিনাই প্রথম মেনিনজাইটিস রোগের কথা জানান এবং এর বৈশিষ্ট্যাবলি চিহ্নিত করেন। তিনিই প্রথম মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্ট পক্ষাঘাত এবং বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট পক্ষাঘাতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। অতিরিক্ত রক্তচাপের ফলে সৃষ্ট স্ট্রোকের লক্ষণও তিনি বর্ণনা করেন। এই ক্ষেত্রে গ্রিক চিকিৎসা-মহারথীরা যা স্থির করে নিয়েছিলেন, ইবনে সিনার বক্তব্য তার বিপরীত। শুধু তাই নয়, ইবনে সিনাই প্রথম পাকস্থলীর প্রদাহ (gastric or intestinal pain) ও কিডনির প্রদাহের (Renal colic) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন।[২৯২]

ইবনে সিনাই প্রথম ব্যক্তি যিনি কতিপয় সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ কীভাবে ঘটে তা আবিষ্কার করেন। যেমন গুটিবসন্ত (Smallpox) ও হাম (measles)। তিনি উল্লেখ করেন যে, এসব ব্যাধি পানি ও বাতাসে বিদ্যমান অতি ক্ষুদ্র জীবের (জীবাণুর) দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, পানিতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীব রয়েছে যা খালি চোখে দেখা যায় না, সেগুলো কিছু ব্যাধি সৃষ্টি করে থাকে।[২৯৩] অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর অষ্টাদশ

---

[২৯১]. গুস্তাভ লি বোঁ, *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৫৯১।

[২৯২]. আমের আন-নাজ্জার, *তারিখুত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩২-১৩৩।

[২৯৩]. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রুউওয়াদু ইলমিত তিব্ব ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৯৮।

শতাব্দীতে ভন লিউয়েন হুক ও পরবর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ইবনে সিনার বক্তব্যকেই সমর্থন ও শক্তিশালী করেন।

এ কারণেই ইবনে সিনা পরজীবী-বিজ্ঞানের (Parasitology) ভিত্তি নির্মাণকারী হিসেবে বিবেচিত হন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে পরজীবী-বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইবনে সিনা প্রাথমিক মেনিনজাইটিসকে[২৯৪] দ্বিতীয় স্তরের মেনিনজাইটিস থেকে আলাদা করে লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেন। তিনি এরূপ অন্যান্য ব্যাধিরও লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। টনসিল অপসারণের (Tonsillectomy) পদ্ধতিও তিনি বর্ণনা করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি আরও যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন তার মধ্যে রয়েছে লিভার ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারসহ কয়েক প্রকারের ক্যান্সার, লিম্ফনোডের[২৯৫] টিউমার ইত্যাদি।[২৯৬]

ইবনে সিনা ছিলেন অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক। তিনি নানা ধরনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন। যেমন প্রাথমিক স্তরের ক্যান্সার-আক্রান্ত টিউমার অপসারণ, গলা ও শ্বাসনালী চেরা, ফুসফুসের ক্রিস্টাল মেমব্রেন (স্ফটিক ঝিল্লি) থেকে ফোড়া অপসারণ ইত্যাদি।[২৯৭] তা ছাড়া তিনি বন্ধন-পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্শ্বরোগের চিকিৎসা করেছেন। একইভাবে তিনি মূত্রতন্ত্রের ফিস্টুলার (urinary fistula) অবস্থাবলির সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। পায়ুপথের ফিস্টুলার (anal fistula) চিকিৎসাপদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেন। এই চিকিৎসাপদ্ধতি এখনো মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইবনে সিনা কিডনি-পাথরেরও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন, তা অপসারণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন এবং কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা

---

২৯৪. মেনিনজাইটিস (Meningitis) বা মস্তিষ্কপর্দার প্রদাহ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণকারী পর্দা বা মেনিনজেসের প্রদাহজনিত একটি রোগ। মেনিনজাইটিস সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা অন্য পরজীবীর সংক্রমণে হয়ে থাকে।-অনুবাদক

২৯৫. লিম্ফনোড একটি ডিম্বাশয় বা কিডনি আকৃতির অঙ্গ। এটি লসিকাতন্ত্রের এবং অভিযোজিত রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার একটি অঙ্গ। লিম্ফনোডগুলো শরীরজুড়ে বিস্তৃতভাবে উপস্থিত থাকে এবং লসিকানালীর মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে সংবহনতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে। এটি বি এবং টি লিম্ফোসাইটে বেশি থাকে এবং অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকায়ও থাকে। লিম্ফনোডগুলো বাইরের কণা এবং ক্যান্সারের কোষগুলোর জন্য ফিল্টার হিসাবে কাজ করে এবং তা উইকিনিয়া রোগপ্রতিরোধক ব্যবস্থাটির সঠিক ক্রিয়াকলাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

২৯৬. আমের আন-নাজ্জার, *তারিখুত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩৩; ফাওযি তাওকান, *আল-উলুম ইনদাল আরাব*, পৃ. ১৭।

২৯৭. মুহাম্মাদ আল-হাজ কাসিম, *আত-তিব্বু ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, পৃ. ১৪৮।

জরুরি তাও বলে দেন। একইভাবে তিনি মূত্রনিষ্কাশনযন্ত্রের ব্যবহারপদ্ধতি ও কী কী অবস্থায় এটির ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[২৯৮]

ইবনে সিনা যৌনরোগবিদ্যার ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। কতিপয় স্ত্রীরোগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন যোনিপথের প্রতিবন্ধকতা (vaginal obstruction), গর্ভপাত, জরায়ুর ফাইব্রয়েড বা টিউমার (uterine fibroids) ইত্যাদি। নারীদের আক্রান্ত করতে পারে এমন কিছু রোগের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। যেমন রক্তস্রাব, জরায়ুতে রক্তধারণ (Hematometra)[২৯৯] এবং এটির কার্যকারণ হিসেবে তিনি টিউমার ও তীব্র জ্বরের[৩০০] কথা উল্লেখ করেন। তা ছাড়া তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, রোধক প্রসব[৩০১] অথবা ভ্রূণের মৃত্যুর কারণে জরায়ুর বীজদূষণ (uterus sepsis) ঘটতে পারে। ইবনে সিনার আগে এ বিষয়ে

---

২৯৮. ইবনে সিনা, *আল-কানুন*, খ. ৩, পৃ. ১৬৫।

২৯৯. Blood retention in the uterus.

৩০০. Acute fevers.

৩০১. রোধক প্রসব (Obstructed labour/labour dystocia) : রোধক প্রসব বলতে সেই পরিস্থিতিকে বোঝানো হয় যখন নবজাতক জরায়ুর স্বাভাবিক সংকোচন সত্ত্বেও যোনিপথের রুদ্ধতার কারণে ভূমিষ্ঠ হতে পারে না। ফলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পাওয়ায় শিশু মারাও যেতে পারে। এর ফলে প্রসূতি বা প্রজায়িনী মায়ের সংক্রমণ, জরায়ু বিদারণ অথবা প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়তে পারে। প্রসবজনিত ফিস্টুলার মতো দীর্ঘস্থায়ী জটিলতাও দেখা দিতে পারে। প্রসবকালীন সক্রিয় পর্যায়ের সময়সীমা ১২ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে, বিলম্বিত প্রসবের কারণে রোধক প্রসবজনিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রোধক প্রসবের জন্য বেশ কিছু কারণ দায়ী। অস্বাভাবিক বড় আকারের বাচ্চা অথবা বাচ্চার অস্বাভাবিক অবস্থান, ছোট শ্রোণিচক্র এবং যোনিপথে বিভিন্ন সমস্যা রোধক প্রসবের অন্যতম কারণ। প্রজায়িনী মায়ের প্রসবকালীন উন্নয়ন বা কোনো সমস্যা আছে কি না তা নির্ধারণে প্যাট্রোগ্রাফ ব্যবহার করা হয়। শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা গর্ভবতী মায়ের রোধক প্রসব হবে কি না তা নির্ধারণ করতে পারে। মাতৃগর্ভে সন্তান অস্বাভাবিকভাবে থাকলে প্রসবকালে তাকে প্রসূতি মায়ের পিউবিক হাড়ের নিচ দিয়ে সহজে বের করা যায় না। এ ধরনের পরিস্থিতিকে কাঁধ ডাইস্টোসিয়া (Shoulder dystocia) বলে। অপুষ্টি ও ভিটামিন ডি-এর অভাব ছোট শ্রোণিচক্রের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব কৈশোরেই সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায়, যদি বাড়ন্ত বয়সে শ্রোণিচক্রের প্রকৃত বৃদ্ধি না ঘটে। যোনিদ্বারে সমস্যার জন্যও রোধক প্রসবের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যদি যৌন অঙ্গহানি বা টিউমারের জন্য নারীর যোনি ও পেরিনিয়াম সংকীর্ণ হয়ে যায়। ২০১৫ সালে প্রায় ৬৫ লক্ষের মতো রোধক প্রসব বা জরায়ু বিদারণের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে ২৩ হাজার নারীর মাতৃমৃত্যু ঘটেছে। ১৯৯০ সালে ২৯০০০ মাতৃমৃত্যু ঘটেছে (যার আট শতাংশ গর্ভধারণজনিত কারণে ঘটেছে)। মৃত সন্তান প্রসবের জন্য অন্যতম কারণ রোধক প্রসব। উন্নয়নশীল বিশ্বে এ ধরনের পরিস্থিতি সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায়। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

কেউ কিছু জানাতে পারেননি। ভ্রূণ অবস্থাতেই স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ নির্ধারিত হয় বলে তিনি আলোকপাত করেন এবং তিনি পুরুষকেই এর জন্য (সন্তান মেয়ে হবে নাকি ছেলে) দায়ী করেন। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়টিকেই জোরালোভাবে সাব্যস্ত করেছে।[৩০২]

উপরে যা-কিছু উল্লেখ করা হলো তা তো বটেই, এ ছাড়াও ইবনে সিনা ছিলেন দন্তচিকিৎসা বিষয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। তিনি দন্তক্ষয়ের (dental caries) চিকিৎসার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, দাঁতের ক্ষয়রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্য হলো ক্ষয়রোধ করা এবং যাতে তা আর না বাড়ে সেই ব্যবস্থা নেওয়া। দাঁতের নষ্ট অংশটুকু ফেলে দিয়ে তা করতে হবে এবং পরিপূরক বস্তু দিয়ে জায়গাটি ভরাট করে দিতে হবে। দাঁতের চিকিৎসার মৌলিক নীতি হলো দাঁতের সুরক্ষা এবং তা করতে হলে দাঁতের ক্ষয়যুক্ত অংশটুকু উঠিয়ে ফেলে দিয়ে তা উপযুক্ত বস্তু দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। এতে দাঁতের যে অংশটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে দাঁত নতুনভাবে তার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।[৩০৩]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম প্রতিভাদের এগুলো কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নয়, বরং এমন শত শত মনীষীর দ্বারা ইসলামি সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে, শত শত পথিকৃতের কাছে গোটা মানবতা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী শিষ্যত্ব বরণ করেছে।

---

[৩০২]. ইবনে সিনা, *আল-কানুন*, খ. ২, পৃ. ৫৮৬।
[৩০৩]. ইবনে সিনা, *আল-কানুন*, খ. ১, পৃ. ১৯২।
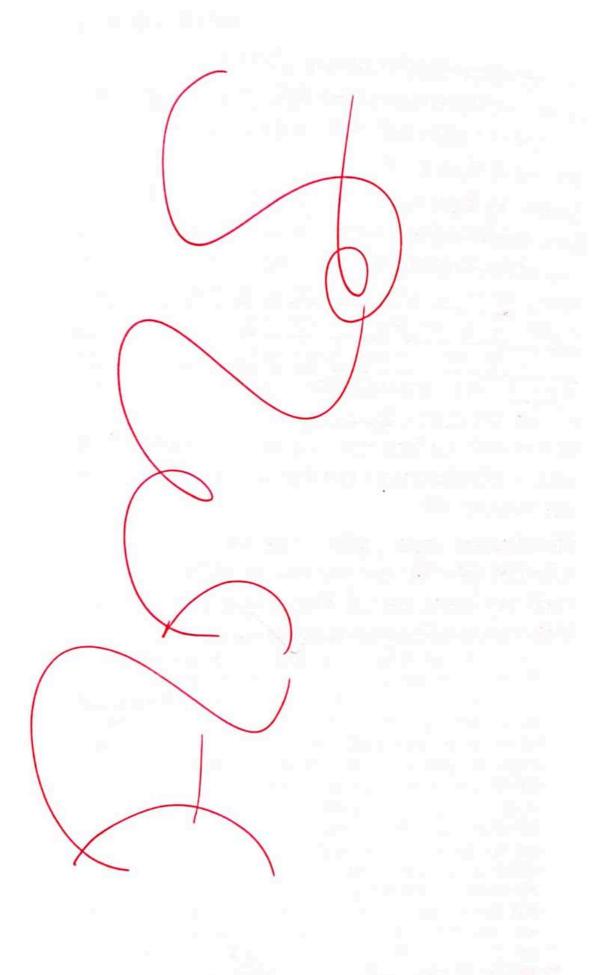
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পদার্থবিজ্ঞান

বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারের ওপর ভিত্তি করেই জ্ঞানবিজ্ঞানের সব শাখার উন্নতি ও বিকাশ ঘটে, তেমনই মুসলিমদের পদার্থবিজ্ঞানচর্চাও শুরুর দিকে গ্রিক রচনারাশির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এসব রচনায় গ্রিক বিজ্ঞানীরা কেবল দর্শনের ওপর নির্ভরশীল থেকেছেন, দর্শনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় পরীক্ষানিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা ছিল না। মুসলিম বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে এই মৌলিক বিষয়টির বিকাশ ঘটিয়েছেন। তারা পদার্থবিজ্ঞানের ময়দানে অভূতপূর্ব যোগ্যতা ও মেধা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেন তারা বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। কারণ মুসলিম বিজ্ঞানীরাই পদার্থবিজ্ঞানের ভিত পরীক্ষানিরীক্ষা ও এক্সপেরিমেন্টের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারা শুধু দর্শন ও চিন্তাভাবনার ওপর নির্ভরশীল হননি।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা নতুন থিউরি ও সূত্র প্রদান করেছেন এবং উদ্ভাবনমূলক গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন। যেমন গতিসূত্র (laws of motion), জলসূত্র (water resources law), মহাকর্ষ নিয়ম (law of universal gravitation)। তা ছাড়া তারা খনিজ পদার্থ ও তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর (specific weight) নিয়ে গবেষণা করেছেন। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। এটিকে বর্তমান যুগে বাস্তবধর্মী আধুনিক উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কঠিন কাজ মনে করা হয়!

মুসলিম বিজ্ঞানীরা শুরুতে পূর্বসূরিদের গ্রন্থাবলির ওপর নির্ভর করেছেন। যেমন : ১. অ্যারিস্টটল কর্তৃক রচিত كتاب الطبيعة[৩০৪], এই গ্রন্থে তিনি গতিসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। ২. আর্কিমিডিসের রচনাবলি, এসব রচনায় পানিতে ভাসমান বস্তু, কতিপয় পদার্থের নির্দিষ্ট ভর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। ৩. তিসিবিওসের গ্রন্থাবলি, এসব গ্রন্থে পাম্প ও

---

৩০৪. মূল গ্রিক থেকে আরবিতে অনুবাদ করেছেন ইসহাক ইবনে হুনাইন।

জলঘড়ির সূত্রাবলি রয়েছে। ৪. হেরন অব আলেকজান্দ্রিয়ার[৩০৫] গ্রন্থাবলি, যেখানে উত্তোলনযন্ত্র, চাকা ও কাজের সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৩০৬]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা অব্যাহতভাবে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের পদার্থবৈজ্ঞানিক থিউরি ও সূত্রাবলির উন্নতি সাধন করেন, তারা এগুলোকে চিন্তাধারার পর্যায় থেকে প্রায়োগিক পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরে নিয়ে আসেন। মূলত পরীক্ষানিরীক্ষাই পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা শব্দবিজ্ঞান, শব্দের সৃষ্টি ও স্থানান্তর নিয়ে গবেষণা করেন। তারাই প্রথম জানতে পারেন যে শব্দ-সৃষ্টিকারী বস্তুর কম্পন থেকে শব্দের (শব্দতরঙ্গের) সৃষ্টি হয় এবং গোলকাকৃতিতে ছড়িয়ে পড়া তরঙ্গরূপে বাতাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তারাই প্রথম শব্দকে কয়েক প্রকারে ভাগ করেন। বিভিন্ন প্রাণীর স্বর বা আওয়াজ কেন ভিন্ন হয় তারও কারণ বের করেন। গলার দীর্ঘতা, কণ্ঠনালির প্রশস্ততা ও স্বরযন্ত্রের গঠন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে স্বর বা আওয়াজেরও ভিন্নতা ঘটে। মুসলিম বিজ্ঞানীরাই প্রথম প্রতিধ্বনির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেন। তারা বলেন, তরঙ্গিত বায়ু (শব্দতরঙ্গ) উঁচু কোনো প্রতিবন্ধকের, যেমন পাহাড় বা দেয়ালের সঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উলটে গেলে (ফিরে এলে) প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। (প্রতিবন্ধক বস্তুর) নৈকট্যের কারণে প্রতিধ্বনির শ্রুতি-অনুভূতি নাও হতে পারে, শব্দের ও তার উলটে যাওয়ার সময়ের ব্যবধানের কারণেও প্রতিধ্বনির শ্রুতি-অনুভূতি হয় না।[৩০৭]

তরল পদার্থ-সম্পর্কিত বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায়, মুসলিম বিজ্ঞানীরা তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর পরিমাপের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণামূলক রচনাবলি লিখেছেন। তারা খনিজ পদার্থ উত্তোলনের বেশ কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, কিছু উপাদানের ঘনত্ব নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন। তাদের হিসাব ও পরিমাপ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বর্তমান সময়ে যে পরিমাপ রয়েছে তার অনুরূপ অথবা কিছুটা ভিন্ন।[৩০৮]

---

৩০৫. হেরন আলেকজান্দ্রিয়া : একজন গ্রিক মিশরীয় গণিতবিদ, প্রকৌশলী।

৩০৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ১১৫।

৩০৭. রিহাব খিদির আকাবি, *মাওসুআতুল আবাকিরাতুল ইসলাম*, খ. ৪, পৃ. ৫৭।

৩০৮. *আল-মওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যা*, http://www.alargam.com/general/arabsince/7.htm

মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা পদার্থবিজ্ঞানে সুনাম কুড়িয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন আবু রাইহান আল-বিরুনি। তিনি আঠারো প্রকারের বহুমূল্য পাথরের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) নিরূপণ করেন। তিনি এই সূত্র প্রদান করেন যে, বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব, তা যতটুকু পানি সরিয়ে দেয় তার আয়তনের সঙ্গে সমানুপাতিক।[৩০৯] আল-বিরুনি সংযোগযুক্ত পাত্রের (Communicating vessels) সূত্র থেকে প্রাকৃতিক ঝরনা এবং আর্তেজীয় কূপ (Artesian aquifer) থেকে পানি-প্রবাহের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেন।[৩১০]

আল-খাযিনি[৩১১] পদার্থবিজ্ঞানের ময়দানে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছেন। তিনি বিশেষ করে গতিবিদ্যা (Dynamics) ও জলস্থিতিবিদ্যায় (hydrostatics/তরল পদার্থের স্থিতিবিজ্ঞান) বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। যা তার পরবর্তী গবেষকদের হতবাক করে দিয়েছে। গতিবিদ্যার ময়দানে বর্তমান সময়েও তার থিউরিগুলো বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এসব থিউরির মধ্যে অন্যতম হলো স্লোপ (Slope/gradient)[৩১২] থিউরি ও ইমপাল্স (Impulse/physics) থিউরি। এই দুটি থিউরি গতিবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনেক ঐতিহাসিক আল-খাযিনিকে সকল যুগের পদার্থবিজ্ঞানের গুরু বলে গণ্য করেছেন। আল-খাযিনি তার অধিকাংশ সময় স্থির তরল পদার্থ

---

৩০৯. আপেক্ষিক গুরুত্ব : আপেক্ষিক গুরুত্ব কোনো বস্তুর ঘনত্ব এবং অন্য একটি প্রসঙ্গ-বস্তুর ঘনত্বের অনুপাত অথবা কোনো বস্তুর ভর এবং একই আয়তনের অন্য একটি প্রসঙ্গ-বস্তুর ভরের অনুপাতকে বোঝায়। আপাত আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে কোনো বস্তুর ওজন এবং সমান আয়তনের অন্য একটি প্রসঙ্গ-বস্তুর ওজনের অনুপাত। তরল পদার্থের ক্ষেত্রে প্রায় সবসময় প্রসঙ্গ-বস্তু হিসেবে সবচেয়ে ভারী অবস্থার পানি (৪° সে. অথবা ৩৯.২° ফা.) এবং গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কক্ষ তাপমাত্রার বাতাস নেওয়া হয় (২০° সে. অথবা ৬৮° ফা.)। দুটি উপাদানের জন্যই তাপমাত্রা ও চাপ নির্দিষ্ট থাকতে হবে।

৩১০. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১৮৬; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৩৩।

৩১১. আল-খাযিনি : আবুল ফাত্হ আবদুর রহমান আল-খাযিন অথবা আল-খাযিনি। জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী। সেলজুক সুলতান আহমাদ সানজার (১০৮৫-১১৫৭ খ্রি.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যে জ্যোতিষ্কসারণি (Ephemeris) তৈরি করেছিলেন তা গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যায় এক মহান কীর্তি। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ الزيج السنجري، رسالة الفعلات، ميزان الحكمة। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩০৫।

৩১২. স্লোপ : ভূপৃষ্ঠ বা অন্য কোনো সমতলপৃষ্ঠ বরাবর ৯০° ডিগ্রি অপেক্ষা কম কৌণিক অবস্থান বা দিক; ঢাল।-অনুবাদক।

বিষয়ে গবেষণা করে কাটিয়েছেন। তিনি তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর জানার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। কোনো কঠিন বস্তুকে তরল পদার্থে নিমজ্জিত করা হলে তা তার নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কতটুকু তরলকে সরিয়ে দেবে তা নিয়ে তিনি তার গবেষণায় আলোচনা করেছেন। আল-খাযিনির মহান শিক্ষক আবু রাইহান আল-বিরুনি কতিপয় কঠিন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, তিনিও ওই একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আল-খাযিনি আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপে নির্ভুলতার বা যথার্থতার একটি বড় পর্যায়ে পৌঁছেছেন, যা তার সামসময়িক বিজ্ঞানীদের ও তাদের অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[৩১৩]

আমেরিকান পদার্থবিদ রবার্ট এন. হল বিজ্ঞানী চরিতাভিধানে আল-খাযিনি সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে কঠিন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব আবিষ্কারে আল-খাযিনির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যে বাতাসে ও পানিতে বস্তুর ভর নিরূপণের স্কেল আবিষ্কার করেছিলেন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটির পাঁচটি পাল্লা ছিল, যার একটি পর্যায়ক্রমিক বাহুর ওপর চলমান থাকত। হামিদ মুরানি ও আবদুল হালিম মুনতাসির উভয়ে তাদের রচিত গ্রন্থ قراءات في تاريخ العلوم عند العرب-এ বলেছেন, ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ টরিসেলি (Evangelista Torricelli)-এর বহু পূর্বেই আল-খাযিনি বায়ুর উপাদান ও ওজন নির্দেশ করেছেন। তিনি নির্দেশ করেছিলেন যে, বায়ুরও তরল পদার্থের মতো ওজন ও ঊর্ধ্বমুখী চাপ রয়েছে। বায়ুপূর্ণ স্থানে বস্তুর ভর তার প্রকৃত ভরের চেয়ে কম, প্রকৃত ভরের চেয়ে কতটুকু কম তা নির্ভর করে বায়ুর ঘনত্বের ওপর। আল-খাযিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, আর্কিমিডিসের সূত্র কেবল তরল পদার্থের ক্ষেত্রে নয়, বরং তা গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ধরনের গবেষণাই ব্যারোমিটার[৩১৪], শোষকল (air vacuums)[৩১৫] ও পাম্প আবিষ্কারের পথ সহজ করে দিয়েছিল। পদার্থবিজ্ঞানে এসব অবদান

---

৩১৩. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমুল বাহতাতি ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যা ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৩১।

৩১৪. আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আবহমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্রবিশেষ; আবহমানযন্ত্র।

৩১৫. যে যন্ত্র ধূলি-ময়লা ইত্যাদি শুষে নেয়।

রাখার কারণেই আল-খাযিনি টরিসেলি, ব্লেইজ প্যাসকেল, রবার্ট বয়েল[৩১৬] ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর অগ্রগামী মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় গতিসূত্রাবলিও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব সূত্র আবিষ্কারে মুসলিম বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করছি।

গতিসূত্র

গতিসূত্রসমূহ এতটাই গুরুত্ব রাখে যে তা আধুনিক সভ্যতার মেরুদণ্ড হিসেবে গণ্য হয়। বর্তমান যুগের প্রতিটি চলমান যন্ত্র–গাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে স্পেস মিসাইল, ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল, বরং সব গতিশীল যন্ত্রের কার্যপ্রণালি গতিসূত্রের ওপর নির্ভরশীল। গতিসূত্রসমূহের ওপর ভিত্তি করেই মানুষ মহাশূন্যে অভিযান পরিচালনা করেছে এবং চাঁদের পৃষ্ঠে নামতে পেরেছে। তা ছাড়া গতিসূত্রাবলি গতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল পদার্থবিজ্ঞানের সব শাখার মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। আলোকবিজ্ঞান মানে আলোর সঞ্চরমান তরঙ্গ, স্বর বা আওয়াজ মানে প্রবহমান শব্দতরঙ্গ, বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি হলো ইলেকট্রনের তরঙ্গ ইত্যাদি।

পশ্চিমে ও প্রাচ্যে সকল মানুষের কাছে এটাই কিংবদন্তি যে, গতিসূত্রসমূহের আবিষ্কারক হলেন ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন। তার ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা (লাতিন ভাষায় *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, ইংরেজি ভাষায় *Mathematical Principles of Natural Philosophy*) গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকেই এই কিংবদন্তির সূচনা হয়।

এটিই গোটা বিশ্বে সুবিদিত সত্যে পরিণত হয়। বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলিতেও এ তথ্য ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমদের বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ও বাদ যায় না। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত এই কিংবদন্তিই চালু ছিল। এই সময় সামসময়িক কতিপয় মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানী বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন

---

৩১৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমুল বাহতাতি ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যা ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৩১।

পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নাজিফ, যন্ত্র-প্রকৌশলের অধ্যাপক ড. জালাল শাওকি, গণিতের অধ্যাপক ড. আলি আবদুল্লাহ দাফফা প্রমুখ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামি পাণ্ডুলিপিসমূহে যা-কিছু ছিল তা তারা পর্যাপ্ত অধ্যয়ন করেন। তারা আবিষ্কার করেন যে গতিসূত্রাবলি আবিষ্কারের প্রকৃত কৃতিত্ব মুসলিম বিজ্ঞানীদেরই। এই ক্ষেত্রে নিউটনের ভূমিকা ও কৃতিত্ব এই যে, তিনি এসব নিয়মের উপাদান সংগ্রহ করেন, সেগুলোকে সূত্রাবদ্ধ করেন এবং গাণিতিক কাঠামোতে সংজ্ঞায়িত করেন।

আবেগ ও তাত্ত্বিক বক্তৃতা বাদ দিয়ে বলা যায়, গতিসূত্রের ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। তাদের পাণ্ডুলিপিতে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য বক্তব্য রয়েছে যা এই সত্যকে প্রতিভাত করে। এসব পাণ্ডুলিপি তারা রচনা করেছেন নিউটনের আবির্ভাবের সাতশ বছর আগে। ওইসব অকাট্য বক্তব্যের আলোকেই আমরা উপর্যুক্ত সত্যের মীমাংসা করব।

প্রথম গতিসূত্র

পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম গতিসূত্রটি বোঝায় যে, কোনো (স্থির) বস্তুর ওপর আঘাতকারী বলের (শক্তির) গোটা পরিমাণ যদি শূন্য হয় তাহলে ওই বস্তু স্থিরই থাকবে। অর্থাৎ, কোনো ধরনের আঘাতকারী বল না থাকা অবস্থায় গতিশীল বস্তু সমবেগে (সরলরেখায়) গতিশীলই থাকবে। যেমন ঘর্ষণশক্তি (friction forces)। নিউটন গাণিতিক কাঠামোতে নিয়মটি সূত্রাবদ্ধ করেছেন এভাবে, বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সুষম গতিতে সরল পথে চলতে থাকবে।[৩১৭]

এখন প্রথম গতিসূত্রের ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের ভূমিকা কী সেই প্রসঙ্গে আসি। মহান মনীষী ইবনে সিনা তার *আল-ইশারাত ওয়াত তানবিহাত* গ্রন্থে বলেছেন, তোমরা অবশ্য জানো যে, বস্তুকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিলে, তার ওপর বাইরে থেকে কোনো বল (শক্তি) প্রয়োগ করা না হলে, তা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট অবস্থাতেই থাকবে। কারণ, বস্তুর প্রকৃতির মধ্যেই গতি বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ধর্ম বিদ্যমান। বস্তুর সংরোধ

৩১৭. First law : In an inertial frame of reference, an object either remains at rest or continues to move at a constant velocity, unless acted upon by a force.

(Impedance) এ কারণে নয় যে তা বস্তু, বরং এই অর্থে যে তা তার নিজের অবস্থায় অপরিবর্তনশীল থাকতে চায়।[৩১৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, প্রথম গতিসূত্র সম্পর্কে ইবনে সিনা যা বলেছেন তা আইজ্যাক নিউটন যা বলেছেন তার থেকে অনন্য, যদিও নিউটন ইবনে সিনার ছয়শ বছর পরে এসেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বস্তু স্থির অবস্থায় থাকবে অথবা সুষম গতিতে সরলরেখায় চলমান থাকবে, যতক্ষণ বাহ্যিক কোনো বল (শক্তি) এই অবস্থার পরিবর্তনে বস্তুকে বাধ্য না করবে। অর্থাৎ, ইবনে সিনাই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম গতিসূত্র আবিষ্কার করেছেন!

দ্বিতীয় গতিসূত্র

এই নিয়ম বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল ও বস্তুর গতির ওপর প্রযুক্ত বলের প্রভাবকে বোঝায়। যখনই কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা হবে তা ওই বস্তুর গতির পরিবর্তন ঘটাবে। হয় গতি বাড়াবে, না হয় কমাবে, অন্তত গতি দিক পরিবর্তন করবে। এটি ত্বরণ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় নিয়মটিকে এভাবে লেখা যেতে পারে, বল = ভর × ত্বরণ। কোনো বস্তুর ত্বরণ সেই বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতিক ও বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর বেগের পরিবর্তন সেদিকেই ঘটে।

নিউটন গাণিতিক আকারে উপর্যুক্ত নিয়মটিকে সূত্রাবদ্ধ করেছেন এভাবে, বস্তুর গতির পরিবর্তনের জন্য প্রযুক্ত বল ওই বস্তুর ভর ও ত্বরণের সঙ্গে সমানুপাতিক। তাই ওই বলকে পরিমাপ করা হয় এভাবে, বল = ভরের সঙ্গে ত্বরণের গুণফল। অর্থাৎ, বস্তুর ওপর বলের প্রয়োগ (ক্রিয়া বা ঝোঁক) যেদিকে ঘটে ওই বস্তুর ত্বরণ বা গতিবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কী বলেছেন সে কথায় আসি। উদাহরণত, হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি (৪৮০-৫৬০ হি./১০৮৭-১১৬৪ খ্রি.) কী বলেছেন তা লক্ষ করুন। তিনি তার *আল-মুতাবার ফিল-হিকমা* কিতাবে বলেছেন, বস্তুর গতিবেগের প্রতিটি পরিবর্তন ঘটে অবশ্যই একটি সময়খণ্ডে, তীব্রতর বল বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন ঘটায় তীব্রভাবে এবং সংকুচিত সময়ে। বল যত তীব্র হবে বস্তুর গতিও (ত্বরণও) তত তীব্র হবে

---

৩১৮. দেখুন, *আল-ইশারাত ওয়াত তানবিহাত*, সম্পাদনা, সুলাইমান দিনা, *দারুল মাআরিফ*, মিশর, পৃ. ২৮৩-২৮৪।-অনুবাদক।

এবং সময় হবে সংকুচিত। বলের তীব্রতা না কমলে ত্বরণের তীব্রতাও কমবে না (ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে)। তখন বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন ঘটবে তীব্র সময়হীনতায়। কারণ গতির পরিবর্তন বা ত্বরণের ক্ষেত্রে সময়ের সংকোচন যারপরনাই হতে পারে। হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকার গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ের নাম 'শূন্যস্থান'। এই অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, বলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বরণও বৃদ্ধি পায়। তাই বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল যত বাড়বে গতিশীল বস্তুর ত্বরণও তত বাড়বে এবং সুনির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমণের ফলে সময় সংকুচিত হয়ে পড়বে। আইজ্যাক নিউটন এই বক্তব্যকেই তার গাণিতিক কাঠামোতে সাজিয়েছেন এবং তার নাম দিয়েছেন গতির দ্বিতীয় সূত্র!

তৃতীয় গতিসূত্র

এই সূত্র বোঝায় যে, যদি দুটি কণা (বস্তু) মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া করে, তাহলে প্রথম কণাটি দ্বিতীয় কণার ওপর যে বলের দ্বারা ক্রিয়া করবে তাকে ক্রিয়া (Action Force) বলে এবং তা পরম মানের (absolute value) সমান এবং বিপরীত দিকে দ্বিতীয় কণা প্রথম কণার ওপর যে বলের দ্বারা ক্রিয়া করবে তাকে প্রতিক্রিয়া (Reaction Force) বলে। নিউটন এই নিয়মকে তার গাণিতিক কাঠামোতে সূত্রাবদ্ধ করেছেন এভাবে, সকল ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

নিউটনের কয়েক শতাব্দী পূর্বে আবুল বারাকাত হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা তার *আল-মুতাবার ফিল-হিকমা* গ্রন্থে যা বলেছেন, একটি গোলাকার রিং ধরে দুইজন প্রতিযোগী দুইপাশ থেকে টানছে, অর্থাৎ, দুইজন প্রতিযোগীর মধ্যে টানাটানিযুক্ত রিং রয়েছে। এখানে প্রত্যেক প্রতিযোগীর রিং টানার ক্ষেত্রে অপর প্রতিযোগীর শক্তির প্রতিরোধমূলক শক্তি রয়েছে। টানাটানিতে একজন প্রতিযোগী বিজয়ী হলে এবং রিংটিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারলে তার অর্থ এটা দাঁড়ায় না যে, রিংটি অপর প্রতিযোগীর টানশক্তি থেকে মুক্ত। বরং ওই শক্তি পরাজিতরূপে বিদ্যমান। ওই শক্তি যদি না-ই থাকত তাহলে বিজয়ী প্রতিযোগীর রিং টানার প্রয়োজনই পড়ত না।

ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাযির রচনাবলিতেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি তার *আল-মাবাহিসুল মাশরিকিয়্যা ফি ইলমিল ইলাহিয়্যাতি ওয়াত তাবিইয়্যাত* গ্রন্থে বলেছেন, যে রিংটিকে দুইজন সমান শক্তিশালী

প্রতিযোগী নিজের দিকে টানে তা মধ্যবর্তী স্থানে স্থির থাকে। কোনো সন্দেহ নেই যে, রিংয়ের ওপর প্রত্যেক প্রতিযোগী অপর প্রতিযোগীর বিপরীতমুখী বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তাকে অকেজো করে দিচ্ছে।

বরং হাসান ইবনুল হাইসামেরও এই ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। তিনি তার *'আল-মানাযির'* গ্রন্থের চতুর্থ মাকালার (প্রবন্ধের) তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন, যদি গতিশীল বস্তু বাহ্যিক প্রতিবন্ধক দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাধাগ্রস্ত হওয়ার সময়ে তার চালক-বল (Driving Force) তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তা যেখান থেকে গতিশীল হয়েছিল সেদিকেই ফিরে আসবে। ফিরে আসার ক্ষেত্রে বস্তুটির ভরবেগ (Momentum) তার প্রথমবারের চালক-বল ও প্রতিবন্ধক বল অনুসারে কাজ করবে।

সুতরাং, কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা এসব উদ্ধৃতিতে যা বলেছেন তা-ই তৃতীয় গতিসূত্রের মূল ভিত্তি। নিউটন সূত্রটির এসব উপাদান আয়ত্ত করে তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন মাত্র।

মহাকর্ষ সূত্র

পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব (থিউরি) অর্থাৎ গতিসূত্রসমূহ আবিষ্কারে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা ও অর্জনের কথা উল্লেখ করা হলো। এগুলোর পাশাপাশি পদার্থবিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আরও সব চমৎকার আবিষ্কার রয়েছে, যেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব আবিষ্কার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরবর্তীকালের অন্য বিজ্ঞানীদের নামে চালু রয়েছে...। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মহাকর্ষ সূত্র। মহাকর্ষ সূত্রের গুরুত্ব এখানে নিহিত যে, এটি মহাজাগতিক বস্তুরাশি (তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ)-কে একটি বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে এবং মহাকর্ষ বলের ফলেই সেগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে সংগতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলমান রয়েছে। মহাকর্ষ আবিষ্কারের ফলেই বিজ্ঞানীরা বস্তু কেন জমিনের দিকে পতিত হয় তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ যে সূর্যের চারপাশে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান রয়েছে তাও যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ, ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সূর্য ও গ্রহগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণই সূর্যকেন্দ্রিক ঘূর্ণনের কারণ।

প্রাচ্যে ও পশ্চিমে সাধারণ মানুষের কাছে এ কথা প্রচলিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এটা পড়েও থাকে যে, মহাকর্ষ

সূত্রের আবিষ্কারক হলেন আইজ্যাক নিউটন। তিনি একদিন একটি আপেল গাছের নিচে বসে ছিলেন। তখন একটি আপেল তার গায়ের ওপর পড়ল। তখনই তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন আপেলটি কেন জমিনের দিকে পড়ল, কেন অন্যদিকে পড়ল না। এভাবে তিনি মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন এবং তার ফর্মুলা প্রস্তুত করেন। (মহাকর্ষের একটি বিশেষ উদাহরণ হলো মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ।) এই সূত্রের মূলকথা এই যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং বস্তুর ভর ও দূরত্ব অনুযায়ী আকর্ষণ-বলে তারতম্য হয়ে থাকে।

কিন্তু এটাই কি সত্য? এটাই কি বাস্তবিক? বরং বিজ্ঞানের ক্রমসমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে দৃঢ়ভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নিউটনের পক্ষে তার বিখ্যাত মহাকর্ষসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হতো না—যেমনটা গতিসূত্র তিনটির ক্ষেত্রে হয়েছে—যদি না তিনি পূর্ববর্তী মহান বিজ্ঞানীদের কাঁধে ভর করতেন এবং দীর্ঘ সময়যাত্রা তাকে সহায়তা না করত। কারণ, এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না যে, পূর্ববর্তী মানুষেরা যেমন বস্তুর উপর থেকে নিচ দিকে পতন পর্যবেক্ষণ করেছেন তেমনই নিউটনও গাছ থেকে আপেলের পতন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারপর তিনি বিদ্যমান তত্ত্বগুলো কাজে লাগিয়ে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা তার *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি* গ্রন্থে এ বিষয়ে যে আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বস্তুর বাধাহীন পতনের ব্যাখ্যায় তাত্ত্বিক প্রসার চালিয়েছিলেন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা এদিকে ইঙ্গিত করার পর বলেছেন, মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের সত্যধর্মের পথপ্রদর্শনের কল্যাণে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে বিশুদ্ধ জ্ঞানগত পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাই তারা যেসব তত্ত্বের সত্যাসত্য বা শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করা যায় সেগুলোর দার্শনিক প্রমাণাদি একেবারেই গ্রহণ করেননি। তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মহাজাগতিক বস্তুরাশির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কতটা যথার্থ তা নিরূপিত হবে এসব বস্তুর আচরণের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের উন্মোচন কতটা ঘটেছে তার ওপর ভিত্তি করে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে মুসলিম বিজ্ঞানীরাই প্রথমবারের মতো

অভিকর্ষের প্রভাবে বস্তুর অবাধ পতনের ব্যাখ্যার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ভিত্তি দাঁড় করিয়েছিলেন।[৩১৯]

আল-হামদানি তার الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء গ্রন্থে একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন। তিনি ভূমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যে জলরাশি ও বায়ু রয়েছে তার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, যারা পৃথিবীর নিচে (পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে) রয়েছে তারাও পৃথিবীর উপরে (এ পৃষ্ঠে) যারা রয়েছে তাদের মতো স্থির (ছিটকে যাচ্ছে না)। পৃথিবীর নিচের পৃষ্ঠে তাদের পতন ও স্থিরতা তাদের পৃথিবীর এ পৃষ্ঠে পতন এবং স্থিরতার মতোই, পৃথিবী যেন একটি ম্যাগনেটিক পাথর, তার শক্তি যেমন তার চারপাশের লোহাকে নিজ দিকে টানছে তেমনই পৃথিবীও তার চারপাশের সবকিছুকে নিজ দিকে টানছে...।[৩২০]

এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আল-হামদানি প্রথমবারের মতো পদার্থবিজ্ঞানে মহাকর্ষসূত্রের আংশিক সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটা বিভব শক্তি বা পটেনশিয়াল এনার্জি (طاقة الموضع أو طاقة الكمون) নামে পরিচিত। যেমনটা ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা বলেছেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে বস্তুর উচ্চতার ফলে বিভব শক্তির সৃষ্টি হয়।[৩২১] যদিও তিনি তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেননি

---

৩১৯. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৯০।

৩২০. হাসান ইবনে আহমাদ আল-হামদানি, الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা। উদ্ধৃতি, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৯০।-অনুবাদক

৩২১. বিভব শক্তির পরিমাণ ভূপৃষ্ঠ থেকে বস্তুর উচ্চতার ওপর নির্ভর করে। উচ্চতা যত বেশি, বিভব শক্তি তত বেশি। একইভাবে বস্তুর ভরের ওপরও নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ২ কেজি ভরের বস্তুকে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে যদি ভূমি থেকে ৫ মিটার উচ্চতায় তোলা হয় তবে বস্তুটিকে ওই উচ্চতায় ওঠানোর ফলে ৯৮ জুল পরিমাণ বিভব শক্তি জমা হবে। যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

সম্পাদিত কাজ=বল×সরণ=ভর×ত্বরণ×সরণ; অভিকর্ষজ ত্বরণ=৯.৮ মিটার/বর্গসেকেন্ড; ভর=২ কেজি; সরণ=৫ মিটার; সুতরাং, সম্পাদিত কাজ =২×৫×৯.৮=৯৮ জুল।

অর্থাৎ, বস্তুটিতে ৯৮ জুল পরিমাণ বিভব শক্তি জমা হবে। এখন বস্তুটিকে অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হলে এর বিভব শক্তি ভূমিস্পর্শের আগেই অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকবে। বিভব শক্তি গতিশক্তি, আলো, তাপ, শব্দ, তড়িৎ ইত্যাদি শক্তিতে রূপান্তরযোগ্য। জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে পানির বিভব শক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। গতিশক্তির সাহায্যে টারবাইনে ঘূর্ণন গতিশক্তির সৃষ্টি করা হয় এবং তা থেকে ডায়নামোর সাহায্যে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

যে, বস্তুরাশি পরস্পরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তারপরও আল-হামদানির বক্তব্যই নিউটনের মহাকর্ষসূত্রের সামগ্রিক মৌল ভিত্তি।
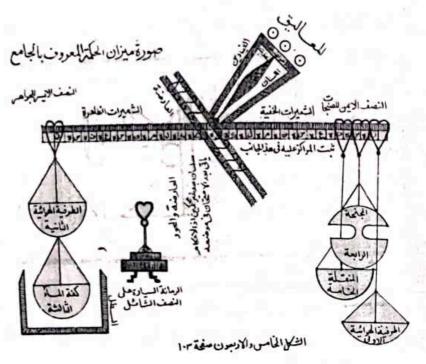
চিত্র নং-৮
'মিযানুল হিকমা'

আল-হামদানির পর এলেন আবু রাইহান আল-বিরুনি (৯৭৩-১০৫০ খ্রি.) এবং তিনি আল-হামদানির বক্তব্যকেই জোরালোভাবে সমর্থন করলেন যে, পৃথিবী তার উপরে যা-কিছু রয়েছে তার সবকিছুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। আবু রাইহান আল-বিরুনি তার القانون المسعودي গ্রন্থে এসব কথা বলেছেন। আল-খাযিনি তার *'মিযানুল হিকমা'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বস্তু তার নিজের শক্তিবলে অনবরত পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। একইভাবে আল-রাযিও বিশ্বনিখিলে উপস্থিত সকল বস্তুর আকর্ষণবলের বিষয়টি কাঠামোগতভাবেই চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

তারপর আরও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি অ্যারিস্টটল যে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিলেন তা সংশোধন করতে সক্ষম হলেন। অ্যারিস্টটল সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, ভারী বস্তু হালকা বস্তুর চেয়ে দ্রুত পতিত হয়। কিন্তু তার এ সিদ্ধান্তটি ছিল ভুল। যদিও পরবর্তীকালে গ্যালিলিও এই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণ করেছিলেন

যে, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাববলয়ে অবাধ[৩২২] পতনশীল বস্তুর ত্বরণ তার ভরের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল নয়।[৩২৩] অর্থাৎ, যখন বস্তুর পতন যেকোনো বাহ্যিক বাধা থেকে মুক্ত থাকবে। (বাধামুক্ত অবস্থায় সব বস্তুই মাধ্যাকর্ষণের ফলে একইসঙ্গে ভূমিতে পতিত হবে।) হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা *আল-মুতাবার ফিল-হিকমা* গ্রন্থে তার নিজের ভাষায় এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি শূন্যস্থানে (বায়ুহীন স্থানে) বস্তুর পতন ঘটে তাহলে ভারী ও হালকা বস্তুর পতন, বড় ও ছোট বস্তুর পতন, মোচাকৃতি বস্তুর চৌকো মাথায় পতন ও প্রশস্ত মাথায় পতন একইভাবে (একই সময়ে) ঘটবে। (এগুলোর ত্বরণে কোনো পার্থক্য ঘটবে না।) (বায়ুর বা জলের) বাধাযুক্ত স্থানে এসব বস্তুর পতনে তারতম্য ঘটে, কারণ বিদ্যমান প্রতিবন্ধকের বাধা পেরিয়ে এগুলোর পতন ঘটে। যেমন পানি, বায়ু বা অন্যকিছু বাধা তৈরি করে।[৩২৪] (ভারী বস্তু যত দ্রুত বাধা পেরোতে পারে, হালকা বস্তু তা পারে না।)

অন্যদিকে, হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি নিক্ষিপ্ত বস্তুর পতন নিয়ে গবেষণা করে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। অর্থাৎ, (উপর দিকে নিক্ষিপ্ত) বস্তুরাশির উর্ধ্বগমন মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত কাজ করে অথবা যে বলের দ্বারা বস্তুকে উপর দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে বিপরীতমুখী ক্রিয়া করেছে। তিনি বলছেন, ...নিক্ষিপ্ত পাথরের মধ্যে যে আকর্ষণ রয়েছে তা নিক্ষেপকারী আকর্ষণের বিপরীত আকর্ষণ, তবে তা নিক্ষেপকারীর (প্রযুক্ত) বলের দ্বারা পরাভূত। বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল দুর্বল হয়ে পড়ে বস্তুর (ভূমির প্রতি) আকর্ষণ ও পারিপার্শ্বিক বাধার কারণে...। তাই প্রযুক্ত বল শুরুতে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আর্কষণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী থাকে, কিন্তু তা একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ে, স্থির হয়ে যায় এবং অবশেষে তা প্রাকৃতিক আকর্ষণের বিপরীতে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক আকর্ষণ প্রযুক্ত বলের

---

৩২২. বায়ুর বাধাহীন বা বায়ুশূন্য স্থানে।

৩২৩. বস্তুর ভর বেশি হলে তা দ্রুত পড়বে এবং ভর কম হলে হালকাভাবে পড়বে এমন নয়।

৩২৪. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৯১।

বিপরীতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বস্তু এ আকর্ষণের দিকেই ফিরে আসে।[৩২৫]

ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা টীকায় বলেছেন, এখানে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করা সংগত যে, হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি 'আল-মাইল' (الميل) বা আকর্ষণ/ঝোঁকের বিষয়টিকে একটি সুপ্ত শক্তি বা নবজাতকের মায়ের কোলের দিকে ধাবিত হওয়ার অপত্যশক্তি হিসেবে বিবেচনা করেননি। যেমনটি অ্যারিস্টটল বলেছেন। বরং এর দ্বারা তিনি বস্তুগত শক্তি বুঝিয়েছেন, যা নিক্ষিপ্ত বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ-বিরুদ্ধ ঊর্ধ্বগামী ত্বরণের মধ্যে ও ভূমির দিকে নিম্নগামী ত্বরণের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে প্রশ্নটি ছুড়ে দিয়েছেন তা হলো, নিক্ষিপ্ত পাথর কি তার ঊর্ধ্বগামী ত্বরণের সর্বোচ্চ বিন্দুতে স্থির হয়ে পড়ে, যখন সে ভূপৃষ্ঠের দিকে পড়তে শুরু করে? এই প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়, কেউ যদি মনে করে যে প্রযুক্ত বলের কারণে ঘটিত পাথরের ঊর্ধ্বগামী ত্বরণ এবং (স্বাভাবিক) নিম্নগামী ত্বরণের মধ্যে (মধ্যবর্তী মুহূর্তে) সামান্যতম স্থিরতা রয়েছে তাহলে সে ভুল করবে। কারণ, পাথরের ওপর প্রযুক্ত বল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পাথরের ভর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন ঊর্ধ্বগামী ত্বরণ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং বিপরীতমুখী (নিম্নগামী) তরণ শুরু হয়। ফলে মনে হয় যে পাথরটি স্থির ছিল।

ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা ধারাবাহিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, আল-খাযিন ভূমির ওপর পতনশীল বস্তুর ত্বরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার *'মিযানুল হিকমা'* গ্রন্থে এ ব্যাপারে বক্তব্য রয়েছে। এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল-খাযিন ভূপৃষ্ঠের ওপর পতনশীল বস্তুর দ্রুতি এবং ওই বস্তু (কোনো একক সময়ে) যে দূরত্ব অতিক্রম করছে ও দূরত্ব অতিক্রম করতে যে সময় নিচ্ছে তার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক কী তা জানতেন। এই সম্পর্ককে গাণিতিক কাঠামোতে ব্যক্ত করতেই সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দে গ্যালিলিওর সঙ্গে সম্পৃক্ত সমীকরণটি প্রকাশিত হয়।

এভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানীরা প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে এসে মহাকর্ষ বিষয়ে মানবিক উপলব্ধির পূর্ণতার

---

৩২৫. আকাশের দিকে একটি ঢিল ছুড়ে এ বিষয়টি পরীক্ষা করা যায়।

পথে অংশত সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার রীতি-পদ্ধতি যে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তা তারা প্রমাণ করেছিলেন। সত্যে উপনীত হতে তারা এ বিষয়টির ওপরও নির্ভরশীল ছিলেন। তারা চিন্তাপদ্ধতি ও বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণারীতির ক্ষেত্রে যে মহাবিপ্লব সাধন করেছিলেন তা না হলে আমাদের সময় পর্যন্তও প্রাচীন কালের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রতিষ্ঠিত থাকত। আইজ্যাক নিউটন তার সামনে এমন মহান বিজ্ঞানীদের পেয়েছিলেন যাদের কাঁধের ওপর ভর করে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং এভাবে খ্যাতি ও সম্মান কুড়িয়ে নিয়েছিলেন।[৩২৬]

শেষে কিছু যদি বলতেই হয় তবে তা এই যে, গতিসূত্রের ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে এবং মহাকর্ষসূত্রের ইতিহাসও জানতে হবে। প্রাপ্য অধিকার তাদের প্রাপকদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

৩২৬. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি* , পৃ. ৯২।

ব্যক্তি-পরিচিতি[৩২৭]

তিসিবিওস : (Ctesibius or Ktesibios or Tesibius) ২৮৫ থেকে ২২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় গ্রিক পদার্থবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করতেন। তিনি প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার প্রকৌশল-যুগের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিসিবিওস ছিলেন একজন নাপিতের সন্তান। ধারণা করা হয় তিনিই প্রথম বাতাসের স্থিতিস্থাপকতা আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া তিনি ঘনীভূত বাতাস ব্যবহার করে বেশ কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ঘনীভূত বাতাসের শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের বিদ্যাকে Pneumatics বা বায়ুবিদ্যা বলা হয়। এজন্য অনেকে তাকে বায়ুবিদ্যার জনক বলেন। বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি ফোর্স পাম্প এবং এক ধরনের গুলতি বানিয়েছিলেন। তিসিবিওসের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ জলঘড়ির উন্নতি সাধন। জলঘড়ি তার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। সবচেয়ে সাধারণ জলঘড়ি দুটি পাত্রের মাধ্যমে কাজ করে। একটি পানিপূর্ণ পাত্র আরেকটি শূন্য পাত্রের একটু উপরে রাখা হয়, পানিপূর্ণ পাত্রের নিচের দিকে একটি ছিদ্র থাকে যা দিয়ে নিচের পাত্রে পানি পড়ে। নিচের পাত্রে পানির স্তর কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মাধ্যমে সময় গণনা করা হয়। কিন্তু এটি কোনো ধ্রুব সময় গণক ছিল না। কারণ উপরের পাত্রে পানি বেশি থাকলে চাপ বেশি হবে এবং সে কারণে পানির বেগও বেশি হবে। কিন্তু উপরের পাত্রের পানির স্তর যত কমতে থাকবে পানির বেগও তত কমতে থাকবে। এ কারণে জলঘড়ির পানিকে সময়ের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করলে বলতে হবে, সময় শুরুর দিকে বেশি দ্রুত চলে। এখান থেকেই বোধহয় 'সময় গড়িয়ে যাচ্ছে' বা 'সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে' বাগধারার উদ্ভব। পানির মাধ্যমে ধ্রুব সময় পরিমাপের জন্য তিসিবিওস উপরের পাত্রে পানির স্তর সর্বদা সমান রাখার কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর জলঘড়ি নির্মাণ করেন। নিচের পাত্রের গায়ে পানির স্তর

---

৩২৭. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত (উইকিপিডিয়া)।

নির্দেশক কাঁটা জুড়ে দিয়ে তিনি সময় (ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর) প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করেন।

হেরন অফ আলেকজান্দ্রিয়া : (হিরো অফ আলেকজান্দ্রিয়া, ১০-৭০ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন এবং এখানেই তার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া গ্রিক প্রভাবিত বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানকার বিজ্ঞান কেন্দ্রটি উৎসর্গ করা হয়েছিল সংগীতের দেবীদের নামে। এই কেন্দ্রে ছিল বিরাট পাঠাগার, জাদুঘর ও সভাগৃহ। হেরন এই কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে মনে করা হয়। হেরনের প্রধান খ্যাতি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের নির্মাতা হিসেবে যা তখন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়নি এবং তার প্রায় ১৮০০ বছর পর এই ধরনের টারবাইনের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে তিনি চারটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রেখে গেছেন, যার মধ্যে *মেট্রিকা*, *মেকানিক্স* ও *নিউম্যাটিক্স* সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এসব গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন সংখ্যা এবং ত্রিভুজ তল শঙ্কু ও ধরাকৃতি প্রসঙ্গে, বেগসামান্তরিক ভারকেন্দ্র, বায়ুর ঘনত্ব ও সংনমন এবং লিভার ও গিয়ার সম্পর্কে। আলোচনা করেছেন পাম্প সাইফন টারবাইন ও বিবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিষয়েও। তার এসব গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

ব্লেইজ প্যাসকেল : (Blaise Pascal 1623-1662) একজন ফরাসি গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ, উদ্ভাবক ও দার্শনিক। প্রথাগত কোনো বিজ্ঞানশিক্ষা না পেলেও গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় তার অত্যন্ত মৌলিক অবদান রয়েছে। তিনি বায়ুর ওজন ও চাপের এবং শূন্যস্থানের অস্তিত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন। তরল পদার্থের সুস্থিতি নিয়ে অনুশীলন করে তিনি এই সূত্র রচনা করেন যে, স্থির কোনো তরলের অভ্যন্তরে যেকোনো বিন্দুতে তরলের চাপ প্রতিটি অভিমুখেই সমান হয়ে থাকে, যা প্যাসকেলের সূত্র নামে পরিচিত। যন্ত্রগণকসহ নানা প্রকারের যন্ত্রও তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। দর্শনের আলোচনায় তিনি ব্যক্তি-প্রবণতাকে গাণিতিক ও স্বজ্ঞাত এই দুই ভাগে ভাগ করেন এবং একই ব্যক্তি বা আধারে এই দুইয়ের সহাবস্থান নিতান্ত বিরল বলে মত দেন।

১৬৪৬ সালে ব্লেইজ প্যাসকেল এবং তার বোন জ্যাকুইলিন ক্যাথলিক ধর্মীয় আন্দোলনে যুক্ত হন এবং সেন্ট অগাস্টিনের কথিত শিক্ষাকে ভিত্তি

করে জেসুইট-বিরোধী এক ধর্মীয় শাখা প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। ১৬৫১ সালে তার পিতা মারা যান। ১৬৫৪ সালের শেষের দিকে তিনি রহস্যময় কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। তার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে শুরু করেন জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, নিজেকে নিয়োজিত করেন দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে। এই সময় তিনি পাটিগাণিতিক ত্রিভুজের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ লেখেন। ১৬৫৮ ও ১৬৫৯ সালের মধ্যে তিনি বৃত্ত নিয়ে লেখেন এবং বিভিন্ন কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয়ে তার প্রয়োগ আলোচনা করেন।

প্যাসকেলের জন্ম হয়েছিল এক অত্যন্ত অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারে। শৈশব থেকেই তার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল এবং তার বিস্ময়কর প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল। তার কোনো কোনো গবেষণার ফল প্রায় দেড়শ বছর পরও ব্যবহারিক প্রয়োগ পেয়েছে। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার অসমাপ্ত সাহিত্যকর্ম *Pensées* ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তরলের চাপের আন্তর্জাতিক একককে তার নামানুসারে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

আল-হামদানি : আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে ইয়াকুব আল-হামদানি (২৮০-৩৩৪ হি./৮৯৩-৯৪৫ খ্রি.) ছিলেন পশ্চিম আমরান/ইয়ামেনের বনু হামদান গোত্রের মানুষ। তিনি একাধারে ভূগোলবিদ, কবি, রসায়নবিদ, ব্যাকরণবিদ, ঐতিহাসিক, ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন আব্বাসি খিলাফতের শেষ সময়কার ইসলামি সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তার যথেষ্ট পরিমাণ বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড থাকা সত্ত্বেও আল-হামদানির জীবনকাহিনি সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। তিনি ব্যাকরণবিদ হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন বেশি, তা ছাড়া তিনি অনেক কবিতা লিখে গেছেন, জ্যোতির্বিদ্যার ছক প্রণয়ন করেছেন এবং তার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই আরবের প্রাচীন ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্কে জানতে অতিবাহিত করেছেন। তার জন্মের পূর্বে তার পরিবার আল-মারশিতে বসবাস করত। সেখান থেকে তারা সানআয় চলে আসে, এখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন পরিব্রাজক এবং তিনি কুফা, বাগদাদ, বসরা, ওমান ও মিশর ভ্রমণ করেন। সাত বছর বয়স থেকেই আল-হামদানি ভ্রমণের কথা বলতেন। পরে প্রথমে তিনি মক্কায় ভ্রমণ করেন এবং সেখানে ছয় বছর পড়াশোনা করে কাটান। তারপর মক্কা ত্যাগ করে সাদাহর উদ্দেশে যাত্রা করেন। এখানে তিনি

খাওলান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে আল-হামদানি সানআয় ফিরে আসেন এবং হিময়ার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। এ সময় তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাকে দুই বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। কারামুক্তির পর তার গোত্রের প্রতিরক্ষার জন্য তিনি রাইদাতে যান। এখানেই তিনি তার বেশিরভাগ গ্রন্থ সংকলন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেন।

তার সম্পাদিত *আরব উপদ্বীপের ভূগোল* (*সিফাতু জাযিরাতিল আরব*) হচ্ছে এই বিষয়ের ওপর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি।

অস্ট্রিয়ান প্রাচ্যবিদ আলয়েস স্প্রেঙ্গার তার গবেষণাগ্রন্থ *Post-und Reiserouten des Orients* (লাইপ্‌ৎসিশ, ১৮৬৪)-এ এবং *Alte Geographie Arabiens* (বের্ন, ১৮৭৫) নামে আরেকটি গ্রন্থে আল-হামদানির পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন।

আল-হামদানির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মের মধ্যে রয়েছে *'ইকলিল'* (মুকুট)। এটি হিময়ারিদের বংশবৃত্তান্ত ও তাদের রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে দশ খণ্ডে রচিত। গ্রন্থটির অষ্টম খণ্ড দক্ষিণ আরবের নগরদুর্গ ও প্রাসাদসমূহের ওপর লিখিত। এটি ডি. এইচ. মুলার কর্তৃক জার্মান ভাষায় *Die Burgen und Schlösser Sudarabiens* (ভিয়েনা, ১৮৮১) নামে অনূদিত ও সম্পাদিত। আল-হামদানির রচিত অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা গুস্তাভ লেবারেশ্‌ট ফ্লুগেলের *Die grammatischen Schulen der Araber* (লাইপ্‌ৎসিশ, ১৮৬২) পৃ. ২২০-২২১-এ পাওয়া যাবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আলোকবিজ্ঞান

ইসলামি সভ্যতার পূর্বেই আলোকবিজ্ঞানের সূচনা ঘটেছিল। গ্রিক ও অন্যান্য প্রাচীন জাতি আলোকবিজ্ঞানের প্রতি বেশ গুরুত্ব প্রদান করেছিল। এই বিজ্ঞানশাখায় তাদের ভালো ভালো কীর্তি ও অবদান রয়েছে। মুসলিমরা আলোকবিজ্ঞানের চর্চার শুরুতে ওইসব অবদান ও কীর্তির ওপর নির্ভর করেছেন। আলোর প্রতিসরণ, প্রজ্জ্বলক আয়না (বার্নিং মিরর) ও অন্যান্য বিষয়ে তারা গ্রিক বিজ্ঞানীদের মতামত গ্রহণ করেছেন। তবে তারা কেবল গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং এই বিজ্ঞানশাখার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, নতুন নতুন অবিস্মরণীয় আবিষ্কারে একে সমৃদ্ধ করেছেন। তারা আলোকবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রিক সভ্যতায় আলোকবিজ্ঞান

গ্রিক আলোকবিজ্ঞান দুটি বিপরীতধর্মী তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১. প্রবেশন তত্ত্ব (Intromission theory), অর্থাৎ (দুই চোখে) এমন কিছুর প্রবেশ যা দুই চোখে বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলে বা দর্শনানুভূতির সৃষ্টি করে। ২. নিঃসরণ তত্ত্ব (Emission theory or extramission theory), অর্থাৎ দর্শনের ঘটনাটি ঘটে তখনই যখন চোখ থেকে আলো নিঃসৃত হয়ে দৃশ্যমান বস্তুর পৃষ্ঠদেশে প্রতিফলিত হয়।[৩২৮] গ্রিক সভ্যতা এই দুটি সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অ্যারিস্টটলের প্রচেষ্টাগুলো অনিবার্যভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ইউক্লিডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও তার প্রচেষ্টা অনেকটা বাস্তবিক। তবে তার তত্ত্বসমূহ ও তাত্ত্বিক বক্তব্য 'দর্শন'-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপনে ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ তাতে 'দৃষ্টিসংক্রান্ত ঘটনা' (Optical phenomena)-এর শারীরিক, শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো গুরুত্ব

---

৩২৮. গণিতবিদ ইউক্লিড ও টলেমি ছিলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা।-অনুবাদক।

পায়নি। তিনি এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, চোখ তার ও দর্শনযোগ্য বস্তুর মধ্যবর্তী স্বচ্ছ মাধ্যমে রশ্মি ফেলে, এই রশ্মি চোখের অভ্যন্তর থেকেই নিঃসৃত হয়। যেসব বস্তুর ওপর এই রশ্মি পড়ে তা দৃষ্টিগোচর হয় এবং যেসব বস্তুর ওপর পড়ে না তা দৃষ্টিগোচর হয় না। যেসব বস্তু বৃহৎ কোণ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলোকে বড় দেখায় এবং যেসব বস্তু ক্ষুদ্র কোণ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলোকে ছোট দেখায়।

অন্যদিকে টলেমি জ্যামিতিক নীতি ও ভৌতিক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেন। আলোকবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষামূলক পদ্ধতিরও প্রবর্তন করেন। এটি ছিল মূল্যবান নতুন ধারা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ এটির ব্যবহার এমনসব সিদ্ধান্তের সমর্থনে সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলোতে বিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বে উপনীত হয়েছিলেন। কখনো কখনো পরীক্ষামূলক ফলাফল এসব সিদ্ধান্তকে সুরক্ষাদানের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল।[৩২৯]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

আলোকবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা অতীতকালের এই ধারাতেই চলতে থাকে, কোনো অগ্রগতি বা উন্নতি দেখা যায় না। ইসলামি সভ্যতার সূচনাকাল পর্যন্ত তার অবস্থা থাকে এমনই। মুসলিম বিজ্ঞানীরা আলোকবিজ্ঞানে যে অবদান রাখেন তাতে এক বিকশিত ও অনন্য ধারার সৃষ্টি হয়। তার কারণ তারা আলোকবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি বিজ্ঞানশাখায় অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান, যন্ত্রপ্রকৌশল ইত্যাদি। কারণ তাদের আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে এসব বিজ্ঞানশাখার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

---

[৩২৯]. ডোনাল্ড আর. হিল, *Islamic Science and Engineering*, আরবি অনুবাদ, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১০২।

আবু ইউসুফ আল-কিন্দি[৩৩০]

দার্শনিক আবু ইউসুফ আল-কিন্দির আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রাথমিক পর্যায়ের যে-সকল মুসলিম বিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞানের ময়দানে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন আল-কিন্দি তাদের অন্যতম। তিনি তার বিখ্যাত কিতাব *'ইলমুল মানাযির'*-এ আলো-সম্পর্কিত ঘটনাবলির ওপর আলোকপাত করেছেন এবং সেগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি 'গ্রিক নির্গমন তত্ত্ব' গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি চোখের রশ্মির বিচ্ছুরণ সম্পর্কে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি একটি নতুন 'বিম্বিতকরণ পদ্ধতি' (ইমেজিং সিস্টেম)-এর মূলনীতি সূত্রবদ্ধ করেন। যা শেষ বিচারে নির্গমন-তত্ত্বেরই নামান্তর। কিন্তু তার *'ইলমুল মানাযির'* গ্রন্থটি মধ্যযুগে আরবের বিজ্ঞানজগতে তো বটেই, ইউরোপেও বেশ সাড়া ফেলেছিল।[৩৩১]

হাসান ইবনুল হাইসাম : আলোকবিজ্ঞানের পথিকৃৎ

আবু ইউসুফ আল-কিন্দির পর এলেন হাসান ইবনুল হাইসাম। আলোকবিজ্ঞান ও 'দর্শন'-এর শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের জগতে ইবনুল হাইসামের অবদান ও কীর্তি এক নতুন বিজয় ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। তার কাজগুলোই ছিল মূল ভিত্তি, যার ওপর পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা তাদের আলোকবিজ্ঞান-সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে-সকল ভিনদেশি বিজ্ঞানী ইবনুল হাইসামের তত্ত্ব ও মতবাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তাদের পুরোভাগে রয়েছেন রজার বেকন ও ভিটেলো (Vitello)[৩৩২] এবং অন্য বিজ্ঞানীরা। শুধু তাই নয়, তারা তার তত্ত্ব চুরিও করেছেন এবং নিজেদের নামে চালিয়েও দিয়েছেন।

---

৩৩০. আল-কিন্দি : আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে আস-সাবাহ আল-কিন্দি (১৮৫-২৫৬ হি./৮০৫-৮৭৩ খ্রি.)। তার যুগের শ্রেষ্ঠ আরব ও ইসলামি দার্শনিক। কিন্দাহর রাজপুত্র। বসরায় বেড়ে ওঠেন, তারপর বাগদাদে চলে যান। চিকিৎসা, দর্শন, সংগীত, প্রকৌশল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং এসব বিষয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা*, খ. ২, পৃ. ১৭২-১৭৭; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩১৫।

৩৩১. ডোনাল্ড আর. হিল, প্রাগুক্ত; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৩৮।

৩৩২. আলোকবিজ্ঞানের ওপর ভিটেলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, *Perspectiva*। গ্রন্থটির রচনাকাল ১২৭০-১২৭৮ খ্রি.। এটি রচনা করতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে হাসান ইবনুল হাইসামের ওপর নির্ভর করেছেন।

বিশেষ করে অণুবীক্ষণযন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ), দূরবীক্ষণযন্ত্র (টেলিস্কোপ) ও আতশি কাচ (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) নিয়ে তারা যেসব গবেষণা করেছেন তাতে এই ব্যাপারটি বেশি ঘটেছে।[৩৩৩]

ইবনুল হাইসাম প্রথমে আলোকবিজ্ঞান ও 'দর্শন'-এর ক্ষেত্রে ইউক্লিড ও টলেমির তত্ত্বগুলোর পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেন এবং দেখান যে এসব তত্ত্বের কিছু দিক সম্পূর্ণ গলদ। এই সময়ের মধ্যেই তিনি চোখ, লেন্স ও দুই চোখের দ্বারা দর্শন বিষয়ে সূক্ষ্ম ও যথার্থ বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, বাহ্যিক বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়লেই দেখতে পাই। আলোকরশ্মি যখন সাধারণভাবে ভূগোলকে পরিব্যাপ্ত বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার প্রতিসরণের পর্যায়ক্রম কীভাবে ঘটে তার বিবরণ প্রদান করেন। বিশেষ করে যখন তা স্বচ্ছ মাধ্যম যেমন বায়ু, পানি, বায়ুমণ্ডলের কণারাশি ভেদ করে (অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে) প্রবেশ করে। তখন আলোকরশ্মি সোজা না গিয়ে দিক পরিবর্তন করে। এই দিক পরিবর্তনের ঘটনাই হলো আলোর প্রতিসরণ। ইবনুল হাইসাম আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিফলিত রশ্মি যে কোণ (প্রতিফলন-কোণ) উৎপন্ন করে সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি আরও জানান যে, মহাজাগতিক বস্তুরাশি সূর্যোদয়ের সময় দিগন্তে প্রকাশ পায় মূলত তা সেখানে পৌছার আগেই এবং সূর্যাস্তের সময় এর বিপরীত কাণ্ড ঘটে, তখন তা দিগন্তে দৃশ্যমান থাকে দিগন্ত-রেখার নিচে মিলিয়ে যাওয়ার পরও। তিনিই প্রথম ডার্করুমের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেন, যা আলোকচিত্রের (ফটোগ্রাফির) মূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত।[৩৩৪]

যে গ্রন্থ ইবনুল হাইসাম নামটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অমর করে রেখেছে তা হলো *'কিতাবুল মানাযির' (Book of Optics)*। এই গ্রন্থ 'দর্শন'-এর প্রাথমিক তত্ত্ব হিসেবে আলোকবিজ্ঞানের ধারণা বিশ্লেষণ করে। ইউক্লিড থেকে শুরু করে, এমনকি আল-কিন্দি পর্যন্ত গাণিতিক ঐতিহ্য যে অনুমিত দৃশ্যমান (চোখ থেকে নির্গত) রশ্মির তত্ত্বকে আঁকড়ে রেখেছিল, ইবনুল হাইসামের উপর্যুক্ত তত্ত্ব ছিল তার থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। শুধু তাই নয়, ইবনুল হাইসাম 'দর্শন-প্রক্রিয়া'-র এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নতুন

---

৩৩৩. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৩৮।
৩৩৪. প্রাগুক্ত।

মেথোডলজি (নিয়মবিষয়ক বিজ্ঞান)-এরও প্রবর্তন করেন। তার এই কাজের ফলে চোখ থেকে নির্গত রশ্মির তত্ত্ব (নিঃসরণ তত্ত্ব) অনুসারে যেসব বিষয় অবোধগম্য ছিল সেগুলোর স্পষ্টীকরণ সম্ভব হয়। যে-সকল দার্শনিকের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল 'অবলোকন'-এর সারবস্তুটা কী সেটাই ব্যাখ্যা করা এবং যারা 'অবলোকন'-এর ঘটনা কীভাবে ঘটে তা বিশ্লেষণ করতে ততটা মনোযোগ দেননি তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় অবহেলিত থেকে গিয়েছিল। ইবনুল হাইসামের নতুন মেথোডলজি প্রবর্তনের ফলে সেগুলোরও ব্যাখ্যাদান সম্ভব হয়।[৩৩৫]

ইবনুল হাইসাম কেবল আলোকবিজ্ঞান নিয়েই প্রায় চব্বিশটি বিষয় লিখেছেন। গ্রন্থাকারে, পুস্তিকাকারে ও প্রবন্ধ-আকারে এসব রচনা লিখেছেন তিনি। আমাদের জ্ঞানভান্ডার থেকে যা-কিছু হারিয়ে গেছে তার সঙ্গে ইবনুল হাইসামের এসব রচনার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। যেগুলো বেঁচে গেছে সেগুলো ইস্তাম্বুল গ্রন্থাগার, লন্ডন গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তার মহাগ্রন্থ '*আল-মানাযির*' ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। তার এই গ্রন্থে আলোকবিজ্ঞানের নব-উদ্ভাবিত তত্ত্বগুলো রয়েছে। গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর থেকে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আলোকবিজ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে বিরাজমান ছিল।[৩৩৬]

'*আল-মানাযির*' গ্রন্থটি আলোকবিজ্ঞানের জগতে এক মহৈশ্বর্য। ইবনুল হাইসাম এই গ্রন্থে টলেমির তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা, সেগুলোর পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি টলেমির আলোকবিজ্ঞান-সম্পর্কিত কতিপয় তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ তিনি নতুন নতুন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তার এসব তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের অস্থিমজ্জারূপে এখনো বিদ্যমান।

টলেমি দাবি করতেন যে—আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি—চোখ থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্মি দর্শনযোগ্য বস্তুর ওপর পতিত হওয়ার মাধ্যমে

---

[৩৩৫]. ডোনাল্ড আর. হিল, *Islamic Science and Engineering*, আরবি অনুবাদ, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১০২।

[৩৩৬]. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমুল বাহতাতি ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যা ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২৫, ইবনুল হাইসামের রচনাবলি প্রসঙ্গে।

দর্শন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তার পরবর্তী বিজ্ঞানীরাও এই তত্ত্বই গ্রহণ করেছেন। ইবনুল হাইসাম এসে এই তত্ত্বকে বাতিল করে দেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, দর্শন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি চোখে এসে পড়ার ফলে। বহু পরীক্ষানিরীক্ষা ও এক্সপেরিমেন্টের পর ইবনুল হাইসাম দেখান যে, আলোকরশ্মি সমজাতীয় বা সমপ্রকৃতির মাধ্যমে সরল রেখায় প্রসারিত হয়। তিনি 'আল-মানাযির' গ্রন্থে তা প্রমাণ করে দেখান।[৩৩৭]

একটি বস্তুকে দুটি দেখার দ্বারা জোড়-দর্শন (ডিপ্লোপিয়া বা ডাবল ভিশন) ঘটা ব্যতিরেকেই দুই চোখের মাধ্যমে একইসঙ্গে একইসময়ে বস্তুরাশি দেখার পদ্ধতিটি কীরূপ তা গাণিতিক ও জ্যামিতিকভাবে প্রতিপাদন করেন ইবনুল হাইসাম।[৩৩৮] তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, দৃষ্টিগোচর বস্তুর দুটি প্রতিকৃতি চোখের রেটিনায় অভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। ইবনুল হাইসাম উপর্যুক্ত প্রতিপাদন ও এই ব্যাখ্যার দ্বারা বর্তমানে যে জিনিসটা স্টেরিওস্কোপ[৩৩৯] নামে পরিচিত তার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন।

ইবনুল হাইসামই প্রথম ব্যক্তি যিনি চোখের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। তিনি চক্ষু-ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে চোখের অংশগুলোর পরিচয় প্রদান করেন, সেগুলোর ব্যাখ্যা দেন এবং চিত্র অঙ্কন করে দেখান। তিনিই প্রথম চোখের বিভিন্ন অংশের নামকরণ করেন। পাশ্চাত্যজগৎ সরাসরি এসব নামই গ্রহণ করেছে অথবা তাদের ভাষায় সেগুলোর অনুবাদ করে নিয়েছে। এসব নামের মধ্যে রয়েছে কর্নিয়া, রেটিনা, ভিট্রিয়াস হিউমার, অ্যাকুয়াস হিউমার ইত্যাদি।[৩৪০]

---

৩৩৭. ইবনুল হাইসাম, *কিতাবুল মানাযির*, পৃ. ১৩৩।

৩৩৮. চোখ কীভাবে কাজ করে তা জানার জন্য দেখুন,
১. বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, Eye (চোখ) ভুক্তি, পৃ. ১৫৫-১৫৮।
২. 'আমাদের চোখ যেভাবে দেখে', https://bit.ly/3mx5Yr5।
৩. 'মানুষের চোখ কিভাবে কাজ করে', https://www.deho.tv/ -অনুবাদক।

৩৩৯. স্টেরিওস্কোপ (Stereoscope) : যে যন্ত্রের সাহায্যে সামান্য ব্যবধানের দুটি ভিন্ন চিত্রকে একক এবং ঘন বলে মনে হয়।-অনুবাদক।

৩৪০. হেনরি ক্রু, *The Rise of Modern Physics; a Popular Sketch*, পৃ. ৫৯; জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩০৫ থেকে উদ্ধৃত। আরও দেখুন, ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১০৪ ও তার পরবর্তী।

আলোকবিজ্ঞানে ইবনুল হাইসামের গুরুত্বপূর্ণ অবদান

তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পিন-হোল বা ডার্করুম বা ডার্ককেবিনেট ব্যবহার করে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। এসব পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে তিনি আবিষ্কার করেন যে, ডার্করুমের বা ডার্ককেবিনেটের অভ্যন্তরে বস্তুর ছবি উলটোভাবে প্রকাশ পায়। এভাবে তিনি ক্যামেরা আবিষ্কারের পথ সুগম করে তোলেন। এমন চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার কারণে ইবনুল হাইসাম দুজন ইতালীয় বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি[৩৪১] ও গিয়ামবাতিস্তা ডেলা পোর্টা[৩৪২] থেকে পাঁচশ বছর এগিয়ে রয়েছেন।[৩৪৩]

---

৩৪১. লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রি.) : ইতালীয় শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। ইতালীয় রেনেসাঁসের কালজয়ী চিত্রশিল্পী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অন্যান্য পরিচয়ও সুবিদিত—ভাস্কর, স্থপতি, সংগীতজ্ঞ, সমরযন্ত্রশিল্পী এবং বিংশ শতাব্দীর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেপথ্য জনক। তার বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে মোনালিসা, দা লাস্ট সাপার অন্যতম। তার শৈল্পিক মেধার বিকাশ ঘটে অল্প বয়স থেকেই। আনুমানিক ১৪৬৯ সালে রেনেসাঁসের অপর বিশিষ্ট শিল্পী ও ভাস্কর আন্দ্রেয়া ভেরোচ্চিয়োর কাছে ছবি আঁকায় ভিঞ্চির শিক্ষানবিশ জীবনের সূচনা। এই শিক্ষাগুরুর কাছেই তিনি ১৪৭৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত চিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৪৭২ সালে তিনি চিত্রশিল্পীদের গিল্ডে ভর্তি হন এবং এই সময় থেকেই তার চিত্রকর জীবনের সূচনা হয়। গির্জা ও রাজপ্রাসাদের দেয়ালে চিত্রাঙ্কন এবং রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের ভাস্কর্য নির্মাণের পাশাপাশি বেসামরিক এবং সামরিক প্রকৌশলী হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের প্রয়োগ, অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিত ও পদার্থবিদ্যার মতো বিচিত্র সব বিষয়ে তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করেন এবং মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। আনুমানিক ১৪৮২ সালে তিনি মিলান গমন করেন এবং সেখানে অবস্থানকালে তার বিখ্যাত দেয়ালচিত্র দা লাস্ট সাপার অঙ্কন করেন। ১৫০০ সালের দিকে তিনি ফ্লোরেন্স ফিরে আসেন এবং সামরিক বিভাগে প্রকৌশলী পদে নিয়োগ লাভ করেন। এই সময়েই তিনি তার বিশ্বখ্যাত চিত্রকর্ম মোনালিসা অঙ্কন করেন। জীবনের শেষকাল তিনি ফ্রান্সে কাটান।-অনুবাদক (উইকিপিডিয়া থেকে)

৩৪২. গিয়ামবাতিস্তা ডেলা পোর্টা (১৫৩৫-১৬১৫ খ্রি.) : ইতালীয় পণ্ডিত ও বহুবিদ্যাজ্ঞ। তার রচিত গ্রন্থাবলির বিষয়বস্তু হলো ঐন্দ্রজালিক দর্শন, জ্যোতিষতত্ত্ব, রসায়ন, গণিত, আবহবিদ্যা ও প্রাকৃতিক দর্শন।-অনুবাদক।

৩৪৩. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩০৪।
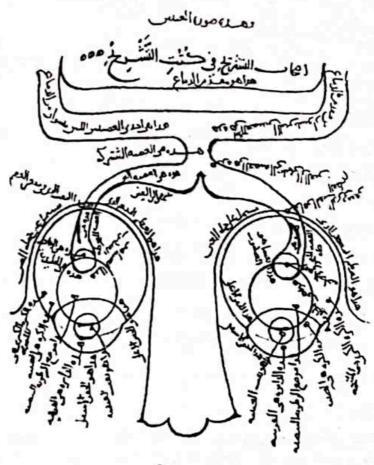
চিত্র নং-৯
ইবনে হাইসাম রচিত 'তাশরিহুল আইন'

ইবনুল হাইসামই প্রথমবারের মতো আলোকবিজ্ঞানের ময়দানে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়মাবলি প্রণয়ন করেন। আলোর গতিপথে আলোর প্রতিসরণ কীভাবে ঘটে তা তিনি কার্যকারণসহ ব্যাখ্যা করে বোঝান। অর্থাৎ বিভিন্ন মাধ্যম যেমন পানি, কাচ ও বায়ু ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গমনকালে আলোর প্রতিসরণ ঘটে। ইবনুল হাইসাম তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন থেকে এগিয়ে রয়েছেন।[৩৪৪]

৩৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

উপর্যুক্ত গ্রন্থে ইবনুল হাইসামের অন্যতম অর্জন হলো ডার্কবক্সের পরীক্ষানিরীক্ষা। এটিকে ক্যামেরা আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপ বিবেচনা করা হয়। সাইন্টিফিক এনসাইক্লোপিডিয়ায় যেমন বলা হয়েছে, ইবনুল হাইসাম প্রথম ক্যামেরা-আবিষ্কারক হিসেবে বিবেচিত হন। এটি কার্যত ক্যামেরা অবস্কিউরা নামে পরিচিত। ক্যামেরা অবস্কিউরা ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার অগ্রদূত।[৩৪৫]

যে-কেউ *'কিতাবুল মানাযির'* ও আলো-সম্পর্কিত বিষয়গুলো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করবেন, তিনি অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, ইবনুল হাইসাম একটি নতুন ধারা ও স্বভাব নিয়ে আলোকবিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করেছেন, যা তার পূর্বে কেউই করেননি। ৪১১ হিজরি/১০২১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি *'কিতাবুল মানাযির'* রচনা করেন। এতে তিনি তার গাণিতিক প্রতিভা, চিকিৎসা-অভিজ্ঞতা ও তার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ফলে তিনি এমন পরিণতিতে পৌঁছেছেন যা তাকে বিজ্ঞানজগতে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি এমনসব বিজ্ঞানশাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিয়েছে।[৩৪৬]

আলোকবিজ্ঞানে ইবনুল হাইসামের অসামান্য অবদান এবং নতুন ধারার উদ্ভাবনী গবেষণা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অনালোচিত, অনেক মানুষের কাছেই অপরিচিত। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে দেন যিনি তার যাবতীয় কর্মের সুলুক সন্ধান করেন, তার কীর্তি ও অবদানের ওপর আলো ফেলেন, সেগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এই ব্যক্তি হলেন মিশরীয় বিজ্ঞানী মুস্তাফা নাজিফ। তিনি ইবনুল হাইসাম ও তার কর্মের ওপর দীর্ঘ গবেষণালব্ধ একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। তিনি ইবনুল হাইসামের বিদ্যমান সব পাণ্ডুলিপি এবং অন্য শত শত উৎসগ্রন্থ পাঠে বিপুল প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করেন। এভাবে তিনি এক বাস্তবিক সত্যে

---

৩৪৫. জর্জ সার্টন, *Introduction to the History of Science*, খ. ১, পৃ. ৭২১।

৩৪৬. জর্জ সার্টন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪ ও তার পরবর্তী।

উপনীত হন। তা এই যে, ইবনুল হাইসাম এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর সূচনাকালে আলোকবিজ্ঞানের পথিকৃৎ।[৩৪৭]

আমরা যা-কিছু উল্লেখ করলাম তা আলোকবিজ্ঞানে মুসলিমদের বিপুল অবদানের নামমাত্র অংশ ছাড়া কিছু নয়। তাহলে আরও কী পরিমাণ বিস্ময়কর অবদান রয়েছে!

---

[৩৪৭]. ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর কায়রোতে অনুষ্ঠিত হাসান ইবনুল হাইসামের স্মরণে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভায় প্রদত্ত মুস্তাফা নাজিফের ভাষণ। আল-জামইয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ লিল উলুম আর-রিয়াদিয়্যাহ ওয়াত-তবিয়িয়্যাহ (ইজিপশিয়ান এসোসিয়েশন ফর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড ন্যাচারাল সাইন্স) কর্তৃক ইবনুল হাইসামের ৯০০তম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা ছিল এটি। ইবনুল হাইসাম ১০৪০ সালে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

জ্যামিতি

প্রাচীন মানুষ তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনেই জ্যামিতিবিদ্যা রপ্ত করেছিল। বিভিন্ন আয়তন ও ক্ষেত্রফলের পরিমাপ ও বাড়িঘর নির্মাণের জন্য জ্যামিতি আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয়েছিল। বরং অনেকে এটাও বলে থাকেন যে, জ্যামিতি হলো সহজাত বিজ্ঞান। কারণ প্রাণীরাও জানে যে দুটি বিন্দুর মধ্যে হ্রস্বতম পথ হলো সরলরেখা।[৩৪৮]

প্রাচীন মিশরীয়দের দিয়ে আমরা জ্যামিতি বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। তারা যেসব জ্যামিতিক সূত্রের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন সেগুলো পরবর্তীকালে পিথাগোরাসের সূত্র নামে প্রতিষ্ঠা পায়। তাদের কীর্তিগুলোই তাদের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। মিশরীয় রাজা আহমাসের (Ahmose I) যুগের অর্থাৎ ৪০০০ বছর আগেকার যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে তাতে পরিমাপ ও বিভিন্ন বস্তুর আকার ও আয়তন সম্পর্কে জ্যামিতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর ব্যাবিলনের অধিবাসীরা প্রকৌশলবিদ্যায় নতুন অনেককিছু সংযোজন করে। গ্রিকরা ব্যাবিলনবাসী থেকে এই বিদ্যা আহরণ করে। জ্যামিতিবিজ্ঞানে গ্রিকরা প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করে। প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইউক্লিড। তিনি জ্যামিতির মূলনীতি বিষয়ে *Elements* (*Euclid's Elements*) গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর অন্যতম। গ্রন্থটি প্রথমে আরবিতে অনূদিত হয়, তারপর তা ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।[৩৪৯]

জ্যামিতিবিদ্যা আরবে আসে গ্রিক রচনাবলির আরবি অনুবাদের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে *Euclid's Elements* গ্রন্থটির অনুবাদ এই ক্ষেত্রে বড়

---

[৩৪৮]. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৬৭।

[৩৪৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৯।

ভূমিকা পালন করে। ডোনাল্ড আর. হিল[৩৫০] ইসলামি সভ্যতায় জ্যামিতিবিদ্যার বিকাশের ধারাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, অনুবাদের ধারা শেষ হওয়ার পরপরই নতুন চিন্তাভাবনা ও উদ্ভাবনের ধারা শুরু হয়। ইউক্লিড, পেরগার অ্যাপোলোনিয়াস (Apollonius of Perga) ও আর্কিমিডিসের মতো মহান মনীষীরা যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও আরবের বিজ্ঞানীরা তাদের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলোর সংশোধন করেছেন। এভাবে আরব বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক জ্যামিতিবিদ্যার ময়দানে অসাধারণ অবদান রেখেছেন।[৩৫১]

আমাদের বিস্ময়ভাব আরও বেড়ে যায় যখন আমরা জানি যে, তাদের এসব 'অসাধারণ অবদান' ছিল তাত্ত্বিক জ্যামিতিবিদ্যার ময়দানে, যেখানে মুসলিমরা তেমন মনোযোগ ও গুরুত্ব দেননি।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্যামিতিবিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন : এক. যৌক্তিক বা বৌদ্ধিক জ্যামিতি এবং দুই. অনুভূতিগ্রাহ্য জ্যামিতি। যৌক্তিক জ্যামিতি হলো তাত্ত্বিক জ্যামিতি এবং অনুভূতিগ্রাহ্য জ্যামিতি হলো প্রায়োগিক ও বাস্তবিক জ্যামিতি। বৌদ্ধিক ও তাত্ত্বিক প্রকৌশলবিদ্যায় মুসলিমরা তত বেশি কাজ করেননি, যদিও তারা এগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং টীকা ও মন্তব্য সংযোজন করেছেন। তাদের সবচেয়ে বেশি

---

৩৫০. ডোনাল্ড আর. হিল (Donald Routledge Hill 1922-1994) : ব্রিটিশ প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ। মুসলিম প্রকৌশলী বদিউযযামান আল-জাযারির كتاب في معرفة الحيل الهندسية গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য তিনি সমধিক পরিচিত। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকৌশলে স্নাতক হন। ১৯৬৪ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামি ইতিহাসে এম. লিট (মাস্টার্স অফ লেটার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ :

১. *Islamic Technology: An Illustrated History* (আহমাদ ইউসুফ আল-হাসানের সঙ্গে যৌথভাবে);
২. *Islamic Science and Engineering*;
৩. *On The Construction of Water-Clocks–Kitab Arshimidas Fi'amal Al-Binkamat*;
৪. *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices: Kitáb fi ma'rifat al-hiyal al-handasiyya* (অনুবাদ);
৫. *The Book of Ingenious Devices* (অনুবাদ)।

৩৫১. ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৬।

মনোযোগ ও গুরুত্ব ছিল প্রায়োগিক ও বাস্তবিক জ্যামিতিবিদ্যায়। কারিগরিশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, নগরশিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে তারা তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।[৩৫২] তাদের কর্মকাণ্ড ছিল এতটাই বিশাল ও বিস্তৃত যে, একসময় যেখানে 'জ্যামিতি' শব্দটা মৌলিকভাবে কেবল তাত্ত্বিক জ্যামিতিবিদ্যাকে বোঝাত, সেখানে আধুনিক আরবি ভাষায় শব্দটি এখন স্বাভাবিকভাবে প্রায়োগিক জ্যামিতিকেই বোঝায়।[৩৫৩]

আমরা আল-বিরুনির কতিপয় রচনায় জ্যামিতি-সম্পর্কিত তত্ত্ব ও দাবি দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর প্রমাণের পদ্ধতিও রয়েছে। এসব প্রমাণ-পদ্ধতি নতুন ধারার ও গভীরতাসম্পন্ন। আল-বিরুনির এসব পদ্ধতি গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদেরা যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে ইবনুল হাইসাম জ্যামিতির দুটি ধারাই—সমতল জ্যামিতি (Plane geometry) ও ঘন জ্যামিতি (Solid geometry) আয়ত্ত করেন। আলো-সম্পর্কিত গবেষণায় এবং গোলক আয়না (Spherical mirror), নলাকার আয়না (Cylindrical mirror), শঙ্কু আয়না (Conical mirror), উত্তল আয়না (Convex mirror) ও অবতল আয়নায় (Concave mirror) বিভিন্ন অবস্থায় আলোর প্রতিফলন-বিন্দু নির্ধারণে তিনি জ্যামিতির প্রয়োগ ঘটান।[৩৫৪] এসবের জন্য সাধারণ সমাধান তৈরি করেন এবং এই ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে পৌঁছেন।[৩৫৫]

মুসলিম গণিতবিদেরা বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণনা করেন এবং সমতল জ্যামিতির ক্ষেত্রে উৎকর্ষের পরিচয় দেন। বিশেষ করে সমান্তরাল জ্যামিতিক রেখা সম্পর্কিত কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ক্ষেত্রে প্রথমত নাসিরুদ্দিন আত-তুসি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি সমান্তরাল রেখার ক্ষেত্রে ইউক্লিডের তত্ত্বকে ত্রুটিপূর্ণ

---

৩৫২. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৭০-৭১।

৩৫৩. ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৭।

৩৫৪. একে দর্পণ আলোকবিজ্ঞান (Mirror optics) বলা হয়। প্রতিবিম্ব সৃষ্টি এবং তা বিশেষ কোনো দিকে চালিত করা অথবা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সমতল অথবা বক্র প্রতিফলক পৃষ্ঠদেশের ব্যবহার-সম্পর্কিত বিদ্যাই দর্পণ আলোকবিজ্ঞান।-অনুবাদক।

৩৫৫. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৮।

আখ্যায়িত করেন এবং তার কিতাবে হাইপোথিসিস-ভিত্তিক দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেন। তার এই কিতাবটির নাম *'আর-রিসালাতুশ শাফিয়া আনিশ শাক্কি ফিল-খুতুতিল মুতাওয়াযিয়াহ'*।
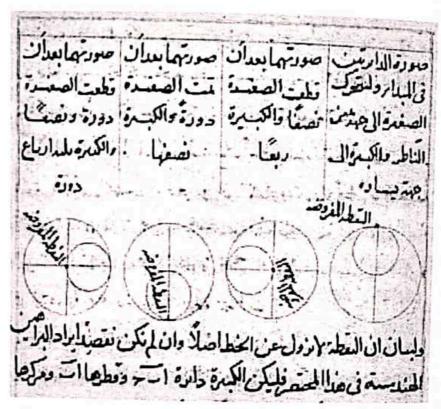
চিত্র নং-১০
নাসিরুদ্দিন তুসির গ্রন্থ

নাসিরুদ্দিন তুসি জ্যোতির্বিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ত্রিকোণমিতির ওপর বই লিখেছেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য না নিয়েই গোলাকার ত্রিকোণমিতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনিই প্রথম গোলাকার ত্রিকোণমিতিতে একটি সমকোণী ত্রিভুজের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নির্ণয় করেন। তার অবদানের ফলে ত্রিকোণমিতি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে।

মুসলিম গণিতবিদেরা গোলকের সমতলকরণ-সম্পর্কিত বিদ্যার সঙ্গেও সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।[৩৫৬] হাজি খলিফা এই বিদ্যার সংজ্ঞা

---

[৩৫৬]. গোলাকার সমতলকরণ (Flattening) ব্যাসের সঙ্গে একটি বৃত্তের বা গোলকের সংকোচনের পরিমাপ; যথাক্রমে উপবৃত্ত বা উপগোলক গঠন করতে এটি করা হয়।-অনুবাদক

দিয়েছেন এভাবে, এটা এমন জ্ঞান যার দ্বারা গোলককে সমতলে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি জানা যায়, যেখানে রেখাগুলো এবং গোলকের অঙ্কিত বৃত্তগুলো অপরিবর্তিত থাকে এবং ওইসব বৃত্তকে বৃত্তাকৃতি থেকে রেখায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতিও জানা যায়।[৩৫৭]

এই জ্ঞানের উপকারিতা কী? এই জ্ঞানের দ্বারা আলোকরশ্মি-সংক্রান্ত যন্ত্রের উদ্ভাবনের পদ্ধতি জানা যায়। সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি যেমন বলেছেন, এসব যন্ত্র ও তাদের কাজ, কীভাবে এগুলোর চিন্তাগত অবস্থাকে বাস্তবিক অবস্থা অনুযায়ী রূপদান করা যায়, এগুলোর দ্বারা কীভাবে জ্যোতির্বিদ্যার খুঁটিনাটি বিষয় জানা যায় এসব নিয়ে অনুশীলন ও চর্চা করাই এই জ্ঞানের উপকারিতা। জ্যামিতির এই শাখায় মুসলিম মনীষীদের রচনাবলির মধ্যে রয়েছে, আহমাদ ইবনে কাসির আল-ফারগানি রচিত '*আল-কামিল*', আল-বিরুনি রচিত '*আল-ইসতিআব*' এবং তাকিউদ্দিন আদ-দিমাশকি আশ-শামি[৩৫৮] রচিত '*দাসতুরুত-তারজিহ ফি কাওয়ায়িদিত-তাসতিহ*'। আল্লাহ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।[৩৫৯] এ বিষয়ে টলেমির একটি গ্রন্থ হলো *Ptolemy's Planisphere*। এটি আরবিতে '*তাসতিহুল কুরাহ*' নামে অনূদিত হয়েছে।

মুসলিমগণ জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয়, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন কোণের বণ্টন বা ত্রিখণ্ডন (Angle trisection), সুষম বহুভুজ (Regular polygon) অঙ্কন এবং বীজগণিতীয় সমীকরণের সঙ্গে একে মেলানো ইত্যাদি। বলা হয়ে থাকে যে, সাবিত ইবনে কুররা[৩৬০] কোণকে তিনটি

---

৩৫৭. হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, পৃ. ৪০৩।

৩৫৮. তাকিউদ্দিন আদ-দিমাশকি : মুহাম্মাদ ইবনে মারুফ আর-রাসিদ আশ-শামি (৯২৭-৯৯৩ হি./১৫২১-১৫৮৫ খ্রি.)। দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, ওষুধবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী ও যন্ত্রপ্রকৌশলী। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার নব্বইটিরও বেশি গ্রন্থ রয়েছে।

৩৫৯. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৩৬০. সাবিত ইবনে কুররা : আবুল হাসান সাবিত ইবনে কুররা ইবনে মারওয়ান ইবনে সাবিত (২২১-২৮৮ হি./৮৩৬-৯০১ খ্রি.)। গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও অনুবাদক। আব্বাসি খলিফা মু'তাদিদ বিল্লাহর ঘনিষ্ঠভাজন ছিলেন। টলেমির *Almagest* গ্রন্থের যেসব অনুবাদ আরবি ভাষায় বেরিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে তার অনুবাদই সবচেয়ে সম্পূর্ণ। টলেমির '*প্ল্যানেটারি হাইপোথেসিস*' গ্রন্থটির খুব সম্ভবত তিনিই অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদের সময় তিনি মূল লেখকের গণনা ও পর্যবেক্ষণকে পরীক্ষা করে দেখতেন এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করে

সমান অংশে ভাগ করেন। তিনি এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজটি করেন যা ছিল গ্রিক বিজ্ঞানীদের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রফেসর কাদরি তাওকান বলেন, তৃতীয় হিজরির শুরুতেই অতিভুজের বদলে সাইন (Sine) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কে এই কাজটির সূচনা করেছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এটা প্রমাণিত সত্য যে, সাবিত ইবনে কুররাই মেনেলাউসের (Menelaus of Alexandria) তত্ত্বকে প্রমাণ করেছিলেন এবং তাকে বর্তমান রূপে উপস্থিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কতিপয় ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানও প্রদান করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকজন পশ্চিমা বিজ্ঞানী তাদের গাণিতিক গবেষণায় এসব পদ্ধতি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন জিরোলামো কার্ডানো ও অন্যান্য বড় গণিতবিদ।[৩৬১]

প্রফেসর তাওকান আরও বলেন, গাণিতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ স্বীকার করেননি যে, সাবিত ইবনে কুররা তাদের অন্যতম যারা ক্যালকুলাস (Calculus) উদ্ভাবনের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ক্যালকুলাসের ভূমিকা কী তা অজ্ঞাত নয়। যদি গণিতের এই শাখা না থাকত এবং অসংখ্য জটিল ও কঠিন গাণিতিক সমস্যার সমাধানে সাবিত যে সহজীকরণ-পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবন করেছেন সেগুলো না হতো তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি থেকে উপকারগ্রহণ অসম্ভব হতো এবং তা মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যেত না। সাবিত তাদের অন্যতম যারা বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতিতে মনোযোগ দিয়েছেন এবং সিদ্ধি লাভ করেছেন। বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতিতে তিনি বহু নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন যা তার আগে কেউ করতে পারেননি। তিনি বীজগণিতের ওপর একটি বই লিখেছেন, তাতে জ্যামিতির সঙ্গে

নিতেন। জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণায় তার অন্যতম মৌলিক অবদান হলো অয়নচলনের (precession) পরিমাণের ক্ষেত্রে এক আপাত ব্যত্যয়ের অনুমান, যা trepidation নামে পরিচিত। যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীব্যাপী জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সারণিকে প্রভাবিত করে রেখেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তার বিভিন্ন রচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৩৬১. কাদরি তাওকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির-রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল-ফালাক*, পৃ. ৮৪ ও তার পরবর্তী; জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৯ থেকে উদ্ধৃত।

বীজগণিতের সম্পর্ক এবং দুটিকে একত্রীকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[৩৬২]

ফরাসি প্রাচ্যবিদ ব্যারন কারা ডি ভো[৩৬৩] ইসলামি সভ্যতার অবদান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আরবরা কার্যত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কীর্তি অর্জন করেছে, তারা আমাদের শূন্য (০)-এর ব্যবহার শিখিয়েছে, যদিও তারা শূন্য (০)-এর উদ্ভাবক ছিল না। দৈনন্দিন জীবনের গণিতও তারাই শুরু করেছে। তারা বীজগণিতকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানশাখার রূপ দিয়েছে এবং এতে উৎকর্ষ সাধন করেছে। তারা বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা কোনো ধরনের বিতর্ক ব্যতিরেকেই সমতল ত্রিভুজ ও গোলাকার ত্রিভুজ এই দুটি জ্ঞানশাখার উদ্‌গাতা এবং এই দুটির আবিষ্কারে গ্রিকদের কোনো অবদান নেই, সূক্ষ্ম বিচার ও ইনসাফ করতে চাইলে আমাদেরকে এ কথা বলতেই হবে।[৩৬৪]

বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টিকে একটি উল্লম্ফন হিসেবে বিবেচনা করা যায় তা হলো আরবদের ভারতীয় সংখ্যা, বিশেষ করে শূন্য (০)-এর ব্যবহার। কে প্রথম শূন্য (০)-এর সংজ্ঞা বা পরিচয় দিয়েছিলেন তার বিতর্ক চলমান থাকলেও আরবরাই যে শূন্য (০)-এর প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। তারা একে খালি জায়গা বা শূন্যস্থানের 'প্রকাশক' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শূন্য (০)-এর দ্বারাই দশকীয় সংখ্যাভিত্তিক হিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন একক স্থানীয় সংখ্যা, দশক স্থানীয় সংখ্যা, শতক স্থানীয় সংখ্যা...। এভাবে বড় বড় সংখ্যা লেখা এবং বড় বড় অঙ্ক কষা সম্ভব হয়েছে। যা সেই লাতিন সংখ্যা ব্যবহার করে সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল।[৩৬৫]

---

৩৬২. প্রাগুক্ত।

৩৬৩. ব্যারন বার্নার্ড কারা ডি ভো (Baron Bernard Carra De Vaux) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। ফরাসি ভাষাতেই লিখেছেন। তার আগ্রহের বিষয় ছিল আরবের জ্ঞানভান্ডার। মুসলিম বিজ্ঞানীদের কয়েকটি রচনা তিনি পুনর্নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা করেছেন।

৩৬৪. *The Legacy of Islam*, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত, আরবি অনুবাদ, *তুরাসুল ইসলাম* (১৯৫৪), অনুবাদ ও টীকা সংযোজন, জার্জিস ফাতহুল্লাহ, পৃ. ৫৬৩-৫৬৪।

৩৬৫. আবদুল হালিম মুনতাসির, *তারিখুল ইলম ওয়া দাওরুল উলামা আল-আরাব ফি তাকাদ্দুমিহি*, পৃ. ৬৪।

জার্মান প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এসব সংখ্যার ব্যবহার কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না অথবা আরবদের কোনো হস্তলিপিশৈলীও ছিল না। বরং তারা তাদের অসাধারণ প্রতিভার ফলেই ভারতবর্ষীয় পণ্যদ্রব্য ও উপঢৌকনের স্তূপ থেকে এই সংখ্যাগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। কারণ, তারা যে অন্যান্য বিস্ময়কর ব্যাপারে মনোযোগ না দিয়ে এই ছোট ছোট সংখ্যাগুলোর মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেছিলেন, তাতেই তারা প্রমাণ করেছিলেন যে তাদের রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা ও ব্যাপক অনুধাবনশক্তি। এই সংখ্যাগুলো ছিল মূলত ভারতবর্ষীয় উপঢৌকনের অলংকার। এই সংখ্যাগুলো কি আলেকজান্দ্রিয়ায় ও সিরিয়ার যেসব নগরীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ছিল সেখানে পরিচিত ছিল না? ছিল। কিন্তু সংখ্যাগুলো আরবদের হাতে না আসা পর্যন্ত তাদের উজ্জ্বল আলো ছড়াতে পারেনি।[৩৬৬]

গণিতবিদেরা মনে করেন যে, মানবসভ্যতায় শূন্য (০) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বস্তুত শূন্য (০) ছাড়া ধনাত্মক পরিমাণ ও ঋণাত্মক পরিমাণের অস্তিত্বই (যেমন তড়িৎবিজ্ঞানে) অসম্ভব হতো এবং বীজগণিতে ধনাত্মক রাশি ও ঋণাত্মক রাশি বলে কিছু থাকত না।[৩৬৭]

তারপর আল-খাওয়ারিজমি কর্তৃক *'ইল্‌মুল জাব্‌র ওয়াল-মুকাবালা'* প্রণয়নের ঘটনায় জ্যামিতিবিজ্ঞান আরেকটি উল্লম্ফন, আরেকটি বড় ধাপ অতিক্রম করে। বিজ্ঞানের এই শাখা সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে, মানববিদ্যায় মুসলিমদের অবদান প্রসঙ্গে আলোচনার সময় বিস্তারিত আলোচনা করব।

বস্তুর আয়তনের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পাই মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রদের কাছ থেকে। জ্যামিতিবিদ্যায় তাদের মহৎ কাজ হলো معرفة مساحة الاشكال البسيطة والكرية (সরল ও গোলাকার বস্তুর আয়তন প্রসঙ্গে) গ্রন্থ প্রণয়ন। এই গ্রন্থে তারা বর্ণনা করেছেন যে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বা বেধ—এই তিনটি পরিমাপ প্রত্যেক ঘনবস্তুর আয়তন ও প্রত্যেক সমতল বস্তুর ক্ষেত্রফলকে সীমাবদ্ধ করে। তাদের (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও

---

৩৬৬. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ১৫৭।

৩৬৭. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৫৬।

উচ্চতার) পরিমাণ নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি একটি সমতল বস্তু ও একটি ঘনবস্তুর সঙ্গে এবং একটি সমতল বস্তুর—যার দ্বারা তল বা পৃষ্ঠদেশকে পরিমাপ করা হয়—সঙ্গে তুলনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়। প্রতিটি বহুভুজ একটি বৃত্তকে বেষ্টন করে থাকে, তাই ওই বহুভুজের সকল ভুজের (বাহুর) অর্ধেকে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ-পরিমাণ তল বা পৃষ্ঠদেশই তার ক্ষেত্রফল।[৩৬৮]

আর্কিমিডিসের *Measurement of a Circle or Dimension of the Circle* (বৃত্তের আয়তনের পরিমাপ) ও *On the Sphere and Cylinder* (গোলাকার ও বেলনাকার বস্তুর পরিমাপ) বিষয়ে দুটি বই রয়েছে। বানু মুসা ইবনে শাকিরের উপর্যুক্ত গ্রন্থটি আর্কিমিডিসের এই দুটি বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ সাধন করেছে। তারা তিন ভাই যে দুটি বিষয়ের সুবিধা কাজে লাগান তা হলো ইউডক্সাসের[৩৬৯] *Method of exhaustion* এবং আর্কিমিডিসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু (infinitesimals) সম্পর্কিত ধারণা। তাদের এই গ্রন্থ ইসলামি প্রাচ্যে ও লাতিনীয় পশ্চিমে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৩৭০]

---

৩৬৮. বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাবু মারিফাতি মাসাহাতিল আশকাল*, সম্পাদনা, নাসিরুদ্দিন আত-তুসি, পৃ. ২; খালিদ আহমাদ হারবি, উলুমু *হাদারাতিল ইসলাম ওয়া দাওরুহা ফিল-হাদারাতিল ইনসানিয়্যা*, পৃ. ১৫৪ থেকে উদ্ধৃতি।

৩৬৯. ইউডক্সাস (Eudoxus of Cnidus 390-337 BC) : গ্রিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। দরিদ্র পরিবারের সন্তান ইউডক্সাস একাডেমিতে অধ্যয়ন করেন। প্লেটোর কাছেও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে মিশরে যান। তিনি তুর্কিস্তানে ও পরে এথেন্স নগরীতে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। তার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের কোনোটিই মূল অবস্থায় পাওয়া যায়নি। হিপ্পারচুস, ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের লেখা থেকে তার বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা জানা যায়। তিনিই হলেন প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানী যার খগোল বা মহাজাগতিক গোলক সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল। তিনি প্রথম গ্রিক বিজ্ঞানী যিনি জানতেন এক বছর ঠিক ৩৬৫ দিন নয়, তার চেয়ে ঘণ্টা ছয়েক বেশি। তিনি পৃথিবীর একটি মানচিত্র এঁকেছিলেন এবং মহাকাশকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে নক্ষত্ররাজির একটা মানচিত্র অঙ্কনেও হাত দিয়েছিলেন। গণিতে তিনি অনুপাতের তত্ত্বকে মূলদ ও অমূলদ উভয় রাশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে তোলেন। বক্ররেখার দ্বারা আবদ্ধ কোনো ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য এক যথোপযুক্ত গাণিতিক পদ্ধতিও (Method of exhaustion) উদ্ভাবন করেছিলেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি বৃত্তের ক্ষেত্রফল যে তার ব্যাসার্ধের বর্গমূলের আনুপাতিক হয় এবং এর আয়তন তার ব্যাসার্ধের ঘনমূলের আনুপাতিক হয় তা প্রমাণ করেছিলেন।

৩৭০. আবদুল হামিদ সাবরাহ, *বানু মুসা ইবনে শাকির*, The Genius of Arab Civilization Source of Renaissance, সম্পাদক, আর. বি. উইন্ডার, আরবি অনুবাদ, عبقرية الحضارة العربية منبع

ক্ষেত্রফল প্রসঙ্গে মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের গণিত-বিষয়ক রচনাবলিতে আলোচনা করেছেন। কারণ ক্ষেত্রফল জ্যামিতিরই একটি শাখা। আমরা দেখি যে, বাহাউদ্দিন আল-আমিলি[৩৭১] তার *আল-খুলাসাতু ফিল-হিসাব* (الخلاصة في الحساب)[৩৭২] গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে কেবল ক্ষেত্রফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের ভূমিকায় তিনি সমতল এবং ঘনবস্তুর আয়তন এবং ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রাথমিক সংজ্ঞার ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি সরল বাহুবদ্ধ তলের (সমতলের) ক্ষেত্রফল সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন : ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, রম্বস, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ এবং অন্যান্য সুষম বাহুর বস্তু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছেন বৃত্ত ও বক্রতল, যেমন সিলিন্ডার, পূর্ণাঙ্গ কোণ, অপূর্ণাঙ্গ কোণ, গোলাকার বস্তু ইত্যাদির ক্ষেত্রফল কীভাবে পাওয়া যায় তার পদ্ধতি নিয়ে। সপ্তম অধ্যায়ে ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন ক্ষেত্রফল ও পরিমাপ-সম্পর্কিত কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। জলপথ তৈরির জন্য জরিপ পরিচালনা, বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চতা পরিমাপ এবং নদীর প্রস্থ ও কূপের গভীরতা জানার জন্য এসব বিষয় সংযোজন করেছেন।

মুসলিমরা তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানকে বাস্তবিক রূপ দিয়েছেন এবং তা তাদের স্থাপত্যশিল্পে প্রয়োগ করেছেন। এটা ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মসজিদ, অট্টালিকা, প্রাসাদ ও শহর নির্মাণে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মনোযোগ ও গুরুত্ব ছিল জ্যামিতিক কারুকার্যের প্রতিও, যা ছিল বিন্যাসে ও সূক্ষ্মতায় অনন্য। যদিও ইসলামি শিল্প

النهضة الأوروبية, অনুবাদক, আবদুল কারিম মাহফুজ, পৃ. ২৫; খালিদ আহমাদ হারবি, *উলুমু হাদারাতিল ইসলাম ওয়া দাওরুহা ফিল-হাদারাতিল ইনসানিয়্যা*, পৃ. ১৫৫ থেকে উদ্ধৃতি।

৩৭১. বাহাউদ্দিন আল-আমিলি : বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আবদুস সামাদ আল-হারিসি, শাইখ বাহায়ি বা বাহাউদ্দিন আল-আমিলি নামে সমধিক পরিচিত (৯৫৩-১০৩১ হি./১৫৪৭-১৬২২ খ্রি.)। ফকিহ, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। বা'লাবাক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ইস্পাহানে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تشريح الأفلاك ـ في علم الهيئة، رسالة في حل إشكالي عطارد والقمر، الصحيفة في الأعمال الاسطرلابية، رسالة في تضاريس الأرض، المخلاة، الكشكول، حديقة السالكين، بداية الهداية، الزبدة في الأصول، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة। দেখুন, *যিরিকলি*, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ১০২।

৩৭২. বইটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন G. H. F. Nesselmann, যা ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।-অনুবাদক

(ইসলামিক আর্ট) সম্পর্কিত আলোচনা-পর্যালোচনায় এ বিষয়টি (ইসলামি স্থাপত্যকলা) যথেষ্ট জায়গা দখল করে নিয়েছে, কিন্তু তা তো স্থাপত্যপ্রকৌশলের একটি মৌলিক দিক বলেই বিবেচিত। ইসলামি স্থাপত্যকলার মৌলিকতা ও অনন্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ মার্টিন এস. ব্রিগ্‌স[৩৭৩]। তিনি বলেছেন, সাম্রাজ্য বিস্তারের শুরুর দিকে স্থাপত্যপ্রকৌশল-সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি আরবদের অজানা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বটে, তবে ইসলামি স্থাপত্যকলা সম্পর্কে এটা জাজ্বল্যমান সত্য যে, ইসলাম তার পতাকা উড়িয়েছে যত দেশে, যত যুগ অতিবাহিত করেছে সেখানে, তার সব জায়গায় ও সবসময়ই ইসলামি স্থাপত্যকলাই নির্মাণশৈলী হিসেবে আধিপত্য ধরে রেখেছে। অথচ ইসলামি স্থাপত্যকলার নীতিমালা অত্যন্ত জটিল (অর্থাৎ প্রভাব-বিস্তারক)। এমন কিছু ব্যাপার আছে যা ইসলামি স্থাপত্যশিল্পকে স্থানীয় সব ধরনের স্থাপত্য-ঘরানার কীর্তিকলাপ থেকে পৃথক রেখেছে। যদিও স্থানীয় স্থাপত্য-ঘরানাগুলো নিজেদের জায়গায় ছিল নির্মাণশিল্পের হাতিয়ার।[৩৭৪]

জ্যামিতিবিজ্ঞানে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামি সভ্যতার একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। তবে কেউ ইচ্ছা করে স্বীকার না করলে ভিন্ন কথা। মুহাম্মাদ কুর্‌দ আলি লুইস সিডিও (Louis-Amélie Sédillot)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, আরবদের (আরব মুসলিমদের) স্থাপত্যপ্রকৌশলে যে সৃজনশীলতা ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সে ব্যাপারে যারা জানে সবাই তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে তাদের কোনো প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আরবরা তাদের নিজস্ব স্টাইলের ভবন উদ্ভাবন করেনি বটে, তবে তাদের স্থাপত্যকলায় কারুকার্য ও কমনীয়তার প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তারা খিলানযুক্ত তোরণ ও কম্পাসীয় নকশা অঙ্কনে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের মসজিদ ও অট্টালিকার জন্য ফুল ও লতাপাতাযুক্ত গম্বুজ, ছাদ ও আসন নির্মাণে তারা যে স্থাপত্য নৈপুণ্যের

---

[৩৭৩]. মার্টিন এস. ব্রিগ্‌স (Martin Shaw Briggs 1882-1977) : ব্রিটিশ স্থাপত্য-ইতিহাসবিদ, বারোক পিরিয়ডে বিশেষজ্ঞ এবং রয়াল ইন্সটিটিউট অফ ব্রিটিশ আর্কিটেক্টস-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Muhammadan architecture in Egypt and Palestine* (1974), *Baroque Architecture* (1913), *The architect in History* (1927).-অনুবাদক

[৩৭৪]. থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত *তুরাসুল ইসলাম* (১৯৫৪), পৃ. ২৩২।

পরিচয় দিয়েছে তা যুগ যুগ ধরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এসব ব্যাপার নকশা ও কারুকার্যের প্রতি তাদের যে প্রগাঢ় ভালোবাসা তা-ই প্রমাণ করে। তাদের অট্টালিকাসমূহ ও নির্মাণশিল্পগুলো যেন প্রাচ্যের এক থান কাপড়, যার নকশায় ও অলংকরণে তাঁতি চরম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। একজন ফিরিঙ্গি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির স্বীকৃতি এমনই।[৩৭৫]

জ্যামিতিবিজ্ঞানের বিকাশে মুসলিমদের অবদানের কিছুমাত্র অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাদের অবদানের ফলে জ্যামিতির ব্যবহার ও প্রয়োগে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছিল। অবশ্য তার আগে তারা পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর উত্তরাধিকার নিজেদের আয়ত্ত করেও নিয়েছিলেন।

---

৩৭৫. মুহাম্মাদ কুর্‌দ আলি, *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাহ আল-আরাবিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ২৩৮।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ভূগোলবিদ্যা

ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের রচনাবলি এখনো পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। এসব রচনায় যেসব তথ্য ও সংবাদ রয়েছে তা আমাদের ঐতিহাসিক ভূগোল-বিষয়ক জ্ঞানকে বৃদ্ধি করেছে। তাদের এসব রচনায় মূলত বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে তা আমাদের ওইসব দেশের ইতিহাস-সম্পর্কিত জ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করেছে। এই ময়দানে ইসলামের উত্তরাধিকার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।[৩৭৬]

এটা আমাদের কথা নয়, বরং তা জার্মান-ইসরাইলি গবেষক মার্টিন প্লেসনারের[৩৭৭] কথা।

ইসলামের আগমনের পূর্বেই ভূগোলবিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আরবদের প্রাগ্রসরতা ও তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ফলে ভূগোলবিদ্যায়ও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই যে, আরবরা শুরুর দিকে গ্রিকদের বিজ্ঞান গ্রহণ করেছিল, বিশেষ করে টলেমির। ভূগোলবিদ্যায় গ্রিকরাই ছিল তাদের পথপ্রদর্শক। তবে এই ক্ষেত্রেও আরবরা তাদের গুরুদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যেমনটা ছিল তাদের অভ্যাস।[৩৭৮]

এটাও আমাদের বক্তব্য নয়, বরং বিখ্যাত ফরাসি চিন্তাবিদ গুস্তাভ লি বোঁর বক্তব্য।

---

৩৭৬. মার্টিন প্লেসনার, *মাবহাসুল উলুম*, যোসেফ শাখ্ত *(Joseph Franz Schacht)* ও ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়র্থ (Clifford Edmund Bosworth) কর্তৃক সম্পাদিত The Legacy of Islam, আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام, খ. ২, পৃ. ১৫৪।

৩৭৭. মার্টিন প্লেসনার (*Martin Plessner* 1797-1883) জার্মান অর্থোডক্স ধর্মপ্রচারক এবং পণ্ডিত। বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ। বেলারুশে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ধ্রুপদি ঐতিহ্য এবং মধ্যযুগে ইহুদিধর্মের ওপর ইসলামের প্রভাব তার প্রধান আগ্রহের বিষয়।-অনুবাদক

৩৭৮. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৬৮।

ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের উদ্ভাবন ও অবদান

ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের উদ্ভাবন ও অবদানকে আমরা তিনটি বিভাগে চিহ্নিত করতে পারি :

- পূর্ববর্তী ভ্রান্তি-বিভ্রাটের সংশোধন
- দেশ ও নিদর্শনসমূহের যথার্থ বর্ণনা
- আবিষ্কার ও উদ্ভাবন

পৃথিবীর গোলকাকৃতির প্রমাণ

পৃথিবী যে গোলাকার তা প্রথম মুসলিমরাই প্রমাণ করেছিলেন। ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার যাত্রা শুরু হয় এভাবেই। গ্রিকরা বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী হলো বৃত্তাকার সমতল চাকতি, যাকে সব দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে সমুদ্রের জলরাশি। হেকাটিয়াস (Hecataeus of Miletus 500 BC)—যাকে গ্রিক ভূগোলবিদ্যার জনক বিবেচনা করা হয়—তো পৃথিবীকে একটি বৃত্তাকার চাকতি ধরে নিয়ে তার মানচিত্র অঙ্কন করেছেন।[৩৭৯] পৃথিবী যে গোলাকার তার প্রথম তাত্ত্বিক ধারণা দেন প্লেটো (৩৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), তবে তিনি তার পরবর্তী দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের থেকে যথার্থ সমর্থন পাননি। এমনকি রোমান সাম্রাজ্য তার এই চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করে। রোমান ভূগোলবিদ্যার জনক কসমাস (Cosmas) ৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন, পৃথিবী হলো চাকার সদৃশ, সমুদ্রের জলরাশি তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে...।' বিষয়টি জটিল পর্যায়ে পৌছে যখন গির্জা ও গির্জার প্রথম সারির ফাদাররা—যাদের নেতৃত্বে ছিলেন লাকটানটিয়াস (Lactantius)—কসমাসের উপর্যুক্ত তত্ত্বকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত দেন যে, পৃথিবী হলো সমতল এবং অন্যপাশ হলো অনাবাদিত, তা (পৃথিবী সমতল) না হলে মানুষ শূন্যে পতিত হতো![৩৮০]

---

৩৭৯. হেকাটিয়াস মূলত অ্যানাক্সিম্যান্ডারের (Anaximander 610-546 BC) অঙ্কিত মানচিত্রের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন।-অনুবাদক।

৩৮০. প্রাগুক্ত এবং জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮।

ইসলামি সভ্যতা আবির্ভাবের পর তা পৃথিবীর গোলকাকার তত্ত্বকে গ্রহণ করে এবং এই তত্ত্বের পুনর্জীবনদানে সচেষ্ট হয়। এর পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে পৃথিবীর গোলকাকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا﴾

এবং পৃথিবীকে তারপর বিস্তৃত করেছেন।[৩৮১]

'দাহিয়্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গোলক। পবিত্র কুরআনে আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো এই গোলকটি যে তার নিজের চারপাশে (কক্ষপথে) ঘূর্ণায়মান তা নিয়ে আলোচনা করেছে। গোলকটির (পৃথিবীর) এমন আবর্তনের ফলেই দিবস ও রজনীর সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾

তিনি রাতের দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে আচ্ছাদিত করেন রাতের দ্বারা।[৩৮২]

ইবনে খুররাদাযবিহ[৩৮৩] বলেছেন, পৃথিবী বলের মতোই গোলাকার, ডিমের ভেতরে থাকা কুসুমের মতো।[৩৮৪] ইবনে রুসতাইও[৩৮৫] একই কথা বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আকাশকে বলের মতো গোলকাকার বানিয়েছেন, তা শূন্যগর্ভ ঘূর্ণনশীল; পৃথিবীও গোলাকার এবং আকাশের অভ্যন্তরে রয়েছে।[৩৮৬]

---

৩৮১. সুরা নাযিআত : আয়াত ৩০।

৩৮২. সুরা যুমার : আয়াত ৫।

৩৮৩. ইবনে খুররাদাযবিহ : আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে খুররাদাযবিহ (২০৪-২৭২ হি./৮২০-৮৮৫ খ্রি.)। ভৌগোলিক ইতিহাসবিদ। বারমাকিদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ المسالك والممالك। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ২২৯।

৩৮৪. ইবনে খুররাদাযবিহ, *আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক*, পৃ. ৪।

৩৮৫. ইবনে রুসতাহ : আবু আলি আহমাদ ইবনে উমর (মৃ. ৩০০ হি./৯১২ খ্রি.)। ভূগোলবিদ। ইরানের ইস্পাহানের অধিবাসী। الأعلاق النفيسة তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ১৮৫।

৩৮৬. ইবনে রুসতাহ, *আল-আ'লাক আন-নাফিসাহ*, পৃ. ৮।

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও *আল-ইক্দুল ফারিদ* গ্রন্থের প্রণেতা ইবনে আবদি রাব্বিহি[৩৮৭] কয়েকটি পঙ্ক্তি রচনা করেছেন, যেখানে তিনি আবু উবাইদা মুসলিম ইবনে আহমাদ আল-ফালাকির[৩৮৮] বক্তব্যের খণ্ডন করেছেন। আমরা তার পঙ্ক্তিমালা থেকে জানতে পারি যে, আবু উবাইদা আল-ফালাকি পৃথিবী গোলকাকার বলে মত ব্যক্ত করতেন। কিন্তু ইবনে আবদি রাব্বিহি তার সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাই তিনি বলেছেন,

أبا عُبيدةَ ما المسؤولُ عن خَبرٍ تَحكيهِ إلا سُؤالاً للذي سألا

أبَيتَ إلا شذوذًا عن جماعتِنا ولم تعبْ رأيُ من أرجا ولا اعْتَزَلا

كذلكَ القِبلةُ الأولى مُبدَّلةٌ وقد أبَيتَ فما تَبغي بها بَدَلا

زعمتَ بهرامَ أو بَيدَختَ يرزقُنا لا بل عُطاردَ أو بِرجِيسَ أو زُحَلا

وقلتَ إنَّ جميعَ الخلقِ في فَلَكٍ بهِمْ يحيطُ وفيهِمْ يقسمُ الأجَلا

والأرضُ كورِيَّةٌ حفَّ السماءُ بها فَوقاً وتحتاً وصارتْ نُقطةٌ مَثَلا

صَيفُ الجنوبِ شتاءٌ للشَّمَالِ بها قد صارَ بَينهما هذا وذا دُوَلا

فإنَّ كانونَ في صَنعا وقُرطبةٍ بردٌ وأيلولُ يُذكي فيهما الشُّعَلا

كما استمر ابنُ موسى في غوايتهِ فوعَّرَ السهلَ حتى خِلتَهُ جَبَلا

أَبلِغْ معاويةَ المُصغي لقولِهما أني كفرتُ بما قالا وما فَعلا

আবু উবাইদা, আপনি যা বলেন সে বিষয়ে আপনি দায়িত্বশীল নন, বরং প্রশ্নকারীর জন্য রেখে যান প্রশ্ন।

আপনি আমাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং যে বিচ্ছিন্ন হয় বা পাশ কাটিয়ে যায় তার বক্তব্য সঠিক হয় না।

---

৩৮৭. ইবনে আবদি রাব্বিহি : আবু উমর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদি রাব্বিহি ইবনে হাবিব ইবনে হুদাইর ইবনে সালেম (২৪৬-৩২৮ হি./৮৬০-৯৪০ খ্রি.)। শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক। *আল-ইকদুল ফারিদ* গ্রন্থের প্রণেতা। কর্ডোভার অধিবাসী। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২০৭।

৩৮৮. আবু উবাইদা আল-ফালাকি : আবু উবাইদা মুসলিম ইবনে আহমাদ (মৃ. ২৯৫ হি.)। গ্রহরাজির আবর্তন ও নক্ষত্রের সন্তরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ছিলেন ফকিহ ও হাদিস বিশারদ। ভাষা ও ব্যাকরণ এবং ছন্দশাস্ত্রেও দখল ছিল তার। দেখুন, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪।

প্রথম কেবলার পরিবর্তন হয়েছিল; কিন্তু আপনি তা স্বীকার করেন না এবং এ ধরনের পরিবর্তন আশাও করেন না।

আপনি দাবি করেছেন, বাহরাম[৩৮৯] বা বায়দুখ্‌ত[৩৯০] আমাদের রিযিক দান করে, না বরং বুধগ্রহ বা বৃহস্পতিগ্রহ বা শনিগ্রহ রিযিক দান করে।

আপনি বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টি রয়েছে এক মহাকাশে, যা তাদের বেষ্টন করে আছে এবং তাদের মধ্যে মহাকাশই নির্ধারণ করে সময়।

আপনি আরও বলেছেন, পৃথিবী হলো গোলাকার, আকাশ তাকে উপর দিক ও নিচ দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, যেন তা আকাশের মধ্যস্থলে একটি বিন্দু।

পৃথিবীর দক্ষিণে (দক্ষিণ মেরুতে) যখন গ্রীষ্ম, উত্তরে (উত্তর মেরুতে) তখন শীত, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যস্থলে রয়েছে পৃথিবীর সব দেশ।

সানআ ও কর্ডোভায় ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে থাকে শীত, আর সেপ্টেম্বর মাস এখানে জ্বালায় আগুন।

ইবনে মুসাও তার পথভ্রষ্টতায় রয়েছেন অটল; তিনি সমতলকে করে তোলেন এতটা অসমান যে (বা সহজ বিষয়কে করে তোলেন এতটা কঠিন যে) তাকে তোমার পাহাড় মনে হয়।

মুআবিয়াকে—যে তাদের দুইজনের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে—জানিয়ে দাও, তারা দুইজন (আবু উবায়দা ও ইবনে মুসা) যা বলেন ও করেন তা আমি স্বীকার করি না।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই আবু উবাইদার জীবনচরিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার কাছে মিথ্যাচারের চেয়ে আকাশ থেকে পতনও সহজতর। এই বক্তব্য প্রথমত তার চারিত্রিক গুণাবলিকে নির্দেশ করলে তা থেকে এই বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি ছিলেন

---

৩৮৯. সাসানীয় সম্রাট; প্রথম বাহরাম, দ্বিতীয় বাহরাম ও পঞ্চম বাহরাম সাসানীয় সম্রাট ছিলেন।-অনুবাদক

৩৯০. ইরানের খুরাসান প্রদেশের গুরাবাদ জেলার একটি শহর।-অনুবাদক

সূক্ষ্ম অনুসন্ধানী, সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁটিয়ে দেখতেন, কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণা করতেন।

আবু উবাইদা হিজরি তৃতীয় শতকের (খ্রিষ্টীয় নবম শতকের) একজন বিজ্ঞানী। আন্দালুসে যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকেন তিনি ছিলেন তাদের প্রথম সারির অন্যতম ব্যক্তি। আমাদের জন্য আরও একটি ব্যাপার জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামি বিশ্ব এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে—তা যতটাই অভিনব হোক—কখনো প্রত্যাখ্যান করেনি এবং বিরোধিতাও করেনি। তা ছাড়া যারা কিছুটা বিরোধিতা করতেন, তারাও স্বাভাবিক সীমারেখার বাইরে গিয়ে বিরোধিতা করতেন না। এখানে আমাদের সংগত কারণেই এ কথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, এই সময় থেকে ইউরোপে পাঁচশ বছরব্যাপী জ্ঞানের বিকাশ ছিল রক্তে প্লাবিত, আগুনে দগ্ধ ও ইনকুইজিশনের নির্যাতনের শিকার।

ইবনে হায্ম আল-আন্দালুসি ও পৃথিবীর গোলাকৃতি

এখানে আমাদের এ কথা বলে রাখাও সংগত যে, ইসলামি ধর্মীয় জ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড়াতে পারেন না। তারা ইসলামে এমন শিক্ষা পান যা জ্ঞানগত সত্যকে সমর্থন করে এবং সত্য অস্বীকারকারীদের বিরোধিতা করে। যেমন ইবনে হায্ম আল-আন্দালুসি পৃথিবীর গোলাকৃতির ব্যাপারে মুসলিম ইমাম ও মনীষীদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, পৃথিবী যে গোলাকার সে ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে এবং এই প্রমাণগুলো সঠিক। তবে এর বিপরীত ছিল সাধারণ মানুষের বক্তব্য। (সাধারণ মানুষের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে) আমাদের জবাব এই যে—আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা—মুসলিম মনীষীদের কেউই, যারা এমনকি 'জ্ঞানের ইমাম' উপাধি ধারণের হকদার, পৃথিবীর গোলকাকৃতিকে অস্বীকার করেননি। তাদের কেউই এই বক্তব্যের সমর্থনে নিজেদের পক্ষ থেকে একটি শব্দও খরচ করেননি। বরং কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই পৃথিবীর গোলকাকৃতির ও ঘূর্ণনের ব্যাপারে বহু প্রমাণ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾

তিনি রাতের দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে আচ্ছাদিত করেন রাতের দ্বারা।[৩৯১]

এদের একটি যে আরেকটিকে পেঁচিয়ে রয়েছে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এটি। كوّر العمامة (সে পাগড়ি পেঁচালো) ধাতু থেকে কথাটি এসেছে। পেঁচানোই পাগড়ি বাঁধার প্রক্রিয়া এবং গোলকাকার বস্তুতেই পেঁচানো হয়। পৃথিবীর গোলকাকৃতির ব্যাপারে এটা স্পষ্ট দলিল...।[৩৯২]

আল-ইদরিসি ও পৃথিবীর গোলাকৃতি

শরিফ আল-ইদরিসি যা বলেছেন, নিশ্চয় পৃথিবী বলের গোলকাকৃতির মতো গোলকাকার। পানি তার সঙ্গে এঁটে রয়েছে এবং প্রাকৃতিকভাবেই তার ওপর স্থির রয়েছে ও পড়ে যাচ্ছে না। জলসহ পৃথিবী রয়েছে মহাকাশের অভ্যন্তরীণ শূন্যতায়, যেমন ডিমের অভ্যন্তরে থাকে কুসুম। জলসহ পৃথিবীর অবস্থান মধ্যবর্তী এবং বাতাস (অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল) তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে।[৩৯৩]

আল-ইদরিসি যেসব মানচিত্র এঁকেছিলেন তার সম্পর্কে উইল ডুরান্ট বলেছেন, এসব মানচিত্র মধ্যযুগে মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যার (cartography) শ্রেষ্ঠ ফসল। তার পূর্বে এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ, এর চেয়ে সূক্ষ্ম, এর চেয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপক মানচিত্র কোথাও অঙ্কন করা হয়নি। অধিকাংশ মুসলিম বিজ্ঞানী যেমন পৃথিবীর গোলকাকৃতির বিষয়টিকে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, আল-ইদরিসিও তা-ই করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এটি বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত সত্য।[৩৯৪]

---

৩৯১. সুরা যুমার : আয়াত ৫।

৩৯২. ইবনে হাযম আল-আন্দালুসি, الفصل في الملل والأهواء والنحل, খ. ২, পৃ. ৭৮।

৩৯৩. আল-ইদরিসি, نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق, পৃ. ৭।

৩৯৪. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৮।

চিত্র নং-১১
ইদরিসি কৃত পৃথিবীর মানচিত্র

এতকিছুর পরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কিছু আরবি গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র এখনো পশ্চিমা তথ্যসূত্র থেকে নকল করে প্রচার করে যাচ্ছে যে পৃথিবীর গোলকাকৃতির তত্ত্বের সঙ্গে মুসলিমদের পরিচয় ছিল না। বরং কোপার্নিকাসের কল্যাণেই এ তত্ত্বটি ঘোষিত হয়। আপনি এখন কোপার্নিকাসের মৃত্যুতারিখ (১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) আমাদের আলোচিত মুসলিম বিজ্ঞানীদের মৃত্যুতারিখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, কে কাদের থেকে এই তত্ত্ব গ্রহণ করেছে সেই সত্য প্রতিভাত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট!

খলিফা আল-মামুন এবং পৃথিবীর আয়তনের পরিমাপ

মুসলিমরা যে পৃথিবীর গোলকাকৃতির বিষয়টি প্রমাণ করেছিলেন তার কৃতিত্ব দেওয়া হয় আব্বাসি খলিফা আল-মামুনকে (মৃ. ২১৮ হি./৮৩৩ খ্রি.)। তিনিই প্রথম ভূ-গোলকের আয়তন (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ) পরিমাপের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই কাজে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ও ভূগোলবিদদের দুটি দলকে নিযুক্ত করেন। একটি দলের নেতৃত্বে থাকে

গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী সিন্দ ইবনে আলি[৩৯৫] এবং অপর দলটির নেতৃত্বে থাকেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ আলি ইবনে ঈসা আল-আস্তুরলাবি[৩৯৬]। (এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, দুটি দলের একটির নেতৃত্বে ছিলেন বানু মুসা ইবনে শাকির বা মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা।) খলিফা তাদের দুইজনের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তারা দুইজন পৃথিবীর পরিধির মহাবৃত্তের পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি ভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে যাবেন এবং উভয়েই দ্রাঘিমারেখার এক ডিগ্রি পরিমাণ পরিমাপ করবেন (যে দ্রাঘিমারেখা ৩৬০ ডিগ্রি হবে)। ইবনে খাল্লিকান বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক দলই একটি বিস্তৃত সমতল ভূখণ্ড বেছে নেয়, ভূখণ্ডের একটি স্থানে একটি কীলক স্থাপন করে। তারপর ধ্রুবতারাকে[৩৯৭] স্থির বিন্দু ধরে নিয়ে কীলক ও ধ্রুবতারা এবং ভূমির মধ্যে কোণ নির্ণয় করে। তারপর উত্তর দিকে এমন জায়গায় এগিয়ে যায় যেখানে ওই কোণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

৩৯৫. সিন্দ ইবনে আলি : আবু তাইয়িব সিন্দ ইবনে আলি আল-ইয়াহুদি (মৃ. ২৫০ হি./৮৬৪ খ্রি.)। প্রখ্যাত মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অনুবাদক, গণিতজ্ঞ ও প্রকৌশলী। খলিফা আল-মামুনের দরবারে আসেন এবং তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তারকা-সারণি জিজ আল-সিন্দহিন্দ (Zij al-Sindhind) অনুবাদ ও সম্পাদনার জন্য পরিচিতি লাভ করেন। একজন গণিতবিদ হিসাবে সিন্দ ইবনে আলি আল-খাওরিজমির সহকর্মী ছিলেন। পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ كتاب المنفصلات والمتوسطات في النجوم والحساب। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৫, পৃ. ২৪২।

৩৯৬. আলি ইবনে ঈসা আল-আস্তুরলাবি ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ। বাগদাদে বসবাস করতেন। খলিফা আল-মামুনের বিজ্ঞান পরিষদে ছিলেন।

৩৯৭. ধ্রুবতারা (Pole star) : পৃথিবীর উত্তর মেরুর অক্ষ বরাবর দৃশ্যমান তারা ধ্রুবতারা নামে পরিচিত। এই তারাটি পৃথিবীর অক্ষের উপর ঘূর্ণনের সঙ্গে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আবর্তিত হয়। প্রাচীন কালে দিগ্নির্ণয়যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে সমুদ্রে জাহাজ চালানোর সময় নাবিকেরা এই তারার অবস্থান দেখে দিগ্নির্ণয় করত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রথম দুটি তারা, পুলহ এবং ক্রতুকে সরলরেখায় বাড়ালে তা এ তারাটিকে নির্দেশ করে। এটি লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডলে দেখা যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দৃশ্যমান সকল তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। শুধু ধ্রুবতারাই মোটামুটি একই স্থানে দৃশ্যমান থাকে। এটি আকাশের একমাত্র তারা, যেটিকে এ অঞ্চল হতে বছরের যেকোনো সময়েই ঠিক এক জায়গায় দেখা যায়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ থেকে ধ্রুবতারাকে সারা বছরই আকাশের উত্তরে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যায়। দিগ্নির্ণয়ে এই তারা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বাংলাদেশের আকাশে ধ্রুবতারাকে বেশি উঁচুতে দেখা যায় না। ঢাকা থেকে ধ্রুবতারার উচ্চতা ২৩ ডিগ্রি ৪৩ মিনিট। দিগ্বলয় থেকে আকাশের প্রায় চারভাগের একভাগ উঁচুতেই এই তারাটির মতো উজ্জ্বল আর কোনো তারা নেই বলে একে চিনতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। তবে বাংলাদেশ থেকে যতই উত্তরে যাওয়া যাবে, ধ্রুবতারাকে ততই ওপরে দেখা যাবে। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

তারপর উভয় দল কীলক দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করে। তারা ভূমির ওপর দূরত্ব পরিমাপ করত কীলকের ওপর বাঁধা রশির দ্বারা।[৩৯৮]

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ভূ-গোলকের আয়তন পরিমাপের ফল ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সামসময়িক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অধিকতর নিকটবর্তী। খলিফা আল-মামুন উভয় দলের নির্ণীত পরিমাণের গড় হিসাব গ্রহণ করেন এবং দেখেন যে এটা ৫,৬৬৬ মাইলের কাছাকাছি। আর সামসময়িক বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে এটা ৫,৬৯৩ মাইল। আল-মামুনের এই পরিমাপ অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি হলো ২০,৪০০ মাইল, অর্থাৎ, প্রায় ৪১,২৪৮ কিলোমিটার। আধুনিক কালে স্যাটেলাইটের দ্বারা পরিমাপকৃত পৃথিবীর পরিধি হলো ৪০,০৭০ কিলোমিটার। আপনি আল-মামুনের নিযুক্ত দল দুটির পরিমাপ ও আধুনিক স্যাটেলাইটের পরিমাপ মিলিয়ে দেখুন, দেখবেন, উভয় পরিমাপের মধ্যে ভুলের পরিমাণ ৩%-এরও কম! নিশ্চয় এটি গৌরব করার মতো বিষয়।[৩৯৯]

টলেমির *জিয়োগ্রাফি* (*Geography of Claudius Ptolemy*) অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ, যার ওপর মুসলিমরা তাদের ভৌগোলিক বিদ্যার ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বলতে গেলে এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা মুসলিমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে। এর সঙ্গে অবশ্য আরেকটি গ্রন্থ ছিল, সেটির রচয়িতা হলেন মারিনুস অফ টায়ার[৪০০]; তবে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত কম।[৪০১]

মুসলিমরা পূর্ববর্তীদের ভ্রান্তি সংশোধন করলেন

টলেমি তার মানচিত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ধারণে যেসব ভুল করেছিলেন মুসলিম ভূগোলবিদেরা তার সংশোধন করেন। তার এসব ভ্রান্তির মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্যসীমা

---

৩৯৮. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১৬২।

৩৯৯. এই বিষয়ে দেখুন, *Johannes Willers*, *Schätze der Astronomie*, আরবি অনুবাদ, كنوز علم الفلك, পৃ. ২৫।

৪০০. মারিনুস অফ টায়ার (Marinus of Tyre) : টায়ার-এর আরবি নাম সুর। এটি ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি শহর। সিরিয়ায় খ্রিষ্টপূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সময়ে তিনি সুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবৎকাল খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ থেকে নিয়ে দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত (৭০-১৩০ খ্রিষ্টাব্দ)। টলেমি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি মারিনুসের শিষ্য ছিলেন। মারিনুস অফ টায়ারের উল্লেখযোগ্য রচনা হলো '*তাসহিহুল জুগরাফিয়া*'।

৪০১. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৯০।

নির্ধারণে অনেক বেশি অতিরঞ্জিত করেন এবং তার পরিচিত পৃথিবীর আবাদিত অংশের বিস্তৃতি নির্ধারণেও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যান। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে হ্রদ বলে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশ করেন তখন এই কাজটি করেন। সাইলোন দ্বীপের (শ্রীলংকার) আয়তন নির্ধারণেও তিনি অতিরঞ্জিত করেন। কাস্পিয়াস সাগর ও পারস্য উপসাগরের অবস্থান নির্ধারণে তিনি মারাত্মক ভুল করেন। মুসলিমরা এসব ভ্রান্তিসহ অন্যান্য ভ্রান্তিরও সংশোধন করেন। তারপর মুসলিমরা পৃথিবীকে তাদের বর্ণনামূলক মানচিত্র উপহার দেন, কমপক্ষে পাঁচ শতাব্দী ধরে ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের বহু দল এটির চূড়ান্ত রূপদানে অংশগ্রহণ করেন। এই মানচিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তারা এমন অনন্য কীর্তি রেখে যান, মধ্যযুগে যার কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি।[৪০২]

টলেমি যেসব শহরের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করেছিলেন তার অধিকাংশেরই বাস্তবিক অবস্থানের সঙ্গে মোটেই মিল ছিল না। কেবল ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণে তার ভ্রান্তির পরিমাণ হলো চারশ ফারসাখ (তিনি একে চারশ ফারসাখ বাড়িয়ে দেখান)।

আরবদের হাতে ভূগোলবিদ্যার কী পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য গ্রিকদের নির্ণীত জায়গাগুলোর সঙ্গে আরবদের নির্ণীত জায়গাগুলোকে মিলিয়ে দেখাই যথেষ্ট।[৪০৩]

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণ

মুসলিমরাই প্রথম ভূ-গোলকের মানচিত্রের ওপর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণ ও অঙ্কন করেন। প্রথম যিনি দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখা নির্ধারণ করেন তিনি হলেন আবু আলি আল-মুররাকুশি[৪০৪]। তার এ কাজের

---

৪০২. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৯০-৩৯৩।

৪০৩. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৬৮।

৪০৪. আবু আলি আল-হাসান ইবনে আলি ইবনে আল-মুররাকুশি (মৃ. ৬৬০ হি./১২৬২ খ্রি.)। মরোক্কান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ভূগোলবিদ এবং সূর্যঘড়িনির্মাতা। ত্রিকোণমিতিতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ত্রিকোণমিতিতে তিনি নতুন রীতির প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম সাইন, কোসাইন ইত্যাদি ব্যবহার করেন এবং সাইন-সারণি তৈরি করেন। বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করেন। ২৪০টিরও বেশি নক্ষত্র চিহ্নিত করে তাদের বর্ণনা দেন। সমান সময় নির্দেশ রেখা ব্যবহার করেন। বিভিন্ন ভৌগোলিক ত্রুটি সংশোধন করেন এবং মরক্কোর মানচিত্র নতুনভাবে অঙ্কন করেন। জর্জ সার্টন বলেছেন, আল-মুররাকুশি প্রথম কোণের সাইন এবং ৯০

পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। যাতে মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নামাযের জন্য সমান সময় নির্ধারণ করতে পারেন। আল-বিরুনিই প্রথম ভূ-গোলককে সমতলে রূপান্তরের (সমতলকরণের) গাণিতিক নীতি প্রস্তুত করেন। এটি হলো রেখা ও চিত্রকে গোলক থেকে সমতলে রূপান্তর করা এবং সমতল থেকে গোলকে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। তিনি এই গাণিতিক নীতি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ভৌগোলিক মানচিত্র অঙ্কন সহজ করে তোলেন।[৪০৫]

পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতা সম্পর্কে গবেষণা

যে সময়টাতে বিশ্বে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে পৃথিবী হলো গোলকাকার এবং ভূ-গোলকের নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মানতার বিষয়ে কেউ আলোচনাও করত না, সেই সময়ে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে) তিনজন মুসলিম বিজ্ঞানী পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতা ও আবর্তনের বিষয়টিকে আলোচনায় নিয়ে আসেন। তারা হলেন কাযভিনের আলি ইবনে উমর আল-কাতিবি[৪০৬], আন্দালুসের কুতুবুদ্দিন আশ-শিরাজি এবং সিরিয়ার আবুল ফারজ আলি। মানবেতিহাসে তারাই প্রথমবার পৃথিবী যে নিজ কক্ষপথে সূর্যের সামনে প্রতি দিনে-রাতে একবার ঘোরে সেই সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেন। এই বিজ্ঞানীত্রয় সম্পর্কে জর্জ সার্টন বলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই তিনজন বিজ্ঞানী যে গবেষণা করেন তা বিফলে যায়নি। বরং তা নিকোলাস কোপার্নিকাসের গবেষণায় অন্যতম অনুঘটক হিসেবে প্রভাব রেখেছে। এই গবেষণা থেকেই কোপার্নিকাস ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে (পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতার) তাত্ত্বিক কাঠামো প্রকাশ করেন।[৪০৭]

ডিগ্রির পূরকের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন। جامع المبادئ والغايات في علم الميقات তার বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন জে জে সিডিও এবং প্রকাশ করেন তার ছেলে লুইস সিডিও।

৪০৫. ড. আবদুর রহমান হামিদাহ, *আলামুল জুগরাফিয়িনাল আরব*, পৃ. ৪৫৯।

৪০৬. আলি ইবনে উমর আল-কাতিবি : নাজমুদ্দিন আলি ইবনে উমর ইবনে আলি আল-কাতিবি আল-কাযবিনি (৬০০-৬৭৫ হি./১২০৩-১২৭৭ খ্রি.)। প্রজ্ঞাবান ও যুক্তিবিদ। নাসিরুদ্দিন আত-তুসির শিষ্য। তার বহু রচনা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো '*আশ-শামসিয়্যাহ*' ও '*হিকমাতুল আইন*'। দেখুন, সাফাদি, আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত, খ. ২১, পৃ. ২৪৪।

৪০৭. জর্জ সার্টন, *Introduction to the History of Science*, খ. ১, পৃ. ৪৬।

ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা

ভূগোলবিদ্যায় ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানীরা প্রকৃত অর্থেই বহু ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইয়াকুত হামাবির রচনা *মুজামুল বুলদান*। এই বিশ্বকোষ সম্পর্কে উইল ডুরান্ট বলেন, এটি একটি বৃহদাকার ভৌগোলিক বিশ্বকোষ; তিনি এতে মধ্যযুগের যাবতীয় পরিচিত ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, মানব-ভূগোলবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে মধ্যযুগে পরিচিত তথ্যের একটিকেও তিনি বাদ দেননি, বরং প্রতিটি তথ্যকে তার এই বিশ্বকোষে সংকলন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি শহরগুলোর তুলনামূলক আয়তন এবং সেগুলোর গুরুত্ব, এসব শহরে বসবাসকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম ইত্যাদিকে স্থান দিয়েছেন। এই মহান জ্ঞানী পৃথিবীকে যতটা ভালোবেসেছেন, অন্য কেউ ততটা ভালোবেসেছেন বলে আমাদের জানা নেই।[৪০৮]

গুস্তাভ লি বোঁ বলেছেন, ভূগোলবিদ্যার ওপর আরবদের রচিত যেসব গ্রন্থ আমরা পেয়েছি তার গুরুত্ব অপরিসীম। এসব গ্রন্থের কয়েকটি ইউরোপে বহু শতাব্দীব্যাপী ভূগোলবিদ্যার পঠনপাঠনের মৌলিক ভিত্তি ছিল।[৪০৯]

লি বোঁ আরও বলেন, শরিফ আল-ইদরিসি পৃথিবীর যে-মানচিত্র অঙ্কন করেন তার চিত্র আমি প্রকাশ করেছি। এই মানচিত্রে নীলনদ ও বড় বড় ট্রপিক্যাল লেকের উৎস সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে। এসব স্থান সম্পর্কে ইউরোপীয়রা এই আধুনিক কালের আগ পর্যন্ত কোনো সন্ধান পায়নি। আল-ইদরিসির এই মানচিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তার এই মানচিত্রে প্রমাণিত হয় যে, মহা-আফ্রিকার ভূগোল সম্পর্কে আরবদের জ্ঞান ছিল দীর্ঘকাল ধরে যা ধারণা করা হতো তার চেয়ে অনেক বেশি।[৪১০]

---

৪০৮. উইল ডুরান্ট, *'কিস্সাতুল হাদারাহ'*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৭।
৪০৯. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৬৯।
৪১০. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৭০।

ইসলামি মানচিত্রাবলি এবং সমুদ্রবিজ্ঞানের ওপর মুসলিমদের রচনাবলি পাশ্চাত্য নৌ-চলাচলবিদ্যার অগ্রগতিতে পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪১১]

সামুদ্রিক অভিযান ও আমেরিকা আবিষ্কার

মুসলিমদের সামুদ্রিক অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হলো আমেরিকা আবিষ্কার। যার কৃতিত্ব দেওয়া হয় ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে[৪১২] যে, তিনি ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। মুসলিমরা পৃথিবীর গোলকাকৃতির বিষয়টি ঘোষণা করলেন এবং তা গাণিতিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দলিল-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত করলেন। তারপর তাদের রচনাসমূহে এমন ইঙ্গিত প্রকাশ পেতে শুরু করল যে, ভূ-গোলকের অপর পৃষ্ঠে অবশ্যই আবাদিত জনপদ রয়েছে, যা এখনো অনাবিষ্কৃত। এই তাত্ত্বিক ধারণার একটি ভিত্তি ছিল। তা এই যে, এটা কখনো বোধগম্য নয় যে পৃথিবীর একটি পৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ এবং অপর পৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে জলভাগ। কারণ তা পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করবে এবং তার ঘূর্ণায়মানতা ও আবর্তনের শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাবে।[৪১৩]

আল-বিরুনি প্রথম এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং তার গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভৌগোলিক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু হয়। বড় বড় মুসলিম ভূগোলবিদদের রচনাবলিতে এসব অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আল-মাসউদি[৪১৪] কর্তৃক রচিত *'মুরজুয-যাহাব ওয়া*

---

[৪১১]. মার্টিন প্লেসনার, *মাবহাসুল উলুম*, যোসেফ শাখ্ত (Joseph Franz Schacht) ও ক্লিফোর্ড বসওর্থ (Clifford Edmund Bosworth) কর্তৃক সম্পাদিত *The Legacy of Islam*, আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام, খ. ২, পৃ. ১৫৪।

[৪১২]. ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬ খ্রি.) বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকা, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করা হয়। তিনি প্রচণ্ড ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্পেনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪১৩]. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

[৪১৪]. আল-মাসউদি : আবুল হাসান আলি ইবনুল হুসাইন ইবনে আলি (২৮৩-৩৪৬ হি./৮৯৬-৯৫৭ খ্রি.)। ইতিহাসবিদ, পর্যটক, অনুসন্ধানী। বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন, কায়রোতে বসবাস করতেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। مروج الذهب ومعادن الجوهر তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২১, পৃ. ৬-৭; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২৭৭।

মাআদিনুল জাওহার' এবং শরিফ আল-ইদরিসি কর্তৃক রচিত '*নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক*' ইত্যাদি।

বিদ্যমান তথ্য থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে যে, খাশখাশ ইবনে সাইদ আল-বাহরি নামের একজন আরব আন্দালুসীয় নাবিক ২৩৫ হিজরিতে (৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে) তার নৌযান চালিয়ে লিসবন থেকে পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগরে এগিয়ে যান। তিনি সাগরে একটি আবাদিত দ্বীপ আবিষ্কার করেন, যেখানে বহু বাসিন্দা রয়েছে। তিনি তাদের থেকে উপঢৌকন এনে আন্দালুসের শাসক দ্বিতীয় আবদুর রহমানের সামনে পেশ করেন। পুরস্কারস্বরূপ আবদুর রহমান খাশখাশকে ইসলামি নৌবহরের আমির নিযুক্ত করেন। এই নাবিক পরে ভাইকিংদের[৪১৫] সঙ্গে একটি সমুদ্রযুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।[৪১৬] তিনিই আমেরিকার আবিষ্কারক হিসেবে প্রতীয়মান হন।

বিদ্যমান তথ্যে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিম আফ্রিকার (মরক্কোর) আরবদের একটি দল আটলান্টিক মহাসাগরে বেরিয়ে ওই দ্বীপে যায়। এটা হিজরি চতুর্থ শতক এবং খ্রিষ্টীয় দশম শতকের ঘটনা। কিন্তু তাদের কেউই ফিরে আসে না এবং তাদের সম্পর্কে কোনো সংবাদও জানা যায় না। তারপর তাদের ঘিরে 'অভিযাত্রী যুবকেরা' (قصة الفتية المُغَرَّرِين) নামে একটি গল্প তৈরি হয়। অভিযাত্রী যুবকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আল-মাসউদি ও আল-ইদরিসি। এই গল্প থেকে জানা যায় যে, লিসবন শহরে আটজন আরব যুবক আটলান্টিক মহাসাগরে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সবাই ছিল একটি নাবিক পরিবারের সদস্য। তারা ওই দ্বীপটি খুঁজে বের করতে চায় যেখানে তাদের পূর্বসূরিরা গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং যাদের সম্পর্কে কোনো সংবাদ জানা যায়নি। ফলে শহরবাসী তাদের 'অভিযাত্রী তরুণদল' (الفتية

---

৪১৫. ভাইকিং (Viking) বলতে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সমুদ্রচারী ব্যবসায়ী, যোদ্ধা ও জলদস্যুদের একটি দলকে বোঝায়, যারা ৮ম শতক থেকে ১১শ শতক পর্যন্ত ইউরোপের এক বিরাট এলাকাজুড়ে লুটতরাজ চালায় ও বসতি স্থাপন করে। এদেরকে নর্সম্যান বা নর্থম্যানও বলা হয়। ভাইকিংরা পূর্ব দিকে রাশিয়া ও কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌছেছিল।

৪১৬. আল-মাসউদি, *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ১, পৃ. ১১৯।

المغررين) উপাধিতে আখ্যায়িত করে। এখানে المغرر শব্দটা এসেছে الغُرَة ধাতু থেকে, যার অর্থ অগ্রযাত্রা বা অভিযাত্রা। শব্দটি الغرور ধাতু নিষ্পন্ন المغرورين (আত্মপ্রবঞ্চিত) নয়, যদিও কোনো কোনো তথ্যসূত্রে এ শব্দটিই রয়েছে। আল-মাসউদি তার *'মুরুজুয-যাহাব'* গ্রন্থে 'যারা আটলান্টিক মহাসাগর ভ্রমণে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল ও যারা ধ্বংস হয়েছিল এবং তারা যা দেখেছিল সেই সম্পর্কিত সংবাদ' (أخبار من خاطر بنفسه في ركوبه -أي المحيط الأطلسي- ومن نجا منهم ومن تلف، وما شاهدوا منه وما رأوا) শিরোনামে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আল-ইদরিসিও এই গল্পের অবতারণা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই আটজন যুবক আন্দালুসে ফিরে এলে লিসবনের বাসিন্দারা তাদের ঘিরে ধরে। নানা ধরনের সাজসজ্জা ও আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে তাদের অভিনন্দন জানায়। এই যুবকেরা যে সড়কে বসবাস করত সেই সড়কের নাম দেয় 'অভিযাত্রী তরুণদের সড়ক'। এটা খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ দিকের ঘটনা। তারপর লিসবনে এই নামটি কয়েকশ বছর ধরে পরিচিত ছিল।-অনুবাদক

আবু উবাইদুল্লাহ আল-আন্দালুসি

আবু উবাইদুল্লাহ আল-বাকরি আল-আন্দালুসি (মৃ. ৪৮৭ হি.) তার *'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক'* গ্রন্থে লিসবনের আরব অভিযাত্রী যুবকদের কাহিনি উল্লেখ করেছেন, যারা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল। তিনি তাদের ফিরে আসার পরের কাহিনি উল্লেখ করেছেন। ফিরে এসে তারা জানায় যে, ওখানে তাদের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে তারা আরবিতে কথাবার্তা বলে। তারা ওই ভূমিখণ্ডের বর্ণনাও দেয়, সেটি ছিল ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কলম্বাসের আমেরিকায় পৌঁছার তিনশ বছর আগে থেকেই সেখানে মুসলিমরা ছিল।

শিহাবুদ্দিন আল-আরাবি আল-উমারি (১৩০০-১৩৪৯ খ্রি.) খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তার ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ *'মাসালিকুল আবসার ওয়া মামালিকুল আমসার'* রচনা করেন। এটি মোট ২৭ খণ্ডে

রচিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মালি সাম্রাজ্য ছিল ইসলামি শাসনাধীন, মানসা মুসা (মুসা অব মালি) তা শাসন করতেন। মানসা মুসা ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন আল-উমারির সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাকে মালির নবম সম্রাটের কাহিনি বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন মানসা মুসার বড় ভাই ও তার পূর্ববর্তী সম্রাট। তিনি আটলান্টিক মহাসাগরে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে শাসনকার্যই ছেড়ে দেন। আটলান্টিকের ওপারে কী রয়েছে তা তিনি দেখতে চান। এই সংকল্পে তিনি ২০০ জাহাজ ও ২০০০ নৌকা প্রস্তুত করেন। এগুলোতে শুকনো খাবার ও স্বর্ণ বোঝাই করেন। এটা কলম্বাসের আমেরিকায় পৌঁছার ১০০ বছর আগের ঘটনা।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, আমেরিকায় প্রকৃতপক্ষেই আফ্রিকান মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল। কলম্বাসের নিজের একটি পাণ্ডুলিপিতে মার্কিন ভূখণ্ডে আফ্রিকানদের উপস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তারা সোনা গলাত।-অনুবাদক

আরবরাই যে আমেরিকা আবিষ্কারে এগিয়ে ছিলেন তা-ই আন্দালুসের ভূগোলবিদদের রচনা থেকে স্পষ্ট হয়। ঐতিহাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানী আল-আব্ আনাসতাস মারি আল-কারমালির[৪১৭] বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি আরও জোরালো হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিমরা কলম্বাসের বহু পূর্বেই লিসবন থেকে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন। কারণ তারা আটলান্টিক মহাসাগরে উষ্ণ গলফ স্ট্রিম (Gulf Stream red—hot) সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতেন। তিনি বলেন, অন্যান্য সব জাতি থেকে আরব জাতিই এই স্ট্রিম ও তার বৈশিষ্ট্যাবলি জানার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। তা মেক্সিকো থেকে কীভাবে আয়ারল্যান্ডে যায় এবং আয়ারল্যান্ড থেকে কীভাবে মেক্সিকোতে ফিরে আসে সেই সম্পর্কে তাদেরই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান ছিল।[৪১৮]

---

৪১৭. আল-আব্ আনাসতাস মারি আল-কারমালি (Al-Ab Anastas Mari Al-Karmali) : তিনি বুতরুস জিবরাইল ইউসুফ আওয়াদ (১২৮৩-১৩৬৬ হি./১৮৬৬-১৯৪৭ খ্রি.) লেবানিজ খ্রিষ্টান পুরোহিত ও আরবি ভাষাবিজ্ঞানী সাহিত্যিক। আরবের দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আরবি ভাষাবিজ্ঞানে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ২৫।

৪১৮. الأب انستاس ماري الكرملي : عرف العرب أمريكا قبل أن يعرفها الغرب, আল-মুকতাতাফ সাময়িকীতে প্রকাশিত, সংখ্যা ১০৬। আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ তার أثر العرب في الحضارة الأوروبية বইতে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, পৃ ৪৭।

মুসলিমগণ আমেরিকার আবিষ্কারক, এ ব্যাপারে যা বলা হলো তার চেয়েও স্পষ্ট, বিস্ময়কর ও প্রভাবসঞ্চারী হলো ওই মানচিত্র যা জার্মান প্রাচ্যবিদ পল আর্নেস্ট কাহলে[৪১৯] তুরস্কের তোপকাপি প্যালেস গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করেছেন। কয়েক বছরব্যাপী আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই মানচিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। এই মানচিত্র বিজ্ঞানীদের মাথা খারাপ করে দেয়, গোটা বিশ্বকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে ফেলে। এই মানচিত্র ছিল তুর্কি মুসলিম ভূগোলবিদের রচিত, তিনি হলেন পিরি রেয়িস (Piri Reis)[৪২০]। তার পূর্ণনাম মুহিউদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ আর-রেয়িস। তিনি ছিলেন তুর্কি নৌবহরের অন্যতম নৌকমান্ডার। তিনি ছিলেন সেই সময়ের 'মাস্টার অফ দা সি'। তার মানচিত্রটি মূলত কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্রে বিভক্ত। এটি আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বাংশকে বর্ণনা করেছে, যেখানে রয়েছে স্প্যানিশ ও পশ্চিম আফ্রিকান উপকূলসমূহ। আপনি যদি এই মানচিত্রে আটলান্টিকের পশ্চিমাংশকে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, সেখানে রয়েছে আমেরিকান ভূখণ্ড, তার উপকূলসমূহ ও দ্বীপসমূহ, বন্দর ও জীবজন্তু। আরও রয়েছে রেড ইন্ডিয়ানদের চিত্র, তাদেরকে তিনি চিত্রিত করেছেন নগ্ন অবস্থায় এবং তারা মেষ চরাচ্ছে।

রুশ-সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ ও আরবি ভাষাবিদ ইগন্যাটি ইয়ুলিয়ানোভিচ ক্র্যাচকোভ্স্কি (Ignaty Yulianovich Krachkovsky) তার تاريخ الأدب الجغرافي العربي গ্রন্থে এই মানচিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, পিরি রেয়িস তার মানচিত্র কলম্বাসের মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন। তুর্কি নৌবহর ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে যখন ভেনেটিয়ান

---

৪১৯. পল আর্নেস্ট কাহলে (Paul Ernst Kahle 1875-1964) : বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ। মারবুর্গ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যের ভাষা শেখেন। প্রোটেস্ট্যান্ট যাজক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন রোমানিয়া ও কায়রোতে। কায়রোতে ভাষাতত্ত্বের ওপরও অধ্যয়ন করেন।

৪২০. পিরি রেয়িস : মুহিউদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ আর-রেয়িস (৮৭৭-৯৬২ হি./১৪৭০-১৫৫৫ খ্রি.)। উসমানি নৌসেনাপতি, নাবিক, ভূগোলবিদ ও মানচিত্রাঙ্কনবিদ। ১৫০০ সালে মাওদান সমুদ্রযুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিশ্বের দুটি মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *কিতাবু বাহরিয়্যাহ*।

নৌবহরকে পরাজিত করে এবং তাদের কয়েকটি জাহাজ আটক করে তখন হয়তো কলম্বাসের মানচিত্র পিরি রেয়িসের হাতে এসে থাকবে।[৪২১]
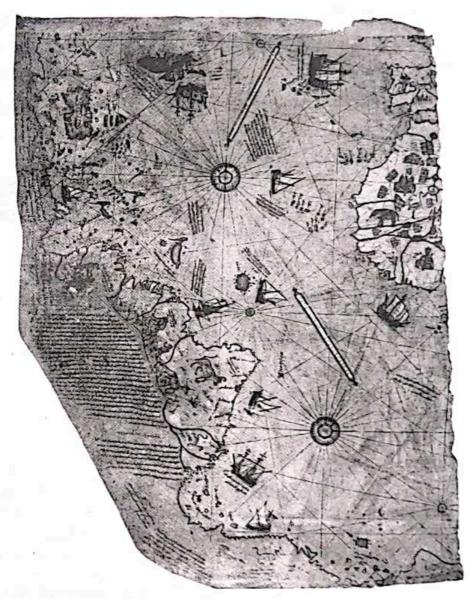
চিত্র নং-১২
মহিউদ্দিন আর-রেয়িসের মানচিত্র

কিন্তু অধিকাংশ গবেষকই ক্র্যাচকোভ্স্কির এই মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন। কারণ পিরি রেয়িসের মানচিত্রে এমন সব জায়গার বর্ণনা ছিল যা কলম্বাস জানতেনই না এবং তার সেগুলো আবিষ্কারেরও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এ সকল গবেষক বিকল্প বিচার-

---

৪২১. ক্র্যাচকোভ্স্কি, *তারিখুল আদাবিল জুগরাফিয়্যিল আরাবি*, খ. ২, পৃ. ৫৬২।

বিশ্লেষণ করেননি যার দ্বারা এই রহস্যময় মানচিত্রের রহস্য উন্মোচিত হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তা এই যে, ১৯৫২ সালে ব্রাজিলীয় নিউজপেপারগুলো একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, বিবৃতিটি দেন ড. জাগরিস, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব দা উইটওয়াটারস্র্যান্ড-এর সামাজিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার (social archaeological sciences) অধ্যাপক। (অ্যারাবিয়ান বিজনেস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী) বিবৃতিতে বলা হয়, ইতিহাসের গ্রন্থাবলি আমেরিকা আবিষ্কারের বিষয়টিকে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বড় ভুল করেছে। তার কারণ, কলম্বাসের কয়েকশ বছর পূর্বে প্রকৃতপক্ষে আরবরাই[৪২২] (আরব মুসলিমরাই) আমেরিকা আবিষ্কার করেছে।[৪২৩] অধ্যাপক ড. জাগরিসের ছয় বছরব্যাপী পরিচালিত গবেষণার ভিত্তি ছিল মানব-কাঠামো পরীক্ষানিরীক্ষা, যা ব্রাজিলীয় গ্রেনাডায় (Grenada) আবিষ্কৃত হয়েছিল।[৪২৪]

---

৪২২. প্রফেসর ইভান ভান সারটিমা (Ivan Van Sertima) তার ১৯৭৬ সালে রচিত *They Came Before Columbus : The African Presence in Ancient America* গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। কলম্বাসের নিজের কথা থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আরবরাই প্রথম আমেরিকায় পৌঁছেছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিশ্বাস করতেন ওই দ্বীপে যেসব রেড ইন্ডিয়ানদের দেখেছেন তারা মূলত আরব বংশোদ্ভূত, তার আগেই তারা ওখানে পৌঁছেছিল। আরবদের পাণ্ডুলিপি থেকেই তিনি এসব তথ্য জেনেছিলেন। ব্রিটিশ রয়াল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি The Discoverers নামে একটি ডকুমেন্টারি টিভি সিরিজ তৈরি করেছে। এখানে একটি পর্ব ছিল কেবল কলম্বাস ও তার আবিষ্কার সম্পর্কে। তা থেকে জানা যায় যে, তিনি আরবি ভাষা জানে এমন একজনকে তার সহযাত্রী মনোনীত করেছিলেন। অর্থাৎ লোকটা ছিল আরব বংশোদ্ভূত। তিনি এই লোককে দিয়ে রেড ইন্ডিয়ানদের সর্দারের কাছে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিটি ছিল আরবি ভাষায় লেখা। চিঠিতে কলম্বাস বলেন, হে মহামান্য, স্পেন ও ক্যাস্টাইল রাজ্যের রানি, রানি ইসবালে আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। তিনি স্পেন ও ক্যাস্টাইল রাজ্য এবং আপনার দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।-অনুবাদক

৪২৩. ড. আবদুর রহমান হামিদাহ, *আলামুল জুগরাফিয়্যিনাল আরব*, পৃ. ২২৫।

৪২৪. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, পৃ. ৫০০।

দক্ষিণ মেরুতে ষষ্ঠ মহাদেশ আবিষ্কার

মুহিউদ্দিন আর-রেয়িস (পিরি রেয়িস)-এর মানচিত্রে বিস্ময়কর এমন কিছু ছিল, যার ফলে তা মহাকাশ ভ্রমণ ও স্যাটেলাইট থেকে পৃথিবীর ছবি উত্তোলনের যুগ শুরু হওয়ার পরও বিজ্ঞানীদের স্বাভাবিকভাবেই ব্যস্ত রেখেছে। বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা ও ইউরোপে মানচিত্রাঙ্কনবিদদের প্রথম বিশ্বাস ছিল যে পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলো ততটা সূক্ষ্ম ও যথার্থ নয়, বরং এর চিত্রাঙ্কনে বেশ ভুলত্রুটি রয়েছে। মার্কিন উপকূলীয় অঞ্চল সম্পর্কে তাদের সর্বশেষ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এমনই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু যখন প্রথমবার স্যাটেলাইট থেকে এসব অঞ্চলের ছবি তুলে তা প্রকাশ করা হয় তখন তারা বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কারণ তারা এতদিন পর্যন্ত যা ভেবেছেন ও চিন্তা করেছেন মুহিউদ্দিন আর-রেয়িসের মানচিত্রই তার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম ও যথার্থ! তা পরিপূর্ণরূপেই স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত ছবিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ! বরং তাদের তথ্যাবলিই ভুল। এর ফলে নাসায় (ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) একদল বিজ্ঞানী মুহিউদ্দিন আর-রেয়িসের মানচিত্রগুলোর পুনর্নিরীক্ষণ করেন, সেগুলো বারবার বড় করে দেখেন। এবার তারা দ্বিতীয়বারের মতো বিমূঢ় হন। কারণ মুহিউদ্দিন আর-রেয়িস তার মানচিত্রে দক্ষিণ মেরুতে ষষ্ঠ মহাদেশ নির্দেশ করেছেন, যার নাম এন্টার্কটিকা (Antarctica)। এটি তাদের এন্টার্কটিকা আবিষ্কারের দুইশ বছরেরও আগের ঘটনা। মুহিউদ্দিন আর-রেয়িস এন্টার্কটিকার পাহাড়সমূহ ও উপত্যকাসমূহের বর্ণনাও দিয়েছেন, যেগুলো ১৯৫২ সালের আগ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

পিরি রেয়িসের মানচিত্রের সূক্ষ্মতা ও যথার্থতা

সুইস লেখক এরিক ফন দানিকেন (Erich von Däniken) *Zuvi Chariots of the Gods? Unsolved Mysteries of the Past* নামক বইয়ে[৪২৫] বলেছেন, পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলো মার্কিন মানচিত্রাঙ্কনবিদ ও নাবিক আর্লিংটন ম্যালেরির (Arlington H. Mallery) কাছে পেশ করা হয়। তিনি মানচিত্রগুলোর সূক্ষ্ম পরীক্ষানিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণের

---

৪২৫. বইটির ইংরেজি অনুবাদ, *Memories of the Future: Unsolved Mysteries of the Past*. মূল জার্মান থেকে বইটির অনুবাদ করেছেন মাইকেল হেরন।

পর সিদ্ধান্ত দেন যে, এগুলো (আমেরিকা-সম্পর্কিত) যাবতীয় ভৌগোলিক তথ্য ও বাস্তবতাকে ধারণ করেছে। তবে তার সন্দেহ থেকে যায় যে, এখানে একটি ভুল থেকে গেছে অথবা কোনো কোনো স্থান-নির্দেশ যথার্থ হয়নি। ফলে তিনি মার্কিন নৌবহরের হাইড্রোগ্রাফিক ব্যুরোর মানচিত্রাঙ্কনবিদ মিস্টার ওয়ালটার্স (Mr. Walters)-এর শরণাপন্ন হন। তারা উভয়ে স্থান-নির্দেশক সংখ্যাঙ্কিত বর্গজালি তৈরি করেন এবং মানচিত্রগুলোকে একটি আধুনিক গ্লোবে রূপান্তরিত করেন। এভাবে তারা চাঞ্চল্যকর সব তথ্য আবিষ্কার করেন। মানচিত্রগুলো সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল। কেবল ভূমধ্যসাগর ও মৃতসাগরই নয়, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল এবং এন্টার্কটিকা সংলগ্ন অঞ্চলগুলোও পিরি রেয়িসের মানচিত্রে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মূলত ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র (Topographic Map), এতে বিস্ময়কর সূক্ষ্মতায় অঞ্চলগুলোর অভ্যন্তরীণ ভূ-সংস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে পাহাড়-পর্বত, পর্বতশৃঙ্গ, নদীনালা, মালভূমি ইত্যাদির স্পষ্ট ও নির্ভুল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেন এগুলোর চিত্র মহাকাশ থেকে ধারণ করা হয়েছে![৪২৬]

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন গ্রেট অবজারভেটরি ও মার্কিন সমুদ্র-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে একদল ভূগোলবিজ্ঞানী পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলোর ওপর অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালান। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার পর তারা দেখেন যে ষষ্ঠ মহাদেশ এন্টার্কটিকার চিত্র বিস্ময়কর পর্যায়ে বিশুদ্ধ ও যথার্থ। এমনকি আমাদের বর্তমান যুগেও যেসব স্থান পরিপূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয়নি তারও বর্ণনা রয়েছে পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলোতে! দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের পর্বতরাশির অস্তিত্ব ১৯৫২ সালের আগে আবিষ্কৃত হয়নি। এগুলো সবসময়ই পুরু বরফের স্তরে ঢাকা থাকে। আধুনিক মানচিত্রগুলোতে এসব পর্বত আবিষ্কার করা হয়েছে ইকো-সাউন্ডিং যন্ত্রপাতি (Echo-Sounding apparatus) ব্যবহার করে।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলোর ওপর অনুসন্ধান ও গবেষণা অব্যাহত রেখেছে। তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, দক্ষিণ মেরু অঞ্চল অর্থাৎ

---

[৪২৬]. এরিক ফন দানিকেন, *Chariots of the Gods?*, আরবি অনুবাদ, عربات الآلهة, অনুবাদক, আদনান হাসান, পৃ. ২৯।

এন্টার্কটিকার উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় মহাকাশযান থেকে ভূ-গোলকের যেসব চিত্র ধারণ করা হয়েছে তার সঙ্গে এসব মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহাকাশযান থেকে পাঁচ হাজার মাইলব্যাপী অঞ্চলের চিত্র ধারণ করা হয়েছে। তা ছাড়া তারা স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত চিত্রসমূহ ও পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস্য মিল খুঁজে পেয়েছেন![৪২৭]

স্পেন থেকে ভারত পর্যন্ত নৌপথ আবিষ্কার

আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি (মৃ. ১৪১৮) তার *সুবহুল আ'শা* গ্রন্থে ভারত মহাসাগরের সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগের বিষয়টি যথার্থভাবে বর্ণনা করেছেন। তার এই বক্তব্য থেকে মুসলিমরা যে ভাস্কো দা গামার[৪২৮] আগেই এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতেন তা স্পষ্ট হয়। তিনি আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে বলেছেন, এই মহাসাগর মরোক্কান উপকূল থেকে জিব্রাল্টার প্রণালির–যা আন্দালুস ও মরক্কোকে বিভক্ত করেছে–পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়েছে এবং বার্বারদের অঞ্চল লামতুনা মরুভূমি অতিক্রম করেছে। আল-কালকাশান্দি তারপর সমুদ্রপথের বর্ণনা দিয়েছেন, তারপর তা জিবালুল কামারের (Dhofar Mountains) পেছন দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়েছে। জিবালুল কামার থেকে মিশরের নীলনদের উৎস শুরু হয়েছে। এর আলোচনা পরে আসবে। এভাবে আটলান্টিক মহাসাগর ভূমি থেকে দক্ষিণমুখী হয়েছে এবং আরদু খারাব (ওয়াস্টল্যান্ড)-এর ওপর দিয়ে ও যান্‌জ (Zanj) দেশের পেছন দিয়ে (সহিলি উপকূলকে বামে রেখে) পূর্বদিকে এগিয়েছে, তারপর পূর্বে ও উত্তরে বিস্তৃত হয়ে ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৪২৯]

ইগন্যাটি ক্র্যাচকোভ্স্কি উল্লেখ করেছেন যে, একজন আরব নাবিক ভাস্কো দা গামা যে ভ্রমণ করেছেন সেই একই ভ্রমণ করেছেন ১৪২০ খ্রিষ্টাব্দে,

---

[৪২৭]. আহমাদ শাওকি আল-ফানজারি, http://www.islamset.com/arabic/asc/fangry1.html.

[৪২৮]. ভাস্কো দা গামা (১৪৬৯-১৫২৪ খ্রি.) ছিলেন পর্তুগিজ অনুসন্ধানকারী ও পর্যটক। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ইউরোপ থেকে ভারত আসেন। তার এই সমুদ্রপথ আবিষ্কার বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদে নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি ভারতের কোচিতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪২৯]. আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৩, পৃ. ২৩৭।

তবে উলটোপথে, তিনি ভারত মহাসাগরের একটি বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং আফ্রিকার চারপাশ ঘুরে আটলান্টিক মহাসাগরে মরক্কোর বন্দরে পৌঁছেন। এটি ভাস্কো দা গামার জন্মেরও ৪৭ বছর আগের ঘটনা।[৪৩০]

ভাস্কো দা গামা তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে, ভ্রমণকালে যে-সকল আরব নাবিকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তারা উন্নতমানের কম্পাস রাখতেন জাহাজের দিক-নির্দেশনার জন্য। তাদের সঙ্গে পর্যবেক্ষণযন্ত্রও থাকত, থাকত সামুদ্রিক মানচিত্রও। বিভিন্ন সময়ে তিনি তাদের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তাদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি আরব নাবিকদের কিছু মানচিত্র পর্তুগালের সম্রাট ম্যানুয়েলের (Manuel I of Portugal) কাছে পাঠিয়ে দেন। আরেকজন মুসলিম নাবিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তার নাম মুআল্লিম কানা। তিনি মালিন্ডির বাসিন্দা ছিলেন। তিনিই ভাস্কো দা গামার জাহাজকে মালিন্ডি[৪৩১] থেকে ভারতের কালিকোট বন্দরে পৌঁছে দেন। অন্যান্য তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি ভাস্কো দা গামার জাহাজ চালিয়ে নিয়ে আসেন তিনি হলেন আরব মুসলিম ভূগোলবিদ ও নাবিক ইবনে মাজেদ[৪৩২]। তিনিই কম্পাস আবিষ্কার করেছিলেন। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, পরবর্তী মুসলিমদের অঙ্কিত মানচিত্রগুলোতে—যেমন আল-মাসউদির মানচিত্র ও আল-ইদরিসির মানচিত্র—আফ্রিকাকে ঘিরে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের সংযোগ-ব্যবস্থার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এসব সামুদ্রিক অঞ্চল আরব নৌবহরের দ্বারা আবাদিত ছিল। এসব নৌবহর ভারত ও পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে যাওয়া-আসা করত।[৪৩৩]

ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের প্রচেষ্টা ও তাদের চারপাশের ভূ-অঞ্চল আবিষ্কারের যে কাহিনি তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়লে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তাদের সেসব প্রচেষ্টার ফল কত-না উজ্জ্বল, কত-না চমৎকার!

---

৪৩০. ক্র্যাচকোভ্স্কি, *তারিখুল আদাবিল জুগরাফিয়্যিল আরাবি*, খ. ২, পৃ. ৫৬৩।

৪৩১. মালিন্ডি উপসাগরের তীরবর্তী গালানা নদীর মুখে অবস্থিত একটি শহর।

৪৩২. ইবনে মাজেদ : আহমাদ ইবনে মাজেদ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাজদি (১৪৩২-১৪৯৮ খ্রি.)। উপাধি : সমুদ্রসিংহ ও ধাবমান নক্ষত্র। আরবের শ্রেষ্ঠ নাবিকদের অন্যতম। মানচিত্রাঙ্কনবিদ। নৌবিজ্ঞানী ও নৌ-ইতিহাসবিদ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২০০।

৪৩৩. বিস্তারিত দেখুন, হুসাইন মু'নিস, *আতলাসু তারিখিল ইসলাম*, পৃ. ১২ ও তার পরবর্তী।

আরবের গুরুত্বপূর্ণ ভূগোলবিদ ও তাদের রচিত গ্রন্থসমূহের পরিসংখ্যান ব্যাপক ও বিস্তৃত বর্ণনার দাবি রাখে। আবুল ফিদা[৪৩৪] একাই ষাটজন ভূগোলবিদের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তার পূর্বে।...ইউরোপীয়রা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইসলামের প্রতি (বিদ্বেষভাবাপন্ন) চিন্তাভাবনা আঁকড়ে ধরে লালন না করত, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে, তাহলে ইউরোপের ভূগোলবিদ্যার বড় বড় পণ্ডিতরা কেন মুসলিমদের অবদানকে অস্বীকার করে তার কারণ উদ্‌ঘাটন করা দুষ্কর হতো। তা সত্ত্বেও আরবরা যেসব বড় বড় কাজ করেছেন তা তাদের কদর ও মূল্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। কারণ আরবরাই প্রথম নিয়মতান্ত্রিক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করেছেন, যা মানচিত্রবিদ্যার প্রধান ভিত্তি।[৪৩৫]

এগুলোও আমাদের কথা নয়, বরং গুস্তাভ লি বোঁর কথা।

---

[৪৩৪] আবুল ফিদা : ইসমাইল ইবনে আলি ইবনে মাহমুদ ইবনে শাহেনশাহ (৬৭২-৭৩২ হি./১২৭৩-১৩৩১ খ্রি.)। আল-মালিক আল-মুআইয়াদ, হামার অধিপতি। ভৌগোলিক ইতিহাসবিদ। দখল ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানেও। تقويم البلدان ও المختصر في أخبار البشر তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৯, পৃ. ১০৪; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ৩১৯।

[৪৩৫]. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৭১।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞান মুসলিমদের কাছে অনেকাংশে তাদের ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। ভৌগোলিক অবস্থান ও ঋতুর ভিন্নতা অনুযায়ী নামাযের সময় নির্ধারণে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন পড়ে। কেবলার দিক নির্ধারণেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হতে হয়। রোযার সূচনা, হজ ও অন্যান্য বিষয়ের সময় নির্ধারণের জন্য চাঁদের চলাচলও পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়।

জ্যোতির্বিদ্যার ওপর কুরআনের গুরুত্বারোপ

কুরআনে অনেক আয়াত এসেছে যা মহাকাশ ও মানুষকে পরিবেষ্টনকারী মহাবিশ্ব সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি প্রদান করেছে। শুধু তাই নয়, কুরআন আকাশ ও জমিনে যা-কিছু রয়েছে তার ওপর অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করেছে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

তাদের জন্য রাত এক নিদর্শন, তা থেকে আমি দিবালোককে অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, তা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন

মনযিল।[৪৩৬] অবশেষে তা শুকনো বাঁকা পুরাতন খেজুরশাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।[৪৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾

তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চাঁদকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও (মাসসমূহের) হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ তা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এইসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। নিশ্চয় দিবস ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকি সম্প্রদায়ের জন্য।[৪৩৮]

তারপর কুরআন আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট তারকা ও নক্ষত্রের নাম ধরে তাদের উল্লেখ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ○ النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾

শপথ আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার, তুমি কি জানো রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কী? তা উজ্জ্বল নক্ষত্র![৪৩৯]

---

৪৩৬. مَنَازِل শব্দটি مَنْزِل শব্দের বহুবচন। আরবি জ্যোতির্বিজ্ঞানে চান্দ্রমাসকে ২৮টি মনযিলে ভাগ করা হয়েছে। চান্দ্রমাসের এই মনযিলকে বাংলায় তিথি বলে।

৪৩৭. সুরা ইয়াসিন : আয়াত ৩৭-৪০।

৪৩৮. সুরা ইউনুস : আয়াত ৫-৬।

৪৩৯. সুরা তারিক : আয়াত ১-৩।

তিনি আরও বলেন,

﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ﴾

আর এই যে, তিনি শিরা[৪৪০] নক্ষত্রের মালিক।[৪৪১]

আরও ব্যাপার আছে। কুরআন যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরেছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর অগাধ ও বিস্তৃত জ্ঞান থাকা ছাড়া কারও পক্ষে সেগুলো বোঝা বা সেগুলো ব্যাখ্যার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। ফলে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীদের মনোযোগ ও প্রযত্ন আবশ্যক করে তোলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলিমদের মনোনিবেশ

মুসলিমরা তাদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর শুরুতে পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর বিজ্ঞানীরা যে উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন তার ওপর নির্ভর করেছেন। প্রথমেই তারা গ্রিক, ক্যালডিয়ান (Chaldean), সুরয়ানি, পারসিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলোর অনুবাদ করেছেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রথম যে গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন সেটি হলো হার্মেস আল-হাকিম[৪৪২] কর্তৃক রচিত, অনূদিত গ্রন্থটির নাম '*মাফাতিহুন নুজুম*'। তারা গ্রিক ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন। এটা উমাইয়া খিলাফতের শেষ দিকের ঘটনা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর গ্রিক থেকে অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর মধ্যে আরও ছিল টলেমির *আল-মাজেস্ট* (*Almagest*)। আরবিতে এটির নাম হয় كتاب المجسطي। এটি জ্যোতির্বিদ্যা ও নক্ষত্ররাজির সঞ্চরণের ওপর রচিত। এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল আব্বাসি খিলাফতকালে।[৪৪৩]

---

৪৪০. শিরা একটি নক্ষত্রের নাম, একে একটি সম্প্রদায় পূজা করত। বাংলায় 'লুব্ধক', ইংরেজিতে 'Sirius'.

৪৪১. সুরা নাজম : আয়াত ৪৯।

৪৪২. হার্মেস আল-হাকিম (Hermes Trismegistus): একজন গ্রিক ব্যক্তিত্ব। সত্য ও কল্পকাহিনির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে তার ব্যক্তিত্ব।

৪৪৩. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৩৪৮।

মুহাম্মাদ মুসা ইবনে শাকির

আব্বাসি যুগে তিনজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। তারা বানু মুসা ইবনে শাকির (মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা) নামে পরিচিত। এই মুসা ইবনে শাকির ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। খলিফা আল-মামুনের দরবারে থাকতেন। তিনি মারা গেলে আল-মামুন তার পুত্রদের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নেন। তারা তখন ছোট ছিল। তিনি তাদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়াহইয়া ইবনে মানসুরের কাছে ন্যস্ত করেন। এই ছোট ছেলেরা যখন বড় হয়ে উঠছিল তখন আল-খাওয়ারিজমি বাগদাদের বাইতুল হিকমায় বসে টলেমির ভ্রান্তিগুলোর সংশোধন করছিলেন। তিনি তখন বাইতুল হিকমায় বিজ্ঞানী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এই ছোট শিশুরা যুবকে পরিণত হলে তাদের মধ্যে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির। খলিফা আল-মামুন তার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য বাগদাদের উপকণ্ঠে সবচেয়ে উঁচু স্থানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করে দেন। বাব আশ-শামাসিয়্যার কাছাকাছিই ছিল এটির অবস্থান। বৈজ্ঞানিকভাবে ও সূক্ষ্মরূপে নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণ ও বিস্ময়কর হিসাবনিকাশ তৈরির উদ্দেশ্যেই এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সে সময় গুনদেশাপুরেও[৪৪৪] একটি মানমন্দির ছিল। তিন বছর পর দামেশকের সন্নিকটে কাসিয়ুন পাহাড়ের ওপর আরেকটি মানমন্দির স্থাপন করা হয়। বাগদাদের মানমন্দিরকে এ দুটির সঙ্গে তুলনা করা হতো এবং এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারকা-সারণি তৈরির জন্য বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে কাজ করতেন। এসব তারকা-সারণির নাম হতো 'আল-মুজাররাবা' বা 'আল-মামুনিয়্যাহ'। এগুলো ছিল টলেমির প্রাচীন তারকা-সারণির সূক্ষ্ম ও যথার্থ সংস্কার।[৪৪৫]

খলিফা আল-মামুন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি দল নিযুক্ত করেন। তাদের অন্যতম ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির। বিজ্ঞানী দলটির কাজ ছিল মহাজাগতিক বস্তুরাশি পর্যবেক্ষণ করা ও এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করা, টলেমির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর পরীক্ষানিরীক্ষা

---

৪৪৪. ইরানের খুযিস্তানে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর। সাসানি সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল এই শহর। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চারও কেন্দ্র ছিল এটি।

৪৪৫. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ১১৮-১১৯।

করা এবং সৌর-কলঙ্ক (Sunspots) নিয়ে গবেষণা করা। তারা ভূ-গোলককে ভিত্তি ধরে নিয়ে একই সময়ে পালমিরা ও সিনজার থেকে সূর্যের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর (অক্ষাংশের ও দ্রাঘিমাংশের) ডিগ্রি পরিমাপ করতে শুরু করেন। তারা এই পর্যবেক্ষণ থেকে ডিগ্রি পরিমাপ করেন ৫৬.৭৫ মাইল। এটা আমাদের আধুনিক যুগের পরিমাপ থেকে আধা মাইল বেশি। এই ফলাফল থেকে তারা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেন প্রায় ২০,০০০ মাইল। আধুনিক যুগের হিসাব মতে তা ২১,৬০০ মাইল। এ সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত না হলে কোনোকিছুই গ্রহণ করতেন না। তারা তাদের গবেষণায় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করতেন।[৪৪৬]

প্রকৃত সফলতা হলো মুসলিমরা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর জ্ঞান সংরক্ষণ করেছেন এবং তাতে যা ভুলভ্রান্তি ছিল তা সংশোধন করেছেন। তা ছাড়া ওই জ্ঞানকে তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে বের করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ময়দানে নিয়ে এসেছেন। আরবরা জাহিলি যুগে যেসব কুসংস্কার ও মায়াবিদ্যায় বিশ্বাস করত তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেককিছু থেকে এই জ্ঞানকে পবিত্র করেছেন। প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে যখন জ্যোতিষতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে তার সমকালে আরবেও কুসংস্কার ও মায়াবিদ্যার বিস্তার ঘটে। ইসলামি শরিয়া জ্যোতিষতত্ত্বকে বাতিল করে দিয়েছে এবং একে অস্বীকার করেছে। বরং একে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এটাই হলো ইসলামি সভ্যতার প্রকৃত অবদান।

মানমন্দির নির্মাণ

মুসলিমরা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষায় কতটা মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার জোরালো প্রমাণ মেলে এতেই যে, তারা বহু বড় বড় মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এসব মানমন্দির ছিল সব ধরনের যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত এবং সার্বক্ষণিকভাবে নিযুক্ত (বেতনভুক্ত) বিজ্ঞানীরা এগুলোতে গবেষণা করতেন। ইসলামি বিশ্বের দূরদূরান্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল মানমন্দির। খলিফা আল-মামুন মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন দামেশকের সন্নিকটে কাসিয়ুন পাহাড়ের ওপর এবং

---

৪৪৬. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১৮২।

বাগদাদের আশ-শামাসিয়্যাহ এলাকায়।[৪৪৭] এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানমন্দির নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। বানু মুসা ইবনে শাকির বাগদাদে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। এখানে তারা পূর্ণচন্দ্রের হিসাব বের করেন। ইরানের মারাগিতে (মারাঘায়) একটি মানমন্দির ছিল। এটি নির্মাণ করেছিলেন নাসিরুদ্দিন আত-তুসি। মারাঘার মানমন্দির ছিল সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বিখ্যাত। এটি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এই মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ ছিল সবচেয়ে নিখুঁত ও যথার্থ। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা তাদের রেনেসাঁসের যুগে ও তার পরেও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করতেন। এগুলোর পাশাপাশি আরও মানমন্দির ছিল। যেমন সিরিয়ায় ইবনে শাতিরের[৪৪৮] মানমন্দির, ইস্পাহানে আদ-দিনাওয়ারির মানমন্দির, সমরকন্দে উলুগ বেগের[৪৪৯] মানমন্দির, ইরানে শারফুদ্দাওলার মানমন্দির (জ্যোতির্বিদ আবু সাহ্ল আল-কুহি এ মানমন্দির থেকে সাতটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন), কায়রোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর নির্মিত আল-হাকিমি মানমন্দির এবং আরও অনেক মানমন্দির।[৪৫০]

---

৪৪৭. দামেশকে আরেকটি মানমন্দির ছিল, যেটি নির্মাণ করেছিলেন উমাইয়া খলিফারা।-অনুবাদক

৪৪৮. ইবনে শাতির : আবুল হাসান আলাউদ্দিন আলি ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারি আদ-দিমাশকি আল-মুআযযিন, ইবনে শাতির নামে পরিচিত (৭০৪-৭৭৭ হি./১৩০৪-১৩৭৫ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও প্রকৌশলী। ছিলেন দামেশকের প্রধান মুআযযিন। তিনি দামেশকের উমাইয়া জামে মসজিদে একটি ধর্মীয় সময়-নির্দেশক (religious timekeeper) বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং মসজিদটির মিনারে তৈরি করে দিয়েছিলেন একটি সূর্যঘড়ি। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে তার বহু পুস্তিকা রয়েছে। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, খ. ৪, পৃ. ৯।

৪৪৯. উলুগ বেগ : মির্যা মুহাম্মাদ তারাগাই ইবনে শাহরুখ ইবনে তৈমুর লং (৭৯৬-৮৫৩ হি./১৩৯৪-১৪৪৯ খ্রি.)। তৈমুরি পরিবারের চতুর্থ শাসক। উলুগ বেগ নামে সর্বাধিক পরিচিত। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। তিনি পাঁচটি ভাষা জানতেন : আরবি, ফার্সি, তুর্কি, মঙ্গোলীয় ও চৈনিক। ত্রিকোণমিতি ও গোলীয় জ্যামিতিতে তিনি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। তিনি সেই যুগের সবচেয়ে বড় মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বুখারা ও সমরকন্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহাবিদ্যালয়। দেখুন, *যিরিকলি*, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ৩২৮।

৪৫০. ডোনাল্ড আর. হিল, *Islamic Science and Engineering*, আরবি অনুবাদ, العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ৭৪-৮২; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৮১-৮২।

মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি

মুসলিম বিজ্ঞানীরা এসব মানমন্দিরে অসংখ্য যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ ব্যবহার করেছেন, এগুলো যেমন ছিল সূক্ষ্ম তেমনই কারিগরি শৈলীতে ছিল অনন্য। এসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলি ও অবস্থাবলির ব্যাপারে অবগত হতেন। এসব যন্ত্রের অধিকাংশই ছিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত, যেগুলো ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। যেমন কীলকযুক্ত কল, আর্মিলারি স্ফেয়ার (Armillary sphere), সাইন কোয়াড্রেন্ট (Sine quadrant), আর্চেড কোয়াড্রেন্ট (Arched quadrant), হোরারি কোয়াড্রেন্ট (Horary quadrant), ফুইকুলা (Fuicula), দিগংশ ও সুবিন্দু পরিমাপযন্ত্র, ম্যারিডিয়ান কোয়াড্রেন্ট (Meridian quadrant), প্যারাল্যাকটিক রুলার (Parallactic ruler) এবং সময় পরিমাপের বিভিন্ন সূর্যঘড়ি ও অন্যান্য যন্ত্র।[৪৫১]

পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির সাহায্যও গ্রহণ করেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা। এসব যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে অ্যাস্ট্রোল্যাব[৪৫২]। যন্ত্রটি তার গ্রিক নামই ধরে রেখেছে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা অ্যাস্ট্রোল্যাবের উন্নতি সাধন করেন এবং নানা ধরনের নমুনা তৈরি করেন। যা তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই অনুষঙ্গ। যেমন তারা উদ্ভাবন করেছেন গোলকাকার অ্যাস্ট্রোল্যাব ও বোট অ্যাস্ট্রোল্যাব। বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞানজাদুঘরে এসব অ্যাস্ট্রোল্যাবের নমুনা সংরক্ষিত আছে। দিগ্‌বলয়

---

৪৫১. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৯২।

৪৫২. অ্যাস্ট্রোল্যাব (astrolabe) একটি বিস্তৃত নতি-পরিমাপক যন্ত্র (inclinometer)। একে এনালগ ক্যালকুলেটরও বলা যেতে পারে। এই যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও নাবিকেরা মহাকাশীয় বা মহাজাগতিক বস্তুর দিগ্‌বলয়ের উপরের উচ্চতা, দিন বা রাত নির্ণয়ের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করতেন। গ্রহ ও নক্ষত্র নির্ণয়ের জন্যও এই যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। নির্দিষ্ট স্থানীয় সময়ে স্থানীয় অক্ষাংশ, জরিপ ও ত্রিভুজীকরণে (triangulation)-ও অ্যাস্ট্রোল্যাব ব্যবহৃত হতো। ধ্রুপদি সভ্যতায়, ইসলামি স্বর্ণযুগে, ইউরোপীয় মধ্যযুগে ও আবিষ্কারের যুগে উপরিউক্ত সব কাজের জন্য অ্যাস্ট্রোল্যাবের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। ইসলামি বিশ্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশকালে মুসলিম বিজ্ঞানীরা অ্যাস্ট্রোল্যাবের নকশার ক্ষেত্রে কৌণিক স্কেল প্রবর্তন করেন। দিগংশকে নির্দেশ করে এমন বৃত্ত যুক্ত করেন। কিবলা অনুসন্ধানের উপায় হিসেবেও যন্ত্রটির ব্যবহার ছিল। অষ্টম শতাব্দীর গণিতজ্ঞ মুহাম্মাদ আল-ফাযারি প্রথম অ্যাস্ট্রোল্যাব-নির্মাতা হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করেন।-অনুবাদক।

থেকে নক্ষত্ররাজির উচ্চতা এবং সময় নির্ধারণে অ্যাস্ট্রোল্যাবের ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল।[৪৫৩]

চিত্র নং-১৩
অ্যাস্ট্রোল্যাব

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপাত্ত-সারণি

মহাকাশের বস্তুরাশির হিসাবনিকাশের জন্য মুসলিমরা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক উপাত্ত-সারণি বা তারকা-সারণি তৈরিতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণের জন্য এটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারকা-সারণি বলতে বোঝায় গাণিতিক সংখ্যার তালিকাকে, যেখানে কক্ষপথে চলমান তারকারাজির অবস্থান নির্ধারণ, মাস ও দিন জানার সূত্রাবলি ও অতীতকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে। গ্রহমণ্ডলীর উর্ধ্ব-অবস্থান, নিম্ন-অবস্থান, হেলে বা ঝুঁকে পড়া ও অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ও জানা যায় তারকা-সারণি থেকে। এসব সারণি অতিশয় সূক্ষ্ম ও নির্ভুল গাণিতিক

---

[৪৫৩]. ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুমু ওয়াল হান্দাসাতু ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৭৫; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৮২-৮৩; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ১৫০।

সূত্রাবলি ও সংখ্যাসূচক আইনকানুনের ওপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে বিখ্যাত তারকা-সারণি হলো ইবনে ইউনুস আল-মিশরির[৪৫৪] (আলি ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস) তারকা-সারণি।[৪৫৫]

খ্যাতিমান কয়েকজন

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারা অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাদের উত্তরসূরিদের জন্য নেতৃত্বের আসনে রয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আহমাদ ইবনে ইউনুস আল-ফারগানি। পশ্চিমাবিশ্বে তিনি আলফ্রাগানুস নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থ كتاب في جوامع علم النجوم (*A Compendium of the Science of the Stars or Elements of astronomy on the celestial motions*) ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়ায় সাতশ বছর ধরে নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিরাজমান থেকেছে।[৪৫৬] তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে চাঁদের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আলফ্রাগানুস-এর।

আল-বাত্তানি

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন আল-বাত্তানি। তিনি বিখ্যাত আয়-যিজুস-সাবি এর (الزيج الصابئ) প্রণেতা। এই তারকা-সারণি জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি অনেক তারকার অবস্থান চিহ্নিত করেন। চাঁদের সন্তরণ ও গ্রহরাজির কক্ষপথে আবর্তন সম্পর্কে তিনি সঠিক ধারণা দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির কিছু ভুলও তিনি সংশোধন করে দেন। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ-সম্পর্কিত টলেমি যে তত্ত্ব ব্যক্ত করেছিলেন, আল-বাত্তানি তা ভুল প্রমাণ করে নতুন প্রামাণিক তথ্য প্রদান

---

৪৫৪. ইবনে ইউনুস : আবুল হাসান আলি ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস (মৃ. ৩৯৯ হি./১০০৯ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী। উল্লেখযোগ্য রচনা : *আয়-যিজুল হাকিমি*, যা যিজ ইবনে ইউনুস নামে পরিচিত। মিশরের ফুসতাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন কায়রোতে। দশম শতাব্দীতে যিনি সময় পরিমাপের জন্য সরল দোলক ব্যবহার করেছিলেন তিনি হলেন ইবনে ইউনুস। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৪২৯।

৪৫৫. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৫১।

৪৫৬. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১৮২।

করেন। সৌর-অপসূর[৪৫৭] নির্ধারণেও তিনি টলেমির বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার নিজের মত দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আল-বাত্তানির সর্বাধিক পরিচিত অর্জন হলো সৌরবর্ষ নির্ণয়। আল-বাত্তানিই প্রথম নির্ভুল পরিমাপ করে দেখিয়েছিলেন যে, এক সৌরবৎসরে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড হয়। এর সঙ্গে আধুনিক পরিমাপের পার্থক্য মাত্র ২ মিনিট ২২ সেকেন্ড কম। আল-বাত্তানি পৃথিবীর বিষুবরেখার মধ্য দিয়ে যাওয়া কাল্পনিক সমতলের সঙ্গে সূর্য ও পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যে যে সমতল, তা অসদৃশ বলে ব্যাখ্যা করেন। বিস্ময়করভাবে তিনি এই দুই কাল্পনিক সমতলের মধ্যকার কোণ পরিমাপ করেন। এই কোণকে বলা হয় 'সৌর অয়নবৃত্তের বাঁক'। আল-বাত্তানি এর পরিমাপ করেন ২৩ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট, যা বর্তমানের আধুনিক পরিমাপ ২৩ ডিগ্রি ২৭ মিনিট ৮.২৬ সেকেন্ডের খুবই কাছাকাছি। তার এসব জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্পর্কিত তথ্য রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তারা আল-বাত্তানির কাজের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। কয়েক শতাব্দী পর কোপার্নিকাস কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন পরিমাপের চেয়ে আল বাত্তানির পরিমাপ অনেক বেশি নিখুঁত ছিল।[৪৫৮]

---

[৪৫৭]. সূর্যের চারদিকে কোনো গ্রহের কক্ষপথের নিকটতম বিন্দুকে অনুসূর (Perihelion) এবং দূরতম বিন্দুকে অপসূর (Aphelion) বলে। অনুসূর অবস্থান পাড়ি দেওয়ার সময় গ্রহরা জোরে এবং উলটোভাবে অপসূর দিয়ে যাওয়ার সময় ধীরে চলে। আমাদের সৌরজগতের গ্রহরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তু সাধারণত বৃত্তাকার কক্ষপথে না ঘুরে অনেকটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথ অনুসরণ করে। তাই সূর্য থেকে এর দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সব গ্রহ এই নিয়ম মেনে চলে। কোনো গ্রহ থেকে সূর্যের ন্যূনতম দূরত্বকে ওই গ্রহের অনুসূর এবং এর বিপরীতকে অপসূর বলা হয়। যেদিন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে, তাকে অনুসূর বলে। সাধারণত ১ থেকে ৩ জানুয়ারি সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে। যেদিন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে, তাকে অপসূর বলে। সাধারণত ১ থেকে ৪ জুলাই সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

[৪৫৮]. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১০৬; জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫; শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, পৃ. ৫৪৩।

আবদুর রহমান আস-সুফি[৪৫৯]

তিনি পশ্চিমা বিশ্বে Azophi এবং Azophi Arabus নামে পরিচিত। আবদুর রহমান আস-সুফি স্থির তারকারাজির সারণির প্রথম উদ্ভাবক। এ বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন যার আরবি নাম صُوَرُ الكَوَاكِبِ الثَابِتَة এবং ইংরেজি নাম *Book of Fixed Stars*[৪৬০]। এটি তিনি ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এতে তিনি ২৯৯ হিজরির/৯১১ খ্রিষ্টাব্দের স্থির তারকারাজির বিবরণ তুলে ধরেন। বিবরণের পাশাপাশি তিনি চিত্রও অঙ্কন করেছেন। এই সারণি এমনকি আধুনিক কালেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা কতিপয় তারকা এবং তাদের অবস্থান ও গতিময়তার ইতিহাস জানতে চান তাদের জন্য। এতে তিনি এক হাজারেরও বেশি তারকার চিত্র অঙ্কন করেছেন। আবদুর রহমান আস-সুফি ও তার অনন্য কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চাঁদের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ **'আযোফি' ও গৌণ গ্রহ ১২৬২১ আল-সুফির** নামকরণ করা হয়েছে তার নামেই।[৪৬১]

---

৪৫৯. আবদুর রহমান আস-সুফি : আবুল হুসাইন আবদুর রহমান ইবনে উমর ইবনে সাহল আর-রাযি (২৯১-৩৭৬ হি./৯০৩-৯৮৬ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পারস্যের (ইরানের) রায় শহরের অধিবাসী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : كتاب تطارح الشعاعات، كتاب التذكرة، رسالة العمل بالأسطرلاب، كتاب الكواكب الثابتة غير المتحركة। দেখুন, আল-কাফাতি, *ইখবারুল-উলামা*, পৃ. ১৫২-১৫৩।

৪৬০. গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি ও অনুবাদ এখনো টিকে আছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বডলেইয়ান লাইব্রেরিতে গ্রন্থটির ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপি আছে। এটি মূলত লেখকের পুত্রের কাজ। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আছে গ্রন্থটির ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি অনুলিপি। -অনুবাদক

৪৬১. শাওকি আবু খলিল, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, প্রথম মুদ্রণ, দারুল ফিকর, দিমাশক, ১৪১৭ হি./১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৭৩।

আবুল ওয়াফা আল-বুযজানি (আল-বুজানি)[৪৬২]

তিনি চন্দ্র পঞ্জিকা তৈরির জন্য একটি সমীকরণ উদ্ভাবন করেন যা গতি-সমীকরণ নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো চাঁদের গতিময়তায় অসাম্য (lunar inequalities) আবিষ্কার। তার এই আবিষ্কার পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বলবিদ্যার পরিধি বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই আবিষ্কারের মালিক ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে[৪৬৩] নাকি আল-বুযজানি তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে যে, তৃতীয় অসাম্য (Third lunar inequality) হলো আল-বুযজানির অন্যতম আবিষ্কার। তার *আল-মাজেস্ট* (*Kitāb al-Majisṭī*/كتاب المجسطي) তার মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দীব্যাপী আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তার এই গ্রন্থে গোলকাকার ত্রিকোণমিতি, গ্রহতত্ত্ব ও কিবলার দিক নির্ধারণে সমাধান প্রসঙ্গে অসংখ্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।[৪৬৪]

---

৪৬২. আবুল ওয়াফা আল-বুযজানি : আবুল ওয়াফা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাইল (৩২৮-৩৮৮ হি./৯৪০-৯৯৮ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রপ্রকৌশলী। খুরাসানের বুযজানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : كتاب في ما يحتاج إليه الكتاب والعمال من علم الحساب، كتاب في ما يحتاج إليه الصانع من الأعمال الهندسية، زيج الواضح، كتاب المجسطي। তিনি দাওফান্তাস (Diophantus of Alexandria) ও আল-খাওয়ারিজমির আলজেব্রা-বিষয়ক গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা করেন এবং ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১৬৭।

৪৬৩. টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) একজন প্রখ্যাত ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী (১৫৪৬-১৬০১ খ্রি.)। তিনি দুটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। একটি হলো প্রাসাদ-মানমন্দির (Uraniborg) এবং তার পাশে অপরটি হলো ভূগর্ভস্থ মানমন্দির (Stjerneborg)। তিনি ডেনমার্কের সম্রাটের কাছ থেকে একটি দ্বীপ উপহার পেয়েছিলেন। ডেনমার্কের উপকূলের কাছে সেই ভেন দ্বীপেই তিনি মানমন্দির দুটি নির্মাণ করেন। তিনি অসংখ্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও গণনাকে আরও নিখুঁত করেন, নানান দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যবহারিক ফল ও বিশেষ সারণির সাহায্যে প্রাপ্ত তাত্ত্বিক গণনা–এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করেও দেখতেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বাধিক ও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল তার হাতেই।

৪৬৪. কাদরি তাওকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির-রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল-ফালাক*, পৃ. ২৩২; আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৩৫৫।

আবু ইসহাক আন-নাক্কাশ আয-যারকালি[৪৬৫]

বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। তিনি *আয-যিজুত তুলাইতিলি* (*Toledan Tables* or *Tables of Toledo*) প্রণেতাদের অন্যতম। এই যিজ বা তারকা-সারণির নামকরণ করা হয়েছে আন্দালুসের শহর তুলাইতিলাহ (Toledo)-এর নামে। টলেমিও আল-খাওয়ারিজমির মতো পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের থেকে আহরিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি এই তারকা-সারণি প্রস্তুত করেন। এই সারণিতে তিনি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন। তার একটি কিতাব রয়েছে الصحيفة الزيجية নামে, এতে তিনি অ্যাস্ট্রোল্যাব ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি অ্যাস্ট্রোল্যাবের একটি উন্নত সংস্করণও উদ্ভাবন করেন। এটিকে আস-সাহিফাতুয যারকালিয়্যাহ বা আয-যারকালাহ বলা হয়। পশ্চিমাবিশ্বে এটি Saphaea নামে পরিচিত। তিনিই প্রথম প্রমাণ পেশ করেন যে, স্থির তারকারাজির তুলনায় সৌর-অপসূরের ঝুঁকে পড়ার পরিমাণ ১২০৫ মিনিটে পৌঁছে। আধুনিক নিরীক্ষায় যার পরিমাণ ১২০৮ মিনিট। আয-যারকালির নির্ণীত পরিমাণের চেয়ে মাত্র ৩ মিনিট বেশি।[৪৬৬] টলেমীয় মডেলের ডায়াগ্রাম (রেখাচিত্র) ব্যবহার করে গ্রহরাজির অবস্থান নির্ণয়ে একটি যন্ত্রও (equatorium) আবিষ্কার করেন তিনি। এ বিষয়ে তিনি দুটি রচনা লেখেন, রচনা দুটি ক্যাসটাইলের রাজা আলফোনসোর (King Alfonso X) নির্দেশে স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়। এটি হিব্রু ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়। আয-যারকালি তার كتاب الجداول (*Book of Tables*) গ্রন্থের জন্যও বিখ্যাত। এর একটি সারণি কিবতি (Coptic), রোমান, পারসিক ও চান্দ্রমাস শুরুর দিনটিকে নির্দেশ করে, অন্য একটি সারণি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহের অবস্থান নির্দেশ করে এবং অপর একটি সারণি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে।

---

৪৬৫. আয-যারকালি : আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে ইয়াহইয়া আত-তুজিবি আন-নাক্কাশ (৪২০-৪৮০ হি./১০২৯-১০৮৭ খ্রি.)। স্পেনের টলেডোয় জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং একাধিক যন্ত্রের উদ্ভাবক। অ্যাস্ট্রোল্যাবের বেশ কয়েকটি সংস্কার সাধন করেন।

৪৬৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২০৯; শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, পৃ. ৫৪৪।

আবুল ইয়ুস্‌র বাহাউদ্দিন আল-খারাকি[৪৬৭]

ষষ্ঠ হিজরি শতকে যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে মগ্ন হয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। গণিত ও ভূগোলবিদ্যায়ও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *আত-তাবসিরাহ* (التبصرة)[৪৬৮] এবং *মুনতাহাল-ইদরাক ফি তাকসিমিল-আফলাক* (منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك)।[৪৬৯]

আল-বাদি আল-আস্তুরলাবি[৪৭০]

তিনি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি তারকা-সারণি, যা তিনি বাগদাদের সালজুকি সুলতানের প্রাসাদে থেকে তৈরি করেছিলেন। তারকা-সারণিটি তার কিতাবে সন্নিবেশন করেন। সুলতান মাহমুদ আবুল কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের নামে সারণিটির নামকরণ করা হয়েছে যিজ আল-মাহমুদি।[৪৭১]

---

৪৬৭. আল-খারাকি : বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবু বকর আল-খারাকি (৪৬৯-৫৩৩ হি./১০৭৬-১১৩৯ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ। খাওয়ারিজমের শাহদের প্রিয়ভাজন ও তাদের রাজদরবারের জ্যোতির্বিদ ছিলেন। দেখুন, উমর রেজা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৮, পৃ. ২৩৮।

৪৬৮. হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ২, পৃ. ৩৩৮; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২১৮।

৪৬৯. হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ২, পৃ. ১৮৫২।

৪৭০. আল-বাদি আল-আস্তুরলাবি : আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনে ইউসুফ আল-বাগদাদি (মৃ. ৫৩৪ হি./১১৩৯ খ্রি.)। দার্শনিক, চিকিৎসক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। যিজগ্রন্থ বা তারকা-সারণি বিষয়ে তার *'আল-মুআররাবুল মাহমুদি'*। তিনি যেমন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছিলেন, তেমনই পূর্ববর্তীদের তৈরিকৃত যন্ত্রপাতির সংস্কারও করেছিলেন। درة التاج من شعر ابن حجاج তার কবিতার বই। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২৭, পৃ. ১৬০।

৪৭১. ইসমাইল পাশা আল-বাবানি আল-বাগদাদি, *হাদিয়্যাতুল আরিফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, পৃ. ৭১৪।

ইবনে শাতির

ইবনে শাতিরের (মৃ. ৭৭৭ হি./১৩৭৫ খ্রি.) জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাবলিও অনেক মূল্যবান। তিনি যেসব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন তা কয়েক শতাব্দীব্যাপী প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে চালু ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো : যিজ ইবনে শাতির *ইদাহুল মুগাইয়াব ফিল-আমাল বিরল-মুজাইয়াব রিসালাহ ফিল-আস্তুরলাব*, *মুখতাসার ফিল-আমাল বিল-আস্তুরলাব*, *আন-নাফউল আম ফিল-আমাল বির-রুবইত তাম্ম*, *নুযহাতুস সামি ফিল-আমাল বির-রুবইল জামি*, *কিফায়াতুল কুনু ফিল-আমাল বির-রুবইল মাকতু*, *নিহায়াতুল গায়াত ফিল-আমালিল ফালাকিয়্যাত*, *আয-যিজুল জাদিদ*। এই তারকা-সারণি তিনি উসমানি খলিফা প্রথম মুরাদের আহ্বানে প্রস্তুত করেছিলেন। ইবনে শাতির এতে যেসব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক উদাহরণ, তত্ত্ব ও মত এবং পরিমাপ পেশ করেন তা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। তবে তার এই সব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণা-ফলাফল পরবর্তীকালে নিকোলাস কোপার্নিকাসের নামে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ইতিহাসবিদ ডেভিড এ. কিং[৪৭২] ১৩৯০ হিজরিতে/১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন যে, পোলিশ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাসের নামে চালু অধিকাংশ তত্ত্বই মূলত ইবনে শাতিরের। এর তিন বছর পর ১৩৯৩ হিজরিতে/১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পোল্যান্ডে কিছু আরবি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়, এসব পাণ্ডুলিপি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোপার্নিকাস এগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন।[৪৭৩]

---

৪৭২. ডেভিড এ. কিং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থিত গ্যোটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Mathematical Astronomy In Medieval Yemen (1983); A Survey Of The Scientific Manuscripts In The Egyptian National Library (1986); Islamic Mathematical Astronomy (1986/1993); Islamic Astronomical Instruments (1987/1995); Astronomy In The Service Of Islam (1993); The Ciphers Of The Monks: A Forgotten Number Notation Of The Middle Ages (2001).*

৪৭৩. ইসমাইল পাশা আল-বাবানি, *হাদিয়্যাতুল আরিফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, পৃ. ৩৮৭; হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ১, পৃ. ৮১; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৩৬-২৩৮।

উলুগ বেগ

উলুগ বেগ বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাদের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণ করে গবেষণার কাজে ভাবনাহীন রাখতেন। তিনি সমরকন্দে সেই সময়ের সবচেয়ে বড় মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। একজন প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ লিখেছেন, উলুগ বেগ ছিলেন জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, চমৎকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও উদ্যমী। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাপক জ্ঞান তার দখলে ছিল। একইসঙ্গে তিনি অলংকারশাস্ত্রেরও অত্যন্ত নিপুণ পরীক্ষক ছিলেন। তার যুগে বিজ্ঞানীদের অবস্থান ছিল সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। জ্যামিতিতে তিনি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। আর মহাবিশ্বের মানচিত্র রচনা (Cosmography)-এর ক্ষেত্রে তিনি টলেমির একটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। তার মতো কোনো সম্রাট আজ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেননি। তিনি প্রাথমিক যুগের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় নক্ষত্রসমূহের টীকা লেখেন। তিনি সমরকন্দে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সৌন্দর্যে ও মানে এবং শিক্ষাদীক্ষার উৎকর্ষে এমন মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন সাতটি প্রদেশের কোথাও ছিল না।[৪৭৪]

উলুগ বেগ একটি আকাশ-পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে তার কার্যকালে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে সক্ষম হন। ৭২৭ হি./১৩২৭ খ্রি. থেকে ৮৩৯ হি./১৪৩৫ খ্রি. পর্যন্ত তার আকাশ-পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে একটি সামগ্রিক সারণি তৈরি করেন। এই সারণির নাম যিজ উলুগ বেগ বা আয-যিজুস-সুলতানি। এতে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে ও যথার্থভাবে নক্ষত্ররাজির অবস্থান নির্ণয় করেন। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়ও নির্ণয় করেন। উলুগ বেগ স্থির তারকারাজিরও একটি সারণি প্রস্তুত করেন। চাঁদ, সূর্য, গ্রহরাজির সন্তরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি শহরগুলোর দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের সারণিও তিনি তৈরি করেন।[৪৭৫]

---

৪৭৪. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৬, পৃ. ৫১।

৪৭৫. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৪৩-২৪৬।

আর-রুদানি শামসুদ্দিন আল-ফাসি[৪৭৬]

তিনি হলেন পরবর্তীকালের মুসলিম বিজ্ঞানীদের অন্যতম, যারা জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের অর্জিত কীর্তিগুলোর সাহায্য গ্রহণ করে সামনে এগিয়েছেন। আর-রুদানি সময় নির্দেশের জন্য একটি গোলকাকার যন্ত্র (গোলক অ্যাস্ট্রোল্যাব) উদ্ভাবন করেছিলেন। গোলকাকার যন্ত্রটির ওপরে ছিল কিছু বৃত্ত এবং তিসি তেলের প্রলেপযুক্ত সাদা রঙের নকশা। গোলকাকার যন্ত্রটির ওপর আরেকটি গোলক যুক্ত ছিল, যা ছিল দুটি অংশে বিভক্ত, এগুলোর ওপর ছিল সৌর-বন্ধনী ও অন্যান্য বস্তু নির্দেশক ছিদ্র। এগুলোও ছিল নিচেরটির মতো গোলকাকার ও সুবজ রঙে চিহ্নিত। আর-রুদানির এই গোলক অ্যাস্ট্রোল্যাবটি অতি সহজে ব্যবহার করা যেত এবং সব শহরের সময় নির্দেশের জন্যও ছিল যথোপযুক্ত। এ বিষয়ে তিনি '*বাহজাতুত তুল্লাব ফিল-আমাল বিল-আস্তুরলাব*' নামে একটি পুস্তকও রচনা করেছেন, এতে তিনি অ্যাস্ট্রোল্যাব নির্মাণ ও তার ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৪৭৭]

পরিশেষে আমরা যা আলোচনা করেছি তার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ময়দানে—সেই সময়ে লব্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতা সত্ত্বেও—যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ও অবদান রেখেছেন তা অবশ্যই সম্মানের যোগ্য, শ্রদ্ধার যোগ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ময়দানে তারা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আকাশের বহু নক্ষত্র এখনো আরবি নাম বহন করে চলেছে। যেমন সুহাইল (Canopus), আল-মাজাররাহ (rogue star), আল-জাওযা (Betelgeuse), আদ-দাব্বুল আকবার (Ursa Major), আদ-দাব্বুল

---

৪৭৬. আর-রুদানি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ইবনে আল-ফাসি (১০৩৭-১০৯৪ হি./১৬২৭-১৬৮৩ খ্রি.)। মালিকি মাযহাবপন্থী মরোক্কান মুহাদ্দিস, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পর্যটক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : صلة الخلف بموصول السلف، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ، مختصر تلخيص المفتاح في المعاني وشرحه، تحفة أولي الألباب في العمل بالأسطرلاب। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ১৫১।

৪৭৭. ইসমাইল পাশা আল-বাবানি, *হাদিয়্যাতুল আরিফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, পৃ. ৬০৭; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৪৮-২৫০।

আসগার (Ursa Minor), আল-গাওল (Algol), আস-সাম্‌ত এবং আরও অনেক।

মারয়াম আল-আস্তুরলাবি[৪৭৮]

দশম শতাব্দীর একজন মুসলিম নারী জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তার মূল নাম আল-ইজলিয়্যাহ বিনতে আল-ইজলি আল-আস্তুরলাবি। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তার পিতা কুশিয়ার আল-জিলানি কয়েকটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচয়িতা। যেমন *'মাজমালুল-উসুল ফি আহকামিন নুজুম'*, *'আল-যিজ আল-জামি'* *'আল-মাদখাল ফি সানাআতি আহকামিন নুজুম'* ও *'আস্তুরলাব'*। তারা বসবাস করতেন সিরিয়ার আলোপ্পোতে। সেখানেই মারয়াম আল-আস্তুরলাবি তার বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কাজ করতেন।

মারয়াম ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নাস্তুলুসের শিষ্য ছিলেন। নাস্তুলুস ছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যিনি ইতিহাসে প্রথম বিস্তৃত অ্যাস্ট্রোল্যাব নির্মাণ করেছিলেন। নাস্তুলুসের কাছে শিক্ষাগ্রহণের পর মারয়াম 'উন্নত অ্যাস্ট্রোল্যাব' নির্মাণে ব্রতী হন। তার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটি ছিল একটি উৎকর্ষের প্রতীক। তিনি তার অ্যাস্ট্রোল্যাবে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে মহাকাশের বস্তুরাশির নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

হিজরি চতুর্দশ শতকে (খ্রিষ্টীয় দশম শতকে) মারয়াম আল-আস্তুরলাবি যখন আলেপ্পোতে বসবাস ও গবেষণা করতেন, সেই সময় সেখানকার গভর্নর ছিলেন সাইফুদ্দাওলাহ। তিনি আলেপ্পো স্টেট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ছিল হামদানি সাম্রাজ্যের একটি প্রতীক। মারয়াম সাইফুদ্দাওলার রাজদরবারে ৯৪৪-৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মহাকাশ-গবেষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি একটি নয়, বিভিন্ন ধরনের একাধিক অ্যাস্ট্রোল্যাব নির্মাণ করেছিলেন।

মারয়াম আল-আস্তুরলাবি যে অ্যাস্ট্রোল্যাব নির্মাণ করেছিলেন তা অনেক আধুনিক নৌবৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন কম্পাস, স্যাটেলাইট ও বিশ্বজনীন

---

৪৭৮. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

অবস্থান-নির্ণায়ক ব্যবস্থা, যা সংক্ষেপে জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) নামে পরিচিত।

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেনরি ই. হল্ট ১৯৯০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোতে অবস্থিত পালোমার মানমন্দিরে গবেষণাকালে একটি গ্রহাণু-বেষ্টনী (asteroid belt) আবিষ্কার করেন। তিনি এটির নাম দেন 'মারয়াম আল-আস্তুরলাবি'।[৪৭৯]

[৪৭৯]. *ডেইলি সাবাহ*, ইস্তাম্বুল, ১৬ জুলাই, ২০১৬ খ্রি.; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৬৭১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

মানবজগতের প্রতি রহমতস্বরূপ ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। এই ধর্ম তার অনুসারীদের প্রগতি ও অগ্রগামিতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। ফলে অন্যান্য জাতিও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, সভ্যতাকেন্দ্রিক উৎকর্ষ ও অগ্রগামিতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। এই উৎকর্ষ কেবল জীবনের একটি দিকে নয়, বরং সব দিকেই বিস্তৃত। কুরআন মুসলিমদের চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পূর্ববর্তী লোকদের অর্জিত সাফল্য ও কীর্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে নিষেধ করেছে। অবশ্য পূর্ববর্তীদের যা-কিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করতে বাধা নেই। অবিশ্বাসীরা অন্ধ-অনুকরণের পথ বেছে নিয়ে চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকে, অন্ধ-অনুকরণকেই তারা যথেষ্ট মনে করে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো, তারা বলে না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষরা যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তারপরও?[৪৮০]

এই রীতি প্রতিটি বিষয়ে বারবার দৃষ্টিপাত করতে, বিশুদ্ধ যুক্তির সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখতে এবং দলিল-ভিত্তিক চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই রীতিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

---

৪৮০. সুরা বাকারা : আয়াত ১৭০।

আল-আহযাব (খন্দকের) যুদ্ধে পরিখা খননের চিন্তাকে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অথচ পরিখা খননের বিষয়টি আরব সমাজের জন্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুগ যুগ ধরে আরবে পরিচিত ও অনুসৃত যুদ্ধের কলাকৌশল আঁকড়ে ধরে থাকেননি, একজন অনারব সাহাবির পরামর্শে তিনি নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন।

এই রীতি মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। তাই তারা পূর্ববর্তী জ্ঞানের পরিধিতে আটকে থাকেননি এবং ইসলামপূর্ব অন্যান্য সভ্যতার কীর্তিগুলোর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। তারা নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছেন, ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কেবল আবিষ্কারই নয়, বরং মৌলিকভাবে নতুন জ্ঞানশাখার ভিত্তিও নির্মাণ করেছেন। নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথম অনুচ্ছেদ : রসায়নশাস্ত্র

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ওষুধবিজ্ঞান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভূতত্ত্ববিদ্যা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বীজগণিত

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : যন্ত্রপ্রকৌশল

প্রথম অনুচ্ছেদ

রসায়নশাস্ত্র

রসায়নশাস্ত্র ইসলামি সভ্যতার পূর্বে সস্তা ধাতুকে সোনা ও রুপায় রূপান্তরের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই শাস্ত্রের নির্ভরশীলতা ছিল বুদ্ধি ও যৌক্তিক দলিল-প্রমাণের ওপর, তা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারেকাছেও যায়নি।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রে এ অবস্থাই বিরাজ করছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীরা যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিজ্ঞানের এই শাখায় নির্ভেজাল সত্যে উপনীত হতে নির্ভর করেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ওপর, এগুলোর সঙ্গে বুদ্ধি ও উপলব্ধিকেও যুক্ত করেন। ফলে রসায়নশাস্ত্র-সংশ্লিষ্ট কতিপয় মূলনীতি ও নিয়মের উদ্ভব হয়। জাবির ইবনে হাইয়ান হলেন প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি এই বিশাল শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি ইউরোপে রসায়নশাস্ত্র কয়েক শতাব্দীব্যাপী 'জাবিরের সৃষ্টিকর্ম' হিসেবে পরিচিত ছিল।

জাবির ইবনে হাইয়ানই অভিজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি বলে স্থির করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানের গবেষণাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এরূপ গবেষণাপদ্ধতির নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনি দেখবেন যে, তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানাচ্ছেন, কারণ এ দুটির ওপরই পরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলছেন, প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতাই এই শাস্ত্রের কাঠামোয় পূর্ণতা দেয়। কেউ প্রয়োগ ও পরীক্ষা না করলে কিছুই অর্জন করতে পারবে না।[৪৮১]

---

৪৮১. জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাবুত তাজরিদ*, এরিক জন হোলমেয়ার্ড কর্তৃক সম্পাদিত مصنفات في علم الكيمياء للحكيم جابر بن حيام الصوفي সংকলনগ্রন্থের অন্তর্গত। প্রকাশক, P. Geuthner, ১৯২৮ খ্রি., প্যারিস।

উইল ডুরান্ট বলছেন, বলা যায় মুসলিমরাই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র হিসেবে রসায়নশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। কারণ, মুসলিমরাই রসায়নশাস্ত্রীয় গবেষণায় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও তার ফলাফল নির্ধারণে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ এই ময়দানে গ্রিকরা—আমরা যতদূর জানি—কারিগরি মূল্যায়ন ও দুর্বোধ্য অনুমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। মুসলিমরা আলেমবিক[৪৮২] আবিষ্কার করেছেন এবং একে এই নাম দিয়েছেন। অসংখ্য বস্তু ও ধাতুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রস্তুত করেছেন। ক্ষার ও এসিডের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। যেসব পদার্থ ক্ষার বা এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সেগুলোর পরীক্ষা করেছেন। শত শত ওষুধ নিয়ে গবেষণা করেছেন, শত শত ওষুধের প্রস্তুতপ্রণালি তৈরি করেছেন। মুসলিমরা সাধারণ ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করার যে জ্ঞান তা পেয়েছিলেন মিশর থেকে। এই জ্ঞানই তাদেরকে সত্যিকার রসায়নবিদ্যায় উপনীত করেছে। শত শত আবিষ্কার, যা তারা যুগপৎভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং রসায়নবিদ্যা নিয়ে কর্মকাণ্ডে তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা-ই তাদেরকে এই পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। মধ্যযুগে তাদের অবলম্বিত পন্থা ও পদ্ধতিগুলোই সঠিক বৈজ্ঞানিক উপায় হিসেবে সবচেয়ে বেশি উপযোগী ছিল।[৪৮৩]

রসায়নশাস্ত্রের উদ্ভবের পর খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া নামের একজন তরুণ বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি রোমান পাদরি মরিয়েনুসের (Morienus the Greek) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার প্রায়োগিক দিকগুলো শেখেন। তার পূর্বে রসায়নশাস্ত্র গ্রিকদের থেকে অনূদিত হয়ে প্রাথমিক স্তরে ছিল। তিনি একে প্রত্যক্ষ অর্জন ও দৃশ্যমান আবিষ্কারের স্তরে উন্নীত করেন। খালিদ ইবনে ইয়াযিদ রসায়ন নিয়ে তিনটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেগুলো হলো : এক. السر البديع في فك الرمز المنيع; দুই. فردوس الحكمة في علم الكيمياء; এবং তিন. مقالتا مريانوس الراهب। শেষের পুস্তিকায় তিনি মরিয়েনুস ও তার মধ্যে কী

---

৪৮২. আলকেমিস্টদের চোলাইযন্ত্র। এতে একটি নল দিয়ে দুটি পাত্র যুক্ত থাকে।

৪৮৩. উইল ডুরান্ট, *স্টোরি অব সিভিলাইজেশন*, খ. ১৩, পৃ. ১৮৭।

ঘটেছে এবং তিনি যেসব প্রতীকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা তার কাছ থেকে কীভাবে শিখেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৪৮৪]

তর্কাতীতভাবেই জাবির ইবনে হাইয়ান হলেন রসায়নশাস্ত্রের জনক এবং এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রায় হাজার বছর ধরে তার গ্রন্থাবলিই ছিল রসায়নবিদ্যার বিশ্বস্ত উৎস। এসব গ্রন্থে অসংখ্য রাসায়নিক যৌগের[৪৮৫] পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে যা তার আগে কেউ জানত না। এ বৈশিষ্ট্যই তার রচনাবলিকে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের পাঠ্যবিষয়ে পরিণত করেছে। যেমন জোহান বার্থোলোমিউ[৪৮৬], লরেন্স এম. ক্রাউস[৪৮৭], এরিক জন হোলমেয়ার্ড। হোলমেয়ার্ড জাবির ইবনে হাইয়ানের প্রতি ইনসাফপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তাকে শীর্ষস্থানে আসীন করেছেন এবং মতলববাজ সুবিধাবাদী বিজ্ঞানীরা তাকে ঘিরে সন্দেহের যে দেয়াল তৈরি করেছিল তা তিনি গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। জর্জ সার্টন মন্তব্য করেছেন যে, জাবির ইবনে হাইয়ান ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে একটি দীর্ঘ সময় দখল করে আছেন।

আবু বকর আল-রাজি (মৃ. ৩১১-৯২৩ হি.) জাবির ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থাবলি থেকে পাঠগ্রহণ করেছেন, রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি মজবুত করেছেন এবং এই শাস্ত্রের বিকাশে বড় অবদান রেখেছেন। তিনি তার *'কিতাবুল আসরার'*-এর ভূমিকায় এসব কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী দার্শনিকরা যা লিখেছেন তা ব্যাখ্যা করেছি। যেমন আগাথা ডিমুস[৪৮৮], হারমেস[৪৮৯], অ্যারিস্টটল, খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া এবং আমাদের গুরু জাবির ইবনে হাইয়ান। বরং তাতে এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে যার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি। আমার এই গ্রন্থ

---

৪৮৪. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২২৪; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৬।

৪৮৫. রাসায়নিক যৌগ হলো একপ্রকারের পদার্থ যা দুই বা ততোধিক ভিন্ন মৌলিক উপাদানের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়। মৌলিক উপাদানগুলো নির্দিষ্ট ভরের অনুপাতে যুক্ত হয়ে রাসায়নিক যৌগ গঠন করে এবং যৌগ ভাঙলে এর মৌলিক উপাদানগুলো পাওয়া যায়।

৪৮৬. Johann Bartholomew.

৪৮৭. Lawrence M. Krauss.

৪৮৮. Agatha Demus.

৪৮৯. Hermes Trismegistus.

তিনটি বিষয়ের জ্ঞানভান্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে: ওষুধ-সম্পর্কিত জ্ঞান, যন্ত্র-সম্পর্কিত জ্ঞান, পরীক্ষানিরীক্ষার জ্ঞান।[৪৯০]

চিত্র নং-১৪

জাবের ইবনে হাইয়ান রচিত 'আস-সিররুস সার'

---

[৪৯০]. আলি আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িয়িল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৭৭ থেকে উদ্ধৃতি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা রসায়নের বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও সেগুলোর রহস্য উন্মোচন করেছেন। তাদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে নাইট্রিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, নাইট্রোহাইড্রোক্লরিক এসিড, সিলভার নাইট্রেট, মার্কারি ক্লোরাইড[৪৯১], মার্কারি অক্সাইড[৪৯২], পটাশিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম কার্বনেট, আয়রন সালফাইড। তারা আরও আবিষ্কার করেন অ্যালকোহল, পটাশ, অ্যামোনিয়া বা এজেন, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, ক্ষার। قلو (ক্ষার) শব্দটি তার আরবি নাম (Alkaki) নিয়েই ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে প্রবেশ করেছে।[৪৯৩]

তারা রসায়নবিদ্যাকে চিকিৎসা ও ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগিয়েছেন। তারাই প্রথম ওষুধ প্রস্তুতপ্রণালি, ধাতুনির্মিত বস্তুর প্রস্তুতপ্রণালি, ধাতু পরিষ্কারকরণপদ্ধতি এবং অন্যান্য যৌগ বস্তু ও আবিষ্কারসমূহের কৌশল প্রকাশ করেছেন। যার ওপর ভিত্তি করে আধুনিক বহু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন সাবান, কাগজ, সিল্ক, রঞ্জক পদার্থ (রং), বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, চামড়া পাকাকরণ, সুগন্ধি তৈরি, স্টিল তৈরি, ধাতু পলিশ এবং অন্যান্য আবিষ্কার। মুসলিম বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষায় বেশ কিছু রাসায়নিক যন্ত্র ও উপকরণের ওপর নির্ভর করেছেন। যেমন ধাতু গলানোর পাত্র, চোলাইযন্ত্র, অতি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম স্কেল। তারা ধাতুসমূহ ও সেগুলোর ভরের অনুপাত নির্ণয় করতেন।[৪৯৪]

---

৪৯১. Mercury (II) chloride or mercuric chloride

৪৯২. Mercury (II) oxide or mercuric oxide

৪৯৩. ডোনাল্ড আর. হিল, *Islamic Science and Engineering*, আরবি অনুবাদ, العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১২০-১২৬।

৪৯৪. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৫৯।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ওষুধবিজ্ঞান

মুসলিমদের পক্ষে রসায়নবিজ্ঞান-সম্পর্কিত জ্ঞানশাখাগুলোতে, বিশেষ করে ওষুধবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তারা রসায়নবিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। যেহেতু ওষুধের জন্য প্রয়োজন রাসায়নিক নিয়মকানুন ও সমীকরণ জানা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার ফলাফল নিশ্চিত করা। ফলে কার্যকরী অর্থেই রাসায়নিক ওষুধের বিস্তার ঘটেছিল এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের সামনে এক নতুন যুগের দরজাসমূহ উন্মোচিত হয়েছিল।

বাস্তবতা এই যে, ওষুধবিজ্ঞান দারুণভাবে মুসলিম বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাদের যুগেই ওষুধপ্রস্তুপ্রণালি বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরীরূপে এবং নতুন পন্থায় বিকশিত হয়েছিল। এই অনন্য বৈশিষ্ট্য তাদের সভ্যতাকালকে দিয়েছিল ভিন্ন মর্যাদা। এ ব্যাপারে গুস্তাভ লি বোঁ যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য, আমরা কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই মুসলিম বিজ্ঞানীদের ওষুধবিজ্ঞানের প্রবর্তক বলে আখ্যায়িত করতে পারি। আমরা বলি যে, এটি একটি মৌলিক আরবি (ইসলামি) আবিষ্কার।[৪৯৫] পূর্বে যেসব ওষুধ প্রচলিত ছিল সেগুলোর সঙ্গে তাদের সৃষ্টিলব্ধ নতুন নতুন ওষুধি যৌগ যুক্ত করেছিলেন। তারাই প্রথম ওষুধ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪৯৬]

অবশ্য মুসলিমরা শূন্য থেকে শুরু করেননি, তারা শুরুর দিকে গ্রিকদের থেকে এই জ্ঞানের ধারণা গ্রহণ করেছেন। গ্রিক চিকিৎসক Pedanius Dioscorides (৪০-৯০ খ্রিষ্টাব্দ) কর্তৃক রচিত *De materia medica (On Medical Material)*[৪৯৭] গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছেন। এই

---

৪৯৫. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৯৪।

৪৯৬. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩০৬।

৪৯৭. ভেষজ ওষুধ এবং ওষুধের উপকরণ-সম্পর্কিত গ্রন্থ।

গ্রন্থ المادَّة الطبيَّة في الحشائش والأدوية المفردة নামে আরবিতে অনূদিত হয়েছে।[৪৯৮] বেশ কয়েকবার এটার অনুবাদ হয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত দুটি : বাগদাদে হুনাইন ইবনে ইসহাকের অনুবাদ[৪৯৯] এবং কর্ডোভায় আবু আবদুল্লাহ আস-সিকিল্লির অনুবাদ। কিছুকাল পরেই মুসলিম ওষুধবিজ্ঞানীরা তাদের চর্চা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই গ্রন্থে অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত করেন এবং Dioscorides যেসব বিষয়ের বর্ণনা দেননি সেগুলোর বর্ণনা দেন। এভাবেই ওষুধবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের সূচনা ঘটে এবং ব্যাপকতা লাভ করে। আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি[৫০০] রচনা করেন *'মুজামুন নাবাত'*, ইবনে ওয়াহশিয়্যাহ[৫০১] রচনা করেন *'আল-ফিলাহাতুন নাবাতিয়্যাহ'* এবং ইবনুল আওয়াম আল-ইশবিলি[৫০২] রচনা করেন *'আল-ফিলাহাতুল আন্দালুসিয়্যাহ'*। পরবর্তীকালে যারা ওষুধবিজ্ঞান বিষয়ে লিখেছেন তারা এই তিনটি গ্রন্থ ও অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

ভেষজবিদ্যা যে মুসলিমদের বিদ্যা বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পেছনে একটি রহস্য আছে। তা এই যে, আরবরা যে দেশে বাস করত তার প্রকৃতি-পরিবেশ ছিল খেজুরগাছ রোপণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী... তা

---

৪৯৮. আরবি উৎসগুলোতে গ্রন্থটি আরও কিছু নামে পরিচিত :

كتاب الحشائش، كتاب الحشائش والأدوية، كتاب الخمس مقالات، المقالات الخمس، هيولى الطب، كتاب ديسقوريدوس في الأدوية المفردة.

৪৯৯. এটি আরবিতে অনুবাদ করেছেন মূলত হুনাইনের শিষ্য স্তাফান ইবনে বাসিল, হুনাইন এটির সম্পাদনা করেছেন।-অনুবাদক

৫০০. আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি : আহমাদ ইবনে দাউদ ইবনে ওয়ানানদ আদ-দিনাওয়ারি (২১২-২৮২ হি./৮২৮-৮৯৫ খ্রি.)। প্রতিভাবান যন্ত্রপ্রকৌশলী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ। ইরানের দিনাওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ খণ্ডে কুরআনের তাফসির রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশটিরও বেশি। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ১২৩।

৫০১. ইবনে ওয়াহশিয়্যাহ : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলি ইবনে কাইস ইবনে মুখতার ইবনে আবদুল কারিম ইবনে হারসিয়্যাহ (মৃ. ৩১৮ হি./৯৩০ খ্রি.)। আলকেমিস্ট, কৃষিবিদ, বিষবিশেষজ্ঞ ও মিশরবিদ এবং সুফি। যাদুবিদ্যায়ও কারিকুরি দেখিয়েছেন। যাদুবিদ্যা নিয়ে তিনটি, রসায়নশাস্ত্র নিয়ে দুটি, প্রতীকবিদ্যা নিয়ে দুটি এবং কৃষি নিয়ে একটি বই রচনা করেছেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ১৭০।

৫০২. ইবনুল আওয়াম আল-ইশবিলি : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ (মৃ. ৫৮০ হি./১১৮৫ খ্রি.)। আন্দালুসীয় বিজ্ঞানী। *'আল-ফিলাহাতুল আন্দালুসিয়া'* গ্রন্থটি রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এই গ্রন্থের একটি অংশ স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৬৫।

ছাড়া ওই এলাকায় অম্লীয় বৃক্ষ প্রচুর জন্মাত, বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যেত ভেষজ নির্যাস এবং অন্যান্য বস্তু, যা মানুষের উপকার করত এবং ক্ষতিও করত। ফলে তাদের ভূমিতে কী কী বৃক্ষ ও উদ্ভিদ জন্মে তার দিকে আরবদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। মালাবার, সাইলান ও পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকাগুলোয়—যেগুলোর সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল—কী কী উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় সেগুলোর দিকেও তাদের নজর গেল। ফলে যেসব উদ্ভিদ ও বৃক্ষলতা চিকিৎসা ও ওষুধ তৈরির জন্য উপযোগী, সেগুলো বাছাই করে সংগ্রহ করা তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেল।[৫০৩]

এই ধরনের উদ্যোগের প্রতি সাড়া দিয়ে স্থানীয় উদ্ভিদ ও লতাপাতা থেকে কীভাবে সাহায্য নেওয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হলো। শুরুর দিকে বিভিন্ন উদ্ভিদের নাম তালিকা আকারে প্রকাশ করে কোষগ্রন্থজাতীয় গ্রন্থ রচিত হলো। উদ্ভিদগুলোর নাম লেখা হলো আরবি, গ্রিক, সুরয়ানি, ফারসি ও বারবারি ভাষায়। একক (অযৌগ) ওষুধসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। এ ক্ষেত্রে প্রায়োগিক প্রচেষ্টাও শুরু হলো। রশিদুদ্দিন আস-সুরি[৫০৪] এই উদ্যোগ নিলেন। তিনি উদ্ভিদে পরিপূর্ণ জায়গাগুলোতে যেতেন এবং তার সঙ্গে থাকত একজন চিত্রকর। তিনি উদ্ভিদগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং খাতায় তার বিবরণী টুকে নিতেন। রশিদুদ্দিন চিত্রকরকে প্রথমবার দেখাতেন উদ্ভিদের প্রাথমিক অবস্থা, যা মাত্র অঙ্কুরিত হয়েছে; দ্বিতীয়বার দেখাতেন উদ্ভিদের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা, যখন ফল বা বীজ বেরিয়েছে এবং তৃতীয়বার দেখাতেন ফলে যাওয়া অবস্থায়। চিত্রকর তিনবারই উদ্ভিদটির ছবি এঁকে নিতেন।[৫০৫]

ভেষজবিদ্যার বিকাশের শুরুর দিকে মুসলিমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই যে, তারা এতে জবাবদিহির[৫০৬] নীতি ও ওষুধ তত্ত্বাবধানের

---

৫০৩. লুইস সিডিও (Louis-Pierre-Eugène Sédillot), *Histoire des Arabes* (১৮৫৪), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল আরাবিল আম*, পৃ. ৩৮১।

৫০৪. রশিদুদ্দিন আস-সুরি : রশিদুদ্দিন আবুল ফযল ইবনে আলি (৫৭৩-৬৩৯ হি./১১৭৭-১২৪১ খ্রি.)। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও চিকিৎসক। আইয়ুবি সুলতান আল-মালিক আল-আদিলের সহচর। সুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন দামেশকে। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৯, পৃ. ১৪২।

৫০৫. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ২১৯।

৫০৬. আরবিতে 'হিসবাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ জবাবদিহি। পরিভাষায় শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সৎকাজ পরিত্যাগ করতে দেখলে সৎকাজের আদেশ করা এবং

বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন। পেশাটিকে স্বাধীন ব্যবসা থেকে গুটিয়ে এনে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের অধীনে ন্যস্ত করেন। ফলে যে-কেউ ওষুধ তৈরি ও বিতরণের পেশায় নিয়োজিত হতে পারত না। এটা খলিফা আল-মামুনের যুগের কথা। তিনি এই আইন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ ওষুধ-ব্যবসার পেশায় কতিপয় অসৎ ও প্রতারক ঢুকে গিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ দাবি করত যে তার কাছে সব ধরনের ওষুধ আছে। তারা রোগীদের যেমনটা মিলে সেই ওষুধই গছিয়ে দিত। ওষুধ সম্পর্কে রোগীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারা এই কাজটি করত। ভাবত যে, রোগীরা তো আর কোনটা কীসের ওষুধ তা জানে না। এ কারণে খলিফা আল-মামুন ওষুধ-প্রস্তুতকারীদের আমানত ও দক্ষতার পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেন। আল-মামুনের পর খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ (মৃ. ২২৭ হিজরি) যেসব ওষুধ-প্রস্তুতকারী সততা ও দক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের সনদ দেওয়ার নির্দেশ দেন। সনদে উল্লেখ থাকবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওষুধ-ব্যবসা বৈধ। এভাবে ওষুধশিল্প জবাবদিহির সামগ্রিক নীতির আওতায় আসে। রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের (৬০৭-৬৪৮ হি./১২১০-১২৫০ খ্রি.) এই ব্যবস্থা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মুহতাসিব[৫০৭] শব্দটি বর্তমান সময়েও আরবি উচ্চারণেই স্প্যানিশ ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

সরকার দেশের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এই প্রয়োজনীয় শিল্পটির সার্বিক তত্ত্বাবধান করত। ওষুধের বিশুদ্ধতা ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার ব্যাপারে ওষুধপ্রস্তুতকারীদের জবাবদিহি করতে হতো। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেনাপতি আল-আফশিন (হায়দার ইবনে কাউস) নিজে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওষুধপ্রস্তুতকারীদের পরিদর্শনে যেতেন এবং তারা যাবতীয় ভালো উপকরণ দিয়ে ওষুধ তৈরি করছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন।[৫০৮]

মন্দকাজ করতে দেখলে মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা। দেখুন, আবুল হাসান আলি আল-মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ. ২৪০।-অনুবাদক

৫০৭. যিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করেন। জবাবদিহি চান।

৫০৮. লুইস সিডিও (Louis-Pierre-Eugène Sédillot), *Histoire des Arabes* (1854), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল আরাবিল আম*, পৃ. ৩৮২।

এভাবে মুসলিমরাই প্রথম ওষুধশাস্ত্রকে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। হিসবাহ (জবাবদিহি)-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ওষুধালয় ও ওষুধপ্রস্তুতকারীদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করেন।[৫০৯]

ম্যাক্স মেয়েরহফ[৫১০] বলেন, এই যুগে ভেষজবিজ্ঞান নিয়ে কী পরিমাণ পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। একক বা অবিমিশ্র ওষুধের যেমন পুস্তক রচিত রয়েছে, তেমনই মিশ্র বা যৌগিক ওষুধ নিয়েও পুস্তক রচিত হয়েছে। একক ওষুধ নিয়ে যারা পুস্তক রচনা করেছেন, কোনোরূপ তর্কবিতর্ক ছাড়াই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন ইবনুল বাইতার। তার রচিত গ্রন্থের নাম كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (*Compendium on Simple Medicaments and Foods*)।[৫১১] তিনি ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল, স্পেন ও সিরিয়া থেকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলোর গুণাগুণ পরীক্ষা করতেন। তিনি তার এই গ্রন্থে ১৪০০টি ভেষজ উদ্ভিদ ও ওষুধের বর্ণনা দিয়েছেন। রেফারেন্স হিসেবে ১৫০জন আরব বিজ্ঞানীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এই গ্রন্থ তার গভীর অধ্যয়ন, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও ব্যাপক জানাশোনার পরিপক্ব ফল। আরবি ভাষায় উদ্ভিদ সম্পর্কে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে এটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।[৫১২]

ওষুধশিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ওষুধপ্রস্তুতকারীরা নতুন নতুন ওষুধ উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র পেয়ে যান। এতে তারা স্থানীয় পরিবেশ থেকেই পরিমিত অনুপাতে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে যৌগিক ওষুধ প্রস্তুতকরণের

---

৫০৯. مبحث إدارة المستشفيات والمراقبة الصحية المجتمع الإسلامي, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত *The Preaching of Islam : A history of the Propagation of the Muslim Faith* গ্রন্থ থেকে। আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام (১৯৫৪), অনুবাদ ও টীকা সংযোজন, জর্জিস ফাতহুল্লাহ, পৃ. ৫১২।

৫১০. Max Meyerhof (১২৯১-১৩৬৪ হিজরি/১৮৭৪-১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) : জার্মান চক্ষু-চিকিৎসক ও প্রাচ্যবিদ। ইউরোপের বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদদের অন্যতম। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯০৩ সালে মিশর ভ্রমণ করেন এবং কায়রোতে অবস্থান করেন। কায়রোতেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

৫১১. উনিশ শতকে গ্রন্থটি ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। আধুনিক মুদ্রণে গ্রন্থটির বিস্তৃতি ৯০০ পৃষ্ঠার বেশি।-অনুবাদক

৫১২. ম্যাক্স মেয়েরহফ, *মাবহাসুত তিব্ব*, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত *তুরাসুল ইসলাম*, পৃ. ৪৮৫।

ধাপে উপনীত হন। রসায়নশাস্ত্র থেকে উপকার লাভের ফলে নতুন নতুন ওষুধ তৈরিতে তারা একটি বড় ধাপ পেরিয়ে যান। কিছু ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভে এসব ওষুধ ইতিবাচক প্রভাব রাখে। যেমন অ্যালকোহল প্রস্তুতকরণ, মার্কারি বা পারদের যৌগ তৈরি, অ্যামোনিয়া সল্ট, সিরাপ ও ইমালশন[৫১৩] তৈরি এবং ছত্রাকীয় নির্যাস তৈরি। তা ছাড়া ঐকান্তিক গবেষণা তাদেরকে উৎস ও শক্তিমাত্রার ভিত্তিতে ওষুধের শ্রেণিবিন্যাস প্রস্তুত করার পথ দেখিয়ে দেয়। তারা তাদের অভিজ্ঞতার বলে এমন কিছু নতুন ভেষজ ওষুধ বা উদ্ভিদের দেখা পান যা পূর্বে পরিচিত ছিল না। যেমন কর্পূর (গাছ), হানজাল বা রাখালশসা[৫১৪] এবং হেনা বা মেহেদি।[৫১৫]

ওষুধবিজ্ঞান নিয়ে অসংখ্য বইপত্র রচিত হয়। ধীরস্থির গবেষণার ফলে নতুন নতুন ওষুধ উদ্ভাবিত হতে থাকে। পুরোনো ওষুধ তো আছেই। ওষুধবিজ্ঞানী বা গ্রন্থপ্রণেতাদের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী এসব ওষুধের নামাবলি বিন্যস্ত হয়। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর বিস্তারিত দৃষ্টান্ত আমরা যেসব গ্রন্থে পাই সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আল-

---

৫১৩. একটি তরল পদার্থের মধ্যে অমিশ্রণীয় অপর একটি তরল পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে বিস্তৃত থাকলে সে মিশ্রণকে ইমালশন বা অবদ্রবণ বলা হয়। ইমালশন দুই প্রকার : ১. পানিতে তেল ইমালশন। যেমন দুধ। এখানে পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে তরল চর্বি বিস্তৃত থাকে। ২. তেলে পানির ইমালশন। যেমন কডলিভার অয়েলে কড মাছের লিভারের তেলে পানি, মাখনে চর্বির মধ্যে পানি, আইসক্রিমের ক্রিমের মধ্যে বরফের কণিকা। স্থায়ী ইমালশন তৈরির জন্য তৃতীয় কোনো পদার্থ ইমালশনের সঙ্গে যোগ করতে হয়। এই তৃতীয় পদার্থকে বলা হয় ইমালশনকার বা অবদ্রবণকারক। পানিতে তেল ইমালশনের ক্ষেত্রে ক্ষার ধাতুর সাবান, গাম-অ্যাকাসিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ইমালশনকারক। ভারী ধাতুঘটিত সাবান তেলে পানির ইমালশনের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়। দুধের ইমালশনকারক হলো ক্যাজিন। জীবাণুনাশক ফিনাইল ও লাইসল পানিতে ঢাললে ইমালশন তৈরি হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং সেই সঙ্গে শিল্প, কৃষি, ওষুধ ও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমালশনের ব্যবহার আছে। ট্যানিং, ডাইয়িং, লুব্রিকেশন শিল্পে ব্যবহৃত কয়েকটি ইমালশন হলো ডিটারজেন্ট, পেইন্ট, বার্নিশ, রেজিন, গাম, গ্লু ইত্যাদি আঠালো পদার্থ।-অনুবাদক

৫১৪. রাখালশসা একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম Citrullus colocynthis, যা Cucurbitaceae পরিবারভুক্ত। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম গবাক্ষী বা ইন্দ্রবারুণী। ইন্দ্রায়ণ নামেও এটি পরিচিত। রাখালশসার ইংরেজি নামগুলো হলো Bitter apple, Colocynth, Vine of Sodom, Citron, Bitter Cucumber, Egusi, desert gourd ইত্যাদি। এটি লতা-জাতীয় উদ্ভিদ। আদি নিবাস ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এশিয়া ও তুরস্ক। এর লতা অনেকটা তরমুজ লতার মতো, এতে ছোট ও শক্ত তিতা ফল হয়।

৫১৫. কাদরি তাওকান, *উলামাউল আরব ওয়া-মা আতাওহু লিল-হাদারাহ*, পৃ. ২৭।

রাজি কর্তৃক রচিত '*কিতাবুল হাবি*', আল-বিরুনি কর্তৃক রচিত '*আস-সাইদালাহ ফিত-তিব্বি*', আলি ইবনে আব্বাস কর্তৃক রচিত '*কামিলুস সানাআহ*' এবং ইবনে সিনা কর্তৃক রচিত '*কিতাবুল কানুন*'।

এই ক্ষেত্রে আল-রাজির রচনাবলি দৃষ্টান্ত হতে পারে। তিনি ওষুধপ্রস্তুতকরণ-সংক্রান্ত কয়েকটি জ্ঞানশাখার ভিত্তি নির্মাণ করে দিয়েছেন। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, প্রস্তুতকরণের পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, সেগুলোর রহস্য ও শক্তি উন্মোচন করেছেন। সেগুলোর বিকল্প কী হতে পারে তাও উল্লেখ করেছেন। যে সময়সীমার মধ্যে ওষুধ সংরক্ষণ সম্ভব তা নির্দেশ করেছেন। তিনি ওষুধের উপাদানগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন : ১. মাটির গর্ভজাত বা খনিজ পদার্থসমূহ ২. উদ্ভিতজাত উপাদান ৩. প্রাণীজাত উপাদান এবং ৪. এগুলো থেকে প্রস্তুতকৃত উপাদান।

মুসলিম ওষুধপ্রস্তুতকারীরা ওষুধ প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়ায় বহু নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ১. আত-তাক্তির বা পাতন, তরল পদার্থ শোধন করার প্রক্রিয়া ২. আল-মালগামাহ বা সংমিশ্রণ, পারদকে অন্যান্য খনিজ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণের প্রক্রিয়া ৩. আত-তাসামি বা ঊর্ধ্বপাতন, কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তরিত না করেই বাষ্পে পরিণত করা, তারপর সেটাকে কঠিন অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া এবং ৪. আত-তাবালুর বা স্ফটিকীকরণ, দ্রবীভূত পদার্থ থেকে স্ফটিক আলাদা করার প্রক্রিয়া ৫. আত-তাকয়িস বা সাধারণ জারণ-প্রক্রিয়া।[৫১৬]

ওষুধবিজ্ঞানে মুসলিমদের আরেকটি আবিষ্কার এই যে, তারা ওষুধকে একবার মধুর সঙ্গে এবং আরেকবার চিনি ও রসের সঙ্গে মেশাতে পারতেন। আরবরা প্রাচীনপন্থীদের বিপরীতে চিনিকে মধুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এর ফলে তারা অনেক উপকারী ওষুধি ফর্মুলা পেয়েছেন।[৫১৭]

আল-রাজিই প্রথম মলম তৈরিতে পারদ ব্যবহার করেন এবং বানরের ওপর প্রয়োগ করে এর কার্যক্ষমতা পরখ করেন। মুসলিম চিকিৎসকেরাই

---

৫১৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫৭।
৫১৭. লুইস সিডিও (Louis-Pierre-Eugène Sédillot), *Histoire des Arabes* (১৮৫৪), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল আরাবিল আম*, পৃ. ৩৮৩।

প্রথম বর্ণনা করেন যে, কফি গাছের বীজ হৃদ্‌রোগের ওষুধবিশেষ। তারা আরও বর্ণনা দেন যে, কফিবীজ (বিচূর্ণ কফি) টনসিল, আমাশয় ও দগদগে জখমের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তারা বলেন যে, কর্পূর হৃৎপিণ্ডকে সঞ্জীবনীশক্তি দান করে। তারা দারুচিনি বা লবঙ্গের সঙ্গে লেবুর রস বা কমলার রস মিশিয়ে কিছু ওষুধের শক্তিও হ্রাস করেন। তারা বিষের প্রতিষেধক ওষুধও প্রস্তুত করতে সমর্থ হন, যা কয়েক ডজন এবং কখনো কখনো কয়েকশ ওষুধের মিশ্রণে তৈরি করা হতো। আফিমের সঙ্গে পারদ মিশিয়ে উপকারী মিশ্রণ তৈরি করেন। রোগীর অনুভূতিবিলোপ বা অ্যানেসথেসিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ভাং ও আফিমের সঙ্গে অন্যান্য বস্তু মিশিয়ে কার্যকরী ওষুধ প্রস্তুত করেন।[৫১৮]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা ওষুধ নিয়ে গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (*Compendium on Simple Medicaments and Foods*)। এটি রচনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-মাকালি, যিনি ইবনুল বাইতার নামে সমধিক পরিচিত (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৪৮ খ্রি.)। তিনি উদ্ভিদের উৎপাদনস্থানগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং কোনো উদ্ভিদ নিয়ে লেখার আগে সেটার বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। ইবনুল বাইতার তার এই গ্রন্থে ইউনানি বা গ্রিক তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন। তিনি এতে প্রায় পনেরোশ ওষুধের বর্ণনা দিয়েছেন। ভেষজ ওষুধ, প্রাণিজ ওষুধ ও খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি ওষুধের বর্ণনা রয়েছে এতে। তিনি এসব ওষুধের ব্যবহাররীতিও বলে দিয়েছেন। আভিধানিক বর্ণমালার ভিত্তিতে ওষুধের নামাবলি সাজিয়েছেন, যাতে খুঁজে পেতে সহজ হয়। এই গ্রন্থে তিনি একটি ভূমিকা রচনা করেছেন। ভূমিকায় তিনি ওষুধ সম্পর্কে তথ্য সংকলনে যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই গ্রন্থ রচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তীদের থেকে আমি যেসব তথ্য নিয়েছি সেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি এবং পরবর্তীদের থেকে তথ্যাবলি যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেছি। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে যা বিশুদ্ধ মনে হয়েছে এবং সংবাদের ভিত্তিতে নয় বরং পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত

---

৫১৮. কাদরি তাওকান, *উলামাউল আরব ওয়া-মা আতাওহু লিল-হাদারাহ*, পৃ. ২৭-২৮।

হয়েছে সেটাকেই আমি প্রবহমান ভান্ডাররূপে সংকলন করেছি। এই ক্ষেত্রে সাহায্যগ্রহণের জন্য নিজেকে আল্লাহ ছাড়া কারও মুখাপেক্ষী মনে করিনি। যে ওষুধের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের বা পরবর্তীদের কারও ভ্রান্তি ঘটে গেছে সে ব্যাপারে সতর্ক করেছি। কারণ তাদের অধিকাংশই বিদ্যমান তথ্যাবলি ও সংবাদের ওপর নির্ভর করেছেন। আর আমি নির্ভর করেছি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর, যেমন ইতিপূর্বে তা আমি উল্লেখ করেছি।[৫১৯]

চিত্র নং-১৫
ইবনে বাইতারের গ্রন্থ

ওষুধবিজ্ঞানের ওপর আবু বকর আল-রাজি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে *'মানাফিউল আগযিয়া'*, *'সাইদালিয়্যাতুত তিব্ব'*, *'আল-হাবি ফিত-তাদাবি'*। আলি ইবনুল আব্বাস *'কামিলুস সানাআতিত তিব্বিয়্যাহ'* ছাড়াও রচনা করেছেন *'আল-মালাকি'*। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি কেবল ওষুধশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এতে তিনি ত্রিশটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেছেন। আবুল কাসিম খাল্‌ফ ইবনে আব্বাস আয-যাহরাবি রচনা করেছেন *'আত-তাসরিফু লিমান আজাযা আনিত তালিফ'*। এতে তিনি একটি অধ্যায়ে কেবল ওষুধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দাউদ আল-আনতাকি[৫২০] রচনা করেছেন *'তাযকিরাতু উলিল আলবাবি ওয়াল-*

---

৫১৯. জালাল মাজহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩০৮-৩০৯; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২২৩।

৫২০. দাউদ ইবনে উমর আল-আনতাকি (মৃ. ১০০৮ হি./১৬০০ খ্রি.) আনতাকিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। ছিলেন অন্ধ। দামেশক, কায়রো, আনাতোলিয়া ভ্রমণ

জামিউ লিল আজাবিল-উজাব'। কোহেন আল-আত্তার রচনা করেছেন '*মিনহাজুদ দাক্কান ওয়া দাসতুরুল আয়ান*'। ইবনে যাহর আল-আন্দালুসি[৫২১] রচনা করেছেন '*আল-জামিউ ফিল-আশরিবাতি ওয়াল মাজুনাত*'। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ইদরিস রচনা করেছেন '*আল-জামিউ লি-সিফাতি আশতাতিন নবাতাত ওয়া দুরুবি আনওয়াইল মুফরাদাতি মিনাল আশজারি ওয়াল-আসমার ওয়াল-উসুল ওয়াল-আযহার*'। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গাফিকি রচনা করেছেন '*জামিউল আদবিয়াতিল মুফরাদাহ*'। আল-কিন্দি চিকিৎসা ও ওষুধবিজ্ঞান নিয়ে বাইশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। '*ফিরদাউসুল হিকমা*'-কে তাবারি কর্তৃক ওষুধবিজ্ঞান বিষয়ে রচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বিবেচনা করা হয়। এটি ওষুধবিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে পুরোনো কোষগ্রন্থ।

ওষুধবিজ্ঞানের নিয়মনীতি নির্ধারণ এবং তার বিকাশ ও ব্যাপকতা সাধনে মুসলিম বিজ্ঞানীরা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে তা-ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওষুধবিজ্ঞান নিয়ে তারা অসংখ্য মূল্যবান স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, ফলে এটি প্রকৃত অর্থেই একটি বিজ্ঞানশাখার মর্যাদা পেয়েছে।

করেছেন। শেষে মক্কায় ভ্রমণ করে সেখানেই স্থির হন। মক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب (ভেষজ-বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ, ৩০০০টি ভেষজ উদ্ভিদের পরিচয় রয়েছে, পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত), رسالة في الفصد والحجامة (চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ) এবং দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ حجر الفلاسفة। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৮, পৃ. ৪১৫-৪১৬।

৫২১. ইবনে যাহর আল-আন্দালুসি : আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে যাহর ইবনে আবদুল মালিক আল-ইশবিলি (৪৬৪-৫৫৭ হি./১০৭২-১১৬২ খ্রি.)। চিকিৎসক। সেভিলের বাসিন্দা। তার যুগে তার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : التيسير في المداواة والتدبير। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ১১০।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভূতত্ত্ববিদ্যা

কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে ভূস্তর-সম্পর্কিত বিদ্যার (জিয়োলজি)[৫২২] প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾

আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো।[৫২৩]

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾

আমি লোহাও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য নানাবিধ কল্যাণ।[৫২৪]

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾

আমি তো তোমাদের দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি।[৫২৫]

এগুলো ছাড়াও আরও বহু আয়াত বিজ্ঞানের এই শাখা অর্থাৎ ভূবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে। এ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীরা ভূতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন কালেও মানবজাতির খনিজ ও আকরিক সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধি ছিল। তবে তা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। গ্রিক

---

৫২২. ভূতত্ত্ব বা ভূবিদ্যা (geology) : ভূস্তর, শিলা ইত্যাদি ভিত্তিক পৃথিবীর ইতিহাস-সম্পর্কিত বিজ্ঞান। ভূবিজ্ঞানের এই শাখায় পৃথিবী, পৃথিবীর গঠন, পৃথিবী গঠনের উপাদানসমূহ, পৃথিবীর অতীত ইতিহাস এবং তার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়।-অনুবাদক

৫২৩. সুরা ফাতির : আয়াত ২৭।

৫২৪. সুরা হাদিদ : আয়াত ২৫।

৫২৫. সুরা আরাফ : আয়াত ১০।

বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে অ্যারিস্টটল (৩৮৩-৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পৃথিবীকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেন : প্রথমত জমিন, যা পানি, আগুন, বায়ু ও মাটি এই চারটি উপাদানের দ্বারা গঠিত এবং দ্বিতীয়ত আকাশ, যা ইথারের দ্বারা গঠিত। ইসলামের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত অ্যারিস্টটলের মতামতই আধিপত্য বিস্তার করে ছিল। ইসলাম এসে যাবতীয় রূপকথা, কল্পকাহিনি ও গালগল্পের অবসান ঘটিয়েছে।[৫২৬]

মুসলিমগণ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে প্রতিটি বিষয় নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সত্য উদ্‌ঘাটনে গবেষণায় ব্রতী হন। ফলে তার প্রাকৃতিক ঘটনাবলির বিচার-বিশ্লেষণে এবং পাথর ও শিলা, পাহাড়-পর্বত ও আকরিক বস্তুরাশির ব্যাখ্যায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। অসংখ্য ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলি, যেমন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, জোয়ারভাটা, পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকার গঠন, নদীনালা, স্রোতপ্রবাহ ইত্যাদির কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন করেছেন। ভূবিজ্ঞানে মুসলিমদের প্রথম কীর্তি সম্ভবত কোষগ্রন্থ ও অভিধানগুলোতে সংকলিত এই জ্ঞান-সম্পর্কিত শব্দভান্ডার। যেমন ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ আল-জাওহারি কর্তৃক রচিত অভিধান '*আস-সিহাহ*', আল-ফাইরুজাবাদি[৫২৭] কর্তৃক রচিত অভিধান '*আল-কামুসুল মুহিত*', ইবনে সিদাহ আল-আন্দালুসি[৫২৮] কর্তৃক রচিত '*আল-মুখাসসাস*'। ভ্রমণ এবং দেশ ও অঞ্চল-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আরও রয়েছে ভৌগোলিক

---

৫২৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৯১।

৫২৭. আল-ফাইরুজাবাদি : আবু তাহির মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে মুহাম্মাদ (৭২৯-৮১৭ হি./১৩২৯-১৪১৫ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম ইমাম। ইরানের শিরাজ নগরের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়ামেনের যুবাইদে মৃত্যুবরণ করেন। '*আল-কামুসুল মুহিত*' তার বিখ্যাত রচনা এবং তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হলো البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৭, পৃ. ১২৬।

৫২৮. ইবনে সিদাহ আল-আন্দালুসি : আবুল হাসান আলি ইবনে ইসমাইল, ইবনে সিদাহ আল-মুরসি নামে পরিচিত (৩৯৮-৪৫৮ হি./১০০৭-১০৬৬ খ্রি.)। ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইমাম। ছিলেন অন্ধ। আন্দালুসের মুরসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন আন্দালুসেরই দানিয়ায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : المخصص، المحكم والمحيط الأعظم، شرح إصلاح المنطق، الأنيق، شرح ما أشكل من شعر، المتنبي، العلام في اللغة على الأجناس، الوافي في علم أحكام العالم والمتعلم، القوافي। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৩৩০-৩৩১।

গবেষণামূলক গ্রন্থাবলি, যেমন হাসান ইবনে আহমাদ আল-হামদানি কর্তৃক রচিত *'সিফাতু জাযিরাতিল আরাব'*।

তারপর আমরা যে-সকল মুসলিম বিজ্ঞানী এই বিজ্ঞানচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে স্পষ্টভাবে পেয়ে যাই ভূতত্ত্ববিদ্যার সীমারেখা। যেমন আল-কিন্দি, আল-রাজি, আল-ফারাবি, আল-মাসউদি, ইখওয়ানুস সাফা, আল-মাকদিসি[৫২৯], আল-বিরুনি, ইবনে সিনা, আল-ইদরিসি, ইয়াকুত হামাবি, আল-কাযবিনি[৫৩০] এবং আরও অনেকে।

এ সকল জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব পেশ করেছেন, ভূমিকম্পের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন, খনিজ বস্তুরাশি ও শিলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পাললিক শিলা ও অশ্মীভূত বস্তুর পরিচয় প্রদান করেছেন। তা ছাড়া শিলার মাত্রাগত রূপান্তর (ডাইমেনশনাল ট্রান্সফরমেশন) সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছেন। উল্কা ও উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে তারা লিখেছেন। উল্কার প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছেন। উল্কাপিণ্ডকে তারা দুই ভাগে ভাগ করেছেন, পাথুরে উল্কাপিণ্ড ও লৌহ উল্কাপিণ্ড। তারা এগুলোর আকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো কর্কশ ও এবড়োখেবড়ো উল্কা। ভূগর্ভের তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কেও তারা আলোচনা করেছেন। ভঙ্গিল পর্বত[৫৩১] স্তূপ

---

৫২৯. আল-মাকদিসি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবু বকর আল-বিনা (৯৪৫-৯৯১ খ্রি.)। ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার উদ্দেশে প্রচুর ভ্রমণ করেছেন। ফলে অধিকাংশ দেশ সম্পর্কে তার জানা হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানচর্চায় ব্রতী হন এবং প্রায় সব মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন। এ বিষয়ে তার অর্জিত জ্ঞানভান্ডার সঞ্চিত আছে তার বিখ্যাত গ্রন্থ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم-এ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৩১২।

৫৩০. আল-কাযবিনি : যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ (৬০৫-৬৮২ হি./১২০৮-১২৮৩ খ্রি.)। ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ। কাজি ছিলেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : آثار البلاد وأخبار العباد, عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات। দেখুন, যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ২, পৃ. ২২; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৪৬।

৫৩১. ভঙ্গিল পর্বত : ভঙ্গ বা ভাঁজ থেকে ভঙ্গিল শব্দটির উৎপত্তি। কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার উঁচু-নিচু ভাঁজ। পৃথিবীর উচ্চতম অধিকাংশ পর্বত এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ভূ-পৃষ্ঠের কোনো অংশে প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে ভূভাগে ক্রমোন্নতি-অবনতির সৃষ্টি হলে সেই স্থানটিতে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পর্বতগুলো কখনো কখনো ৫০০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতার হয়। এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ।-অনুবাদক

পর্বত[৫৩২] ও অন্যান্য শ্রেণিতে পর্বত-বিভাজনের যে তত্ত্ব তাও তারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কী কী কারণে পাহাড়ে ধস নামে এবং নদীপাড়ের মাটি ক্ষয়ে যায় তাও তারা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক ভূবিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক ভূবিজ্ঞান সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা উপহার দিয়েছেন। এসব গবেষণায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান জলের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে দালিলিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের রচনাবলিতে জলের এসব অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নদীনালা গঠনে তাদের মতামত নির্ভেজালভাবে বৈজ্ঞানিক। ইখওয়ানুস সাফার প্রবন্ধসমগ্র (*রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা*), ইবনে সিনার '*আন-নাজাত*' কিতাবে এবং আল-কাযবিনির '*আজায়িবুল মাখলুকাত*' গ্রন্থে আমরা এসব মতামত ও বক্তব্য পাই। একইভাবে কেলাসবিজ্ঞান (Crystallography) সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন আল-বিরুনি। তার হাতেই বিজ্ঞানের এই শাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তার রচিত '*আল-জামাহির ফি মারিফাতিল জাওয়াহির*'[৫৩৩] গ্রন্থে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। তারপর এই বিজ্ঞান বিকশিত হয় আল-কাযবিনির হাতে, তিনি তার '*আজায়িবুল মাখলুকাত*' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তারা দুজন যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করেছেন, যার বিবরণ তাদের কিতাবে পাওয়া যায়, তাতে কেউই তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা সেই বিজ্ঞানশাখা নিয়েও আলোচনা করেছেন যাকে আমরা খনিজ তেল-বিষয়ক বিজ্ঞান (বা পেট্রোলিয়াম জিয়োলজি) বলতে পারি। এটি প্রায়োগিক ভূবিজ্ঞানের একটি শাখা। তারা দুই ধরনের খনিজ তেলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং দুই ধরনের তেলই তারা ব্যবহার করেছেন। তারা তেল অনুসন্ধান (পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন) সম্পর্কেও

---

৫৩২. স্তূপ পর্বত : ভূ-আলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে প্রসারণ ও সংকোচনের সৃষ্টি হয়। এই প্রসারণ ও সংকোচনের জন্য ভূত্বকে ফাটল তৈরি হয়। কালক্রমে এসব ফাটল বরাবর ভূত্বক স্থানচ্যুত হয়। ভূগোলের ভাষায় একে চ্যুতি বলে। ভূত্বকের এমন স্থানচ্যুতি কোথাও উপরের দিকে হয়, কোথাও হয় নিচের দিকে। চ্যুতির ফলে উঁচু হওয়া অংশকে স্তূপ পর্বত বলে। ভারতের বিন্ধ্যা ও সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাকিস্তানের লবণ পর্বত স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।-অনুবাদক

৫৩৩. গ্রন্থটির বিষয়বস্তু আকরিক ও খনিজ পদার্থ, শিলা ও পাথর।

আলোচনা করেছেন এবং তেল অনুসন্ধানের কয়েকটি নকশাও তারা প্রদান করেছেন।

মুসলিমদের প্রাথমিক পর্যায়ের বিজ্ঞানীদের অনেকেই পৃথিবীর গঠন, স্থলভাগ ও জলভাগের বিভাজন এবং ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিবরণ-বিষয়ক গবেষণায় গুরুত্বারোপ করেছেন। পৃথিবীর গঠনের বাহ্যিক উপাদান নিয়েও তারা আলোকপাত করেছেন। যেমন নদীনালা, সমুদ্র, বায়ু, সামুদ্রিক ঝড় ইত্যাদি। যেসব অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ভূত্বকে পরিবর্তন সাধিত হয় তা নিয়েও তারা চিন্তাভাবনা করেছেন। যেমন আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, ভূমিধস ও স্থানচ্যুতি। স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যে স্থানের অদলবদল এবং এই অদলবদলের সময়সীমা সম্পর্কেও তারা আলোচনা করেছেন। নদীর উৎপত্তি ও উচ্ছল প্রবাহ, তারপর বার্ধক্য এবং তারপর মৃত্যু—এসব বিষয় নিয়েও আলোকপাত করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিমদের অধীত ভূতত্ত্ববিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞানশাখার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই এগিয়েছে। যা তার বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভে সাহায্য করেছে। তখনকার বিজ্ঞানীদের এটাই ছিল রীতি। বিজ্ঞানশাখাগুলোর মধ্যে এখনকার মতো সূক্ষ্ম বিভাজন ছিল না, বরং ব্যাপক ও সামগ্রিক অধ্যয়ন-গবেষণা ছিল। তাই মুসলিম বিজ্ঞানীদের জিয়োলজি ও ভূবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট কাজগুলো বিভিন্ন নামের অসংখ্য গ্রন্থাবলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন আমরা দেখি যে, ইবনে সিনা তার *'আশ-শিফা'* গ্রন্থে খনিজ পদার্থ ও আবহাওয়া-সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে আকরিক ও আবহাওয়াবিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। শিহাবুদ্দিন আন-নুওয়াইরি[৫৩৪] আবহবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভূতত্ত্ববিদ্যা নিয়েও আলোকপাত করেছেন তার *'নিহায়াতুল আরাবি ফি ফুনুনিল আদাব'* গ্রন্থে। আল-মাসউদি তার *'মুরুজুয যাহাবি ওয়া মাআদিনুল*

---

৫৩৪. আন-নুওয়াইরি : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আহমাদ আল-বাকরি (৬৭৭-৭৩৩ হি./১২৭৮-১৩৩৩ খ্রি.)। বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানী গবেষক। মিশরের বনি সুওয়াইফের একটি গ্রাম নুওয়াইরার দিকে সম্পর্কিত করে তাকে আন-নুওয়াইরি বলা হয়। মূলত তিনি কাওসে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। *'নিহায়াতুল আরাবি ফি ফুনুনিল আদাব'* তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *আদ-দুরারুল-কামিনাহ*, খ. ১, পৃ. ২৩১।

জাওহার' কিতাবে ভৌগোলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভূতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর পর্যালোচনাও করেছেন।[৫৩৫]

ভূমিকম্প

আদিকাল থেকেই ভূমিকম্পের বিষয়টি মানুষের মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রেখেছে। কতিপয় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ভূ-অভ্যন্তরীণ বায়ুপ্রবাহের ফলে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয় বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, পৃথিবীর গভীর তলদেশে রয়েছে আগুন, তাই দেখা দেয় ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের উৎপত্তি ও কার্যকারণ-সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা প্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ পায় মুসলিমদের হাতে, হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে (খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে)। মুসলিম বিজ্ঞানীরা তখন ভূমিকম্প, ভূমিকম্প সংঘটনের ইতিহাস ও ভূকম্পনপ্রবণ এলাকাগুলোর ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান করেন। ভূমিকম্পের প্রকারভেদ, তার শক্তিমাত্রা, ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসলীলা এবং এর ফলে উদ্‌গত শিলারাশির স্থানান্তর ও তার অপকার-উপকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার ওপর জোর দেন। ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে কমানো যায় তার কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন কেউ কেউ। ইবনে সিনার '*আশ-শিফা*' গ্রন্থের খনিজ পদার্থ ও আবহাওয়া-সম্পর্কিত অংশে, ইখওয়ানুস সাফার '*রাসায়িল*'-*এ* এবং আল-কাযবিনির '*আজায়িবুল মাখলুকাত*'-এ এসব বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তারা সবাই তাদের স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে ইবনে সিনার বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য, তা সংঘটনের কারণ ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে ইবনে সিনা বলেছেন, ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর কোনো একটি অংশের কম্পন, যা তার অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্টি হয়। ভূ-অভ্যন্তরে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তার ফলে আবশ্যকভাবে ওই অংশের ভূত্বকও কেঁপে ওঠে। ভূ-অভ্যন্তরে যে অংশটির নড়ে ওঠা সম্ভব তা হয়তো বাষ্পীভূত, ধূমায়িত ও বাতাসের মতো প্রবলবেগ কাঠামো, বা খরস্রোতা জলীয় কাঠামো, অথবা বায়বীয় কাঠামো, কিংবা আগ্নেয় কাঠামো অথবা ভূমি-কাঠামো। অবশ্য

---

[৫৩৫]. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৯১ থেকে উদ্ধৃত।

ভূমি-কাঠামোর কম্পনের জন্য এমন একটি কারণ দরকার, যা এই ভূত্বকের কম্পনের কারণের অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে প্রথম কারণটিই ভূমিকম্পের সংঘটক। অন্যদিকে বায়বীয় কাঠামো—চাই তা আগ্নেয় হোক বা অন্যকিছু—নিজেই ভূ-অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূত্বকে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।[৫৩৬]

ইখওয়ানুস সাফা ভূমিকম্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ভূ-অভ্যন্তরের উত্তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ওসব গ্যাসই ভূমিকম্প ঘটিয়ে থাকে। যদি ওই ভূখণ্ডের জমিন আলগা-আলগা হয় তবে সেসব গ্যাস ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে, অন্যথায় ভূমিতে ফাটল ধরে ও সেসব গ্যাস বেরিয়ে পড়ে এবং ভূমিতে ধস নামে। ফলে তীব্র আওয়াজ ও কম্পন অনুভূত হয়।[৫৩৭]

খনিজ ও শিলা

মুসলিম বিজ্ঞানীরা খনিজ পদার্থ ও মূল্যবান পাথরসমূহের পরিচয় দিয়েছেন এবং সেগুলোর প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করেছেন। খনিজ পদার্থ ও শিলারাশির স্তরবিন্যাস সাজিয়েছেন এবং সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বর্ণনা প্রদান করেছেন। খনিজ পদার্থ ও মূল্যবান পাথর কোথায় পাওয়া যায় সেসব জায়গাও চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট আর কোনটি অপকৃষ্ট তা নির্ণয় করার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়েছেন। পাললিক শিলার গঠন, তার উপরিভাগের গঠন, উপত্যকার পলল, ভূমির সঙ্গে সমুদ্রের ও সমুদ্রের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক এবং সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট পাথুরে কাঠামো ও ভূমিক্ষয়ের কার্যকারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন।

সম্ভবত উতারিদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাসিব[৫৩৮] প্রথম ব্যক্তি যিনি আরবি ভাষায় পাথর সম্পর্কে বই রচনা করেছেন। এই বইটির নাম '*মানাফিউল*

---

৫৩৬. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২৬৪; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৩১৪।

৫৩৭. ইখওয়ানুস সাফা, *রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা*, খ. ২, পৃ. ৯৭, দারু সাদির, বৈরুত।

৫৩৮. উতারিদ ইবনে মুহাম্মাদ : উতারিদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাবিলি আল-বাগদাদি (মৃ. ২০৬ হি./৮২১ খ্রি.)। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ১. العمل بالأسطرلاب ২. تركيب الأفلاك। দেখুন, ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৩৬।

আহজার। তিনি এই বইয়ে মণিমুক্তা ও মূল্যবান পাথরের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।[৫৩৯] আল-রাজি এই বইটির কথা তার '*আল-হাবি*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল-বিরুনির যুগ পর্যন্ত মুসলিমরা ভূমি থেকে উত্তোলিত বস্তুরাশির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ৮৮টি মণিমাণিক্য ও মূল্যবান পাথরের সন্ধান পেয়েছেন।

ইবনে সিনা তার '*আশ-শিফা*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনটি কারণে শিলা গঠিত হয়। মাটি শুষ্ক হতে হতে তা থেকে গঠিত হয়, পানি বাষ্পীভূত হওয়ার ফলেও শিলা গঠিত হয় এবং পলল জমেও শিলা গঠিত হয়। তিনি খনিজ পদার্থগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন : শিলা বা পাথর, গন্ধক বা সালফার, লবণ বা দ্রবীভূত বস্তুসমূহ। ইবনে সিনা ধাতুসমূহেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেগুলোর গঠনের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বহু আকরিক ও খনিজ পদার্থের নাম উল্লেখ করে সেগুলোর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এসব পদার্থের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কীভাবে বজায় থাকে তাও উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক পদার্থের বিশেষ গঠনরূপ রয়েছে, আমাদের পরিচিত রূপান্তরপ্রক্রিয়ায় সেগুলোর পরিবর্তন ঘটে না। যা ঘটা সম্ভব তা হলো ধাতুর আকৃতি ও কাঠামোর বাহ্যিক পরিবর্তন।[৫৪০]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা খনিজ পদার্থসমূহের প্রাকৃতিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাহ্যিক কার্যকারণের ফলে সেগুলোর বিশেষ গুণ ও স্বভাবে কী ধরনের পদার্থগত পরিবর্তন সাধিত হয় তা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু খনিজ পদার্থ প্রাকৃতিকভাবেই নির্দিষ্ট জ্যামিতিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং তাদের এরূপ গঠনে মানুষের কোনো হাত নেই। আমরা বর্তমান সময়ে যাকে কেলাসবিজ্ঞান নাম দিয়েছি তারই প্রাথমিক লক্ষণ ছিল এটা। আল-বিরুনি এসব পদার্থের কয়েকটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর উপরিভাগ পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কাঠামো জ্যামিতিক। তিনি উদাহরণ হিসেবে হীরার কথা উল্লেখ করেছেন। হীরার আকৃতি তার একান্ত নিজস্ব, মোচাকার বহুভুজী। কোনো কোনো হীরা হয়ে থাকে যৌগিক

---

৫৩৯. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২৬১।
৫৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

ত্রিভুজাকৃতির, অগ্নিসদৃশ তলগুলো পরস্পর সংলগ্ন, আবার কোনো কোনো হীরা আছে দ্বৈত পিরামিড আকৃতির।

শিলার উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে মুসলিম বিজ্ঞানীরা আলোকপাত করেছেন। জলপ্রবাহের ফলে পলল জমে যে শিলা গঠিত হয়েছে তা হলো পাললিক শিলা[৫৪১] এবং অগ্নিময় অবস্থা থেকে যে শিলার সৃষ্টি হয়েছে তা হলো আগ্নেয় শিলা[৫৪২]। তা ছাড়া তারা অসংখ্য শিলা ও ধাতুর নির্দিষ্ট ভর বের করেছেন, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও যথাযথ। ভূবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তারা ভূ-সংস্থান[৫৪৩], ভূ-প্রকৃতি, জলীয় ভূতত্ত্ব[৫৪৪], জীবাশ্মবিজ্ঞান, মহাকাশীয় প্রভাব বা আবহবিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আবহবিদ্যা বা আবহাওয়াবিজ্ঞান হলো ভূবিদ্যা ও জলবায়ুবিজ্ঞানের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক।[৫৪৫]

---

৫৪১. পৃথিবীর শুরু থেকে যেসব শিলা উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে কঠিন হয়েছে তা-ই আগ্নেয় শিলা। অগ্নিময় অবস্থা থেকে এ শিলার সৃষ্টি হয়েছিল বলে একে আগ্নেয় শিলা বলে। আগ্নেয় শিলার অন্য নাম অস্তরীভূত শিলা (Unstratified Rock), প্রাথমিক শিলা। আগ্নেয় শিলা স্ফটিকাকার, অপেক্ষাকৃত ভারী, কঠিন ও কম ভঙ্গুর। এতে জীবাশ্ম দেখা যায় না। যেমন গ্রানাইট, গ্যাব্রো, ব্যাসল্ট, ডাইক, ল্যাকোলিথ, ব্যাথোলিথ ইত্যাদি।

৫৪২. পলি বা পলল সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠন করে তা পাললিক শিলা। এ শিলায় পলি সাধারণত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। পাললিক শিলা নরম ও হালকা, সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পাললিক শিলায় জীবাশ্ম যেমন দেখা যায়, তেমনই ছিদ্রও দেখা যায়। যেমন চুনাপাথর, কয়লা, নুড়িপাথর, বেলেপাথর, পলিপাথর, চক, কোকিনা, লবণ, ডোলোমাইট, জিপসাম, ডায়াটম ইত্যাদি।-অনুবাদক

৫৪৩. ভূ-সংস্থান (Topography) : যেকোনো ভৌগোলিক এলাকার প্রাকৃতিক এবং মানবিক দৃশ্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ ও উপস্থাপনকে ভূ-সংস্থান বলে। এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি বলতে যেকোনো এলাকার উদ্ভিদ, প্রাণী, নদনদী, ভূমির বন্ধুরতা, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বিবরণকে বোঝায়। মানবিক দৃশ্যাবলি বলতে যেকোনো এলাকার বসতি, নগর-বন্দর, হাটবাজার, রাস্তাঘাট, স্কুলকলেজ, অফিস-আদালত, পরিবহন ইত্যাদির বিবরণকে বোঝায়। ভৌগোলিক পঠনপাঠনের জন্য যেকোনো এলাকার প্রাকৃতিক ও মানবিক দৃশ্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো ভৌগোলিক এলাকার যাবতীয় প্রাকৃতিক ও মানবিক দৃশ্যাবলির বিভিন্ন সূচক ও চিহ্ন দিয়ে প্রদর্শিত মানচিত্রকে ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র (Topographic Map) বলে। এটি হলো বৃহৎ স্কেল বা মাপনীর মানচিত্র।-অনুবাদক

৫৪৪. হাইড্রোগ্রাফি বা পৃথিবীর জলভাগ সম্বন্ধে গবেষণামূলক বিজ্ঞান।-অনুবাদক

৫৪৫. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

সমুদ্র ও জোয়ারভাটা

মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের ভূগোল-সংশ্লিষ্ট রচনাবলিতে সমুদ্র ও নদীভিত্তিক ভূতত্ত্ব নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা করেছেন, যা অন্যকোনো বিষয় নিয়ে করেননি। ভূগোল-বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে তারা আলাদা আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন, যেখানে সমুদ্রসমূহের নাম, সমুদ্রের অবস্থান ও সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। স্থলভাগের যেসব জায়গা একসময় নদী ও সমুদ্র ছিল এবং অতীতকালের যেসব জনপদ সমুদ্রে পরিণত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নৌচালনবিদ্যা নিয়ে তারা গ্রন্থ রচনা করেছেন। জোয়ারভাটার ঘটনাবলি—যার ওপর নদীপথে ও সমুদ্রপথে চলাচলের সময় জাহাজের নাবিকেরা নির্ভর করে থাকেন—সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এসব বিষয়ে যে-সকল মুসলিম বিজ্ঞানীর নিজস্ব মতামত ও বক্তব্য ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে আল-কিন্দি, আল-মাসউদি, আল-বিরুনি, আল-ইদরিসি, আল-মাকদিসি প্রমুখ।

যেসব গ্রন্থে দেশ ও অঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে তার কোনোটিই নদী ও সমুদ্র-সম্পর্কিত বিবরণ থেকে মুক্ত নয়। আল-মাসউদি তার '*আখবারুয যামান*' কিতাবে সমুদ্রের গঠন ও তার কার্যকারণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী মনীষীদের বক্তব্য কী তা নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার '*মুরুজুয যাহাব*' কিতাবে একগুচ্ছ ভূতাত্ত্বিক পর্যালোচনা রয়েছে, যেখানে সমুদ্র ও নদী এবং জোয়ারভাটা সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। তিনি সমুদ্র সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন, যার নাম ذكر الأخبار عن انتقال البحار (সমুদ্রের স্থানান্তর-সম্পর্কিত তথ্যাবলি)।[৫৪৬]

আল-মাকদিসি এসব সমুদ্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমূহ এবং বিপজ্জনক স্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি জোয়ারভাটা-সংক্রান্ত ঘটনাবলির উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।[৫৪৭]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা জলীয় পৃষ্ঠের (সমুদ্রপৃষ্ঠের) বিস্তৃতি পরিমাপ করেছেন এবং স্থলভাগের সঙ্গে মিলে তার আয়তন কতটা বিশাল হয় তাও

---

৫৪৬. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ২১৯।

৫৪৭. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৩১০।

জানিয়েছেন। ভূপৃষ্ঠের নানা প্রকারের উঁচু গঠন সম্পর্কে তারা আলোকপাত করেছেন। এসব উঁচু গঠনের ফলেই সমুদ্রের জলরাশি পৃথিবীকে তলিয়ে দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইয়াকুত হামাবি বলেছেন, এসব উঁচু অংশ না থাকলে (সমুদ্রের) পানি স্থলভাগের চারপাশ ঘিরে তাকে নিমজ্জিত করে ফেলত। ফলে পৃথিবীর কোনো স্থলভাগই প্রকাশ পেত না। পৃথিবীর জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ কতটুকু সে সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ পাই আবুল ফিদার কাছে। তিনি তার '*তাকবিমুল বুলদান*' কিতাবে জলভাগ ও স্থলভাগের অনুপাত উল্লেখ করে বলেছেন, ভূপৃষ্ঠের যে অংশ জলে আচ্ছন্ন তার পরিমাণ ৭৫%। পৃথিবীর যে অংশ উন্মোচিত বা দৃশ্যমান তা প্রায় এক চতুর্থাংশ, আর বাকি তিন চতুর্থাংশ সমুদ্রে নিমজ্জিত।[৫৪৮]

ভূপ্রকৃতিবিজ্ঞান বা ভূমিরূপবিদ্যা

মুসলিম বিজ্ঞানীরা জিয়োমোরফোলজি (ভূপ্রকৃতিবিজ্ঞান) বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা করেছেন। তারা এমন কিছু বাস্তবিক সত্যে উপনীত হয়েছেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কালগত কার্যকারণের ভূমিকা ও প্রভাব, স্থলভাগ ও জলভাগের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় শিলাচক্র ও জ্যোতিশ্চক্রের প্রভাব, ইরোশন বা ক্ষয়কার্যে পানি, বাতাস ও জলবায়ু এদের প্রত্যেকটির সাধারণ ভূমিকা। বিজ্ঞানের এই দিকটি যারা ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল-বিরুনি। ভারতবর্ষের একটি সমতলভূমির গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই জায়গায় একটি সমুদ্র অববাহিকা ছিল। এখানে পলি জমতে থাকে এবং পলি জমতে জমতে একসময় তা সমতলভূমিতে পরিণত হয়। নদীর পলি সঞ্চিত হওয়ার ঘটনাও তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিশেষ করে যখন নদী মোহনার কাছাকাছি আসে তখন পলি বেশি জমে। মূল নদী তার উৎসের কাছে বড় আকারের হয় এবং মোহনার কাছাকাছি এসে তা তুলনামূলক ছোট আকার ধারণ করে। আল-বিরুনির বক্তব্য, পাহাড়ের কাছে পাথরগুলো বড় বড় এবং নদীর জলের প্রবাহও তীব্র, দূরে এসে পাথরগুলো হয় ছোট এবং জলের প্রবাহও থিতিয়ে আসে। জলের প্রবাহ

---

৫৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২-৩২৪।

ধীর হয়ে এলে সমুদ্রে প্রবেশপথের কাছাকাছি বালু জমতে থাকে। তাদের এসব সমতলভূমি প্রাচীন কালে সমুদ্র ছিল, তারপর জলপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বালু ও পলি জমে তা সমতলভূমিতে পরিণত হয়।[৫৪৯]

জিয়োমোরফোলজির ক্ষেত্রে ইবনে সিনার বক্তব্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আধুনিক তাত্ত্বিক মতামতের কাছাকাছি। উদাহরণত, তিনি কিছু পাহাড় গঠনের ক্ষেত্রে দুটি কার্যকারণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। একটি হলো প্রত্যক্ষ কার্যকারণ, অপরটি পরোক্ষ। যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী ভূমিকম্প ভূমির একটি অংশকে স্থানান্তর করে ফেলে তখন সরাসরি ছোট পাহাড় জেগে ওঠে। এটি প্রত্যক্ষ কারণ। যখন ঝড়ো হাওয়া বা খাত সৃষ্টিকারী খরস্রোতা জল পার্শ্ববর্তী ভূমির কিছু অংশের ক্ষয় ঘটায় এবং কিছু অংশ স্বাভাবিক থাকে, ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ নিচু হয়ে যায় এবং তার পাশের অংশ উঁচু থাকে। তারপর এই নিচু অংশ দিয়ে জলপ্রবাহ তার পথ তৈরি করে নেয় এবং তা ধীরে ধীরে গভীর হতে থাকে। পাশের অংশ উঁচু টিলার মতোই থেকে যায়। এটা হলো পরোক্ষ কারণ।[৫৫০]

আবহবিদ্যা (মিটিয়োরোলজি)

মুসলিম বিজ্ঞানীরা আবহবিদ্যা[৫৫১] বা আবহাওয়াবিজ্ঞানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তারা এই বিজ্ঞানকে علم الآثار العلوية (উচ্চ প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান) নামে আখ্যায়িত করেছেন। বায়ুমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা, ঘনত্ব, তাপমাত্রার স্তর, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ ও বৃষ্টি এই বিজ্ঞানের মূল বিষয়। একে علم الأرصاد الجوية (আবহাওয়া বিজ্ঞান)-ও বলা হয়। অবশ্য আরও আগে আরব ভাষাবিজ্ঞানীরা এই বিজ্ঞান-সম্পর্কিত বহু পরিভাষা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে কিছু পরিভাষা এখানে উল্লেখ করা হলো। তারা কম তাপমাত্রাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন।

---

৫৪৯. আল-বিরুনি, *তাহকিক মা লিল হিন্দ*, পৃ.৮০।

৫৫০. প্রাগুক্ত।

৫৫১. আবহাওয়াবিজ্ঞান বা আবহবিদ্যা (Meteorology) : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণকারী বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার বিভিন্নতা নিয়ে যে বিজ্ঞান তার নাম আবহবিদ্যা। আবহাওয়াবিদগণ বায়ুর বেগ, তাপমাত্রা, চাপ, বৃষ্টি, শিলাবর্ষণ, শিশির, কুয়াশা, তুষারপাত, বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক পদার্থ (যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন) ইত্যাদির পরিমাণ পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করেন, আবহাওয়া সম্পর্কে অনুমান করেন এবং ভবিষদ্বাণী করেন।

যথা : বার্‌দ (ঠান্ডা), হার্‌র (উষ্ণ), কুর্‌র (ঠান্ডা), যামহারির (অতিশয় ঠান্ডা), সাকআ (হিম বা হিমাঙ্কের নিচের ঠান্ডা), সির্‌র (প্রচণ্ড ঠান্ডা), আরিয (বিপজ্জনক ঠান্ডা)। বেশি তাপমাত্রাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা : হার্‌র (উষ্ণ), হারুর (বেশি গরম), কায়য (অতিশয় গরম), হাজিরাহ (তীব্র গরম), ফায়হ (আগুনের মতো গরম)। তারা বায়ুকেও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন, বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসারে অথবা বায়ুর বৈশিষ্ট্য অনুসারে। বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসারে বায়ুর প্রকার : শাম্‌আল, শামাল, শামিয়া (উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), জানুব বা তায়াম্মুন (দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), সাবা (পুব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), দাবুর (কাবার পেছন থেকে প্রবাহিত বায়ু), আস-সাবাবিয়্যাহ (উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), আল-আযয়াব (দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), আদ-দাজিন (দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), আল-জারয়াবা (উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু)। বৈশিষ্ট্য অনুসারে বায়ুর প্রকার : গরম বায়ুকে বলা হয় সামুম, শীতল বায়ুকে বলা হয় সারসার, বর্ষণমুখর বায়ুকে বলে মু'সিরা এবং বর্ষণহীন বায়ুকে বলে আকিম।

আরব ভাষাবিজ্ঞানীরা মেঘেরও বিভিন্ন নাম দিয়েছেন যা সেগুলোর বিভিন্ন অংশ ও গঠনের স্তরসমূহকে নির্দেশ করে। যেমন গামাম (এমন মেঘ যার দ্বারা আকাশের চেহারা পালটে যায়), মুয্‌ন (বৃষ্টিমুখর সাদা মেঘ), সাহাব (বজ্রহীন ও ঝড়হীন বর্ষণমুখর মেঘ), আরিদ (দিগন্তে ভাসমান মেঘ), দিমাহ (ঝড়-বজ্রহীন স্থির মেঘ), রাবাব (সাদা মেঘ)। মেঘের অংশসমূহ: হাইদাব, মানে নিচের মেঘ, কিফাফ, মানে উপরের মেঘ; রাহা, মানে মধ্যবর্তী স্তরে ভাসমান মেঘ, খিনদিয, মানে মেঘের দূরবর্তী প্রান্ত, বাওয়াসিক, মানে মেঘের সর্বোচ্চ অংশ। যে পানি আকাশ থেকে নামে বা কম তাপমাত্রার কারণে জমে যায় তারও বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন কাত্‌র (ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া বৃষ্টিজল), নাদা (শিশির), সাদা (রাতের শিশির), দাবাব (কুয়াশা), তাল্‌ল (কুয়াশার মতো বৃষ্টি), গায়স (বৃষ্টি), রাযায (ঝিরিঝিরি বৃষ্টি), ওয়াবিল (প্রবল বৃষ্টি), হাতিল (নিরবচ্ছিন্ন তুমুল

বৃষ্টি), হাতুন (প্রবল বর্ষণ)। এগুলোর প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইবনে সিনা ও ইখওয়ানুস সাফা।[৫৫২]

জীবাশ্মবিজ্ঞান (palaeontology)

মুসলিম বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে গিয়ে এবং সমুদ্রের শুষ্ক ভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রমাণাদি উপস্থিত করতে গিয়ে জীবাশ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। আল-বিরুনি তার *'তাহদিদু নিহায়াতি আমাকিনি লি-তাসহিহি মাসাফাতিল-মাসাকিন'* কিতাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ জলে নিমজ্জিত ছিল। ভূতাত্ত্বিক কালপরিক্রমায় তা থেকে পানি সরে যায়। কেউ যদি জলাশয় বা কূপ খনন করে, সেখানে সে পাথর দেখতে পাবে, সেই পাথর ভাঙলে তা থেকে বেরিয়ে আসবে শঙ্খ (বা সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক)। এই যে আরব মরুভূমি, তা একসময় সমুদ্র ছিল, সমুদ্রের জল শুকিয়ে গিয়ে ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে জলাশয় বা কূপ খনন করতে গেলেই আমরা তার স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাই। মাটি, বালু ও কঙ্করের কয়েকটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। তারপর পাওয়া যায় মৃৎপাত্র বা কুমারের মাটি, কাচ ও হাড়। এর অর্থ এই নয় যে, এখানে আগমনকারী কাউকে এখানে দাফন করা হয়েছিল। খননের ফলে পাথরও বেরিয়ে আসে। পাথর ভাঙলে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে শঙ্খ। একে মাছের কান বলা হয়। এসব শঙ্খ হয়তো নিজ অবস্থায় বহাল থাকে অথবা জীর্ণ হয়ে মিলিয়ে যায়, তখন তার কাঠামো আকারেই ওই জায়গাটুকু পাথরের ভেতরে খালি থাকে।[৫৫৩]

আল-বিরুনি এখানে ফসিল বা জীবাশ্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এগুলো হলো অশ্মীভূত পূর্ণাঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা পাথরের অভ্যন্তরে খোদাই হওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিহ্ন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, কিছু অঞ্চল পানিতে নিমজ্জিত ছিল, তারপর তা স্থলভাগে পরিণত হয়েছে।

---

৫৫২. *রিসালাতুল আসারিল আলাবিয়্যা*, *মিন রাসায়িলি ইখওয়ানিস সাফা*, দারু সাদির, বৈরুত, খ. ২, পৃ. ৬২ ও তার পরবর্তী।

৫৫৩. আল-বিরুনি, *তাহদিদু নিহায়াতিল আমাকিনি লি-তাসহিহি মাসাফাতিল মাসাকিন'* ইস্তাম্বুলের জামে আল-ফাতিহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে জার্মান প্রাচ্যবিদ Fritz Krenkow কর্তৃক চয়নকৃত অংশ। *আল-মুজাল্লাদুত তাযকারি*, পৃ. ২০৪।

ইবনে সিনাও আল-বিরুনির অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। কোনো শুকনো ভূখণ্ডে বা স্থলভাগে জলজ প্রাণীর জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে এই এলাকা কোনো এক সময় জলে নিমজ্জিত ছিল। *আশ-শিফা* গ্রন্থে ইবনে সিনার বক্তব্য এসেছে এভাবে, অনুমিত হয় যে, এই আবাদিত জনপদ প্রাচীন কালে আবাদ ছিল না, বরং সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। পরে তা প্রস্তরীভূত হয়েছে। প্রস্তরীভবনের ঘটনা ঘটেছে হয়তো সমুদ্র থেকে পানি সরে গিয়ে তা উন্মোচিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে, বছরের পর বছর ধরে, যার বিবরণ ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে সুরক্ষিত থাকেনি। অথবা সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তাতে প্রস্তরীভবনের ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রথম কারণটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই ক্ষেত্রে সমুদ্র-এলাকার মাটি এঁটেল হওয়ায় তা প্রস্তরীভবনে সাহায্য করেছে। আবাদিত জনপদে প্রচুর পাওয়া গেছে। এসব পাথর ভাঙলে ভেতরে পাওয়া গেছে জলজ প্রাণীর খোলস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যেমন শঙ্খ ও অন্যান্য প্রাণী।[৫৫৪]

এই প্রসঙ্গে ইবনে সিনা আরও বলেছেন, প্রাণীর ও উদ্ভিদের অশ্মীভবনের (পাথরে বা ফসিলে পরিণত হওয়া) যেসব ঘটনা শোনা যায় তা সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়। এর পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। কিছু সামুদ্রিক এলাকায় ভূগর্ভে প্রচণ্ড শক্তির চাপ অশ্মীভবনের ঘটনা ঘটিয়েছে। অথবা ভূমিকম্প ও ভূমিধসের কারণে ভূখণ্ডের একটি অংশ সরে গেছে এবং এর ফলে সেখানে অশ্মীভবনের ঘটনা ঘটেছে।[৫৫৫]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের গ্রন্থসমূহে ও রচনাবলিতে ভূতত্ত্ব ও ভূবিজ্ঞান বিষয়ে যা-কিছু লিখেছেন, উপরিউক্ত আলোচনা তার সিন্ধুর মধ্যে ভাসমান হিমশৈলের একটি চূড়ামাত্র। এ থেকেই অগ্রগামিতা ও নেতৃত্বের দিকটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বিজ্ঞানীরাই ভূবিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন ইবনে সিনা, আল-বিরুনি ও আল-কিন্দি। মুসলিম বিজ্ঞানীরা এই ক্ষেত্রে যে অবদান ও কীর্তি রেখে গেছেন আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্যা তারই সম্প্রসারিত রূপ।

---

৫৫৪. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২৬৩।

৫৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

বীজগণিত

বীজগণিতের সূচনা ও তার ভিত্তি স্থাপন করেছেন বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী আল-খাওয়ারিজমি (১৬৪-২৩২ হি./৭৮১-৮৪৬ খ্রি.)। মিরাসের অংশবণ্টনে কিছু জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি বীজগণিতের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন। তিনি বীজগণিতের কিছু মূলনীতি ও নিয়ম স্থির করেছেন যা একে প্রকৌশল ও গণিতের অন্যান্য শাখা থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞানের মর্যাদা দান করেছে।

আল-খাওয়ারিজমিই প্রথম বর্তমানে আলজেব্রা নামে পরিচিত জ্ঞানশাখাটির জন্য 'জাব্‌র' শব্দটি ব্যবহার করেন। ইউরোপীয়রা তার থেকে তা গ্রহণ করে। এখনো পর্যন্ত 'আল-জাব্‌র' তার আরবি নামেই ইউরোপের যাবতীয় ভাষায় পরিচিত। তা ইংরেজি ভাষায় Algebra এবং ফরাসি ভাষায় Algèbre। অন্যান্য ভাষায়ও অনুরূপ। ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে যত শব্দে algorithme বা algorithm বা algorism রয়েছে তা 'আল-খাওয়ারিজমি' নামটির অপভ্রংশ। মানুষকে আরবি সংখ্যা শেখানোর কৃতিত্বও তারই। তাই তো আল-খাওয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক বলা হয়।[৫৫৬]

---

৫৫৬. কারাম হিলমি ফারহাত, *আত-তুরাসুল ইলমি লিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিশ শাম ওয়াল ইরাক খিলালাল কারনির রাবিয়িল হিজরি* পৃ. ৬৪২-৬৪৩, মুহাম্মাদ আলি উসমান, *মুসলিমুনা আল্লামুল আলামা*, পৃ. ৭৪-৭৫, আকরাম আবদুল ওয়াহহাব, *মিয়াতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াযহাল আলাম* পৃ. ২০।

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب وضعه محمد بن موسى الخوارزمي افتتحه بأن قال
الحمد لله على نعمه بما هو أهله من محامده التي بأداء ما افترض منها على من يعبده
من خلقه يقع اسم الشكر ويستوجب المزيد ويؤمن من الغير إقرارا بربوبيته
وتذللا لعزته وخشوعا لعظمته بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله
بالنبوة على حين فترة من الرسل وتنكر من الحق ودروس من الهدى فبصر به من العمى
واستنقذ به من الهلكة وكثر به بعد القلة وألف به بعد الشتات تبارك
الله ربنا وتعالى جده وتقدست أسماؤه ولا إله غيره وصلى الله على محمد النبي وآله
وسلم ولم تزل العلماء في الأزمنة الخالية والأمم الماضية يكتبون الكتب
مما يصنفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة نظرا لمن بعدهم واحتسابا
للأجر بقدر الطاقة ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك وذخره وذكره ويبقى لهم
من لسان الصدق ما يصغر في جنبه كثير مما كانوا يتكلفونه من المؤونة ويحملونه
على أنفسهم من المشقة في كشف أسرار العلم وغامضه إما رجل سبق إلى ما
لم يكن مستخرجا قبله فورثه من بعده وإما رجل شرح مما أبقى الأولون
ما كان مستغلقا فأوضح طريقه وسهل مسلكه وقرب مأخذه وإما رجل
وجد في بعض الكتب خللا فلم شعثه وأقام أوده وأحسن الظن بصاحبه غير راد
عليه ولا مفتخر بذلك من فعل نفسه وقد شجعني ما فضل الله به الإمام
المأمون أمير المؤمنين مع الخلافة التي حاز له إرثها وأكرمه بلباسها وحلاه
بزينتها من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وإدنائهم وبسط كنفه لهم ومعونته
إياهم على إيضاح ما كان مستبهما وتسهيل ما كان مستوعرا على أن ألفت من
حساب الجبر والمقابلة كتابا مختصرا حاصرا للطيف الحساب وجليله
لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم
وتجاراتهم وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكري الأنهار
والهندسة

চিত্র নং-১৬

আল-খাওয়ারিজমি রচিত 'আল-জাবরু' (বীজগণিত)

আল-খাওয়ারিজমির কিতাব *'আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা'* গণিতশাস্ত্রের একটি প্রধান বই এবং বিপুল প্রভাবসঞ্চারী। এতে তিনি সমীকরণের পক্ষান্তর ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন যে, খলিফা আল-মামুন তাকে এই গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কীভাবে তিনি অনুরোধ জানান তারও বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থটি লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন জেরার্ডো ডি ক্রিমোনা (Gerardo de Cremona)।[৫৫৭] ১৮৫১ সালে লন্ডন থেকে গ্রন্থটির আরবি ভাষ্যসহ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন ফ্রেডেরিক রোজেন। তিনিই এটির অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। অনূদিত গ্রন্থটির নাম *The Algebra Of Mohammed Ben Musa*।

আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা গ্রন্থটির একাধিক অনুবাদের ফলে ভারতীয় গণিত ও দশমিক পদ্ধতির[৫৫৮] ব্যবহার ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি সেখানে গাণিতিক ক্রিয়া-কার্য Alguarismo নামে পরিচিতি লাভ করে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এগুলোই আবার আরবিতে অনূদিত হয় اللوغاريتمات নামে, যদিও তা মূলত আল-খাওয়ারিজমির প্রতি সম্বন্ধিত। এর সঠিক তরজমা হবে الخوارزميات বা الجداول الخوارزمية।

আল-খাওয়ারিজমির *আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা* গ্রন্থটি খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণিতশাস্ত্রের প্রধান উৎস হিসেবে বিরাজমান ছিল। তার পরে যারা আলজেব্রা বা বীজগণিত নিয়ে বই লিখেছেন তাদের অধিকাংশই এই গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল। আরবি ভাষা থেকে লাতিন ভাষায় এটির অনুবাদ করেন রবার্ট অব চেস্টার (Robert of Chester)। ফলে এর দ্বারা ইউরোপ আলোকিত হয়। আধুনিক কালে দুইজন ডক্টর মিশরীয় পদার্থবিদ আলি মুস্তাফা মুশরাফা ও মিশরীয় গণিতবিদ মুহাম্মাদ মুরসি আহমাদ *আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা* গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।[৫৫৯] এটি كتاب الجبر والمقابلة، تحقيق:

---

৫৫৭. গ্রন্থটি রবার্ট অব চেস্টার (Robert of Chester) কর্তৃক লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।-অনুবাদক

৫৫৮. Decimal Numeral System.-অনুবাদক

৫৫৯. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, মুবতাকির ইল্‌মিল-জাবর... মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি, *মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যা*, খ. ৫, পৃ. ১৮৭ এবং *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৭৭; মুহাম্মাদ আলি উসমান, *মুসলিমুনা আল্লামুল*

علی مصطفی مشرفة ومحمد مرسی أحمد নামে ১৯৩৭ সালে কায়রোর পল বেরি প্রকাশনাসংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।

আল-খাওয়ারিজমির পর এই পথপরিক্রমা সমাপ্ত করেন আবু কামিল শুজা আল-মিশরি[৫৬০], আবু বকর আল-কারখি[৫৬১] ও উমর আল-খাইয়াম[৫৬২] এবং অন্যান্য প্রতিভাবান মুসলিম গণিতবিদ।

আলামা, পৃ. ৭৭; আবদুল হালিম মুনতাসির, *তারিখুল ইলম ওয়া দাওরুল উলামাইল আরাব ফি তাকাদ্দুমিহি*, পৃ. ৬৫।

৫৬০. শুজা আল-মিশরি : আবু কামিল শুজা ইবনে আসলাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে শুজা (মৃ. ৩১৮ হি./৯৩০ খ্রি.)। আবু কামিল আল-হাসিব নামেও পরিচিত। মিশরীয় গণিতজ্ঞ ও প্রকৌশলী। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

كتاب الجمع والتفريق، كتاب الخطأين، كتاب كمال الجبر وتمامه والزيادة في أصوله ويعرف بكتاب الكامل، كتاب الوصايا بالجبر والمقابلة، كتاب الجبر والمقابلة، كتاب الوصايا بالجذور، كتاب الشامل في الجبر والمقابلة ، كتاب الطرائف في الحساب، كتاب الجمع والتفريق، كتاب الخطأين، كتاب الكفاية، كتاب المساحة والهندسة والطير، كتاب مفتاح الفلاح، رسالة في المخمس والمعشر، كتاب العصير، كتاب الفلاح.

দেখুন, ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৩৯; উমর রিদা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৪, পৃ. ২৯৫।

৫৬১. আবু বকর আল-কারখি (আল-কারজি) : মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-কারখি (মৃ. ৪১০ হি./১০২০ খ্রি.)। গণিতজ্ঞ, প্রকৌশলী। ইরাকের আমির বাহাউদ দাওলার উজির ফাখরুল মালিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার অনুরোধে তিনি বীজগণিত বিষয়ে *কিতাবুল ফাখরি* রচনা করেন। তার আরও দুটি গ্রন্থ *আল-বাদি ফিল-হিসাব* এবং *আল-কাফি ফিল-হিসাব*। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১২৫; ফুয়াদ সেযগিন, *তারিখুত তুরাসিল আরাবি*, খ. ১, পৃ. ৫৬২।

৫৬২. উমর আল-খাইয়াম : উমর ইবনে ইবরাহিম আল-খাইয়ামি আন-নিশাপুরি (১০৪৮-১১২১ খ্রি.)। পার্সিয়ান কবি, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। বীজগণিত সম্পর্কে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি তার লেখা। এই গ্রন্থে তিনি দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান ও ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্পর্কে একটি টীকাও আছে তার। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি একটি মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, উন্নত জ্যোতিষ-সারণি রচনা ও মুসলিম বর্ষপঞ্জির সংস্কার সাধন (১০৭৪ খ্রি.) করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন ও অধিবিদ্যা নিয়েও লিখেছিলেন তিনি। আইন ও ইতিহাস সম্পর্কেও তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তুর্কি সুলতানদের দরবারে তিনি ছিলেন সম্মানিত বৈতনিক সভাসদ। সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি অবশ্য বেশি পরিচিত কবি হিসেবে, *রুবাইয়াতের* রচয়িতারূপে। বাংলা ও ইংরেজিসহ বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এই কবিতাগুচ্ছ থেকে উমর আল-খাইয়ামের শাশ্বত ভাবনা, গভীর অনুভূতি ও জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। দেখুন, আব্বাস আল-কোমি, *সাফিনাতুল বিহার*, খ. ১, পৃ. ৪৩৬; ইবনুল আসির, *আল-কামিল*, ৪৭৬ হিজরির ঘটনাবলি।

শূন্য (০) প্রবর্তন

শূন্য (০)-এর প্রবর্তন গণিতশাস্ত্রে মুসলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও মহাকীর্তি। কোনো সন্দেহ নেই যে, শূন্য (০) গাণিতিক কার্যাবলিকে সহজতর করে দিয়েছে এবং গণিতবিজ্ঞানকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। শূন্য (০) না থাকলে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক গাণিতিক সমীকরণের সমাধান ততটা সহজে করতে পারতেন না, যা এখন করতে পারছেন। গণিতের বিভিন্ন শাখায় যে অগ্রগতি ঘটেছিল তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এর ফলে সভ্যতার যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তা বিস্ময়কর।[৫৬৩]

দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান

গণিতশাস্ত্রে মুসলিমদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও কীর্তি হলো দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান। একে ঘন সমীকরণও বলে। তারা দ্বিঘাত সমীকরণের কয়েকটি সমাধানপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। গণিতের আধুনিক গ্রন্থগুলোতে এখনো এসব সমাধানপদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা জানিয়েছেন যে, এ ধরনের সমীকরণের দুটি রুট (Root) বা মূল থাকে। মূল দুটি ধনাত্মক হলে কীভাবে সেগুলোকে বের করতে হবে তাও তারা জানিয়েছেন। মুসলিমজাতি যেসব বিষয়ে অগ্রগামী এবং পূর্ববর্তী সব জাতি থেকে এগিয়ে রয়েছে তার মধ্যে গণিতশাস্ত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার অন্যতম। তারা কতিপয় সমীকরণের সমাধানের জন্য প্রকৌশলীয় পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন। আল-খাওয়ারিজমির *আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা* গ্রন্থের 'আলা-মাসাহাত' অধ্যায়ে এমন কিছু প্রকৌশলীয় প্রক্রিয়া রয়েছে যেগুলোর সমাধান করা হয়েছে বীজগণিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমরাই প্রথম প্রকৌশলীয় সমস্যার (engineering problem) সমাধানে বীজগণিতের ব্যবহার চালু করেন।[৫৬৪]

---

৫৬৩. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।
৫৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহার

যদিও বলা হয়ে থাকে যে ডাচ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ সিমোন স্টেভিন[৫৬৫] প্রথম দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা দেন এবং তিনিই প্রথম এর ব্যবহার চালু করেন, কিন্তু তা যথার্থ নয়। মুসলিম গণিতজ্ঞ গিয়াসুদ্দিন জামশেদ আল-কাশি[৫৬৬] মূলত প্রথম ব্যক্তি, যিনি দশমিক ভগ্নাংশের প্রতীক প্রবর্তন করেছিলেন এবং সিমোন স্টেভিনের ১৭৫ বছরেরও বেশি পূর্বে তা ব্যবহার করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহারের উপকারিতা এবং তা ব্যবহার করে অঙ্ক কষার পদ্ধতিও বলে দিয়েছিলেন। তিনি তার *'মিফতাহুল হিসাব'* গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দশমিক ভগ্নাংশ আবিষ্কার করেছেন, যাতে ওইসব ব্যক্তিদের জন্য অঙ্ক কষা সহজ হয় যারা ষষ্ঠিক (sexagesimal) পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। সুতরাং তিনি জেনেশুনেই বলছেন যে, তিনি একটি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছেন।[৫৬৭]

গণিতে প্রতীকের ব্যবহার

আল-খাওয়ারিজমির পরবর্তীকালে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গাণিতিক ক্রিয়া-কার্যে প্রতীকের (÷ ،× ،- ،+) ব্যবহার শুরু করেন। আল-কালাসাদি

---

৫৬৫. সিমন স্টেভিন (Simon Stevin 1548-1620) : গ্যালিলিও, কেপলার ও দেকার্তের মতো তিনিও 'নতুন' বিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠাতা। নতুন পদ্ধতি ও প্রথাবিরোধী প্রতীতে তার আগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানের প্রাচীন পদ্ধতি ও প্রণালিসমূহকে তিনি সচেতনভাবে বাতিল করেছিলেন। জলগতিবিজ্ঞানের কলাকৌশলে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী এবং এই বিষয়ে একটি সরকারি পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, নৌপরিবহন ও রসায়নসহ বিভিন্ন শাখা তার অনুশীলনের ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে। পাটিগণিত ও বীজগণিত সম্পর্কে লেখা তার গ্রন্থ পরবর্তীকালের অনেক উল্লেখযোগ্য গণিতবিদকে অনুপ্রাণিত করেছে। -অনুবাদক

৫৬৬. আল-কাশি : গিয়াসুদ্দিন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাশি (১৩৮০-১৪২১ খ্রি.)। হিজরি নবম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। খুরাসানের কাশান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সমরকন্দে মৃত্যুবরণ করেন। বর্গমূল, ঘনমূলের মতো পূর্ণসংখ্যার ঘাতবিশিষ্ট মূল নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। বহু শ্রেষ্ঠ আরব বিজ্ঞানীর মতো তিনিও অনুবাদের কাজ করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : كتاب زيج الخاقاني، الأبعاد والأجرام، نزهة الحدائق، رسالة سلم السماء، رسالة المحيطية، رسالة الجيب والوتر، مفتاح الحساب। দেখুন, উমর রিদা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৮, পৃ. ৪৩; নাসরিন মুস্তাফা, *জামশিদ গিয়াসুদ্দিন আল কাশি : জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার অবদান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ২০০৯, প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৫৬৭. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৬।

আল-আন্দালুসির[৫৬৮] রচনাবলিতে, বিশেষ করে '*কাশফুল আসরারি আন ইলমি হুরুফিল গুবার*' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তা থেকে গাণিতিক প্রতীক ব্যবহারের বিষয়টি যথার্থ প্রমাণিত হয়। গণিতের বিভিন্ন শাখার অগ্রগামিতা ও উৎকর্ষ লাভে এসব প্রতীক ব্যবহারের যে ভূমিকা ও প্রভাব তা কারও অজানা নয়। কিন্তু সত্যিকারই আফসোসের ব্যাপার যে, ফরাসি বিজ্ঞানী ফ্রাঁসোয়া ভিয়েটাকে[৫৬৯] গণিতে প্রতীক ব্যবহারের প্রবর্তক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বলা হয় যে, তিনি এসব গাণিতিক প্রতীক ও চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। অথচ তার জীবৎকাল ১৫৪০-১৬০৩ খ্রি.।[৫৭০]

ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান

উমর আল-খাইয়াম (৪৩৬-৫১৭ হিজরি) বীজগণিতীয় ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান করেন। কনিক সেকশন বা কনিক ব্যবহার করে বহুপদী সমীকরণের সমাধানপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা মানবসভ্যতাকে যা-কিছু দিয়েছেন এটি তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

---

৫৬৮. আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল-কুরাশি আল-বাসতি (৮১৫-৮৯১ হি./১৪১২-১৪৮৬ খ্রি.)। আন্দালুসের বাজায় (বাস্তায়) জন্মগ্রহণ করেন এবং তিউনিসিয়ার বাজায় মৃত্যুবরণ করেন। গণিতবিদ। মালিকি মাযহাবপন্থী ইমাম। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : شرح التبصرة الواضحة في المنطق، كشف الجلباب عن علم الحساب، الأرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابلة أشرف كتاب النصيحة في السياسة العامة والخاصة، مسائل الأعداد، شرح أيساغوجي في اللائحة المسالك إلى مذهب مالك، । দেখুন, শামসুদ্দিন আস-সাখাবি, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, খ. ৬, পৃ. ৫; হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ১, পৃ. ১৫৩।

৫৬৯. ফ্রাঁসোয়া ভিয়েটা (François Viète 1540-1603) : ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ বীজগণিতজ্ঞ বলে পরিচিত। ত্রিকোণমিতি তার বিকাশের উন্নত পর্যায়ে এসে বীজগণিতের সঙ্গে যখন জড়িয়ে পড়তে লাগল তখন ভিয়েটা এই দুটি শাখা নিয়েই পাশাপাশি কাজ করেছিলেন। তার বলয়ের ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতির প্রয়োগ তার বীজগাণিতিক অঙ্কপাতনকে সাহায্য করেছিল। গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আধুনিক ধারণার প্রবর্তনে তিনি উভয় শাখা থেকে উপাদান সংগ্রহ শুরু করেছিলেন। ভিয়েটা প্রাচীন গ্রিক গণিতজ্ঞ আপোলোনিয়াসের একটি মূল সমস্যারও সমাধান করেছিলেন, প্রদত্ত তিনটি বৃত্তকে স্পর্শ করে একটা বৃহদাকার বৃত্ত অঙ্কন। π (পাই)-এর মান নির্ধারণের একটি উন্নত পদ্ধতিও তিনি দেখান। জ্যোতির্বিদ্যায় অবশ্য তার মোটেও দখল ছিল না। সেজন্য তিনি ক্যালেন্ডারের গ্রেগরীয় সংস্কার ও সংশোধনের বিরোধিতা করেছিলেন।-অনুবাদক

৫৭০. জালাল মাযহার : *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৮, আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা : *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম* পৃ. ৬৫।

কীর্তি। উমর আল-খাইয়াম যে অধিবৃত্ত (parabola) ও বৃত্তের (বৃত্তের ছেদকের) সাহায্যে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান করেছেন তা থেকেই প্রতিভাত হয় যে তিনি (শূন্যে অবস্থিত কোনো) বিন্দুর স্থানাঙ্ক (সঠিক অবস্থান) ব্যাখ্যার জন্য আনুভূমিক স্থানাঙ্ক[৫৭১] সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। উমর আল-খাইয়াম তার এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক বা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির[৫৭২] ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় প্রথম ইটগুলো স্থাপন করেন। অথচ রেনে দেকার্তেকে এর প্রবর্তক আখ্যায়িত করা হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির বিকাশ ও মূলনীতি স্থিরীকরণে দেকার্তের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা গণিতশাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটির উদ্ভাবক উমর আল-খাইয়ামের ভূমিকার কথা ভুলে যাব।[৫৭৩]

---

৫৭১. Horizontal Coordinate/X–coordinate বা ভুজ।-অনুবাদক

৫৭২. স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বিশ্লেষণী জ্যামিতি (Analytic geometry) : গণিতশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে জ্যামিতি আলোচনা করার জন্য বীজগণিত প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় একে বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতিও বলা হয়। এটি সাধারণত কো-অর্ডিনেট জ্যামিতি বা কার্টেসিয়ান জ্যামিতি নামে পরিচিত। পদার্থবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষায় এর গুরুত্ব অসীম। স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে সমতলে অবস্থান করা একটি বিন্দুর স্থানকে একজোড়া সংখ্যার সহায়তায় উপস্থাপন করা হয়। একে সংখ্যাজোড়ক স্থানাঙ্ক বলা হয়। সমতলে একটি বিন্দুর অবস্থান জানতে একজোড়া অক্ষ ব্যবহার করা হয়। y অক্ষ থেকে একটি বিন্দুর দূরত্বকে x স্থানাঙ্ক বা ভুজ বলা হয়। x অক্ষ থেকে একটি বিন্দুর দূরত্বকে y স্থানাঙ্ক বা কোটি বলা হয়। x অক্ষের উপরে থাকা একটি বিন্দুর স্থানাঙ্কের অবস্থান $(x, 0)$ এবং y অক্ষের উপরে থাকা একটি বিন্দুর স্থানাঙ্কের অবস্থান $(0, y)$।-অনুবাদক

৫৭৩. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৬৫।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

যন্ত্রপ্রকৌশল

গ্রিক, রোমান, পারসিক, চৈনিক বিজ্ঞানীরা যন্ত্রপ্রকৌশলের ময়দানে যেসব ছড়ানো-ছিটানো তত্ত্ব ও নিয়ম রেখে গিয়েছিলেন তা-ই ছিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক অবলম্বন। পরে তারা যন্ত্রপ্রকৌশলের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং নতুন কৌশল ও যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই বিজ্ঞান তাদের নতুন নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য প্রায়োগিক বিজ্ঞানশাখায় পরিণত হয়েছে। আগে এমন কৌশলজ্ঞান কেবল বিনোদন ও জাদুবিদ্যাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরব বিজ্ঞানীরা এই বিজ্ঞানশাখার নাম দিয়েছিলেন 'ইলমুল হিয়াল' বা (প্র)কৌশলবিজ্ঞান বা কৌশলবিদ্যা। এমন নামকরণ করে তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এসব কৌশল অবলম্বন করে কঠিন পরিস্থিতি ও অবস্থাকে আয়ত্তে এনে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। অর্থাৎ, এতে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও মানবিক কর্মশক্তি পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পায় এবং কৌশলগত শক্তি ব্যাপকতা লাভ করে। মানবশক্তি ও পশুশক্তি থেকেও বহুগুণ বেশি শক্তি আয়ত্তে চলে আসে এবং এর দ্বারা যেকোনো উপকার হাসিল করা যায়।

কৌশলবিদ্যার উদ্দেশ্য

মুসলিম বিজ্ঞানীরা কৌশলবিদ্যা কাজে লাগিয়ে মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছেন, শক্তির জায়গায় কৌশল এবং পেশির জায়গায় বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। দেহের জায়গায় ব্যবহার করতে চেয়েছেন যন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণি ও দাসদের বন্দিদশা, বাধ্যতামূলক শ্রম ও কায়িক পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বিশেষ করে যেহেতু ইসলাম অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে এমন বৈষয়িক কর্মকাণ্ডে বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করেছে। একইভাবে ইসলাম শ্রমিকশ্রেণির ওপর কষ্টদায়ক ও তীব্র ক্লান্তিকর কাজ চাপিয়ে দিতেও নিষেধ করেছে। প্রাণীদের কষ্ট দেওয়াও হারাম করেছে। অর্থাৎ, প্রাণীদের দিয়ে তাদের সাধ্যাতীত বোঝা টানানো বা বহন করানো যাবে না। এ কারণে

মুসলিমদের দৃষ্টি ছিল নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করার দিকে, যাতে মানুষ ও প্রাণীর বদলে যন্ত্রপাতি দিয়েই কষ্টকর কাজগুলো সম্পন্ন করা যায়। এটা মূলত মানুষের সভ্যতাজনিত প্রবণতা। যেসব জাতির মধ্যে এমন প্রবণতা রয়েছে তারা জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে গেছে। এই প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই নতুন কিছু আবিষ্কারের দর্শন ঘুরপাক খায়, যে আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনায় কাঠামোবদ্ধ রূপ লাভ করে। কারণ এর পেছনে সক্রিয় থাকে মানুষের জীবনকে সুন্দর করার এবং মানবজীবন থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের কষ্টকে দূরীভূত করার অভিপ্রায়।

ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানজগতে উপকারী কৌশলবিজ্ঞান (ইলমুল হিয়ালিন নাফিআ) অগ্রসর প্রযুক্তিগত দিকটিই সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদরা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানবিদ্যাকে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ধর্মের সেবায় এবং সভ্যতা ও নগরায়ণের প্রতিটি দিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা কল্যাণকর প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন।

প্রাচীন লোকেরা কৌশলবিদ্যা কাজে লাগিয়ে তাদের ধর্মাদর্শের অনুসারীদের ওপর ধর্মীয় ও আত্মিক প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। যেমন গণকদের মাধ্যমে চলাফেরা করে বা কথা বলে এমন পুতুল ব্যবহার করত। উপাসনাগুলোতে সংগীত, অর্গান ও শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা হতো। প্রাচীন লোকদের কৌশলবিদ্যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল এগুলোই। ইসলাম আসার পর তা বান্দা ও তার রবের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করল তাতে কোনো ওসিলা বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ল না। মানুষের চোখে বিভ্রাট সৃষ্টি করারও কোনো দরকার হলো না। তখন 'উপকারী কৌশলবিদ্যার' নতুন উদ্দেশ্য হলো সক্রিয় (মেকানিক্যাল) যন্ত্র ব্যবহার করে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করা। সক্রিয় ও চলমান যন্ত্র বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে এমন সব যন্ত্রপাতি যাদের সক্রিয়তা ও চলমানতা বায়ুর গতি অথবা জলের গতি বা সুষম অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের ভাষায় এদের প্রথমটিকে বলে এরোডাইনামিক্স (বায়ুগতিবিদ্যা)[৫৭৪] এবং দ্বিতীয়টিকে

---

৫৭৪. বায়ুগতিবিদ্যা (Aerodynamics) : এটি বায়ুবলবিদ্যার একটি শাখা। এই শাস্ত্র বাতাস ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ গতিশীল অবস্থায় যেসব ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে এবং বল প্রয়োগ করে তা নিয়ে আলোচনা করে। যদি কোনো বস্তু বাতাস বা কোনো গ্যাসে নিমজ্জিত অবস্থায়

বলে হাইড্রোডাইনামিক্স (জলগতিবিদ্যা)[৫৭৫] বা হাইড্রোস্ট্যাটিক্স (জলস্থিতিবিদ্যা)[৫৭৬]। এগুলোর সঙ্গে আরও ছিল ধীরগতির অপারেটিং সিস্টেমযুক্ত কপাটিকা[৫৭৭], দূরবর্তী স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণপদ্ধতিতে কার্যক্ষম ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, জলসাঁকো ও কৃত্রিম জলপ্রণালি (Aqueduct), প্রকৌশলীয় ব্যবস্থা, স্থাপত্য-কারুকার্য ও অন্যান্য বিষয়।[৫৭৮]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে যন্ত্রপ্রকৌশলের বিকাশ

আমরা যন্ত্রপ্রকৌশলের বা উপকারী কৌশলবিদ্যার শুরুর দিনগুলোতে ফিরে গেলে দেখতে পাই যে, ইসলামি বিশ্বে যন্ত্রপ্রকৌশলের প্রযুক্তি বিকাশ লাভ করতে থাকে হিজরি তৃতীয় শতাব্দী (খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী) থেকেই এবং তা ঘটে একদল প্রতিভাবান মুসলিম বিজ্ঞানীর হাতে। শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই আমরা যন্ত্রপ্রকৌশলের বিকাশের ধাপগুলো জানতে পারি। কারণ তারাই ছিলেন যন্ত্রপ্রকৌশলের ময়দানে ইসলামি প্রযুক্তিবিদ্যার পথিকৃৎ।

১. মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা (বানু মুসা ইবনে শাকির)

তারা ছিলেন তিন ভাই। বড় ভাইয়ের নাম মুহাম্মাদ (মৃ. ২৫৯ হি./৮৭৩ খ্রি.)। তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী, ভূগোলবিদ ও

গতিশীল হয় বা এদের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক বেগ থাকে তবে তাও এই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। বায়ুগতিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা রয়েছে।

৫৭৫. জলগতিবিদ্যা (Hydrodynamics) : তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান। কেবল আপেক্ষিকভাবে বর্ণনাযোগ্য অনবচ্ছিন্ন বলবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে অসংনম্য (incompressible) তরলের গতিসূত্রগুলো এবং সীমানার সঙ্গে তরলের মিথস্ক্রিয়া আলোচিত হয়।-অনুবাদক

৫৭৬. জলস্থিতিবিদ্যা (Hydrostatics) : স্থিতাবস্থায় তরলের আলোচনা। গতি অনুপস্থিতির তির্যক পীড়ন থাকে না, যেকোনো বিন্দুতে পীড়নের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নির্ধারিত হয় শুধু চাপের দ্বারাই। সুতরাং কোনো বিন্দুতে চাপের পরিমাণ সব দিকেই সমান থাকে। সব সীমাপৃষ্ঠের ওপর সচরাচর চাপ কাজ করে। অভিকর্ষের আওতায় সুস্থিতির জন্য যেকোনো আনুভূমিক প্রস্থচ্ছেদের ওপর চাপ সমান হয়, এতে (তরল) ধারণকারী পাত্রের আকার কোনো গুরুত্ব বহন করে না। উচ্চতা বা গভীরতা অনুযায়ী চাপের তারতম্য হয়।-অনুবাদক

৫৭৭. কপাটিকা (Valve) : একটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র। নালি ব্যবস্থায় এবং যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রবাহের ধারা নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্র কপাটিকা ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রপাতিতে প্রবাহী-প্রতিষঙ্গ অনেক সময় ঝলকিত অথবা সবিরাম প্রকৃতির এবং সংশ্লিষ্ট গিয়ারসহ কপাটিকা একটা সময় নির্বাচনী বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। -অনুবাদক

৫৭৮. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ২৯-৩০।

শারীরবৃত্তবিদ। দ্বিতীয় ভাই আহমাদ ছিলেন যন্ত্রপ্রকৌশলী। তৃতীয় ভাই হাসান (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৪ খ্রি.) ছিলেন প্রকৌশলী ও ভূগোলবিদ। হিজরি তৃতীয় শতকে (খ্রিষ্টীয় নবম শতকে) তাদের জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রপ্রকৌশলে তারা ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। *'হিয়ালু বানি মুসা'* (*Book of Ingenious Devices*) গ্রন্থটির জন্য তারা সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। এটি যন্ত্রবিজ্ঞানের একটি প্রধান ও মূল্যবান গ্রন্থ। ইবনে খাল্লিকান এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, কৌশলবিদ্যায় তাদের একটি বিস্ময়কর দুর্লভ গ্রন্থ রয়েছে। এতে সব ধরনের বিস্ময়কর কৌশলের বর্ণনা রয়েছে। আমি এই গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি এবং দেখেছি যে এটি একটি সমৃদ্ধ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।[৫৭৯]

বানু মুসার *'কিতাবুল হিয়াল'*-এ একশ যন্ত্র-স্থাপন (mechanical installation) কৌশল রয়েছে। প্রতিটির সঙ্গে বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে এবং ব্যাখ্যামূলক চিত্রও রয়েছে। চিত্রগুলোতে যন্ত্র-স্থাপন ও যন্ত্রটি চালানোর পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। বানু মুসার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা ও কলাকৌশলের মধ্যে ছিল একাধিক ধরনের স্বয়ংক্রিয় কপাটিকা (ভাল্‌ভ), নির্দিষ্ট সময়ের পর সক্রিয় হয়ে ওঠা যন্ত্রব্যবস্থা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। তা ছাড়া তারা উদ্ভাবন করেছিলেন মোচাকার কপাটিকা (কনিক্যাল ভাল্‌ভ), রোধনী কপাটিকা (প্লাগ ভাল্‌ভ), স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যক্ষম ক্র্যাংক-দণ্ড[৫৮০] ইত্যাদি। এসব আবিষ্কার ছিল নজিরবিহীন। ইউরোপে যে আধুনিক ক্র্যাংক চালু আছে, পাঁচশ বছর আগেই তার প্রথম যান্ত্রিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছিলেন মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা।[৫৮১]

---

৫৭৯. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১৬১।

৫৮০. ক্র্যাংক বা ঘোড়া (Crank) : এটি এমন একটি যান্ত্রিক সংযোগ যা নির্দিষ্ট অক্ষের চারদিকে ঘুরতে পারে। ক্র্যাংকের ঘূর্ণনের কেন্দ্রে থাকে তার পিভট (pivot)। এই পিভট হচ্ছে ক্র্যাংকের দণ্ড (Crankshaft)। এই দণ্ড ক্র্যাংকটিকে নিকটস্থ সংযোগস্থলের সঙ্গে যুক্ত করে।- অনুবাদক

৫৮১. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩০।

বানু মুসার কয়েকটি যান্ত্রিক কাঠামোর উদাহরণ :

- হারিকেন বাতি (Hurricane lamp) : প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে রেখে দিলেও এই বাতির আলো নেভে না।
- স্ব-সজ্জিত বাতি (Self-trimming lamp) : নিজেই সলতে বের করে নেয় এবং নিজেই তেল টেনে নেয়। কেউ দেখলে মনে করে যে, আগুন কোনো তেল পোড়াচ্ছে না এবং বাতিটির মূলত কোনো সলতেই নেই।
- ফোয়ারা : এ ফোয়ারা থেকে কিছু সময় বর্শার মতো পানি বেরোয় এবং অনুরূপ সময় আইরিস ফুলের মতো পানি বেরোয়। এভাবে অনবরত চলতেই থাকে।

তাদের যান্ত্রিক আবিষ্কারগুলোর যেটি সবচেয়ে বিস্ময়কর সেটি হলো নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য বিশাল আকারের একটি যন্ত্র। যন্ত্রটি তারা তাদের মানমন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাসবিদগণ এই যন্ত্র সম্পর্কে অপার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। জলপ্রবাহের শক্তি প্রয়োগ করে এটিকে ঘোরানো হতো। যন্ত্রটি আকাশের নক্ষত্ররাজির খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করত এবং এক বৃহদাকার আয়নায় তা প্রতিফলিত করত। আকাশে কোনো তারা ভেসে উঠলেই তা এই যন্ত্রে ধরা পড়ত এবং কোনো তারা বা উল্কা ডুবে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে তা ধরা পড়ত। এগুলোর রেকর্ডও লিখে রাখা হতো।[৫৮২]

মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা কৃষিকাজের জন্যও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেন। যেমন নির্দিষ্ট আকারের প্রাণীদের জন্য বিশেষ খাদ্যপাত্র তৈরি করেন, প্রাণীরা এসব পাত্র থেকে অন্যদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি না করে সহজেই নিজেদের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পারত। কৃষিজমিতে স্থাপন করার জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেন, এসব যন্ত্র স্থাপন করা হলে কৃষিজমির পানি নষ্ট হয় না। তা ছাড়া এসব যন্ত্রের দ্বারা জমিতে জলসেচ-ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তারা গোসলখানার জন্য ট্যাংকও তৈরি করেন। তরলের ঘনত্ব পরিমাপের জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাদের এসব সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তা প্রযুক্তির (উপকারী কৌশলের) বা যন্ত্রপ্রকৌশলের উন্নতি ও অগ্রগামিতায় বড় ভূমিকা পালন করেছে। কারণ উর্বরতা-সমৃদ্ধ

---

৫৮২. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ১২২।

চিন্তাভাবনা, সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যায়ন ও প্রাগ্রসর পরীক্ষামূলক পদ্ধতির কারণে তাদের প্রদত্ত ডিজাইন ও নকশাগুলো ছিল অনন্য ও অসাধারণ।[৫৮৩]

২. বদিউযযামান আল-জাযারি[৫৮৪]

উপকারী কৌশল-প্রযুক্তির ময়দানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক উদ্ভাবনগুলোর মধ্যে রয়েছে যান্ত্রিক ঘড়ি ও উত্তোলন-যন্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের নকশা। দাঁতযুক্ত গিয়ারের ওপর নির্ভরশীল ব্যবস্থার সাহায্যে রৈখিক গতিকে বৃত্তাকার গতিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই যাবতীয় আধুনিক ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়ে মৌলিক পথিকৃৎ গ্রন্থ হলো '*আল-জামিউ বাইনাল ইলমি ওয়াল-আমলিন নাফি ফি সানাআতিল হিয়লি*'[৫৮৫]। এটি রচনা করেছেন বদিউযযামান আবুল ইয্য ইবনে ইসমাইল ইবনে রাযযায আল-জাযারি। ডোনাল্ড আর. হিল গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। অনূদিত গ্রন্থটি *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices* নামে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের হিজরা কাউন্সিল প্রকাশনাসংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। সমকালীন বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিদ জর্জ সার্টন মন্তব্য করেছেন যে, আল-জাযারির এই গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্টভাষ্য ও ব্যাখ্যামূলক। মুসলিমদের প্রযুক্তিগত অর্জন ও অবদানের ক্ষেত্রে এটি শীর্ষস্থান দখল করে আছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।[৫৮৬]

আল-জাযারির গ্রন্থে কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায় হলো জলঘড়ি-সম্পর্কিত। আরেকটি অধ্যায়ে পানি উত্তোলন-যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পানি উত্তোলক যন্ত্র-সম্পর্কিত অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এতে রয়েছে পাম্পের নকশা সম্পর্কে

---

৫৮৩. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩০-৩১।

৫৮৪. বদিউযযামান আল-জাযারি : বদিউযযামান আবুল ইয্য ইবনে ইসমাইল ইবনে রাযযায আল-জাযারি (৫৩০-৬০২ হি./১১৩৬-১২০৬ খ্রি.)। উদ্ভাবক, যন্ত্রপ্রকৌশলী, পণ্ডিত ও আর্টিস্ট। তিনি পানি উত্তোলন-যন্ত্র, জলঘড়ি, হস্তীঘড়ি, ফ্ল্যাশ টয়লেট ইত্যাদিসহ প্রায় একশ যন্ত্রের উদ্ভাবক। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ১৫।

৫৮৫. গ্রন্থটি كتاب في معرفة الحيل الهندسية নামেও পরিচিত।-অনুবাদক

৫৮৬. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩১।

সচিত্র বিস্তারিত বর্ণনা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিদগণ একে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অধিকতর কাছাকাছি বলে বিবেচনা করেছেন। এই পাম্পে যুক্ত রয়েছে মুখোমুখি দুটি পাইপ, পাইপ দুটির প্রত্যেকটিতে রয়েছে একটি বাহু, বাহুতে রয়েছে সিলিন্ডার আকৃতির পিস্টন (চাপদণ্ড)। পাইপ দুটির একটি চাপ বা সংকোচনের অবস্থায় থাকলে অপরটি থাকে টান বা চোষণের অবস্থায়। এই বিপরীতমুখী শক্তিকে সুরক্ষিত করার জন্য রয়েছে দাঁতযুক্ত বৃত্তাকার চাকতি, চাকতিকে কেন্দ্র থেকে দূরে যুক্ত রয়েছে পাইপ দুটির বাহু দুটি। এই চাকতিকে ঘোরানো হয় কেন্দ্রীয় ঘূর্ণনদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত গিয়ারের সাহায্যে। প্রত্যেক পাম্পে রয়েছে তিনটি ভাল্‌ভ (কপাটিকা), এগুলোর সাহায্যে জল একমুখী হয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে ওঠে এবং বিপরীত দিকে (নিচের দিকে) ফিরে আসতে পারে না।[৫৮৭]

আল-জাযারি কর্তৃক উদ্ভাবিত এই পাম্প ধাতুর তৈরি একটি যন্ত্র, যা বায়ুশক্তির সাহায্যে বা চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান প্রাণীর সাহায্যে ঘোরে। এই পাম্প নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল গভীর কূপ থেকে পানি ভূপৃষ্ঠে উত্তোলন করা। নদীর পানি নিচে নেমে গেলে (বা নদীর জলস্তর নিচু হলে) তা থেকে উঁচু ভূমিতে পানি ওঠানোর কাজেও এই পাম্প ব্যবহৃত হতো। যেমন মিশরের জাবাল আল-মুকাত্তাম (মুকাত্তাম) পাহাড়ে পানি ওঠানো হতো। সংশ্লিষ্ট বরাতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রযুক্তি প্রায় দশ মিটার পর্যন্ত পানি উত্তোলন করতে পারত। পাম্পকে সরাসরি জলস্তরের ওপর বসিয়ে দিয়েও পানি ওঠানো হতো, তখন পাম্পের সঙ্গে যুক্ত চোষক দণ্ডটি পানিতে নিমজ্জিত থাকত।[৫৮৮]

৩. তাকিউদ্দিন আদ-দিমাশকি

তাকিউদ্দিন ইবনে মারুফ আর-রাসিদ আদ-দিমাশকি আশ-শামি—যিনি হিজরি দশম শতাব্দীতে (খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে) তার জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন—ইসলামি প্রযুক্তির অহংকার হিসেবে বিবেচিত। তিনি '*আত-তুরুকুস-সানিয়্যাতু ফিল-আলাতির রুহানিয়্যাহ*' গ্রন্থটির রচয়িতা।

---

৫৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

৫৮৮. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩৩।

এই গ্রন্থে বেশ কিছু যান্ত্রিক কলের (মেকানিক্যাল ডিভাইস) বর্ণনা রয়েছে। যেমন জলঘড়ি, যান্ত্রিক ঘড়ি, বালুঘড়ি, কপিকল ও গিয়ারের সাহায্যে উত্তোলন-যন্ত্র, জলফোয়ারা, বাষ্পীয় টারবাইনের সাহায্যে ঘূর্ণনযন্ত্র যা বর্তমানেও আমাদের কাছে পরিচিত।[৫৮৯]

তাকিউদ্দিন আদ-দিমাশকির এই গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ তা ইসলামি যুগে যন্ত্রপ্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপের পূর্ণতা দিয়েছে। তিনি বহু যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর উল্লেখ পূর্ববর্তীদের কোনো কিতাবে নেই। এমনকি তখনও ইউরোপের রেনেসাঁসকালের বিখ্যাত রেফারেন্সগ্রন্থগুলোতেও এসব যন্ত্রের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তাকিউদ্দিনের এ গ্রন্থটি ছিল অনন্য ও অদ্বিতীয়। কারণ এটি যন্ত্রপাতির উপস্থাপনায়, বৈশিষ্ট্যায়ন ও বর্ণনায় ছিল প্রজেকশনযুক্ত আধুনিক প্রকৌশলীয় অঙ্কনের (engineering drawing) যে ধারণা (কনসেপ্ট) তার অধিকতর নিকটবর্তী। কিন্তু তিনি যন্ত্র-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন একই ধরনের অঙ্কনে, যেখানে প্রজেকশন-ধারণা ও অঙ্কন-ধারণার সম্মিলন ঘটেছে। অর্থাৎ, তা হলো ঘনদর্শন অঙ্কনকৌশল (stereoscopic perspective)। এ কারণে বিশেষজ্ঞদের টেক্সট পাঠ ও অঙ্কন বোঝার জন্য গভীর অধ্যয়ন প্রয়োজন, যাতে তারা মানসপটে যে চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন তা যথার্থ হয়।

তাকিউদ্দিন তার গ্রন্থে একাধিক জল উত্তোলন-যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ছয় সিলিন্ডারযুক্ত পাম্প। এতে তিনি প্রথমবারের মতো একই সারিতে ছয়টি সিলিন্ডার স্থাপনের জন্য সিলিন্ডার-ব্লক ব্যবহার করেছেন, একের পর এক বৃত্তাকারে সজ্জিত ছয়টি উদ্ভেদ (protrusion)-যুক্ত ক্যামশাফ্‌ট[৫৯০] ব্যবহার করেছেন, ফলে সিলিন্ডারগুলো (ক্যামশাফ্‌টের ক্যামের পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে) পর্যায়ক্রমে কাজ করতে থাকে এবং একটি শৃঙ্খলিত ব্যবস্থায় জলের প্রবাহ

---

৫৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৫৯০. ক্যাম ব্যবস্থা (cam mechanism) : একটা যান্ত্রিক সংযোগ যার কাজ হচ্ছে কোনো পূর্বনির্দিষ্ট পথে এই সংযোগের বহির্মুখী বা ফলদায়ক অংশকে (আউটপুট লিংক) পরিচালিত করা। ফলদায়ক অংশকে বলে ফলোয়ার। বিভিন্ন ইঞ্জিনে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেখানে ক্যাম তার ক্যামশাফ্‌টসহ বৃত্তাকৃতির গতি বা চক্রগতিতে ঘুরতে থাকে। অপরদিকে ফলোয়ার এই ক্যামের পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে উপর-নিচ করতে থাকে। ক্যামশাফ্‌টকে বাংলায় 'দন্তক ঈষা' বা দাঁতযুক্ত দণ্ড বলা যায়। ক্যাম মানে দাঁত, শাফ্‌ট মানে দণ্ড।-অনুবাদক

অব্যাহত থাকে। তাকিউদ্দিন পরামর্শ দিয়েছেন যে, সিলিন্ডারের সংখ্যা তিনটির কম হবে না, যাতে পানির উত্তোলন বিরতিহীনভাবে কোনো বিঘ্ন ছাড়াই চলতে থাকে। এখানে বিচ্ছিন্নতা ও কোনোরকম বাধাবিঘ্নতা এড়িয়ে চলার যে প্রাগ্রসর ধারণা (কনসেপ্ট) তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক গতিশীল সুস্থিতি (Dynamic equilibrium)-এর ধারণা। এই মূলনীতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক মাল্টি-সিলিন্ডার ইঞ্জিন ও কমপ্রেসরের প্রযুক্তি।

তাকিউদ্দিন ছয় সিলিন্ডারযুক্ত পিস্টন পাম্পের যে নকশা অঙ্কন করেছেন তাতে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি প্রতিটি পিস্টনদণ্ডের মাথায় নির্দিষ্ট ওজনের সিসা বসিয়ে দিয়েছেন, যাতে পিস্টনের ওজন ঊর্ধ্বমুখী টিউবের মধ্যে স্থাপিত জলদণ্ডের ওজনের চেয়ে বেশি হয়। এই নকশা প্রস্তুতের মধ্য দিয়ে তাকিউদ্দিন স্যামুয়েল মোরউন্ডের পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন। মোরল্যান্ড ১৬৭৫ সালে প্লাঞ্জার পাম্পের (Plunger pump) যে নকশা তৈরি করেন তাতে প্লাঞ্জারের ওপর সিসানির্মিত কয়েকটি চাকতি বসিয়ে দেন, তাই প্লাঞ্জারটি জলে নিমজ্জনের অবস্থায় ফিরে যায় এবং সিসার প্রভাবে কাঙ্ক্ষিত উচ্চতা পর্যন্ত পানি ঠেলে দেয়।[৫৯১]

এভাবেই প্রযুক্তির পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের দাবি বাতিল হয়ে যায়। তাদের দাবি এই যে, যন্ত্রপ্রকৌশলের ময়দানে ইসলামি প্রযুক্তির স্বভাব হলো মজা করা, বিনোদন ও খেলাধুলা এবং অলস সময় কাটানো। এসব ঐতিহাসিক তাদের বক্তব্যে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচার করেননি। তাদের দাবির অসারতা প্রমাণে ওয়াটার হুইলের সেসব সাক্ষ্যই যথেষ্ট যেগুলো আটার কল ও আখ-মাড়াই যন্ত্র ঘোরাতে, শস্য মাড়াই করতে এবং জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য জল উত্তোলনে ব্যবহৃত হতো। ব্যাপক আকারে জলশক্তি ও বায়ুশক্তিও ব্যবহৃত হতো। বাস্তব জীবনের সব ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তিগত প্রয়োগের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। পৌর নকশা প্রণয়ন, জলসেচ-ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ, ভবন-স্থাপনা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয় ছিল বাস্তবিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ইসলামি সভ্যতার যুগে প্রকৌশলীরা ও

---

[৫৯১]. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩৬।

যন্ত্রকারিগরেরা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। জটিল ক্ষেত্রে তারা প্রথমে পরিকল্পনা তৈরি করতেন, তারপর তারা বাস্তবে যা করতে যাচ্ছেন তার ছোট একটি নমুনা প্রস্তুত করতেন। তারপর অধুনা যন্ত্রকারিগরেরা পূর্ববর্তী মুসলিম প্রযুক্তিবিদেরা তাদের রচনাবলিতে যে ব্যাখ্যা ও বিবরণ রেখে গেছেন সে অনুযায়ী সংযোজনাদি ও যন্ত্রপাতি পুনর্নির্মাণ করতেন।[(৫৯২)]

৫৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

পঞ্চম অধ্যায়

আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

মানবসভ্যতায় মুসলিমদের যে অবদান-পরম্পরা তাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। তা হলো আকিদা, চিন্তা ও সাহিত্য সম্পর্কিত। এটিকে ইসলামি সভ্যতার একটি মৌল বিষয় বিবেচনা করা হয় এবং এসব বিষয়ে ইসলামি সভ্যতা অনন্য। এই অধ্যায়ে আমরা এসব ক্ষেত্রে কী কী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা তুলে ধরব। নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলোতে তা আলোচিত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রচলিত জ্ঞানের বিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

আকিদা-বিশ্বাস ও আকিদাগত ধারণার ক্ষেত্রে মুসলিমরা অনন্য ও অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনো করছেন। পূর্ববর্তী ও সামসময়িক জাতি-গোষ্ঠী ও সভ্যতাগুলো বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও ইবাদতের উপযুক্ত ইলাহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছে। মুসলিমরা একত্বকে এবং ইবাদতের উপযুক্ততাকে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই স্থির করেছেন। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সকল কর্তৃত্ব একমাত্র তারই। এই বিশ্বাস গোটা মানবতার জন্য এক বিরাট উপহার। বিশেষ করে, যখন আমরা জানি যে সভ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভে আকিদা ও বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এই অধ্যায়ে আমরা আকিদাগত ধারণার সংশোধনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভূমিকা কী এবং তারা কী অবদান রেখেছেন তা আলোকপাত করব। দুটি অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আমরা তা তুলে ধরব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাওহিদ ও আকিদাগত ধারণার সংশোধন

প্রথম অনুচ্ছেদ

পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস

ইসলামপূর্ব বিশ্ব ইলাহত্বের হাকিকত ও সত্য সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার বশীভূত ছিল। আল্লাহর মহত্ত্বকে সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে এমন কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এ ব্যাপারে সবার ধারণা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ধোঁয়াশাপূর্ণ। অজ্ঞতা ও অলিক ধ্যানধারণাই এমন দৃষ্টিভঙ্গির চারপাশ ঘিরে রেখেছিল। সত্য এই যে, অন্যান্য সভ্যতা–যেমনটা তাদের ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয়–আল্লাহ তাআলাকে সঠিকভাবে চিনতে পারেনি, মহান আল্লাহর পরিচয়ই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার ব্যাপারে যথার্থ ঈমানের পথ তারা পায়নি। পরিপূর্ণ ইলাহত্বের হাকিকতও তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। যে ইলাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা এবং ক্ষমাপরায়ণ ও দয়ালু। কারণ পথপ্রদর্শক নবুয়তের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না, নিষ্কলঙ্ক ওহির সঙ্গেও তাদের সরাসরি যোগাযোগ ঘটেনি। ফলে তারা 'প্রথম কার্যকারণ' বা 'প্রথম অনুঘটক' বা 'ওয়াজিবুল উজুদ' সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিজস্ব পথ অবলম্বন করেছে। তাই তারা হোঁচট খেয়েছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে অনুমান-আন্দাজ, ভ্রান্তি এবং প্রবৃত্তিতাড়িত ধ্যানধারণাই প্রাধান্য পেয়েছে।

এমনকি যেসব দার্শনিকের নাম ইতিহাস ঈশ্বরবাদী হিসেবে উল্লেখ করেছে, অর্থাৎ যারা মোটামুটিভাবে ইলাহত্বকে স্বীকার করেছে, যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মতো বিশাল বিশাল দার্শনিক, যারা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস ও নাস্তিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদেরও ইলাহত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না, বরং তাদের ধারণা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, সংশয়গ্রস্ত এবং অনেক অনুমান ও ভেজালমিশ্রিত। গ্রিকদের প্রথম শিক্ষক অ্যারিস্টটল যে ইলাহ বা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেছে তা আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। দেখি কেমন সেই ইলাহ? তিনি কি সেই ইলাহ যাকে আমরা জানি সবকিছুর স্রষ্টা, জীবিত সবকিছুর

রিযিকদাতা, সবকিছুর নিয়ন্তা, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত, যা চান তা-ই করেন, সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান? নাকি তিনি আমরা যাকে জানি সেই ইলাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ?[৫৯৩]

উইল ডুরান্ট '*মাবাহিজুল ফালাসাফা*' *গ্রন্থে* বলেছেন, অ্যারিস্টটল ঈশ্বর বা আল্লাহকে একটি আত্মারূপে কল্পনা করেছে, যা তার সত্তাকে ধারণ করে আছে। তা একটি রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় গুপ্ত আত্মা। কারণ অ্যারিস্টটলের ইলাহ বা ঈশ্বর কখনো কোনো কাজ করেন না। তার কোনো ইচ্ছা নেই, অভিপ্রায় নেই, উদ্দেশ্য নেই। তার কার্যক্ষমতা এতটাই পবিত্র ও নির্ভেজাল যে, তা তাকে কোনো কাজ করতে দেয় না। তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ, কোনো ব্যাপারে নাক গলানো তার জন্য সংগত নয়। এ কারণেই তিনি কোনো কাজ করেন না। তার একটিই দায়িত্ব, বস্তুরাশির মৌল পদার্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। এই যুক্তিতে যে, তিনিই সত্তাগতভাবে যাবতীয় বস্তুর মৌল পদার্থ এবং সকল বস্তুর আকৃতি। এ কারণে তার একমাত্র কাজ হলো নিজ সত্তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, ইংরেজরা অ্যারিস্টটলকেই ভালোবাসবেন, কারণ তার ঈশ্বর স্পষ্টভাবে তাদের সম্রাটেরই অবিকল নকল অথবা তাদের সম্রাট অ্যারিস্টটলের ঈশ্বরেরই কার্বন কপি।[৫৯৪]

অ্যারিস্টটলের ঈশ্বর ছিলেন নিঃস্ব-অপদার্থ, বিশ্বনিখিলে ক্রিয়াকর্মে তার সক্ষমতা ছিল না, কোনোকিছুর সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু প্লেটোর ঈশ্বর অ্যারিস্টটলের ঈশ্বরের চেয়েও নিঃস্ব-অপদার্থ, অর্থাৎ আধুনিক প্লেটোবাদ যে ঈশ্বরের কথা বলে থাকে। কারণ এই ঈশ্বর কোনোকিছু নিয়ে চিন্তা করেন না, এমনকি তার নিজের সত্তা নিয়েও নয়![৫৯৫]

---

৫৯৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, *আল-ইসলাম হাদারাতুল গাদ*, পৃ. ১৪।

৫৯৪. উইল ডুরান্ট, *দা স্টোরি অফ ফিলোসফি* (*The Story of Philosophy*), আরবি অনুবাদ, *মাবাহিজুল ফালসাফা*, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ আল-আহওয়ানি, পৃ. ১৬১-১৬২, ইউসুফ আল-কারযাবি, *আল-ইসলাম হাদারাতুল গাদ*, পৃ. ১৪-১৫ থেকে উদ্ধৃত।

৫৯৫. মাহমুদ আব্বাস আল-আক্কাদ, *আল্লাহ*, পৃ. ৭৮, ১৩১।

ষষ্ঠ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে পৌত্তলিকতাবাদ তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শুধু ভারতে ঈশ্বরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৩০ মিলিয়ন বা ৩৩ কোটিতে। প্রতিটি বস্তু হয়ে উঠেছিল অনন্য, প্রতিটি জিনিসই ছিল আকর্ষক, জীবনের সঙ্গে যুক্ত সবকিছুই ছিল দেবতা, যাদের উপাসনা করা হতো। এভাবে মূর্তি, প্রতিমা, দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে অসংখ্য হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর ও দেবতারা ঐতিহাসিক চরিত্র ও বীরের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, কতিপয় দেবতা ভাস্বর হয়েছিল পাহাড়ের ওপর, কেউ কেউ উপস্থিত হয়েছিল সোনা-রুপা ইত্যাদি খনিজ পদার্থরূপে, নদীরূপেও ছিল দেবদেবী, কোনো কোনো দেবতা ছিল যুদ্ধাস্ত্ররূপে, প্রজননযন্ত্ররূপেও ছিল কেউ কেউ, চতুষ্পদ জন্তুজানোয়ারও ছিল দেবদেবী, এগুলোর প্রধান হলো গাভি। গ্রহনক্ষত্রও ছিল দেবতা, দেবতা ছিল আরও অনেককিছু। ধর্ম পরিণত হয়ে ছিল কুসংস্কার, রূপকথা ও সংগীতের রূপে। তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও উপাসনার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। কোনো কালে সুস্থ বিবেকবুদ্ধিও তা মেনে নেয়নি। বর্তমান যুগে মূর্তির আকার-আকৃতি পূর্বের সব যুগকে ছাড়িয়ে গেছে। সব স্তরের মানুষ, রাজাবাদশা থেকে নিয়ে কপর্দকহীন লোক পর্যন্ত সবাই মূর্তিপূজার ওপর অটল রয়েছে।[৫৯৬]

অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষের কাছেই মানবিকতার মূল্য হারিয়েছে। তারা পাথর, বৃক্ষ ও নদনদীর সিজদা করেই যাচ্ছে, তারা এমন সবকিছুর পূজা করছে যা নিজেরই কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতি প্রতিহত করতে পারে না।

রোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীতে খ্রিষ্টধর্মের ধ্বজাধারী। তারা বড় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের একটি ক্যাথলিক, অপরটি অর্থোডক্স। অর্থোডক্সরা তাদের কর্মকাণ্ড অনুযায়ী দুটি উপদলে বিভক্ত হয়েছিল, একটি হলো মুলকানিয়া, অপরটি হলো মানুফিসিয়া। এসব দল ও উপদলের মধ্যে তীব্র লড়াই জারি ছিল। প্রত্যেক দলই তাদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছিল। তারা সবাই আল্লাহর সঙ্গে অন্যদের শরিক

---

৫৯৬. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৪০ এবং *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২১।

করত, শরিক করার পদ্ধতি নিয়ে ছিল তাদের মধ্যে মতবিরোধ। আল্লাহর বদলে পুরোহিত ও ধর্মগুরুরাই হয়ে উঠেছিল ঈশ্বর।

ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস হলো ধর্মীয় (পোপীয়) কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে বিরোধ ও লড়াইয়ের ইতিহাস। পোপীয় কর্তৃত্ব আল্লাহর নামে কথা বলার অধিকার কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। তারা ছিল সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে, তাদের জবাবদিহি আদায় করার বা তাদের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করার অধিকার কারও ছিল না। রাজাবাদশাদের ওপরও কর্তৃত্ব ফলাত তারা, ধর্মের নামে রাজাবাদশাদেরও চূড়ান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করতে হতো। এই পোপীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে লড়াই জারি ছিল শাসকগোষ্ঠীর, সম্রাট, বিশপ ও আমিরদের, যারা জনগণের ওপর তাদের ক্ষমতা চর্চা করতে চাইত, তাদের উপযুক্ততা প্রমাণ করতে চাইত এবং প্রজাদের ওপর তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখত। তারা চাইত না কোনো শক্তি তাদের চ্যালেঞ্জ করুক, সেটা যে নামেই হোক, যে কারণেই হোক, এমনকি ধর্মের আচ্ছাদনে আবৃত পোপীয় শক্তিও নয়।

১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পোপ সপ্তম গ্রেগরি[৫৯৭] ঘোষণা দিলেন যে গোটা পৃথিবীতে কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র গির্জা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা সরাসরি কর্তৃত্ব বাস্তবায়ন করবে। গির্জার এই ভূমিকা পালনের ফলে পৃথিবীর সব সম্রাট ও শাসকদেরকে পোপের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও পোপ হবেন একচ্ছত্র কর্তৃত্বপরায়ণ। তিনিই বিশপ ও যাজকদের নিয়োগ দেবেন এবং তাদের বরখাস্ত করবেন। এমনকি তিনি প্রধান বিশপদের বা গির্জাপ্রধানদেরও পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাখেন। কারণ পোপই তাদের নেতা, অন্যরা সবাই তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করবে, তিনি যা করবেন তার জন্য কোনো জবাবদিহি করবেন না। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে পোপেরা যেসব বিশপ ও সম্রাটদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকত তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন। ইংল্যান্ডের সম্রাট চতুর্থ হেনরির[৫৯৮] সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে। ১১০৭ খ্রিষ্টাব্দে পোপ তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে তিনি পোপের ফটকের সামনে খালি পায়ে ও খালি মাথায় বরফ ও বৃষ্টির মধ্যে তিন দিন অবস্থান করতে বাধ্য হন। আরও ঘটনা আছে। পোপ

---

৫৯৭. Pope Gregory VII, 1015-1085.

৫৯৮. Henry IV of England (Henry Bolingbroke).

তৃতীয় ইনোসেন্ট[৫৯৯] ইংল্যান্ডের রাজা জনের ওপর ক্রুদ্ধ হন। গোটা ইংল্যান্ডের ওপর তার ক্রোধের অভিশাপ নেমে আসে। তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন। ফরাসি সম্রাটকে তিনি ইংল্যান্ডে আক্রমণ করতে ও তা দখল করে নিয়ে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে উসকানি দেন। ফলে ইংল্যান্ডের রাজা পোপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। রাজা জন পোপের আনুগত্য করার ঘোষণা দেন এবং তার কর্তৃত্বাধীন থাকবেন বলে শপথ গ্রহণ করেন। পোপের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তারপর পোপ তাকে ক্ষমা করেন।

১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট তার শীর্ষস্থানীয় লোকদের কাছে একটি নির্দেশনা পাঠান। তাতে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনিই ঈসা মাসিহের স্থলাভিষিক্ত, তার অবস্থান আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যবর্তী স্থানে, রবের নিচে ও মানুষের ওপরে। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্ব করবেন, তার ওপর কেউ কর্তৃত্ব করতে পারবে না।[৬০০]

কোনো সন্দেহ নেই যে, খ্রিষ্টধর্মের গুরুদের এমন বিকৃতি, কর্তৃত্বপরায়ণতা, জোর-জুলুম-জবরদস্তি মানুষকে গির্জা বিমুখ করে দিয়েছিল। এসব কারণেই আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ গির্জা কর্তৃপক্ষের হম্বিতম্বি ও ঔদ্ধত্য থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করছে, ধর্মের লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতায় মনোযোগী হচ্ছে এবং ধর্মকে পার্থিব যাবতীয় বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

আরবরা শুরুর দিকে—ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি—আল্লাহর ইবাদত করত, আল্লাহর একত্ব স্বীকার করত এবং বিশ্বাস করত যে তিনি সবচেয়ে বড় ইলাহ, বিশ্বজগতের স্রষ্টা, আকাশ ও জমিনের নিয়ন্ত্রক, সবকিছুর কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

---

৫৯৯. Pope Innocent III, 1160-1216.

৬০০. আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান, *মাআলিমুল হাদারাতি ফিল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৩৮-৩৯।

> তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।[৬০১]

কিন্তু বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের যা-কিছু স্মরণ রাখতে বলা হয়েছিল তার অধিকাংশই তারা ভুলে গেল এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করতে শুরু করল। আল্লাহ ও তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে নিলো। আল্লাহর কাছে প্রার্থনার ক্ষেত্রে তাদের উসিলা মানত এবং তাদের নাম উল্লেখ করে তাদের কাছেও প্রার্থনা করত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

> আমরা তো এদের পূজা এই জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।[৬০২]

তারা এগুলোর নানা ধরনের পূজায় লিপ্ত হলো এবং তাদের মগজে এদের সুপারিশের চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে গেল এবং তারা এই বিশ্বাসে উপনীত হলো যে এগুলো তাদের জন্য কল্যাণের বা অকল্যাণের সুপারিশ করতে সক্ষম। এভাবে তারা শিরকে উপনীত হলো এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করল। তারা এ ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করল যে এগুলো পৃথিবীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং সত্তাগতভাবেই উপকার ও অপকার, কল্যাণ ও অকল্যাণ, দেওয়া ও না দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।[৬০৩]

জাযিরাতুল আরবে মূর্তিপূজা ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি প্রতি গোত্রে মূর্তি স্থাপিত হলো, তারপর ঘরে ঘরে মূর্তি তৈরি হলো। ইবনুস সায়িব আল-কালবি[৬০৪] বলেছেন, মক্কার প্রত্যেক গৃহকর্তার বাড়িতে একটি করে মূর্তি ছিল, বাড়ির সবাই সেই মূর্তির উপাসনা করত। তাদের কেউ সফর

---

৬০১. সুরা আনকাবুত : আয়াত ৬১।

৬০২. সুরা যুমার : আয়াত ৩।

৬০৩. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৪৫।

৬০৪. ইবনুস সায়িব আল-কালবি : আবুন নদর মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব ইবনে বিশর ইবনে আমর (মৃ. ১৪৬ হি./৭৬৩ খ্রি.)। আরবদের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। কথক ইতিহাসবিদ। কুফার অধিবাসী, এখানেই জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিয়া মতাবলম্বী। ইতিহাস বিষয়ে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

করতে চাইলে বাড়িতে সর্বশেষ যে কাজটি করত তা হলো মূর্তিটির গায়ে হাত বুলানো। সফর থেকে ফিরে এসে বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথম যে কাজটি করত তা হলো ওই মূর্তির গায়েই হাত বুলানো। আরবরা মূর্তিপূজায় এতটা মগ্ন হলো যে তাদের বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ মূর্তিঘর নির্মাণ করল, কেউ মূর্তি নির্মাণ করল। যাদের এসব করার সামর্থ্য ছিল না তারা হারামের সামনে একটি পাথর স্থাপন করল অথবা যেখানে ভালো মনে করল সেখানে পাথর স্থাপন করল। তারপর কাবাঘরের মতো এটির চারপাশে তাওয়াফ করতে লাগল। তারা এগুলোর নাম দিলো 'আনসাব'। কেউ সফরে বেরুতে চাইলে হাতে চারটি পাথর নিত, যে পাথরটিকে সবচেয়ে সুন্দর মনে হতো সেটিকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে সঙ্গে নিয়ে যেত এবং বাকি তিনটিকে চুলার ঝিঁক[৬০৫] হিসেবে রেখে দিত। সফর থেকে ফিরে এসে ওই সুন্দর পাথরটিকে ফেলে দিত।[৬০৬] আবু রাজা আল-আতারিদি বলেন,

«كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ»

আমরা পাথরের পূজা করতাম। যখন এটির চেয়ে ভালো কোনো পাথর পেতাম তখন এটি ফেলে দিয়ে ওই ভালোটিকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতাম। পাথর না পেলে আমরা মাটির ঢিবি বানিয়ে নিতাম, দুগ্ধবতী ছাগী নিয়ে এসে ওই ঢিবির ওপর দোহন করাতাম, তারপর ঢিবিটির চারপাশে তাওয়াফ করতাম।[৬০৭]

কাবাঘরের ভেতরে ও তার আঙিনায় তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল, যে ঘরটি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।[৬০৮]

---

৬০৫. চুলার ওপর বসানো পাথরের তিনটি টুকরো, যেগুলোয় রান্নার হাঁড়ি বসানো হয়।

৬০৬. আবুল মুনযির হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব আল-কালবি, *কিতাবুল আসনাম*, তাহকিক, আহমাদ যাকি পাশা, পৃ. ৩৩।

৬০৭. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাগাযি, বাব : ওয়াফদু বানি হানিফাহ ওয়া হাদিসু সুমামাহ ইবনে আসাল, হাদিস নং ৪১১৭।

৬০৮. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : হাল তুকসারুদ দিনান আল্লাতি ফিহাল খাম্‌র আও তুখাররাকুয যিকাক, হাদিস নং ২৩৪৬; *মুসলিম*,

দ্বীন-ধর্ম, আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের উপযুক্ত উপাস্যের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্যানধারণা ছিল এমনই। তাওহিদের ধারণা বিলুপ্ত হয়ে সেখানে পৌত্তলিকতা স্থান করে নিয়েছিল। কুদরত, রবুবিয়্যাত ও স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যাবলি তিরোহিত হয়েছিল। একইসঙ্গে মানবতার বিপর্যয় ঘটেছিল, সভ্যতাকেন্দ্রিক সব ধরনের মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটেছিল।

কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : ইযালাতুল আসনাম মিন হাওলিল কাবা, হাদিস নং ১৭৮১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তাওহিদ ও আকিদাগত চিন্তাধারণার সংশোধন

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অলিক ধ্যানধারণা, কুসংস্কার ও আকিদাগত ভ্রান্তির মোকাবিলায় এবং গোটা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার সামনে যেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটল, সেদিন থেকেই তাওহিদের আকিদার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান শুরু হয়েছে। এই আকিদা মানবতার জন্য ইসলামের সবচেয়ে বড় উপহার, মানবতা এমন উপহার কখনো পায়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কখনো পাবেও না।

ইসলামের আকিদায় এই বিশ্ব মালিকহীন নয়, বরং তার একজন মালিক রয়েছে। তিনি হলেন তার স্রষ্টা, তার রূপকার, তার শাসনকর্তা, তার নিয়ন্ত্রক, সকল সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব তাঁরই। শাসন চলবে তাঁরই।

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

জেনে রাখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই।[৬০৯]

এই পৃথিবীতে তাঁর আদেশ ও ক্ষমতার বাইরে কিছুই ঘটে না। পৃথিবীর অস্তিত্বের মূল কারণ হলো তাঁর অভিপ্রায় ও সক্ষমতা। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তাঁর বশীভূত ও তাঁর অনুগত এবং তাঁর কাছে সমর্পিত।

﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে তার সবই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।[৬১০]

ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অধিকারী সকল সৃষ্টির উচিত তাঁর আনুগত্য করে নেওয়া।

---

৬০৯. সুরা আরাফ : আয়াত ৫৪।
৬১০. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৩।

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।[৬১১],[৬১২]

কারণ আল্লাহ তাআলাই গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, সকল বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য, সকল সৃষ্টির তাঁরই উদ্দেশ্যে ইবাদত করা আবশ্যক।

ইসলাম এ ব্যাপারে চূড়ান্ত দলিল-প্রমাণ পেশ করেছে যে, আল্লাহ তাআলাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ ব্যাপারেও চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল পেশের আঙ্গিকে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।[৬১৩]

আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

বলো, তোমরা আমাকে দেখাও যাদের শরিকরূপে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছ তাদের। না, কখনো না,[৬১৪] বরং তিনি আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৬১৫]

সত্য এই যে, এই যুক্তি অত্যন্ত সন্তোষজনক, বিশ্ববাসী সবাই এই যুক্তি গ্রহণ করেছে ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তাই আল্লাহর দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করেছে।

---

৬১১. সুরা যুমার : আয়াত ৩।

৬১২ আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২১।

৬১৩. সুরা আম্বিয়া : আয়াত ২২।

৬১৪. যাদেরকে শরিক করা হয়েছে তাদেরকে শরিক হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করতে পারোনি এবং কখনো পারবেও না।-অনুবাদক

৬১৫. সুরা সাবা : আয়াত ২৭।

এখানে কারও কারও ভুল হয়ে থাকে, যারা এই ধারণা করেন যে, আরব মুসলিমরা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ফলে ইসলামও ছড়িয়ে পড়েছে এবং আরবদের সংখ্যাধিক্যের ফলে তাওহিদি বিশ্বাসের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং ভুল করে থাকে যারা এই ধারণা করে যে, আরব মুসলিমরা তরবারি ও অস্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করতে ও তাওহিদি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য করেছে। আমরা পৃথিবীর ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে পারি।

আরব মুসলিমরা ছিল সংখ্যায় অল্প। সংখ্যায় ও গুণগত দিক থেকে তাদের অস্ত্রবল ছিল দুর্বল। তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনাও ছিল অতি নগণ্য। তারপরও ওই সময় বিশ্বের মানুষ দেশ ও জাতির ধর্মাদর্শ এবং শক্তিশালী ও উন্নত সভ্যতা ত্যাগ করে এই নগণ্য মানুষের ধর্মাদর্শে প্রবেশ করেছে!

স্বাভাবিকভাবেই মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জেগে ওঠে যে, বিশ্বের মানুষ এই কাজ কেন করেছিল? কেন তারা এই ধর্মাদর্শে প্রবেশ করেছিল?

এই প্রশ্নের জবাব এইভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, এই ধর্মাদর্শ ছিল সন্তোষজনক, এই ধর্মের আকিদা-বিশ্বাস ছিল যৌক্তিক ও মানুষের স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই আকিদা-বিশ্বাসের ফিতরাত দিয়েই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারা এক সত্তার ইবাদত করবে, যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কোনো শরিক নেই।

এখন আমরা কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করব :

- আরবদের মূলত কে বাধ্য করেছিল ইসলামে প্রবেশ করতে, অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিরা ছিলেন সংখ্যায় ও শক্তিতে নগণ্য ও দুর্বল?
- ইসলামে প্রবেশ করতে মিশরীয়দের বাধ্য করেছিল কে? কে তাদের জবরদস্তি করেছিল? এটা কি বোধগম্য যে, মাত্র আট হাজার সৈনিক মিশরীয়দের মতো একটি প্রাচীন জাতিকে বাধ্য করেছিল? বিজয়কালীন যাদের সংখ্যা ছিল ৮০ লাখেরও বেশি তা ছাড়া এটাও জানা কথা যে, মিশর ছিল কার্যতভাবে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন এবং তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী।

- কে পারস্যবাসীকে শত শত বছরের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করতে এবং ইসলামকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য করেছে? অথচ তারা সংখ্যায় বিপুল এবং তাদের রয়েছে দীর্ঘ সমৃদ্ধ ইতিহাস!
- কে দক্ষিণ আফ্রিকা, আন্দালুস, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কি ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে?
- বরং কে বর্তমান বিশ্বকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছে? অথচ সবাই স্বীকার করছে যে মুসলিমরা অন্যদের তুলনায় অত্যন্ত নাজুক ও দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। কেবল যে ইসলামে প্রবেশের ঘটনা ঘটছে তা নয়, ইসলাম বরং বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে সম্প্রসারণশীল ধর্ম!

যে সত্যে কোনো সন্দেহ নেই তা এই যে, আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব পূর্ণাঙ্গ এবং আল্লাহর দ্বীনে কোনো ত্রুটি নেই, কোনো ভ্রান্তি নেই। এ কারণেই যে-কেউ ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করবে, ইসলামকে ভালোভাবে জানবে, তাকে স্বীকার করতেই হবে যে এটি সত্য ধর্ম। চাই সে এই ধর্মের অনুসরণ করুক বা না করুক।

আরেকটি সত্য এই যে, আকিদা ও বিশ্বাসগত ধারণার ক্ষেত্রে মুসলিমদের যে অবদান তার প্রভাব কেবল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের ওপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অমুসলিমরাও এতে উপকৃত হয়েছে। (যার আলোচনা সামনে আসব)। তাদের কাছে আকিদা ও বিশ্বাসের বাস্তবিক দিকগুলো উন্মোচিত হয়েছে, একত্ববাদ (তাওহিদ) কী এবং কেন তা-ও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে, ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের ফলস্বরূপ মানুষের ওপর প্রথম যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব তাতে তারা উপলব্ধি করেছে যে গোটা বিশ্ব একটি কেন্দ্রের ও একই ব্যবস্থার অনুসারী, বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তাদের নীতি-বিধানের মধ্যেও ঐক্য রয়েছে। এই বিশ্বাস ও উপলব্ধির পর মানুষ জীবনের পূর্ণাঙ্গ

ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে এবং নিজেদের চিন্তা ও কর্মাবলিকে প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।[৬১৬]

কোনো সন্দেহ নেই যে, সর্বশক্তিমান এক ইলাহের প্রতি ঈমান মানুষের চিন্তাকে বহু-ঈশ্বরবাদের খপ্পর থেকে মুক্তি দিয়েছে, বিশুদ্ধ স্বভাব ও চরিত্রের সঙ্গে বহু-ঈশ্বরবাদ কখনো মেলে না। জীবন ও জগতের সকল গতিপথের নিয়ন্তা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী আত্মশক্তি ও দেহশক্তির মুক্তি ঘটেছে, আল্লাহর হাতেই রয়েছে সৃষ্টি সকলের ভাগ্যলিপি, সৃষ্টির সবাই কাজেকর্মে তাঁরই ওপর নির্ভরশীল। সকলের অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে বিশ্বজগতের একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি চতুষ্পার্শ্বে চলমান সবকিছু দেখেন, যিনি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করেন এবং অপরাধী-পাপীদের শাস্তি দেন, দুনিয়াতে না হলে আখিরাতে দেন। তিনি কারও সৎকর্মকে বাতিল করেন না এবং তাঁর কাছে কারও অধিকার খর্ব হয় না।[৬১৭]

কোনো সন্দেহ নেই যে, সমাজব্যবস্থার ওপরও ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। যখন আমরা একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠন করতে চাই, যে সমাজের নেতৃত্ব ন্যায়পরায়ণ ও চালিকাশক্তি প্রজ্ঞাপূর্ণ, যে সমাজ অপরাধমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ, সদস্যরা ভ্রাতৃত্বকামী ও কল্যাণকর কাজে পরস্পর সহযোগী, তখন ইসলামি বিশ্বাসের প্রভাবের বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন একটি সমাজই যখন আমাদের কাম্য, আমাদের উচিত ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের ওপরই সেই সমাজকে গড়ে তোলা। তার কারণ ইসলামি বিশ্বাসই এমন সমাজনির্মাণের ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপরই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একটি উন্নত সভ্য শ্রেষ্ঠ সমাজ নির্মাণ করেছেন। ফলে যে ইসলামি উম্মাহ গঠিত হয়েছে তার কাছে পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত গোটা বিশ্ব নতি স্বীকার করেছে।

উস্তাদ আবুল হাসান আলি নদবি বলেন, সবচেয়ে বড় জট খুলে গেল। সেটা হলো শিরক ও কুফরির জট। এই জট খোলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছোট-বড় সব জটও খুলে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৬১৬. আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২২।

৬১৭. জামাল ফাওযি, *মাআলিমুল হাদারাতিল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ১৬।

তাদের সঙ্গে তার প্রথম জিহাদই করেছেন, ঈমান ও আকিদার জিহাদ। তাই তার প্রতিটি আদেশ ও প্রতিটি নিষেধের জন্য নতুন নতুন জিহাদের প্রয়োজন পড়েনি। প্রথম লড়াইয়েই ইসলাম জাহিলিয়াতের ওপর বিজয়ী হয়েছে। পরবর্তী প্রতিটি লড়াইয়ে বিজয়ই ছিল ইসলামের মিত্র।... যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হলো তখন উপচে পড়া পানপাত্র ছিল তাদের হাতে, কিন্তু মুহূর্তেই আল্লাহর নির্দেশ মদের পেয়ালা এবং উন্মুক্ত ঠোঁট ও উত্তেজিত চিত্তের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। মদের মটকাগুলো ভেঙে ফেলা হলো, ফলে মদিনার অলিতে-গলিতে বয়ে গেল মদের প্রবাহ![৬১৮]

একটিমাত্র কথাই জাতির মধ্যে দৃঢ়মূল অভ্যাসের মূলোৎপাটন করেছিল, যে অভ্যাস তারা কয়েক পুরুষ ধরে লালন করছিল।

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

তোমরা নিবৃত্ত হবে না?

তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিবৃত্ত হলাম; আমরা নিবৃত্ত হলাম, হে আমাদের প্রতিপালক...।

আমেরিকাও মদ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উপকরণ তারা এই কাজে ব্যবহার করেছে। কিন্তু ফলাফল শূন্য। পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন-সাময়িকী, ভাষণ-বক্তৃতা, ছবি, সিনেমা সবই তারা মদের অপকারিতা বর্ণনা করতে ব্যবহার করেছে। মদ-বিরোধী যুদ্ধে ৬০ মিলিয়ন[৬১৯] ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছে তারা। মদের ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করে প্রায় দুই বিলিয়ন (দুইশ কোটি) পৃষ্ঠা ছেপেছে। মদ-বিরোধী আইন প্রয়োগে ২৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করেছে। তিনশ লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। অর্ধ-মিলিয়নেরও বেশি লোককে কারাগারে পুরেছে। প্রায় চারশ চার মিলিয়ন ডলারের ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু এতকিছুর পরও মদের প্রতি মার্কিন জাতির আসক্তিই বেড়েছে। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৩৩ সালে মদ বৈধ

---

৬১৮. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৯০।

৬১৯. ১ মিলিয়ন = ১০ লাখ।

ঘোষণা করেছে। কারণটা খুব সহজ। তাদের মদ-বিরোধী নির্দেশ বাস্তবায়ন বিশ্বাসজাত বা আকিদাজাত কিছু ছিল না।[৬২০]

এই ভিত্তির ওপরই ইসলামের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম মানবজাতিকে বিশুদ্ধ, সুন্দর ও সহজ আকিদা-বিশ্বাস প্রদান করে অন্যান্য বিশ্বাস থেকে তাদের অমুখাপেক্ষী করেছে। এই বিশ্বাস প্রশান্তিদায়ক, স্বস্তিকারক, দুশ্চিন্তাবিদারক এবং সঞ্জীবনী। তাই এই বিশ্বাসের আশ্রয়ে মানুষ ভীতি ও দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় না করার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তারা নিশ্চিতভাবে জেনেছে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী, তিনিই দাতা এবং তিনিই বারণকারী। একমাত্র তিনিই মানুষের সকল প্রয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক। এই নতুন জ্ঞান ও চৈতন্যের আলোকে মানুষ পৃথিবীকে নতুনভাবে ও নতুনরূপে দেখতে পায়। পৃথিবী তার কাছে নবরূপে উন্মোচিত হয়। সব ধরনের দাসত্ব ও গোলামি থেকে সে সুরক্ষিত থাকে। সৃষ্টিজীবের (মানুষের) থেকে সে কিছু আশা করে না এবং ভয়ও করে না। চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে এবং চিন্তাকে এলোমেলো করে দেয় এমন সবকিছু থেকে সে দূরে থাকে। এই বহুত্বের মধ্যেও সে একত্ব অনুভব করে এবং নিজেকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে বিবেচনা করে। উপলব্ধি করে যে, সেই এই পৃথিবীর নেতা এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তাআলার খলিফা বা প্রতিনিধি। সে তার রব ও স্রষ্টার আনুগত্য করে এবং তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে। এভাবেই তার মানবিক মহান মর্যাদা প্রমাণিত হয়, মানুষের চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যে শ্রেষ্ঠত্ব থেকে পৃথিবী তাকে দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত করে আসছে।

ইসলামি সভ্যতাই মানবতাকে এই দুর্লভ উপহারে ভূষিত করেছে, তা হলো তাওহিদি আকিদা-বিশ্বাসের উপহার। পৃথিবীর যেকোনো বিশ্বাসের চেয়ে এই আকিদা-বিশ্বাস ছিল অধিক অজ্ঞাত, অপরিচিত, নির্যাতিত ও প্রবঞ্চিত। কিন্তু তারপরই গোটা বিশ্বে এই বিশ্বাসের ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিশ্বের সব ধরনের দর্শন ও দাওয়াতি কার্যক্রম এই বিশ্বাসের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে। ফলে বড় বড় কিছু ধর্ম–যাদের ভিত্তি ও বেড়ে ওঠা ছিল শিরক ও বহু-ঈশ্বরবাদের ওপর এবং যাদের রক্তে-মাংসে

---

৬২০. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৬৮।

ছিল শিরক—ক্ষীণ আওয়াজে ও ফিসফিসিয়ে হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তাদের শিরকপূর্ণ বিশ্বাসরাশির দার্শনিকতাপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতেও বাধ্য হয়েছে এবং সেগুলোকে শিরক ও বিদআতের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। ইসলামের তাওহিদি আকিদার সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই বড় বড় ধর্মের গুরুরা ও নেতৃস্থানীয়রা শিরকের ব্যাপারটা স্বীকার করতে এবং মানুষের সামনে তা উল্লেখ করতে লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করতে শুরু করেছে। এসব শিরকপন্থী ব্যবস্থা ও ধর্মাদর্শের সবগুলোই হীনম্মন্যতাবোধে ও তুচ্ছতাবোধে আক্রান্ত হয়েছে। তাই তাওহিদি আকিদার উপহারই সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান উপহার, যা পেয়ে মনুষ্যজাতি সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েছে। এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও ইসলামি সভ্যতার অবদানের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে।[৬২১]

---

৬২১. আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২১-২৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশ

মানববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার বেশ কিছু শাখা মুসলিম সভ্যতার পূর্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। বিজিত জাতি-গোষ্ঠী ও অন্যদের মধ্যে এসব বিজ্ঞানের চর্চা ও পঠনপাঠন ছিল। এসব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর ভালো ভালো কীর্তি ও অবদান রয়েছে। মুসলিমরা এগুলো থেকে উপকৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যা-কিছু তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তারা গ্রহণ করেছে। তারপর তারা এসব বিজ্ঞানে উজ্জ্বল ও গৌরবপূর্ণ সংযোজন ঘটিয়েছে, যা এখনো পর্যন্ত তাদের স্বকীয়তা ও প্রাতিস্বিকতার চিহ্ন বহন করে চলেছে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এসব বিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : দর্শনবিজ্ঞান

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইতিহাসবিজ্ঞান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সাহিত্য

প্রথম অনুচ্ছেদ
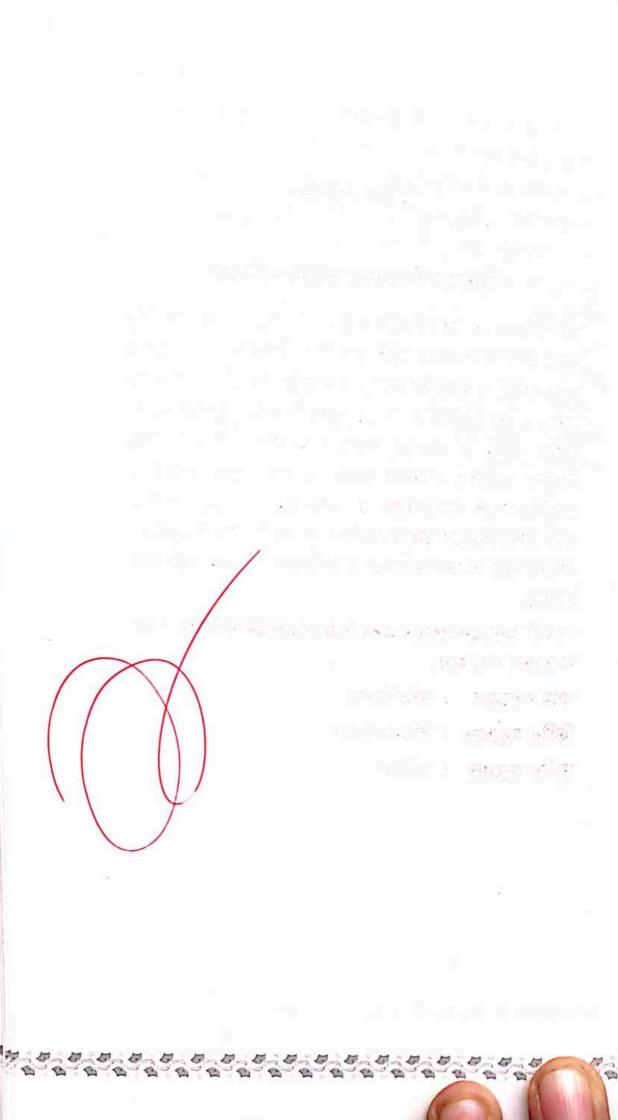
দর্শনবিজ্ঞান

আরবি 'ফালসাফা' (দর্শন) শব্দটি মূলত গ্রিক শব্দ। দুটি গ্রিক শব্দখণ্ড থেকে এ শব্দটি তৈরি হয়েছে, philien (এর অর্থ ভালোবাসা, প্রেম) এবং sophia (এর অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞা)। এভাবে 'ফাইলাসুফ' (দার্শনিক) বা philosopher শব্দটি গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞাকে ভালোবাসেন বা প্রজ্ঞাপ্রেমী।[৬২২]

মুসলিম দার্শনিকরা দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে ইউসুফ আল-কিন্দি দর্শনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ,

«إِنَّهَا عِلْمُ الْأَشْيَاءِ بِحَقَائِقِهَا بِقَدْرِ طَاقَةِ الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْفَيْلَسُوْفِ فِيْ عِلْمِهِ إِصَابَةُ الْحَقِّ، وَفِيْ عَمَلِهِ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ»

> দর্শন হলো মানবিক সাধ্যের মধ্যে বস্তুরাশির হাকিকত বা মূল বিষয় জানা, কারণ দার্শনিকের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যে উপনীত হওয়া এবং কর্মের ক্ষেত্রে সত্য অনুযায়ী তা সম্পাদন করা।[৬২৩]

অনুবাদ-আন্দোলন শুরু হওয়ার পরই মুসলিমরা দর্শনবিদ্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক আব্বাসি যুগে। গ্রিক দর্শনের গ্রন্থরাজির জন্য আরবের পথ সুগম হয়ে ওঠে, ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে—আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আন্তাকিয়া ও হাররান পর্যন্ত এসব গ্রন্থের সয়লাব ঘটে। শুধু তাই নয়, খলিফা আল-মামুন গ্রন্থাবলি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য রোমান, অর্থাৎ বাইজান্টাইন সম্রাটদের কাছে লোক পাঠাতেন। তিনি বিশেষভাবে দর্শনের গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করতেন। রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জ্ঞানের শহর হিসেবে

---

৬২২. ইয়াহইয়া হুওয়াইদি, *মুকাদ্দামা ফিল-ফালসাফা*, পৃ. ২২।

৬২৩. *রাসায়িলুল কিন্দি আল-ফালসাফিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ১৭২।

বিখ্যাত ছিল।[৬২৪] রোমানরা তার কাছে দর্শনের ও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থাবলি পাঠান। একইভাবে দক্ষ অনুবাদকেরাও আল-মামুনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন।

তারা গ্রিক গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। সুরয়ানি ভাষায় রূপান্তরিত গ্রিক গ্রন্থাবলিও তারা হুবহু অনুবাদ করেন। কারণ, মুসলিমদের আবির্ভাবের পূর্বে গ্রিক দর্শনের অসংখ্য গ্রন্থ সুরয়ানি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ সকল অনুবাদকের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন : সারগিউস, সফরানিউস, সাওয়িরিস।[৬২৫]

অন্যান্য গ্রিক (ইউনানীয়) জ্ঞানের সঙ্গে গ্রিক দর্শনেরও অনুবাদ হলো এবং তা মুসলিম ভূখণ্ডে স্থান করে নিলো বটে, কিন্তু অব্যবহিত পরই গ্রিক দর্শন নিয়ে মুসলিম জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। কেউ কেউ গ্রিক দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন এবং একে ভ্রান্তি, গোমরাহি ও নৈরাজ্যের ফটক বলে আখ্যায়িত করলেন। এই অবস্থান ছিল কট্টরপন্থী ফকিহদের। কেউ কেউ মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করলেন। তারা গ্রিক দর্শনের সমালোচনা ও পরিশুদ্ধির পক্ষে অবস্থান নিলেন। গ্রিক দর্শনের যা-কিছু সত্য ও ভালো তা গ্রহণ করা হবে এবং যা-কিছু অসত্য ও ভ্রান্তিপূর্ণ তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মুতাযিলা সম্প্রদায় ও বহু আশআরি মতাবলম্বীর অবস্থান ছিল এটিই। যেমন ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালি। তিনি গ্রিক দর্শনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন : প্রথম ভাগ, যেটাকে কুফরি বলে আখ্যায়িত করা আবশ্যক; দ্বিতীয় ভাগ, যেটাকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করা আবশ্যক; তৃতীয় ভাগ, যেটাকে মৌলিকভাবে অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই।[৬২৬]

কেউ কেউ গ্রিক দর্শনকে বিস্ময়কর ও অভাবিত জ্ঞান হিসেবে আলিঙ্গন করেছেন, তারা এর পঠনপাঠন ও চর্চায় নিয়োজিত হয়েছেন, সেগুলোর অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। তারা গ্রিক দর্শনের রীতি ও আদলে লেখালেখি করেছেন। এই অবস্থানে রয়েছেন আল-কিন্দি ও তার অনুসারীরা।[৬২৭]

---

[৬২৪]. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৭, পৃ. ৮৭।

[৬২৫]. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২২০-২২১।

[৬২৬]. আল-গাযালি, *আল-মুনকিযু মিনাদ দালাল*, পৃ. ১০১।

[৬২৭]. আবদুল মাকসুদ আবদুল গনি, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২২, ২৩।

আরব প্রাচ্যে বা মরক্কো ও আন্দালুসে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে একটি শ্রেণি গ্রিক দর্শনের সেবা করতে চেয়েছেন এবং গ্রিক দর্শনের প্রতি বিমুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। যেমন শেষ দৃষ্টান্তে আমরা উল্লেখ করেছি তা সত্ত্বেও তারা যে কেবল গ্রিক জ্ঞান-ঐতিহ্যের সংরক্ষক ছিলেন অথবা মধ্যযুগে ও পরবর্তী সময়ে প্রাচীন গ্রিস (ইউনান) থেকে ইউরোপে এই জ্ঞান আমদানির বাহক ছিলেন তা নয়, যদিও কতিপয় প্রাচ্যবিদ তাদেরকে এভাবেই চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আল-কিন্দি বা আল-ফারাবি বা ইবনে সিনা বা ইবনে রুশদ প্রমুখ মনীষীর উত্তরাধিকার-ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির কাছে এটা স্পষ্ট যে, তারা দর্শনশাস্ত্রে, এমনকি গ্রিক দর্শনের বিশ্লেষণে ও সংক্ষেপণে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত করেছেন, যা থেকে তাদের মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারও পক্ষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে তাদের কারও কারও মধ্যে ঘৃণ্য পক্ষপাত এবং যাবতীয় ইসলামি ও প্রাচ্যীয় দর্শন ও জ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষভাব শেকড় বিস্তার করেছিল। তাদের কথা অবশ্য ভিন্ন। এই ঘরানার দার্শনিকদের মৌলিকত্ব ও প্রাতিস্বিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সম্ভবত দর্শন ও ধর্ম অথবা যুক্তি ও ওহির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তাদের যে প্রয়াস তার ফলাফলেই ঘটেছে। এসব প্রয়াসের আগে তারা এ ধরনের আরও কিছু প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। সেটা হলো সুফিতাত্ত্বিক আদর্শবাদী প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)—যেমনটা তারা বুঝেছেন—এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।[৬২৮]

দর্শনবিজ্ঞানে মুসলিমদের সেরা অবদান এই যে, তারা প্রাচীন গ্রিসের (ইউনানের) দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থাবলি ও রচনারাশির তথ্যসমূহকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সেগুলোতে যেসব ত্রুটি ছিল সেগুলোকে সংশোধন করেছেন। তারা সেসব গ্রন্থের কোনায়-কানায় থাকা জ্ঞানের ছিটেফোঁটা এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুক্তাদানাকে সন্নিবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলোর সঙ্গে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। তা ছাড়া নতুন নতুন বিষয়, তথ্য ও তত্ত্বের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এগুলো কেবল মুসলিম মনীষীদের উদ্ভাবন, তারা ছাড়া পূর্ববর্তীদের কেউ এগুলো জানত না।

---

[৬২৮]. হামিদ তাহির, *মাদখাল লি-দিরাসাতিল ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২১।

তাই ইসলামে দর্শন-চিন্তার নানা দিক ও বিভিন্ন শাখার সূচনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব), তাসাউফ (সুফিতত্ত্ব), অবিমিশ্র ইসলামি দর্শন ইত্যাদি।

এসব শাখা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো।

১. ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব)

ইসলামি যুক্তিবাদের অন্যতম সূচনা হলো দর্শনবিজ্ঞানের এই শাখা। ইবনে খালদুন ইলমুল কালামের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, এটা এমন জ্ঞান যা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলাদির দ্বারা ঈমানি আকিদা-বিশ্বাসের সুরক্ষা প্রদান করে এবং বিদআতি ও বিকৃতিকারীদের যুক্তি খণ্ডন করে।[৬২৯]

এই বিজ্ঞানশাখাটি অবিমিশ্রভাবে মুসলিমদের বলে বিবেচিত, সূচনাকালে তো বটেই। ধর্মত্যাগ ও ভ্রষ্টতা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখনই দ্বীনি আকিদা-বিশ্বাস এবং এগুলোর বিশ্লেষণ বা যৌক্তিক ব্যাখ্যার সুরক্ষার জন্য ইলমুল কালামের উদ্ভব ঘটে। ইলমুল কালামকে কেন্দ্র করেই বড় বড় দার্শনিক মতবাদের জন্ম হয়েছে। বিশ্বজগতের (বস্তুরাশির) ব্যাখ্যা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম উদ্ভাবনে মুসলিমদের উজ্জ্বল কীর্তিরও প্রকাশ ঘটে এ সময়। তারা অস্তিত্ব, জীবন ও কার্যকারণ ইত্যাদির তাৎপর্য নিরূপণ করেন, যা ছিল গ্রিক দার্শনিকদের থেকে ভিন্ন। এই ক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিকরা ইউরোপের আধুনিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন।[৬৩০]

মুতাকাল্লিমিন বা ধর্মতাত্ত্বিকরা তাদের কার্যক্রমে যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে বেশ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এর ফলেই সম্ভবত কতিপয় প্রাচ্যবিদ ইলমুল কালামকে ইসলামি দর্শন-চিন্তার উদ্ভবের কারণ হিসেবে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তারা এটিকে মুসলিমদের চিন্তার মৌলিকত্বের দলিল হিসেবেও দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে ফরাসি প্রাচ্যবিদ আর্নেস্ট রেনান (Joseph Ernest Renan) বলেছেন, ইসলামে প্রকৃত দর্শন-আন্দোলন মুতাকাল্লিমদের মতবাদগুলোতেই খুঁজে দেখা উচিত।[৬৩১]

---

[৬২৯]. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৪৫৮।

[৬৩০]. আলি সামি নাশশার, *নাশআতুল ফিকরিল ফালসাফি ফিল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৩১ এবং আবদুল মাকসুদ আবদুল গনি, *ফিল ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৪।

[৬৩১]. আবুল ওয়াফা তাফতাযানি, *দিরাসাত ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮।

২. তাসাউফ

তাসাউফকে ইসলামি দর্শন-চিন্তার অন্যতম ময়দান বলে বিবেচনা করা হয়। যদিও তাসাউফের মূল উপাদান হলো সুফিদের যাপিত আত্মিক অভিজ্ঞতা, তারপরও এই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটে চিন্তার এবং কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের। এ কারণে তাসাউফ কেবল অবিমিশ্র দর্শন নয় যে তা বৈপরীত্যমুক্ত ও পরিপূর্ণ অধিবিদ্যামূলক[৬৩২] তত্ত্বে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিতর্কমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ-আলোচনায় গুরুত্বারোপ করবে, বরং তা বিশেষ জীবনঘনিষ্ঠ দর্শন, যেখানে চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবেগ এবং চিত্তের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা, যা সত্যিকার অস্তিত্ব অনুভব করতে সাহায্য করে। এসব কারণে তাসাউফে বিভিন্ন মত, বিভিন্ন ঘরানা ও বিভিন্ন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে তিনটি মানবশক্তি তথা বুদ্ধি, অস্তিত্ব ও আচরণের পরিপূর্ণতার ফল বিবেচনা করা হয়।[৬৩৩]

আমরা এখানে একটি ইঙ্গিত দেওয়া সংগত মনে করি। তাসাউফ হলো যেকোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলিত অন্তর্বীক্ষণ, যে ব্যক্তি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা যাপন করে তার অন্তরে এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাসাউফ একটি মানবতাবাদী প্রপঞ্চ, যার প্রকৃতিটি আত্মিক, সময়ের বা স্থানের সীমারেখা দিয়ে একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তা ছাড়া তাসাউফ কোনো জাতি বা গোষ্ঠী বা মানবশ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট নয়।[৬৩৪]

৩. অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ দর্শন

যে-সকল মুসলিম দার্শনিক অভিভূত হয়ে গ্রিক দর্শনকে আলিঙ্গন করেছিলেন, গ্রিক দর্শনের পড়াশোনায় এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচনাবলি লিখেছিলেন তাদের

---

৬৩২. অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স (Metaphysics) হলো দর্শনের একটি শাখা। এতে বিশ্বের অস্তিত্ব, আমাদের অস্তিত্ব, সত্যের ধারণা, বস্তুর গুণাবলি, সময়, স্থান, সম্ভাবনা ইত্যাদির দার্শনিক আলোচনা করা হয়। এই চিন্তাধারার জনক অ্যারিস্টটল। মেটাফিজিক্স শব্দটি গ্রিক 'মেটা' (μετά) এবং 'ফিজিকা' (φυσικά) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অধিবিদ্যায় দুটি মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় : ১. সর্বশেষ পরিণাম কী? ২. কীসের মতো? অধিবিদ্যার দুটি মৌলিক শাখা হলো সৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology) এবং তত্ত্ববিদ্যা (ontology)।-অনুবাদক

৬৩৩. আবদুল মাকসুদ আবদুল গনি, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫।

৬৩৪. আবুল আলা আফিফি, *আত-তাসাউফ আস-সাওরাতুর রুহিয়্যা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৫৬।

দর্শনই বিশুদ্ধ দর্শন। যেমন আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ইবনে বাজাহ[৬৩৫], ইবনে তুফাইল[৬৩৬] প্রমুখ। মুসলিম দার্শনিকদের এই দলটি ছিল এক বিশাল মিনারের মতো, এর আলোয় আলোকিত হয়েছিল গোটা বিশ্ব। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সভ্যতা। নিচে এ সকল দার্শনিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হলো।

---

[৬৩৫]. ইবনে বাজাহ আন্দালুসি : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে বাজাহ (৪৮৭-৫৩৩ হি./১০৮৫-১১৩৯ খ্রি.)। ল্যাটিনকৃত 'আভেমপেস' বলেও পরিচিত। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের আন্দালুসের একজন পলিমেথ (বহুশাস্ত্রবিদ)। ইবনে বাজাহ জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সংগীত, যুক্তি, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও কাব্য নিয়ে লিখেছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ '*ইত্তিসালুল আকল*'। ইবনে বাজাহ বর্তমান স্পেনের অ্যারাগনের জারাগোজায় ১০৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৩৯ সালে মরক্কোর ফেজে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে বাজাজ কবি তুতিলির সঙ্গে কবিতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় ২০ বছর তিনি মরক্কোর মুরাবিত সুলতান ইউসুফ ইবনে তাশফিনের উজির হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি *কিতাবুন নাবাত* নামক উদ্ভিদবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। এতে উদ্ভিদের লিঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সেভিলের চিকিৎসক আবু জাফর ইবনে হারুন তুরজালি। তার দার্শনিক মতামত ইবনে রুশদ ও আলবার্টাস মেগনাসের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। অল্প বয়সে মৃত্যুর কারণে তার অধিকাংশ লেখা ও বই অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। ওষুধ, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইসলামি দর্শনে আত্মা বিষয়ে তার অবদান কম নয়। তার সময়ে দর্শন ছাড়াও সংগীত ও কবিতার একজন প্রখ্যাত সমঝদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৫১ সালে তার দিওয়ান আবিষ্কৃত হয়। ইবনে বাজাহর অধিকাংশ কর্ম টিকে না থাকলেও জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে তার তত্ত্ব মাইমোনিডস ও ইবনে রুশদের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এ সকল তত্ত্ব পরবর্তী সময়ে ইসলামি সভ্যতা ও গ্যালিলিও গ্যালিলিসহ ইউরোপের রেনেসাঁসকে প্রভাবিত করেছে।-অনুবাদক।

[৬৩৬]. ইবনে তুফাইল : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তুফাইল কাইসি আন্দালুসি (৪৯৪-৫৮১ হি./১১০০-১১৮৫ খ্রি.) ছিলেন একাধারে একজন চিকিৎসক, লেখক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, কবি, ধর্মতাত্ত্বিক, উজির ও দরবারের কর্মকর্তা। মুওয়াহহিদি খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফের দরবারে কাজ করেছেন। প্রথম দার্শনিক উপন্যাস '*হাই ইবনে ইয়াকযান*' রচনার জন্য তিনি অধিক সমাদৃত। পাশ্চাত্যজগতে এটি ফিলোসফিকাল অটোডিডাকটাস নামে পরিচিত। মরদেহ ব্যবচ্ছেদের সমর্থক প্রথমদিককার চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৪৯।

১. আল-কিন্দি

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দি আল-কুফি (১৮৫-২৫৬ হি./৮০৫-৮৭৩ খ্রি.)। অধিকাংশ বিশ্লেষক তাকে ইসলামি আরব দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচনা করেছেন। তাই তিনিই 'ফাইলাসুফুল আরব' (আরবের দার্শনিক) উপাধির সত্যিকার হকদার ছিলেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি দুইশরও বেশি রচনা লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দর্শন বিষয়ে তার মূল্যবান গ্রন্থ '*আল-ফালসাফাতুল উলা ফি-মা দুনাত তবিইয়্যাত ওয়াত-তাওহিদ*'।

আল-কিন্দি মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা-বিষয়ক জটিলতার দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রথম ইটটি স্থাপন করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, প্রকৃত কর্ম ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ফসল নয়। তা ছাড়া মানুষের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় একপ্রকার মানসিক শক্তি, আবেগ ও চিন্তাই এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। আল-কিন্দি ছিলেন কার্যকারণে বিশ্বাসীদের একজন। ঐশী প্রযত্ন (Divine Providence)[৬৩৭]-এর চিন্তাকে তিনি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন, কতিপয় প্রতিষ্ঠিত নীতির আলোকে ঐশী প্রযত্নের দাবির কাছেই সৃষ্টিজগৎ নতি স্বীকার করে।[৬৩৮]

আল-কিন্দি একইভাবে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি চিকিৎসা ও ওষুধ বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভূগোল, রসায়ন, যন্ত্রপ্রকৌশল ও সংগীতবিদ্যায়ও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কতিপয় প্রাচ্যবিদ তাকে বারোজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অন্যতম মনে করেন, যাদেরকে মানব-চিন্তার চূড়া বিবেচনা করা হয়।[৬৩৯]

২. আল-ফারাবি

তিনি হলেন আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে তারহান আল-ফারাবি (২৫৯-৩৩৯ হি./৮৭২-৯৫০ খ্রি.)। তাকে সবচেয়ে বড় মাপের মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে বিবেচনা করা হয়। আল-ফারাবি অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলির পঠনপাঠন এবং সেগুলোর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শিক্ষক

---

৬৩৭. মানুষ ও সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর প্রযত্ন বা দেখভাল।-অনুবাদক।

৬৩৮. ইবরাহিম মাদকুর, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ১৪৪।

৬৩৯. কাদরি হাফিজ তাওকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি*, পৃ. ২৭ এবং ফাওকিয়া মাহমুদ, *মাকালাত ফি আসালাতিল মুফাককিরিল মুসলিম*, পৃ. ৪৯।

হিসেবে পরিচিত, যেখানে প্রথম শিক্ষক অ্যারিস্টটল নিজে। তার হাতেই অ্যারিস্টটলীয় দর্শন চূড়ান্ত মার্গে পৌছে, অ্যারিস্টটলের দর্শন কোথাও এর চেয়ে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেনি। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি আলফারাবিয়াস (Alpharabius) নামে বিখ্যাত। আল-ফারাবি তার ব্যাখ্যা, চিন্তা ও শৈলীর কল্যাণে গ্রিক দর্শনকে ইসলামি চিন্তার সাথে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল-কিন্দির হাতে এই কীর্তি সাধন সম্ভব হয়নি।[৬৪০]

আল-ফারাবির সবচেয়ে বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *আরাউ আহলিল মাদিনাতিল ফাদিলাহ ওয়া মুদাদ্দাতুহা*। এই গ্রন্থে তিনি অভিজাত আদর্শ মানবসমাজের নীতি-ব্যবস্থা বর্ণনা করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও ইসলামি আরব সংস্কৃতির কিছু অনুষঙ্গ তার বিশেষ দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। ইলমুল কালাম, আকিদা, ফিকহ ও শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগেই আল-ফারাবির গ্রন্থাবলি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং প্যারিস থেকে ১৬৩৮ সালে মুদ্রিত হয়েছে। তাই ইউরোপের ওপর এসব গ্রন্থের বিরাট দার্শনিক প্রভাব রয়েছে।[৬৪১]

৩. ইবনে সিনা

তিনি হলেন আবু আলি হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা (৩৭০-৪২৮ হি./৯৮০-১০৩৭ খ্রি.)। ইবনে সিনা 'আশ-শাইখুর রয়িস' (প্রধান শাইখ) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অ্যারিস্টটল ও আল-ফারাবির পর তিনি 'তৃতীয় শিক্ষক' হিসেবে পরিচিত হন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে তার যতটা খ্যাতি, দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি তার চেয়ে কম নয়। আমেরিকান ঐতিহাসিক ও রসায়নবিদ জর্জ সার্টন ইবনে সিনাকে শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অন্যতম এবং পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের একজন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

[৬৪০]. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২২৪।

[৬৪১]. রহিম কাযিম মুহাম্মাদ হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৮।
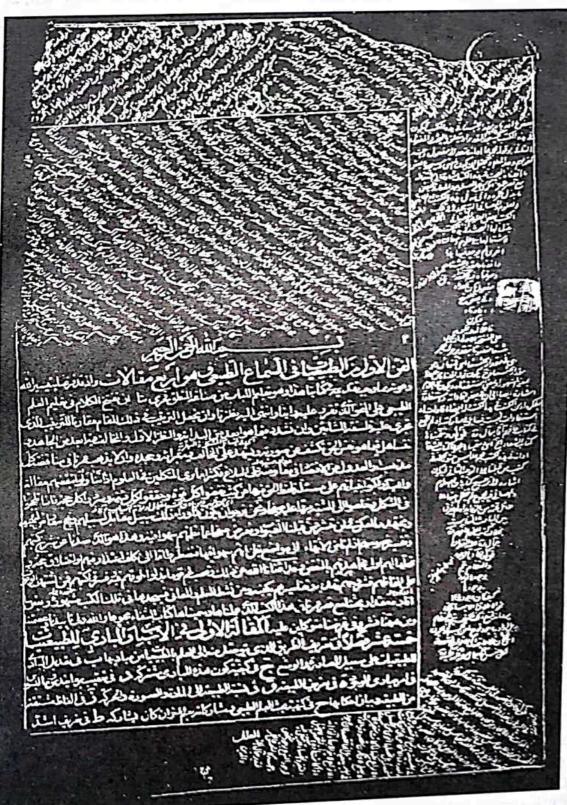
চিত্র নং-১৭
ইবনে সিনা রচিত 'আশ-শিফা'

দর্শন বিষয়ে ইবনে সিনার বহু রচনা রয়েছে। এসব রচনা তার হাতে দর্শন নির্মাণ ও দর্শনের বিকাশে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তার কিছু দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ হলো '*আশ-শিফা*'। এই গ্রন্থে দর্শনবিদ্যার সমাবেশ ঘটেছে। এর পরে রয়েছে '*আন-নাজাত*'। যা *আশ-শিফার* সংক্ষিপ্ত রূপ। আরও রয়েছে '*আল-ইশারাত ওয়াত-তানবিহ*' এবং হিকমাহ বিষয়ে সাতটি পুস্তিকা এবং অন্যান্য বই।[৬৪২]

৪. ইবনে রুশদ

আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ কুরতুবি আন্দালুসি (৫৯৫ হি./১১৯৮ খ্রি.)। তিনি আন্দালুসে (মুসলিম স্পেনে) শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ছিলেন। তাকে অ্যারিস্টটলের দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারও বিবেচনা করা হয়। এমনকি তিনি 'আশ-শারিহ' (ব্যাখ্যাকার) নামে পরিচিতি পান। ইবনে রুশদ অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর শিক্ষারাশির মধ্যে বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য নিরূপণ করেন। তা ছাড়া তিনি সেগুলোর পরীক্ষানিরীক্ষা ও সংশোধনও করেন। এমনকি তিনি অ্যারিস্টটলের অধিকাংশ মত ও সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, যেগুলো ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

পাশ্চাত্য ইবনে রুশদের দর্শনের পুরোটাই গ্রহণ করেছে। তার দর্শন মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন-চিন্তার সামনে তর্কবিতর্ক ও গবেষণার ফটক উন্মোচন করে দেয়। গবেষণার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক মত গ্রহণের ব্যপারে তাদের মধ্যে 'রুশদিয়া মতবাদ' (Averroism)-এর উদ্ভব ঘটে। ইবনে রুশদের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *ফাসলুল মাকাল ফি-মা বাইনাল হিকমাতি ওয়াশ-শারিআতি মিনাল ইত্তিসাল*[৬৪৩] এবং *মানাহিজিল আদিল্লাহ ফি আকায়িদিল মিল্লাহ*।[৬৪৪]

---

৬৪২. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২২৫।

৬৪৩. On the Harmony of Religions and Philosophy or The Decisive Treatise, Determining the Nature of the Connection between Religion and Philosophy.-অনুবাদক।

৬৪৪. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২২৭ এবং রহিম কাযিম মুহাম্মাদ হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৮।

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, ইসলামি দর্শন মানব-চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা হিসেবে পরিগণিত। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানব-চিন্তার উৎকর্ষ বলতে ইসলামি দর্শনকেই বোঝায়। পূর্ববর্তী দর্শন থেকে যা-কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তা তো হয়েছেই, তা সত্ত্বেও দর্শনের বিশুদ্ধতা নিরূপণে এবং নতুন নতুন বিষয় সংযোজনে ইসলামি দর্শন-স্কুলের অবদান অনেক। ইসলামি দর্শন পরবর্তীকালের অন্যান্য দর্শনের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছে। ইসলামি দর্শনই খ্রিষ্টবাদী দর্শনকে প্রচণ্ড ধাক্কায় হটিয়ে দিয়েছে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং আধুনিক যুগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে রসদ জুগিয়েছে।

বাস্তবিক দিক থেকেও ইসলামি দর্শনের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব। ইসলামি দর্শন ইউরোপে বেশ কিছু বিষয়কে ও সমস্যাকে জাগিয়ে দিয়েছে। যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইনস্টিটিউটে গুরুত্ব পেয়েছে। এসব সমস্যা ও বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রচুর গবেষণা, আলাপ-আলোচনা ও পঠনপাঠন হয়েছে। বহু গ্রন্থ ও রচনায় এগুলোর প্রতিবিধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশেও এসব বিষয়ের ভিন্নতা প্রভাব ফেলেছিল। এসব বিষয় ও সমস্যার মধ্যে রয়েছে আত্মা ও আত্মার রহস্য, জ্ঞান-তত্ত্ব, পৃথিবীর প্রাচীনত্বের সমস্যা, পরিবর্তনপরম্পরা-তত্ত্ব, স্রষ্টার গুণাবলি, ঐশী প্রযত্ন-সমস্যা, মঙ্গল ও অমঙ্গল, অস্তিত্ব ও উপাদান-সমস্যা, সম্ভব ও আবশ্যক সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয়।[৬৪৫]

---

৬৪৫ আবদুল মাকসুদ আবদুল গনি, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইতিহাসবিজ্ঞান

কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং মানবসমাজের অস্তিত্বের সূচনালগ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসবিদ্যার সূচনা ঘটেছে। যখন থেকে মানুষ চিহ্ন বা প্রতীক বা অন্যকিছুর দ্বারা তার জীবনের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাতে শুরু করেছে তখন থেকেই ইতিহাসবিদ্যার ভিত রচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই মানুষকে জানার একটি নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, সামাজিক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তেই এই জ্ঞানপদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। সূচনাকাল থেকেই মানবগোষ্ঠীগুলোর ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই প্রয়োজন আবশ্যক হয়ে উঠেছে, সুতরাং আমাদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেওয়া সংগতই হবে যে, ইতিহাসের সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। মানবসত্তা ও মানবসমাজকে জানার যে প্রয়োজন, ইতিহাসই তা পূরণ করে।[৬৪৬]

ইবনে খালদুন বলছেন, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের সব জাতি-গোষ্ঠী ইতিহাসশাস্ত্রের চর্চা করেছে। ভ্রাম্যমাণ কাফেলা ও যাযাবররাও ইতিহাসের প্রতি ধাবিত হয়েছে। ইতিহাসবিদ্যার কাছে ধরনা দিয়েছে সচেতন গোষ্ঠী যেমন, তেমনই কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে উদাসীন গোষ্ঠীও। জ্ঞানী ও নির্বোধ উভয় শ্রেণিই ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে সমরেখায় অবস্থান করেছে। যেহেতু ইতিহাস বাহ্যিকভাবে রাষ্ট্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পূর্ববর্তী যুগ সম্বন্ধে কেবল সংবাদই পরিবেশন করেছে। এতে বক্তব্যের বাড়াবাড়ি আছে, দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি আছে। বিভিন্ন জনসমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রান্তিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব সংবাদ আমাদের জানায় যে যুগ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পালটে যায় মানবমণ্ডলীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র, রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও ছোট-বড় সব দিক উঠে এসেছে এসব সংবাদে। তারা এক সময় পৃথিবী আবাদ করেছিল, পরে তাদের চলে যাওয়ার ডাক আসে এবং পতনের সময় এসে উপস্থিত

---

৬৪৬. কাসিম আবদুহু কাসিম, *আর-রুয়াতুল হাযারিয়্যাহ লিত-তারিখ*, পৃ. ৯।

হয়। তার অভ্যন্তরীণ দিকে (ইতিহাসবিদ্যার অভ্যন্তরে তত্ত্বানুসন্ধানীদের জন্য) রয়েছে চিন্তাভাবনার অনেক বিষয়, মানবমণ্ডলী ও তাদের নীতি-আদর্শের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, ঘটনাবলির অবস্থা ও কার্যকারণ সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব। এ কারণেই জ্ঞানের ময়দানে ইতিহাসশাস্ত্রের রয়েছে মৌলিক ও দৃঢ়মূল অবস্থান এবং এটি জ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাখা।[৬৪৭]

ইতিহাসবিদ্যার সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

ইতিহাস হলো বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী, তাদের দেশ ও অঞ্চল, আচার-অভ্যাস-সংস্কৃতি, ব্যক্তিবর্গের কীর্তিকলাপ, তাদের বংশধারা, জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে জানা। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হলো অতীতকালের নবী-রাসুল, বুযুর্গ-আওলিয়া, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ, কবি-সাহিত্যিক, রাজাবাদশা ও অন্যদের অবস্থাবলি। ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য হলো অতীত কালের অবস্থাবলি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে জানা। ইতিহাসবিদ্যার উপকারিতা হলো ওইসব ঘটনা ও অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, নসিহত হাসিল করা এবং যুগের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের যোগ্যতা লাভ করা, যাতে অনুরূপ ক্ষতিকর ঘটনা থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং অনুরূপ কল্যাণকর ঘটনা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। এই বিদ্যায় যারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তাদের জন্য তা অন্য জীবন এবং এই বিদ্যার ভূমিতে যারা ভ্রমণ করবে তারা অনন্য উপকারিতায় সমৃদ্ধ হবে।[৬৪৮]

ইসলামি ইতিহাসবিদ্যা মৌলিকতা ও অনন্যতার ভূষণে ভূষিত। ইসলামি সমাজের অভ্যন্তর থেকেই এই সমাজের প্রয়োজন পূরণ ও উদ্দেশ্য সাধনে সাড়া দিয়ে এই বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে। ইসলামি ইতিহাস অন্যদের কাছে যা ছিল তার কোনো ছায়া নয় অথবা তাদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তাবলি থেকে সংগৃহীতও কিছু নয়। ইসলামি ইতিহাস মূলত ঐতিহাসিকদের ধর্মীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এবং ধর্মীয় জ্ঞানরাশির

---

[৬৪৭]. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৩-৪।
[৬৪৮]. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

পরিপূরক। ইসলামি ইতিহাস হিজরি বর্ষপঞ্জিকেই যুগপরম্পরা নির্ধারণ ও ঘটনার বর্ণনায় ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।[৬৪৯]

আরবরা জাহিলি যুগে এবং ইসলামের শুরুর দিকে ইতিহাসকে তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করত। তারা ইতিহাসের ঘটনাবলি সংকলন বা লিপিবদ্ধকরণে কোনো প্রচেষ্টা ব্যয় করেনি। তা এ কারণে নয় যে তারা লিখতে জানত না, বরং তারা লেখার চেয়ে স্মৃতিতে সংরক্ষণকেই অধিক সমর্থন দিয়েছে। সেই সময়ে লেখার যোগ্যতা মানুষকে ততটা সামাজিক মর্যাদা এনে দিত না, যতটা মর্যাদা এনে দিত স্মৃতিতে সংরক্ষণের যোগ্যতা। তাই আরবদের প্রাথমিক ইতিহাস, অর্থাৎ ঘটনাবলি ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ তাদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত ছিল, যা তারা মুখে মুখে আওড়াত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরব মুসলিমরা তাদের পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেল, যুদ্ধ ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নানা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে গেল, বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশে গেল যারা তাদের (আরবি) ভাষায় কথা বলত না। তখন তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণের যোগ্যতা হ্রাস পেল এবং সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুসলিমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহ, ঘটনাবলি ও অবস্থাবলি বর্ণনা ও সংরক্ষণের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলো। এটাই ছিল ইসলামি ইতিহাস সংকলনের সূচনা। তবে ইসলামি ইতিহাসের সংকলন-কর্মের বিস্তৃতি ঘটল তখনই যখন বিজিত অঞ্চলগুলোর মানুষ ইসলামের প্রতি ধাবিত হলো এবং আরবি ভাষা শিখতে উঠেপড়ে লাগল। তাদের পূর্ববর্তী সভ্যতা তাদেরকে ইতিহাসের স্বাদ আস্বাদনে সহায়তা করল। এসব কারণে ইসলামের প্রাথমিক ঐতিহাসিকরা ছিলেন অনারব আরবি ভাষাবিদ।[৬৫০]

এটা বলা যায় যে, ইসলামি ইতিহাসের পড়াশোনা ও লেখালেখি শুরুর দিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত এবং তার যুদ্ধবিগ্রহ ও যে-সকল সাহাবি এগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সংবাদ, প্রাথমিক মুসলিমদের হাবশায় হিজরতের তথ্যাবলি, তারপর

---

৬৪৯. ফ্রান্‌জ রোসানথাল (Franz Rosenthal), *A History of Muslim Historiography*, আরবি অনুবাদ, علم التاريخ عند المسلمين, অনুবাদক, সালেহ আহমাদ আলি, পৃ. ২৬৭; আহমাদ আমিন, *ফাজরুল ইসলাম*, পৃ. ১৫৬-১৬২।

৬৫০. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২১১-২১২।

মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরতের ঘটনা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের উদ্যোগের জন্য মক্কা ও মদিনা ছিল প্রধান কেন্দ্র। ঐতিহাসিকগণ মৌখিক বর্ণনার ওপর নির্ভর করতেন, যেমন মুহাদ্দিসগণ করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি ইতিহাস সূচনালগ্নে সেই পথেই এগিয়েছে যে পথে এগিয়েছে ইলমুল হাদিস (হাদিসশাস্ত্র)। সংবাদ ও তথ্য পরিবেশকদের থেকে এই পদ্ধতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ঐতিহাসিক সংবাদ ও তথ্য লিপিবদ্ধ করা হতো। এটি সনদ বা ইসনাদ নামে পরিচিত ছিল। এসব সংবাদ ও তথ্য ভাষ্য আকারে পরিবেশিত হলো এবং এর নাম হলো মতন। এই কারণে যুদ্ধবিগ্রহের সংবাদ-সংবলিত গ্রন্থাবলিকে (কুতুবুল মাগাযি ওয়াস-সিয়ার) সবচেয়ে প্রাচীন ও সূচনালগ্নের ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এসব গ্রন্থে হাদিস ও ইতিহাসের সমাবেশ ঘটেছিল। এসব গ্রন্থ সংকলনে গুরুত্ব প্রদানের কারণ ছিল এই যে, মুসলিমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও কাজের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন, যেহেতু তারা এগুলোর দ্বারা পথের দিশা পেতেন এবং এগুলোরই ওপর নির্ভর করতেন।

ফলে মুসলিমদের ইতিহাস সংকলনে দুটি পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে : ১. মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি। মদিনা মুনাওয়ারায় যাপিত নববি জীবনচরিতের ইতিহাস রচনায় এই পদ্ধতির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে, এটি সনদ বা সূত্রের সঙ্গে সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। ২. এটি হলো ইতিহাসবিদদের পদ্ধতি। বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ, কবিতা ও বক্তৃতার উদ্ধৃতি ও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ চিত্র প্রদান করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে কুফায়। তারপর উভয় পদ্ধতির মধ্যে মিলনপ্রক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে। একইভাবে ইতিহাসবিদ্যার অন্যান্য ঘরানার প্রকাশ ঘটে। এসব ঘরানার বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহ, ইসলামি বিজয়, বংশপরম্পরার বর্ণনা ইত্যাকার কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করা।

ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন ছিলেন তারা হলেন : আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান[৬৫১], মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরি, ইবনে ইসহাক[৬৫২], আওয়ানা ইবনুল হাকাম কালবি[৬৫৩], সাইফ ইবনে উমর কুফি[৬৫৪], আল-মাদায়িনি[৬৫৫] প্রমুখ। আল-মাদায়িনি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদদের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতেন। কারণ, তিনি সনদ ও সূত্রের ওপর অন্যদের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তা ছাড়া তিনি তথ্য ও সংবাদ পরীক্ষানিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও শৃঙ্খলাবদ্ধকরণে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

মুসলিমদের নিকট ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ ধরণগুলো নিম্নরূপ :

ক. সিরাতে নববি ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধবিগ্রহ-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি

মুসলিমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ ও কার্যাবলির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন। কারণ, তারা এগুলোর দ্বারা পথের দিশা পেতেন এবং ইসলামি বিধান প্রণয়নে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ও জীবনযাপনে এগুলোরই ওপর নির্ভর করতেন। এ ব্যাপারটিই

---

[৬৫১]. আবান ইবনে উসমান : আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান আল-উমাবি আল-কুরাশি (মৃ. ১০৫ হি./৭২৩ খ্রি.)। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির, ইতিহাসবিদ। সিরাতে নববি বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত বিষয়ে রচনা তিনিই প্রথম লেখেন। তিনি খলিফা উসমান রা.-এর পুত্র। তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *তাহযিবুত তাহযিব*, খ. ১, পৃ. ৮৪।

[৬৫২]. ইবনে ইসহাক : মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার আল-মুত্তালিবি (মৃত্যু: ১৫১ হি./৭৬৮ খ্রি.)। আরবের প্রাথমিক ইতিহাসবিদদের অন্যতম। মদিনার অধিবাসী ছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো '*আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*'। গ্রন্থটির পরিমার্জন করেছেন ইবনে হিশাম। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

[৬৫৩]. আওয়ানা আল-কালবি : আবুল হাকাম আওয়ানা ইবনুল হাকাম ইবনে আওয়ানা ইবনে ইয়ায (মৃ. ১৪৭ হি./৭৬৪ খ্রি.)। বড় মাপের আলেম ও ইতিহাসবিদ, বাগ্মী ও বিশুদ্ধভাষী। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : '*আত-তারিখ*', '*সিয়ারু মুআবিয়া ওয়া বানি উমাইয়া*'। তার অন্যান্য গ্রন্থও রয়েছে। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৭, পৃ. ২০১।

[৬৫৪]. সাইফ ইবনে উমর : সাইফ ইবনে উমর আল-আসাদি আল-কুফি (মৃ. ২০০ হি./৮১৫ খ্রি.)। প্রখ্যাত জীবনচরিতকার। বাগদাদে খ্যাতিমান ছিলেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : '*আল-জামাল*', '*আল-ফুতুহুল কাবির*'। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *তাহযিবুত তাহযিব*, খ. ৪, পৃ. ২৫৯।

[৬৫৫]. আল-মাদায়িনি : আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (১৩৫-২২৫ হি./৭৫২-৮৪০ খ্রি.)। বর্ণনাধর্মী ঐতিহাসিক। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বসরার অধিবাসী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : '*আখবারু কুরাইশ*'। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ৪০০-৪০২।

লেখকদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। কালিক অগ্রগামিতার বিবেচনায় জীবনচরিত বর্ণনাকারীদের ও তাদের গ্রন্থাবলিকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম স্তর : এই স্তরে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন, ১. উরওয়া ইবনে যুবাইর ইবনুল আওয়াম। তিনি তাবিয়ি। ৯২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। ২. আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান। তিনি বহু পুস্তিকা রচনা করেছেন যেগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের মণি-মুক্তা ধারণ করে আছে। ৩. শুরাহবিল ইবনে সাদ। দ্বিতীয় স্তর : এই স্তরে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরি। তাকে জীবনচরিত ও যুদ্ধবিগ্রহের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বিবেচনা করা হয়। তৃতীয় স্তর : এ স্তরের বিখ্যাতদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক। আমরা যত সিরাতগ্রন্থ পেয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সিরাতগ্রন্থের রচয়িতা তিনি।

খ. তবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থাবলি

ইসলামি ইতিহাসের সংস্কৃতি সূচনালগ্ন থেকেই তবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থাবলির সঙ্গে পরিচিত। হাদিস সংকলন ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলিই হলো তবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থাবলি। হাদিসের সনদ যাচাই-বাছাই, রাবিদের অবস্থাবলি নিরীক্ষণ ইত্যাদিও এসব গ্রন্থের বিষয়। এসব বিষয় থেকেই তবাকাত-চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের বক্তব্য বিশুদ্ধীকরণ ও গ্রহণযোগ্যতার অনুমোদনে কতিপয় মানদণ্ড নির্ধারণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হাদিস-বিশেষজ্ঞদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। রাবির চারিত্রিক দিক, তার সত্যবাদিতা ও তাকওয়াই ছিল সেসব মানদণ্ডের মৌলিক বিষয়। হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ রাবিগণের পারিবারিক অবস্থা, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার হাল-হাকিকত ও তাঁর সঙ্গে তাদের সাহচর্যের সময়সীমা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের সঙ্গে বা খুলাফায়ে রাশেদিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খতিয়ে দেখার বিষয়টিও মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন। যাদের থেকে রাবিগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের সঙ্গে বাস্তবিক অর্থেই তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, নাকি সাক্ষাৎ সম্ভাব্য বিষয় ছিল, এ ব্যাপারেও তারা গুরুত্ব দিয়েছেন। সনদে বর্ণিত প্রত্যেক

মনীষীর জন্মতারিখ ও মৃত্যুতারিখ জানতেও তারা বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ফলে হাদিসের সনদ বা ইসনাদ ছিল জীবনচরিত রচনার অন্যতম কারণ। এসব জীবনচরিতের সনদে বর্ণিত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকত। জীবনচরিত রচনায় হাদিসের মূল উৎস অর্থাৎ নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতা জানার চেষ্টায় সনদে বর্ণিত ব্যক্তিদের ধারাবাহিক স্তরে বিন্যস্ত করা, সামসময়িকতার দিকটি বিবেচনায় আনা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সেই সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল সংগত কাজ। এসব বিষয়েই তবাকাত (স্তরবিন্যাস)-চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল। সনদে বর্ণিত ব্যক্তিদের তথ্যাবলি বেশ কিছু রচনায় পরিবেশিত হয়েছিল।[৬৫৬]

তাবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থাবলি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তাবাকাতুল মুহাদ্দিসিন (মুহাদ্দিসগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল হুফফায (হাফিযে হাদিসগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল ফুকাহা (ফকিহগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ (শাফিয়ি মাযহাবপন্থী আলেমগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল হানাবিলাহ (হাম্বলি মাযহাবপন্থী আলেমগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল কুররা (কুরআনের কারিদের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল মুফাসসিরিন (মুফাসসিরগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুস সুফিয়্যাহ (সুফিগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুশ শুআরা (কবিদের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুন নাহবিয়্যিন (ব্যাকরণবিদদের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল আতিব্বা (চিকিৎসকদের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি। তাবাকাত-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে : ১. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মুহাম্মাদ ইবনে সাদ যুহরি[৬৫৭] ২. *তাবাকাতুশ শুআরা*, মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-

---

৬৫৬. মুহাম্মাদ খায়ের মাহমুদ আল-বুকায়ি, *আত-তালিফ ফি তাবাকাতিল মালিকিয়্যা ফিত-তুরাসিল আরাবিয়্যা : দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়াসফিয়্যাতুন*, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

৬৫৭. ইবনে সাদ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাদ ইবনে মানি আয-যুহরি (১৬৮-২৩০ হি./৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.)। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক, হাফিযে হাদিস। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ '*আত-তাবাকাতুল কুবরা*'। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *তাহযিবুত তাহযিব*, খ. ৯, পৃ. ১৬১।

জুমাহি[৬৫৮] ৩. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, আহমাদ ইবনে আবি উসাইবিআ (মৃ. ৬৬৮ হি.) এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

চিত্র নং-১৮
সুবকি রচিত 'তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ'

৬৫৮. আল-জুমাহি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-জুমাহি (১৫০-২৩২ হি./৭৬৭-৮৪৬ খ্রি.)। আরবি সাহিত্যের ইমাম। বসরার অধিবাসী। বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *'তাবাকাতু ফুহুলিশ শুআরা'*। দেখুন, ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল উদাবা*, পৃ. ২৫৪১।

গ. জীবনচরিত-বিষয়ক গ্রন্থাবলি

এসব গ্রন্থে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পরিবেশিত হয়েছে। জ্ঞানের বিশেষ শাখায় তাদের খ্যাতিই তাদের একত্র করেছে। বিশ্বকোষ আকারে তাদের জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে। আলেম, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, খলিফা ও অন্যান্য শ্রেণির মানুষ জীবনচরিত-বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে স্থান পেয়েছেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি নিম্নরূপ : ১. *মুজামুল উদাবা*, ইয়াকুত হামাবি (মৃ. ৬২৬ হি) ২. *উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা*, ইবনুল আসির ৩. *ওয়াফাতুল আ'য়ান*, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে খাল্লিকান (মৃ. ৬৮১ হি)। জীবনচরিত বিষয়ে এটি অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ, এটির বিন্যাস উৎকৃষ্ট ও যথাযথ। ৪. *ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*, ইবনে শাকির কুতুবি[৬৫৯] ৫. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, সালাহুদ্দিন খলিল সাফাদি[৬৬০]।

ঘ. বিজয়-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি

এসব গ্রন্থে ভূখণ্ড, দেশ ও শহর বিজয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : ১. *ফুতুহু মিস্‌র ওয়াল-মাগরিব ওয়াল-আন্দালুস*, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (মৃ. ২৫৭ হি.) ২. *ফুতুহুল বুলদান*, আল-বালাযুরি[৬৬১] ৩. *ফুতুহুশ শাম*, আল-ওয়াকিদি[৬৬২]।

---

৬৫৯. ইবনে শাকির কুতুবি : সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে শাকির আদ-দিমাশকি (মৃ. ৭৬৪ হি./১৩৬৩ খ্রি.)। গবেষক ঐতিহাসিক, সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ। দামেশকেই জন্ম ও মৃত্যু। '*ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*' তার বিখ্যাত গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৬, পৃ. ২০৩-২০৫।

৬৬০. সাফাদি : সালাহুদ্দিন খলিল ইবনে আইবেক ইবনে আবদুল্লাহ (৬৯৬-৭৬৪ হি./১২৯৬-১৩৬৩ খ্রি.)। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক। ফিলিস্তিনের সাফাদে জন্মগ্রহণ করেন। (বর্তমানে এটি ইসরাইলের একটি শহর।) তিনি সাফাদে, মিশরে ও আলেপ্পোয় দিওয়ানুল ইনশার প্রধান (খলিফা ও আমিরদের চিঠিপত্র বিভাগের সম্পাদক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর দামেশকে বাইতুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের) তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। দামেশকেই মৃত্যুবরণ করেন। '*আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৬, পৃ. ২০০-২০৩।

৬৬১. আল-বালাযুরি : আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জাবির ইবনে দাউদ (জন্ম : ৮০৬ খ্রি., মৃ. ৮৯২ খ্রি./২৭৯ হি.)। ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, বংশধারাবিশেষজ্ঞ। বাগদাদের অধিবাসী।

ঙ. বংশধারা-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি

এসব গ্রন্থে আরবদের বংশধারা ও তাদের উৎপত্তি-সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। বংশবিদ্যায় আরবদের বিশেষ পারঙ্গমতা ছিল, যা অন্যকোনো জাতির মধ্যে ছিল না। কারণ ইসলামের পূর্বে গোত্রগত উপজাতীয়তা (tribalism) তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। যারা বংশবিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন নিম্নরূপ : ১. মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব আল-কালবি, তার রচিত গ্রন্থ '*জামহারাতুন নাসাব*'। ২. মুসআব যুবাইরি[৬৬৩], তার রচিত গ্রন্থ '*নাসাবু কুরাইশ*'। ৩. ইবনে হাযম আল-আন্দালুসি, তার রচিত গ্রন্থ '*জামহারাতু আনসাবিল আরাব*'।

চ. অঞ্চল-ভিত্তিক ইতিহাস

এসব ঐতিহাসিক গ্রন্থে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ শ্রেণির গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি নিম্নরূপ : ১. *উলাতু মিসরা ওয়া কুযাতুহা*, আবু উমর আল-কিন্দি[৬৬৪] ২. *তারিখে বাগদাদ*, খতিব আল-বাগদাদি ৩. *তারিখে দিমাশক*, আলি ইবনে হাসান ইবনে আসাকির, গ্রন্থটি আশি খণ্ডে রচিত। ৪. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি ইখতিসারি আখবারি মুলুকিল আন্দালুস ওয়াকিল মাগরিব*, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইযারি[৬৬৫] ৫. *আন-*

'*ফুতুহুল বুলদান*' তার বিখ্যাত গ্রন্থ। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৬, পৃ. ৩৬।

৬৬২. আল-ওয়াকিদি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে ওয়াকিদ আস-সাহমি (১৩০-২০৭ হি./৭৪৭-৮২৩ খ্রি.)। ইসলামি প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকদের অন্যতম। হাফিযে হাদিস। '*আল-মাগাযিন নাবাবিয়্যাহ*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮-৩৫০।

৬৬৩. মুসআব যুবাইরি : আবু আবদুল্লাহ মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসআব (১৫৬-২৩৬ হি./৭৭৩-৮৫১ খ্রি.)। বংশবিদ্যায় প্রখ্যাত আলেম। ইতিহাসেও বিশেষজ্ঞ। হাদিসের নির্ভরযোগ্য রাবি। কবি। '*নাসাবু কুরাইশ*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ৮৬-৮৭।

৬৬৪. আবু উমর আল-কিন্দি : আবু উমর মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (২৮৩-৩৫৫ হিজরির পর/৮৯৬-৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পর)। ঐতিহাসিক। মিশর, মিশরের অধিবাসী ও উপকূলীয় শহরের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি জানতেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ '*আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*'। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ১৪৮।

৬৬৫. ইবনে ইযারি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, অথবা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মারাকেশি (মৃ. ৬৯৫ হি./১২৯৫ খ্রি.)। ঐতিহাসিক। আন্দালুসীয় বংশোদ্ভূত। মরক্কোর অধিবাসী। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ৯৫।

নুজুমুয যাহিরাহ ফি মুলুকি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ, জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনে তাগরি-বারদি আল-আতাবেকি[৬৬৬] (মৃত্যু : ৮৭৪ হি.)।

ছ. সাধারণ ইতিহাসের গ্রন্থাবলি

ঐতিহাসিকদের গুরুত্বের জায়গাগুলো বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও জীবনচরিতের পাশাপাশি ব্যাপকতর, সামগ্রিক ও বিপুলায়তনিক ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোকে সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ (তাওয়ারিখে আম্মাহ) বলে। এসব গ্রন্থে ইতিহাসের ঘটনাবলি বর্ষপঞ্জিভিত্তিক বা তারিখভিত্তিক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ঐতিহাসিকরা এসব গ্রন্থে মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে তাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। ইসলামপূর্ব আসমানি গ্রন্থসমূহের আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে, জাহিলি যুগের ইতিহাস রয়েছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, খুলাফায়ে রাশেদিন থেকে সর্বশেষ ইসলামি ইতিহাসও এগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন : ১. মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারি, তার রচিত গ্রন্থ '*তারিখুর রুসুলি ওয়াল-মুলুক*', এটি '*তারিখুত তাবারি*' নামে প্রসিদ্ধ। ২. আল-মাসউদি, তার রচিত গ্রন্থ '*মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*', এটি বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থ। ৩. ইযযুদ্দিন ইবনুল আসির, তার রচিত গ্রন্থ '*আল-কামিল ফিত-তারিখ*', এটি '*তারিখে ইবনে আসির*' নামে বিখ্যাত। গ্রন্থটি ইসলামি ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উৎস। ৪. ইবনে কাসির, তার রচিত গ্রন্থ '*আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*'। ৫. ইবনে খালদুন বা আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন, তার রচিত গ্রন্থ '*আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি ফি আইয়ামিল আরাবি ওয়াল-আজমি ওয়াল-বারবার ওয়ামান*

---

[৬৬৬]. ইবনে তাগরি-বারদি : আবুল মাহাসিন জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনে তাগরি-বারদি (৮১৩-৮৭৪ হি./১৪১০-১৪৭০ খ্রি.)। অনুসন্ধানী ইতিহাসবিদ। কায়রোর অধিবাসী, এখানেই জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ। '*আন-নুজুমুয যাহিরাহ ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ*', তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১০০।

আসারাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবার', এটি তারিখে ইবনে খালদুন নামে বিখ্যাত।[৬৬৭]

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির আরও বহু বিভাগ ও প্রকার রয়েছে। ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থরচনার হাজারো পদ্ধতির মধ্যে ইতিহাসবিদরা ইচ্ছামতো কোনো একটি বেছে নিয়েছেন এবং সেই পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম যাহাবি ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনার চল্লিশটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : সিরাতে নববি বা নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবিদের ইতিহাস, খলিফাদের ইতিহাস, রাজাবাদশাদের ইতিহাস, সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের ইতিহাস, উজির ও মন্ত্রীদের ইতিহাস, আমির ও গভর্নরদের ইতিহাস, ফকিহদের ইতিহাস, কারিদের ইতিহাস, হাফিযদের ইতিহাস, মুহাদ্দিসদের ইতিহাস, ইতিহাসবিদদের ইতিহাস, ব্যাকরণবিদদের ইতিহাস, সাহিত্যিকদের ইতিহাস, ভাষাবিদদের ইতিহাস, কবিদের ইতিহাস, যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখদের ইতিহাস, সুফিদের ইতিহাস, কাজি ও বিচারকদের ইতিহাস, প্রশাসকদের ইতিহাস, শিক্ষকদের ইতিহাস, ওয়ায়েজদের ইতিহাস, অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস, চিকিৎসকদের ইতিহাস, দার্শনিকদের ইতিহাস, কৃপণদের ইতিহাস।[৬৬৮]

ফ্রান্জ রোসানথাল বলেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি ইতিহাসের গ্রন্থাবলির পরিমাণ বিপুল। বাইজান্টাইন বার্ষিক ঘটনাপঞ্জি ইসলামি বার্ষিক ঘটনাপঞ্জির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, তবে ইসলামি ইতিহাস তার নানাবিধ প্রকরণ ও বিপুল পরিমাণের কারণে ওইসব ঘটনাপঞ্জি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাস্তবিক ব্যাপার এই যে, প্রথমদিকের ইতিহাসে মনে হয় এমন কোনো স্থান নেই যেখানে অন্যদের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি পরিমাণে ও আয়তনে মুসলিমদের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির সমান হতে পারে। মুসলিমদের ইতিহাসের গ্রন্থাবলি সংখ্যায় গ্রিক ও লাতিন রচনাবলির সমান, কিন্তু তা অবশ্যই মধ্যযুগের ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের রচনাবলি থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি। কোনো

---

৬৬৭. রহিম কাযিম মুহাম্মাদ আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৯-১৮১; হিকমাত আবদুল কারিম ফারিহাত ও ইবরাহিম ইয়াসিন আল-খতিব, *মাদখাল ইলা তারিখিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১১১।

৬৬৮. ফ্রান্জ রোসানথাল (Franz Rosenthal), *A History of Muslim Historiography*, আরবি অনুবাদ علم التاريخ عند المسلمين, পৃ. ৫১৮-৫২২।

সন্দেহ নেই যে, ইসলামি সাহিত্য-আন্দোলনে এসব গ্রন্থের যে কালজয়ী ভূমিকা তা ধামাচাপা দেওয়ার কোনো উপায় নেই। যে-সকল পশ্চিমা পণ্ডিত আরবদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন তারা এসব ব্যাপার ভালোভাবেই জানেন। তবে তারা বিজ্ঞান, দর্শন ও খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা তাদের সাধারণ মুসলিম সহযাত্রীদের মতোই, ঐতিহাসিক রচনাবলি সম্পর্কে কিছু জানেন বলে স্বীকার করার মতো নমনীয়তা দেখাননি।[৬৬৯]

---

৬৬৯. প্রাগুক্ত, ৩৬৯-৩৭০।

Asif

11. 07. '21
1st Dhul Hajj
9:49 pm.

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সাহিত্য

আরবরা ইসলামপূর্ব কাল থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। কিছু কিছু সাহিত্যের সূচনালগ্ন শনাক্ত করা সম্ভব হলেও—যেমন লাতিন সাহিত্য, ফারসি সাহিত্য—আরবি সাহিত্যের সূচনালগ্ন শনাক্ত করা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে আরবদের যা-কিছু পৌঁছেছে তার মধ্যে সাহিত্য সবচেয়ে প্রাচীন। মুসলিমরা যদিও ইউনান (গ্রিস) থেকে নানা ধরনের জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা গ্রিক সাহিত্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রহণ করেননি। অথচ ইউনানি (গ্রিক) সাহিত্য ছিল সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল। তা ছাড়া আরবি সাহিত্য ইউনানি (গ্রিক) সাহিত্য-চরিত্রের দ্বারাও প্রভাবিত হয়নি। যদিও মুসলিমরা গ্রিক সাহিত্যের কিছু গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, যেমন অ্যারিস্টটলের কবিতা, দুই বিখ্যাত গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াড[৬৭০] ও অডিসি[৬৭১]। বরং উলটো ঘটনা ঘটেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে আরবি সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। যথাস্থানে আমরা তা দেখব। ইউরোপীয় সাহিত্য মূলত গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যেরই একটি জাত। কোনো সন্দেহ

---

৬৭০. ইলিয়াড গ্রিক মহাকাব্য। প্রাচীন গ্রিসের ইলিওন শহরের নামানুসারে এই মহাকাব্যের নামকরণ করা হয়। মহাকবি হোমার এই মহাকাব্যের রচয়িতা। এটি গ্রিক ভাষায় রচিত ও ২৪টি সর্গে বিভক্ত। এর বিষয় ট্রয়ের যুদ্ধ। এতে ১৬,০০০ পঙ্‌ক্তি কবিতা আছে। যুদ্ধ সংঘটিত হয় হেলেন নামের এক নারীকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধে গ্রিকদের সেরা বীর ছিলেন অ্যাকিলিস আর ট্রয়ের পক্ষে ছিলেন হেক্টর। যুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে তখন হেক্টর অ্যাকিলিস কর্তৃক নিহত হন এবং এর মধ্য দিয়ে মূলত ট্রয়বাসীর পরাজয় নিশ্চিত হয়। যুদ্ধ শেষে গ্রিক সেনারা সুরক্ষিত ও সাজানো নগরী ট্রয় জ্বালিয়ে দেয়। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৭১. অডিসিও কবি হোমারের রচিত মহাকাব্য। এই কবিতায় ট্রয় নগরীর ধ্বংসের পরে ইথাকার রাজা অডিসিউসের আপন ভূমিতে ফিরে আসার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে তাকে পোহাতে হয়েছে নানা ঝড়ঝাপটা, সংগ্রাম করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে। নিজের সহযোদ্ধাদের হারিয়ে তাকে একাই ফিরতে হয়েছে ইথাকায়। হোমার সেই কাহিনিই তার অডিসি মহাকাব্যে তুলে ধরেছেন। আধুনিক গ্রহণযোগ্য সংস্করণে ইলিয়াডের ১৫,৬৯৩টি ছত্র রয়েছে। এটি আইওনিক গ্রিক ও অন্যান্য উপভাষার সংমিশ্রণে গঠিত হোমারীয় গ্রিক ভাষায় রচিত। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

নেই যে সাহিত্য জাতির আত্মা থেকে উৎসারিত হয়, তেমনই আরবি সাহিত্যও আরবি ও ইসলামি আত্মার অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হয়েছে।[৬৭২]

বিশেষজ্ঞগণ সাহিত্য বা সাহিত্যবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, আরবি ভাষার মৌখিক ও লেখ্য রূপে যাবতীয় ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা যায় যে বিদ্যার দ্বারা তাই সাহিত্যবিদ্যা। এই বিদ্যার উদ্দেশ্য হলো পদ্যে ও গদ্যে উৎকর্ষসাধন, একইসঙ্গে বুদ্ধিকে শাণিত করা এবং চিত্তকে বিশুদ্ধ করা।[৬৭৩] ইবনে খালদুন বলেন, ভাষাভাষীদের কাছে সাহিত্যবিদ্যার উদ্দেশ্য তার ফল বা পরিণতি। তা হলো আরবদের শৈলী ও রীতি-পদ্ধতি অনুসারে পদ্যে ও গদ্যে উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধন।[৬৭৪]

আরবি 'আদব' (সাহিত্য) শব্দটির মূল অজ্ঞাত, ইসলামি যুগে শব্দটির বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল তাও জানা যায় না। তার কারণ এই যে, আরবরা বিজিত দেশগুলোর সঙ্গে—যাদের পূর্ববর্তী সাহিত্য বিদ্যমান ছিল—নিজেদের মিশ্রণ এবং এসব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটিয়ে তাদের জীবনকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। ইসলামের শুরুর যুগে 'আদব' শব্দটি ধর্মীয় অর্থ বহন করত এবং সুন্নাহ বোঝাত। তারপর এটি যেকোনো কাজের রীতি ও পদ্ধতি বোঝাতে শুরু করল। তারপর সাধারণ সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকল। প্রত্যেক জ্ঞানশাখার একটি অংশকে গ্রহণ করাও বোঝাত 'আদব' শব্দটি। অবশেষে 'আদব' শব্দটি সাধারণ অর্থেই গদ্যে ও পদ্যে উৎকর্ষ সাধনের ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৬৭৫]

পদ্য সাহিত্য : পদ্য মানে কবিতা। মানে ছন্দবদ্ধ ও প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিলযুক্ত কথা। আরবদের কাব্য সাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন এবং এটি তাদের পরিচয়ের অন্যতম বড় দিক। জাহিলি যুগের ছন্দবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতাও আমরা পেয়েছি। আরবরা পদ্য বা কবিতাকে বিভিন্ন রীতি ও প্রকারে শৃঙ্খলিত করেছে। পরবর্তীকালে চারটি নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে : ১. রাজায (এই রীতিতে রচিত কাব্যকে আরজুযাহ

---

[৬৭২]. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ১৯৭।
[৬৭৩]. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৪৪।
[৬৭৪]. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৫৩।
[৬৭৫]. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ১৯৮।

বলা হয়। আরজুযাহ শব্দের বহুবচন আরাজিয) ২. কারিয (এটি রাজাযের বিপরীত) ৩. মাকবুয এবং ৪. মাবসুত। জাহিলি যুগে আরবরা তাদের কবিদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মেলা বা বাজার বসাত। এতে বড় বড় কবি অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদের কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। যে কবি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন তার কবিতা কাবাঘরের খুঁটিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো এবং কবিতাটির নাম দেওয়া হতো মুআল্লাকাহ (ঝুলন্ত কবিতা)।

আরবি কবিতার বিষয়বস্তু অজস্র। এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে গৌরব, প্রশংসা, নিন্দা, শোক, গুণগান, প্রেম ও প্রণয়। এগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক গৌরবগাথা রচনা, অর্থাৎ উপজাতীয় ও গোত্রগত কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা প্রকাশ করে কবিতা রচনা। জাহিলি যুগে বিভিন্ন গোত্রের কবিদের মধ্যে গৌরবগাথা রচনার প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হতো। আরবি সাহিত্যের উৎসগুলোতে এ ধরনের গৌরবগাথার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। এসব গৌরবগাথা মাঝে মাঝেই যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটাত। ইসলাম আসার পর এ ধরনের বিদ্বেষমূলক গৌরবগাথা রচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। জাহিলি যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের কয়েকজন হলেন : মুহালহিল[৬৭৬], ইমরুল কাইস[৬৭৭], নাবিগা যুবয়ানি[৬৭৮], যুহাইর ইবনে আবি সুলমা[৬৭৯], আনতারা ইবনে শাদ্দাদ[৬৮০], তারাফা ইবনুল

---

[৬৭৬]. নাজদের অধিবাসী এবং কবি ইমরুল কাইসের মামা। আসল নাম আদি ইবনে রবিআহ ইবনুল হারিস আত-তাগলিবি। ৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

[৬৭৭]. ইমরুল কাইস হলেন ৬ষ্ঠ শতকের আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। তার পুরো নাম হল ইমরুল কাইস জুনদুহ ইবনে হুজ্‌র আল-কিন্দি। তার পিতার নাম হুজ্‌র ইবনুল হারিছ এবং মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে রাবিয়াহ আল-তাগলিবি। তিনি আরবের নাজদ এলাকায় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজকীয়ভাবে প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি বাল্যকালে কবিতা রচনা শুরু করলে তার পিতা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তারপর তিনি বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে মদ্যপায়ী জীবন শুরু করেন। তার প্রেমিকার নাম ছিল উনাইযা। ইমরুল কাইস আরবি ভাষায় লেখা বিখ্যাত কাব্য সংকলন *মুআল্লাকার* অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ লেখক। এই মহান কবি ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

[৬৭৮]. ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার একটি কবিতাকে ঝুলন্ত গীতিকার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। তার আসল নাম যিয়াদ ইবনে মুআবিয়া ইবনে দাব্বাব। তার কবিতা শিল্পকুশলতা ও ছন্দমাধুর্যে উৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা সাবলীল। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

[৬৭৯]. শ্রেষ্ঠ কবিত্রয়ের অন্যতম। অন্য দুজন হলেন ইমরুল কাইস ও নাবিগা। জীবৎকাল : ৫২০-৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ। কবিদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তলাভের এক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

[৬৮০]. আনতারা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে কাররাদ আল-আবসি (৫২৫-৬০৮ খ্রি.) ছিলেন বিখ্যাত ইসলাম-পূর্ব আরব কবি। ঘোড়সওয়ার হিসেবেও খ্যাতি ছিল তার। কবিতার জন্য যেমন,

আবদ[৬৮১], আলকামা আল-ফাহল[৬৮২], আ'শা[৬৮৩] ও লাবিদ ইবনে রবিআহ। জাহিলি যুগে কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা কবিও ছিলেন, যেমন হিন্দ বিনতে আসাদ আদ-দাবাবিয়্যাহ ও খানসা।[৬৮৪]

ইসলাম আসার পর উপজাতীয়তা ও কৌলীন্য নিয়ে বড়াই ও গৌরবের প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, যা ছিল আরবি কবিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। এ ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ গৌরবগাথা রচনার ফলে আরবদের মধ্যে বিভেদ প্রকট হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। ইসলাম কবিতার নতুন চরিত্র ও প্রকৃতি নির্দেশ করে এবং একটি ভারসাম্য পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতার বিচার করে। মিথ্যাবাদী মুনাফিক কবিদের নিন্দা প্রকাশ করে এবং সত্যবাদীদের প্রশংসা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ○ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ○ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ○ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

তেমনই দুঃসাহসিক জীবনের জন্য বিখ্যাত। তিনি কাবাঘরের দেওয়ালে ঝুলন্ত সপ্তগীতিকার অন্যতম কবি। আনতারার কবিতাগুলো ভিলহেল্ম অলওয়ার্ড্‌ট-এর লেখা '*দা ডিভান্স অব দা সিক্স এনশিয়েন্ট এরাবিক পোয়েটস*' (লন্ডন, ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। এটি পরবর্তীকালে বৈরুত থেকে (১৮৮৮) আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। ৬০৮ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৮১. তারাফা ইবন আবদ জাহিলি প্রথম সারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বিখ্যাত ঝুলন্ত সপ্তগীতিকার কবিদের একজন। বাহরাইনের এক অভিজাত পরিবারে ৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। হিরার অধিপতি আমর ইবনে হিন্দ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গকবিতা রচনার অভিযোগে তারাফাকে হত্যার নির্দেশ দেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তারাফার জীবনাবসান ঘটে। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৮২. আলকামা ইবনে আবাদাহ ইবনে নাশিরাহ ইবনে কাইস। আলকামা আল-ফাহল নামে পরিচিত। ৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জাহিলি যুগের প্রথম স্তরের কবি।

৬৮৩. মাইমুন ইবনে কাইস ইবনে জানদাল। আ'শা শব্দের অর্থ রাতকানা। তিনি রাতে কম দেখতেন বলে এই নামকরণ হয়েছে। জাহিলি যুগের প্রথম স্তরের কবি। জন্ম ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৮৪. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ১৯৮-২০০।

> এবং কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখো না তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা এমন কথা বলে যা তারা করে না। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।[৬৮৫]

উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً»

নিশ্চয় কিছু কিছু কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।[৬৮৬]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

«إِذَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرآنِ فَابْتَغُوْهُ فِي الشِّعْرِ؛ فَإِنَّهُ دِيْوَانُ الْعَرَبِ»

> তোমাদের কাছে কুরআনের কোনো শব্দ অস্পষ্ট মনে হলে কবিতায় তা খুঁজে দেখো। কারণ, তা আরবদের তথ্য-বিবরণী।[৬৮৭]

কবিরা ইসলামি দাওয়াতকে জোরালো রূপ দিয়েছেন। তারা মুক্তি ও বিজয়ের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণের উদ্দেশ্যে স্তবগীতি রচনা করেছেন। জিহাদে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহর পথে শহিদ হতে উৎসাহ জুগিয়েছেন। মুজাহিদ শহিদগণের জন্য শোকগাথা রচনা করেছেন। ইসলামের শুরুর যুগের প্রখ্যাত কবিদের মধ্যে কয়েকজন হলেন: কাব ইবনে যুহাইর রা. (মৃ. ২৬ হি./৬৪৫ খ্রি.), আবু যুআইব আল-হুযালি রা. (মৃ. ২৭ হি./৬৪৮ খ্রি.-এর দিকে) এবং হাসসান ইবনে

---

৬৮৫. সুরা শুআরা : আয়াত ২২৪-২২৭।

৬৮৬. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদব, বাব : মা ইয়াজুযু মিনাশ-শি'রি ওয়ার-রাজযি ওয়া মা ইয়ুকরাহু মিনহু, হাদিস নং ৫৭৯৩; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫০১০; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৮৪৪; *ইবনে মাজাহ*, ৩৭৫৫।

৬৮৭. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাবুত তাফসির, বাব : তাফসিরু সুরাতি নুন, হাদিস নং ৩৮৪৫।

সাবিত রা. (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৪ খ্রি.)। কাব ইবনে যুহাইর কাসিদায়ে বুরদা রচনা করেন।

উমাইয়া যুগে কবিতার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের বিস্তৃতি ঘটে। নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয় কবিতায়, যেগুলো ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। কারণ খলিফারা, প্রশাসক ও গভর্নররা একদিক থেকে কবিতাকে গুরুত্ব দিতেন, সামাজিক জীবনের রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটত অন্যদিক থেকে, আরেকদিকে ছিল নতুন নতুন রাজনৈতিক দল-উপদলের আত্মপ্রকাশ। এই যুগে কাব্য-সাহিত্য উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ করে। কারণ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই কবিতাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিত। তা ছাড়া সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে কবিতার প্রভাব ছিল ব্যাপক। উমাইয়া খলিফা ও আমিররা কবিতাকে তাদের প্রশংসার প্রচারযন্ত্রে পরিণত করেছিলেন। কবিতার দ্বারা তারা তাদের কর্তৃত্বকে অটুট রাখতে এবং প্রতিপক্ষ নেতৃবৃন্দকে ঘায়েল করারও চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে শিয়া, খারেজি ও যুবাইরি আমিররা[৬৮৮] এই দিকে এগিয়ে ছিলেন। উমাইয়া যুগের প্রখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আশা রবিআহ আবদুল্লাহ ইবনে খারিজা (মৃ. ১০০ হি./৭১৮ খ্রি.), আদি ইবনুল রিকা আল-আমিলি (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.), তিনি খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের সভাকবি ছিলেন। উমাইয়া যুগে ইরাকের শক্তিমান কবিদের মধ্যে যারা খলিফা ও আমিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আদরযত্ন পেয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, জারির ইবনে আতিয়্যাহ (৩৩-১১০ হি./৬৫৩-৭২৮ খ্রি.), ফারাযদাক (৩৮-১১৪ হি./৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ও আল-আখতাল আত-তাগলিবি (১৯-৯০ হি./৬৪০-৭০৮ খ্রি.)। উমাইয়াদের বিরোধী দলীয় কবিদের মধ্যে শিয়া কবিরা বিখ্যাত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি (মৃ. ৬৯ হি./৬৮৮ খ্রি.), আল-কুমাইত ইবনে যায়েদ (মৃ. ১২৬ হি./৭৪৩ খ্রি.)। খারিজি কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তিরিম্মাহ ইবনুল হাকিম (মৃ. ১০০ হি.)। আবদুল্লাহ ইবনুল যুবাইর-দলীয় (যুবাইরি) কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে কাইস আর-রুকাইয়াত (মৃ. ৮৫ হি.)। উমাইয়া যুগে গযল-রচয়িতা কবিদেরও আত্মপ্রকাশ ঘটে। গযল দুই ধরনের : ১.

---

৬৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর খিলাফতকালে (৬৪-৭৩ হি.) যারা আমির ও গভর্নর ছিলেন।

উযরি এবং ২. সারিহ। কবিরা এই দুই ধরনের গযলই রচনা করতেন। উযরি গযলের বৈশিষ্ট্য হলো বক্তব্যের সারল্য ও সততা এবং গাম্ভীর্য। এই শ্রেণির গযল-রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন জামিল বাসিনা[৬৮৯] (মৃত্যু : ৮২ হি./৭০১ খ্রি.) এবং লাইলা আল-আখিলিয়্যাহ[৬৯০] (মৃ. ৭৫ হি./৭০৪ খ্রি.)। সারিহ গযল-রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন উমর ইবনে আবি রবিআহ (২৩-৯৩ হি./৬৪৪-৭১১ খ্রি.)।[৬৯১]

আব্বাসি যুগ কবিতায় এক গভীর বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে—পরিমাণেও, প্রকরণেও। কবিতার বিষয়বস্তু, অর্থ, শৈলী, শব্দের প্রয়োগে ব্যাপক পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। নতুন নতুন উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কবিতা রচিত হতে থাকে, যা পূর্বে দেখা যায়নি। অন্যান্য বিষয়ও কবিতায় যুক্ত হয়। রাজনৈতিক কবিতা দুর্বল হয়ে পড়ে, নিস্তেজ হয়ে পড়ে বীরত্বপূর্ণ কবিতাগাথাও, উযরি গযলের গায়েও লাগে রুগ্‌ণতার বাতাস। অন্যদিকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে স্তবগীতি ও শোক-কবিতা, প্রজ্ঞামণ্ডিত কবিতার সয়লাব বয়ে যায়, তপস্যামূলক ও দুনিয়াবিমুখতায় চিহ্নিত কবিতার জোয়ার ওঠে। সুফিতাত্ত্বিক, দার্শনিক, শিক্ষামূলক, কাহিনিমূলক এমন নানা প্রকারের কবিতা পাখা মেলে ছড়িয়ে পড়ে। নবাগত কবিরা অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন অলংকার, যেমন শ্লেষালংকার ও বিরোধালংকার ইত্যাদি অপরিমিত ব্যবহার করেন। তারা শব্দের কারুকাজ ও অলংকরণে অধিক মনোযোগ দেন। ফলে কাব্য-আন্দোলন ও সাহিত্য-আন্দোলন উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে। এই আন্দোলনে সামাজিক উপাদানগুলোর সঙ্গে কার্যকরী অর্থেই অন্যান্য উপাদানের সংশ্লেষ ঘটে। অনুবাদের পথ ধরে আরবে আগমন করে অনারব সাহিত্য-সংস্কৃতি। একদিকে ইসলামি দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক ও ধর্মাদর্শিক বিরোধ, অন্যদিকে তাদের সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরোধ সাহিত্য-আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে খলিফা ও শাসকরা কবিদের বেশ উৎসাহ দিতেন, উজ্জীবিত করতেন। আব্বাসি সাহিত্যের আকাশে

---

৬৮৯. জামিল ইবনে মা'মার, বা জামিল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'মার আল-উযরি আল-কুযায়ি।-অনুবাদক

৬৯০. লাইলা বিনতে আবদুল্লাহ আর-রিহাল ইবনে শাদ্দাদ ইবনে কা'ব আল-আখিলিয়্যাহ।

৬৯১. রহিম কাযিম মুহাম্মাদ আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

বড় বড় কবি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলে ওঠেন। উদাহরণ হিসেবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে : বাশশার ইবনে বার্‌দ (৯৬-১৬৮ হি./৭১৪-৭৮৪ খ্রি.), আবু নাওয়াস (১২৯-১৯৮ হি./৭৪৭-৮১৪ খ্রি.), আবু তাম্মাম হাবিব ইবনে আওস আত-তায়ি (মৃ. ২২৮ হি.), আল-বুহতুরি (২০৪-২৮৪ হি./৮১৯-৮৯৭ খ্রি.), ইবনে রুমি (২২১-২৮৩ হি./৮৩৫-৮৯৬ খ্রি.), আবুত তাইয়িব আল-মুতানাব্বি (৩০৩-৩৫৪ হি./৯১৫-৯৬৫ খ্রি.), আবু ফিরাস হামদানি (৩২০-৩৫৭ হি./৯৩২-৯৬৮ খ্রি.), আবুল আলা মাআররি (৩৬৩-৪৪৯ হি./৯৭৩-১০৫৭ খ্রি.)।[৬৯২]

চিত্র নং-১৯
'দিওয়ানুল মুতানাব্বি'

আন্দালুসীয় কবিরা আন্দালুসে কাব্যের 'মুওয়াশশাহ' প্রকরণের উদ্ভাবন করেন এবং এটিকে বিকশিত করেন। কবিতার এই প্রকরণের বিভিন্ন শৈলীতে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। আরবি কবিতার গঠন-উৎকর্ষে

৬৯২. রহিম কাযিম মুহাম্মাদ আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৪।

'মুওয়াশশাহ' প্রকরণটি ছিল একটি বড় পদক্ষেপ। এটি কবিকে কবিতার অন্ত্যমিল নিয়ে কারিকুরি করার স্বাধীনতা এনে দেয়। ছন্দ নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার স্বাধীনতাও কবিরা পান। কাব্যের 'মুওয়াশশাহ' প্রকরণের প্রচার-প্রসারের ফলে উপজাতীয় জাযাল[৬৯৩] সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। ইবনে খালদুন বলেন, আন্দালুসের ভূখণ্ডে কবিতাচর্চা বেড়ে গেল। কবিতার প্রকরণ, বিষয় ও প্রবণতা মার্জিত রূপ নিলো। শৈলীবদ্ধকরণ (স্টাইলাইজেশন) তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছল। ফলে আন্দালুসের পরবর্তী কবিরা কবিতার একটি প্রকরণ উদ্ভাবন করেন এবং এটির নাম দেন 'মুওয়াশশাহ'।[৬৯৪] আন্দালুসীয় বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে যাইদুন (৩৯৪-৪৬৩ হি.) এবং সেভিলের শাসক মুতামিদ ইবনে আব্বাদ (৪৩১-৪৮৮ হি./১০৪০-১০৯৫ খ্রি.)।

গদ্য সাহিত্য : গদ্য মানে অন্ত্যমিলহীন কথা। সমৃদ্ধি ও উর্বরতার দিক থেকে এটি পদ্যের চেয়ে কম নয়। ইসলামের শুরুর যুগেই গদ্য সাহিত্যের সাবলীল ও সহজ সূচনা দেখা যায়। বাক্যগুলো ছোট ছোট এবং কাঠামোও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন : পত্র, ভাষণ-বক্তৃতা, হাদিস, উপমা, কাহিনি ইত্যাদি। সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গদ্য সাহিত্যেরও অগ্রগতি ঘটে। গদ্যের বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য আসে এবং প্রকরণেও দেখা যায় ভিন্নতা। তাই লিখন-শিল্পের প্রকাশ ঘটে এবং উমাইয়া যুগে তা উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। প্রথম যুগের বড় লিখন-শিল্পীদের অন্যতম হলেন আবদুল হামিদ আল-কাতিব (মৃ. ১৩২ হি.)। তিনি লিখনের শর্তাবলি তার বিখ্যাত পুস্তিকাগুলোতে সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং লিখন-শিল্পীদের সামনে তা তুলে ধরেছেন। এমনকি এ কথা প্রচলিত আছে যে, লিখন-শিল্প শুরু হয়েছে আবদুল হামিদের হাতে এবং এর সমাপ্তি ঘটেছে ইবনুল আমিদের হাতে।

আব্বাসি যুগে গদ্য-শিল্প বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে যারা গদ্য-শিল্পে খ্যাতি লাভ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জাহিয (১৫০-২৫৫

---

৬৯৩. জাযাল (زجل) : কথ্য উপভাষায় রচিত মৌখিক স্ট্রফিক কাব্যের একটি ঐতিহ্যবাহী রূপ। জাযালের সঠিক উৎস সম্পর্কে তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জাযালের প্রথম কবি হিসেবে আন্দালুসের আবু বকর ইবনে কুযমান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। তার জীবৎকাল ১০৭৮-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৯৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৮৩।

হি./৭৬৭-৮৬৮ খ্রি.)। তিনি গদ্যের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং গদ্যের দিগন্ত বিস্তৃত করেন। গদ্যের ইমামে পরিণত হন তিনি। ইবনুল মুকাফফাও (১০৬-১৪২ হি./৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) গদ্য সাহিত্যে জাহিযের মতো অবদান রাখেন। হিজরি চতুর্থ শতকে গদ্য সাহিত্য তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এই সময় অন্ত্যমিলযুক্ত গদ্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন আবু হাইয়ান আত-তাওহিদি (মৃ. ৪০০ হি.-এর দিকে) এবং ইবনুল আমিদ (মৃ. ৩৬৬ হি.) ও অন্যরা। এরপর গদ্যের উপর দিয়ে শাব্দিক কারুকাজ ও অলংকারের প্রবল তরঙ্গ বয়ে যায়। অর্থগত সূক্ষ্মতার চেয়ে শব্দের কারিকুরিতেই অপচয় ঘটে বেশি। পরবর্তী কয়েকজন লেখকের মাকামা-সাহিত্যে[৬৯৫] ও চিঠিপত্রে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিঠিপত্র হলো শৈল্পিক গদ্যের একটি প্রকার। চিঠিপত্র দুই ধরনের : ১. সরকারি বা সাধারণ চিঠি এবং ২. ব্যক্তিগত বা বিশেষ চিঠি। ইসলামের শুরুর যুগে ও উমাইয়া খিলাফতকালে প্রাতিষ্ঠানিক চিঠিপত্র ছিল সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট, এগুলোতে লৌকিকতার কোনো স্পর্শ ছিল না। আব্বাসি যুগ থেকে সরকারি দপ্তরগুলোতে কাতেব বা মুন্সি নিয়োগ দেওয়া হয়, তারা চিঠিপত্রে ভাষার কারুকাজ ও শব্দের কারিকুরি দেখাতে শুরু করেন। চিঠিপত্রের বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল হামিদ আল-কাতিব, ইবনুল আমিদ, সাহিব ইবনে আব্বাদ প্রমুখ। বিশেষ বা ব্যক্তিগত অথবা ভ্রাতৃত্বসুলভ চিঠি হলো, যা এক বন্ধু অপর বন্ধুকে লিখে থাকে। এ ধরনের চিঠির বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে ছিলেন আল-জাহিয ও ইবনে যাইদুন।

আরবি গদ্যের আরেকটি প্রকার হলো খুতবা বা বক্তৃতা। মুসলিমরা কবিতার পর বক্তৃতার ব্যাপারেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ বক্তৃতা মূলত বাগ্মিতাপূর্ণ কথা, যা সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধিতে ভাস্বর। জাহিলি যুগে ও ইসলামের শুরুর যুগে বক্তৃতার বড় ভূমিকা রয়েছে। আরবরা তাদের কিশোর-যুবাদেরকে তাদের শিশুকাল থেকেই বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দিত। সাহিত্যের গ্রন্থগুলোতে বেশ কিছু অলংকারপূর্ণ বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। রাশেদি যুগের বিখ্যাত খতিব বা বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চতুর্থ খলিফা আলি ইবনে আবু তালিব। *'নাহজুল বালাগাহ'* গ্রন্থে তার

---

৬৯৫. আরবি গদ্য-সাহিত্যের একটি আঙ্গিক।

অলংকারসমৃদ্ধ বক্তৃতাসমূহ ও চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ বক্তৃতাই আলি রা.-এর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও বাস্তবে তিনি সেগুলোর বক্তা নন।

উমাইয়া যুগে বক্তৃতার জোয়ার বয়ে যায়। কয়েকজন আমির ও খলিফা, যেমন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, যিয়াদ ইবনে আবিহি ছিলেন বিখ্যাত বক্তা। তারা জনমণ্ডলীর কাছে তাদের উদ্দেশ্য পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের নীতি-আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মেনে নিতে জনমণ্ডলীকে প্রভাবিত করার জন্য বক্তৃতার ওপর নির্ভর করতেন। উমাইয়া যুগ আমাদের জন্য বিপুল সংখ্যক উৎকৃষ্ট বক্তৃতার উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছে, এসব বক্তৃতা বাক্যে যেমন অলংকারপূর্ণ তেমনই চিন্তায়ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

আব্বাসি যুগে বক্তৃতা-শিল্পে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বড় ধরনের অধঃপতন ঘটে। আব্বাসি খলিফাদের মধ্যে বক্তা হিসেবে কেউই খ্যাতি বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেননি।

মুসলিমরা উপমা-সাহিত্যেও গুরুত্ব প্রদান করেন। তারা উপমা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলোকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। উপমা-সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি নিম্নরূপ : ১. *মাজমাউল আমসাল*, আবুল ফজল আল-মাইদানি[৬৯৬] ২. *আল-মুসতাকসা ফি আমসালিল আরাব*, আল-যামাখশারি[৬৯৭], এটি আরবি উপমাসমগ্র, যেখানে উপমাগুলোকে আরবি বর্ণমালাভিত্তিক সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

কাহিনি ও গল্প সাহিত্যে মুসলিমদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার অনেক বিশাল। মানুষ এখনো এগুলো পড়ে এবং এসব কাহিনির দিগন্তবিস্তৃত প্রেক্ষাপট, ভাবনার মাধুর্য ও ঘটনার অভিনবত্বে বিমুগ্ধ হতেন। সম্ভবত

---

৬৯৬. আল-মাইদানি : আবুল ফজল আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে ইবরাহিম (মৃ. ৫১৮ হি./১১২৪ খ্রি.)। সাহিত্যিক, গবেষক। নিসাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি তার *'মাজমাউল আমসাল'* গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের গ্রন্থ ইতিপূর্বে লেখা হয়নি। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ১, পৃ. ১৪৮; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২১৪।

৬৯৭. আয-যামাখশারি : জারুল্লাহ আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে উমর আল-খাওয়ারিজমি (৪৬৭-৫৩৮ হি./১০৭৫-১১৪৪ খ্রি.)। ধর্মীয় জ্ঞান, তাফসির, ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। তার রচিত গ্রন্থ অনেক। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কুরআনুল কারিমের তাফসির *'আল-কাশশাফ'*। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১৬৮-১৭১।

এসব কাহিনির মধ্যে আব্স গোত্রের কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়সওয়ার আনতার বা আনতারার কাহিনি[৬৯৮], ইয়ামেনের বিখ্যাত বীর সাইফ ইবনে যি-ইয়াযানের কাহিনি[৬৯৯], মাগরিবের (মরক্কোর) বীরপুরুষ আবু যায়দ আল-হিলালির কাহিনি এবং মিশরের সুলতান জাহির বাইবার্সের কাহিনি, এ ছাড়াও মোগল-বিরোধী যুদ্ধ ও ক্রুসেড যুদ্ধের বীর সেনানীদের বীরত্বগাথা সবচেয়ে বিখ্যাত।

হিজরি চতুর্থ শতকে আরবি সাহিত্যে ছোট গল্পের ভিত প্রস্তুত করা হয়, এগুলোকে বলা হয় মাকামাত। বিখ্যাত মাকামাত-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বদিউযযামান আল-হামাদানি (৩৫৮-৩৯৮ হি./৯৬৯-১০০৭ খ্রি.)। তিনি চারশ মাকামাত রচনা করেছেন। এই চারশ মাকামাত রচনা করা হয়েছে দুজন বীরপুরুষকে নিয়ে, তাদের একজন হলেন ঈসা ইবনে হিশাম এবং দ্বিতীয়জন হলেন আবুল ফাত্হ আল-ইস্কান্দারি। আরও আছেন ইবনে নাকিয়া আল-বাগদাদি (৪১০-৪৮৫ হি./১০২০-১০৯২ খ্রি.)। তিনি আল-হামদানির পদ্ধতি অনুসরণ করে গদ্য রচনা করেন। আরও আছেন আল-হারিরি[৭০০] (৪৪৬-৫১৬ হি./১০৫৪-১১২২ খ্রি.)। তিনি তার মাকামাতে আবু যায়দ আস-সারুজি এবং হারিস ইবনে হাম্মাম নামের দুজন ব্যক্তির সাহসিকতার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এ দুজন ব্যক্তিই অত্যন্ত মেধাবী।[৭০১]

সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থাবলি সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেছেন, আরবি (ভাষা ও) সাহিত্যের ভিত্তি হলো চারটি দিওয়ান (সংকলনগ্রন্থ) : ১. *আদাবুল কাতিব*, ইবনে কুতাইবা দিনাওরি[৭০২] ২. *আল-কামিল (ফিল-*

---

[৬৯৮]. কবি আনতারা ইবনে শাদ্দাদ ও তার প্রেমাস্পদ আবলার কাহিনি।-অনুবাদক।

[৬৯৯]. ইয়ামেনের প্রাচীন হিময়ারি বাদশাহ সাইফ ইবনে যি-ইয়াযান বা মাদিকারিব ইবনে আবু মুররাহ (৫১৬-৫৭৬ খ্রি.)-এর কাহিনি। তিনি ইয়ামেন থেকে হাবশিদের বিতাড়িত করেছিলেন।-অনুবাদক।

[৭০০]. আবু মুহাম্মাদ আল-কাসিম ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আল-হারিরি আল-বসরি আল-হারামি।-অনুবাদক

[৭০১]. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২০৬-২১০; রহিম কাযিম মুহাম্মাদ হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৫-১৭৭।

[৭০২]. ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওরি : আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওরি (২১৩-২৭৬ হি./৮২৮-৮৮৯ খ্রি.)। মুফাসসির, ফকিহ, সাহিত্যবিশারদ, ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ। হিজরি তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। কুফায় জন্মগ্রহণ

লুগাহ ওয়াল-আদাব), আল-মুবাররাদ[৭০৩] ৩. *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, আল-জাহিয[৭০৪] ৪. *আন-নাওয়াদির*, আবু আলি আল-কালি[৭০৫]।[৭০৬] আরবি সাহিত্যের আরও কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে, এখানে সেগুলোর নাম না নিলেই নয় : *আল-ইক্‌দুল ফারিদ*, ইবনে আব্‌দ রাব্বিহি (মৃ. ৩২৮ হি.); *আল-আগানি*, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানি (মৃ. ৩৫৬ হি.); *বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মুজালিস*, ইবনে আবদুল বার্‌র ইত্যাদি।

এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আমরা আল্লাহ চাহে তো বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের ওপর ইসলামি আরবি সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে জানব।

করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৩, পৃ. ২৯৬।

[৭০৩]. আল-মুবাররাদ : মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আবদুল আকবার ইবনে উমাইর ইবনে হাসসান (২১০-২৮৬ হি./৮২৬-৮৯৯ খ্রি.)। ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের ইমাম। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'আল-কামিল ফিল-লুগাহ ওয়াল-আদাব'*, *'আল-ফাদিল'*, *'আল-মুকতাদাব'*, *'শারহু লামিয়াতিল আরাব'*। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৩, পৃ. ৫৭৬।

[৭০৪]. আল-জাহিয : আবু উসমান আমর ইবনে বাহর আল-কিনানি (১৬৩-২৫৫ হি./৭৮০-৮৬৯ খ্রি.)। আরবি সাহিত্যের বড় ইমাম এবং মুতাযিলা সম্প্রদায়ের জাহিযিয়্যাহ গোত্রের প্রধান। বসরায় জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেন। তার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। যেমন : *'আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন'*, *'কিতাবুল হায়াওয়ান'*, *'আল-বুখালা'*, *'আল-মাহাসিন ওয়াল-আযদাদ'*। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১২১-১২২।

[৭০৫]. আবু আলি আল-কালি : ইসমাইল ইবনুল কাসিম ইবনে ইযুন (২৮৮-৩৫৬ হি./৯০১-৯২৭ খ্রি.)। ভাষা, কবিতা ও সাহিত্যের বিষয়াবলি তিনি সবচেয়ে বেশি মুখস্থ রেখেছিলেন। ফুরাত নদীর পূর্ব তীরে মানযিকার্‌দ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্ডোভায় মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'কিতাবুল আমালি'*, *'আল-বারিউ ফিল-লুগাহ'*, *'আল-আমসাল'* ইত্যাদি। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৯, পৃ. ১৪২।

[৭০৬]. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৫৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন

মানববিদ্যা ও চিন্তাভিত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অগ্রগামী। তারা উচ্চতর জ্ঞানের (জ্ঞানশাখার) উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন, যেখানে মানবিক-সামাজিক দিক গুরুত্ব পেয়েছে। একইভাবে তারা ইসলামি শরিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের উদ্ভাবন করেছেন। আরবি ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : সমাজবিজ্ঞান

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শরিয়া-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান
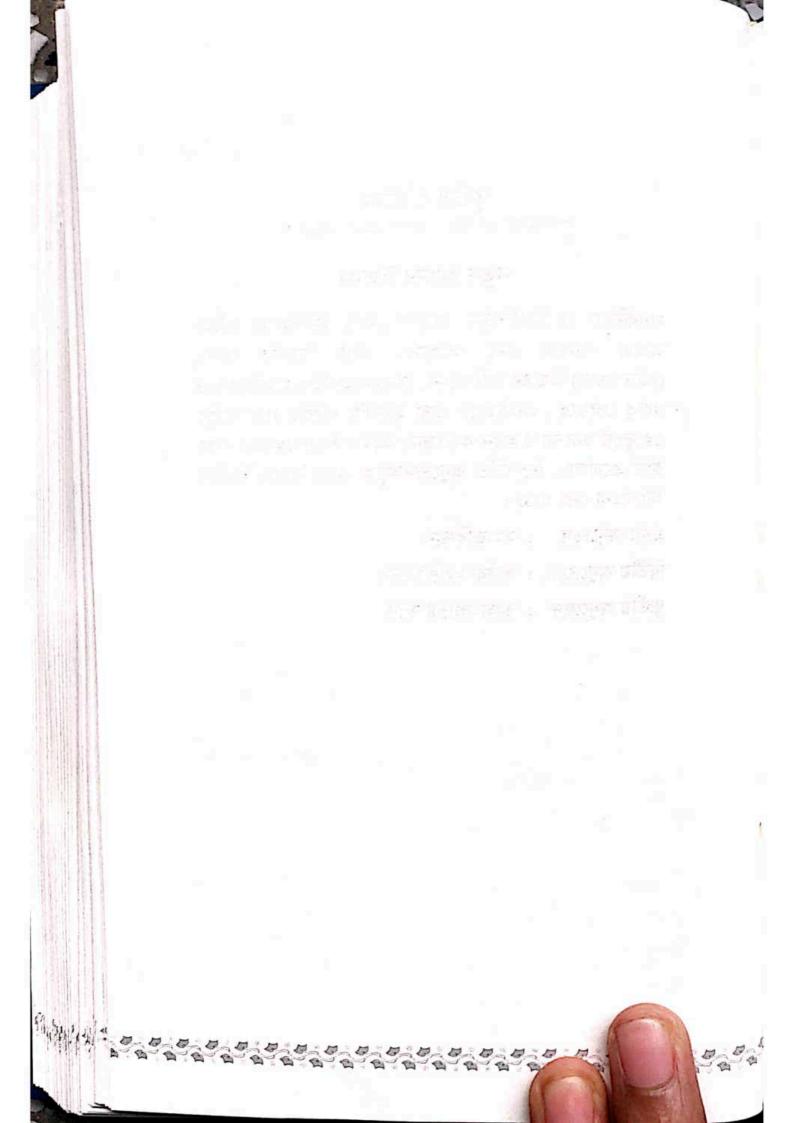
প্রথম অনুচ্ছেদ

সমাজবিজ্ঞান

সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষাকোষ সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, মানবসমাজের সমকালীন বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক পাঠ, কালে কালে ও স্থানে স্থানে তা যেমন রূপ লাভ করে তেমনই, যাতে বিকাশ ও উৎকর্ষের সেসব রীতিনীতি জানা যায়, মানবসমাজ তার অগ্রগামিতা ও রূপান্তরশীলতায় যেগুলোর অধীন।[৭০৭]

সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞানমণ্ডলকে বা জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সামাজিক ঘটনাবলির সঙ্গে সীমাবদ্ধ করেছেন। মানুষের একতাবদ্ধতা ও সমবেত আচরণ, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদান-প্রদানমূলক সম্পর্ক স্থাপন এবং যৌথ সংস্কৃতি উদ্‌যাপনের ফলে এসব অনুষঙ্গ সামনে আসে। মানুষ তাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শৈলীর ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করে। একইভাবে তারা নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধও লালন করে। আর্থিক লেনদেন, কর্তৃত্ব ও শাসন, নীতি-নৈতিকতা ও অন্যান্য বিষয়েও তারা কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে।

সমাজের বাহ্যিক ব্যাপারগুলো দুজন বা একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। এসব সম্পর্ক যখন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে তখন তা মানুষের মধ্যে সামাজিক যূথবদ্ধতা তৈরি করে এবং সামাজিক দল গঠন করে। এই সামাজিক দলসমূহই সমাজবিজ্ঞানের পঠনপাঠনের মৌলিক বিয়ষবস্তু।

আরেকটি বিষয় আছে যা সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্য। সামাজিক কার্যকলাপে সে বিষয়টি বাস্তবিক রূপ লাভ করে। যেমন দ্বন্দ্ব-কলহ, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, মতৈক্য, স্তরভিত্তিক সন্নিবেশ, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি। একইভাবে সমাজবিজ্ঞানে পঠনপাঠনের একটি বড় ময়দান হলো

---

৭০৭. আহমাদ যাকি বাদাবি, *মুজামুল মুসতালাহাতিল ইজতিমাইয়্যা*, পৃ. ৫।

সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও সমাজ-গঠনে পরিবর্তন। সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাও রয়েছে বিভিন্ন রকমের, এগুলো মূলত সামাজিক আচার-আচরণের মার্জিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি। ব্যক্তিগত আচরণও তাই, ব্যক্তিই হলো সংস্কৃতি গঠনের শ্রমিক, সে সংস্কৃতিকে যেমন গঠন করে তেমনই সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে নিজেও গঠিত হয়।[৭০৮]

সমাজচিন্তা স্বয়ং মানবজাতির মতো প্রাচীন হলেও মানবসমাজ কোনো জ্ঞানশাখার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে এই তো সেদিন! প্রথম যিনি এই জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এর স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন তিনি হলেন মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন!

তিনি কয়েকটি বাক্যে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি একটি নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন, যে ব্যাপারে পূর্ববর্তীরা কোনো কথা বলেননি। তিনি বলেন, যেন এটি স্বতন্ত্র জ্ঞান, এর বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র। তা হলো মানবসভ্যতা ও মানবসমাজ। এখানে কিছু সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধানও করা হয়, সেগুলো হলো উদ্ভূত প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থা। একের পর এক এ ধরনের সমস্যা বা প্রশ্ন আসতেই থাকে। এটাই প্রত্যেক জ্ঞানশাখার বৈশিষ্ট্য, চাই তা মানবরচিত হোক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক হোক।[৭০৯]

ইবনে খালদুন আরও বলেছেন, জেনে রাখো, এই বিষয়ে কথা বলা একটি নতুন শিল্প, একটি অভিনব প্রবণতা। গবেষণাই এর পথ দেখিয়ে দেবে, নিমগ্নতাই এ পথে পরিচালিত করবে। যেন এই জ্ঞানের শৈশব মাত্র উদ্‌ঘাটিত হলো। আমার প্রাণের শপথ! মনুষ্যজগতের কেউ এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন বলে আমি জানি না। আমার জানা নেই, এটা (তাদের কথা না বলা) তাদের উদাসীনতার ফল এবং তারা কোনো ধারণাই রাখে না এ ব্যাপারে নাকি সম্ভবত তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণই লিখেছেন, কিন্তু তা আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।[৭১০]

ইবনে খালদুন তার প্রচেষ্টা ব্যয় করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং এ ব্যাপারে যে খামতি রয়েছে তা পূরণ করার জন্য শক্তিমানদের আহ্বান

---

[৭০৮]. মানসুর যাবিদ আল-মাতিরি, *আস-সিয়াগাতুল ইসলামিয়্যা লি-ইলমিল ইজতিমা : আদ-দাওয়ায়ি ওয়াল-ইমকান*, পৃ. ২৮-২৯।

[৭০৯]. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৩৮।

[৭১০]. প্রাগুক্ত।

জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের পরে এমন অনেকেই আসবে আল্লাহ যাদেরকে বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তি দেবে এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করবে, তারা হয়তো এই জ্ঞানের (সমাজবিজ্ঞানের) সমস্যাবলি নিয়ে আমরা যা লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি লিখবে। কোনো শাস্ত্রের উদ্‌গাতার দায়িত্ব শুধু এতটুকু নয় যে, তিনি ওই শাস্ত্রের সমস্যাবলি নিরূপণ করবেন; বরং ওই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা, তার বিভাগগুলো চিহ্নিত করা এবং সে ব্যাপারে যত বক্তব্য রয়েছে সেগুলোর প্রকারভেদ তৈরি করাও তার দায়িত্ব। তার পরবর্তী লোকেরা নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করবে এবং শাস্ত্রটিকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেবে।[৭১১]

ইবনে খালদুন অবশ্য এর চেয়েও বেশি কিছু করেছেন। তার মুকাদ্দিমায় সামসময়িক সমাজবিদ্যার কমপক্ষে সাতটি শাখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইবনে খালদুন এগুলো নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।[৭১২]

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও, এমনকি বিখ্যাত অস্ট্রীয় (পোলিশ) সমাজবিজ্ঞানী লুডভিগ গম্পলোইকস মন্তব্য করেছেন যে, আমরা প্রমাণ উপস্থিত করতে চাই, অগাস্ট কোঁৎ[৭১৩]-এরও পূর্বে, বরং ইতালীয় রাজনৈতিক-দার্শনিক গিয়ামবাতিস্তা ভিকোরও পূর্বে, যাকে ইতালীয়রা প্রথম ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছে, একজন খোদাভীরু মুসলিমের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি পরিমিত বিচারবিবেচনার সঙ্গে

---

[৭১১]. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৫৮৮।

[৭১২]. হাসান আস-সাআতি, *ইলমুল ইজতিমা আল-খালদুনি*, পৃ. ২৮-৩৫।

[৭১৩]. অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte): ফরাসি চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদের প্রবক্তা। ফ্রান্সের মঁপেলিয়ে শহরের এক ক্যাথলিক খ্রিষ্টান পরিবারে ১৭৯৮ সালের ১৯ জানুয়ারি তার জন্ম। ১৮১৪ সালে প্যারিসের একোল পলিতেক্‌নিক-এ তার শিক্ষাজীবন শুরু। কিন্তু প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতিতে নেতৃত্বদানের জন্য অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তিনিও এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮১৬ সালে বহিষ্কৃত হন। ১৮১৭ সালে ফ্রান্সের সমাজবাদী নেতা স্যাঁসিমঁ-র একান্ত সচিব নিযুক্ত হন। কিন্তু তার সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় ১৮২৪ সালে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আধুনিক সমাজভাবনামূলক বক্তৃতাদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদের ওপর প্রথম বক্তৃতা দেন। এই সম্পর্কে তার প্রথম গ্রন্থ '*কুর দা ফিলসফি পজিতিভ*' (*দা কোর্স ইন পজিটিভ ফিলোসফি*, ১৮৩০-৪২) ছয় খণ্ডে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ '*সিস্ত্যাম দা পলিতিক পজিতিভ*' (*সিস্টেম অব পজিটিভ পলিটি*, ১৮৫১-৫৪) চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কোঁৎ-এর মতে ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর নয়, মনুষ্যত্ব। মানবপ্রেমের ওপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। চরম অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি গবেষণার কাজ চালান। ১৮৫৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

সামাজিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে গভীর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে যা লিখেছিলেন সেটাকেই আমরা আজ সমাজবিজ্ঞান নামে আখ্যায়িত করি।[৭১৪] তা সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসি অগাস্ট কোঁৎকে এই বিজ্ঞানের আদি প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার ব্যাপারে অজ্ঞতা জাহির করা হয়েছে, যিনি এই বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন বলে স্পষ্ট ভাষায় ও সচেতনভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৭১৫]

অথচ লেখক-গবেষকেরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, অগাস্ট কোঁৎ অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব ইবনে খালদুনের *মুকাদ্দিমা* থেকে গ্রহণ করেছেন![৭১৬]

ইবনে খালদুন মানবেতিহাস রচনা এবং তৎকর্তৃক সমাজবিজ্ঞানের ভিত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রূপান্তরের বা পরিবর্তনের পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে বিশ্বমানবচিন্তা আন্দোলিত হয়েছে। কারণ, তিনি নতুন নকশা প্রণয়ন করেছেন এবং নতুন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। বরং নতুন নীতি ও আইন নির্দেশ করেছেন, যেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব এবং প্রত্যেক মানবসমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার সিদ্ধান্ত ও নীতিমালার মূলে এই বিষয়গুলো : মানুষকে অবশ্যই সমাজে বসবাস করতে হয়, সমাজের সঙ্গে বসবাস না করে তার উপায় নেই, সমাজে বসবাস করলে অবশ্যই কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করতে হয় এবং কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করলে অবশ্যই তাকে পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডের ওপর বসবাস করতে হয়। আর যেহেতু এ সকল মানুষ অথবা গোত্রবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ কিংবা এসব মানবসংঘের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই তাদের শৃঙ্খলিত রাখার জন্য শাসক প্রয়োজন। শাসকের বিভিন্ন স্তর বা প্রকারভেদ রয়েছে। গোত্রপ্রধান থেকে শুরু করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসক। মানবসংঘের বা মানবসমাজ যতগুলো উপায় ও উপাদান প্রস্তুত করে রেখেছে, সংশ্লিষ্ট শাসক তার প্রত্যেকটি কাজে লাগাতে পেরেছেন

---

৭১৪. ড. মোস্তফা আশ-শাকআহ, *আল-উসুসুল ইসলামিয়্যা ফি ফিকরি ইবনি খালদুন ওয়া নাযরিয়্যাতিহ*, পৃ. ১৯৮ থেকে উদ্ধৃত।

৭১৫. মানসুর যাবিদ আল-মাতিরি, *আস-সিয়াগাতুল ইসলামিয়্যা লি-ইলমিল ইজতিমা : আদ-দাওয়ায়ি ওয়াল-ইমকান*, পৃ. ২৩-২৪।

৭১৬. আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি, *দিরাসাহ মুকাদ্দিমাহ ইবনে খালদুন*; আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান, *মাআলিমুল হাদারাতি ফিল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৪৮ থেকে উদ্ধৃত।

এবং এগুলো কাজে লাগিয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসক হয়ে উঠেছেন। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসক হওয়ার পর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। শাসক যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ওপর ইবনে খালদুন তার চিন্তা ও তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন, সে রাষ্ট্র বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে এবং এসব স্তর বাস্তবিক জীবনে যথার্থরূপে প্রয়োগকৃত বলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে।[৭১৭]

এখানে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে খালদুনের জীবনচরিতের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তার প্রকৃত নাম আবু যায়দ আবদুর রহমান ইবনে খালিদ (খালদুন) আল-হাদরামি। তিনি ৭৩২ হিজরির পহেলা রমযান তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ফেজ (ফাস), গ্রানাডা, তিলমসান (টেলমসেন)[৭১৮], আন্দালুস প্রভৃতি শহর ও দেশ ভ্রমণ করেন। মিশরও ভ্রমণ করেন। মিশরের সুলতান আয-যহির সাইফুদ্দিন বারকুক তাকে সম্মানিত করেন। এখানে ইবনে খালদুন মালিকি আদালতের[৭১৯] বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মিশরে তিনি সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় (৭৮৪-৮০৮ হি.) অতিবাহিত করেন। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং স্থানীয় গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে ইবনে খালদুনের বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।[৭২০]

ইবনে খালদুন একটি সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। খুব ছোটবেলাতেই তিনি কুরআন মাজিদ হিফয করেছেন। তার পিতাই ছিলেন তার প্রথম শিক্ষক। তা ছাড়া তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাদের দেশে যে মহামারি হয়েছিল সেই মহামারিতে তার অধিকাংশ শিক্ষকই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর ইবনে খালদুন সরকারি কাজে যুক্ত হন। বনি মারিনের (Marinid Sultanate) রাজদরবারে লেখকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই চাকরি তাকে আত্মতৃপ্তি দিতে পারেনি। মাগরিবে আকসা বা মরক্কোর সম্রাট আবু ইনান ফেজ শহরে তার বিদ্বান-পরিষদে ইবনে খালদুনকে

---

৭১৭. সুহাইলাহ বিনতে যাইনুল আবিদিন, নাযরিয়্যাতুদ-দাওলাহ ইনদা ইবনে খালদুন, *মাজাল্লাতুল মানার*, সংখ্যা ৭৫, ৭৬, ৭৭, বর্ষ ১৪২৪ হি.।

৭১৮. আলজেরিয়ার একটি শহর।

৭১৯. মালিকি মাযহাব অনুযায়ী পরিচালিত আদালত।

৭২০. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩৩০।

সদস্যপদ দেন। ফলে তিনি ফেজের বড় বড় আলেম ও সাহিত্যিকের কাছে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পান। এ সকল আলেম ও পণ্ডিত তিউনিসিয়া, আন্দালুস ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ফেজে সমবেত হয়েছিলেন।

ইবনে খালদুন তার পরিবারকে ফেজে রেখে গ্রানাডায় সফর করেন। সেখান থেকে আলজেরিয়ার ওরানে ফিরে আসেন। এখানে তিনি ও তার পরিবার ইবনে সালামার দুর্গে চার বছর বসবাস করেন। এখানেই তিনি তার সেই বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন যার নাম '*আল-ইবারু দিওয়ানিল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি ফি আইয়ামিল আরাব ওয়াল-আজম ওয়াল-বারবার ওয়া মান আসারাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবার*', এটি *তারিখে ইবনে খালদুন* নামে বিখ্যাত। এই গ্রন্থের মুকাদ্দিমা বা ভূমিকাই সমাজবিজ্ঞান, মানবসমাজের ঘটনাবলি ও তার রীতিনীতি সম্পর্কে রচিত প্রথম ও সবচেয়ে বিখ্যাত ভূমিকা। এই ভূমিকাতেই তিনি সেসব বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন যেগুলোকে এখন 'সামাজিক ঘটনাবলি' বা 'মানবসভ্যতার ঘটনাবলি' বা 'মানবসমাজের অবস্থাবলি' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৭২১]

চিত্র নং-২০
ইবনে খালদুনের গ্রন্থ

৭২১. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩৩০; ড. মোস্তফা আশ-শাকআহ, *আল-উসুসুল ইসলামিয়্যা ফি ফিকরি ইবনি খালদুন ওয়া নাযরিয়্যাতিহ*, পৃ. ২১ ও পরবর্তী।

ইবনে খালদুন এই মুকাদ্দিমায় তার সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তা অতি মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বরং যে সময়ে এই মুকাদ্দিমা রচিত হয়েছে সেই সময়ের তুলনায় তা ছিল অত্যন্ত অগ্রসর। মুকাদ্দিমায় ছয়টি অধ্যায় রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় মানবসভ্যতা বা মানবসমাজ : এটি সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। এই অধ্যায়ে ইবনে খালদুন মানবসমাজের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং যেসব রীতিনীতি ও আইনকানুনের ওপর সমাজ পরিচালিত হয় সেগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় বেদুইন সমাজ : এই অধ্যায়ে তিনি বেদুইন সমাজ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এই সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি চিহ্নিত করেছেন। বেদুইন সমাজ নাগরিক সমাজের মূল ভিত্তি এবং তার পূর্ববর্তী স্তর।

তৃতীয় অধ্যায় রাষ্ট্র, খিলাফত ও সাম্রাজ্য : এটি রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। ইবনে খালদুন এই অধ্যায়ে শাসনের নীতিমালা, ধর্মীয় সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় নাগরিক সমাজ : এটি নাগরিক সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। এই অধ্যায়ে তিনি নগরসভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় ঘটনা এবং নগর উন্নয়নের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সভ্য ও সংস্কৃতিমান হওয়াই নগরায়ণের উদ্দেশ্য।

পঞ্চম অধ্যায় শিল্পবাণিজ্য, জীবিকা ও উপার্জন : এটি অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। এই অধ্যায়ে তিনি সমাজের অবস্থাবলির ওপর অর্থনৈতিক ঘটনাবলির প্রভাব পর্যালোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় জ্ঞানবিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জন : এটি শিক্ষাসংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি, শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞানার্জনের পন্থা ও পদ্ধতি এবং জ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।

ইবনে খালদুন এগুলো ছাড়াও ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞান ও আইন-সম্বন্ধীয় সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন, পাশাপাশি রাজনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে জোরালো সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।[৭২২]

দৃশ্যমান সত্য এই যে, ইবনে খালদুনের পূর্বে কেউই সামাজিক ঘটনাবলির এমন বিচার-বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষানিরীক্ষা করেননি, যাতে ফলাফল ও সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। ইবনে খালদুনের গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণে ফলাফল ও সিদ্ধান্ত উভয়টি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এই মুসলিম ফকিহ চিন্তাবিদ বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে সামাজিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেছেন, যেভাবে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিতবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত বিষয়াদি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এ কারণে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সামাজিক ঘটনাবলিকে একটি বিদ্যায়তনিক গবেষণামূলক পদ্ধতির আওতাভুক্ত করেছেন এবং এর দ্বারা বহু প্রতিষ্ঠিত সত্যে উপনীত হয়েছেন যেগুলো আইনকানুনের সমগোত্রীয়। ইবনে খালদুন এই পদ্ধতির ভিত্তিতেই যেসব তত্ত্ব স্থির করেছেন তা মানবচিন্তার অগ্রযাত্রায় সমাজবিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণার ময়দানে পথপ্রদর্শক কর্মরূপে বিদ্যমান।[৭২৩]

---

৭২২. নুমান আবদুর রাজ্জাক আস-সামাররায়ি, *নাহনু ওয়াল-হাদারাহ ওয়াশ-শুহুদ*, খ. ১, পৃ. ১২০।

৭২৩. ড. মোস্তফা আশ-শাকআহ, *আল-উসুসুল ইসলামিয়্যা ফি ফিকরি ইবনি খালদুন ওয়া নাযরিয়্যাতিহ*, পৃ. ৭৭-৭৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শরিয়া-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

মুসলিম উম্মাহ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব দিয়েছে অন্যকোনো জাতি সেটা করেনি। এভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অবিমিশ্র ইসলামি জ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যকোনো জাতির কাছে এ ধরনের দৃষ্টান্ত নেই। ইসলামি জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. উসুলুল হাদিস-সম্পর্কিত জ্ঞান

এই জ্ঞান নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সুন্নাহ ইসলামি শরিয়ার উৎসগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় উৎস। প্রথম উৎস আল-কুরআন। সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ তা কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বক্তব্য, কাজ ও অনুমোদনের দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইসলামের প্রয়োগ ও তার আইনকানুন বাস্তবায়নের পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন।

ইলমুল হাদিসের পরিচিতি এরূপ : ইলমুল হাদিস এমন জ্ঞান যার দ্বারা হাদিসের সনদের অবস্থাবলি, অর্থাৎ রাবিদের ধারাক্রম এবং হাদিসের বক্তব্য, অর্থাৎ হাদিসের টেক্সট (মতন) ও বিষয়বস্তু জানা যায়। ইলমুল হাদিসের উদ্দেশ্য হলো সহিহ ও গাইরে সহিহ হাদিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা।

সুতরাং ইলমুল হাদিস দুই প্রকারের :

ক. রেওয়ায়েত বা বর্ণনা-সম্পর্কিত ইলমুল হাদিস : নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় কথা বা কাজ বা অনুমোদন অথবা দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম বর্ণনা ইলমুল হাদিসের এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

খ. দিরায়াত বা উসুল ও নীতি-সম্পর্কিত ইলমুল হাদিস : এখানে সেসব উসুল ও নীতি আলোচনা করা হয় যেগুলো দ্বারা সহিহ হাদিস, হাসান হাদিস ও যয়িফ হাদিস বলতে কী বোঝায় তা জানা যায়, এসব হাদিসের প্রকারসমূহও জানা যায়; রেওয়ায়েতের অর্থ, এর শর্তাবলি ও প্রকারভেদ, রাবির অবস্থা ও শর্তাবলি, জারহ ও তাদিল, রাবিদের ইতিহাস, তাদের জন্ম ও মৃত্যু, নাসিখ, মানসুখ, মুখতালিফুল হাদিস, গরিবুল হাদিস ও অন্যান্য বিষয় জানা যায়। সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যায়, রাবি (বর্ণনাকারী) ও বর্ণনাকৃত বিষয়ের অবস্থা অথবা সনদ ও মতনের অবস্থা জানা, যাতে গ্রহণ করা যায় অথবা বর্জন করা যায়। এই জ্ঞানের নামই 'ইলমু উসুলিল হাদিস' (হাদিসের নীতিমালা-সম্পর্কিত জ্ঞান) অথবা ইলমু মুসতালাহিল হাদিস (হাদিসের পরিভাষা-সম্পর্কিত জ্ঞান)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে মিথ্যাচার ও বানোয়াট বক্তব্য থেকে সুরক্ষার জন্য এই জ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। তা ছাড়া এই জ্ঞানের আলোকে কোনটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় আর কোনটা করা যায় না তা জানা যায়।

উসুলুল হাদিস-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ-রচয়িতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় রামাহুরমুযিকে[৭২৪]। তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে মুহাদ্দিসগণের বহুসংখ্যক নীতি ও পরিভাষা সংকলন করেছেন। তার গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন '*আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবি ওয়াল-ওয়ায়ি*'। তারপর এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন হাকিম নিশাপুরি[৭২৫], তার গ্রন্থের নাম '*মারিফাতু উলুমিল হাদিস*'। তিনি তার গ্রন্থে রামাহুরমুযিকেই অনুসরণ করেন। আবু নুআইম আল-ইস্পাহানি[৭২৬] তার গ্রন্থে একই পথ অনুসরণ

---

[৭২৪]. রামাহুরমুযি : আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ (মৃ. ৩৬০ হি./৯৭১ খ্রি.)। যুগশ্রেষ্ঠ অনারব মুহাদ্দিস। সাহিত্যিক ও কাজি। কবিতা বিষয়েও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। '*আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবি ওয়াল-ওয়ায়ি*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১২, পৃ. ৪২।

[৭২৫]. হাকিম নিশাপুরি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হামদওয়াইহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.)। বিশিষ্ট হাফিযে হাদিস এবং হাদিসবিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২৮০-২৮২।

[৭২৬]. আবু নুআইম আল-ইস্পাহানি : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-ইস্পাহানি (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.)। হাফিযে হাদিস, ইতিহাসবিদ। হাদিস সংরক্ষণ ও

করেন, তার গ্রন্থের নাম *'আল-মুসতাখরাজ আলা মারিফাতি উলুমিল হাদিস'*। তারই পথ ধরে এগিয়ে যান খতিব বাগদাদি, তার রচিত গ্রন্থের নাম *'আল-কিফায়া ফি ইলমির-রিওয়ায়া'*। একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন কাজি ইয়ায, তার গ্রন্থের নাম *'আল-ইলমা ইলা মারিফাতি উসুলির রিওয়াতি ওয়া তাকয়িদিল আসমা'*।

তাদের পর আসেন হাফিজ ইবনে সালাহ। তিনি তার নিজস্ব শৈলী ও পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *'উলুমুল হাদিস'*[৭২৭]। এই গ্রন্থ পূর্ববর্তী সকল রচনার মার্জিত ও সামগ্রিক রূপ, ফলে তা আলেম-উলামার কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং পরবর্তীকালে রচিত যাবতীয় গ্রন্থের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থাবলি হয়তো এটির সংক্ষিপ্তরূপ অথবা বিশ্লেষিতরূপ বা তার ইঙ্গিতবাহী অথবা বিন্যস্তরূপ। হাফিজ ইবনে সালাহর এই গ্রন্থের পরে উসুলুল হাদিস বিষয়ে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ একটি পুস্তিকা রচিত হয়, সেটি রচনা করেন ইবনে হাজার আসকালানি[৭২৮]। তিনি পুস্তিকাটির নাম দেন *'নুখবাতুল ফিকার'*। এরপর তিনি নিজেই এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন, সেটার নাম দেন *'নুযহাতুন নাযার'*। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলোর নাম উল্লেখ করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।[৭২৯]

যে দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় তার প্রেক্ষিতে উলুমুল হাদিস কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। নিচে তার আলোচনা করা হলো।

বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া'*, *'দালাইলুন নুবুওয়া'*, *'তারিখু ইস্পাহান'*, *'মুজামুস সাহাবাহ'*। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

৭২৭. এই গ্রন্থের আরও দুটি নাম আছে : ১. *মুকাদ্দিমা ইবনে আস-সালাহ*, এ নামেই এটি সমধিক পরিচিত। ২. *মারিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল হাদিস*।

৭২৮. ইবনে হাজার আসকালানি : আবুল ফজল আহমাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আল-কিনানি (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.)। জ্ঞান ও ইতিহাসের জগতে একজন ইমাম। তিনি ফিলিস্তিনের (বর্তমান ইসরাইলের) আসকালান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'ফাতহুল বারি'*। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৭, পৃ. ২৭০-২৭৩।

৭২৯. মাহমুদ আত-তাহহান, *তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস*, পৃ. ১২-১৫।

গঠন-কাঠামোর বিবেচনায় হাদিসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

১. সনদ (যে সকল রাবি হাদিসের মূলকথা ও শব্দসমষ্টি বর্ণনা করেছেন)

২. মতন (সনদের শেষে বর্ণিত হাদিসের মূলপাঠ ও শব্দসমষ্টি)

বক্তা অনুযায়ী হাদিসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

১. মারফু, অর্থাৎ যে কথা বা কাজ বা অনুমোদন বা স্বীকৃতি বা গুণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

২. মাওকুফ, অর্থাৎ যে হাদিসের সনদ সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৩. মাকতু, অর্থাৎ যে হাদিসের সনদ তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আমাদের কাছে পৌঁছার বিবেচনায় হাদিসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

১. হাদিসে মুতাওয়াতির : যে হাদিসের সনদের সকল স্তরে রাবি এত বেশি যে, তাদের একত্র হয়ে মিথ্যা রচনা বা মিথ্যা কথা বলা স্বভাবতই ও যৌক্তিকভাবেও অসম্ভব মনে হয়। অর্থাৎ সনদের প্রত্যেক স্তরে একদল রাবি রয়েছেন। এ ধরনের হাদিস শব্দগত দিক থেকে মুতাওয়াতির অথবা অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির।

২. হাদিসে আহাদ বা খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক এমন হাদিস যাতে মুতাওয়াতির হাদিসের শর্তাবলি পাওয়া যায়নি। এ ধরনের হাদিস তিন প্রকারের হয়ে থাকে : ক. মাশহুর, খ. আযিয, গ. গরিব।

ক. হাদিসে মাশহুর : সনদের প্রত্যেক স্তরে যদি রাবিদের সংখ্যা তিনজন বা তার চেয়ে বেশি থাকে তাহলে তা হাদিসে মাশহুর।

খ. হাদিসে আযিয : যে হাদিসের সনদের প্রত্যেক স্তরে রাবির সংখ্যা দুইজনের কম নয় এবং কোনো কোনো স্তরে দুইজনের বেশি হতে পারে, তা হাদিসে আযিয।

গ. হাদিসে গরিব : যে হাদিসের সনদের প্রত্যেক স্তরে অথবা কোনো একটি স্তরে একজনমাত্র রাবি তাকে হাদিসে গরিব বলে। একে হাদিসে ফারদ (একক ব্যক্তির হাদিস)-ও বলা হয়।

গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের বিবেচনায় হাদিসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : ১. সহিহ হাদিস, ২. হাসান হাদিস, ৩. যয়িফ হাদিস। এদের প্রথম দুই ভাগের প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকারের : সহিহ লি-যাতিহি এবং সহিহ লি-

গাইরিহি, হাসান লি-যাতিহি এবং হাসান লি-গাইরিহি। তৃতীয় ভাগের অর্থাৎ যয়িফ (দুর্বল) হাদিসের প্রকার অনেক; আছে মুআল্লাক, মুরসাল, মুদাল্লাস, মুরসালখফি, মুনকাতি, মু'দাল; আছে মাওজু, মাতরুক, মাতরুহ; আছে শায, মুনকার, মুদতারাব, মাকলুব, মুদরাজ, মাযিদ, মুসাহহাফ ও মুহাররাফ।[৭৩০]

এই জ্ঞান নিয়ে গৌরব ও অহংকার করা কেবল মুসলিম উম্মাহকেই শোভা পায়, তারাই এর হকদার। এই জ্ঞানশাখার নীতিমালা নিয়ে তারাই সম্মানিত বোধ করতে পারে। উসুলুল হাদিস বিদ্যার উদ্দেশ্য একটিই, তা হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ, অনুমোদন ও স্বীকৃতিকে স্পষ্টভাবে, নির্ভেজাল ও সন্দেহাতীতভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

১. ইলমুল জার্‌হ ওয়াত-তাদিল (রাবি বা হাদিস-বর্ণনাকারীর দোষ ও গুণ বর্ণনা-সম্পর্কিত বিদ্যা)

এটা স্পষ্টভাবেই জানা বিষয় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস ও সংবাদসমূহ রাবিদের ও বাহকদের সূত্র ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তাই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং সহিহ ও দুর্বল হাদিস জানার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এ সকল রাবি ও বাহকের অবস্থাবলি অবহিত হওয়া, তাদের স্বভাবচরিত্র অনুসন্ধান করা, তাদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা, তাদের শ্রেণি ও স্তর সম্পর্কে জানা এবং কারা আস্থাভাজন ও কারা দুর্বল তা অবগত হওয়া।

এগুলোই হলো 'ইলমুল জার্‌হ ওয়াত-তাদিল' অথবা 'ইলমুর রিজাল'[৭৩১] অথবা 'ইলমু মিযান আও মিয়ারুর রুয়াত'[৭৩২]-এর আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীর বুকে অন্যকোনো জাতির কাছে এ ধরনের বিদ্যার দৃষ্টান্ত নেই। এই বিদ্যা-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, কতিপয় ভিত্তি ও আইন স্থির করা হয়েছে। ফলে এই বিদ্যা সূক্ষ্ম পরিমাপ ও মানদণ্ডের স্থলাভিষিক্ত হয়, যার ভিত্তিতে রাবিদের অবস্থা যাচাই করা হয়। কে বিশ্বস্ত এবং কে

---

৭৩০. বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে দেখুন, *হাদিস বিজ্ঞান*, শামীম আরা চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ২০০১।-অনুবাদক

৭৩১. রিজালশাস্ত্র বা রাবিদের নাম-পরিচয়-সম্পর্কিত বিদ্যা।-অনুবাদক

৭৩২. রাবিদের মানদণ্ড-সম্পর্কিত বিদ্যা।-অনুবাদক

দুর্বল, কার বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য এবং কার বর্ণিত হাদিস প্রত্যাখ্যানযোগ্য তা এই বিদ্যার ভিত্তিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এই বিদ্যাকে ইলমুল হাদিস বা হাদিস শাস্ত্রের অর্ধেক বিবেচনা করা হয়। এটি হাদিসের রাবিদের নিক্তি এবং তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানদণ্ড। এই বিদ্যাই মিথ্যাচার ও বানোয়াট কথাবার্তা থেকে সুন্নাহকে সুরক্ষাকারী!

হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে সুরক্ষাদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কারণ তারা আশঙ্কা করেছেন যে, হাদিসের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা না হলে এতে মিথ্যা ও কল্পনা এবং বানোয়াট ও জাল জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটবে। নানা কারণেই এটা হতে পারে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য, দলীয় উদ্দেশ্য সাধন, চিন্তাগত লক্ষ্য, মাযহাবি মত ও সিদ্ধান্ত, শ্রোতাদের আকর্ষণ করার জন্য মুখরোচক কাহিনি, শাসকদের তোষামোদ ও চাটুকারিতা অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি যেকোনো কারণেই তা হতে পারে। আলেমগণ হাদিস সুরক্ষার জন্য বিশেষ পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন আর তারই পরিচিতি ঘটে 'ইলমুল জারহ ওয়াত-তাদিল' নামে। হাদিসের সনদসমূহ অর্থাৎ যে-সকল রাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের পরম্পরার পাঠও এই জ্ঞানশাখার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সনদই মতন বা হাদিসের ভাষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং হাদিসের স্তর নির্ণয় করে। তাই হাদিস-বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা নিরূপণ ছাড়া হাদিসের সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা যায় না। সনদ যদি না থাকত তাহলে যে-কেউ যা-খুশি বলতে পারত। যদি সনদের দাবি অপরিহার্য না হতো এবং হাদিসের সুরক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা না থাকত তাহলে ইসলামের মিনার ধসে পড়ত। তা ছাড়া ধর্মত্যাগী ও বিদআতপন্থীরা হাদিস বানানোর মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যেত।[৭৩৩]

পারিভাষিক অর্থে জারহ : জারহ বলতে বোঝায় রাবির দোষ বর্ণনা করা বা দোষ প্রকাশ করা, যে দোষের প্রেক্ষিতে তার রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যাত হয়।

পারিভাষিক অর্থে তাদিল : তাদিল বলতে বোঝায় রাবির গুণ বর্ণনা করা, যে গুণের প্রেক্ষিতে তার রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হয়।

---

৭৩৩. ড. মুহাম্মাদ দাইফুল্লাহ আল-বিতাইনাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২২।

ইলমুল জার্হ ওয়াত-তাদিল-এর পারিভাষিক অর্থ, এটা এমন বিদ্যা বা জ্ঞানশাখা যেখানে নির্দিষ্ট শব্দাবলির দ্বারা রাবিদের দোষ ও গুণ বর্ণনা করা হয় এবং ওই নির্দিষ্ট শব্দাবলির স্তরবিন্যাস আলোচনা করা হয়। রাবিদের দোষ বর্ণনার বৈধতার ভিত্তি হলো কল্যাণকামিতা ও শরিয়তের সুরক্ষা এবং যার থেকে দ্বীনি জ্ঞান গ্রহণ করা হচ্ছে তার অবস্থা তুলে ধরা। এটা দ্বীনেরই অংশ, মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো নয়।[৭৩৪]

রাবিদের দোষ-গুণ বর্ণনা মনের বাসনা পূরণের জন্য নয়, প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্যও নয়। এ কারণে আপনি দেখবেন যে তারা কারও প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করেননি, সে যতই নিকটাত্মীয় হোক। তাদের কেউ কেউ নিজের জন্মদাতা পিতাকেও দুর্বল রাবি বলে সাব্যস্ত করেছেন। আলি ইবনুল মাদিনি[৭৩৫]-কে তার পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আমাকে নয়, অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করো। উপস্থিত লোকেরা বলল, আমরা আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি। তখন তিনি মাথা নিচু করে আবার মাথা তুললেন। বললেন, এটাই দ্বীন, আমার বাবা দুর্বল (রাবি)।[৭৩৬] কেউ কেউ নিজের ছেলেকে ও ভাইকেও দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যায়দ ইবনে আবি উনাইসাহ[৭৩৭] বলেছেন, আমার ভাই ইয়াহইয়া থেকে তোমরা হাদিস গ্রহণ করো না।[৭৩৮]

---

৭৩৪. আশ-শারিফ হাতিম ইবনে আরিফ আল-আওনি, *খুলাসাতুত তাসিল লি-ইলমিল জার্হ ওয়াত-তাদিল*, পৃ. ৬।

৭৩৫. আলি ইবনুল মাদিনি, আবুল হাসান আলি ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আস-সাদি (১৬১-২৩৪ হি./৭৭৭-৮৪৯ খ্রি.)। মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ। তার যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদিস ছিলেন। রিজালশাস্ত্রের ইমাম। তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ, আবু হাতিম আর-রাযি, আবু ইয়ালা আল-মুসিলি প্রমুখ। তার রচিত প্রায় দুইশটি গ্রন্থ রয়েছে। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন সামার্রায়। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الأسامي والكنى (আট খণ্ড), الطبقات (দশ খণ্ড), قبائل العرب (দশ খণ্ড), التاريخ (দশ খণ্ড), اختلاف الحديث (পাঁচ খণ্ড), مذاهب المحدثين (দুই খণ্ড)। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ৮১।

৭৩৬. ইবনে হিব্বান, *আল-মাজরুহিন*, খ. ২, পৃ. ১৫।

৭৩৭. যায়দ ইবনে আবি উনাইসাহ : আবু উসামা যায়দ ইবনে আবি উনাইসাহ আল-জাযারি আর-রুহাবি (মৃ. ১২৪ হি.)। ইমাম, হাফিয, নির্ভরযোগ্য রাবি। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৮৮।

৭৩৮. সাখাবি, *ফাতহুল মুগিস*, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫।

তাই এখানে কিছু শর্ত রয়েছে যা জারিহ (দোষ বর্ণনাকারী) ও মুআদ্দিল (গুণ বর্ণনাকারী)-এর মধ্যে পর্যাপ্তরূপে থাকা অপরিহার্য। যেমন :

১. পরিপূর্ণ জ্ঞান, তাকওয়া, পরহেযগারি ও সত্যবাদিতা থাকতে হবে।

২. জার্হ ও তাদিলের কারণগুলো জানা থাকতে হবে।

৩. আরবদের বাগ্ভঙ্গি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে হবে। কোনো শব্দকে প্রচলিত অর্থের বাইরে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যাবে না। এমন শব্দ বর্ণনা করে দোষ প্রকাশ করা যাবে না যা মূলত দোষ-প্রকাশক নয়।[৭৩৯]

হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ কিছু নির্দিষ্ট শব্দকে পরিভাষা হিসেবে স্থির করেছেন, এগুলো দ্বারা তারা রাবিদের দোষ-গুণ প্রকাশ করে থাকেন। যাতে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের বিবেচনায় তাদের বর্ণিত হাদিসসমূহের স্তর নির্ণয় করা যায়। শব্দগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত তাওসিক ও তাদিলের শব্দাবলি (যেসব শব্দের দ্বারা রাবিকে বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করা হয় বা গুণ প্রকাশ করা হয়) :

১. অধিকতর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা-প্রকাশক শব্দাবলি : এমন গুণ প্রকাশে সবচেয়ে স্পষ্ট শব্দ হলো 'আফআল' (আধিক্য-প্রকাশক শব্দরূপ)। যেমন আওসাকুন নাস (সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি) অথবা আসবাতুন নাস (সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি) অথবা ইলাইহিল মুনতাহা ফিত-তাসাব্বুত (নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যক্তি)।

২. বিশ্বস্ততা-প্রকাশক বিশেষণের পুনরুক্তি : এটা শব্দগতও হতে পারে, অর্থগতও হতে পারে। যেমন সিকাহ সিকাহ (বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত), সিকাহ হাফিয (বিশ্বস্ত সংরক্ষক), সাবৃত হুজ্জাহ নির্ভরযোগ্য প্রমাণপেশের উপযুক্ত, সিকাহ মুতকান (বিশ্বস্ত যথাযথ)।

৩. বিশ্বস্ততা-প্রকাশক একটি শব্দের ব্যবহার : যেমন সিকাহ, সাবৃত, ইমাম, হুজ্জাহ একক অর্থে একাধিক শব্দের ব্যবহারও হতে পারে। যেমন আদিল হাফিজ বা আদিল দাবিত।

---

৭৩৯. আশ-শারিফ হাতেম ইবনে আরিফ আল-আওনি, *আত-তাসিল লি-ইলমিল জারহি ওয়াত-তাদিল*: ২৭; আবুল হাসানাত আল-লাকনাবি আল-হিনদি, *আর-রাফউ ওয়াত-তাকমিল*: ৬৭।

৪. কারও কারও মন্তব্য : লা বা'সা বিহি বা লাইসা বিহি বা'স তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, অথবা সাদুক অধিক সত্যবাদী বা খাইয়ার অধিক ভালো। তবে ইবনে মাইন[৭৪০] যখন 'লাইসা বিহি বা'স' বলে মন্তব্য করবেন, তখন তার ভিন্ন অর্থ দাঁড়াবে। কারণ তিনি বলেছেন, যখন আমি তোমাকে বলব, 'লাইসা বিহি বা'স', তার অর্থ হলো সে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

৫. মুহাদ্দিসগণের অন্যান্য মন্তব্য : সত্যবাদিতা তার অবস্থান বা সে সত্যবাদিতার কাছাকাছি (অর্থাৎ সে সত্যবাদিতা থেকে দূরে নয়) বা শাইখ বা হাদিসের কাছাকাছি বা সন্দেহকারী সত্যবাদী বা ভ্রমযুক্ত সত্যবাদী বা ইনশাআল্লাহ সত্যবাদী বা আশা করি তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই বা তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে বলে আমার জানা নেই বা সৎ বা হাদিসের ক্ষেত্রে সৎ।

উপর্যুক্ত পাঁচটি স্তরের হুকুম : যে রাবির ক্ষেত্রে প্রথম তিন স্তরের কোনো শব্দ বলা হবে তার বর্ণিত হাদিস সহিহ এবং একটি অপরটি থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ। চতুর্থ স্তরের শব্দ যাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তাদের বর্ণিত হাদিস হাসান। আর পঞ্চম স্তরে যারা রয়েছেন, অর্থাৎ যাদেরকে এসব শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের হাদিস গ্রহণ করা যাবে না। তবে বিবেচনার জন্য তাদের হাদিস লেখা যেতে পারে। অন্য রাবিগণ তাদের সমর্থক হলে তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত হবে।

দ্বিতীয়ত দোষ-প্রকাশক শব্দাবলি :

১. যেসব শব্দ অধিকতর দোষ প্রকাশ করে সেগুলোর দ্বারা কাউকে চিহ্নিত করা : এমন দোষ প্রকাশে সবচেয়ে স্পষ্ট শব্দ হলো 'আফআল' (আধিক্য-প্রকাশক শব্দরূপ)। যেমন মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য, আকযাবুন নাস (সবচেয়ে মিথ্যাবাদী লোক) বা ইলাইহিল মুনতাহা ফিল-কিয্‌ব (মিথ্যাবাদিতায় চরম পর্যায়ের ব্যক্তি) বা হুয়া রুক্‌নুল কিয্‌ব (সে মিথ্যাবাদিতার খুঁটি)।

---

৭৪০. ইয়াহইয়া ইবনে মাইন : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মাইন ইবনে আওন ইবনে যিয়াদ ইবনে বিসতাম ইবনে আবদুর রহমান আল-মুররি আল-বাগদাদি (১৫৮-২৩৩ হি./৭৭৫-৮৪৮ খ্রি.)। প্রখ্যাত হাফিযে হাদিস এবং মুহাদ্দিসদের ইমাম। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৬, পৃ. ১৩৯; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৭২।

২. দোষ প্রকাশে যা বলা হয় : সে জাল হাদিসের কারিগর বা সে অতিশয় মিথ্যাবাদী বা সে হাদিস বানায় বা সে হাদিস উদ্ভাবন করে বা সে কিছুই না (এটি ইমাম শাফিয়ির মন্তব্য)।

৩. দোষ প্রকাশে যা বলা হয় : সে মিথ্যায় অভিযুক্ত বা সে জাল হাদিস বানানোর জন্য অভিযুক্ত বা সে হাদিস চুরি করে বা সে বর্জিত বা সে ধ্বংসকারী বা তার হাদিস ছুটে যায় বা তার হাদিস পরিত্যাজ্য বা মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন বা তার মধ্যে সমস্যা রয়েছে বা মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে চুপ রয়েছে (শেষের দুটি মন্তব্য ইমাম বুখারির) বা সে বিশ্বস্ত নয়।

৪. দোষ প্রকাশে মন্তব্য : তোমরা তার হাদিস প্রত্যাখ্যান করো বা সে অত্যন্ত দুর্বল বা সে একেবারেই ভিত্তিহীন বা সে বিনষ্টকারী বা তার থেকে রেওয়ায়েত বৈধ নয় বা 'লা শাইয়া' (সে কিছু নয়) বা লাইসা বি-শাইয়িন (সে কিছু নয়; এটি ইমাম শাফিয়ি ছাড়া অন্যদের মন্তব্য) বা মুনকারুল হাদিস (তার হাদিস অস্বীকৃত; ইমাম বুখারির মন্তব্য এটি)।

৫. দোষ প্রকাশে মন্তব্য : সে দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন বা তার হাদিস অস্বীকৃত (ইমাম বুখারি ছাড়া অন্যদের মন্তব্য) বা তার হাদিস বিশৃঙ্খল বা তার হাদিস দলিলযোগ্য নয় বা সে ভিত্তিহীন।

৬. দোষ প্রকাশে মন্তব্য : তার ব্যাপারে কথা রয়েছে বা তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে বা সে তেমনটা নয় বা সে শক্তিশালী নয় বা সে অভিজ্ঞ নয় বা সে দৃঢ়চিত্ত নয় বা তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল বা সে তরলচিত্ত বা তুমি তার হাদিস জানো এবং অস্বীকার করো বা সে সংরক্ষক নয়।

উপর্যুক্ত ছয়টি স্তরের হুকুম : প্রথম চারটি স্তরের ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, তাদের কারও দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না এবং তাদের বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের হাদিস কোনোভাবেই বিবেচ্য নয়। তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রাবিদের হাদিস জাল ও বানোয়াট, তৃতীয় স্তরের রাবিদের হাদিস পরিত্যাজ্য এবং চতুর্থ স্তরের রাবিদের হাদিস অতিশয় দুর্বল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তরের রাবিদের হাদিস বিবেচনার জন্য লেখা

যাবে এবং তাদের বর্ণিত কোনো হাদিসের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে তা সর্বোচ্চ হাসান স্তরে উন্নীত হবে।[৭৪১]

হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ তাদের রাবি-সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল জারূহ ওয়াত-তাদিল-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলিতে সংকলন করেছেন। 'আদ-দুআফা' নাম বহনকারী কিতাবসমূহে তারা দুর্বল রাবিদের স্থান দিয়েছেন। যেমনঃ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি কর্তৃক রচিত কিতাব *'আদ-দুআফাউল কাবির'* ও *'আদ-দুআফাউস সাগির'*, ইমাম নাসায়ি[৭৪২] কর্তৃক রচিত কিতাব *'আদ-দুআফা ওয়াল-মাতরুকিন'*। অন্যদিকে 'আস-সিকাত' নাম বহনকারী কিতাবগুলোতে তারা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবিদের স্থান দিয়েছেন। যেমন ইবনে হিব্বান কর্তৃক রচিত কিতাব *'আস-সিকাত'*। কিছু কিছু কিতাবে দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য উভয় শ্রেণির রাবিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের বিখ্যাত দুটি কিতাব : ইবনে সাদ কর্তৃক রচিত *'আত-তাবাকাতুল কুবরা'* এবং হাফিয ইবনে কাসির কর্তৃক রচিত *'আত-তাকমিল ফিল-জারহি ওয়াত-তাদিল ওয়া মারিফাতিস সিকাত ওয়ায-যুআফায়ি ওয়াল-মাজাহিল'*।[৭৪৩]

পবিত্র নববি সুন্নাহকে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য করা এবং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে সুরক্ষাদানের জন্য মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীগণ যে উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়। তারা সুন্নাহর বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার যত পথ আছে তার সবগুলো অবলম্বন করেছেন। এভাবে তারা এই জ্ঞানের (ইলমুল জারূহি ওয়াত-তাদিল) উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং একে শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। এটি একমাত্র মুসলিম উম্মাহরই বৈশিষ্ট্য। মানবেতিহাসের প্রাচীন পর্বে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, আধুনিক পর্বেও নেই।

---

৭৪১. মাহমুদ আত-তাহহান, *তাইসির মুসতালাহিল-হাদিস*, পৃ. ১১৬-১১৮।

৭৪২. নাসায়ি : আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব ইবনে আলি আল-খুরাসানি (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.)। হাদিসের প্রখ্যাত ইমামদের অন্যতম। সুনান রচয়িতা। খুরাসানের নাসা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন মক্কা মুকাররমায়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৪, পৃ. ১২৫।

৭৪৩. মুহাম্মাদ যাইফুল্লাহ আল বাতায়িনা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২৩; মাহমুদ আত-তাহহান, *তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস*, পৃ. ১১৫-১১৬।

হাদিসের সিহাহ সিত্তাহ (ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ) এবং অন্যান্য সহিহ হাদিসগ্রন্থ, যেগুলোর শীর্ষস্থানে রয়েছে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* ইতিহাসে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ।

هذا الجزء التاسع عشر
من متن صحيح البخاري

أوقف وحبس وأبد وسبل وأكد وخلد إلى الله
سبحانه وتعالى الفقير مصطفى بن محمد الشلشتاوي
هذا الجزء تكملة للنسخة الموقوفة من قبل الخديوي
الأعظم الحاج محمد علي باشا المحبوسة بكتبخانة رواق
الأكراد بالجامع الأزهر في يوم الجمعة المبارك
الموافق خمسة عشر من شهر شعبان من شهور سنة ١٢٩٤
ألف ومائتين أربعة وتسعون من الهجرة النبوية
وقفا صحيحا شرعيا لا يباع ولا يرهن ويكون نفعه عاما
لجميع الطلبة فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
يبدلونه إن الله سميع عليم

চিত্র নং-২১
'সহিহুল বুখারি'

৩. ইলমু উসুলিল ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি-সংক্রান্ত বিদ্যা)

ইসলামি সভ্যতার কীর্তিগুলো গণনা করতে গেলে অবশ্যই 'ইলমু উসুলিল ফিকহ'-এর কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করতে হবে। এই বিদ্যা একমাত্র মুসলিম উম্মাহরই অর্জন, পূর্ববর্তী কোনো জাতির এই অর্জন নেই, পরবর্তী কোনো জাতিরও নেই। মুসলিম উম্মাহ ছাড়া অন্যকোনো জাতির 'ইলমু উসুলিল ফিকহ'-এর মতো স্বতন্ত্র বিদ্যা বা জ্ঞান নেই, এই বিদ্যা পূর্ণাঙ্গতায় ও সূক্ষ্মতায় অনন্য, এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহ তার যাবতীয় নিয়মনীতি ও আইনকানুনকে সংরক্ষণ করতে পেরেছে!

এই জ্ঞান—যেমনটি ইবনে খালদুন ইঙ্গিত করেছেন—মুসলিম জাতির মধ্যে নব-উদ্ভাবিত জ্ঞানগুলোর অন্যতম। এটি উলুমে শারইয়্যাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচিত হয়। এই জ্ঞানের মর্যাদা অনেক এবং এর উপকারিতা অপরিসীম। 'ইলমু উসুলিল ফিকহ' বলতে বোঝায় শরিয়ার দলিল-প্রমাণ যাচাই-বাছাই করা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এগুলো থেকে (শরয়ি) হুকুম-আহকাম গ্রহণ করা হয়।[৭৪৪] অন্য কথায়, নীতিমালা ও দলিলসমূহ জানা, যার দ্বারা শরয়ি বিধিবিধানে উপনীত হওয়া যায়।

এই মহৎ জ্ঞানশাখা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো ইসলামের খেদমত এবং মানুষের ঐচ্ছিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত ইসলামের সুদৃঢ় হুকুম-আহকামের খেদমত।

উসুলে ফিকহ-সংক্রান্ত বিদ্যার উদ্ভব কীভাবে হলো? তার জবাব এই, কতিপয় ফকিহ ফিকহি বিধান স্থিরীকরণ অথবা সেগুলোর উদ্‌ঘাটনে কিছু মূলনীতি ও পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতেন। এই ক্ষেত্রে অন্যরা তাদের সঙ্গে মতবিরোধ করতেন। ফলে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলে যা সহিহ ও বিশুদ্ধ তার শুদ্ধতা নিরূপণের জন্য এবং একই বিষয়ের একাধিক বিধানের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে তা নিশ্চিত করার জন্য শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন পড়ে। যদিও ফকিহগণের দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য ছিল। এ বিষয়ে প্রথমে পুস্তিকা আকারে রচনাবলি প্রকাশিত হতে শুরু করল, এগুলোতে মৌলিক নীতিমালার আলোচনা থাকত। অর্থাৎ, কোন নীতির ওপর নির্ভর করা আবশ্যক, কোন নীতির ওপর নির্ভর করা জায়েয এবং কোন নীতির ওপর নির্ভর করা জায়েয নেই ইত্যাদি।[৭৪৫]

যাকে ইলমু উসুলিল ফিকহ বিষয়ে প্রথম কিতাব রচনাকারী বিবেচনা করা হয় তিনি হলেন ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ-শাফিয়ি বা ইমাম শাফিয়ি। এ বিষয়ে তিনি তার কয়েকটি বিখ্যাত কিতাব রচনা ও সংকলন করেন। যেমন : *আর-রিসালাহ*, *জাম্মাউল ইলম*, *ইবতালুল ইসতিহসান* ও *ইখলিতাফুল হাদিস*। তার হাতেই এই জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে।

---

৭৪৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৪৫২।
৭৪৫. আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫১৮-৫২০।

চিত্র নং-২২
ইমাম শাফিয়ি রচিত 'আর-রিসালাহ'

ইবনে খালদুন বলেন, এই বিষয়ে যিনি প্রথম কলম ধরেছেন, তিনি হলেন ইমাম শাফিয়ি রহ. (মৃ. ২০৪ হি.)। এ বিষয়ে তার বিখ্যাত পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। তাতে আলোচনা করেছেন শরিয়তের আদেশ ও নিষেধ এবং হাদিস ও নাসেখ-মানসুখ নিয়ে এবং কিয়াসের দ্বারা নির্ধারিত ইল্লতের হুকুম নিয়ে। তারপর এ বিষয়ে হানাফি ফকিহগণ কিতাব রচনা করেছেন এবং ওইসব নীতিমালাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারা এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন...। এসব নীতিমালা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হানাফি ফকিহদের অবদান অনেক। কারণ তারা ফিকহি পয়েন্টগুলোর ওপর মনোযোগ দিয়েছেন এবং এসব নিয়মকানুন যথাসম্ভব ফিকহি মাসায়িল থেকে সংগ্রহ করেছেন। হানাফি ইমামগণের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু যায়দ আদ-দাবুসি[৭৪৬], তিনি কিয়াস নিয়ে অন্য সবার চেয়ে

---

[৭৪৬]. আবু যায়দ আদ-দাবুসি : আবদুল্লাহ (বা উবাইদুল্লাহ) ইবনে উমর ইবনে ঈসা আদ-দাবুসি আল-বুখারি আল-হানাফি আল-কাযি (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৯ খ্রি.)। হানাফি ঘরানার বিখ্যাত ফকিহ। ইলমুল খিলাফ (বিরোধ-বিদ্যা)-এর প্রবর্তক। বুখারা ও সমরকন্দের মাঝে অবস্থিত দাবুসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং কিয়াসের জন্য যেসব শর্ত প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করেছেন। কিয়াসের পূর্ণাঙ্গতার ফলে উসুলে ফিকহের কাঠামোও পূর্ণতা লাভ করে। ফিকহি মাসায়িলগুলো মার্জিতরূপ ধারণ করে এবং ফিকহের নীতিমালাও সুবিন্যস্ত হয়। মানুষ উসুলে ফিকহের ব্যাপারে মুতাকাল্লিমদের (ধর্মতাত্ত্বিকদের) অবলম্বিত পন্থায় আকৃষ্ট হয়। মুতাকাল্লিমগণ এ বিষয়ে যত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উৎকৃষ্ট কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনি কর্তৃক রচিত '*আল-বুরহান*'।

২. ইমাম গাযালি (মৃ. ৫০৫ হি.) কর্তৃক রচিত '*আল-মুসতাসফা*'। এই দুইজন হলেন আশআরি ঘরানার ইমাম।

৩. কাজি আবদুল জাব্বার[৭৪৭] কর্তৃক রচিত '*আল-আহদ*'।

৪. আবুল হুসাইন আল-বসরি[৭৪৮] কর্তৃক রচিত '*আল-আহদ*'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ '*আল-মুতামাদ ফি উসুলিল ফিকহ*'। এই দুইজন মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ইমাম।

এই চারটি গ্রন্থ এই শাস্ত্রের ভিত্তি এবং স্তম্ভ। পরবর্তীকালের মুতাকাল্লিমদের দুইজন মনীষী এই গ্রন্থ চারটির সংক্ষিপ্তরূপ রচনা করেন। তারা হলেন ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি (মৃ. ৬০৬ হি.), তার রচিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ '*আল-*

تقويم الأدلة في أصول الفقه، الأسرار، تأسيس النظر، الأنوارا

দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৪৮।

৭৪৭. কাজি আবদুল জাব্বার : কাজিউল কুজাত আবুল হাসান আবদুল জাব্বার ইবনে আহমাদ আল-হামদানি আল-মুতাযিলি আল-আসাদাবাদি (৩৫৯-৪১৫ হি./৯৬৯-১০২৫ খ্রি.)। শাফিয়ি ঘরানার বিখ্যাত ফকিহ। সেই যুগের মুতাযিলা সম্প্রদায়ের শাইখ। রায় শহরে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। জন্ম ইরানের হামদান শহরের কাছে আসাদাবাদ এলাকায়। তিনি সত্তরটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

النهاية في أصول الفقه، الخلاف والوفاق، الدواعي والصواري، شرح الأصول الخمسة.

দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৭, পৃ. ২৪৪-২৪৫।

৭৪৮. আবুল হুসাইন আল-বসরি : মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে তাইয়িব আল-মুতাকাল্লিম আল-মুতাযিলি (মৃ. ৪৩৬ হি./১০৪৪ খ্রি.)। মুতাযিলি সম্প্রদায়ের ইমাম। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন, বসবাস করেন বাগদাদে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : المعتمد في أصول الفقه। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২৭১।

মাহসুল' এবং সাইফুদ্দিন আল-আমিদি[৭৪৯], তার রচিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ *'আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম'*।[৭৫০]

ইসলামি শরিয়ার উৎস থেকে মানুষের ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট হুকুম ও বিধান উদ্‌ঘাটনের জন্য নিবেদিত ফকিহগণের অবলম্বিত পদ্ধতিকে শৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত করার জন্য প্রত্যেক ফিকহি মাযহাবেরই জ্ঞানী-মনীষীগণ মৌলিক নীতিমালা প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে-সকল মুজতাহিদ (মূল বিধানের) শাখাগত বিধান উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টারত তাদের কর্ম যেন অর্থহীন না হয়। কারণ, তাদের কর্ম সুসম্পাদিত নীতিমালার আওতায় না হলে তা অর্থহীনই হবে। মনীষীদের প্রচেষ্টা ও আত্মনিবেদনের ফলে যে জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে তার উদ্দেশ্য হলো দূরদৃষ্টি ও যৌক্তিক বিচার, মৌলিক নীতিমালার সুসম্পাদন, শাখাগত বিধান উদ্‌ঘাটনকারীর জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্যক তার বর্ণনা; সেই জ্ঞান হলো 'ইলমু উসুলিল ফিকহ'। পূর্ববর্তী কোনো জাতির কাছে এই ধরনের জ্ঞানের দৃষ্টান্ত নেই![৭৫১]

মানুষের মতামত, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও তাদের কল্যাণের ওপর নির্ভরশীল নীতিমালার প্রণেতা যারা তারাও মুসলিমদের উসুলে ফিকহ শাস্ত্রের মর্যাদা ও মহিমা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু তাই নয়, শব্দের ব্যাখ্যায় উসুলে ফিকহে কতিপয় নীতি, কিয়াস ও জনকল্যাণ-সংক্রান্ত কতিপয় ফিহকি বিধান এবং পাঁচটি সামগ্রিক জিনিসের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ফিকহি আইনকানুন থেকে তারা উপকারও লাভ করেছেন। এই পাঁচটি সামগ্রিক জিনিসের সুরক্ষাদান ইসলামি শরিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত। তা হলো : দ্বীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ। যা-কিছু এই পাঁচটিকে বা এই পাঁচটির কোনোটিকে সুরক্ষা দান

---

[৭৪৯]. সাইফুদ্দিন আল-আমিদি : আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালেম আত-তাগলিবি (৫৫১-৬৩১ হি./১১৫৬-১২৩৩ খ্রি.)। যুক্তিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দিয়ারে বকরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন দামেশকে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

أبكار الأفكار في أصول الدين، غاية المرام في علم الكلام، الإحكام في أصول الأحكام، تعليقة الصغيرة في الخلاف ।

দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২২, পৃ. ৩৬৪-৩৬৬।

[৭৫০]. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৪৫৫।

[৭৫১]. আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫১৯।

করে তা-ই কল্যাণ। যা-কিছু এগুলোর কোনো একটিকে বিঘ্নিত করে তা-ই অকল্যাণ। এগুলোর সুরক্ষাদান ও হেফাজতের বিভিন্ন স্তর ও ধাপ রয়েছে। একটি হলো জরুরি পর্যায়ের স্তর, এটি সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো প্রয়োজনীয় পর্যায়ের স্তর, এটি মধ্যম স্তর। এই স্তরেরও কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এরপর আছে ভালো (হলে ভালো) পর্যায়ের স্তর, এটি সর্বনিম্ন স্তর। এই স্তরেরও আছে কয়েকটি ধাপ।[৭৫২]

'ইলমু উসুলিল ফিকহ' বা উসুলে ফিকহ শাস্ত্র একটি ইসলামি উদ্ভাবন এবং মানবসভ্যতার এক বিরাট ঘটনা!

---

৭৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
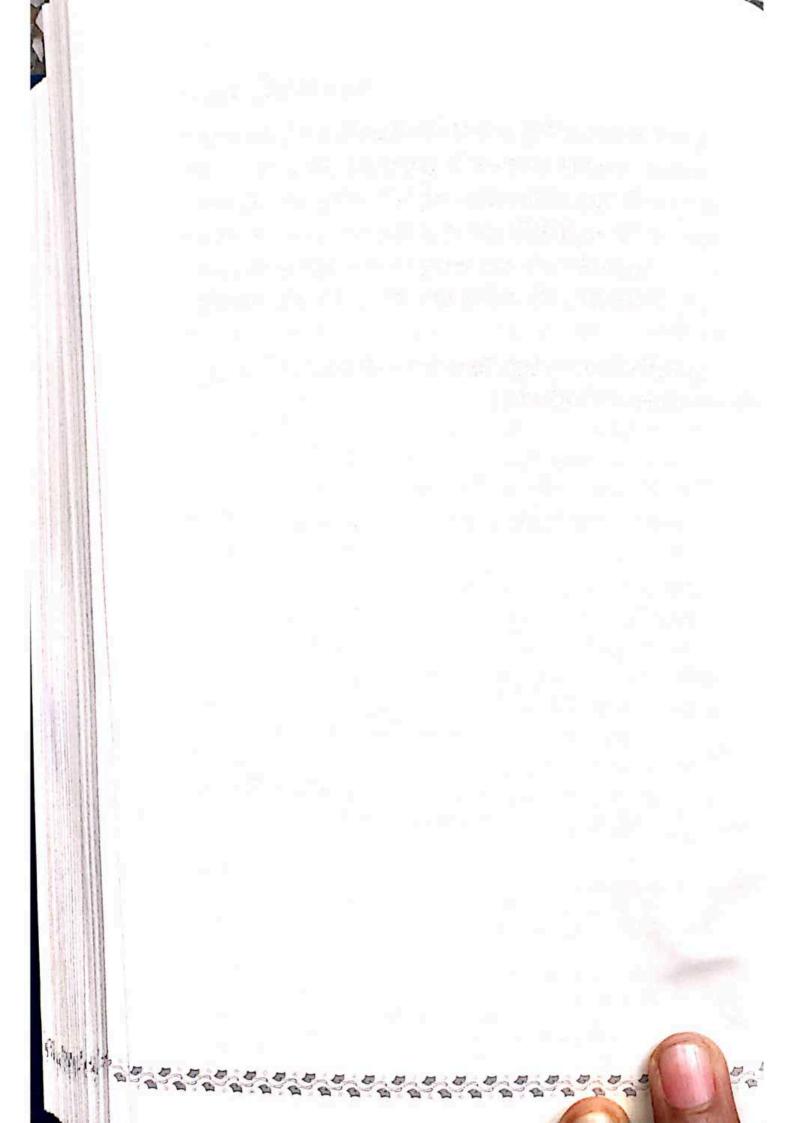
ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

আরবি ভাষা তো কুরআনের ভাষা এবং ইসলামের নিদর্শন, ইসলামি সভ্যতার আধার এবং তার শক্তির প্রতীক। উম্মাহর গঠনপ্রক্রিয়ায় ও মুসলিম ব্যক্তিত্ব নির্মাণে আরবি ভাষার বড় অবদান রয়েছে। অন্যান্য সভ্যতা থেকে ইসলামি সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যে ও শ্রেষ্ঠত্বে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আরবি ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের কয়েকটি শাখা রয়েছে। আরবি ভাষাবিজ্ঞানীরা এগুলো উদ্ভাবন করেছেন। এসব জ্ঞানশাখা একটি বিশ্বসভ্যতার ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার পরিপক্বতা, উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধনে অব্যাহত ভূমিকা পালন করেছে এবং একে বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে, যার চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য মুহূর্তের জন্যও ম্লান হয় না। ফলে আরবি ভাষা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে কালযাপন করছে।

ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞানশাখার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইলমুন নাহব (পদক্রম ও বাক্যবিন্যাসশাস্ত্র)

ইলমুন নাহবকে ইলমুল ইরাবও বলা হয়। এটি আরবি ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর দ্বারা আরবি বাক্যের গঠনপ্রক্রিয়া, পদক্রম, বাক্যগঠনে শব্দের অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি শুদ্ধরূপে জানা যায়। কোনটা শুদ্ধ নয় সেটাও জানা যায়। ইলমুন নাহবের উদ্দেশ্য হলো আরবি ভাষা লেখা ও বলায় ভুলত্রুটি থেকে বাঁচা এবং তা বোঝা ও বোঝানোয় সক্ষমতা অর্জন করা।[৭৫৩]

এই জ্ঞানশাখার উদ্ভাবনের পেছনে কিছু কারণ আছে। আরবরা যখন বিজিত দেশগুলোর যেসব জাতি-গোষ্ঠী ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল, অধিক হারে পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটল এবং

---

৭৫৩. সিদ্দিক হাসান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৫৬০।

তারা এ সকল নওমুসলিম অনারবকে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী আরবি ভাষা শেখানোর চেষ্টা চালাল, তখন বহু আরবের কথাবার্তায় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতির সংক্রমণ ঘটতে শুরু করল। ধীরে ধীরে ত্রুটিবিচ্যুতির সয়লাব ঘটে গেল। ফলে মুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা কুরআনের ভাষার ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করলেন এবং নড়েচড়ে উঠলেন। তারা লেখ্য ও কথ্য ভাষাকে সুরক্ষাদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আরবি বাক্যে শব্দাবলির অবস্থানের ভিন্নতা অনুয়ায়ী শব্দের শেষে 'হরকত' (যের, যবর, পেশ) প্রদানের নীতিও গ্রহণ করলেন। যাতে সবাই বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, ...মুসলিম জ্ঞানী সম্প্রদায় আশঙ্কা বোধ করলেন যে, শুদ্ধরূপে কথা বলার যোগ্যতাই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে যাবে। ফলে কুরআন ও হাদিস কিছু বোঝা যাবে না, এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হবে না। তাই তারা আরবদের কথার স্রোতধারা থেকে ওই যোগ্যতা-সংশ্লিষ্ট প্রচলিত কানুনগুলো উদ্‌ঘাটন করলেন। এগুলো ছিল সামগ্রিক নীতি ও কায়দার অনুরূপ। এসব কায়দাকানুনের ওপর তারা সব রকমের কথাকে পরিমাপ করলেন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাকে অনুরূপ কথার সঙ্গে মেলালেন। যেমনঃ ফায়েল হলো মারফু, মাফউল হলো মানসুব, মুবতাদা হলো মারফু। তারপর তারা দেখলেন যে, এসব শব্দের হরকতের পরিবর্তনের ফলে উদ্দিষ্ট অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তারা এর পারিভাষিক নামকরণ করলেন 'ইরাব'[৭৫৪] এবং পরিবর্তন-কারকের নামকরণ করলেন 'আমিল'[৭৫৫]। এরূপ অন্যান্য বিষয়েরও পারিভাষিক নামকরণ করলেন। এসব পরিভাষা আরবিভাষীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তারা এগুলোকে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তাদের একটি বিশেষ শিল্প হিসেবে স্থির করলেন। তারা পরিভাষাসমগ্রের বিদ্যায়তনিক নাম দিলেন 'ইলমুন নাহব'।[৭৫৬]

---

৭৫৪. শব্দের শেষ বর্ণের স্বরধ্বনি নিরূপণ।

৭৫৫. অন্য শব্দের চালক শব্দ।

৭৫৬. ইবনে খালদুন, *আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৪৬।

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালিকে[৭৫৭] ইলমুন নাহব-সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থরচয়িতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 'ফাতহা' (যবর), 'যম্মা' (পেশ) ও 'কাসরা' (যের)-রূপে পরিচিত হরকতগুলো তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তারপর অন্যান্য মনীষী এ বিষয়ে লেখালেখি করেন। হারুনুর রশিদের খিলাফতকালে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন খলিল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহিদি[৭৫৮]। খলিল ইবনে আহমাদ থেকে ইলমুন নাহব গ্রহণ করেন এবং ইলমুন নাহবের অধ্যায়গুলোকে পূর্ণতা দান করেন—ইবনে খালদুন যেমনটি উল্লেখ করেছেন—সিবাওয়াইহ[৭৫৯]। সিবাওয়াইহ ইলমুন নাহবে নতুন নতুন সংজ্ঞা ও পরিভাষা যুক্ত করেন। অসংখ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেন। ব্যাকরণ-বিষয়ে '*আল-কিতাব*' নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থ ছিল আরবি ব্যাকরণ বিষয়ে পরবর্তীকালে যত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে তার সবগুলোর ইমাম বা পথপ্রদর্শক। আবু তাইয়িব আল-লুগাবি[৭৬০] এই গ্রন্থকে 'কুরআনুন নাহব' বা ব্যাকরণের কুরআন বলে

---

৭৫৭. আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি : জালিম ইবনে আমর ইবনে সুফিয়ান (১৬ হিজরিপূর্ব-৬৯ হিজরি/৬০৫-৬৮৮ খ্রি.)। তাবিয়ি। ইলমুন নাহব বা আরবি ব্যাকরণের প্রবর্তক। আলি ইবনে আবি তালিব রা.-এর সঙ্গে সিফফিনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আলি রা.-এর ইনতেকালের পর মুআবিয়ার রা.-এর দলে যুক্ত হন। দেখুন, ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ৩১২।

৭৫৮. খলিল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহিদি : আবু আবদুর রহমান খলিল ইবনে আহমাদ ইবনে আমর ইবনে তামিম আল-ফারাহিদি আল-আযদি আল-ইয়াহমাদি (১০০-১৭০ হি./৭১৮-৭৮৬ খ্রি.)। আরবি ছন্দশাস্ত্রের প্রবর্তক ও ব্যাকরণবিদ। সংগীত ও সুরবিজ্ঞানও অধ্যয়ন করেছেন। তার দুজন বিখ্যাত উস্তাদ হলেন ঈসা ইবনে উমর এবং আবু আমর ইবনুল আলা। খলিল ব্যাকরণবিদ সিবাওয়াইহের গুরু। বসরায় বড় হন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ছিলেন দুনিয়াবিমুখ, জ্ঞান ও জ্ঞানীদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি :

كتاب معاني الحروف، كتاب الإيقاع، كتاب النقط والشكل، كتاب الشواهد، كتاب العروض،

كتاب النغم، كتاب معجم العين ।

৭৫৯. সিবাওয়াইহ : আবু বিশর আমর ইবনে উসমান ইবনে কানবার আল-হারিসি (১৪৮-১৮০ হি./৭৬৫-৭৯৫ খ্রি.)। আরবি ব্যাকরণবিদদের ইমাম। তার উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন খলিল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহিদি, ইউনুস ইবনে হাবিব, আবুল খিতাব আল-আখফাশ, ঈসা ইবনে উমর। '*আল-কিতাব*' ব্যাকরণ বিষয়ে তার প্রধান কীর্তি।

৭৬০. আবু তাইয়িব আল-লুগাবি : আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আলি আল-হালাবি (মৃ. ৩৫১ হি./৯৬২ খ্রি.)। আলেম, বিখ্যাত ভাষাবিদ। আলেপ্পোয় বসবাস করতেন। আলেপ্পোর সম্রাট সাইফুদ দাওলাহ আল-হামদানির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। ৩৫১ হিজরিতে রোমান সৈন্যরা আলেপ্পোর ওপর আক্রমণ করে এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের হাতে আবু তাইয়িব নিহত হন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

مراتب النحويين، شجر الدر، المثلى، لطيف الإتباع، كتاب الأضداد، طبقات الشعراء।

আখ্যায়িত করেছেন। সিবাওয়াইহ সম্পর্কে তিনি বলেন, সিবাওয়াইহ হলেন খলিল ইবনে আহমাদের পরে ব্যাকরণ সম্বন্ধে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।[৭৬১] তারপর শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট ছোট ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ[৭৬২] ও আবু আলি আল-ফারিসি[৭৬৩]। সিবাওয়াইহ তার গ্রন্থে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তারা একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।[৭৬৪]

এরপর আরবি ভাষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানীরা ব্যাকরণের ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং ছোট-বড় প্রচুর ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। দীর্ঘ কলেবরযুক্ত, সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত ব্যাখ্যাযুক্ত, টীকাভাষ্য ও হাশিয়া, বিবরণ-সংবলিত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের বিশ্লেষণমূলক ইত্যাদি বিপুল গ্রন্থ রচিত হয়। তারপর আসে 'সহজ ব্যাকরণ পাঠ' জাতীয় পুস্তক রচনার পালা। এসব পুস্তক ব্যাকরণের শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করে তোলে।[৭৬৫]

সিবাওয়াইহ কর্তৃক রচিত গ্রন্থের পরে আরবি ব্যাকরণ বিষয়ে প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আবু আমর ইবনুল হাজিবের (মৃ. ৬৪৬ হি.) গ্রন্থাবলি : পদপ্রকরণ ও বাক্যগঠন-বিষয়ে তার গ্রন্থ *'আল-কাফিয়া'* এবং শব্দপ্রকরণ বিষয়ে তার গ্রন্থ *'আশ-শাফিয়া'*। এই দুটি গ্রন্থের ওপর, বিশেষ করে *'আল-কাফিয়া'*র ওপর প্রচুর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ১৭৩।

৭৬১. আবু তাইয়িব আল-লুগাবি, *মারাতিবুন নাহবিয়্যিন*, পৃ. ৬৫।

৭৬২. আয-যাজ্জাজ বা আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ : আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সারি ইবনে সাহল আয-যাজ্জাজ আল-বাগদাদি (২৪১-৩১১ হি./৮৫৫-৯২৩ খ্রি.)। ধর্মীয় পণ্ডিত ও সাহিত্য-বিশারদ। বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদেই মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

معاني القرآن تفسير أسماء الله الحسنى، كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف، القوافي أو الكافي في أسماء القوافي

৭৬৩. আবু আলি আল-ফারিসি : হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল গাফফার আল-ফারিসি (২৮৮-৩৭৭ হি./৯০০-৯৮৭ খ্রি.)। আরবি ভাষাবিজ্ঞানী। পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : التذكرة (আরবি ভাষাবিজ্ঞানের ওপর ২০ খণ্ডে রচিত), تعاليق سيبويه (২ খণ্ড), جواهر النحو। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ৮০-৮২।

৭৬৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৪৬।

৭৬৫. আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৮৮।

২. ইবনে মালিকের[৭৬৬] গ্রন্থাবলি : তার বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল-আলফিয়্যাহ'* (ألفية ابن مالك)। এটি ছন্দে ছন্দে রচিত আরবি ব্যাকরণগ্রন্থ এবং বহু ভাষাবিদ এটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে হিশাম আল-আনসারি[৭৬৭], তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম *'আওযাহুল মাসালিক ইলা আলফিয়্যাতি ইবনে মালিক'*। তার আরও কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে, সেগুলো হলো : *'মুগনিল লাবিব আন কুতুবিল আ'আরিব'*, *'শারহু শুযুরিয যাহাব ফি মারিফাতি কালামিল আরাব'*, *'কাতরুন নাদা ওয়া বাললুস সাদা'*। ইবনে আকিলও[৭৬৮] আল-আলফিয়্যাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, সেটির নাম *'শারহু ইবনে আকিল আলাল আলফিয়্যাহ'*।

ইলমুন নাহব বা আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এভাবেই এবং তা ছিল সংস্কৃতিমূলক উজ্জ্বল মর্যাদাপূর্ণ কীর্তি, কেবল মুসলিমরাই এই কীর্তি সাধন করেছে।

২. ইলমুল আরুয (আরবি ছন্দশাস্ত্র)

ইলমুল আরুয আরবি কবিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইলমুল আরুয বলতে এমন নিয়মকানুনকে বোঝায় যার দ্বারা বিশুদ্ধ কবিতা ও অশুদ্ধ কবিতা চিহ্নিত করা যায়। অথবা এটি এমন শাস্ত্র যেখানে গ্রহণযোগ্য ছন্দ ও মাত্রারীতি

---

৭৬৬. ইবনে মালিক : জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আন্দালুসি (৬০০-৬৭২ হি./১২০৩-১২৭৪ খ্রি.)। আরবি ভাষাবিজ্ঞানী। আন্দালুসের জায়ানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন দামেশকে। *'আল-আলফিয়্যাহ'* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৯।

৭৬৭. ইবনে হিশাম আল-আনসারি : জামালুদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ (৭০৮-৭৬১ হি./১৩০৯-১৩৬০ খ্রি.)। আরবি ভাষার ইমাম, বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ। মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। مغني اللبيب عن كتب الأعاريب তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, খ. ৩, পৃ. ৯২-৯৪।

৭৬৮. ইবনে আকিল : বাহাউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আল-কুরাশি (৬৯৪-৭৬৯ হি./১২৯৪-১৩৬৭ খ্রি.)। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ। আবু হাইয়ান তার সম্পর্কে বলেছেন, আকাশের নিচে তার মতো বড় ব্যাকরণবিদ আর নেই। জন্ম ও মৃত্যু কায়রোতে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الجامع النفيس، مختصر الشرح الكبير، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৬, পৃ. ২১৪।

সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অথবা এটি কবিতার মানদণ্ড, যার দ্বারা শুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ কবিতার মধ্যে পার্থক্য করা যায়।[৭৬৯]

এটি একটি শিল্প, যার দ্বারা আরবি কবিতার শুদ্ধ ছন্দ ও মাত্রা এবং অশুদ্ধ ছন্দ ও মাত্রা জানা যায় এবং যা ছন্দের যিহাফ[৭৭০] ও ইলাল[৭৭১] সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়—বলেছেন আহমাদ আল-হাশিমি।[৭৭২]

আরবি ছন্দশাস্ত্রের যিনি উদ্ভাবক এবং যিনি একে অস্তিত্বদান করেছেন তিনি হলেন সিবাওয়াইহের গুরু খলিল ইবনে আহমাদ ফারাহিদি। তিনি ছন্দশাস্ত্র নিয়ে *'আল-আইন'* গ্রন্থটি রচনা করেছেন, এটি প্রথম কোষগ্রন্থ যেখানে তিনি একটি জাতির ভাষাকে আঁটিয়ে ফেলেছেন। খলিল ইবনে আহমাদ আরবদের কবিতাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেগুলোকে পনেরোটি ছন্দে শৃঙ্খলিত করেছেন। প্রত্যেক ছন্দের নাম দিয়েছেন 'বাহ্‌র'। আরও একটি কথা বলা হয়ে থাকে, ছন্দশাস্ত্রের প্রবর্তন করেছেন আহমাদ এবং তা পরিমার্জন করেছেন আবু নাস্‌র জাওহারি[৭৭৩]। আখফাশ[৭৭৪] আরও একটি ছন্দ বাড়িয়েছেন এবং ছন্দটির নাম দিয়েছেন 'আল-মুতাদারাক'।[৭৭৫] মোট ছন্দ হয়েছে ষোলোটি।

---

৭৬৯. উমর আল-আসআদ, *মাআলিমুল আরুয ওয়াল-কাফিয়া*, পৃ. ১১; মুহাম্মাদ আলি আশ-শাওয়াবাকাহ ও আনওয়ার আবু সুওয়াইলিম, *মুজাম মুসতালাহাতিল আরুয ওয়াল-কাফিয়া*, পৃ. ১৭৭; খতিব আত-তাবরিযি, *আল-ওয়াফি ফিল-আরুয ওয়াল-কাওয়াফি*, পৃ. ৩২-৩৩।

৭৭০. ছন্দের পরিমাপে পরিবর্তন-বিশেষ। পুরো কবিতায় একই পরিবর্তন জরুরি।

৭৭১. ছন্দ ও মাত্রায় পরিবর্তন, পুরো কবিতায় পরিবর্তনের সামঞ্জস্য বিধান জরুরি।

৭৭২. সাইয়িদ আহমাদ আল-হাশিমি, *মিযানুয যাহাব ফি সানাআতি শি'রিল আরাব*, পৃ. ৫।

৭৭৩. আবু নাস্‌র ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ আল-জাওহারি আল-ফারাবি (মৃ. ৩৯৮ হি./১০০৭ খ্রি.)। ভাষাবিদ ও অভিধান-প্রণেতা। তৎকালীন তুর্কিস্তানের ফারাবে জন্মগ্রহণ করেন। ফারাব বর্তমানে কাজাখস্তানের অন্তর্গত। বিখ্যাত দার্শনিক আল-ফারাবি তার মামা। তার বিখ্যাত গ্রন্থ تاج اللغة وصحاح العربية, যা *'আস-সিহাহ'* নামে পরিচিত। ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র নিয়েও তার গ্রন্থ রয়েছে। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৯, পৃ. ৬৯।

৭৭৪. আখফাশ আল-আকবার : আবুল খাত্তাব আবদুল হামিদ ইবনে আবদুল মাজিদ। আল-আখফাশ আল-আকবার নামে সমধিক পরিচিত। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ। তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন সিবাওয়াইহ, ইউনুস ইবনে হাবিব, ঈসা ইবনে উমর, আবু উবাইদা মা'মার, আবু যায়দ আল-আনসারি, আল-আসমায়ি। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ২৮৮।

৭৭৫. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৩৮১-৩৮২।

হামযাহ আল-ইস্পাহানি[৭৭৬] বলেন, ইসলামের সাম্রাজ্যে যত নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে, আরব জ্ঞানী সম্প্রদায় তার প্রত্যেকটির জন্য খলিল ইবনে আহমাদ থেকে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে আরবি ছন্দশাস্ত্রের চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কিছু নেই। খলিল ইবনে আহমাদ ছন্দশাস্ত্র কোনো প্রজ্ঞাবান থেকে গ্রহণ করেননি এবং তার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো দৃষ্টান্তও ছিল না যাকে তিনি অনুসরণ করেছেন...। যদি তার যুগ হতো অতিপ্রাচীন এবং নিদর্শনাবলি হতো আরও দূরবর্তী, তাহলে এই জাতির অনেকেই তার সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত। দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তার সৃষ্টিকর্মের মতো কারও সৃষ্টিকর্ম নেই, বিশেষ করে একটু আগে যে শাস্ত্রের (ছন্দশাস্ত্র) কথা বলা হয়েছে সে শাস্ত্রের উদ্ভাবন। একটিমাত্র গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়েই তিনি ছন্দশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেটি হলো *'আল-আইন'*। এই গ্রন্থে তিনি একটি জাতির ভাষাকে পুরোপুরি পুরে দিয়েছেন। সিবাওয়াইহ ইলমুন নাহব বা ব্যাকরণশাস্ত্রে খলিল থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছেন তাও উল্লেখযোগ্য, তার থেকে জ্ঞান আহরণ করে সিবাওয়াইহ যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তা ইসলামি সাম্রাজ্যের সৌন্দর্যরূপে বিদ্যমান।[৭৭৭]

আল-ইয়াফিয়ি[৭৭৮] বলেছেন, খলিল ইবনে আহমাদ ইলমুল আরুয বা আরবি ছন্দশাস্ত্র—যা কবিতার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মানদণ্ড—উদ্ভাবনের

---

৭৭৬. হামযাহ আল-ইস্পাহানি : আবু আবদুল্লাহ হামযাহ ইবনুল হাসান আল-ইস্পাহানি (২৮০-৩৬০ হি./৮৯৩-৯৭০ খ্রি.)। ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক। ইরানের ইস্ফাহানে জন্মগ্রহণ করেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تاريخ سني ملوك الأرض، التنبيه على حدوث التصحيف والأنبياء। *'তারিখু আসবাহান'* তার আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। দেখুন, মুস্তাফা জালবি (হাজি খলিফা), *কাশফুয যুনুন*, খ. ১, পৃ. ২৮২, ২৮৫, ৩০১; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ২৭৭।

৭৭৭. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

৭৭৮. আল-ইয়াফিয়ি : আফিফুদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইবনে আলি (৬৯৮-৭৬৮ হি./১২৯৮-১৩৬৭ খ্রি.)। ইতিহাসবিদ, গবেষক, সুফি সাধক, ইয়ামেনের শাফিয়িয়্যাহ বংশোদ্ভূত। আদনে জন্ম এবং মক্কায় মৃত্যু। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان وتاريخ موت بعض المشهورين من الأعيان نشر المحاسن، الغالية في فضائل المشايخ أولي المقامات العالية مختصر الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم والآيات، والذكر الحكيم روض البصائر ورياض الأبصار في معالم الأقطار والأنهار الكبار।

দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৮-২০।

ক্ষেত্রে মহামতি অ্যারিস্টটলের মতোই, যিনি যুক্তিবিদ্যা–যা অর্থের ও দলিলের শুদ্ধতার মানদণ্ড–উদ্ভাবন করেছেন।[৭৭৯]

একটি সূত্র থেকে জানা গেছে যে, খলিল ইবনে আহমাদ পবিত্র মক্কায় হজব্রত পালনাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে এমন জ্ঞান দাও যা আমার পূর্বে কাউকে দাওনি এবং সে জ্ঞান যেন কেবল আমার থেকেই গ্রহণ করা হয়।

তিনি হজ থেকে ফিরে এলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য ছন্দশাস্ত্রের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। সুর ও সংগীত সম্পর্কে খলিলের পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞানই তাকে ছন্দশাস্ত্র সৃষ্টির পথ দেখিয়ে দেয়। যেহেতু উৎসের ক্ষেত্রে ছন্দশাস্ত্র ও সংগীতশাস্ত্র কাছাকাছি।[৭৮০]

ইলমুল আরুযের বিষয় হলো আরবি কবিতা, যেহেতু আরবি কবিতা বিশেষ কিছু ছন্দে আবদ্ধ। কোনটা গদ্য আর কোনটা কবিতা তা পার্থক্য করার ক্ষেত্রে ইলমুল আরুযের ফায়দাটা বোঝা যায়। এই শাস্ত্রের ফলেই কবিতা-লেখক একটি ছন্দের সঙ্গে আরেকটির তালগোল পাকিয়ে ফেলা থেকে বেঁচে যান। কারণ, আরবি ছন্দগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য অনেক এবং পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। ছন্দের টুটে যাওয়া ও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকেও নিরাপদ থাকেন। এই শাস্ত্র জানা থাকলে কবিতা ছন্দ অনুযায়ী শুদ্ধভাবে পাঠ করা যায় এবং কোন কবিতার ছন্দ ঠিকঠাক আছে এবং কোনটার ছন্দে পতন ঘটেছে তাও বোঝা যায়।[৭৮১]

আরবদের জন্য আরবি ভাষা আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান। খলিল তাদের ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে আরবি কবিতাকে ষোলোটি ছন্দে শৃঙ্খলিত করেছেন। ছন্দগুলো হলো : আত-তাবিল, আল-মাদিদ, আল-বাসিত, আল-ওয়াফির, আল-কামিল, আল-হাযাজ, আর-রাজায, আর-রামাল, আস-সারি, আল-মুনসারিহ, আল-খফিফ, আল-মুযারি, আল-

---

৭৭৯. আল-ইয়াফিয়ি, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান ফি মারিফাতি হাওয়াদিসিয যামান*, খ. ১, পৃ. ১৬৫।

৭৮০. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২৪৪; সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ৩, পৃ. ৪।

৭৮১. উমর আল-আসআদ, *মাআলিমুল আরুদ ওয়াল-কাফিয়া*, পৃ. ১৬; মুহাম্মাদ আবদুল মুনয়িম খাফাজি ও আবদুল আযিয শারফ, *আল-উসুলুল ফান্নিয়্যাহ লি-আওযানিশ শি'রিল আরাবি*, পৃ. ২০-২১।

মুকতাযিব, আল-মুজতাস্‌স, আল-মুতাকারিব, আল-মুতাদারাক। এই শেষের ছন্দটি সংযোজন করেছেন আখফাশ এবং খলিলের যে ভ্রম ঘটেছিল তা দূর করেছেন।[৭৮২]

আবু তাহির আল-বাইযাবি ষোলোটি ছন্দকে দুটি পঙ্‌ক্তিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন :

طَوِيلٌ يَمُدُّ الْبَسْطَ بِالْوَفْرِ كَامِلٌ   وَيَهْزِجُ فِي رَجْزٍ وَيُرْمِلُ مُسْرِعَا

فَسَرِّحْ خَفِيفًا ضَارِعًا يَقْتَضِبْ لَنَا   مَنِ اجْتُثَّ مِنْ قُرْبٍ لِنُدْرِكَ مَطْمَعَا

খলিল ইবনে আহমাদ ছাড়াও অন্যান্য ভাষাবিদ আরবি ছন্দশাস্ত্র নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর বিখ্যাত কয়েকটি হলো : ১. قصيدة ابن الحاجب, ইবনুল হাজিব[৭৮৩]; ২. الوافي في علم العروض وعلم القوافي وعيوب الشعر, খতিব তাবরিযি[৭৮৪]; ৩. القصيدة الخزرجية في العروض, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-খাযরাজি; ৪. العروض والقوافي, وتسمى الرامزة شفاء الغليل في علم الخليل, আমিনুদ্দিন আল-মাহাল্লি[৭৮৫]; আর ৫. ইউসুফ ইবনে আবু বকর

---

৭৮২. সাইয়িদ আহমাদ আল-হাশিমি, *মিযানুয যাহাব ফি সানাআতি শি'রিল আরাব*, পৃ. ২৯।

৭৮৩. ইবনুল হাজিব : আবু আমর উসমান ইবনে উমর ইবনে আবু বকর (৫৭০-৬৪৬ হি./১১৭৪-১২৪৯ খ্রি.)। মালিকি ঘরানার ফকিহ ও ভাষাবিজ্ঞানী। মিশরের মালভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

الجامع بين الأمهات في الفقه، كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب ।

দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৫, পৃ. ২৩৪।

৭৮৪. খতিব তাবরিযি : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাইবানি আল-লুগাবি আল-খতিব (৪২১-৫০২ হি./১০৩০-১১০৯ খ্রি.)। তাবরিযে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে বড় হন। সিরিয়া ও মিশর ভ্রমণ করেন। বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت، الملخص في إعراب القرآن، شرح اختيارات المفضل الضبي، الوافي في العروض والقوافي، شرح شعر المتنبي ।

দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৫৭; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৬, পৃ. ১৯১।

৭৮৫. আমিনুদ্দিন আল-মাহাল্লি : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে মুসা ইবনে আবদুর রহমান আল-আনসারি (৬০০-৬৭৩ হি.)। ভালো ভালো কবিতা লিখেছেন। কয়েকটি ভালো বইও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই : أرجوزة في العروض। দেখুন, সুয়ুতি, *বুগয়াতুল উআত ফি তাবাকাতিল লুগাবিয়্যিন ওয়ান-নুহাত*, খ. ১, পৃ. ১৯২।

আস-সাক্কাকি *'মিফতাহুল উলুম'* গ্রন্থে আরবি ছন্দ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা এই শাস্ত্র বোঝার জন্য যথেষ্ট।[৭৮৬]

৩. অভিধান-সংকলন বিদ্যা[৭৮৭]

ড. আদনান আল-খতিব বলেছেন, প্রত্যেক ভাষাই তার অভিধান নিয়ে গৌরব প্রকাশ করে, তাই সমস্ত গৌরব সকল ভাষার মা আরবি ভাষার। কারণ এই পৃথিবী আরবদের মতো কোনো জাতি দেখেনি, মাতৃভাষার যত্ন-পরিচর্যা, সংগ্রহ ও সংকলন, শব্দানুসন্ধান, একক শব্দের হরফ তার অবস্থান অনুযায়ী কী অর্থ প্রকাশ করে তা জানার চেষ্টা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবজাতি পৃথিবীর অন্যসব জাতির চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে।[৭৮৮]

মুজাম বা অভিধান বলতে শুরুর দিকে এমন গ্রন্থ বোঝাত যাতে ভাষার শব্দভান্ডারের এক বিরাট অংশ সংকলিত হয়েছে এবং শব্দগুলোকে উচ্চারণের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। মুজামকে কখনো কখনো 'কামুস' বা শব্দকোষও বলা হয়। অভিধানের প্রধান গুরুত্ব এখানে যে, তাতে অসংখ্য শব্দের অর্থ দেওয়া থাকে যা সংশ্লিষ্ট ভাষার কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, এসব শব্দ অনুসন্ধান করে তার অর্থ জানার যতই আগ্রহ থাকুক এবং ভাষার শব্দরাশি যতই ছড়িয়ে থাকুক। নিজের পরিবেশ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

আরবদের মধ্যে অভিধান-চিন্তার প্রকাশ ঘটে কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার পর। কুরআনে আরবদের বহু উপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। অনারবরা ইসলামে প্রবেশ করে এবং তাদের অনেকের কাছে কুরআনের কিছু কিছু শব্দ কঠিন ও দুর্বোধ্য ঠেকে। ফলে কুরআন ও হাদিসের অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দাবলি এবং সাধারণভাবে আরবি ভাষার কঠিন ও জটিল শব্দগুলোর ব্যাখ্যার দাবি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তাই আরবি ভাষাবিদদের জন্য অভিধান-সংকলন বিদ্যা আরব-ঐশ্বর্য থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি, অন্য কোথাও থেকে নয়। এ কারণে অভিধান

---

৭৮৬. হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ২, পৃ. ১১৩৩-১১৩৪।

৭৮৭. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ*, ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক ভার্সন, সৌদি আরব, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৭৮৮. আদনান আল-খতিব, *আল-মুজামুল আরাবি বাইনাল মাযি ওয়াল-হাযির*, পৃ. ৫।

সংকলন-বিদ্যাকে আরব ভাষাবিদদের একটি উদ্ভাবন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে তারা পথিকৃৎ। অভিধান-রচনায় তারা অন্যান্য জাতি থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। অভিধান-সংকলনের বহু পদ্ধতি রয়েছে তাদের, অভিধানের প্রকারভেদও অনেক। তাই আরবদের অভিধান-চর্চা নিয়ে সমৃদ্ধ গবেষণাও রয়েছে। এসব গবেষণা থেকে এ স্বীকৃতি মিলেছে যে, অন্যান্য ভাষার পণ্ডিতদের চেয়ে আরবি ভাষার পণ্ডিতরা শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী। জার্মান প্রাচ্যবিদ অগাস্ট ফিশার (August Fischer 1865-1949) বলেন, চীনকে যদি বাদ দিই, তাহলে আরব ছাড়া আর কোনো জাতি পাওয়া যাবে না যারা ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানের ওপর লিখিত গ্রন্থাবলির প্রাচুর্য এবং নীতিমালা ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ভাষার শব্দরাশিকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তাবোধ ও অগ্রসর চিন্তাভাবনার জন্য গৌরবের হকদার হতে পারে।[৭৮৯]

প্রখ্যাত অনারব আরবি-ভাষাবিদ এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর মিডল ইস্টার্ন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ-এর খ্যাতিমান অধ্যাপক John A. Haywood তার *'সানাআতুল মাআজিম ফিল-আরাবিয়্যাহ'* গ্রন্থে বলেছেন, আরবদের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক অভিধান রয়েছে, সেটি হলো *'লিসানুল আরব'*[৭৯০]। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার অভিধানাবলি সূক্ষ্মতায় ও সামগ্রিকতায় *'লিসানুল আরব'*-এর সমকক্ষ হতে পারেনি।[৭৯১]

পবিত্র কুরআনের অপ্রচলিত ও জটিল শব্দাবলি নিয়ে প্রথম যিনি অভিধানমূলক পুস্তিকা রচনা করেন, তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৭ খ্রি.)। এই পুস্তিকায় তিনি খারিজি সম্প্রদায়ের নাফে ইবনুল আযরাক (মৃ. ৬৫ হি./৬৮৪ খ্রি.) কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নাবলির জবাব দিয়েছেন। পুস্তিকাটির নাম *'মাসায়িলু নাফে ইবনিল আযরাক ফি গরিবিল কুরআন'*। তারপর এ বিষয়ে একাধিক পুস্তিকা রচিত হয়। যেমন :

---

৭৮৯. *আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ*, সংখ্যা ৩৩৪, বর্ষ ২৯, যিলকদ ১৪২৫ হি./জানুয়ারি ২০০৫ খ্রি.।

৭৯০. ইবনে মানযুর (মৃ. ৭৫০ হি.), *লিসানুল আরব*।

৭৯১. আদনান আল-খতিব, *আল-মুজামুল আরাবি বাইনাল মাযি ওয়াল-হাযির*, পৃ. ৫।

গরিবুল কুরআন, আবু সাইদ আবান ইবনে তাগলিব[৭৯২]; '*তাফসিরু গরিবিল কুরআন*', ইমাম মালিক; '*গারিবুল কুরআন*', আবু ফায়দ মুআররিজ ইবনে আমর আস-সাদুসি[৭৯৩] এবং অন্যান্য।

সাধারণ ও সামগ্রিক অর্থে অভিধানগ্রন্থের প্রকাশ ঘটে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। যখন খলিল ইবনে আহমাদ তার '*আল-আইন*' নামক কোষগ্রন্থটি রচনা করেন। উচ্চারণস্থল অনুযায়ী আরবি বর্ণমালার ভিত্তিতে এই কোষগ্রন্থের ভুক্তিসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত ও সন্নিবিষ্ট করা হয়।[৭৯৪] খলিল ইবনে আহমাদের পথ অনুসরণ করেন আবু আলি আল-কালি (মৃ. ৩৫৬ হি./৯৬৬ খ্রি.)। তিনি তার অভিধান '*আল-বারি*'তে হরফের উচ্চারণস্থল (মাখরাজ) অনুযায়ী ভুক্তিগুলো বিন্যস্ত করেন। আন্দালুসে রচিত এটিই প্রথম কোষগ্রন্থ। যারা খলিলকে অনুসরণ করেছেন এবং মাখরাজ অনুযায়ী বিন্যাস ও অধ্যায়ভুক্ত করার ক্ষেত্রে তারই পথে হেঁটেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু মানসুর আল-আযহারি[৭৯৫], তার রচিত অভিধান '*তাহযিবুল লুগাহ*' এবং সাহিব ইবনে আব্বাদ (মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫ খ্রি.), তার রচিত অভিধান '*আল-মুহিত ফিল-লুগাহ*'। খলিলের আবিষ্কৃত বিন্যাসপদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন বিন্যাস ও শৈলীতে অভিধান রচনার প্রয়াস পেয়েছেন ইবনে দুরাইদ আল-আযদি। তার রচিত অভিধানের নাম '*জামহারাতুল লুগাহ*'। এই অভিধানে তিনি বর্ণনাক্রমিক

---

৭৯২. আবান ইবনে তাগলিব : আবু সাইদ আবান ইবনে তাগলিব ইবনে রাবাহ আল-বাকরি আল-জারিরি আল-কুফি (মৃ. ১৪১ হি./৭৫৮ খ্রি.)। রাবি, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, কারি, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক। শিয়াপন্থী। যাইনুল আবিদিন ইবনুল হুসাইনের সহচর। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : غريب القرآن، القراءات، صفين। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২৬।

৭৯৩. আবু ফায়দ মুআররিজ : আবু ফায়দ মুআররিজ ইবনে আমর আস-সাদুসি (মৃ. ১৯৫ হি./৮১০ খ্রি.)। আরবি ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : جماهير القبائل، غريب القرآن، الأنواء। দেখুন, ফাইরুজাবাদি, البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, খ. ১, পৃ. ৫৬।

৭৯৪. খলিল ইবনে আহমাদ, *মুজামুল আইন*, তাহকিক, আবদুল হামিদ হিন্দাবি, খ. ১, পৃ. ১৫।

৭৯৫. আবু মানসুর আল-আযহারি : আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনুল আযহারি আল-হারাবি (২৮২-৩৭০ হি./৮৯৫-৯৮১ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। খুরাসানের হেরাতে জন্ম ও মৃত্যু। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

كتاب التفسير، تفسير ألفاظ المزني، علل القراءات، كتاب الروح، كتاب الأسماء الحسنى، شرح ديوان أبي تمام، تفسير إصلاح المنطق।

দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪।

(আলফাবেটিক) পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যদিও তা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেননি। আহমাদ ইবনে ফারিস[৭৯৬] বর্ণনাক্রমিক পদ্ধতি ও শব্দের গঠন অনুযায়ী ভুক্তিবিন্যাসের পদ্ধতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করেন। তার রচিত অভিধানের নাম '*মাকায়িসুল লুগাহ*'।

আবু নাস্র ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ আল-জাওহারি (মৃ. ৪০০ হি./১০০৯ খ্রি.) তার রচিত অভিধান '*আস-সিহাহ*'-তে এক নতুন বিন্যাসপদ্ধতির উদ্ভব ঘটান, এই পদ্ধতি ছিল তার পূর্ববর্তীকালে রচিত সব ধরনের অভিধানের বিন্যাসরীতি থেকে ভিন্ন। তিনি বর্ণনানুক্রমিক রীতি অনুসরণ করেন বটে, তবে অধ্যায়ভুক্ত শব্দাবলিকে শেষ হরফ অনুযায়ী বিন্যস্ত করার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যা আর কেউ করেননি।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর দিকে যামাখশারি তার অভিধান '*আসাসুল বালাগাহ*' রচনা করেন। এই অভিধানে তিনি ভিন্নভাবে বর্ণনানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি শব্দাবলিকে তাদের প্রথম বর্ণ অনুযায়ী, তারপর দ্বিতীয় বর্ণ অনুযায়ী, তারপর তৃতীয় বর্ণ অনুযায়ী বিন্যস্ত করেন। আধুনিক অভিধানগুলোতে শব্দের বিন্যাসে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে যামাখশারির দুই শতাব্দীরও পূর্বে এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করে অভিধান রচনা করেন আলি ইবনুল হাসান আল-হুনায়ি, যিনি কুরাউন নাম্‌ল[৭৯৭] নামে পরিচিত। তার অভিধানের নাম '*আল-মুনাযযাদ*'। এই অভিধান তিনি আলিফ-বা-তা-সা বর্ণনানুক্রম অনুসারে রচনা করেন। ইয়াকুত আল-হামাবি তার কোষগ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এবং অন্যান্য জীবনীকাররাও তা-ই করেছেন।

অভিধান রচনায় পূর্ববর্তী মনীষীদের যে অভিজ্ঞতা তাকে পুঁজি করেই সাধারণ অভিধান রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। আল-জাওহারি তার

---

[৭৯৬]. ইবনে ফারিস : আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনে ফারিস ইবনে যাকারিয়া (৩২৯-৩৯৫ হি./৯৪১-১০০৪ খ্রি.)। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। কাযবিনে জন্মগ্রহণ করেন, তারপর রায় শহরে গমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

معجم مقاييس اللغة، الإتباع والمزاوجة، اختلاف النحويين، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ।

দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ১, পৃ. ১১৮।

[৭৯৭]. কুরাউন নাম্‌ল : আবুল হাসান আলি ইবনুল হাসান আল-হুনায়ি (মৃ. ৩১০ হি./৯২১ খ্রি.)। আরবি ভাষাবিদ। মিশরের অধিবাসী। '*আল-মুনায্যাদ*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২০, পৃ. ২০৯।

অভিধান '*আস-সিহাহ*'-তে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইবনে মানযুর রচনা করেন '*লিসানুল আরব*'। ফাইরুজাবাদি তার অভিধান '*আল-কামুসুল মুহিত*'-এ '*লিসানুল আরব*' ও '*আস-সিহাহ*'-তে অনুসৃত পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে মুরতাযা আয-যাবিদি[৭৯৮] অভিধান রচনায় '*আল-কামুসুল মুহিত*'-এর ওপরই নির্ভর করেন। ১০ খণ্ডে রচিত তার অভিধানের নাম '*তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস*'। তবে তিনি অভিধানের প্রত্যেক অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট হরফ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, হরফটির বৈশিষ্ট্য কী এবং ভাষাগত ব্যবহার কী কী তার বর্ণনা দিয়েছেন।

সাধারণ আরবি অভিধানের উদ্দেশ্য ছিল শব্দার্থের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং দ্ব্যর্থবোধক অর্থকে স্পষ্ট করা। এগুলো মুজামুল আলফায বা শব্দাভিধান হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ধরনের অভিধান রচনার পাশাপাশি আরেক ধরনের অভিধান রচনার ধারা তৈরি হয়, সেগুলোর নাম মুজামুল মাআনি বা অর্থাভিধান। এসব অভিধানের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন শব্দ ও শব্দরূপ তৈরি করা, যার দ্বারা লেখক তার নিজস্ব অর্থ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারেন অথবা যা তার জীবনে নতুন কিছু হিসেবে উপস্থিত হয়। এ প্রকারের অভিধানে ভুক্তিবিন্যাসে শব্দাভিধান থেকে ভিন্নতর পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন বিষয় অনুযায়ী বিন্যাসপদ্ধতি। ইবনুস সিক্কিত (২৪৪ হি./৮৫৮ খ্রি.) কর্তৃক রচিত '*আল-আলফায*' এই শ্রেণির প্রথম অভিধান। তারপর এ ধরনের অভিধান রচনার একটি ধারা তৈরি হয়। আবদুর রহমান ইবনে ঈসা আল-হামাদানি[৭৯৯] রচনা করেন '*আল-আলফাযুল*

---

৭৯৮. মুরতাযা আয-যাবিদি : আবুল ফায়দ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রাজ্জাক, তার উপাধি মুরতাযা (১১৪৫-১২০৫ হি./১৭৩২-১৭৯০ খ্রি.)। ভাষা, হাদিস, রিজালশাস্ত্র ও বংশবিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের হারদুয়ি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ ছিলেন ইরাকের ওয়াসিত শহরের বাসিন্দা। তার মা-বাবা তাকে নিয়ে ইয়ামেনের হাজরামাউতে চলে যান। ১২০৫ হিজরিতে মিশরে এক মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

تاج العروس من جواهر القاموس (১০ খণ্ড) ، إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للغزالي (১০ খণ্ড) أسانيد الكتب الستة، عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة، كشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلام، رفع الشكوى وترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب ।

৭৯৯. আবদুর রহমান ইবনে ঈসা আল-হামাদানি (মৃ. ৩২০ হি./৯৩২ খ্রি.) ছিলেন বিখ্যাত লিখন-শিল্পী। আমির বকর ইবনে আবদুল আযিয আল-আজালির চিঠিপত্রের লেখক ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ '*আল-আলফাযুল কিতাবিয়্যাহ*'। তার এই গ্রন্থ সম্পর্কে সাহিব ইবনে আব্বাদ

কিতাবিয়্যাহ'। তিনি বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইবনুস সিক্কিতের গ্রন্থকেই অনুসরণ করেন। তিনি আলোচ্য বিষয়গুলোকে কয়েকটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করেন।

আল-হামাদানি কর্তৃক রচিত গ্রন্থটির অনুসন্ধান লাভের পর কুদামা ইবনে জাফর[৮০০] রচনা করেন *'জাওয়াহিরুল আলফায'*। কিন্তু এটি তার আশা মেটায়নি এবং তাকে পরিতৃপ্ত করেনি। আবু হিলাল আল-আসকারি[৮০১] এই শ্রেণির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করেন, বিন্যাস ও কাঠামোর দিক থেকে এটি বেশ গুরুত্ব বহন করে। গ্রন্থটির নাম *'আত-তালখিস'*। সংক্ষিপ্ত হলেও এটি অভিধানের স্তরে উত্তীর্ণ। এই ময়দানে আরও অবতীর্ণ হন আবু মানসুর আস-সাআলিবি[৮০২] এবং রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ *'ফিকহুল লুগাহ'*। যিনি এই শ্রেণির রচনাকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরান তিনি হলেন ইবনে সিদাহ আল-আন্দালুসি[৮০৩], তার রচিত অভিধান *'আল-মুখাসসাস'*। গ্রন্থটি বিন্যাস ও অধ্যায়বিভক্তি এবং ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার দিক থেকে শীর্ষস্থান দখল করে নেয়। এখনো পর্যন্ত এটি

বলেন, তিনি কিছু পৃষ্ঠায় আরবি ভাষার মূল্যবান মুক্তারাশি একত্র করেছেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩২১।

[৮০০]. কুদামা ইবনে জাফর : আবুল ফারাজ কুদামা ইবনে জাফর ইবনে কুদামা (মৃত্যু : ৩৩৭ হি./৯৪৮ খ্রি.)। লিখন-শিল্পী। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : كتاب صناعة الكتابة، كتاب الخراج، كتاب نقد الشعر। দেখুন, ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ২২০।

[৮০১]. আবু হিলাল আল-আসকারি : আবু হিলাল হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (৯২০-১০০৫ খ্রি.)। সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। কবিতা লিখেছেন। ফিকহেও ব্যুৎপত্তি ছিল। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : شرح الحماسة، جمهرة الأمثال، الفروق في اللغة، ديوان المعاني، المحاسن في تفسير القرآن। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১২, পৃ. ৫০।

[৮০২]. সাআলিবি : আবু মানসুর আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (৩৫০-৪২৯ হি./৯৬১-১০৩৮ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন। *'ইয়াতিমাতুদ দাহর'* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ১৩০।

[৮০৩]. ইবনে সিদাহ আল-আন্দালুসি : আবুল হাসান আলি ইবনে ইসমাইল, ইবনে সিদাহ আল-মুরসি নামে পরিচিত (৩৯৮-৪৫৮ হি./১০০৭-১০৬৬ খ্রি.)। ভাষাবিজ্ঞানী ও অভিধানবেত্তা। আন্দালুসের মুরসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন দায়িনায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : المخصص المحكم والمحيط الأعظم، الأنيق، شرح إصلاح المنطق، شرح ما أشكل من شعر المتنبي، العلام في اللغة على الأجناس، العالم والمتعلم، الوافي في علم أحكام القوافي।

সবচেয়ে বড় আরবি অর্থাভিধান, বিপুল সংখ্যক ভুক্তি রয়েছে এতে, অর্থাভিধান নামটি ধারণ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত গ্রন্থ এটি।[৮০৪]

ইউরোপীয় অভিধান-বিশেষজ্ঞ জন এ. হেউড (John A. Haywood) মুসলিমদের কাছে অভিধান ও কোষগ্রন্থের গুরুত্ব ও মহিমা যে কী তা নিয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সত্য এই যে, অভিধান ও কোষগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক পৃথিবী এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তুলনায় আরবরা কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে। তা যুগের বা স্থানের যে বিবেচনাতেই হোক।[৮০৫]

তাই আরবি অভিধান ও কোষগ্রন্থ—তাদের বিভিন্ন শ্রেণি ও প্রকার নিয়েই—ইসলামি আরবের নবচিন্তার একটি অংশ এবং মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীরা হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে যে শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তার ফল।

।। দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।।

Asif Rahman 12.07.'21 10:12 pm

---

৮০৪. আদনান আল-খতিব, *আল-মুজামুল আরাবি বাইনাল মাযি ওয়াল-হাযির*, পৃ. ৩৭-৪৬।

৮০৫. আহমাদ মুখতার উমর, *আল-বাহসুল লুগাবি ইনদাল আরাব*, পৃ. ৩৪৩।

বাইতুল হিকমা

বাগদাদের বাইতুল হিকমা গ্রন্থাগার। এটিকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র বিবেচনা করা হয়। এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যাপীঠের সমপর্যায়ের। বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে ছুটে এসেছে। তারা বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছে, নানা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছে। তাতারদের হাতে ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত বাইতুল হিকমার আলোকবর্তিকা প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপী মানবতাকে পথ দেখিয়েছে।

আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর তার খিলাফতের সময় রাজধানী বাগদাদে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিছু ভবন নির্দিষ্ট করে সেখানে অতি মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থাবলির সমাবেশ ঘটান।

খলিফা হারুনুর রশিদ এই গ্রন্থাগারের জন্য একটি বিশাল ভবন নির্মাণ করেন এবং বাগদাদের সমস্ত গ্রন্থভান্ডার এখানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এটির নামকরণ করেন বাইতুল হিকমা (House of Wisdom)। পরবর্তী-কালে এই গ্রন্থাগার ক্রমবিকশিত হতে থাকে ও উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে এবং অবশেষে বিখ্যাত একাডেমিক জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

খলিফা আল-মামুনের যুগে গ্রন্থাগারটির সর্বাধিক উন্নতি হয়। তিনি বিখ্যাত অনুবাদক, অনুলিপিকার, লেখক ও জ্ঞানী-গুণীদের সমবেত করতে সক্ষম হন। এমনকি তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে গবেষক ও অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করেন। তার এসব কাজ এই জ্ঞানসুলভ অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নতি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাইতুল হিকমার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার হিসেবে, তারপর তা অনুবাদকেন্দ্রের রূপ পায়, তারপর তা পরিণত হয় গবেষণা ও সংকলনকেন্দ্রে, অবশেষে তা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তারপর এতে যুক্ত করা হয় একটি মানমন্দির (Astronomical observatory)।

মুসলিমজাতি ও তাদের সৃষ্টি সভ্যতা গতানুগতিক কোনো সভ্যতা নয়। এই সভ্যতার অবদানকে অন্যান্য সভ্যতার কৃতিত্ব ও অবদানের পরিপূরক বলারও অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সভ্যতা ও তার অবদান এমন অনন্যতায় আরোহণ করে, যা সকল সভ্যতা ও গোটা বিশ্বের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও উপমারূপে স্থির হয়।

কিন্তু এই অমায়িক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কী ছিল? এই সভ্যতা গোটা বিশ্ব ও সকল সমাজের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে প্রদর্শিত আচরণ, একইসাথে তাঁর সৃষ্টি মানবজাতির সাথে প্রদর্শিত আচরণে অপূর্ব ভারসাম্য সৃষ্টি করে দেখায়। শুধু তা-ই নয়, বরং সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষের পাশাপাশি তার চারপাশে বিদ্যমান পরিবেশ ও প্রাণের সাথেও অভূতপূর্ব সেতুবন্ধনের উপমা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়।

বস্তুত এই সভ্যতা এতটাই মানবীয়, যে-জন্য সকল মানুষের এ ব্যাপারে অবগতিলাভ ও অধ্যয়ন-গবেষণা কর্তব্য। তবে এই সুমহান সভ্যতার কৃতিত্ব ও অবদান বর্ণনার পথে আপনার সামনে রয়েছে অল্পকিছু পৃষ্ঠা মাত্র। প্রতিটি মুসলিমের উচিত এর মাঝে চোখ বুলিয়ে তার অপূর্ব সুধায় তৃপ্ত হওয়া, পাশাপাশি নিজের চারপাশে তার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দেওয়া।
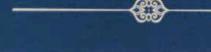
মাকতাবাতুল হাসান

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

উমাইর লুৎফর রহমান
অনূদিত

অনুবাদক পরিচিতি

উমাইর লুৎফর রহমান

মেধাবী, কর্মতৎপর ও চিন্তাশীল এক যুবক। মাত্র ১০ বছর বয়সেই কুরআনুল কারিম হিফয শেষ করে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মেধাতালিকায় জায়গা করে নেন। এরপর উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা আতহার আলী রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিশোরগঞ্জস্থ জামিয়া ইমদাদিয়ায় দ্বীনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় সর্বোন্নত ফলাফলের অধিকারী হয়ে ইলমি মহলে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এরপর ইসলামি দাওয়াহ ও আরবি ভাষা সাহিত্যের যোগ্যতা অর্জন করেন। লেখালেখির অভ্যাস তার ছাত্রজীবন থেকেই। অনুবাদ ও সম্পাদনা মিলিয়ে একাধিক বই তার সমাদৃত হয়েছে। সরল ও সাবলীল অনুবাদে পাঠকমহলে ইতিমধ্যেই তিনি সুপরিচিতি লাভ করেছেন। মহান আল্লাহ তার মেহনতকে কবুল করুন এবং তার প্রয়াসসমূহকে পরকালে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।
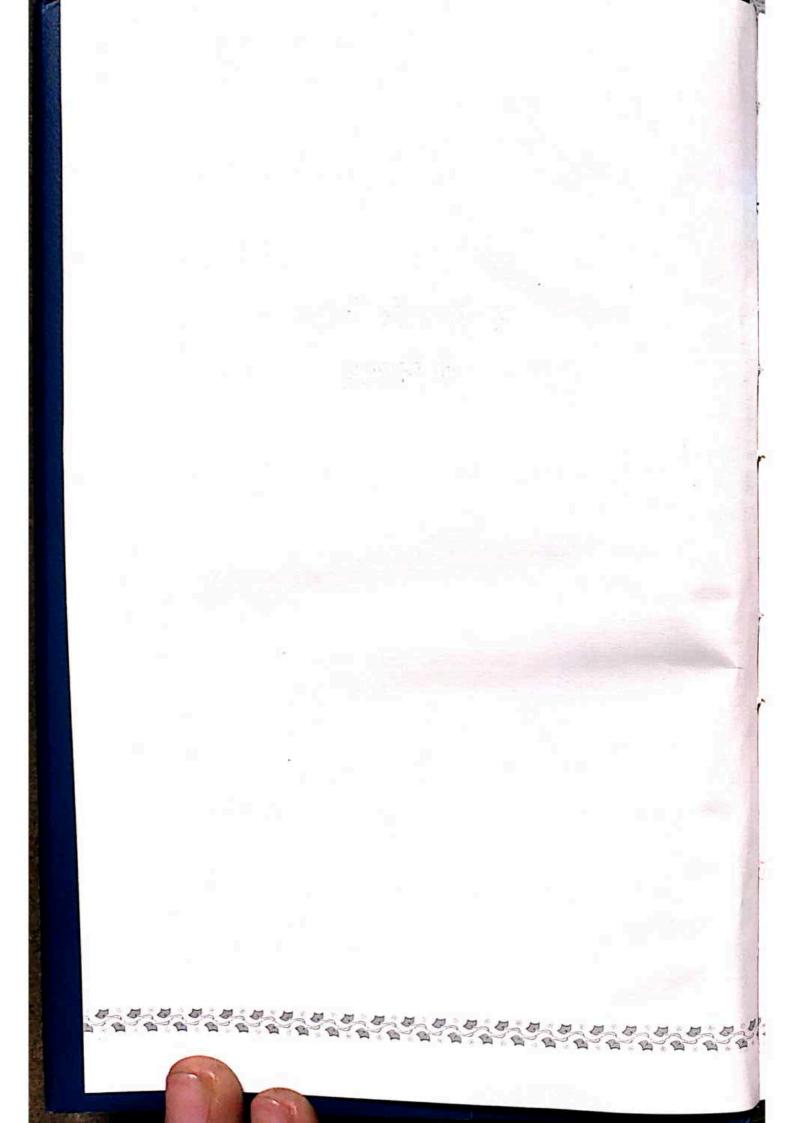
ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

তৃতীয় খণ্ড

উমাইর লুৎফর রহমান
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (৩য় খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২/ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-64-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২৯০০/- টাকা মাত্র [চার খণ্ড একত্রে]

MuslimJati Bisshoke ki Diyece(3rd Part)
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

* * *

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। তাদের অন্তরে যা ছিল আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।[১]

* * *

১. সুরা ফাতহ : ১৮।

সূচিপত্র
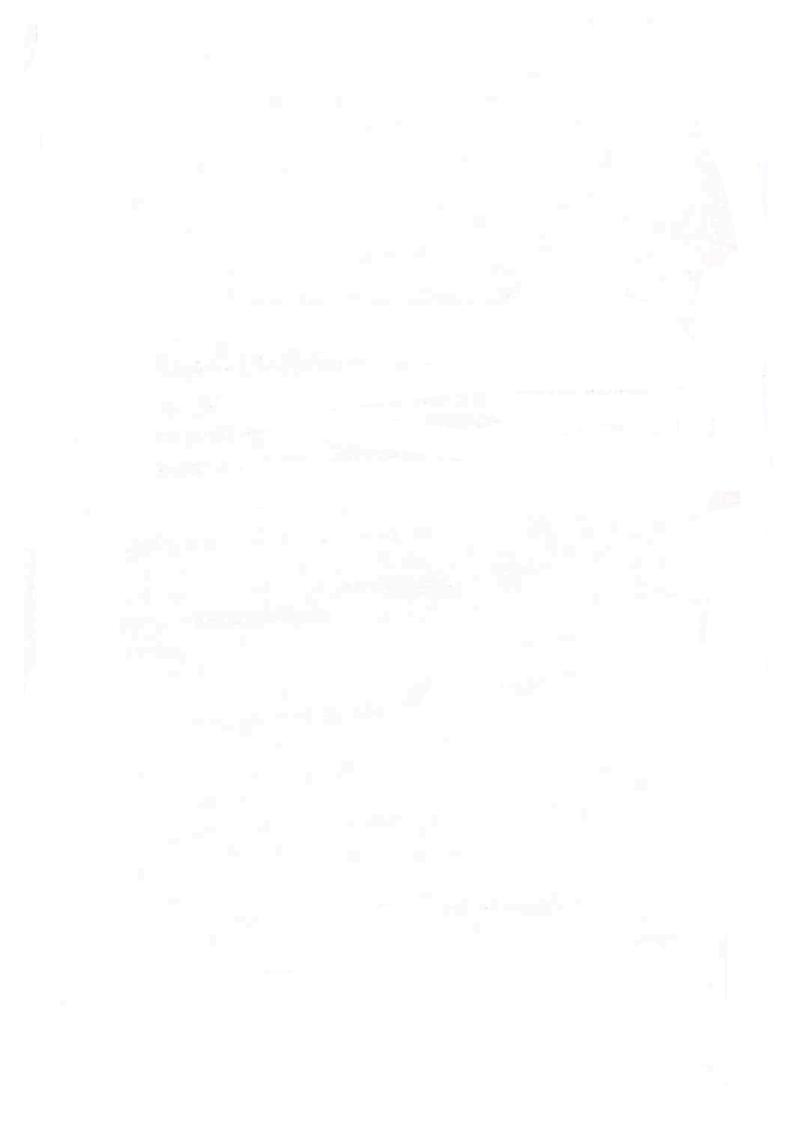
ষষ্ঠ অধ্যায়
ইসলামি সভ্যতায় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান

প্রথম পরিচ্ছেদ
খিলাফত ও নেতৃত্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মন্ত্রণালয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বিভাগ ও কার্যালয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচারবিভাগ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা বিভাগ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চিত্র সূচি

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতায় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান

কোনো জাতির উন্নতি ও সংস্কৃতিমান হওয়ার ধারণা পাওয়া যায় সে জাতির সংগঠন ও সংস্থার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। এসব সংগঠনই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের জীবনাচার ও কার্যাবলিতে বিন্যাস ঘটায়। মর্যাদাশীল মানবজীবন প্রদানের লক্ষ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল ও সহযোগী জাতির জীবনচরিত সংরক্ষণ করে। আর এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যত বেশি সামাজিক জীব মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়, তত বেশি তাদের কল্যাণে নিবেদিত হয়, অকল্যাণ থেকে তাদের রক্ষা করে। জীবনযাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনে যত বেশি উন্নয়ন ঘটায়, তত বেশি তারা মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে, তাদের কর্মতৎপরতার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং অন্য সব জাতি ও সভ্যতাকে ছাপিয়ে নিজেদের তারা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

আর এ অধ্যায়ে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে মানবিকতাপূর্ণ সভ্যতায় মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় দিক উপস্থাপন করব। নিচের পরিচ্ছেদগুলোতে তার সংক্ষিপ্তরূপ :

প্রথম পরিচ্ছেদ

খিলাফত ও নেতৃত্ব

এ ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। মানব সভ্যতার উন্নয়নে যার অসামান্য অবদান রয়েছে। আমাদের শাশ্বত ইসলামি সংস্কৃতি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, তা হলো সাংগঠনিক ব্যবস্থা, যা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ স্বার্থের কোনো ব্যক্তি বা দলের সাথে শর্তযুক্ত নয়। কারণ এসব সংগঠন কিতাবুল্লাহ আর সুন্নাতে রাসুলের আলোকে গঠিত ইসলামি বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। যা সমাজের প্রতিটি মানুষকে তাদের সক্ষমতা ও প্রতিভা প্রদর্শন করার সুযোগ দেয়। ফলে তা যুগ-পরিক্রমায় এই প্রতিষ্ঠানে নতুনত্ব আনতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রতিটি স্থান-কালের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। বৈশ্বিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ভান্ডার ও নানা দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করা এবং সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে-সকল নিয়মনীতি প্রয়োগ হয়ে আসছে সেসবে অবদান রাখা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোর মধ্য থেকে ইসলামি রাজনৈতিক সংগঠন হলো অন্যতম। এই শ্রেষ্ঠ সংগঠনটি তার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের ধারাবাহিকতায় প্রতিটি স্তরে উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে মানবজাতির জন্য অনুসৃত আদর্শ হিসেবে গণ্য।

ইসলাম এবং তার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণাকারী মাত্রই এই মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ করে থাকবেন, যা একমাত্র এই আসমানি ধর্মই প্রবর্তন করতে পেরেছে। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট। কারণ ইসলাম সবার আগে মানুষের নিজ সত্তাকে পরিবর্তন করতে পেরেছে। যুগ যুগ ধরে বংশীয় ও পৈত্রিক সূত্রে চলে আসা চারিত্রিক, নৈতিক, বিশ্বাসগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পালটে দিতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম বরং হাজার বছর ধরে মানুষের মনে গেঁথে থাকা রোমান ও পারসিক রাজনীতি ও বিশ্বাসকে নির্মূল করেছে। কারণ মানুষের মাঝে শাসননীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ইসলামি বিধানাবলির সাথে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যার মাধ্যমে ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা, জনগণের কল্যাণ বিধান

করা, তাদের ধর্ম ও কর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জাতি হিসেবে তাদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা, অন্যসব জনগোষ্ঠীর সামনে তাদের লাঞ্ছিত না করা ইত্যাদি অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে অন্যসব ধর্ম ও জীবনবিধান ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

খিলাফত ও আধুনিক প্রত্যাশিত নেতৃত্ব বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামি অভিধানবেত্তা, দার্শনিক, চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে 'খিলাফত' শব্দের পরিচয় জেনে নেব। কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে 'খিলাফত' শব্দের সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শাসনতান্ত্রিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন।

ইবনে মনজুর মিসরির মতে খিলাফত শব্দের আভিধানিক পরিচয় হলো,

خَلَفَهُ يَخْلُفُهُ صَارَ خَلْفَهُ، وَالْخَلِيْفَةُ الَّذِيْ يُسْتَخْلَفُ مِمَّنْ قَبْلَهُ، وَالْخِلَافَةُ الْإِمَارَةُ

> অর্থাৎ খালাফা শব্দের অর্থ একজন আরেকজনের পেছনে হওয়া। খলিফা হলো যে ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হয়। আর খিলাফত অর্থ হলো নেতৃত্ব বা শাসন।[২]

অপরদিকে ইবনুল আসির থেকে যুবাইদি বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'খালাফ' (خلف) শব্দের লামের ওপর যবর বা সাকিন দিয়ে পড়লে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে যে একজন চলে যাওয়ার পরে তার স্থানে আসে। তবে পার্থক্য এতটুকুই, যবর দিয়ে পড়লে ভালো প্রতিনিধি বোঝায় আর সাকিন দিয়ে পড়লে মন্দ।[৩]

কুরআনুল কারিমে অধিকাংশ স্থানে الخليفة। শব্দটির 'বহুবচন' ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন দল বা জনগোষ্ঠী বোঝানোর জন্য, এর দ্বারা কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বোঝানো হয়নি। আর দুটি স্থানে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এক স্থানে তা দিয়ে আমাদের আদি পিতা আদম আ.-কে বোঝানো হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

---

২. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, خلف মূলধাতু, খ. ৯, পৃ. ৮২।

৩. যুবাইদি, *তাজুল আরুস*, অধ্যায় : فاء, পরিচ্ছেদ : الخاء مع اللام, খ. ২৩, পৃ. ২৪৭।

আর স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি... ।[৪]

অপর স্থানে নবী দাউদ আ.-কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾

হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি... ।[৫]

আয়াতদুটিতে 'খলিফা' শব্দের আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসিরগ্রন্থ একমত।[৬] আর আবু বকর সিদ্দিক রা. প্রথম ব্যক্তি যাকে খলিফা উপাধি দেওয়া হয়। কারণ উম্মতের নেতৃত্বে তিনিই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হয়েছিলেন।[৭]

অপরদিকে পৃথিবীজুড়ে ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তৃত ও প্রদেশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পর ইমারাত হয়ে ওঠে একটি সম্ভ্রান্ত পদ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। অধিকৃত কোনো দেশ বা প্রদেশের গভর্নর মনোনয়ন ও নিয়োগের একমাত্র ক্ষমতা ছিল খলিফার। খলিফার ইচ্ছাতেই গভর্নর নিয়োগ হতো। নির্দিষ্ট দেশের বা রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় খলিফার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে বলা হতো আমির বা ওয়ালি।[৮]

'ইমারাত'-কে ফুকাহায়ে কেরাম দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. সাধারণ ইমারাত (إمارة عامة)। দুই. বিশেষ ইমারাত (إمارة خاصة)।

অনুরূপভাবে সাধারণ ইমারাতের আবার দুটি শাখা। এক. ইমারাতুল ইস্তিকফা (إمارة الاستكفاء)। অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানের স্বতঃস্ফূর্ত মনোনয়নে একজনকে নির্দিষ্ট রাজ্যের গভর্নর নিয়োগ করে তাকে রাজ্যবাসীর শাসনকার্য পরিচালনার এবং তাদের উন্নয়নে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া। দুই. ইমারাতুল ইস্তিলা (إمارة الاستيلاء) । অর্থাৎ কোনো একজন লোক বা নির্দিষ্ট দল কর্তৃক জোর করে ক্ষমতা দখল করে নেওয়া। তাকে বা সেই

---

৪. সুরা বাকারা : ৩০।

৫. সুরা সদ : ২৬।

৬. তাবারি, *জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ৪৪৯।

৭. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৬, পৃ. ৩৩৩।

৮. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৩।

দলকে ক্ষমতা প্রদান না করার কারণে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য বা গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করলে রাষ্ট্রপ্রধান তার বা সেই দলের নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেন। এ ধরনের ঘটনা শুধু রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে।

গভর্নরের জন্য বিশেষ বিশেষ যেসব সেক্টরে ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ থাকে, তাকে বলা হয় ইমারাতুল খাসসা। যেমন সেনাবাহিনী পরিচালনা ও পুনর্গঠন, রাজনীতির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে মানুষকে বারণ... ইত্যাদি। তবে ইমারাতুল খাসসার অধিকারী গভর্নর বিচারব্যবস্থা এবং ট্যাক্স-সদকা উত্তোলনে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, ইসলামের সূচনালগ্নে সাধারণত 'ইমামত' বা সাধারণ নেতৃত্বের প্রচলন ছিল। এরপর রাষ্ট্রের পরিধি বাড়ার সঙ্গে তা ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ পৃথকীকরণ হয়। শেষ পর্যন্ত আমিরের ক্ষমতা কেবল সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং নামাযের ইমামতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।[১]

যাইহোক, খিলাফত ও নেতৃত্বের বিষয়ে মুসলিমদের অবদানগুলো আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করছি :

প্রথম অনুচ্ছেদ : খিলাফতের শর্তসমূহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : খলিফা বা আমির নির্বাচন পদ্ধতি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাইআত (তথা খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার)

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : পরবর্তী খলিফা নির্বাচন

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

সপ্তম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক

অষ্টম অনুচ্ছেদ : সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক যত গোলযোগ

নবম অনুচ্ছেদ : শুরা (পরামর্শসভা)

---

১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৩০; ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৮-৭১।

প্রথম অনুচ্ছেদ

খিলাফতের শর্তসমূহ

খিলাফতের শর্ত বলতে, শরিয়ত এ বিষয়ে যেসব শর্ত আরোপ করেছে এবং প্রশাসনে বা খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে শাসকের মধ্যে যেসব শর্তের উপস্থিতিকে আবশ্যক বলে সকল শরিয়তজ্ঞ এবং জনসাধারণ একমত হয়েছেন, তা উদ্দেশ্য।

আর আপনি যদি শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এসব শর্ত ও মানদণ্ডকে তৎকালীন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত আইনকানুনের সঙ্গে তুলনা করেন, তাহলে রাজনৈতিক ইতিহাসে ইসলামি সভ্যতা কত উন্নত ও উচ্চ আসন গ্রহণ করেছিল, তা খুব সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

ইসলামের আগমনই ঘটেছিল কেবল মানুষের অধিকার রক্ষা এবং তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও সমুন্নত রাখার জন্য, প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর জমিনে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তা ছাড়াও শরিয়ত নানা অবকাঠামো এবং উদার নিয়মের প্রচলন ঘটিয়ে ইসলামের একতা সুরক্ষায় জোর তাগিদ দিয়েছে। ফলে ইসলামি বিচারব্যবস্থা অন্যান্য সকল ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে অনন্য ও সুউচ্চ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের সকল প্রশাসনিক অবকাঠামোতে হারিয়ে যাওয়া ন্যায়, সুবিচার ও সাম্যের মতো সামাজিক বিষয়গুলো পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করতে শতভাগ সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই সাম্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রণীত বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সকল অধিকার সুরক্ষা করা। মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য শরিয়ত অনুমোদিত সকল বৈধ উপাদান সরবরাহ ও সহজলভ্য করা। আর এই ন্যায়, ইনসাফ ও সমতা বিধানের নজির আমরা কেবল ইসলামি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমুজ্জ্বলরূপে দেখতে পাই।

যেহেতু খলিফা, আমিরুল মুমিনিন বা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি মানুষের দ্বীন-ধর্ম সুরক্ষা ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, তাই ইসলামি স্কলার ও শরিয়তব্যবস্থায় বিজ্ঞ আলেমগণ এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। ইমাম মাওয়ারদি রহ.-এর মনোনীত সাতটি শর্ত আমরা এখানে উল্লেখ করছি। সেগুলো হলো :

১। ন্যায়পরায়ণ হওয়া। প্রয়োজনীয় সকল শর্তসহ।

২। কুরআন-হাদিসের আলোকে ইজতেহাদের যোগ্যতা পর্যন্ত পৌঁছায় এমন ইলমের ধারকবাহক হওয়া।

৩। দৈহিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া। তথা দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাক্শক্তি পুরোমাত্রায় সুস্থ ও ত্রুটিমুক্ত হওয়া।

৪। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াতে প্রতিবন্ধক হয় এমন সব রোগ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া।

৫। দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

৬। শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতে এবং মুসলিমদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সাহসিকতা ও বীরত্বের অধিকারী হওয়া।

৭। কুরাইশ বংশীয় হওয়া। কারণ এর সপক্ষে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইজমা (উম্মতের ঐক্য) সাব্যস্ত হয়েছে।[১০]

কোনো সন্দেহ নেই, ইসলামের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো সবসময় এই শর্তগুলোকে সামনে রেখেই তার পথ চলা অব্যাহত রেখেছে। মুসলিম জনসাধারণও তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে এসব শর্তের উপস্থিতিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। ফকিহদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এসব শর্ত আমরা অধিকাংশ মুসলিম খলিফার মাঝে পুরোপুরিভাবে দেখতে পাই। *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু* গ্রন্থে ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি রহ. মুসলিম খলিফার মাঝে কী কী শর্ত থাকা জরুরি সে বিষয়ে আলোচনার সূচনালগ্নে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকামের (মৃ. ৮৬ হি.) বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, নিশ্চয় আবদুল মালিক ইবনে

---

১০. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৫।

মারওয়ান মানুষের কাছে ন্যায় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসুল প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানান। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন বিখ্যাত এবং জ্ঞানগরিমায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত। তার ধর্মানুরাগের ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তার আল্লাহভীতিতে কারও কোনো প্রশ্ন নেই। সকলেই এক বাক্যে তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। কুরাইশের কেউই তার খলিফা হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেনি এবং শামের কোনো অধিবাসীও এ ব্যাপারে বিরোধিতা করেনি।[১১]

ইবনে কুতাইবার বর্ণনা করা ওইসব শর্তের উপস্থিতিতে মুসলিম জনসাধারণ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে এক বাক্যে খলিফা হিসেবে মেনে নেন। ইসলামের ফকিহগণ খলিফার পদে সমাসীন ব্যক্তির মাঝে এসব শর্তের উপস্থিতিকে আবশ্যক হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার, কুরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে ফকিহগণ খলিফার ব্যাপারে যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, তা নিছক সমাজবহির্ভূত ব্যক্তিগত মতামত নয়, বরং শরিয়ত কর্তৃক প্রণীত বিধান এবং ইসলামি ভূখণ্ডে তা বাস্তবায়নের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক জড়িত। 'খিলাফত' বা ইমামতে কুবরার ব্যাপারে এর সঠিক বাস্তবায়নই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

আমাদের বোঝার বাকি নেই যে, ইসলামি সংস্কৃতিতে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আর খলিফা তো ভিন্ন গ্রহের কেউ নন, সাধারণ একজন মানুষ। কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে তিনি এই পদের উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছেন। যাই হোক, তা সত্ত্বেও তিনি মানুষের কাছে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নন। রোম ও পারস্যের সম্রাটদের মতো স্বৈরাচারী ভাবাপন্ন হবেন না। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি এমন পদ যা মানবিক কল্যাণের জন্য নিবেদিত। জনসাধারণের সকল অধিকার রক্ষা করা, তাদের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। রোম ও পারস্যের সম্রাটগণ যা গুরুত্বের সঙ্গে নেননি।

[১১]. ইবনে কুতাইবা দিনাওয়ারি, *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু*, খ. ৩, পৃ. ১৯৩।

পারসিক সভ্যতায় পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি খসরুকে প্রভু হিসেবে মানা হতো। পারসিক জনগণের সঙ্গে সম্রাটদের আচার-ব্যবহারের দ্বারা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি অধিকাংশ সম্রাট ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করে নিতেন। জনগণকে দাস বানিয়ে রাখতেন। সম্রাট দ্বিতীয় খসরুই এর সব থেকে বড় উদাহরণ। নিজেই নিজের উপাধি নির্ধারণ করেছেন এই বলে, সকল প্রভুর মাঝে চির অম্লান পুরুষ। সকল সম্রাটের মাঝে সবচেয়ে বড় অধিপতি। মহা ক্ষমতার অধিকারী। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেগে ওঠেন। বিখ্যাত নীলনদের জন্য তিনি তার দু-নয়ন উজাড় করে দিয়েছেন।[১২]

ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন গ্রন্থে আর্থার ক্রিস্টেনসেন খসরুর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, নিজের ধনভান্ডার পূর্ণ করার জন্য তিনি জনগণের প্রতি অবিচার করেন। সাম্রাজ্যের জ্ঞানী ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের তিনি আদৌ মর্যাদা দিতেন না। তিনি ছিলেন চরম হিংসুটে, সন্দেহপ্রবণ। তার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে সন্দেহ করতেন তাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতেন সবসময়।[১৩]

তা ছাড়া পারস্যসম্রাট মনোনীত হতো বংশপরম্পরা অনুসারে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কোনো বিধিমালার আলোকে মনোনীত হতো না। আর তাই পারসিক সমাজে জনগণের ন্যূনতম কোনো অধিকার ও মূল্য অবশিষ্ট ছিল না। শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সামাজিকভাবে পারস্য সাম্রাজ্য চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল : এক. ধার্মিক শ্রেণি। দুই. যোদ্ধা ও সৈনিক শ্রেণি। তিন. বিধিমালা প্রণয়নে লেখক শ্রেণি। চার. সাধারণ জনগণ শ্রেণি (কৃষক, দিনমজুর ইত্যাদি)। আর এই চারটি স্তরের সবগুলোই ছিল (সাসানীয়) রাজপরিবার থেকে নিম্নস্তরের। রাজপরিবার ছিল এসব শ্রেণিবিন্যাসের অনেক উর্ধ্বে।[১৪]

রোমসম্রাটের অবস্থাও ছিল তাই। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হতো। তিনি স্বেচ্ছাচারমূলক রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষমতা

---

১২. আর্থার ক্রিস্টেনসেন, *ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন*, পৃ. ৪৩২।

১৩. প্রাগুক্ত, ৪৩৩।

১৪. প্রাগুক্ত, ৮৫।

রাখতেন। চরম স্বৈরাচারী হলেও তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার বা সামান্য প্রতিবাদ করার সুযোগ ছিল না কারও।[১৫]

পরবর্তীকালে সম্রাট মনোনয়নের ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে চলে যাওয়ায় তা প্রহসনে রূপ নেয়। এরপর থেকে সেনা অফিসারগণই রোমান সম্রাট হতে থাকেন। এসব ক্ষমতালোভী সেনাপতিগণ রাষ্ট্রপ্রধানের পদ পেয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। পাদরি, ধর্মযাজক, জ্ঞানী-গুণী কেউই তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেত না। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট উরিলিয়ন[১৬] যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হন, তখন তাকে প্রভু বা ঈশ্বর বলে উপাধি দেওয়া হয়। সম্রাট দাকলাদিয়ানুসের শাসনামলে তা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। তার আমলেই রোমান সাম্রাজ্য অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, অবক্ষয়ের চরম সীমায় উপনীত হয়। পাপের সাম্রাজ্য উপাধি পায় রোম।[১৭]

মোটকথা, ধর্মীয় ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব মূলনীতি ফকিহগণ নির্ধারণ করেছেন, মুসলিম খলিফাদের মাঝে এর সবগুলোই বিদ্যমান ছিল। তাই তো আমরা দেখতে পাই খলিফা হারুনুর রশিদ রহ. আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা চাওয়ার কারণে ওই ব্যক্তিকে মাফ করে দেন যে তার সম্মানে আঘাত করেছিল।[১৮] পারস্য ও রোমসম্রাটদের ইতিহাসে এরকম কোনো নজির নেই। আর এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা নিছক মুসলিম খলিফাদের গুণাগুণ ও ন্যায়-ইনসাফের প্রদর্শনী নয়, বরং শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত মুসলিম শাসকদের বাস্তব চরিত্রের প্রতিফলন।

---

[১৫]. মাহমুদ ইবরাহিম সাদানি, *মাআলিমু তারিখি রুমা আল-কাদিম*, পৃ. ৬৩।

[১৬]. বিখ্যাত রোমান সম্রাট (২১৫-২৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)। তার সেনাশাসনের দ্বারা নিজ সাম্রাজ্যে একনায়কতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন। আশপাশের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোকে সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তার আমলে প্রণীত মুদ্রার ওপর তার উপাধি লেখা ছিল 'পৃথিবীর সংস্কারক'। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তীরঘেঁষা ইলিরিকম এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অবশেষে সেনাবাহিনীর হাতেই তিনি নিহত হন।

[১৭]. মাহমুদ মুহাম্মাদ আল-হুয়াইরি, *রু'য়াতুন ফি সুকুতিল ইমবারাতুরিয়্যা আর-রুমানিয়্যা*, পৃ. ২৫, ২৬।

[১৮]. তারতুশি, *সিরাজুল মুলুক*, পৃ. ৭১।
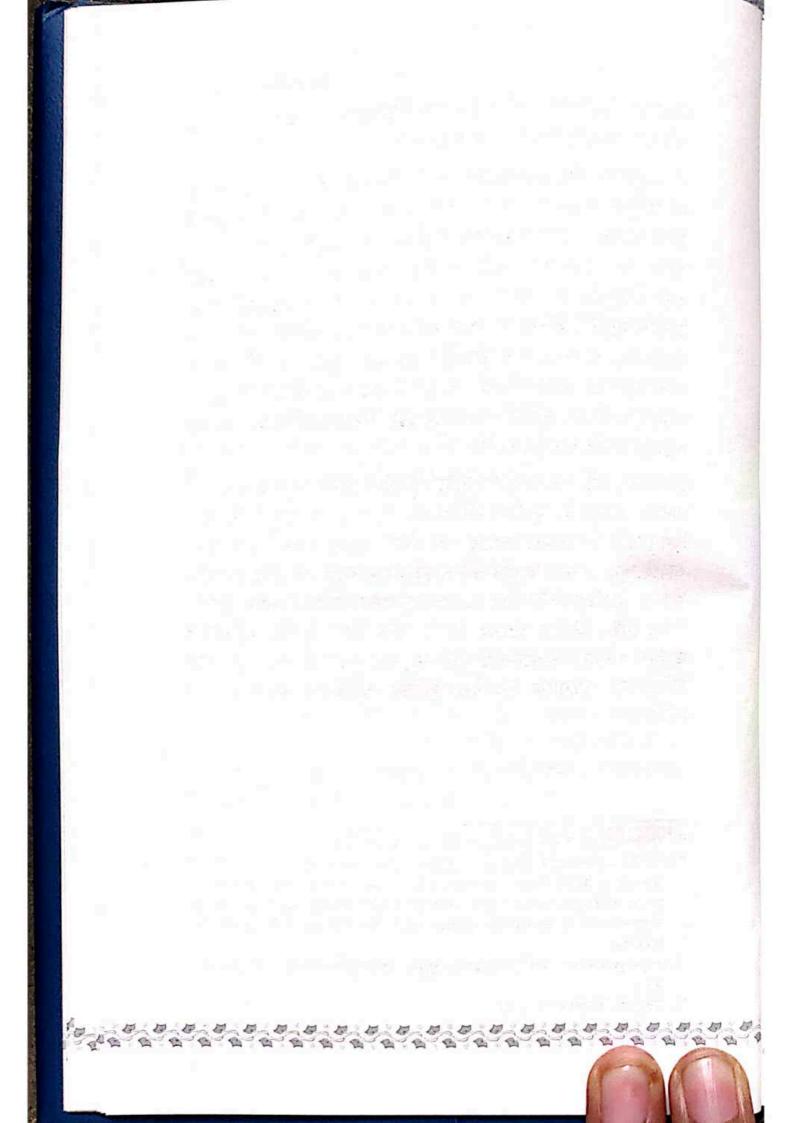
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আমির বা খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি

খলিফা বা আমির মনোনয়নে শরিয়ত সবচেয়ে উত্তম ও ন্যায়সংগত পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি সংস্কৃতি অন্যান্য সকল সভ্যতাকে ছাপিয়ে এক অনন্য আসন গ্রহণ করেছে, এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। চিরসুন্দর এই ইসলামি সভ্যতা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, তা হলো শুরা (শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সর্বসম্মত পরামর্শক্রমে গঠন) পদ্ধতি। এই শুরা পদ্ধতি যে নিরেট ইসলামি সভ্যতার সৃষ্টি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। ইসলাম ও মানবসভ্যতায় শুরার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এর জন্য আমরা স্বতন্ত্র একটি অনুচ্ছেদ গঠন করেছি।

আর চলমান অনুচ্ছেদে শুধু খলিফা নির্বাচনে মুসলিমগণ যেসব আধুনিক ও যুগোপযোগী পন্থা আবিষ্কার করেছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। কোনো সন্দেহ নেই ইসলামের একেবারে সূচনালগ্নে খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচনপ্রক্রিয়া সংঘটিত হয় চারটি ধাপে। সব খলিফার ক্ষেত্রে হুবহু এক রকম না হলেও মৌলিকভাবে প্রক্রিয়াগুলো অভিন্ন। ইসলামি সভ্যতা মুসলিম জনসাধারণের সামনে চারটি শরিয়তসম্মত পথ ও পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছে, যেগুলোর নিরিখে মুসলিমদের ইমাম ও খলিফা নির্বাচন সম্ভব। নেতা নির্বাচনের বিষয়ে এটি গোটা বিশ্বমানবতার জন্য ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য অবদান।

সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ ও শ্রেষ্ঠ নমুনা আমরা দেখতে পাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি নির্বাচনের বেলায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর তার খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে সাকিফায়ে বনি সাদে আনসার সম্প্রদায় বৈঠকে বসে। তাদের মাঝে কেবল তিনজন ছিলেন মুহাজির: আবু বকর রা., উমর

ইবনুল খাত্তাব রা. এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.। বৈঠকে সিংহভাগ সদস্য আনসার হওয়া সত্ত্বেও তারা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। খলিফা নির্বাচনে মুহাজির সদস্যকে প্রাধান্য দেন। আবু বকর রা.-এর হাতে তারা বাইআত গ্রহণ করেন। বিশেষ করে আবু বকর রা. কুরাইশ গোত্রের 'তিম' নামক এক দুর্বল শাখার সদস্য এ কথা জানার পরও আনসারদের এ সিদ্ধান্ত বিশ্ব-ইতিহাসে নজিরবিহীন। অপরদিকে আনসারগণ সব দিক থেকেই ছিলেন এগিয়ে। দেশ তাদের। ভূখণ্ড তাদের। এরপরও তারা আবু বকরকে নেতা হিসেবে এগিয়ে দেন। কারণ তিনিই ছিলেন ধর্মীয় ও আদর্শগত দিক থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। এই পদ্ধতিকে আমরা 'সরাসরি জনগণ কর্তৃক নির্বাচন পদ্ধতি' হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।[১৯]

ঠিক তেমনই আবু বকর রা. যেভাবে উমর রা.-কে তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন সেটিও ইতিহাসের পাতায় রাজনৈতিক সভ্যতার দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ হয়ে আছে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ তাবারি রহ. লেখেন, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবু বকর রা. জনসম্মুখে আগমন করেন। তাদের উদ্দেশে ভাষণে তিনি বলেন, আমি যদি কাউকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করে যাই, তাহলে আপনারা সন্তুষ্ট থাকবেন?! আল্লাহর শপথ, আমি এ বিষয়টি ভাবতে কোনো ত্রুটি করিনি এবং কোনো আত্মীয়স্বজনকেও আমি প্রস্তাব করছি না। বরং উমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার প্রতিনিধি নির্বাচন করছি। আপনারা সবাই তার কথা শুনবেন। তার আনুগত্য করবেন। এরপর সকলে সমস্বরে বলল, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং নির্দ্বিধায় মেনে নিলাম।[২০]

প্রস্তাবটি ছিল আবু বকর রা.-এর পক্ষ থেকে জনগণের উদ্দেশে। খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি আবু বকর রা.-এর একান্ত কর্তব্য ছিল না। জনগণও ছিলেন এ ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু আবু বকর রা.-এর প্রস্তাবকে তারা প্রত্যাখ্যান করেননি। কারণ জনগণের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এবং দেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের সামনে তিনি এ প্রস্তাব পেশ করেন। আবু বকর রা.-ও বিষয়টি মুখ ফসকে আচমকা বলে

---

১৯. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৪৩-২৪৫।

২০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

দেননি, বরং এর আগে এ বিষয়ে তিনি বড় বড় সাহাবির মতামত গ্রহণ করেন। তাবারি রহ. লেখেন, মৃত্যুশয্যায় আবু বকর রা. আবদুর রহমান ইবনে আওফকে ডেকে বললেন, উমর সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আল্লাহর শপথ! তিনি অন্য সবার চেয়ে উত্তম। তবে তার মধ্যে কিছু কঠোরতা আছে। তখন আবু বকর রা. বললেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ এ কথা এজন্য বলেছে, যেহেতু সে আমাকে নরম দেখেছে। তবে খিলাফতের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপলে তিনি অনেক বিষয়ে কঠোরতা বর্জন করবেন। হে আবু মুহাম্মাদ, আমি তাকে খুব যাচাই করেছি। দেখেছি, আমি কোনো বিষয়ে কারও ওপর রেগে গেলে তিনি আমাকে তা মেনে নিতে বলেন। কারও প্রতি আমি নরম হলে সে ক্ষেত্রে তিনি কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেন। হে আবু মুহাম্মাদ, আপনাকে যা বললাম তা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। উত্তরে তিনি বললেন, জি আচ্ছা। এরপর উসমান ইবনে আফফান রা.-কে ডেকে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ, উমর সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। উত্তরে উসমান রা. বললেন, তার সম্পর্কে আপনিই বরং বেশি অবগত। তখন আবু বকর রা. বললেন, হ্যাঁ, তার সম্পর্কে আমার ভালো জানা আছে। উসমান রা. বললেন, তবে আল্লাহর শপথ, যতদূর জানি বাহ্যিক রূপের চেয়ে তার ভেতরের রূপটা আরও বেশি উত্তম। আমাদের মাঝে তার কোনো জুড়ি নেই। তা শুনে আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন হে আবু আবদুল্লাহ। আমি যা বলেছি তা কারও সামনে প্রকাশ করবেন না। তিনি বললেন, আপনার যেমন ইচ্ছা।[২১] এভাবেই উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খলিফা হওয়ার প্রক্রিয়াটি পূর্ববর্তী খলিফার প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে ইসলামি সভ্যতার অনন্য কীর্তির উদাহরণ আমরা তৃতীয় খলিফা নির্বাচনের বেলায়ও দেখতে পাই। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছয়জন বড় বড় সাহাবিকে মনোনয়ন করেন পরামর্শের জন্য। এই ছয়জনের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে মদিনার বাইরের এবং ভেতরের কারও কোনো দ্বিমত ছিল না। মুসলিম নেতা নির্বাচনে তাদের থেকেই যে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ মতামত পাওয়া যাবে এ

---

[২১]. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫২।

বিশ্বাস সবার ছিল। বাস্তবতা হলো উমর রা. তাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই মনোনীত করেছিলেন। কারণ তারা আশারায়ে মুবাশশারা তথা পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করা দশজনের তালিকাভুক্ত ছিলেন। মূলত নির্বাচিত এ দলটি ছয়জনের নয়, ছিল সাতজনের। তারা হলেন উসমান ইবনে আফফান রা., আলি ইবনে আবু তালিব রা., আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা., সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা., যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা., তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.। আর সপ্তমজন ছিলেন সাইদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল রা.; কিন্তু নিকটাত্মীয়তা থাকায় তাকে তিনি এ কমিটির বাইরে রাখেন। উমরের বংশের আর কেউ এ পদে আসুক, তা তিনি চাননি। তিনি বলতেন, উমরের বংশের কেবল একজনই হোক, আর কাউকে যেন এ পদের জন্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে না হয়।[২২]

কোনো সন্দেহ নেই উমর রা.-এর এই মনোনয়নকমিটি গঠন মুসলিমদের সাধারণ-বিশেষ সকল শ্রেণির কাছে ছিল সমাদৃত, বরং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তৎকালীন বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে যে কৌশল অবলম্বন এবং যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, উমর রা.-এর এই মনোনয়ন পদ্ধতি ছিল তার সঙ্গে পুরোমাত্রায় সংগতিপূর্ণ। এরকম নতুন পরিস্থিতিতে উমর রা. একা খলিফা নির্বাচন করে যাবেন তা যুক্তিযুক্ত ছিল না। এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকায় এর সঙ্গে খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি জড়িয়ে গেলে বড় রকম কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। যাই হোক, উমর রা.-এর কমিটি গঠন ছিল পুরোপুরি শরয়ি নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই উমর রা.-এর আহলে শুরা বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই পরামর্শের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। উসমান ইবনে আফফান রা.-কে তৃতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচনের ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেন। আর এভাবেই উমর রা.-এর মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শরিয়াভিত্তিক সুষ্ঠু নেতা নির্বাচনব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।

---

২২. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৮৫০।

চতুর্থ পদ্ধতিটি আলি ইবনে আবু তালিব রা.-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচনের বেলায় আমরা দেখতে পাই। এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং কঠিন ফেতনার সময়।[২৩] সে কারণে সঠিক ও যোগ্য মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণ তখন জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ ফেতনার উদ্ভবই ঘটেছিল পূর্ববর্তী খলিফাকে হত্যার মধ্য দিয়ে। তাই এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ফেতনা বড় আকার ধারণ করার আগেই তা মূলোৎপাটন করা জরুরি ছিল। আলি ইবনে আবু তালিব রা. ছাড়া অন্য কারও হাতে মুসলিমগণ বাইআত গ্রহণ করবেন সেই পরিস্থিতি তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনিই খলিফা হন এবং মসজিদে নববিতে বাইআত গ্রহণ করার শর্ত জুড়ে দেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মতো অনেক সাহাবি এরকম জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে মসজিদে বাইআত গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন; কিন্তু মুহাজির ও আনসার সকল সাহাবি শেষ পর্যন্ত মসজিদে নববিতেই আলি রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।[২৪] এ ধরনের জটিল ও উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে নেতা নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া মুসলিমগণ উপহার দেন, সেখান থেকে আমরা সঠিক সময়ে যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করি।

উপর্যুক্ত চারটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে চার পদ্ধতিতে সফলভাবে নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া বিশ্ব রাজনীতির সামনে ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য অবদান। পরিস্থিতি কখনো ছিল শান্তিপূর্ণ আর কখনো ছিল যুদ্ধ ও ফেতনা কবলিত। তবে যাই হোক, সবগুলো পদ্ধতির মূলে ছিল শুরা এবং বাইআত গ্রহণ প্রক্রিয়া। এ দুটি বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। পাশাপাশি উত্তরাধিকারীকে বা নিকটস্থ কাউকে খলিফা নির্বাচনের বিধান নিয়েও আমরা আলোকপাত করব।

প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, চার খলিফা এবং তাদের পরবর্তী সময়ে মুসলিমগণ নেতা নির্বাচনে যেসব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যে আদর্শ পৃথিবীবাসীর সামনে রেখে গেছেন, তা মূলত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ইসলামি শরিয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। যা বিচিত্র পরিস্থিতিতে

---

[২৩]. আলি রা.-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া এবং তৎকালীন মদিনার পরিস্থিতি নিয়ে ফেতনার অধ্যায়ে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করব।

[২৪]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৬৯৬।

নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার এবং ফেতনা নিয়ন্ত্রণে ইসলামি সভ্যতার সামর্থ্য ও সক্ষমতার প্রমাণ দেয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইসলামি সভ্যতা এ ধরনের শান্তিপূর্ণ ও সফল নির্বাচন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে অন্য সব সভ্যতাকে ছাপিয়ে গেছে।

আর ইসলামের ইতিহাসে গভর্নর বা আমির নির্বাচনের প্রক্রিয়া ছিল আরও সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়। আমির পদপ্রার্থীদের জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আদর্শ উপদেশ বা অনন্য মূলনীতি রেখে গেছেন। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা, কখনো তুমি নেতৃত্ব প্রার্থনা করো না। কারণ প্রার্থনা করে নেতৃত্ব লাভ করলে এর যাবতীয় দায়ভার তোমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে (আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতার সুযোগ থাকবে না)। আর বিনা প্রার্থনায় পেলে তোমাকে সহযোগিতা করা হবে।[২৫]

আর তাই দায়িত্ব প্রদানের সময় বা নেতা নির্বাচনের বেলায় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় এই মূলনীতিকে সামনে রাখতেন। আবু যর রা. বলেন, একবার আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে গভর্নর নিযুক্ত করুন। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধে হাত চাপড়ে বলেন, হে আবু যর, তুমি দুর্বল। আর নেতৃত্ব একটি আমানত। কেয়ামতের দিন তা অপমান আর লাঞ্ছনার কারণ হবে। তবে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করে প্রত্যেকের হক আদায় করে থাকলে সেই অপমান আর লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি মিলবে।[২৬]

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন গোটা মুসলিম জাতির নেতা। নেতৃত্বের এই গুরুভার কে যথাযথভাবে পালন করতে পারবে আর কে পারবে না এ সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি অবগত। এ কথা পুরোপুরি জেনেই তিনি আবু যর রা.-কে এই দায়িত্বের অনুপযোগী বলেছিলেন। নেতৃত্ব পেলে যথাযথভাবে হয়তো হক আদায় করতে পারবে

---

২৫. *বুখারি*, কিতাবুল আইমান ওয়ান-নুযুর, ৬২৪৮; *মুসলিম*, কিতাবুল আইমান, ১৬৫২।
২৬. *মুসলিম*, কিতাবুল ইমারা, ১৮২৫।

না এ আশঙ্কায় আবু যর রা.-কে তিনি নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই এটিই হলো যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নববি পদ্ধতি ও ইসলামি সভ্যতার মূলনীতি। স্বজন বা বন্ধু হলেও অযোগ্যদের নির্বাচন না করে যোগ্য ও উপযুক্ত নেতা নির্বাচনে ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য অবদান এই 'নির্বাচনপ্রক্রিয়া'।

আর সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক দেখে তিনি নেতা বা গভর্নর নির্বাচন করতেন। আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তুলনামূলক এ বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ না হওয়ায় অনেককে তিনি এ পদের জন্য মনোনীত করেননি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বাহরাম জুরের পুত্র বাযান ইবনে সাসান রা.-কে মনোনীত করা। *যাদুল মাআদ* গ্রন্থে ইবনুল কাইয়িম রহ. লেখেন, 'বাযান ইবনে সাসান রা.-কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। ইসলামের ইতিহাসে ইয়ামেনের প্রথম গভর্নর এবং অনারব রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রথম ইসলামগ্রহণকারী তিনিই। বাযান রা.-এর মৃত্যুর পর তারই পুত্র শাহর ইবনে বাযান রা.-কে 'সানা'র প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। শাহর রা. নিহত হলে সাইদ ইবনুল আসের পুত্র খালেদ রা.-কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। আর কিন্দা ও সাদাফে নিয়োগ করেন মুহাজির ইবনে উমাইয়া মাখযুমি রা.-কে।[২৭]

বিশ্বনবীর যুগ থেকে বহুকাল অবধি ইসলামি সভ্যতায় দক্ষ, যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকেই শুধু নেতৃত্বের পদগুলোতে নিয়োগ করা হতো। ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর বিবরণে এ কথারই প্রমাণ মেলে। কারণ সে সময় মক্কা ও মদিনার জন্য ইয়ামেন ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রদেশ। সদকা, উশর ও ভূমিকরের প্রচুর অর্থ আসত ইয়ামেন থেকে। সেই বিবেচনায় এই ভূখণ্ডে নিযুক্ত গভর্নরকে অবশ্যই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শুল্ক উত্তোলন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নেতৃত্বপ্রার্থী বা মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে বেশ কিছু গুণ থাকা আবশ্যক বলেছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তার ভাষায়,

---

[২৭]. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মাআদ*, খ. ১, পৃ. ১২৫।

'নেতৃত্বের জন্য চারটি গুণ অবশ্যই লাগবে। এর একটিতে যদি সামান্য ঘাটতি থাকে, তবে সে নেতৃত্বের যোগ্য নয়। শর্তগুলো হলো : ন্যায়সংগত পন্থায় অর্থ উসুলের সামর্থ্য, যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয়, স্বেচ্ছাচারিতা না করে কড়াকড়ি আরোপ এবং লজ্জায় না ফেলে এমন নম্রতা অবলম্বন।'[২৮]

তা ছাড়া উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এমনি হুট করে নেতা বা গভর্নর নির্বাচন করতেন না, বরং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাকে বারবার যাচাই করতেন। নিবিড়ভাবে তার কার্যক্রম ও গতিবিধি লক্ষ করতেন। তার সম্পর্কে নিকটস্থদের জিজ্ঞেস করতেন। তার যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তবেই তাকে এ পদের জন্য মনোনীত করতেন। শর্ত জুড়ে দিতেন, মানুষের প্রয়োজন যতদিন পূরণ না হয়, ততদিন যেন তার দরজা উন্মুক্ত থাকে। যারা এ পদের প্রার্থী হতে চায়, সবসময় তিনি তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দিতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি পদ প্রার্থনা করবে, তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করা হবে না। এ কথার প্রবক্তা তিনিই প্রথম নন, বরং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি এ পদের প্রার্থনা করলে বিশ্বনবী স্পষ্ট বলে দেন, 'যে ব্যক্তি এ পদ প্রার্থনা করবে, তার দ্বারা আমরা এ কাজে সহায়তা নেব না।'[২৯]

এ পদের যোগ্য ব্যক্তিদের মাঝে দয়া ও নম্রতার গুণ থাকা জরুরি মনে করতেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। এসব গুণ না থাকলে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিতেন। একবার বহু যাচাইবাছাই করে এক ব্যক্তিকে তিনি কোনো এক এলাকার প্রশাসক হিসেবে মনোনীত করতে চাইলেন। সভায় নিয়োগপত্র লেখা হচ্ছিল। এমন সময় এক শিশু এসে উমর রা.-এর কোলে উঠে বসল। উমর রা. শিশুটিকে আদর করলেন। তা দেখে লোকটি বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, এর মতো আমার দশজন পুত্র রয়েছে। কেউ কখনো আমার কোলে উঠার সাহস করেনি। তখন উমর রা. বললেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া বিলুপ্ত করে দেন, এতে আমার কী করার আছে! যারা দয়া করে, আল্লাহ তাদের

---

[২৮]. তারতুশি, *সিরাজুল মুলুক*, পৃ. ৫০।

[২৯]. *নাসায়ি*, ৪, *ইবনে হিব্বান*, ১০৭১।

প্রতিও দয়া করেন। এরপর কাতেবকে নিয়োগপত্র ছিঁড়ে ফেলার আদেশ দিয়ে বলেন, 'যে লোক নিজের পুত্রদের দয়া দেখাতে পারে না সে জনগণের ওপর কী দয়া দেখাবে?!'[৩০]

আমরা দেখতে পাই, নেতা নির্বাচনে এরকম সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণেই তখনকার গভর্নর ও শাসকগণ ছিলেন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বহুমাত্রিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী। যার মধ্যে অন্যতম হলেন আমর ইবনুল আস রা.। মিশরের গভর্নর হিসেবে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিয়োগ করা বিশিষ্ট এই সাহাবি মাত্র তিন হাজার পাঁচশ যোদ্ধা নিয়ে মিশর অভিযানে যান।[৩১] বিজয়ের পর মিশরবাসীর জন্য তিনি বহুমুখী উন্নয়নপ্রকল্প হাতে নেন। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ কারণেই তার শাসনামলে মিশরে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জোয়ার ছিল। তিনি জনগণকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তার আমলে মানুষ ন্যায্য ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করে। এ সময় 'ফুসতাত' শহরকে তিনি উন্নত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৩২] সমুদ্রপথে হেজায পর্যন্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আনা-নেওয়া সহজ করতে উপসাগরকে লোহিত সাগর পর্যন্ত খননের প্রকল্প গ্রহণ করেন।[৩৩] সেখানে তিনি একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেন, তার নামেই এর নামকরণ করা হয়। এখনো পর্যন্ত মিশরের বুকে আমর ইবনুল আস নামের সেই মসজিদটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিযও প্রশাসক নির্বাচনে এমনই যাচাইপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। পরীক্ষা করতেন। মনের অবস্থা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য বারবার বিভিন্নভাবে তাদের পরখ করতেন। উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. খলিফা হওয়ার পর বেলাল ইবনে আবি বুরদা[৩৪] এসে তাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যে-ই খলিফা হয়েছে সে-ই

---

৩০. ইবনুল জাওযি, *তারিখু উমার*, পৃ. ১০৪-১০৫।

৩১. ইবনে আবদুল হাকাম, *ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ৬৫।

৩২. প্রাগুক্ত, ১০৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১৭৯।

৩৪. বেলাল ইবনে আবি বুরদা আমের ইবনে আবু মুসা আল আশআরি। তিনি বসরার আমির ও কাযি ছিলেন। মর্যাদাবান লোক ছিলেন। দেখুন, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৫, পৃ. ৬।

সম্মানিত হয়েছে। আপনিও এ পদকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এরপর বেলাল মসজিদবান্ধব হয়ে পড়েন। দিনরাত সেখানে পড়ে থেকে তিনি তেলাওয়াতে মশগুল থাকেন। তা দেখে উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. তাকে ইরাকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগের ইচ্ছা পোষণ করে বলেন, এই লোকটি খুব ভালো এবং এ পদের জন্য সে উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য। এরপর নিজের একজন বিশ্বস্ত লোককে তার কাছে পাঠালেন। সে তাকে বলল, তোমাকে ইরাকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করলে আমাকে তুমি কী দেবে? এ প্রস্তাব পেয়ে বেলাল তাকে প্রচুর অর্থ দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এ কথা উমরের কানে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এবং তাকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে বলেন, হে ইরাকবাসী, তোমাদের এ সঙ্গী কথা বলতে পারে ভালো, তবে তার জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট অভাব। তার ভাষার পাণ্ডিত্য প্রচুর, তবে তার নিষ্ঠায় ঘাটতি অনেক।[৩৫]

জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাদের মাঝে ন্যায়-ইনসাফের শাসন কায়েম করতে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পাদনের সময় অধিকাংশ খলিফা গভর্নরদের উপদেশ দিতেন। খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার ভাই আবদুল আযিযকে মিশরের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর সময় উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

> সুখ ও সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দাও। সহযোগীদের প্রতি নম্র হও। সকল কাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখো। কারণ সৌহার্দ্যের মাধ্যমেই লক্ষ্য অর্জিত হয়। তোমার সহযোগীরা যেন হয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। কারণ তারাই তোমার অবয়ব ও বাহ্যিক রূপ। তোমার দরবারে আগতদের তুমি ভালো করে দেখে নিয়ো। যেন তুমি নিজেই তাকে নিয়োগ বা বিয়োগ করতে পারো। মজলিস শেষ করে সবাইকে সালাম দিয়ো, তাহলে তারা তোমার প্রতি সদয় হবে এবং তাদের অন্তরে তোমার প্রতি আস্থা ও ভালোবাসার জায়গা তৈরি হবে। কোনো সমস্যা বা জটিলতা তৈরি হলে তাদের সঙ্গে পরামর্শে বসো। কারণ পরামর্শের মাধ্যমে জটিল ও কঠিন

---

৩৫. ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ১০, পৃ. ৫১০।

বিষয়গুলো সহজ হয়ে যায়। কারও ওপর অসন্তুষ্ট হলে একটু বিলম্বে শাস্তি দিয়ো। কারণ হুট করে দণ্ড বাস্তবায়ন করে ফেললে কোনো কারণে সিদ্ধান্ত মুলতবি হলে তখন আর কিছুই করার থাকবে না।[৩৬]

এই ছিল মিশরের জন্য নবনিযুক্ত গভর্নরের উদ্দেশে খলিফা আবদুল মালিকের উপদেশবাণী। এতে যেকোনো গভর্নরের জন্য প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনের প্রধান প্রধান মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত আছে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, গভর্নর ও প্রশাসক নিবাচনে ইসলামি সভ্যতা এরকম হাজারও সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। পূর্ববর্তীকালের মুসলিম শাসকদের স্থাপন করা এসব উদাহরণ বিশ্বমানবতার কল্যাণে ইসলামি সভ্যতার অনন্য অবদানের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

---

৩৬. ইবনুত তিকতাকি, *আল-ফাখরিয়্যু ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যা ওয়াদ-দুওয়ালিল ইসলামিয়্যা*, ১২৬।
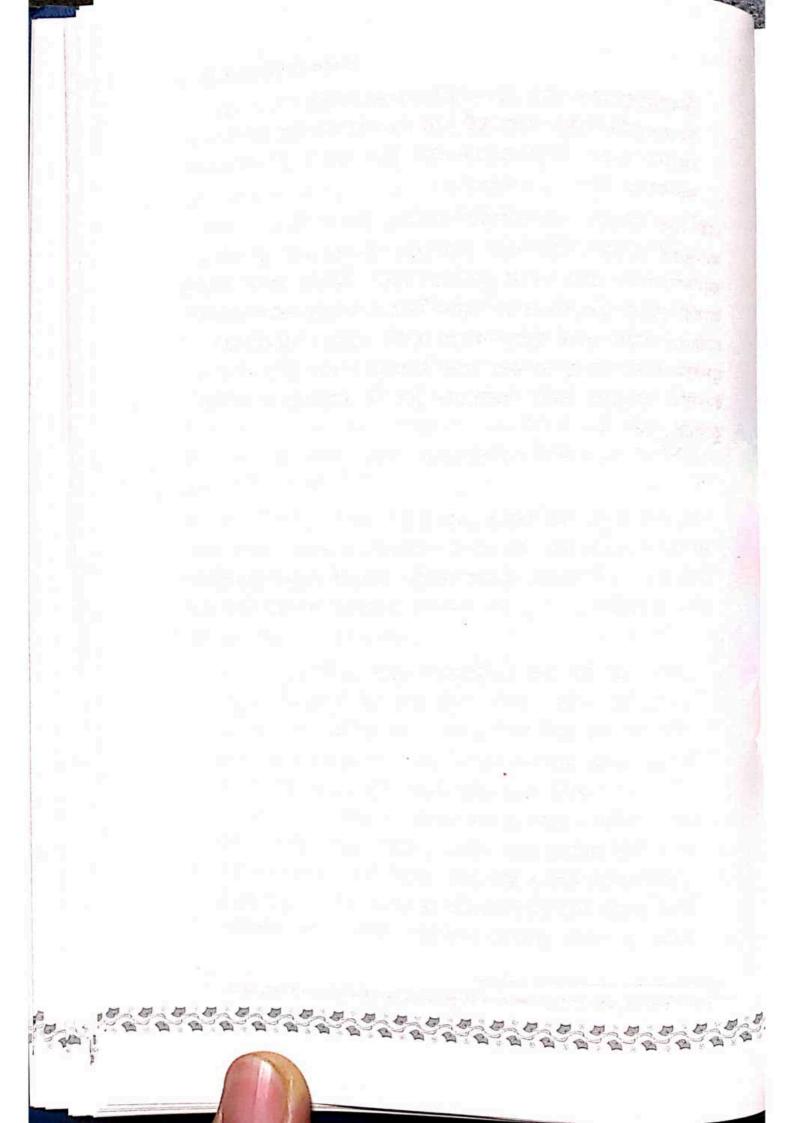
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বাইআত (তথা খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার)

বিশ্বমানবতার কল্যাণে কাজ করা সকল সভ্যতার মধ্যে ইসলামি সভ্যতা এক অনন্য আসন তৈরি করেছে। সকল ধর্মের জন্য ইসলামি সভ্যতার চমৎকার ও উল্লেখযোগ্য অবদানগুলোর একটি হচ্ছে বাইআত (খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার) ব্যবস্থা। লক্ষণীয় বিষয়, এর আগে কোনো সভ্যতায় বাইআত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। বাইআতের অর্থ যদি হয় আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার, অপর দিকে এর অর্থ হলো, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যদিও ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর পরিমাণ খুব সামান্যই দেখা যায়। তারপরও এটি ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য।

'বাইআত' মানে প্রশাসকের বিধিনিষেধ মানা এবং তার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারনামা। সেই কার্যক্রমের মূল হলো আল্লাহর শরিয়ত অনুযায়ী দ্বীন ও দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা। পাঠক জেনে অবাক হবেন, বাইআতের বেলায় ইসলাম নারী-পুরুষ বা বড়-ছোটর মাঝে কোনো তারতম্য করেনি। এটিই জনগণের মধ্যে সাম্য ও ভারসাম্য তৈরি করার অন্যতম উপাদান। কারণ, দেশ ও সমাজের উন্নয়নে সকল শ্রেণির অবাধ অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম।

ইসলামি সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই আলো ছড়িয়েছে বাইআত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সাহাবিগণ একাধিকবার বাইআত গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার বাইআত, বাইআতুর রিদওয়ান, বিশ্বনবীর হাতে তায়েফবাসীর বাইআত গ্রহণ ইত্যাদি। এ ছাড়াও ছোট-বড় বহু দল তার কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিল। আল্লাহর রাসুলের হাতে বাইআত গ্রহণ করা পুরুষদের সংখ্যা অগণিত। তেমনই মহিলাদের মধ্যেও বিরাট সংখ্যক আল্লাহর রাসুলের

হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত। ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. রাসুলের হাতে বাইআত গ্রহণকারী নারীর সংখ্যা ৪৫৭ উল্লেখ করেছেন। তবে তারা সবাই মুসাফাহার মাধ্যমে নয়, মৌখিকভাবে বাইআত গ্রহণ করেন। এমনকি আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের পর্যন্ত বাইআত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের বাইআত গ্রহণকালে তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর।[৩৭]

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইসলামি সভ্যতা এক পরিপূর্ণ ও সফল সভ্যতা। এক জীবন্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা। যা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে। আশপাশে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনায় তার সুষ্ঠু অংশগ্রহণে জোর তাগিদ দেয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাজনৈতিক আদর্শ থেকেও এর প্রমাণ মেলে। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই তিনি বাইআতের রীতি প্রচলন করেন। কুরআনুল কারিমের একাধিক স্থানেও আমরা বাইআতের উল্লেখ পাই। এখান থেকেই ইসলামি সভ্যতায় বাইআতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সুরা ফাতহ-এ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো মূলত আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ করে। তাদের হাতের ওপর রয়েছে আল্লাহর হাত।[৩৮]

একই সুরায় অন্যত্র বলেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। তাদের অন্তরে যা ছিল আল্লাহ সে

---

৩৭. কাত্তানি, *আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ২২২।

৩৮. সুরা ফাতহ : ১০।

সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।[৩৯]

ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণে নারীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব বোঝাতে আল-কুরআনে নারীদের প্রতিও বাইআত গ্রহণের নির্দেশ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ﴾

তাদের (নারীদের) বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[৪০]

বিশ্বনবীর পরিপূর্ণ অনুকরণ নিশ্চিত করতে মুসলিমগণ পরবর্তীকালে বাইআতকে রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নেতা নির্বাচনে জনগণের সুষ্ঠু অংশগ্রহণের অন্যতম উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেন।

সম্মিলিত পরামর্শ ছাড়া একজনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। হজের সময় একবার এ বিষয়টি তার কানে গেলে মুসলিমবিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত হাজিদের উদ্দেশে খলিফা নির্বাচনের শর্ত এবং বাইআত ও শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত একটি ভাষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। তখন কেউ কেউ বললেন, হজের মৌসুমে তো বিভিন্ন ধরনের মানুষের সমাগম হয়। তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা আরবি ভাষা ঠিকমতো বোঝে না। ফলে তারা বিষয়টি ভালোভাবে না বুঝেই তাদের দেশে ফিরে যাবে এবং এতে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। তারচেয়ে ভালো হবে আপনি বিষয়টি মুলতবি রেখে মদিনায় ফেরার পর জ্ঞানী-গুনী ও বুদ্ধিমানদের সামনে এ নিয়ে কথা বললে। উমর রা. তাই করলেন। আল্লাহর রাসুলের মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আপনাদের মাঝে অনেকে বলেন, আল্লাহর শপথ, উমরের ইনতেকাল হয়ে গেলে আমি অমুকের হাতে বাইআত গ্রহণ করব। ভালো করে শুনে রাখো, আবু বকরের বাইআত গ্রহণটি ছিল একটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ত্বরিত শপথ গ্রহণ মাত্র—এ কথা বলে কেউ যেন

---

৩৯. সুরা ফাতহ : ১৮।

৪০. সুরা মুমতাহিনা : ১২।

প্রতারিত না হয়। হ্যাঁ, সেটি এরকমই ছিল। তবে এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আবু বকরের মতো গুরুজন এমন কেউ নেই এখন, যার দিকে মানুষ ঘাড় উঁচু করে দেখে। মুসলিমদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছাড়া যার হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে, বাইআতগ্রহীতা ও বাইআতকারী উভয়েই হত্যার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।[৪১] এরপর তিনি আবু বকর রা.-এর শপথ গ্রহণের বিষয়টি টেনে তখনকার পরিস্থিতির কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ত্বরিত বাইআত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কার বিষয়টি তিনি মানুষের কাছে পরিষ্কার করেন। আর আবু বকর রা.-এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কোনো মুসলিমের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। পক্ষান্তরে উমর রা.-এর বাইআত গ্রহণের বিষয়টিও ছিল বড় মাপের একদল সাহাবির সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ফসল। পরবর্তীকালে তা ইজমায়ে উম্মত হিসেবে গণ্য হয়। এ থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার যে, বাইআত বা শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়া অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হবে। মনোনীত ও বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও আলেমদের পরামর্শের মাধ্যমেই নেতা নির্বাচন সম্পন্ন হবে।[৪২]

উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর মতো অনেক খলিফা বাইআতের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। যদিও তিনি চাচাতো ভাই সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক কর্তৃক পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নির্ধারিত চুক্তিপত্রের সিদ্ধান্তের ওপর সাধারণ মুসলিমগণ সুলাইমানের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তারপরও জনগণের পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণের ওপর তিনি জোর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন, জনগণ যদি সন্তুষ্টচিত্তে তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়, তবেই তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে এমন সংবাদ শোনার পর উমর ইবনে আবদুল আযিযের দেওয়া প্রথম ভাষণেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। সেই ভাষণে তিনি বলেন, হে লোকসকল, এ পদের প্রতি সামান্য চাহিদা বা লোভ আমার ছিল না, তারপরও আমার ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিমদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছাড়াই। তাই আমার হাতে বাইআতের যে

---

[৪১]. ইবনে তাইমিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, খ. ৫, পৃ. ৩৩০-৩৩১।
[৪২]. মুহাম্মাদ রশিদ রেজা, *আল-খিলাফা*, পৃ. ২০-২১।

দায়িত্ব আপনাদের ঘাড়ে ছিল, তা থেকে আপনাদের মুক্ত ঘোষণা করছি। এখন আপনারাই আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী খলিফা নির্বাচন করুন। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, আমরা আপনাকেই নির্বাচন করেছি হে আমিরুল মুমিনিন। আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই আপনিও সন্তুষ্টচিত্তে কল্যাণের জন্য আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।[৪৩] এ ঘটনাটিতে উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ-এর দুনিয়াবিমুখতা প্রকাশের পাশাপাশি ইসলামি সভ্যতার ধারকবাহকদের চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং যোগ্য নেতা নির্বাচনে তাদের পরিপক্বতার বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে মুসলিম স্কলারগণ বাইআত গ্রহণের জন্য অপরিহার্য পাঁচটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। সেগুলো হলো:

১। যার হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে ইমামতের জন্য প্রযোজ্য সকল শর্তের উপস্থিতি থাকতে হবে। খিলাফত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

২। বাইআত ব্যবস্থাপক ব্যক্তিকে অবশ্যই বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলার বা নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের হতে হবে। যার কথা সবাই অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেবে।

৩। যার হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে, বাইআতের প্রতি তার ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে এবং বাইআত পরবর্তী দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে তাকে পুরো প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি সে বাইআত করতে অনীহা প্রকাশ করে তাহলে জোরপূর্বক তাকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

৪। বাইআত গ্রহণকারী একজন হলে সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হবে। তবে সংঘবদ্ধভাবে হলে সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

৫। যার হাতে বাইআত গ্রহণ করা হবে, তিনি হবেন একজন। একাধিক ব্যক্তির হাতে বাইআত গ্রহণ করা যাবে না।[৪৪]

কোনো সন্দেহ নেই, মুসলিম স্কলারদের প্রণীত ও স্বীকৃত এসব শর্ত ইসলামি শাসনব্যবস্থার উন্নত নিদর্শন এবং ইসলামি সভ্যতার অনন্য

---

[৪৩]. আজুররি, *আখবারু আবি হাফস উমার ইবনে আবদুল আযিয*, পৃ. ৫৬; ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ৪৫, পৃ. ৩৫৭।

[৪৪]. আজুররি, *আখবারু আবি হাফস উমার ইবনে আবদুল আযিয*, পৃ. ৫৬; ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ৪৫, পৃ. ৩৫৭।

অবদান। কারণ এসব শর্ত ও বিধি প্রণয়নের একমাত্র লক্ষ্য একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কল্যাণের বিষয় সংযুক্ত করা।

বাইআত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খিলাফত গ্রহণের অন্যতম মৌলিক শর্ত হওয়ায় ইসলামি সভ্যতার পুরো ইতিহাসেই আমরা বাইআতের প্রতিফলন দেখতে পাই। এমনকি খিলাফতের পর্ব যখন একেবারে দুর্বল ও অন্তিম মুহূর্তে, তখনও ইসলামি খলিফাগণ এ বাইআতকে কতটুকু গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন সে ঘটনাগুলোও আমাদের জানা। সেলজুক শাসনামলেও মুসলিমগণ বাইআত গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি ৪৮৫ হিজরিতে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান দামিগানি নবনিযুক্ত খলিফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। বাইআতের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শুরুতেই খলিফা মুস্তারশিদ বিল্লাহ রাষ্ট্রের বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলারদের বাইআত গ্রহণে এবং তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে মনোযোগ দেন। তৎকালীন বাগদাদের বিজ্ঞ স্কলার এবং হাম্বলি মাযহাবের বিদগ্ধ আলেম আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল রহ. বলেন, মুস্তারশিদ বিল্লাহ খলিফা হওয়ার পর তিনজন সরকারি কর্মচারী আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন, আমিরুল মুমিনিন আপনাকে তলব করেছেন। এরপর রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি প্রধান বিচারপতি তার সামনে দাঁড়ানো। তিনি আমাকে বললেন, তিনিই আমিরুল মুমিনিন (তিনবার)। তখন আমি বললাম, তাহলে এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের ও জনগণের ওপর আল্লাহর পরম কৃপা। এরপর আমি হাত বাড়িয়ে দিই। তিনিও নিজ হাত প্রসারিত করে সাড়া দেন। আমি সালাম দিয়ে মুসাফাহা করি। এরপর বাইআত গ্রহণ করে বলি, আমি কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসুল এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের ওপর আমিরুল মুমিনিন মুস্তারশিদ বিল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম। আশা করছি, তিনি নিজ সাধ্যমতো কুরআন-সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকবেন। এ ব্যাপারে আমি তার আনুগত্য প্রকাশ করলাম।[৪৫]

নববি যুগ থেকে চলে আসা এ অনুপম রীতি ও সুমহান ঐতিহ্যের মাধ্যমে নতুন খলিফা নির্বাচনে প্রজা বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রমাণ

---

৪৫. কালকাশান্দি, *মাআসিরুল ইনাফা*, খ. ১, পৃ. ১৭৬।

পাওয়া যায়। কোনো সন্দেহ নেই, এসব ঘটনা ইসলামি সভ্যতার অনন্য কীর্তি ও অসামান্য অবদান, যা মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা দেয়। এভাবেই একজন খলিফা, বিচারক থেকে শুরু করে ইসলামি স্কলার, আলেম, ফকিহসহ সর্বস্তরের মানুষের পক্ষ থেকে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে রাষ্ট্রপ্রধানের আসন অলংকৃত করেন।

ইসলামি সভ্যতায় সবসময় বাইআত ছিল একটি সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের মতো। নবনিযুক্ত প্রার্থী থেকে শুরু করে এমনকি পদত্যাগকারী সকলেই নিজেদের জন্য এবং তাদের যোগ্য পুত্র, ছোট-বড় সকলের জন্য জনগণের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু বাইআত গ্রহণে সমান গুরুত্বারোপ করতেন। এ অনুপম রীতি শুধু একটি ইসলামি রাষ্ট্রেই নয়, তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে এমনকি স্পেনেও বিরাজমান ছিল। মরক্কোয় প্রতিষ্ঠিত ইদরিসীয় সাম্রাজ্যের আমির ইদরিস ইবনে ইদরিস ইবনে আবদুল্লাহ মাত্র এগারো বছর বয়সে জনগণের পক্ষ থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাস্তবেও তিনি ছিলেন দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য, স্পষ্টভাষী ও দুরন্ত সাহসী। মিম্বারে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, সকল বন্দনা আল্লাহর। তাঁরই প্রশংসা করছি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁরই ওপর ভরসা করছি। নিজের ও সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আমি তাঁরই আশ্রয় চাচ্ছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। জিন ও ইনসানের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে তিনি আগত। আল্লাহর ইচ্ছায় আল্লাহর দিকে তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। তিনি সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গের প্রতি রহম করুন। তাঁর পরিবারকে আল্লাহ সকল অনিষ্ট ও অপবাদ থেকে সুরক্ষা দান করেছেন এবং তাদের পূত-পবিত্র করেছেন। হে লোকসকল, এ পদে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর সকলেই জানেন, এ পদের কেউ ভালো কাজ করলে তার প্রতিদান সে বহুগুণ বেশি পাবে। তেমনই মন্দ কাজ করলে শাস্তিও তার দ্বিগুণ হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এর জন্য সঠিক লক্ষ্যেই আছি। তাই অন্য কারও প্রতি আপনারা মনোনিবেশ করবেন না। কারণ ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন আপনারা লালন করেন, তা আমাদের মাঝেই পাবেন। এরপর তিনি মানুষকে বাইআতের আহ্বান

জানান। সকল স্তরের মানুষকে আনুগত্যের স্বীকৃতি দিতে উৎসাহ দেন। মানুষ তার স্পষ্টবাদিতা ও কৈশোরের এ অসামান্য দূরদর্শিতা দেখে অভিভূত হয়ে যায়। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এলে মানুষ তার হাতে বাইআত গ্রহণের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার হস্তচুম্বন করতে ভিড় করে। এরপর তিনি মরক্কোর যানাতা, আওরাবা, সানহাজা, গামারাসহ সকল বারবারীয় জাতি-গোষ্ঠীর বাইআত গ্রহণ করেন। এভাবেই তাঁর বাইআত প্রক্রিয়াটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।[৪৬]

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, ইসলামি সভ্যতায় বাইআত ছিল মানবতার প্রতি এক অসামান্য অবদান। যার ফলে সমাজের ছোট-বড়, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ সবার ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল এই মহান ব্যবস্থা। কোনো সন্দেহ নেই সাম্প্রতিক পশ্চিমা সভ্যতার চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে ছিল ইসলামি সভ্যতা। পাশ্চাত্যের অধুনা সভ্যতা শুধু ব্যক্তিবিশেষের শর্তসাপেক্ষে স্বাধীনতা দিয়েছে। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে (১২১৫ খ্রি.) কিং জন ব্রিটেনের সাম্রাজ্যাধিপতি হওয়ার পর 'অ্যারিস্টোক্রেসি' নামে মানবতার প্রতি মূল্যবোধ প্রদর্শনের যে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়,[৪৭] তা ছিল শুধুই নির্দিষ্ট কিছু লোক এবং একটি গোষ্ঠীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ, গোটা মানবতার নয়। অনেকে এই ঘটনাকে ব্রিটিশ প্রশাসনের দৃষ্টিতে গণস্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জনে একটি মাইলফলক হিসেবে মনে করেন। বরং কেউ কেউ খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে অবশেষে মানবতার মূল্যবোধের স্বীকৃতি প্রদান সম্ভব হয়েছে বলে গর্ববোধ করে এটিকে অভূতপূর্ব সাফল্য হিসেবে অভিহিত করেন। অথচ ইসলামি সভ্যতা কখনো মানুষের মাঝে বৈষম্য তৈরি করেনি। নেতা বা প্রশাসক নির্বাচনেও জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রচলন করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ধনী-গরিব সকলের সুষ্ঠু অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে ইসলামি সভ্যতা।

---

[৪৬]. আহমাদ ইবনে খালেদ আন-নাসিরি, *আল-ইসতিকসাউ লি-আখবারি দুওয়ালি মাগরিবিল আকসা*, খ. ১, পৃ. ২১৮।

[৪৭]. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৬, পৃ. ২৭৪-২৭৫।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

পরবর্তী খলিফা নির্বাচন

পরবর্তী খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়া ইসলামি রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। সূচনালগ্নে ইসলামি বিশ্ব যেরকম দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, একের পর এক দেশ বিজয়, নতুন নতুন সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ঘটছিল, নানা বর্ণের নানা জাতের নানা ভাষার মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল, তখন বাস্তবেই যোগ্য নেতৃত্ব গঠনের স্বার্থে এরকম নতুন ও আধুনিক ব্যবস্থা প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল।

'অলিয়ে আহদ' হলেন সেই ব্যক্তি, যাকে বর্তমান খলিফা বা শাসক তার মৃত্যুর পর শাসক হিসেবে নিযুক্ত করবেন। এরকম মনোনীত ব্যক্তি একজনও হতে পারেন, ক্রমান্বয়ে একাধিকও হতে পারেন। খলিফা কর্তৃক তার কোনো পুত্র অথবা পিতাকে পরবর্তী শাসক হিসেবে ঘোষণা করা অনেক ফিকহি মাযহাবেও স্বীকৃত। কারণ বর্তমান খলিফা হলেন আমিরুল মুমিনিন। তার আনুগত্য জনগণের ওপর ফরয। তিনি নিজে কাউকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করলে অন্য কারও এখানে দ্বিমত করার অবকাশ থাকবে না। তার রেখে যাওয়া আমানতের ব্যাপারে কোনোপ্রকার অপবাদের সুযোগ থাকবে না। বিরুদ্ধাচরণ করার উপায় থাকবে না।[৪৮]

ولاية العهد বা পরবর্তী খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক হলেন খলিফা মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. (মৃ. ৬০ হি.)। এটি ছিল তার 'ইজতিহাদি' উদ্ভাবন। এর পেছনে কারণও ছিল যথেষ্ট। কেননা পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত না করে গেলে রাষ্ট্রে গোলযোগ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ভয় ছিল যে, বিরোধিতার মুখে পড়তে পারে গোটা রাষ্ট্র, পরবর্তী সময়ে যা পুরো মুসলিমজাতির জন্য সর্বনাশ ডেকে

---

৪৮. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১৩।

আনতে পারে। কারণ তখন শামের অধিবাসী মুসলিম জনগোষ্ঠীই ছিলেন রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড এবং তারা ছিলেন খলিফা মুআবিয়া এবং তার পুত্র ইয়াযিদের সমর্থক।[৪৯]

বাস্তবতা হলো, পুত্র ইয়াযিদের বাইআতের জন্য মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান সকল অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। শুধু তিনজন সাহাবি ও সাহাবিপুত্র এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৫০] তবে এ ব্যাপারে তিনি ইজমায়ে উম্মত (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) অর্জনে সক্ষম হন। এর পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল উম্মতকে বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা। আর এটাই ছিল তার কাছে সবকিছু থেকে অগ্রগণ্য।

যদিও মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর হাতে ولاية العهد বা পরবর্তী খলিফা নির্বাচনব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়, তবে সেখানেও নতুন শাসকের জন্য বাইআত ব্যবস্থা বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জনের প্রক্রিয়া স্বমহিমায় বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই মুআবিয়া থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল উমাইয়া খলিফা শাসনকর্তার জন্য উন্নত চরিত্র ও অপরিহার্য সকল গুণের উপস্থিতিকে তারা জরুরি মনে করতেন। যাদের মাঝে এসব গুণ ও শর্ত অনুপস্থিত থাকত, তাদেরকে এড়িয়ে যেতেন। গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদানে তাদের বারণ করতেন। তাদের কাছে বাইআত গ্রহণ করতে মানুষও অনীহা প্রকাশ করত। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, খলিফা বা শাসকের মাঝে কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক, সেগুলো মুআবিয়া রা. আগেই সবিস্তারে বর্ণনা করে গেছেন। যেমন সত্যবাদিতা, বদান্যতা, সহনশীলতা, নিষ্কলুষতা, বীরত্ব।[৫১] পাশাপাশি সহিষ্ণুতা ও দানশীলতার গুণ থাকাও অপরিহার্য বলে মনে করতেন। কারণ সহিষ্ণুতা বিরোধিতা থেকে রক্ষা করবে। ঐক্যের পথ সুগম করবে। এ কারণেই তিনি ইয়াযিদকে বলতেন; পুত্র আমার! সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলে কখনো অনুশোচনায় পড়তে হবে না তোমাকে।[৫২]

---

[৪৯]. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৪৪৫।

[৫০]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ২৪৮। তারা হলেন, হুসাইন ইবনে আলি, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা.।

[৫১]. নুওয়াইরি, *নিহায়াতুল আরাব*, খ. ৬, পৃ. ৪।

[৫২]. ইবনুত তিকতাকি, *আল-ফাখারিয়্যু ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১০৫।

বড় পুত্রকেই পরবর্তী শাসক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে এমন কোনো লিখিত নিয়ম ছিল না। তবে খলিফাগণ পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকেই পরবর্তী খলিফার পদের জন্য মনোনীত করতেন। আবার কখনো রাজপরিবারের বাইরের লোককেও পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দিতেন।

যাই হোক, সকল খলিফাই ইসলামের মৌলিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল ছিলেন। ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়াই প্রথম তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনা করেন। যে অভিযানের ব্যাপারে স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন। সেই অভিযানে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের তিনি প্রশংসা করে বলেছেন,

«أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَهُمْ»

রোমসম্রাটের শহর অভিযানকারী আমার উম্মতের প্রথম সেনাবহর আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত।[৫৩]

এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একজন খলিফা হলেন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান। তিনি উমাইয়া খিলাফত সাম্রাজ্যে দীর্ঘ ৬৫ হি. থেকে ৮৬ হি. পর্যন্ত শাসন করেন। ইসলামি রাষ্ট্র তার আমলে বিশাল বিস্তৃতি লাভ করে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম। তার আমলে যথাক্রমে মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক[৫৪] চীন বিজয় করেন। কুতাইবা ইবনে মুসলিম আল-বাহেলি[৫৫] সমরকন্দ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো বিজয় করেন। মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম হিন্দুস্তান বিজয় করেন। মুসা ইবনে নুসাইর[৫৬]

---

৫৩. *বুখারি* : কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : মা কি-লা ফি কিতালির রুম, ২৭৬৬।

৫৪. মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক (৬৬ হি.-১২০ হি./৬৮৫ খ্রি.-৭৩৮ খ্রি.)। তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা দামেশকে। যুদ্ধবিষয়ক অনেক ঘটনা তার থেকে বর্ণিত রয়েছে। দেখুন, *তাহযিবুল কামাল*, খ. ২৭, পৃ. ৫২৩।

৫৫. কিংবদন্তি সেনানায়ক, সুমহান বীরপুরুষ তিনি। খাওয়ারিজম ও বুখারার মতো এলাকাগুলো তার হাতেই বিজিত হয়। এরপর ফারগানা ও তুর্কি দেশসমূহও মুসলিমদের করতলগত করেন তিনি। দেখুন, ইমাম যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪১০।

৫৬. ৯৭ হিজরিতে ইনতেকাল করা এ সেনানায়কের বেড়ে ওঠা দামেশকে। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ৮৮ হিজরিতে তাকে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর হিসেবে মনোনীত করেন। তারেক ইবনে যিয়াদের সঙ্গে মাত্র এক বছরের কম সময়ের মধ্যে তিনি স্পেন বিজয় সম্পন্ন

প্রথমে উত্তর আফ্রিকা ও পরে আন্দালুস বিজয় করেন। শুনে অবাক হতে হয়, উমাইয়া শাসনামলেই ইসলামের এত সব বিজয় সম্পন্ন হয়। ফলে এসব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দ্রুত ইসলামি সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।[৫৭]

৯৯ হিজরিতে ইনতেকাল করা খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর ইবনে আবদুল আযিযের (মৃ. ১০১ হি.) নাম ঘোষণা করেন। অথচ তখন পরবর্তী খলিফা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার ভাই হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের (মৃ. ১২৬ হি.)।[৫৮] এ থেকেই বোঝা যায়, পরবর্তী খলিফা নির্বাচন নিজ পরিবার বা আপনজন থেকেই করতে হবে এরকম কোনো লিখিত নিয়ম ছিল না।

সেরকমই আরেকটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই আবদুর রহমান ইবনে মুআবিয়া আদ-দাখিলের (মৃ. ১৭২ হি.) ঘটনা থেকে। তার দুই পুত্র হিশাম ও সুলাইমান উভয়েই ছিলেন খলিফা হওয়ার যোগ্য আর সুলাইমান ভাইদের মধ্যে বড় ছিল। তৃতীয় পুত্র ও তাদের আরেক ভাই আবদুল্লাহকে তাদের মধ্যে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণে সালিস নির্ধারণ করেন। খলিফা আবদুর রহমান ছিলেন তখন মৃত্যুশয্যায়। পুত্র হিশাম তখন মারদা[৫৯] অঞ্চলের গভর্নর। অপর পুত্র সুলাইমান টলেডো[৬০] অঞ্চলের প্রশাসক। অন্তিম মুহূর্তে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন, তোমার দুই ভাইয়ের মধ্যে যে তোমার কাছে আগে এসে পৌছবে, তার হাতেই তুমি আংটি (সিল) ও নেতৃত্ব তুলে দেবে। হিশাম যদি আগে আসে তবে সে ধার্মিকতা ও সচ্চরিত্রে অতুলনীয়। সকলেই তাকে একবাক্যে মেনে নেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর যদি সুলাইমান আগে আসে, তবে বয়সের দিক থেকে পরিণত হওয়ায় এবং শামবাসীদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ায় সেও যথেষ্ট উপযুক্ত। এরপর সুলাইমানের আগে ছোট পুত্র হিশাম এসে কর্ডোভার নিকটবর্তী রাসাফায় অবতরণ করেন। ছোট ভাই আবদুল্লাহ কর্ডোভায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে

করেন। তার ইনতেকাল হয় মদিনায়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৪৯৬; ইবনে খাল্লিকান, *ওফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ৩১৮।

৫৭. ইউসুফ আল কারযাবি, *তারিখুনাল মুফতারা আলাইহি*, পৃ. ৮২।

৫৮. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৭৪।

৫৯. ফিলিস্তিনের একটি শহর।

৬০. স্পেনের একটি প্রাচীন শহর।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তার ব্যাপারে হিশাম যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলেন; কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবদুল্লাহ তার ভাই হিশামের কাছে ছুটে যান। পিতার ওসিয়তমতো হিশামের হাতে খিলাফত ও আংটি হস্তান্তর করে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন।[৬১]

এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, স্পেনের খলিফা আবদুর রহমান আদ-দাখিল তার পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি জানতেন, তার পুত্রদের মধ্যে পরবর্তী খলিফা হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে হিশাম। কারণ খোদাভীতি, দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে তার পারদর্শিতাসহ খলিফা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্তই তার মাঝে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তারপরও নিজ পুত্রদের মাঝে সংঘাত তৈরি হোক, খিলাফত নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হোক, এটা তিনি চাননি। কারণ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বড় ছেলে সুলাইমানই পরবর্তী পদের অধিকারী হওয়ার কথা; কিন্তু সেই সংঘাত এড়াতে সুকৌশলে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্ডোভায় যে আগে পৌঁছবে তার হাতেই খিলাফতের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে বলে পুত্র আবদুল্লাহকে ওসিয়ত করেন। এরপর আবদুর রহমান আদ-দাখিলের অনুমান সত্যি হয়। পুত্র হিশামই কর্ডোভায় আগে পৌঁছে যান। আর তিনিই ছিলেন পরবর্তী খলিফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।

কোনো সন্দেহ নেই, পরবর্তী খলিফা নির্বাচনব্যবস্থাটি ইসলামি সভ্যতায় একটি সুসংগঠিত ও বাস্তবিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামি ভূখণ্ড যতই বিস্তৃত হয়েছে, ততই সেটি আরও জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় সুফল ছিল উম্মত বা জাতি হিসেবে মুসলিমদের একতা সুরক্ষা, যা ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় খিলাফতের পতনের আগ পর্যন্ত গোটা মুসলিমবিশ্বে বিদ্যমান ছিল।

---

৬১. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, খ. ২, পৃ. ৬১।
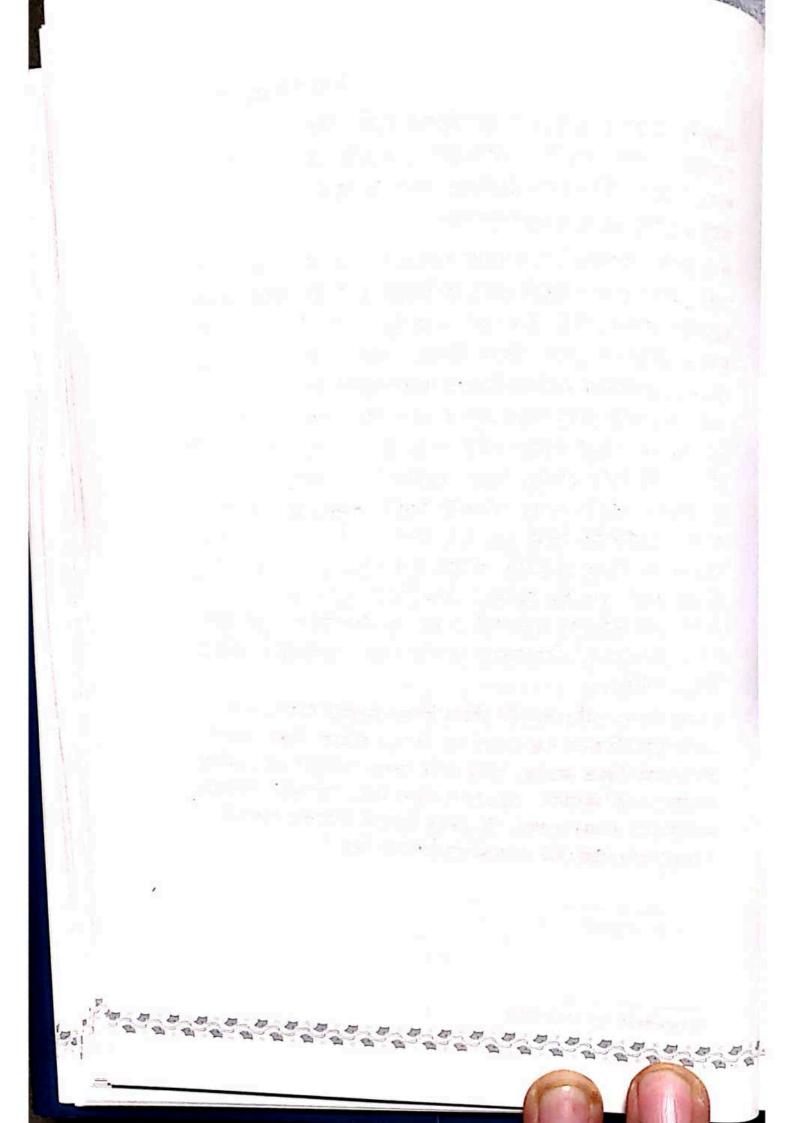
পঞ্চম অনুচ্ছেদ

জনগণের সঙ্গে শাসকদের সম্পর্ক

ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি কারণ হলো তা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে পেরেছে যে, তাদের ও শাসক শ্রেণির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং শাসকবর্গ তাদের সেবক ও হিতৈষী। একজন শাসক সচ্ছলতা ও বিপদের মুহূর্তে জনগণের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক অটুট রাখবেন সেই মহান শিক্ষা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন। মদিনায় হিজরতের পর ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে 'মসজিদে নববি' নির্মাণের কাজে তিনি সাহাবিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। সেই ঘটনার জীবন্ত বর্ণনা উরওয়া রা.-এর বিবৃতিতে উঠে এসেছে। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবিদের সঙ্গে ইট বহনের কাজে অংশ নেন। ইট বহনের সময় তিনি বলছিলেন,

«هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرَ، هٰذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ»

> আজকের এই ইট বহনের কাজটি খাইবার অঞ্চলের সাধারণ ইট বহনের মতো কোনো কাজ নয়। বরং এটি আমাদের মহান প্রতিপালকের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও পবিত্র একটি কাজ।

তিনি আরও বলছিলেন,

«اللّٰهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ، فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ»

> হে আল্লাহ, আখেরাতের পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ ও বড় পুরস্কার। তাই আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার দয়া অব্যাহত রাখুন।[৬২]

---

[৬২]. *বুখারি*, ৪১৮; *মুসলিম*, ৫২৪।

কঠিন বিপদের মুহূর্তেও সাথিদের সঙ্গে থেকে তিনি তাদের মনোবল বাড়ানোর কাজ করেন। তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন। খন্দক যুদ্ধে তিনি নিজে খননকাজে অংশ নেন। তখন তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল ইবনে রাওয়াহার রচিত বিখ্যাত কাব্যমালা। তিনি মাটি অপসারণের কাজ করছিলেন। এমনকি কাজের চাপে তার পেটের সাদা অংশ মাটিতে লেপটে যায়।[৬৩] এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও নিরহংকারী চরিত্রের প্রভাব পড়ে সাহাবিদের মাঝে। যা ওই যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে তাদের ভেতর টনিকের মতো কাজ করে। তাদের সাহস ও মনোবল বাড়াতে তা বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে শত্রুদের পৌছার আগেই তারা সবরকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন আদর্শ সেনাপতি, জনগণের বিপদের সময় যিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়ে তাদের সঙ্গে একই সারিতে কাজ করে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

বিশ্বনবীর পর তাঁর প্রতিনিধি হওয়া খুলাফায়ে রাশেদিনের মাঝেও আমরা সেই আদর্শ ও চরিত্রের প্রতিবিম্ব লক্ষ করি। বিশ্বনবীর তখন ইনতেকাল হয়ে গেছে। মুসলিমদের শাসক তখন আবু বকর রা.। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ভাষায়, মদিনার উপকণ্ঠে বাস করত এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, সেই অন্ধ বৃদ্ধার জন্য আমি পানির ব্যবস্থা করব। তার প্রয়োজন পূরণ করব। সেজন্য যখনই আমি তার কাছে আসতাম, দেখতাম আমার আগে কে যেন তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে চলে গেছেন। প্রতিদিন আমার আগে কে এসে এই বৃদ্ধার প্রয়োজন পূরণ করে দেন তা দেখার জন্য একদিন আমি আগেভাগে এসে পাশের এক জায়গায় আত্মগোপন করে রইলাম। দেখি আবু বকর এসে বৃদ্ধার প্রয়োজন পূরণ করছেন। আর আবু বকর তখন আমিরুল মুমিনিন। তা দেখে উমর বলে উঠলেন, খোদার কসম! আপনিই তাহলে সেই লোক।[৬৪]

জনগণের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তারা ছিলেন সদা তৎপর। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও সাধারণ মানুষের প্রতি যত্ন ও তাদের

---

[৬৩]. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৪৯৫। ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৩০৬; সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ২, পৃ. ৩৩৬।

[৬৪]. সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, খ. ১, পৃ. ৭৪।

কল্যাণের জন্য শাসকদের কী পরিমাণ মনোযোগ ছিল, নোমান ইবনে মুকরিন রা.-এর প্রতি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর লেখা চিঠি থেকে এর প্রমাণ মেলে। চিঠির ভাষা ছিল এমন :

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটি আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনিন উমরের পক্ষ থেকে নোমান ইবনে মুকরিনের প্রতি। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা শোনাচ্ছি। যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। পরকথা এই, নিহাওয়ান্দ শহরে বেশ কিছু অনারব জাতি-গোষ্ঠী আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমবেত হয়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি। আমার চিঠি পাওয়ামাত্রই আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবেন। আল্লাহর সাহায্য ও মদদ আপনার এবং আপনার সঙ্গে থাকা মুসলিমদের সাথে আছে। কোনো দুর্গম প্রান্তর বা গহিন অরণ্য দিয়ে যাবেন না। তাহলে সাধারণ মুসলিমদের কষ্ট হবে। তাদের অধিকার নষ্ট করবেন না, নয়তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাদের নিয়ে ঘন বৃক্ষলতায় ভরা জঙ্গলে প্রবেশ করবেন না। কারণ একজন মুসলিম আমার কাছে এক লক্ষ দিনারের চেয়েও বেশি মূল্যবান। আসসালামু আলাইকুম।[৬৫]

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর অন্য একটি ঘটনায় বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। ১৭ হিজরির শেষ দিকে মদিনায় খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে বছর বৃষ্টিবাদল কম হওয়ায় মদিনার সকল ফসলি জমি ও চাষাবাদের ভূমি শুকিয়ে ফেটে যায়। *তাবাকাতে ইবনে সাদ*-এ উল্লেখিত আছে, সে বছর একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে মাখন মেশানো রুটি আনা হলে তিনি একজন বেদুইনকে সঙ্গে নিয়ে খাবার খেতে বসেন। বেদুইন প্লেটের একপাশ থেকে বড় বড় লুকমায় দ্রুত রুটি খেতে থাকে। তা দেখে উমর রা. বললেন, তুমি দেখছি বড় বড় লুকমায় সব রুটি মুহূর্তেই সাবাড় করে ফেলছ! বেদুইন বলল, বহুদিন হলো তেল আর মাখন চোখে পড়ে না। অনেক দিন ধরে কাউকে এসব খাবার খেতে দেখি না। এ ঘটনার পর উমর রা. শপথ করেন, যতদিন না মানুষের এই দুর্দশার পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন কোনো মাখন বা মাংস তিনি স্পর্শ করবেন না।

---

৬৫. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৩৬৫।

উমর রা. ছিলেন একজন খাঁটি আরব। মাখন আর দুধই ছিল তার প্রথম পছন্দ। মানুষ দুর্ভিক্ষে পড়ায় এসব খাবার তিনি নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নেন। অনাহারে-অর্ধাহারে সে বছর তার গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিজের গায়ে সয়ে নিয়ে অন্যসব শাসকের জন্য শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থাপন করেন। সন্ধ্যায় শুধু তেল মাখানো রুটি দিয়েই খাবার সারতেন। একদিন একটি উট জবাই করে গোশত পাকিয়ে মানুষকে খাওয়ানো হয়। তার সামনে সেই উটের কুঁজ ও কলিজার সামান্য অংশ নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কীসের? সবাই বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আজ যে উট জবাই হয়েছে সেই উটের। তা শুনে তিনি বললেন, উঠিয়ে নাও, সরিয়ে নাও। আমি খাব নরম গোশত ও কলিজা আর মানুষ খাবে হাড্ডি, তা কখনো হবে না। এ খাবার সরিয়ে সাধারণ খাবার নিয়ে এসো আমার জন্য। এরপর রুটি আর তেল আনা হলে তিনি রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে তেলের সঙ্গে মাখিয়ে খেয়ে নেন। এরপর বললেন হে ইয়ারফা, এই খাবার তুমি 'ছামাগ'[৬৬] গ্রামে থাকা আমার পরিবারের লোকদের দিয়ে এসো। তিন দিন হলো তাদের জন্য আমি কোনো খাবার পাঠাতে পারিনি। মনে হয় তারা এবার পেট ভরে খেতে পারবে। এগুলো তাদের দিয়ে এসো।[৬৭]

জনগণের প্রতি মুসলিম শাসকদের দরদ কেমন ছিল তার আরেকটি উদাহরণ আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর (মৃ. ২২৭ হি.) অভিযান থেকে বোঝা যায়। রোমান সৈন্যবাহিনী একজন মুসলিম নারীকে বন্দি করলে সে চিৎকার করে সাহায্য চায়, হে মুতাসিম!! খলিফা মুতাসিমের কানে সে সংবাদ পৌঁছলে তিনি সিংহাসনে বসেই সেই আবেদনে সাড়া দেন, বলে ওঠেন, আমি প্রস্তুত, আমি প্রস্তুত। আর তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছেড়ে প্রাসাদে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, আন-নাফির, আন-নাফির। (যুদ্ধের ডাক এসেছে। বেরিয়ে পড়ো সবাই।) এরপর তিনি বাহনে উঠে জিজ্ঞেস করেন, রোমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য কেল্লা কোনটি? সবাই বলল, আম্মুরিয়ার দুর্গ। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত কেউ তাতে আক্রমণ করেনি। এটি খ্রিষ্টানদের মূল ভূমি। কনস্টান্টিনোপলের চেয়েও তাদের কাছে এটি বেশি পবিত্র। এরপর

---

৬৬. মদিনার নিকটবর্তী এক জায়গার নাম।

৬৭. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৩১২।

মুতাসিম যুদ্ধের জন্য এত বিপুল পরিমাণ সেনা, অস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়সামগ্রী, প্রয়োজনীয় আসবাব প্রস্তুত করলেন, যা ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধের জন্য কোনো খলিফা করেননি। এরপর অভিযান শুরু করে ৬ রমযান (২২৩ হিজরি) তিনি সেই স্থানে পৌছেন। ৫৫ দিন সেখানে অবস্থান করে সকল বন্দিকে মুক্ত করেন। এরপর তারাসুস অভিমুখে রওয়ানা হন।[৬৮]

এগুলো মুসলিম শাসকদের থেকে সংঘটিত কাকতালীয় কোনো ঘটনা নয়, বরং যে নীতি আদর্শের সংস্পর্শে এসে তারা এসব ঘটনার জন্ম দিয়েছেন, সেই আদর্শের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে ইসলামি সভ্যতা। পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোনো জুড়ি নেই। খলিফা হিশামের সেনাপতি আল-হাজিব আল-মনসুর মাত্র তিনজন মুসলিম নারীকে উদ্ধার করতে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অভিযান চালান। এ তিন নারী স্পেনের বেস্কিউ রাজ্যে গির্জায় কারাবন্দি ছিল। একবার মনসুরের পক্ষ থেকে একজন রাজদূত সেই গির্জা পরিদর্শনে গেলে বহুদিনের কারাবন্দি এক নারীকে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। এরপর ওই নারী দূতকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, মনসুর কি শুধু নিজেই ভোগবিলাসে মত্ত থাকবে আর আমাদের দুঃখদুর্দশার কথা ভুলে যাবে? নিজে রাজকীয় পোশাক পরবে আর আমরা নোংরা পোশাকে অপবিত্র হয়ে দিনযাপন করব? আর কত বছর পর্যন্ত বিধর্মীদের এ কারাগারে আমাদের থাকতে হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে তার কাছে আবেদন করেন, যেন সে তার এই গ্লানির জীবনের অবসান ও কষ্ট-যন্ত্রণাকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করেন এবং এ মর্মে তার থেকে শক্ত শপথ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আশ্বস্ত হন। এরপর এই দূত মনসুরের কাছে গিয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় ও তথ্য তাকে অবহিত করেন। মনসুর তার কথা শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে শোনেন। মনসুর আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে অস্বস্তিকর ঠেকেছে এরকম কিছু দেখেছ সেখানে? নাকি তেমন কিছু তুমি সেখানে পাওনি! এরপর দূত মনসুরকে ওই নারীর ঘটনা ও তাকে দেওয়া অঙ্গীকার সম্পর্কে অবহিত করেন। বন্দি নারীর সকল অভিযোগ ও শপথবাক্য হুবহু মনসুরের সামনে উপস্থাপন করেন। তা শুনে মনসুর

---

৬৮. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ৪৫।

দূতকে তিরস্কার করে বলেন, এ কথা তুমি প্রথমেই বলোনি কেন?! এরপর মনসুর ওই নারীসহ সকল মুসলিম নারীকে উদ্ধার করতে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন।[৬৯]

ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে এমনই ছিল শাসকদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক। যে সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সহানুভূতি, দয়া, উপকার সাধন ও আন্তরিকভাবে জনগণের কল্যাণে নিবেদিত হওয়া। ক্ষমতার লোভ বা কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়।

---

৬৯. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ৪০৪।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

শাসনব্যবস্থায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

ইসলামি সভ্যতা যুগ যুগ ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গমন করলেও মুসলিম স্কলারগণ হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। আর তাই তাদের লেখা অসংখ্য বইপুস্তক আমরা দেখতে পাই যার মাধ্যমে তারা ইসলামি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়কে আরও সুসংহত ও সমৃদ্ধ করতে বিপুল অবদান রেখে গেছেন। এসব রচনাসম্ভার মূলত তাদের প্রশাসনিক অবস্থার বাস্তব বিবরণ আমাদের সামনে তুলে ধরে। চোখে আঙুল দিয়ে শাসকদের নেতিবাচক দিকগুলো দেখিয়ে সংশোধনের পথ বাতলে দেয়।

এ কারণেই ইসলামি সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মুসলিম মনীষীগণ বইপুস্তক রচনার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ইসলামি রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গন এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা যাদের লেখনীতে উঠে এসেছে তাদের অন্যতম হলেন বিখ্যাত ফিকহ বিশারদ আবু ইউসুফ রহ.[৭০]। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর শিষ্য। الخراج। *আল-খারাজ* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি শাসক ও জনগণের মাঝে কীরকম সম্পর্ক থাকবে এ বিষয়ে সাধারণ ইজতিহাদের গণ্ডি পেরিয়ে বেশ কিছু গঠনমূলক নির্দেশনা প্রদান করেন। ইমামের পূর্ণ আনুগত্যের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বেশ কিছু হাদিস উল্লেখ করে তিনি তার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। এর মধ্যে একটি হাদিস হলো :

«إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا»

---

৭০. তিনি হলেন ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে হাবিব আল-আনসারি আল-বাগদাদি। (১১৩-১৮২ হি./৭৩১-৭৯৮ খ্রি.) ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ও সহচর। হানাফি মাযহাবের প্রথম প্রচারক হিসেবে বিখ্যাত এই মহাপুরুষ ছিলেন বিজ্ঞ ফকিহ, হাফিযুল হাদিস। কুফায় তার জন্ম। হাদিস ও রেওয়ায়েত বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। কাযিযুল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাকেই প্রথম সম্বোধন করা হয়। তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের অন্যতম হলো *আল-খারাজ*। দেখুন, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ২৯২-২৯৩; *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৯৩। *মুজামুল মাতবুআত*, খ. ১, পৃ. ৪৮৮।

> নাক/কান কাটা একজন হাবশিকেও যদি তোমাদের নেতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শোনো। তার আদেশ মেনে চলো।[৭১]

এরপর হাসান বসরি রহ.-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করে এ বিষয়টি আরও জোরালো করে তোলেন, তোমরা শাসকদের নিন্দা করো না। ভালো কাজ করলে তারা পুরস্কার পাবে, আর তোমরা তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবে। মন্দ কাজ করলে এর বোঝা তাকেই বহন করতে হবে, আর তোমরা শুধু ধৈর্য ধারণ করবে।[৭২]

আবু ইউসুফ রহ. আরও বলেন, একজন শাসকের উচিত জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। তাদের অভিযোগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা। তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে উপদেশ দিতে এসে এক ব্যক্তি বলল, اتق الله—আল্লাহকে ভয় করুন। মজলিসে উপস্থিত একজন ব্যক্তিটির স্পর্ধা দেখে তাকে ধমক দিলে উমর রা. তাকে বললেন, জনগণ যদি আমাদের কিছু না বলতে আসে তাহলে এ ধরনের জনগণের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। আর আমরা যদি তাদের মতামত না শুনি, তাহলে আমাদের মাঝেও কোনো কল্যাণ নেই।[৭৩]

এর দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামি রাজনীতির বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান সূত্র হলো হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তবে যাই হোক, এটি হলো মতামত গ্রহণ ও উপদেশ প্রদানের আদলে রাজনৈতিক বিষয়ের একেবারে প্রাথমিক পদক্ষেপ।[৭৪]

এ কারণেই আমরা লক্ষ করি, হিজরি ৩য় শতকের গোড়া থেকেই লেখালেখি ও রচনা তৈরি রাজনীতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করার একমাত্র উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সে সময় ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু* রচনা

---

৭১. *ইবনে মাজাহ*, ২৮৬১; *তিরমিযি*, ১৭০৬; *আহমাদ*, ২৭৩০১।

৭২. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ১০।

৭৩. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ১২।

৭৪. আবদুল আযিয আদ-দুরি, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৬৮।

করেন। বইয়ের এই শিরোনামটিই সেই শতাব্দীতে নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক ইস্যুতে মুসলিম মনীষীদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই রাজনীতিকে মুসলিমগণ কেমন গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন এবং তারা কীরকম দক্ষ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক উপহার দিয়েছিলেন এই বইয়ে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় এবং পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে ইসলাম শুধু ভ্রাতৃত্ব ও উদারতার ধর্ম নয়, রাজনীতি ও নেতৃত্বেরও ধর্ম।

ইবনে কুতাইবা গ্রন্থের সূচনা করেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর খিলাফত ইস্যু দিয়ে। আর ইতি টানেন খলিফা মামুনের বিবরণ দিয়ে। প্রত্যেক খলিফার বৃত্তান্ত ও খলিফাকেন্দ্রিক বর্ণনাগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে বইয়ের বিন্যাস ঘটান। যেসব ইতিহাসগ্রন্থে লেখকের কোনো সংযোজন ছাড়া শুধু রেওয়ায়েত বা বর্ণনাকারীদের বিবৃতি সংকলন করা হয় এটি সেরকমই একটি বই। অনেকটা *তারিখে তাবারি* এবং *সিরাতে ইবনে হিশাম*-এর মতো।

এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দুই শতকে লেখা রাজনীতিকেন্দ্রিক বই বিশেষত খিলাফত ও খলিফাদের নিয়ে লেখা রচনাসমূহ আরও উন্নত ও পরিপক্ব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছে। খিলাফত ও শাসনব্যবস্থা বিষয়ক স্বনামধন্য লেখক ইমাম মাওয়ারদি রহ.-এর লেখা *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা ওয়াল-বিলায়াতুদ দ্বীনিয়্যা* الأحكام السلطانية والولايات الدينية বইটি সে কালের খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো। বইটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবিক উভয় ক্ষেত্রেই সমান তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত হয়। এ ছাড়াও ইমাম মাওয়ারদির সমকালীন আরও অনেকের লেখা এ বিষয়ে আলো ছড়িয়েছে। যেমন হেলাল ইবনে মুহসিন আস-সাবির[৭৫] লেখা *রুসুমুল খিলাফা*। তবে এ বইটি এত গভীরভাবে বিশ্লেষণে যেতে পারেনি। আরও পরিষ্কার করে বললে একটি ইসলামি সমাজকে

---

৭৫. হিলাল আস-সাবি। তার পুরো নাম আবুল হুসাইন হেলাল ইবনে মুহসিন আস সাবি (৩৫৯-৪৪৮ হি./৯৭০-১০৫৬ খ্রি.)। তিনি একাধারে লেখক, চিন্তাবিদ, ইতিহাসবিদ। বাগদাদ নিবাসী এ লেখক বহুদিন পর্যন্ত বাগদাদের রাজদরবারের রচনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে : *আখবারু বাগদাদ*, *রুসুমু দারিল খিলাফা*, *গুরারুল বালাগা*, *তুহফাতুল উমারায়ি ফি তারিখিল ওযারায়ি* উল্লেখযোগ্য। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ৯২।

সুনিপুণভাবে নেতৃত্ব দেওয়া এবং উন্নতি ও অগ্রগতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যেসব উপায়-উপকরণের বর্ণনা ইমাম মাওয়ারদির লেখায় পাওয়া যায়, সেরকমটি *রুসুমুল খিলাফাতে* পাওয়া যায়নি।

মোটকথা, স্বসময়ে প্রধান বিচারপতির পদে দায়িত্বরত মাওয়ারদি নামের এই মহান পুরুষ তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহর একান্ত কাছের লোক ছিলেন। খলিফা ও বুওয়াই সাম্রাজ্যের (Buyid Dynasty) মাঝে দূত হিসেবে কাজ করতেন। ফলে রাজনৈতিক পটভূমিতে বহু দিনের কাজের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিনি তার অনবদ্য *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা ওয়াল-বিলায়াতুদ দ্বীনিয়্যা* গ্রন্থটি রচনার ইচ্ছা করেন।

চিত্র নং-১

মাওয়ারদি রচিত 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা'

এ গ্রন্থে খিলাফত ও রাজনীতি সংক্রান্ত সকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ ও বিধি উল্লেখ করেন। নেতা নির্বাচন থেকে শুরু করে অপরাধ ও ফৌজদারি বিধির সকল আইনকানুন সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিয়োগ পাওয়া প্রতিটি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করেন। কারণ রাজনৈতিক এসব পদে কর্মরত মানুষগুলোই পুরো মুসলিমজাতির জন্য মেরুদণ্ডের মতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম মারওয়ারদি বলেন, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা* মূলত নেতা, শাসক ও গভর্নরদের উদ্দেশ্যে লেখা। এ বইটি অধ্যয়ন করলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণকারী এ শ্রেণি অনেক রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বিশেষভাবে সেখানে উল্লেখ করেছি। যেন ইসলামি আইনবিদগণ এ বই থেকে উপকৃত হতে পারেন এবং যে বিষয়গুলো আমি এতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি, সেগুলো রচনার কাজে হাত দিতে পারেন। এ বই লেখার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল শাসকশ্রেণি যেন বইটি পড়ে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন। ইনসাফ কায়েম বা সুচারুরূপে বিচারকার্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন।[৭৬]

তবে যাইহোক, মাওয়ারদি রহ. খিলাফত ও ইমামতকে একই অর্থে নিয়ে এর সংজ্ঞা করেছেন এভাবে,

> «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع»
>
> ইমামত (ইসলামি শাসক নির্ধারণ প্রক্রিয়া) প্রতিষ্ঠা হয়েছে নবুয়তের প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীনের সুরক্ষা এবং ভূপৃষ্ঠের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে। আর এ মহান দায়িত্ব যে ব্যক্তি ভালোভাবে পালন করতে পারে তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেওয়ার লক্ষ্যে ইমাম বা খলিফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব।[৭৭]

উম্মতের মহান আইনবিদগণ খিলাফতের যেসব সংজ্ঞা ও শর্ত উল্লেখ করেছেন, তাদের সুরে সুর মিলিয়ে একজন নির্ভেজাল আইনজ্ঞের মতো

---

৭৬. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

তিনিও খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়কে ইজমায়ে উম্মতের (সকল মুসলিম স্কলারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের) ভিত্তিতে ওয়াজিব হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে এখানে তিনি পরিষ্কারভাবে খিলাফত শব্দের উল্লেখ করেননি। কারণ ওই সময় প্রকৃত অর্থে খিলাফতের পটভূমি অবশিষ্ট ছিল না। শুরা পদ্ধতির বদলে তখন প্রচলিত ছিল বাইআত ও বংশানুক্রমিক ইমাম নির্বাচন প্রক্রিয়া।

এখানে মাওয়ারদির বিশ্লেষণ কয়েকটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত। সবগুলোকে সমন্বয় করলে সারকথা এই দাঁড়ায় যে, ইমামত বা শাসক নির্বাচন শুধু যুক্তির নিরিখে নয়, বরং শরিয়তের ভিত্তিতে ওয়াজিব। আর সেটি হবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। শাসক নির্বাচনে প্রস্তাবিত ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই কুরাইশ বংশের হবেন। সামসময়িক সকল ধর্মীয় নেতা এবং ইজতিহাদের স্তরে উপনীত সকল আইনজ্ঞ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করবেন। মাওয়ারদির বক্তব্য থেকে আরও স্পষ্ট, তুলনামূলক কম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকেও ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা যাবে। তাই বলে একসঙ্গে দুজনকে শাসক বানানো যাবে না। পরবর্তী শাসনকর্তা হিসেবে মনোনীত ব্যক্তি বা যুবরাজ ইচ্ছা করলে যুবরাজ হিসেবে নির্ধারিত অন্য ব্যক্তিদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন। তবে এটি ছিল নিছক মাওয়ারদির ইজতেহাদপ্রসূত মত। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতও এরূপ বলে তিনি দাবি করেন।[৭৮]

ইসলামি রাজনৈতিক ইস্যুতে লেখা আরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো আবু বকর আত-তারতুশি[৭৯] রচিত *'সিরাজুল মুলুক'*। এই স্থূলকায় গ্রন্থে তিনি একাধারে আরব, পারস্য, রোম, হিন্দুস্তান, সিন্ধু এলাকা এবং হিন্দ-সিন্ধের সমন্বিত নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সৌন্দর্যের দিকগুলো নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। মূলত এ গ্রন্থটি তিনি লেখেন মিশরের নবনিযুক্ত উযির

---

৭৮. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২০।

৭৯. পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে খালাফ আল-কুরাশি আত-তারতুশি (৪৫১-৫২০ হি./১০৫৯-১১২৬ খ্রি.)। মালেকি মাযহাবের ফকিহ হিসেবে খ্যাত এ মনীষী ছিলেন পশ্চিম আন্দালুসের তারতুশ এলাকার অন্যতম সুসাহিত্যিক। তার ইনতেকাল হয় আলেকজান্দ্রিয়ায়। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২৬২-২৬৪।

মামুন বাতাইহির[৮০] উদ্দেশ্যে। এর পেছনে তার লক্ষ্য ছিল, হক প্রতিষ্ঠায় মামুনকে উদ্বুদ্ধ করা। শরিয়তের প্রতি তাকে অনুগতরূপে গড়ে তোলা। আহলে সুন্নাতের মাযহাবগুলোর প্রতি তাকে শ্রদ্ধাশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ এর আগে মামুন ছিলেন মিশরের শিয়া ফাতেমি সাম্রাজ্যের অন্যতম উযির।

সিরাজুল মুলুক গ্রন্থটি চৌষট্টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে বিবৃত হয়েছে রাজনীতি, শাসনবিধি, মানবাধিকার রক্ষা নীতি, একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য অপরিহার্য গুণাবলি, সুলতানের বৈশিষ্ট্য, রাজ্য সুরক্ষার কৌশল, রাষ্ট্রকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার সব নীতিমালা। স্থান পেয়েছে রাষ্ট্রনায়ক অবিচার ও স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হলে জনগণের করণীয়, সৈনিক ও যোদ্ধাদের সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কের সম্পর্ক ও তাদের সঙ্গে আচরণ, রাজস্ব উত্তোলন ও অর্থ ব্যয়সহ রাজনৈতিক নানা বিষয়। তা ছাড়াও এই গ্রন্থে তিনি মন্ত্রীদের সম্পর্কে বলেছেন। উযিরদের বৈশিষ্ট্য ও নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে পরামর্শ ও উপদেশদানের মতো উন্নত গুণাবলি ধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে একজন সুলতান কীভাবে এবং কতটুকু হস্তক্ষেপ করতে পারবেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। শহরে-নগরে নিয়োগকৃত সরকারি কার্যনির্বাহী ও কর্মচারীদের প্রতি সুলতান কীরূপ নীতি অবলম্বন করবেন সেই বিষয়গুলোও তিনি স্পষ্ট করেছেন। তা ছাড়া জিম্মির (ভিসা বা অনুমোদন নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম) প্রতি সরকারের আচরণ এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা তিনি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধবিষয়ক নিয়মনীতি ও কলাকৌশলের কথাও বিখ্যাত এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অপরদিকে ৫৮৯ হিজরিতে ইনতেকাল করা স্বনামধন্য আইনবিশারদ আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ শাইযারি রহ. *আল-মানহাজুল মাসলুক*

---

৮০. মামুন বাতাইহি (মৃ. ৫১৯ হি./১১২৫ খ্রি.) দরিদ্র অবস্থায় বেড়ে ওঠা এ মন্ত্রী শুরুতে কুলির কাজ করতেন। ফাতেমি সরকারের উঁচু স্তরের কর্মকর্তা আফজাল আল-উবাইদির কাছে তিনি মজদুরি করতেন। এরপর ধীরে ধীরে উন্নতি করতে করতে মিশরের মন্ত্রণালয়ে চাকরি পেয়ে যান। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী, মহৎ ও দানবীর। তবে রক্তপাতের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রনায়ককে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে তাকে শূলে চড়ানো হয়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৯, পৃ. ৫৫৩।

ফি সিয়াসাতিল মুলুক রচনা করেন। এ গ্রন্থ লেখার পেছনে তার লক্ষ্য ছিল, গল্প ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার ছলে সুলতান সালাহুদ্দিন ইবনে আইয়ুবকে রাজনৈতিক উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। পূর্ববর্তী শাসকদের অবস্থা বর্ণনা করে সেখান থেকে সারনির্যাস বের করে তাকে শিক্ষা গ্রহণের পথ বলে দেওয়া। এ কারণেই গ্রন্থের শুরুতে কিতাব লেখার নেপথ্য কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সালাহুদ্দিনের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে আমি এ গ্রন্থ রচনা করেছি। এতে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কথা, সাহিত্যের মণিমুক্তা, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার রক্ষার মূলনীতি লিপিবদ্ধ আছে। রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করা এবং জনগণের মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার কৌশলও এতে বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন এবং সৈনিকদের মাঝে এর সুষম বণ্টন পদ্ধতি, সেনাবাহিনীর ওপর জিহাদ সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সংযোজন করেছি। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভালো ও মন্দ চরিত্রের দিকগুলো উল্লেখ করেছি। রাষ্ট্র পরিচালনায় মাশওয়ারা বা পরামর্শের গুরুত্ব, মাশওয়ারায় উৎসাহ প্রদান, শত্রুদের মোকাবেলা, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলো সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। এর জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণ, ঘটনা, যুক্তি, প্রমাণ সবকিছু বর্ণনা করেছি।[৮১] কোনো সন্দেহ নেই, সালাহুদ্দিনের মতো একজন দূরদর্শী ও বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক সবসময় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন। এ কারণেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দীক্ষা নিয়ে এবং পূর্ববর্তী খলিফা ও শাসকদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি রচনা করেন একের পর এক বিজয়ের উপাখ্যান। রাষ্ট্রকে উন্নীত করেন সমকালীন সকল সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বে।

উক্ত গ্রন্থে স্বরাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ইস্যুকে ভূরাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য সুলতানমাত্রই জনগণের সঙ্গে বসার ও তাদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার ওপর জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থে লেখক বলেন, জেনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রনায়ককে সময় বের করে বসতে হবে। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বাদী-বিবাদীর মাঝে নিষ্পত্তি

---

৮১. শাইযারি, *আল-মানহাজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক*, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

বিধান করতে হবে। এগুলো ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তা না করলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে না। সুষম বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।[৮২] রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ স্পষ্ট করতে গিয়ে সালাহুদ্দিনের উদ্দেশ্যে বইতে তিনি লেখেন, তিন কারণে রাষ্ট্র ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে যায় : প্রথম কারণটি রাষ্ট্রনায়ককেন্দ্রিক। আর সেটি হলো, শাসকের মনোবৃত্তি যদি তার বুদ্ধি বিবেচনাকে ছাপিয়ে যায়। তাহলে ভোগের সুযোগ আসামাত্রই সে তা লুফে নেবে। খুঁজবে শুধু আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার সকল উপায়-উপকরণ। দ্বিতীয় কারণটি হলো মন্ত্রিপরিষদ-কেন্দ্রিক। আর তা হলো নিজের মতের বিরুদ্ধে হলেই প্রতিহিংসা-প্রবণতা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাদের মাঝে সবসময় মনোমালিন্য ঘটবে। ফলে তৈরি হবে বিভেদ। তৃতীয় কারণটি হলো, সেনাবাহিনী ও শাসকের একান্ত সহযোগীকেন্দ্রিক। আর তা হলো, জিহাদের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বরফের মতো জমে বসে থাকা। জিহাদের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ না করে অস্ত্রের প্রয়োগ ছাড়া শান্তির পথ তালাশ করা।[৮৩]

তকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া[৮৪] রহ. রচিত *আস-সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যা ফি ইসলাহির রায়ি ওয়ার-রায়িয়্যাহ* গ্রন্থটিও ইসলামি রাজনীতির বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া রহ. তার এ গ্রন্থে পরিষ্কার করে বলেছেন, বর্তমান সময়ে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়া, তাদের রাষ্ট্রগুলো হাতছাড়া হওয়া এবং শত্রুদের হামলার কেন্দ্রস্থল হওয়ার একমাত্র কারণ শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা, নৈরাজ্য এবং আল্লাহর বিধান থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়া। যার ব্যাপ্তি মুসলিম জনসাধারণকেও গ্রাস করে ছেড়েছে। শাসনযন্ত্র ও শাসকশ্রেণির বিনষ্টতাকে কেন্দ্র করে মূলত প্রধান দুটি নির্দেশনা নিয়ে তার এ বইটি রচিত। এর মধ্যে একটি হলো, যথাযথভাবে অর্থব্যয় নিশ্চিত করা এবং আমানত ও দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে

---

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২-৫৬৩।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭।

৮৪. তার পুরো নাম আহমাদ ইবনে আবদুল হালিম আল-হাররানি (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.)। তিনি একাধারে ইমাম, বড় আলেম, বিখ্যাত ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, শাইখুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত। হাররানে জন্মেছেন। দামেশকে ইনতেকাল করেছেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত* খ. ৭, পৃ. ১১।

আদায় করা। দ্বিতীয়টি হলো, সবকিছুতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং মানুষের সকল অধিকার রক্ষা করা। দ্বিতীয় ইস্যুর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একজন শাসকের চরিত্রের উত্তম দিকগুলো টেনে এনেছেন। শাসক ও শাসিত সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। যার ফলে নবীন ও প্রবীণ গবেষক মহলে বইটি বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।[৮৫]

ইসলামি রাজনীতির বিষয়ে উন্নত লেখনী বেরিয়ে এসেছে ইবনে খালদুনের হাত থেকেও। বিখ্যাত *আল-মুকাদ্দিমায়* তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এবং সমাজের সকল শ্রেণি ও দলকে একটি সংঘে পরিণত করার পদ্ধতি ও কৌশলগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ গ্রন্থে তিনি সমাজের শুধু একটি শ্রেণির বিবরণ ও তাদের সমস্যার কথা বর্ণনা করেননি, বরং সমাজের শহুরে ও গ্রাম্য উভয় শ্রেণির স্বাতন্ত্র্য বর্ণনা করে উভয় শ্রেণির সমস্যার সমাধানের পথ বর্ণনা করেন। ইবনে খালদুনের মতো জগদ্‌বিখ্যাত লেখকের শুধু এ গ্রন্থেই নয়, বরং তার লেখা সব পুস্তকেই তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর চমৎকার একটি উদাহরণ হলো, খিলাফত ও ইমামতকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, খিলাফত হলো দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণার্থে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সকল কিছু বিধান করা। অর্থাৎ আখেরাতের ভালোমন্দ পরিণামের কথা বিবেচনা করে জাগতিক সকল সমস্যার সমাধান শরিয়তের মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে। আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে, এক কথায় শরিয়তের বিধিবিধানের ওপর ভিত্তি করে ধর্মের সুরক্ষা এবং ভূ-রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার নাম হচ্ছে খিলাফত।[৮৬]

তবে খিলাফত ও রাজত্বের মাঝে পার্থক্য করেছেন ইবনে খালদুন। তিনি বলেন, রাজত্বের মূল হলো কিছু রাজনৈতিক বিধিনিষেধ, যেগুলো জনসাধারণ একবাক্যে মেনে নেয় এবং পালন করতে বাধ্য থাকে। এবার এই বিধানগুলো যদি রাষ্ট্রের বিজ্ঞ আইনবিদ ও দূরদর্শী শ্রেণির দ্বারা স্বীকৃত হয়, তবে তা হবে বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতি। আর যদি আল্লাহর

---

৮৫. ইবনে তাইমিয়া, *আস-সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যা*, পৃ. ৪-৫।

৮৬. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ১৯১।

নাযিল করা কুরআন এবং রাসুলের রেখে যাওয়া সুন্নাহ কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তবে সেটি হবে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণবাহী ধর্মীয় রাজনীতি বা খিলাফত।[৮৭]

রাজনৈতিক বিষয়ে মুসলিম লেখকদের অবদান সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার আগে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি। সেটি হলো, এ সংক্রান্ত সকল গ্রন্থে লেখকগণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের দেখানো পথ অবলম্বন করেছেন। কুরআন-সুন্নাহ থেকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিছক শাসকশ্রেণির তোষামোদ পেতে এবং তাদের প্রিয়পাত্র হতে তাদের সঙ্গে দুর্নীতি ও অবিচারের পাল্লা ভারী না করে, বরং সবসময় কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের দিকে ফিরে আসার প্রতি তাদের আহ্বান জানিয়েছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগেই প্রায় সকল মুসলিম লেখক একই পথ অনুসরণ করেছেন। তবে তাদের বর্ণনা ও উপস্থাপনভঙ্গিতে বৈচিত্র্য ছিল। পরবর্তীকালের লেখকদের লেখনীতে অনেক নতুন নতুন বিষয়ের আলোচনা ও প্রস্তাবনা ছিল।

কারণ এ সংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থ লেখার পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং খ্যাতিমান এ আইন বিশারদদের যুগে ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণের পথ সুগম করা। রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে লেখা মুসলিম লেখকদের গ্রন্থগুলোর সঙ্গে পশ্চিমা লেখকদের বইগুলোর তুলনা করলেই তাদের ও মুসলিম লেখকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপের নবজাগরণের যুগে রাজনীতি বিষয়ে লেখা নিকোলা ম্যাকিয়াভেলির[৮৮] বিখ্যাত গ্রন্থ *দা প্রিন্স* সংকলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইতালির একটি শহরের জনৈক শাসকের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা। একজন শাসক কীভাবে তার সমকক্ষদের সামলাবেন তার বিবরণ তিনি এ গ্রন্থে দিয়েছেন। তার প্রধান রাজনৈতিক দর্শন ছিল 'লক্ষ্য ভালো হলে যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে দোষ নেই'। অর্থাৎ কোনো লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে বৈধ-অবৈধ যেকোনো পন্থা অবলম্বন করা

---

৮৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০। দেখুন, যাফির কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি*, খ. ১, পৃ. ১৯১।

৮৮. নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রি.)। ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বাস্তববাদী রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা বলা হয়ে থাকে। তার লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ *দা প্রিন্স*।

যেতে পারে। লক্ষ্যটা যদি ভালো হয় তবে এতে দোষের কিছু নেই। সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা, ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের আশ্রয় নেওয়ার কথা বলেছেন ম্যাকিয়াভেলি। জনসাধারণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে হুমকি-ধমকি দিয়ে জোরপূর্বক স্বার্থ হাসিলের কথাও বলেছেন তিনি। তিনি আরও বলতেন, রাজনীতিতে নীতি-নৈতিকতা ও সাধুতা বলতে কিছু নেই।[৮৯]

কোনো সন্দেহ নেই, এই গ্রন্থকার এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট[৯০] ও অ্যাডল্‌ফ হিটলারসহ[৯১] তার অনুসারী সকল শাসকবর্গের যে পরিমাণ মানুষের মালামাল লুণ্ঠন করা ও শাসক শ্রেণির ভোগবিলাসের উপকরণ নিশ্চিত করা উদ্দেশ্য ছিল সে পরিমাণ জনগণের মাঝে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের জন্য সকল সামাজিক উপকরণ নিশ্চিত করা উদ্দেশ্য ছিল না। সেই তুলনায় মুসলিম লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসকদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া। নানাভাবে, বিচিত্র পন্থায় আল্লাহর জমিনে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর শরিয়ত প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

---

৮৯. আলি ইবনে নায়েফ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া আমালিল মুসতাকবিল*, পৃ. ২৯৪।

৯০. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.)। বিখ্যাত ইউরোপীয় সেনানায়ক। মিশরের বিরুদ্ধে ফরাসি আক্রমণের নেতৃত্ব দেন তিনি। ইউরোপেও বহু যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সবগুলোতেই তিনি ছিলেন অপরাজেয়। তবে বেলজিয়ামের ওয়াটারলুতে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এরপর তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

৯১. অ্যাডল্‌ফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রি.)। জার্মানির বিখ্যাত রাষ্ট্রপ্রধান। তার মিত্রদের বিরুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। শেষ পর্যন্ত জার্মানির পতন ঘটে এবং তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক

ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতির ওপর। রোমান ও পারস্যসম্রাটগণ প্রজাদের সঙ্গে যেখানে বলপ্রয়োগ ও স্বেচ্ছাচারমূলক নীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন, ইসলামি সভ্যতায় মুসলিম শাসকগণ সেরকমটা কখনোই করেননি।

ইসলামি সভ্যতায় জনগণ ও শাসক সকলেই যে জীবনব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল-কুরআন ও সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণের ওপর। এ কারণেই হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকল মুসলিম শাসকই শরিয়তবান্ধব সেই শাসনব্যবস্থার ওপর অটল ছিলেন। শুধু তাই নয়, উম্মাহর বিদগ্ধ আলেম ও মহাপুরুষগণ শাসক ও সর্বস্তরের কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীকে সবসময় সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

উপদেশদানের মাধ্যমে অত্যাচারী শাসককে সুপথে আনার উদ্যোগকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠ জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন,

«إِنَّ أَعْظَمَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

> অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়ের কথা উচ্চারণ করা শ্রেষ্ঠ জিহাদ।[৯২]

ভুল পথে যাওয়া শাসক ও খলিফাদের ত্রুটিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার সুমহান দায়িত্ব ইসলামের সূচনাকাল থেকেই উম্মতের

---

৯২. *তিরমিযি*, কিতাবুল ফিতান, বাব : أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر, ২১৭৩, হাদিসটি হাসান। *আবু দাউদ*, ৪৩৪৪; *নাসায়ি*, ৪২০৯; *ইবনে মাজাহ*, ৪০১১; *আহমাদ*, ১৮৮৫০।

বিদগ্ধ আলেমগণ সুচারুরূপে পালন করেছেন। বরং স্বয়ং খলিফাগণই জনগণকে এ কাজে উৎসাহিত করেছেন বলে আমরা দেখতে পাই। আমিরুল মুমিনিন হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর জনগণের উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে আবু বকর রা. বলেন,

«إِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوْنِيْ»

> আমি ভুল পথে গেলে বা ভুল সিদ্ধান্ত নিলে আপনারাই আমাকে সোজা পথে নিয়ে আসবেন।[১৩]

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় সঙ্গীদের নিয়ে পরামর্শে বসতেন। তাদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হলে একাত্মতা পোষণ করতেন। বদর যুদ্ধে সঙ্গীদের নিয়ে তিনি প্রথমে বদর কূপের সন্নিকটে একটি জায়গায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তা বিশিষ্ট সাহাবি হাব্বাব ইবনুল মুনযির রা.-এর মনঃপূত হয়নি। তিনি গিয়ে মুসলিম সেনাপতি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আল্লাহর আদেশে এ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন, এখানে কিন্তু সামনে-পেছনে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই; নাকি রণকৌশল হিসাবে এই স্থানটি পছন্দ করেছেন? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা স্রেফ রণকৌশল। এ কথা শোনার পর হাব্বাব রা. বললেন, এই জায়গায় অবস্থান করাটা আমি সমীচীন মনে করছি না। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। কুরাইশ বাহিনীর অবস্থানের সবচেয়ে নিকটবর্তী কূপ আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য কূপের প্রতিও আমরা নজর রাখব। তাহলে ফল দাঁড়াবে এই, যুদ্ধ শুরু হলে আমরা পানি পান করতে পারব আর কুরাইশরা পানির অভাবে ছটফট করবে। হাব্বাবের এই সুপরামর্শ আল্লাহর রাসুলের পছন্দ হলো। তিনি খুশি হয়ে বললেন, তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ। এরপর তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। রাতের মাঝামাঝি সময়ে শত্রুদের অবস্থানের নিকটবর্তী কূপের কাছে

---

১৩. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৩৮।

পৌঁছে তাঁবু খাটালেন। এরপর সাহাবিগণ হাউজ বানালেন এবং পানি ভরা হলে তাতে পাত্র ফেলে রাখলেন।[১৪]

সাধারণ একজন যোদ্ধার সঙ্গে একজন সেনানায়কের কীরকম সম্পর্ক ছিল এবং রাষ্ট্রনায়ক হয়ে সাধারণ মানুষের মতামত তিনি কী পরিমাণ গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন, তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট। এই মহৎ ও অনন্য ইসলামি সভ্যতায় জনগণের সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক আন্তরিকতা, পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ ও সুপরামর্শ বিনিময়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হাব্বাবের এই ঘটনা থেকে বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তখন আমিরুল মুমিনিন। একবার এক বেদুইন এসে উমর রা.-কে কিছু রাখালিয়া জমি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। জমিগুলো তার অনুমতি ছাড়া কেউ যেন ব্যবহার না করে সেই ফরমান আগেই দিয়ে রেখেছিলেন উমর রা.। সেই বেদুইন বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, এটি আমাদের দেশ। জাহিলিয়াত যুগে এ দেশে আমরা যুদ্ধ করেছি। ইসলাম আসার পর এ ভূমিতেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাহলে কীসের ভিত্তিতে আপনি এ ভূমি সংরক্ষণ করে রাখবেন? বেদুইনের এ কথা শুনে উমর বিরক্ত হয়ে গোঁফে ফুঁ দিতে লাগলেন আর গোঁফ পাকাতে লাগলেন। কোনোকিছু নিয়ে বিরক্ত হলে তিনি এমনটি করতেন। বেদুইন উমরের হাবভাব দেখে তার কথাগুলো পুনর্ব্যক্ত করল। এক পর্যায়ে উমর রা. বললেন, সকল সম্পদ একমাত্র আল্লাহর। সব মানুষ আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর রাস্তায় যদি আমি তা ব্যবহার না করতাম, তাহলে এক বিঘত পরিমাণ জমিও আমি রক্ষা করতে পারতাম না।[১৫]

উমর ইবনুল খাত্তাবের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রাদেশিক গভর্নরগণ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও নির্লোভ প্রকৃতির। এমনও পাওয়া গেছে, জনগণ ছিল ধনী আর শাসক ছিলেন চরম দরিদ্র। এরকমই একজন শাসক ছিলেন সাইদ ইবনে আমের আল-জুমাহি। *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক* গ্রন্থে ইবনে আসাকির লেখেন, একবার সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হিমস পরিদর্শনে এসে সেখানকার দরিদ্রদের একটি তালিকা করতে বলেন আমিরুল

---

১৪. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ২৬০; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৪০২; সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ৩, পৃ. ৬২; তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৯।

১৫. ইমাম নববি, *আল-মাজমু*, খ. ১৫, পৃ. ২৩৪।

মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তালিকাটি পূর্ণ করে আমিরুল মুমিনিনের কাছে হস্তান্তর করা হলে তাতে সাইদ ইবনে আমেরের নাম দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই সাইদ ইবনে আমের? সবাই বলল, আমাদের শাসক হে আমিরুল মুমিনিন। উমর রা. আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের শাসক দরিদ্র?! সবাই বলল, জি হ্যাঁ! উমর রা. অবাক হয়ে বললেন, কী করে তোমাদের শাসক দরিদ্র হতে পারেন? তার ভাতা কোথায় যায়? তার রিযিক কোথায় ব্যয় হয়? সবাই উত্তর দিলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, তিনি নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। এ কথা শুনে উমর রা. কেঁদে উঠলেন এবং এক হাজার দিনারের থলে প্রস্তুত করে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। দূতকে বলেন, তাকে গিয়ে আমার সালাম বলো। কিন্তু সেই শাসক উমরের পাঠানো অর্থ নিজের কাছে না রেখে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের কাছে হস্তান্তর করেন।[৯৬]

একবার খলিফাতুল মুসলিমিন এবং তৎকালীন বিশ্বের শক্তিধর শাসক মুআবিয়া রা. ভাষণের উদ্দেশ্যে মিম্বরে দাঁড়ালেন। এমন সময় বিশিষ্ট তাবেয়ি, আল্লাহর পথের নির্ভীক কণ্ঠস্বর আবু মুসলিম আল-খাওলানি রা. খলিফার সামনে গিয়ে বলতে লাগলেন, হে মুআবিয়া, আপনি তো একদিন লাশ হয়ে কবরে চলে যাবেন। পৃথিবীতে ভালো কিছু করে গেলে সেখানে সুখ পাবেন। অন্যথায় দুনিয়ার এই চাকচিক্য ও আড়ম্বরতা একদিন আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হে মুআবিয়া, এমনটি কখনো ভাববেন না যে, খিলাফত শুধু রাজস্ব ও অর্থ উসুল করা এবং তা বিতরণ করার নাম। বরং খিলাফত হলো হকের উচ্চারণ ও ইনসাফের আচরণ এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে মনোনিবেশ করার অন্যতম পথ। হে মুআবিয়া, ঝরনার উৎসমুখ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে নদনদীর জল ঘোলা হলেও আমাদের তাতে কিছু যায় আসে না। সাবধান, কখনো নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের পক্ষপাতিত্ব করবেন না। তাহলে আপনার নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।' এ কথাগুলো বলে তিনি বসে পড়লেন। মুআবিয়া রা. তার এ বলিষ্ঠ সতর্কবার্তা শুনে উত্তর দিলেন, তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক হে আবু মুসলিম।[৯৭]

---

৯৬. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ২১, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

৯৭. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ২৯৭।

ইসলামি সভ্যতায় শাসক ও জনগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সবসময় বিরাজমান ছিল। খলিফাগণ সবসময় জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। বিখ্যাত আব্বাসীয় খলিফা মুতাযিদ বিল্লাহ (মৃ. ২৮৯ হি.) রাজ্যের কৃষক শ্রেণির সঙ্গে সদয় আচরণ করতেন। তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব উসুল না করে একমাস পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ করতেন। যেন ফসল বিক্রি করে তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। যার ফলে দেখা যায়, তার আমলে কৃষকদের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।[৯৮]

এমনকি আব্বাসীয় খিলাফতের অবস্থা যখন শোচনীয়, তখনও খলিফাগণ জনগণের উন্নতি, অগ্রগতি এবং তাদের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। বিশিষ্ট আব্বাসি খলিফা আল-কাদির বিল্লাহ (মৃ. ৪২২ হি.) ছিলেন একজন ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান, ত্যাগী, নিয়মিত তাহাজ্জুদগুজার এবং খুব বেশি পরিমাণ দান ও সেবার কাজে নিবেদিত একজন ব্যক্তি। ইফতারের জন্য রাজদরবারে প্রস্তুত করা খাদ্যসামগ্রীর একতৃতীয়াংশ তিনি বড় দুটি মসজিদে বিতরণ করে দিতেন। খুব কাছ থেকে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অনেক সময় তিনি রাজপোশাক ছেড়ে একেবারে সাধারণ পোশাক পরে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতেন। জনশ্রুতি আছে, হাদিসের মূলনীতি বিষয়ক একটি বইও তিনি রচনা করেন, যা প্রতি শুক্রবার আল-মাহদি মসজিদে হাদিস বিশারদদের বৈঠকে পড়া হতো। আর মানুষ তা শোনার জন্য মসজিদে চলে আসত।[৯৯]

বিপদের সময় খলিফাগণ জনগণের পাশে থাকতেন। দুঃখদুর্দশা ভাগ করে নিতেন। তাদের চাহিদা পূরণে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন। আন্দালুসের বিশিষ্ট শাসক আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের (মৃ. ২৩৮ হি.) শাসনামলে মাটি থেকে সৃষ্ট হলুদ পঙ্গপালের আবির্ভাব এবং তা ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে স্পেনে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় খলিফা রাজকর্মচারীদের সঙ্গে মিশে নিজে দরিদ্র-মিসকিনদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।[১০০]

---

৯৮. ইউসুফ আল-উশ, *তারিখু আসরিল খিলাফাতিল আব্বাসিয়া*, পৃ. ১৬৭।
৯৯. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৭, পৃ. ১৬১।
১০০. ইবনে হাইয়ান আল-কুরতুবি, *আল-মুকতাবাসু মিন আনবায়িল উন্দুলুস*, পৃ. ২২৫।

ইসলামি সভ্যতায় খলিফা ও গভর্নরদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও যথাযথ মর্যাদাদানের সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। যার ফলে আমরা দেখি, খিলাফতের দুর্বল ও অন্তিম সময়গুলোতেও গভর্নর ও খলিফাদের পারস্পরিক এই সুসম্পর্কের বন্ধন অটুট ছিল। এক উম্মত হিসেবে পৃথিবীর সকল মুসলিম এবং সকল শাসকের মাঝে অভিন্ন আত্মার সম্পর্ক বজায় ছিল। তারা সকলেই খলিফার আদেশ-নিষেধকে সম্মান করতেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো আব্বাসীয় খিলাফতের সঙ্গে বিখ্যাত সেনাপতি বীর সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সম্পর্ক। বাস্তব প্রেক্ষাপটে তখন আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ ছিল সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে। তিনি ছিলেন তৎকালীন গোটা মুসলিম জাহানের আশার আলো। এই বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সকল ক্রুসেড শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করেন। ইসলামের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি সমুন্নত করেন। এই দুঃসাহসী বীরপুরুষের অবদান মুসলিমজাতি চিরকাল স্মরণ রাখবে। তিনি একাধারে সিরিয়া, মিশর, হেজায ও ইয়ামেনকে ইসলামি শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। এরকম মহান সেনাপতি হওয়ার পরও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে আমরা দেখতে পাই, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং আব্বাসীয় খলিফার মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। অথচ তখন বাগদাদ ও আশপাশের কিছু এলাকা ছাড়া মুসলিমবিশ্বে আব্বাসীয় খলিফার আধিপত্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এরপরও সে সময় সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং আব্বাসীয় খলিফার মাঝে বিনিময় হওয়া চিঠিগুলো থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আব্বাসীয় খলিফাকেই তিনি মুসলিমদের প্রকৃত আমির বলে মানতেন। এরই ধারাবাহিকতায় আব্বাসি খলিফা আন-নাসির লি দ্বীনিল্লাহর[১০১] প্রতি তিনি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান। শুধু শুভেচ্ছা জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, সবসময় খলিফার পরামর্শ নিয়েই তিনি কাজ করতেন। খলিফার কল্যাণে অনেক বিজয়াভিযান সম্পন্ন করেন। ইবনে কাসির তার ইতিহাসগ্রন্থে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মসুল শহর অবরোধ করার পেছনে মূলত সালাহুদ্দিন আইয়ুবির উদ্দেশ্য ছিল শহরের অধিবাসীকে খলিফার আনুগত্যে ফিরিয়ে আনা এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করা।[১০২] এমনকি খলিফা ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মাঝে

---

[১০১]. মুহাম্মাদ ইবনে তকিউদ্দিন আইয়ুবি, *মিযমারুল হাকায়িকি ওয়া সিররিল খালায়িকি*, পৃ. ৫।
[১০২]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ৩৮৭।

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এ পরিমাণ উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে, ৫৭০ হিজরিতে খলিফা তাকে খিলাফতের সম্মানসূচক পোশাক ও অনেক মূল্যবান বস্তু উপহার পাঠান।[১০৩]

হিজরি পঞ্চম শতকে মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের[১০৪] (Almoravid dynasty) প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ ইবনে তাশফিন প্রথমে মরক্কো, এরপর মরক্কো ও স্পেন একসঙ্গে অধিকার করেন। সেই মহান সেনাপতি নিজেকে মহামান্য আব্বাসীয় খলিফার[১০৫] একজন নগণ্য সেবক মনে করতেন। অথচ মরক্কো এবং আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের মাঝে দূরত্ব ছিল প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার। আর মরক্কো তখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিতও হচ্ছিল, কিন্তু ইউসুফ ইবনে তাশফিন চাচ্ছিলেন খিলাফতের অধীনে থাকতে। সেই লক্ষ্যে খলিফা মুস্তাযহিরের কাছে পত্রযোগে খিলাফত সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানালে খলিফা তাকে ডেকে আনেন এবং মরক্কোকে খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করে ইউসুফ ইবনে তাশফিনকে সেখানকার শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে মুরাবিতিন সাম্রাজ্যে আব্বাসীয়দের আধিপত্য বিরাজমান ছিল। আর খলিফার মর্যাদা ও আদব রক্ষার্থে ইউসুফ ইবনে তাশফিন আমিরুল মুমিনিন নয়, আমিরুল মুসলিমিন উপাধি গ্রহণ করেন।[১০৬]

২০৫ হিজরি সন থেকে তাহের ইবনে হুসাইন[১০৭] কর্তৃক খোরাসান রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করার পর অনেক শাসক ও গভর্নর

---

১০৩. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ১৩২।

১০৪. হিজরি পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে উত্তর আফ্রিকায় মালেকি সুন্নি মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি সাম্রাজ্য, বর্তমানের মরক্কো, মৌরিতানিয়া, আলজেরিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, জিব্রাল্টার, সেনেগাল, মালি ও নাইজেরিয়া এ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১০৫. দেখুন, ইমাম গাযালির প্রতি ইমাম আবু বকর ইবনে আরাবির লেখা চিঠি। আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুল মুরাবিতিন*, পৃ. ১২৩।

১০৬. আবুল আব্বাস আন-নাসিরি, *আল-ইসতিকসাউ ফি আখবারিল মাগরিব*, খ. ২, পৃ. ৫৮।

১০৭. পুরো নাম আবুত তাইয়িব তাহের ইবনুল হুসাইন ইবনে মুসআব আল খুযায়ি (১৫৯-২০৭ হি./৭৭৫-৮২২ খ্রি.)। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট উযির ও সেনাপতি। সাহিত্য, জ্ঞান ও বীরত্বে তিনি সুনাম অর্জন করেন। আব্বাসীয় খলিফা মামুনের রাজত্ব শক্তিশালী করতে তার বিশাল ভূমিকা ছিল। খলিফা মামুন প্রথমে তাকে বাগদাদের পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেন। এরপর পর্যায়ক্রমে মসুল, আলজেরিয়া, সিরিয়া এবং মরক্কোর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। এরপর তিনি খোরাসানের শাসক হিসেবে নিযুক্ত হন। খোরাসানে জুমআর খুতবায় খলিফা মামুনের জন্য দোয়া বর্জন করেন। অবশেষে তিনি বিষাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হত্যার নেপথ্যে ছিল তারই এক দাস। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ২২১।

স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রদেশ পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ২৫৯ হিজরি পর্যন্ত তাহেরের সন্তানগণ সেই সিংহাসন ধরে রাখতে সক্ষম হন। এরপরও তাহেরি রাজবংশ খিলাফত ও তার অনুষঙ্গ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করেননি। শুধু তাহের নয়, খোরাসানে তাহেরি সাম্রাজ্যের অন্যসব শাসকও খিলাফত থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে দাবি করেননি। অপরদিকে ২৫৪ হিজরি থেকে স্বাধীনভাবে মিশর শাসনকারী মুহাম্মাদ ইবনে তুলুন এবং পরবর্তীকালে তার সন্তানগণ খিলাফত থেকে বের হননি। তেমনই ৩২৩ হিজরি সন থেকে মিশরের কর্তৃত্ব গ্রহণকারী মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ আল-ইখশিদ[১০৮], আলেপ্পোর বনু হামদের নেতাবর্গ এবং মরক্কো ও স্পেনের অন্য শাসকগণও খিলাফত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বলে দাবি করেননি।

এরকম অনেক স্বাধীন শাসক খিলাফত ব্যবস্থাকে অসামান্য মর্যাদার চোখে দেখতেন, এটাই চিরসত্য ও সুপ্রমাণিত। নিজ নিজ ভূখণ্ড ও প্রজাদের স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার পরও অধিকাংশ সময় আব্বাসীয় খিলাফতের ছায়াতলেই থেকেছেন তারা।

হিজরি তৃতীয় শতক থেকে শাসনব্যবস্থার নানা অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত দিক থেকেও বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন শাসকগণ নিজ নিজ ভূখণ্ডকে উন্নত ও প্রগতিশীল করার এবং ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের চাহিদা পূরণ করার প্রতি মনোযোগী হন। এমনকি তাদের অনেকে সেনাশক্তি অর্জন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে খিলাফত সাম্রাজ্যকেও ছাড়িয়ে যান। যার ফলে আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাকফি বিল্লাহ (মৃ. ৩৩৮ হি.) মিশরের গভর্নর ও স্বাধীন শাসক মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশিদের কাছে মিশর, সিরিয়া, ইয়ামেন, মক্কা ও মদিনার সঙ্গে বাগদাদকেও তার শাসনাধীন করার প্রস্তাব করেন। স্বভাবতই ইখশিদের মতো এরকম যোগ্য ও ক্ষমতাবান শাসকের হাতের ছোঁয়ায় মিশর নানাভাবে অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তিনি নিজ অধিকারভুক্ত রাজ্যগুলোতে স্বতন্ত্র ইখশিদি

---

[১০৮]. তার পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইবনে জুফ ইবনে খাকান আল-ফারগানি আত-তুরকি (২৬৮-৩৩৪ হি./৮৮২-৯৪৬ খ্রি.)। তিনি ইখশিদি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। দামেশকে তার ইনতেকাল হয়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৫, পৃ. ৩৬৬।

মুদ্রা প্রচলন করেন। এরকম আধুনিক মুদ্রানীতির প্রচলন সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিচারব্যবস্থা ও নেতা নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে যে উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল ইসলামি সভ্যতা, তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও ফেতনার সময় শাসক ও জনগণ সকলেই সমাধানের জন্য কাযি, বিচারক বা নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তির দ্বারস্থ হতেন, যিনি এই সংকটময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা রাখেন। এরপর তুলনামূলক অধিক যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার স্থলে ওই ব্যক্তিকে এ পদে বসাতেন। বিশেষত মুসলিম শাসনামলে স্পেনে এ রীতির প্রচলন ছিল। আবু আবদিল মালিক নামে খ্যাত ভ্যালেন্সিয়ার বিচারক ও অধিবাসী মারওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ৫৩৮ হিজরি সনের যিলহজ মাসে নিজ শহরের বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ৫৩৯ হিজরি, আবার কেউ কেউ ৫৪০ হিজরি বলেছেন। এরপর লামতুনিয়া সাম্রাজ্য পতনের সময় রমযানের শেষে কিংবা শাওয়ালের শুরুতে তিনি ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত হন। ফলে ৫৪০ হিজরি সনের সফর মাসে তার হাতে মানুষ বাইআত গ্রহণ করে। অল্প কিছুদিন শাসকের দায়িত্ব পালন করার পর তার স্থলে আরেকজনকে শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।[১০৯]

আন্দালুসের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিটি পাঠকের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট যে, মুসলিম স্পেনে খণ্ডকালীন শাসক নিয়োগের প্রচলন ছিল। মানুষের কাছেও বিষয়টি গ্রহণযোগ্য ছিল। ইবনুল আব্বারের বর্ণনা করা এই আপৎকালীন নিয়োগব্যবস্থা বর্তমান কালে প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মতো। সাধারণত বর্তমান শাসক মারা যাওয়ার পর নতুন শাসক নিয়োগ করা পর্যন্ত অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা ছাড়ার পর নতুন কারও হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সংসদীয় কমিটির নিয়োগ মোতাবেক অনেকটা অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনব্যবস্থা বলা যায় এটিকে। এরকম ব্যবস্থার সর্বশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত শাসক ছিলেন লিপিকার আখিল ইবনে ইদরিস আল-কাইসি। আবুল কাসেম নামে খ্যাত এ শাসক ছিলেন রান্দার অধিবাসী। জ্ঞান ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। বুদ্ধিমত্তা ও

---

১০৯. অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল কারনির রাবিয়িল হিজরিয়্যি*, খ. ১, পৃ. ৫৩।

ভাষাগত শাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ছিলেন দানশীল, সহানুভূতিশীল, প্রখর মেধাসম্পন্ন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তিনি রান্দার শাসনভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তার স্থলে আরেকজনকে বসানো হয়। প্রথম জীবনে তিনি বিশিষ্ট কাযি আবু জাফর ইবনে হামদাইনের কেরানি ছিলেন। শেষজীবনে তিনি কর্ডোভা ও সেভিলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।[১১০]

ইসলামি সভ্যতার পুরোটা সময়জুড়ে মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গই ছিলেন এই উম্মতের কান্ডারি, আশার আলো। মুসলিমবিশ্বের কাঁধে যখনই কোনো অবিচার, অনাচারের খড়্গ পড়েছে তখনই তারা মাথা উঁচু করে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আওয়াজ তুলেছেন। এ সম্পর্কে মিশর ও সিরিয়ার সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স এবং ইমাম নববির মধ্যে সংঘটিত ঘটনাটি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাতারদের দখলদারি থেকে মুক্ত করার কারণে দামেশকের একটি এলাকা নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেন রুকনুদ্দিন বাইবার্স। প্রকৃত হকদারদের তা থেকে বঞ্চিত করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম নববি সুলতান রুকনুদ্দিনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। একের পর এক পত্র পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত রুকনুদ্দিন তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। একটি চিঠির ভাষা ছিল এরকম :

> এ ধরনের অধিকার চাপানোর ফলে মানুষ অবর্ণনীয় যাতনা ও সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছে। অন্যায়ভাবে সেখানকার অধিবাসীদের থেকে প্রমাণপত্র চাওয়া হচ্ছে। কোনো মুসলিম জ্ঞানীর কাছেই জনগণের ওপর এ ধরনের প্রক্রিয়া আরোপ বিধিসম্মত নয়। বরং যার অধিকারে যা আছে, সে তার মালিক। এ ব্যাপারে দ্বিমত করার এবং তার ওপর প্রমাণপত্র উপস্থিত করার দায় চাপানোর কোনো অবকাশ নেই। আমরা শুনেছি, সুলতান বাইবার্স শরিয়তের ওপর আমল করতে পছন্দ করেন। সরকারি কার্যনির্বাহী ও অধীনস্থদেরও শরিয়তমতে চলার কথা বলেন। ফলে আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারেও তিনি শরিয়তসমর্থিত বিধানই মেনে নেবেন।[১১১]

---

[১১০]. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৪।

[১১১]. আবদুর রাযযাক আল-কিলানি, *মিন মাওয়াকিফি উযামায়িল মুসলিমিন*, পৃ. ২৬২।

এরকম হাজারও ঘটনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জনসাধারণ সর্বযুগেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছেন। অবাধে নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সাদা-কালো, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকলেই এ স্বাধীনতা সমানভাবে উপভোগ করতেন। কোনো সন্দেহ নেই, এ বিষয়গুলো ইসলামি সভ্যতার মহত্ত্ব ও বড়ত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।
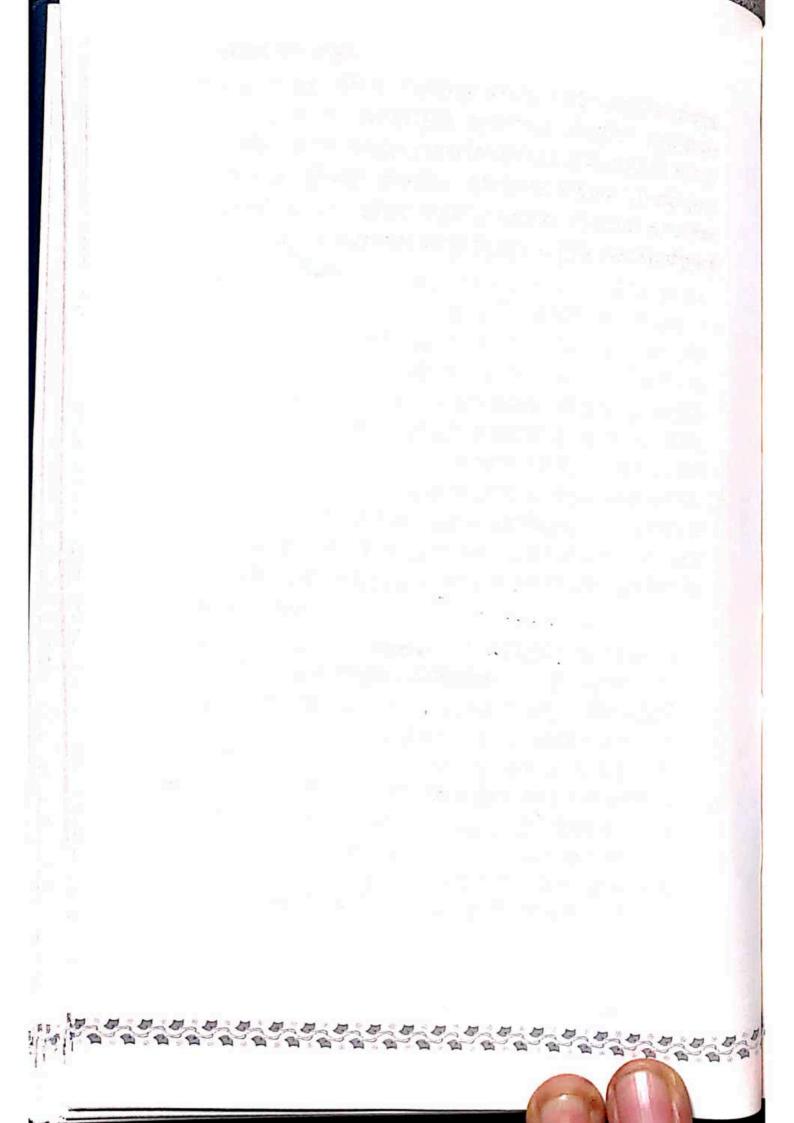
অষ্টম অনুচ্ছেদ

সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক যত গোলযোগ

ইসলামি সভ্যতা রাজনৈতিক ফেতনা ও গোলযোগসমূহকে বিচিত্র ও অভাবনীয় পদ্ধতিতে সমাধান করেছে, ইতিপূর্বে অন্য কোনো সভ্যতার ইতিহাসে যা দেখা যায়নি। সবগুলো রাজনৈতিক দাঙ্গা ও গোলযোগকে ক্ষমতার দাপটে বা অস্ত্রের বলে প্রতিহত করেনি, বরং ফেতনাবিশেষে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলো দমন করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি ফেতনার সময় ব্যক্তিপর্যায়ে করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কেও হাদিসে নববিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি বা অন্য কেউ ফেতনার কথা আলোচনা করলেন। তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ»

যখন দেখবে, মানুষের প্রতিশ্রুতিগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানতগুলো গুরুত্বহীন হয়ে গেছে এবং তারা সকলেই এরকম হয়ে গেছে (এ কথা বলার সময় তিনি হাতের আঙুলগুলো গুটিয়ে একত্র করে দেখান)। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আমি উঠে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ হোক! তখন আমি কী করব? তিনি বললেন, বেশিরভাগ সময় ঘরে অবস্থান করবে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ

করবে। যা ভালো মনে হয়, পালন করবে। যা মন্দ, তা বর্জন করবে। কেবল নিজের বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকবে। জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ফেতনার বিষয়ে একেবারেই মনোনিবেশ করবে না।[১১২]

এই হাদিসে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, ফেতনার সময় যে মুসলিম ফেতনার ব্যাপারে কিছু করার ক্ষমতা রাখে না তার ভূমিকা কী হতে পারে। তার জন্য তিনি ফেতনায় মনোনিবেশ না করে ফেতনার উত্তাপ না ছড়িয়ে নিজ ঘরে অবস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

মুসলিমবিশ্বে ঘটিত সবগুলো গোলযোগে ইসলামি সভ্যতা বাস্তবসম্মত ও কল্যাণকর পদক্ষেপ উপহার দিয়েছে। মুসলিম উম্মাহ প্রথম যে ফেতনার মুখোমুখি হয়, তা ছিল আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর সঙ্গে শামের গভর্নর মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের মাঝে সদ্যপ্রয়াত খলিফা উসমান রা.-এর হত্যাবিচার নিয়ে সৃষ্ট ফেতনা। আমিরুল মুমিনিন হিসেবে আলি রা. চাচ্ছিলেন মুআবিয়া রা.-কে শামের গভর্নর পদ থেকে অব্যাহতি দিতে। আর মুআবিয়া রা. চাচ্ছিলেন যে করেই হোক উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। এ নিয়ে দুপক্ষের মাঝে বিরোধ চরমে পৌঁছে। ফলে সংঘটিত হয় জামাল ও সিফফিনের মতো হৃদয়বিদারক যুদ্ধ। এরপর দেখা দেয় আরেক ফেতনা যা হলো আলি রা.-এর হত্যার ঘটনা। তখন পুরো মুসলিমবিশ্বের পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত ও অস্থিরতাপূর্ণ। এরকম জটিল ও কঠিন ফেতনাটি খলিফাতুল মুসলিমিন হাসান ইবনে আলি রা.-এর হাত ধরে খুব সুন্দর ও সঠিক সমাধানের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়। নিহত হওয়ার আগে আলি রা. পুত্র হাসান ও আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীকে এই বলে ওসিয়ত করে যান, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, এরপর আমি যেন আর তোমাদেরকে মুসলিমদের রক্ত নিয়ে খেলতে না দেখি। তোমরা বলতে পারো, আমিরুল মুমিনিন নিহত হয়েছেন। আমিরুল মুমিনিন নিহত হয়েছেন। সাবধান, এর বিচারে শুধু আমার হত্যাকারী ব্যক্তিকেই যেন হত্যা করা হয়। দেখো হাসান, আমি যদি এক আঘাতে নিহত হই, তাহলে তাকেও এক আঘাতে হত্যা করো। তার

---

[১১২]. *আবু দাউদ*, ৪৩৪৩; *ইবনে মাজাহ*, ৩৯৫৭; *আহমাদ*, ৬৯৮৭।

লাশ বিকৃত করো না।[১১৩] পুত্রের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা ছিল স্বয়ং নিহত হওয়া আলি রা.-এর। তার মৃত্যুর সময় যেমন অগণিত মুসলিমের রক্ত ঝরেছে, তার পর যেন আর কোনো মুসলিমের রক্ত না ঝরে, সে বিষয়ে তিনি হাসান ও গোটা আবদুল মুত্তালিব গোষ্ঠীকে ওসিয়ত করে যান। এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা থেকে কঠোরভাবে তাদের নিষেধ করেন।

আমিরুল মুমিনিন আলি রা. নিহত হওয়ার পর ৪০ হিজরি সনে গোটা উম্মাহ তার সুযোগ্য পুত্র হাসানের হাতে বাইআত গ্রহণ করে। আর আমিরুল মুমিনিন হিসেবে শপথ নেওয়ার পর হাসান রা. প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে তিনি প্রতিশোধের ইচ্ছা থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। তাকে এবং তার নিহত পিতাকে বিপৎকালে ধোঁকা দেওয়া ইরাকবাসীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর শান্তিচুক্তি করার জন্য মুআবিয়া রা.-এর কাছে দূত পাঠান। শেষ পর্যন্ত সফলভাবে তাদের মাঝে সেই চুক্তি সম্পাদিত হয়। মুসলিমদের পবিত্র রক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া ফেতনার দাবানল বন্ধ করতে মুআবিয়া রা.-এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন হাসান ইবনে আলি রা.।[১১৪]

মুসলিম জনসাধারণের রক্তের সুরক্ষা ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বেচ্ছায় হাসান ইবনে আলি রা.-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলামি সভ্যতা একজন মুসলিমের যথাযথ মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে, যা অন্যসব সভ্যতায় বিরল। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, রোমান সম্রাটগণ দাস ও হিংস্র প্রাণীর মাঝে লড়াইয়ের আয়োজন করত। এরপর হিংস্র প্রাণী যখন ভৃত্যকে পর্যুদস্ত করে তার বুক চিড়ে খেত, সম্রাট ও রাজকর্মচারীগণ খুব আনন্দের সঙ্গে সেই দৃশ্য উপভোগ করত। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। অপরদিকে ইসলামি সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, একজন

---

[১১৩]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১৫৮।
[১১৪]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১৬৭।

মুসলিমের রক্তপাত ঘটানো আল্লাহর কাছে পবিত্র কাবাঘর ধ্বংস করা থেকেও জঘন্য হারাম।[১১৫]

ফেতনা ও রাষ্ট্রীয় গোলযোগের সময় নমনীয়তা অবলম্বনের কথা বলেছে শরিয়ত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إن أُمِّرَ عليْكم عبدٌ حبشيٌّ مجدَّعٌ فاسمعوا لَهُ وأطيعوا»

> একজন হাবশি প্রতিবন্ধীকেও যদি তোমাদের নেতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শোনো। তার আদেশ মেনে চলো।[১১৬]

সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে যিনি নেতা হবেন, তাকেই একবাক্যে মেনে নিতে হবে এবং তার আদেশ সকলকে মেনে চলতে হবে, অধিকাংশ ফকিহ এমনটিই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য, জনগণের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, মুসলিমদের ঐক্য ও ভাবমূর্তি সুরক্ষা করতে এবং সর্বোপরি ফেতনার দরজা চিরতরে বন্ধ করতে উম্মাহকে একজন শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের মাঝে খিলাফত নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে তুমুল রক্তপাত ঘটে। তখন ইরাক, হেজায ও মিশর নিয়ে স্বাধীন হয়ে যান আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.। আর আবদুল মালিকের নিয়ন্ত্রণে অবশিষ্ট ছিল কেবল শাম। সে সময় বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পুত্রগণ উম্মাহকে বিভক্তকারী এই ফেতনায় অংশগ্রহণ করা থেকে মানুষকে কঠিনভাবে বারণ করেন। যতক্ষণ তারা উভয়ে বিবদমান ও বিভক্ত থাকবেন, ততক্ষণ তাদের কোনো একজনের কাছে বাইআত করা থেকে মানুষকে নিষেধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের বিজয়ের মাধ্যমে এবং অধিকাংশ জনগণ তার সমর্থক হওয়ার কারণে ফেতনার পরিসমাপ্তি ঘটে। গোটা মুসলিম জাহান

---

১১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার কাবাঘর তাওয়াফ করতে দেখি। কাবার উদ্দেশে তখন তিনি বলছিলেন, কত পবিত্র তুমি, কত পবিত্র তোমার সৌরভ! কত মহান তুমি, কত মহান তোমার গৌরব! যার হাতে আমার প্রাণ সেই প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই একজন মুমিনের মর্যাদা, সম্পদ ও রক্ত আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। মুমিনের প্রতি সবসময় সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য। দেখুন, *ইবনে মাজাহ*, ৩৯৩২; *তিরমিযি*, ২০৩২।

১১৬. *ইবনে মাজাহ*, ২৮৬১; *তিরমিযি*, ১৭০৬; *আহমাদ*, ২৭৩০১।

আবার একজন শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। অনেক বিখ্যাত ও বড় বড় সাহাবিও তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তাদের অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে তিনি চিঠি লিখে পাঠান, আমি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের রীতি অনুযায়ী আমিরুল মুমিনিন হিসেবে মেনে নিচ্ছি। আমি যথাসম্ভব তাঁর কথা শুনব, তার আদেশ মেনে চলব। আমার গোত্রের সবাই তা মেনে নিয়েছে।[১১৭]

ইসলামি শরিয়তে সবসময় যথাসম্ভব ফেতনা থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল, সংঘাত ও রক্তপাত বন্ধ করা। ঐক্য, সমতা, আল্লাহর ধর্মের প্রচার ও ইবাদতের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। ইসলামি সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য আগেও যা ছিল এখনো তা-ই আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি শরিয়তের বিধি মোতাবেক সর্বজনস্বীকৃত খলিফার বর্তমানে দ্বিতীয় কেউ খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করা শুরু করলে তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

> দুজন খলিফার বাইআত গ্রহণ করা হলে তাদের মধ্যে যার বাইআত পরে গ্রহণ করা হয়েছে তাকে হত্যা করো।[১১৮]

এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, একজন খলিফা নির্বাচন হওয়ার পর এবং সকলেই একবাক্যে তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়ার পর দ্বিতীয় কেউ যদি বাইআত করা শুরু করে, তাহলে সে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে বিবেচিত হবে। তাকে এবং তার অনুসারী সকলকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। হাদিসে উল্লেখিত «فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا» দ্বারা প্রথমেই হত্যা করা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তবে কোনো উপায় না থাকলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে।[১১৯]

---

১১৭. *বুখারি*, কিতাবুল আহকাম, বাব : কাইফা ইয়ুবায়িয়ুল ইমামুন নাসা, ৬৭৭৭।
১১৮. *মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, বাব : ইযা বুইয়া লি-খালিফাতাইন, ১৮৫৩।
১১৯. ইবনুল জাওযি, *কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সাহিহাইন*, খ. ১, পৃ. ৭৯৫।

ইসলামি সভ্যতা সবসময় মুসলিমদের ঐক্যকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। উদ্দেশ্য যদি হয় মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা, তাহলে বিজয়ী ব্যক্তিকেই নেতা হিসেবে মেনে নিতে হবে।[১২০] এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ ইউসুফ ইবনে তাশফিন। স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করত স্থানীয় গোত্রীয় রাজা-মহারাজাগণ। সবসময় তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে থাকত। এক অঞ্চলের সাথে যুদ্ধের জন্য অন্য অঞ্চলের রাজাদের সহায়তা নিত। এরপর স্পেনে ইসলামের শত্রুদের নির্মূল করার পর এবং ৪৭৯ হিজরি সনে ঐতিহাসিক যাল্লাকা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর ইউসুফ ইবনে তাশফিন এসব বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। সেনাপতিদের নির্দেশ দেন এসব অঞ্চলে অভিযান চালাতে। তার এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেন তৎকালীন বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট সব ওলামায়ে কেরাম। তাদের একজন হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি রহ.। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইসলামি সভ্যতার দর্শন কী হতে পারে তা স্পষ্ট করেন বিখ্যাত এই মুসলিম মনীষী। তিনি বলেন, নেতৃত্ব ও বিজয়ের এই নিশানকে উঁচু করার জন্য ইউসুফ ইবনে তাশফিনের এই পদক্ষেপটি যথার্থ ছিল। মুসলিম অঞ্চল পুনরুদ্ধারে নামা প্রতিটি সেনাপতির কর্তব্যও তাই। এমনকি শাসকের পক্ষ থেকে তিনি স্পষ্ট কোনো নির্দেশ না পেলেও, অথবা কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে তার কাছে শাসকের বার্তা পৌঁছতে দেরি হলেও।[১২১]

ইসলামি সভ্যতা ফেতনা ও গোলযোগ নির্মূলে কার্যকর সমাধান দেখিয়েছে এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে, যা অন্য কোনো সভ্যতা পারেনি। ইসলামি স্কলারগণও সবসময় উম্মাহর একতা রক্ষার স্বার্থে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও বিজয়ী খলিফার নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার কথা বলেছেন। এসবের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো উম্মাহকে একই পতাকাতলে সমবেত করা, উম্মাহর ঐক্য ও অভিন্নতা রক্ষা করা। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুসলিমদের হেফাজত করা। অন্যসব ধর্ম ও সভ্যতার সামনে ইসলামি সভ্যতার মর্যাদা ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা।

---

[১২০]. মুহাম্মাদ রশিদ রেজা, *আল-খিলাফা*, পৃ. ৪৪।
[১২১]. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুল মুরাবিতিন*, পৃ. ১২৩।

নবম অনুচ্ছেদ

শুরা (পরামর্শসভা)

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি সংগঠনের অবদানের কথা আলোচনা করতে গেলে এর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যগুলো আগে তুলে ধরতে হবে। জেনে রাখা দরকার, জনহিতকর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গটি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে ইসলাম। আর তা হলো শুরা (شورى) পদ্ধতি। মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে শুরা বা পরামর্শের গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে কুরআনুল কারিমের একটি পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম দেওয়া হয়েছে الشورى বলে।

শুরা পদ্ধতি কীভাবে এবং কতটুকু বাস্তবায়ন করতে হবে এ বিষয়ে ইসলামি আইনবিদগণ যদিও নানা মত প্রদান করেছেন, তবে মুসলিমদের মাঝে শুরা-রীতি প্রচলিত থাকা আবশ্যক, এ নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই।[১২২] কারণ মহান আল্লাহর নির্দেশ,

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।[১২৩]

শুরা হলো জনপ্রতিনিধি বা স্থলবর্তী নির্বাচনে অথবা জনগণের সার্বিক কল্যাণের ইস্যুতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা।[১২৪]

---

১২২. কুরতুবি, *আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ২৪৮-২৫২; ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ২, পৃ. ১৫০; কাসানি, *বাদায়িয়ুস সানায়ি*, খ. ৭, পৃ. ১২; কারাফি, *আয-যাখিরাহ*, খ. ১০, পৃ. ৭৫-৭৬; ইমাম শাফিয়ি, *আল-উম্ম*, খ. ৫, পৃ. ১৬৮; ইবনে কুদামা, *আশ-শারহুল কাবির*, খ. ১১, পৃ. ৩৯৯।

১২৩. সুরা আলে-ইমরান : ১৫৯।

১২৪. জাফর ইবনে আবদুস সালাম, *নিযামুদ দাওলাতি ফিল-ইসলামি ওয়া আলাকাতুহা বিদ-দুয়ালিল উখরা*, পৃ. ১৯৯।

এ আয়াতের ওপর ভিত্তি করে মুসলিমগণ 'শুরা পদ্ধতিকে' শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে যার মাঝে যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি লক্ষ করেন, তাকে নেতা হিসেবে প্রস্তাব করেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময় লিখিতভাবে কাউকে প্রতিনিধি বা শাসক হিসেবে নির্বাচন করে যাননি, বরং বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে গেছেন শুরা পদ্ধতির ওপর। এ থেকেই শুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুভব করা যায়। আবু ওয়ায়েল রা. বর্ণনা করে বলেন, একবার আলি ইবনে আবু তালিব রা.-কে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি আমাদের ওপর আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাবেন না? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল মৃত্যুর সময় কাউকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাননি, তাহলে আমি কীভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাব! তবে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ মঙ্গলের ইচ্ছা করলে অবশ্যই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তাদের জন্য শাসক হিসেবে নির্বাচন করে দেবেন। ঠিক যেমন নবীর মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মুসলিমদের শাসক করে দিয়েছিলেন।[১২৫]

এ থেকেই ইসলামের রাজনৈতিক অবকাঠামোতে শুরাব্যবস্থা একটি মৌলিক অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়, বরং মুসলিমদের প্রতিটি কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে এ পরামর্শব্যবস্থা। এ মহান ব্যবস্থা প্রণয়ন করে অধুনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অনেক আগেই ছাপিয়ে গেছে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। শাসক নির্বাচনে জনগণের ভোট লাগবে, রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত লাগবে, এ প্রক্রিয়ার গণতন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে মাত্র কয়েক শতাব্দী হলো, কিন্তু সেই চৌদ্দ শতাব্দী আগেই ইসলাম এর থেকে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীর সামনে এক আদর্শ ও সফল জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এখান থেকেই ইসলামে জনগণের মতামত ও চাহিদার মূল্য এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়।[১২৬]

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, কাদের নিয়ে এই শুরা বোর্ড গঠিত হবে? কারা করবে শাসক নির্বাচন? এ ব্যাপারে মুসলিম আইনবিদ ও ইতিহাসবিদগণ

---

১২৫. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা রা., বাব : আবু বকর সিদ্দিক রা., হাদিস নং ৪৪৬৩।

১২৬. ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৪-২৫।

যাদের কথা বলেছেন তারা কারা? কী তাদের পরিচয়? কারা আহলুল হাল্লি ওয়াল-আকদি?

মুসলিমদের নিয়ে একটি শুরা বোর্ড গঠিত হবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে আইনবিদগণ শুরা বোর্ডে সদস্যদের মধ্যে কিছু শর্ত পরিপূর্ণভাবে থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। শর্তগুলো হলো : পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা, যথেষ্ট জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এক কথায় বলা যায়, এ বোর্ডের সদস্যরা হবেন আলেম (জ্ঞানী), যোগ্য, নেতৃস্থানীয় এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।[১২৭]

শাসক ও বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারীদের জন্য শুরা পদ্ধতি অবলম্বন করাকে ফরয করেছে ইসলাম। আমরা বলতে পারি, শুরাব্যবস্থা মুসলিমদের আত্মস্থ করা এক সুমহান নির্বাচন পদ্ধতি, যা মুসলিম সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে প্রচলিত ছিল। বরং অন্যরাও এর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিল। বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কারণ শুরাব্যবস্থা মূলত মানুষের মাঝে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন। কেননা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ»

আমার উম্মত কখনো কোনো ভুল সিদ্ধান্তের ওপর একতাবদ্ধ হবে না।[১২৮]

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। সেটা হলো, ইসলামি রাষ্ট্রে একজন খলিফা কখনো অধিকর্তা বা স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। সকল বিষয়ে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখেন না। নতুন কোনো শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের অধিকার রাখেন না। বরং শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের ওপর। তবে নতুন কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা না থাকলে তখন শাসক সমাজের শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ লোকদের ইজতিহাদ ও মতামতের

---

১২৭. ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ*, খ. ১২, পৃ. ৭৭।

১২৮. *ইবনে মাজাহ*, কিতাবুল ফিতান, বাব : আস-সাওয়াদুল আযম, ৩৫৯০; *তিরমিযি*, ২১৬৭; *আবু দাউদ*, ৪২৫৩; *আহমাদ*, ২৭২৬৭।

ভিত্তিতে এর ফয়সালা করবেন।[১২৯] আর শাসক বা খলিফা নির্বাচন করবেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দ।

বর্তমান পৃথিবীতে শাসক বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের যতগুলো পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সকল পদ্ধতির চেয়ে মহান ও সুন্দর পদ্ধতি হলো ইসলামের এই শুরাব্যবস্থা, যার বাস্তব উদাহরণ আমরা খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে দেখতে পাই। যেমন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে যখন ছুরিকাঘাত করা হয়, তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, সাহাবিগণ তার কাছে পরবর্তী শাসক হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে উম্মতের শ্রেষ্ঠ ছয়জন সাহাবির সমন্বয়ে একটি শুরা কমিটি গঠন করে দিলেন। এই ছয়জনের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকল মুসলিম ছিলেন একমত। এখান থেকেই উমর রা. শুরা পদ্ধতির প্রচলন করেন। তিনি ঘোষণা করেন,

> তোমরা এই ছয় সদস্যের ওপর আস্থা রাখো। এই ছয়জনের জন্য আল্লাহর রাসুল জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আর সাইদ ইবনে যায়দ রা.-ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের একজন। তবে আমি তাকে এই শুরা বোর্ডে রাখছি না। সদস্য ছয়জন হলো : আবদে মানাফ বংশের আলি রা. ও উসমান রা.। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. (আল্লাহর রাসুলের মামা) ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.। আল্লাহর রাসুলের বিশিষ্ট সঙ্গী ও ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.। এই ছয়জন মিলে পরামর্শের ভিত্তিতে একজনকে শাসক হিসেবে নির্বাচন করবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তোমরা নবনির্বাচিত শাসককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে। যথাযথভাবে কর্তব্য পালনে তাকে সহায়তা করবে। তোমাদের কাউকে সে কোনো দায়িত্ব দিলে সুষ্ঠুভাবে সেই দায়িত্ব পালনের প্রয়াস করবে।[১৩০]

এরপর উমর রা. ইনতেকাল করেন। তার কাফন-দাফন সম্পন্ন করে ছয় সদস্যের শুরা বোর্ড বৈঠকে বসেন। তিন দিন পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের পর সুষ্ঠুভাবে শুরা কার্যক্রম শেষ হয়। উসমান ইবনে আফফান রা.-কে

---

১২৯. আবদুর রাযযাক সানহুরি, *ফিকহুল খিলাফা*, পৃ. ১২২-১২৩।
১৩০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ২৯৩।

পরবর্তী শাসক হিসেবে নির্বাচনের ব্যাপারে সকলেই একমত হন। পাঠক! জেনে আশ্চর্য হবেন যে উসমান রা.-এর হাতে প্রথম বাইআত গ্রহণকারী হলেন এ নির্বাচনে তার নিকটতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আলি ইবনে আবু তালিব রা.। ইসলামি শুরাব্যবস্থা যে সবচেয়ে উন্নত নির্বাচনব্যবস্থা তার অন্যতম প্রমাণ হলো উল্লিখিত ঘটনা। কারণ, শুরাব্যবস্থার মূলকথাই হলো নেতা নির্বাচনে জনগণের স্বাধীন মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। মদিনাবাসী উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিয়োগ করা এই ছয় সদস্যের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখেন। এ নির্বাচনব্যবস্থা উমরের পক্ষ থেকে জাতির ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া কোনো প্রক্রিয়া ছিল না। এরপর ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবিও উসমান ইবনে আফফান রা.-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্তে পৌঁছান। জাতির কল্যাণার্থে তাদেরই একজনকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করার ব্যাপারে তারা একমত হন। আর উসমান রা.-কে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে তারা শুধু নিজেদের ঐকমত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এমনটি নয়, বরং এ ব্যাপারে তারা মদিনায় বসবাস করা প্রত্যেক বিচারক, সেনাপ্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামতও গ্রহণ করেছিলেন।[১৩১] এ কারণেই আনসার ও মুহাজির নির্বিশেষে পুরো জাতি উসমান রা.-কে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে নিঃসংকোচে মেনে নেন এবং তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ইসলামি শুরাব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে সাংঘর্ষিক। কেননা গণতন্ত্রের মূলকথা হলো জনগনের জন্য জনগনের শাসন (For the people by the people)। অর্থাৎ জাতিই নির্ধারণ করবে জাতির শাসননীতি, সংবিধান। আর সেই শাসননীতির আদলেই পরিচালিত হবে শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও তা বিধিবদ্ধ করার ক্ষমতা জনগণের ওপর ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রব্যাপী মতামত বা ভোটগ্রহণের মাধ্যমে কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয় যাদের হাতে থাকে ক্ষমতা ব্যবহারের অবাধ অধিকার। সবকিছু তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন। রাষ্ট্রীয় কোনো আইন মুছে ফেলা বা যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এই জনপ্রতিনিধিবৃন্দ। যেকোনো উর্ধ্বতন সরকারি

১৩১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪২২।

দায়িত্বশীলকে বরখাস্ত করার, কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এমনকি প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত জবাবদিহির সম্মুখীন করার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ইসলামি শুরাব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। শুরাব্যবস্থা এক সুমহান সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার সারমর্ম হলো, শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত বিধান অনুযায়ী, যা ওহির মাধ্যমে তিনি তাঁর রাসুলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন। যা মেনে চলা ঈমানের অন্যতম মৌলিক দাবি। এই প্রক্রিয়ার নির্বাচক হবেন কেবল ইসলামি স্কলারগণ (বিজ্ঞ আলেম সম্প্রদায়)। তাদের নেতৃত্বেই গঠিত হবে শুরা বোর্ড। আল্লাহর প্রণীত কোনো বিধান পরিবর্তনের অধিকার কোনো আলেমের নেই। শুরা বোর্ডের একমাত্র কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। রাসুলের রাজনৈতিক জীবনকে সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করা খুব সহজ। যেমন, কোনো দল পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে একটি আইন প্রণয়ন করল। পরবর্তী সময় নতুন কোনো দল ক্ষমতায় বসে সেই আইনকে পুরোপুরি বিলুপ্ত ঘোষণা করে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী আইন পাস করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিলো। অপরদিকে শুরাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য আল্লাহর। আল্লাহর প্রণীত বিধানের ওপর চলবে মানুষের সকল আচার-অনুষ্ঠান। সকল নিয়মের ওপর প্রাধান্য পাবে আল্লাহর বিধান। শুরাব্যবস্থা শুধু এই সুমহান দায়িত্বটুকু এমন সব উপযুক্ত ব্যক্তির কাঁধে তুলে দেবে, যারা আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে জীবনযাপন করেন। নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহকে ভয় করেন।[১৩২]

আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, ইসলামি শাসনব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে এমন এক যুগে, যখন পারস্য, রোম, হিন্দুস্তান ও চীনসহ পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত ছিল চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও একনায়কতন্ত্র। এই শুরা পদ্ধতির সঙ্গে মানুষ পরিচিত ছিল না। এমনকি পৃথিবীতে গণতন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে ইসলাম আগমনের প্রায় বারোশ বছর পর ফ্রান্সে রাজতন্ত্র বিলুপ্তির পরবর্তী সময়ে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, শুরাব্যবস্থা ছিল

১৩২. আহমাদ আহমাদ গুলুশ, *আন-নিযামুস সিয়াসি ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৬১-৬৪।

বিশ্বমানবতার কল্যাণে মুসলিমদের রেখে যাওয়া অসামান্য অবদানগুলোর একটি।

যাই হোক, ইসলামি সভ্যতার সবগুলো অবদানের আলোচনা ও পূর্ণ বিশ্লেষণ এই ছোট্ট পরিসরে করা সম্ভব নয়। যেগুলো উল্লেখ করলাম, বিশ্বমানবতার কল্যাণে মুসলিমজাতির অসামান্য অবদানগুলো বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।
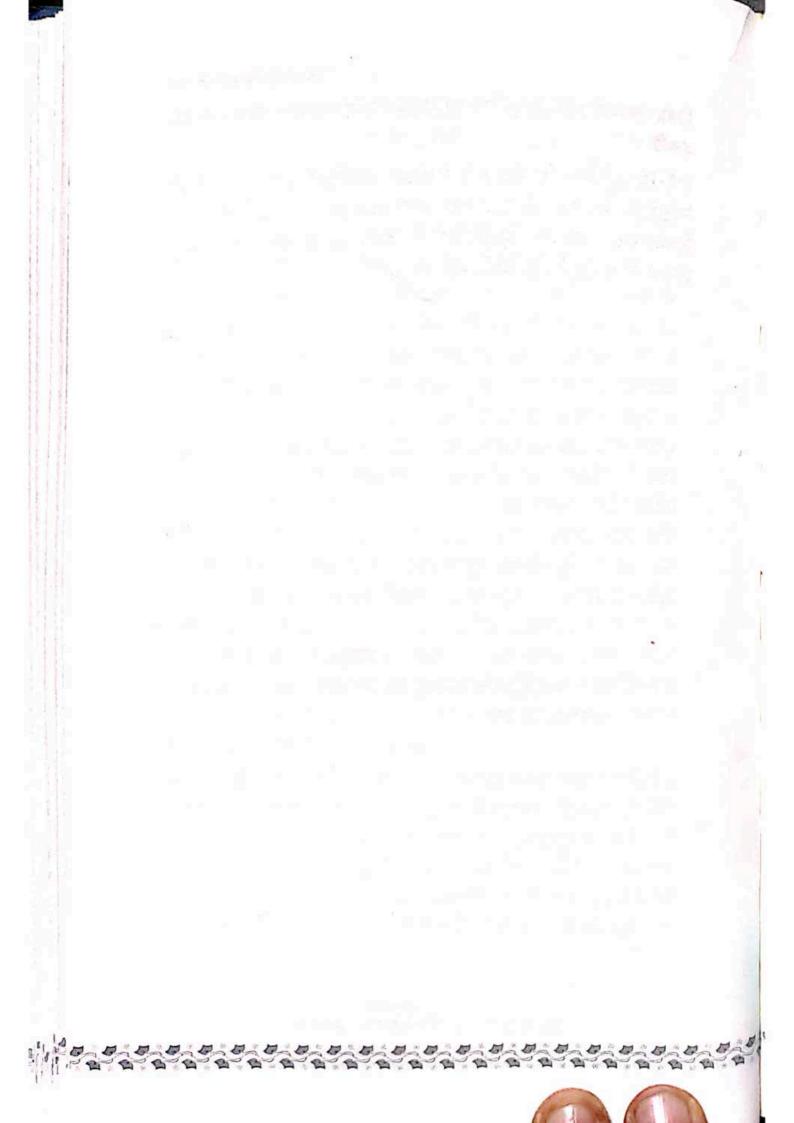
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণালয়

وَزَارَةٌ (ওয়ারাহ–মন্ত্রণালয়) একটি মৌলিক আরবি শব্দ। এটি وَزَرَ ও آزَرَ থেকে এসেছে। *লিসানুল আরব* গ্রন্থে ইবনে মানযুর রহ. বলেন, উযির হলেন শাসকের সঙ্গী ও বিশেষ সহচর, তার কাজ হলো শাসকের জটিল ও কঠিন কাজগুলো সমাধা করা। সুপরামর্শ দিয়ে তাকে সহযোগিতা করা।[১৩৩]

اَلْوَزَارَةُ শব্দের উৎস নিয়ে তিন রকম মত পাওয়া যায়।

এক. এটি اَلْوِزْرُ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ভার, ওজন। শাসকের কার্যভার বহন করেন বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে উযির (মন্ত্রী)।

দুই. কেউ কেউ বলেন এটি الوَزَر শব্দ থেকে বেরিয়েছে, যার অর্থ আশ্রয়কেন্দ্র। কুরআনুল কারিমে জাহান্নামিদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾

না, কোথাও আশ্রয়ের জায়গা নেই।[১৩৪]

কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় শাসক মতামত গ্রহণের জন্য উযিরের আশ্রয় নিয়ে থাকেন বলে তাকে উযির বলা হয়। আবার,

তিন. কেউ বলেন এটি الأَزْر থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ পিঠ বা মেরুদণ্ড। দেহের জন্য পিঠ ও মেরুদণ্ডের ভূমিকা যেমন, একজন শাসকের জন্য উযিরের ভূমিকাও তেমন। সে হিসেবে

---

১৩৩. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, وزر মূল ধাতু, খ. ৫, পৃ. ২৮২।

১৩৪. সুরা কিয়ামা : ১১।

তাকে উযির বলা হয়।[১৩৫] কুরআনুল কারিমে নবী মুসা আ.-এর বিবরণ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ এ শব্দটি ব্যবহার করেন,

﴿وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾

(মুসা আ. আল্লাহর কাছে দোয়া করতে গিয়ে বলেন,) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী দিন। আমার ভাই হারুনের মাধ্যমে আমার কোমর (শক্তি) আরও মজবুত করে দিন। তাকে আমার কাজে অংশীদার করে দিন।[১৩৬]

আল-কুরআনের আরেকটি জায়গায় আমরা এ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই,

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾

আমি তো মুসাকে দিয়েছি কিতাব এবং তার ভাই হারুনকে বানিয়েছি তার একান্ত সহযোগী। এরপর আমি বলেছি, তোমরা ওই জাতির কাছে যাও যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এরপর আমি তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি।[১৩৭]

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় রাষ্ট্রীয় ও জনকল্যাণকর কোনো কাজ করার আগে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা নিতেন আবু বকর রা. এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে। আবু সাইদ খুদরি রা. বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

---

১৩৫. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২৪।

১৩৬. সুরা তহা : ২৯-৩৩।

১৩৭. সুরা ফুরকান : ৩৫-৩৬।

আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে আমার উযির দুজন: জিবরাইল ও মিকাইল। আর জমিনবাসীর মাঝেও আমার দুজন উযির আছে: আবু বকর ও উমর।[১৩৮]

বনি সায়িদার আশ্রয়কেন্দ্রে আনসারদের উদ্দেশে আবু বকর রা. বলেছিলেন,

«نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ»

আমরা (মুহাজির) হলাম শাসকশ্রেণি আর আপনারা হলেন (আনসার) উযিরশ্রেণি।[১৩৯]

এই হাদিসের মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝা যায়, উযির শব্দ বলে সহযোগী অর্থ নেওয়া হয়েছে, শাসনভার গ্রহণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন উযির জাতীয় শব্দের প্রচলন ঘটেছে আব্বাসীয় শাসন থেকে, এর আগে এ ধরনের পরিভাষা ও শব্দ অপরিচিত ছিল, তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য এ হাদিসটিই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।[১৪০]

ইসলামি সভ্যতায় ওযারাত বা মন্ত্রণালয়ের সীমাহীন গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে একে আমরা স্বতন্ত্র দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছি, তা হলো :

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয়ের মহত্ত্ব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

---

১৩৮. *তিরমিযি*, কিতাবুল মানাকিব, বাব : ফি মানাকিবি আবি বকর রা. ওয়া উমর রা., হাদিস নং ৩৬৮০। এই হাদিসটিকে তিনি হাসান গরিব বলেছেন। *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৩০৪৬; তিনি এই হাদিসটিকে সহিহুল ইসনাদ বলেছেন, তবে তাখরিজ করেননি। ইমাম যাহাবিও তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

১৩৯. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৪৩।

১৪০. আবদুল আযিয আদ-দুরি, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৪।
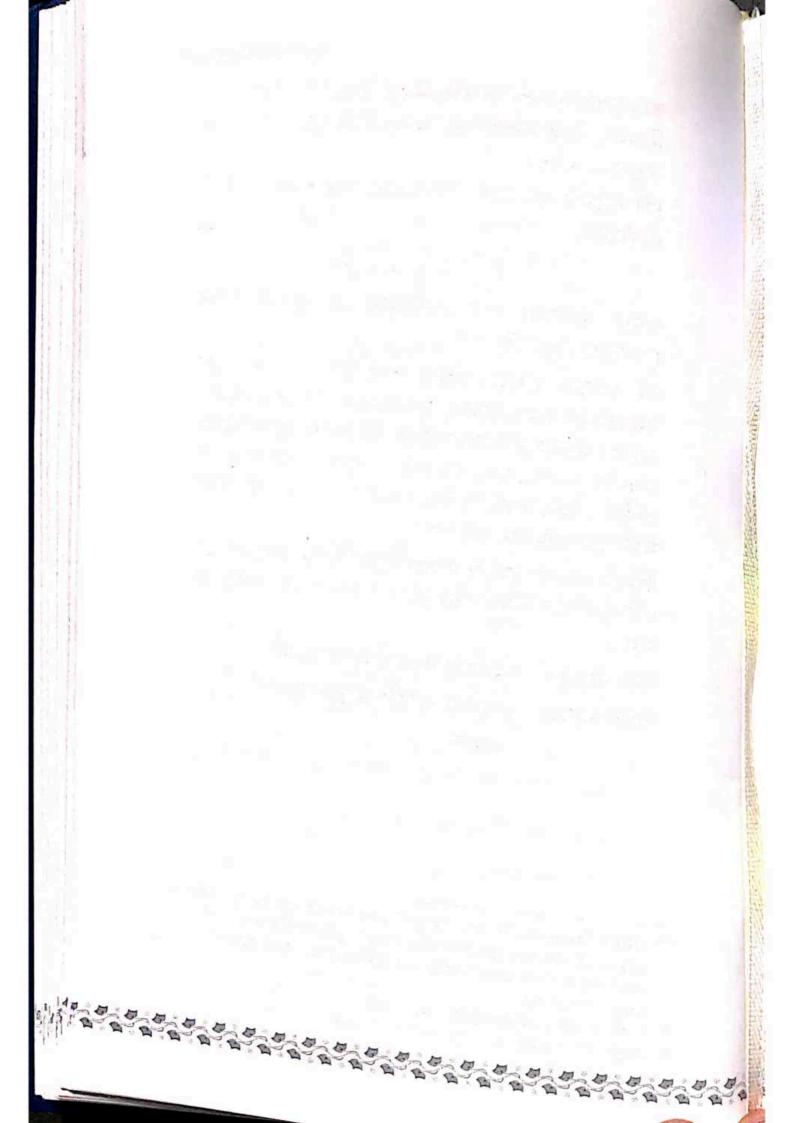
প্রথম অনুচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয়ের মহত্ত্ব

অনেক মুসলিম মনীষী ও ইতিহাসবিদ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে কথা বলেছেন। মাওয়ারদি বলেন, জনগণের সকল ইস্যু নিয়ে কাজ করা এবং সকল-কিছু সমাধা করা, এ জাতীয় কাজগুলো একা শাসকের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সেজন্য তার দরকার হয় সহযোগী ও সুপরামর্শদাতার। একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে বরং বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের মতামতের ভিত্তিতে কোনো কাজ সমাধা করলে তা সঠিক ও যথাযথ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। পদস্খলন বা ত্রুটিবিচ্যুতির আশঙ্কা অনেকাংশেই কমে যায়। অন্যের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করলে কাজে সফলতার নিশ্চয়তাও বেড়ে যায়।[১৪১] গুরুত্বপূর্ণ এ মন্ত্রণালয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনে খালদুন রহ. বলেন, মন্ত্রণালয় হলো রাজসভার প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগকারী পরিষদ। কারণ মন্ত্রণালয়ের আরবি وزارة (বিযারা) শব্দের মূল অর্থেই লুকিয়ে আছে সহযোগিতার মর্মকথা।[১৪২]

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর শাসনামলে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ছিলেন রাজ্যের প্রধান উপদেষ্টার ভূমিকায়। সকল কাজে তিনি খলিফা আবু বকর রা.-কে সহযোগিতা করতেন। সুপরামর্শ দিতেন। ওহির সম্মানিত লেখক সাহাবিদের কাছে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা কুরআনের সুরা ও আয়াতগুলো একত্র করার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শটিও উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর দেওয়া। কারণ ঐতিহাসিক ইয়ামামার যুদ্ধে অধিকাংশ হাফেয ও কারি[১৪৩] শহিদ হয়ে যাওয়ায় খলিফা আবু বকর রা.-এর কাছে তিনি কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। পবিত্র

---

১৪১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৩২।

১৪২. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২৩৬।

১৪৩. তারা শুধু কারি ও হাফেযই ছিলেন না, বরং উঁচুমানের আলেমও ছিলেন।-সম্পাদক।

কুরআন একত্র করার কাজে প্রধান ভূমিকা পালনকারী যায়দ ইবনে সাবিত রা.-এর বিবৃতিতে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উঠে এসেছে : ইয়ামামার যুদ্ধের পর আমিরুল মুমিনিন আবু বকর রা. আমাকে ডেকে পাঠান। গিয়ে দেখি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার কাছে উপস্থিত। আবু বকর রা. আমাকে বললেন, উমর আমার কাছে এসে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কুরআনের কারি ও হাফেয শহিদ হয়েছেন। আমার আশঙ্কা, এভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে কুরআনের কারিগণ শহিদ হয়ে গেলে কুরআনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আমার পরামর্শ, আপনি কুরআন একত্র করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এ কথা শুনে আমি উমর রা.-কে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে যাননি তা আপনি কীভাবে করবেন? তা শুনে উমর রা. বললেন, আল্লাহর শপথ, এ উদ্যোগের ফলে অনেক কল্যাণ সাধন হবে। এরপর উমর বারবার আমার কাছে বিষয়টি উত্থাপন করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন। আমিও উমরের মতো বিষয়টি ভাবতে লাগলাম। যায়দ রা. বলেন, এরপর আবু বকর রা. আমাকে বললেন, আপনি একজন বিবেকবান যুবক পুরুষ, আপনার প্রতি আমরা পূর্ণ আস্থাশীল। এমনকি আপনি ছিলেন আল্লাহর রাসুলের ওপর অবতীর্ণ ওহির অন্যতম লেখক। তাই আমার সিদ্ধান্ত, আপনি কুরআনের অংশগুলো খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করে সবগুলো একত্র করুন।[১৪৪]

এ থেকেই বোঝা যায়, মন্ত্রিত্বের বিষয়টি আব্বাসীয় শাসনামলের আবিষ্কার বা ইসলামধর্মে পারসিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ নয়, বরং বিশ্বনবীর জীবনী ও তার বক্তব্যসমগ্র থেকে এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলের দিকে তাকালেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, মন্ত্রিত্বের বিষয়টি ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত একটি বিষয়।

তবে যাই হোক, উমাইয়া শাসনামলে মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রিত্বের পদগুলোতে অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। রাজ্য সম্প্রসারণ, মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন ঐতিহ্য ও সভ্যতা নিয়ন্ত্রণে আবশ্যকভাবে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুপরামর্শ দরকার হতো খলিফাদের। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা লক্ষ করি, বিখ্যাত খলিফা মুআবিয়া ইবনে আবি

---

১৪৪. *বুখারি*, কিতাব : ফাজায়িলুল কুরআন, বাব : জামউল কুরআন, ৪৭০১।

সুফিয়ান রা. উযির (মন্ত্রী) হিসেবে নিয়োগ করেন আরেক বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনুল আস রা.-কে। যদিও তখন মন্ত্রিত্ব শব্দটি ব্যবহৃত হতো না। একবার আমর ইবনুল আস রা. মুআবিয়া রা.-এর উদ্দেশে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি কি আপনাকে সুপরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করি না? উত্তরে মুআবিয়া রা. বলেন, এর ফলেই তো আজ আমি যা অর্জন করার, তা অর্জন করতে পেরেছি।[১৪৫]

উযির শব্দের সরাসরি প্রচলন উমাইয়া শাসনামলে যে প্রচলিত ছিল এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ তাবারি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের (মৃ. ১২৫ হি.) শাসনামলে একবার মিশরের অধিবাসীগণ তাদের দেশে নিযুক্ত গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে রাজদরবারে উপস্থিত হলো। অনেক চেষ্টা করেও তারা খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারল না। দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করে যখন তাদের আসবাব ও রসদ শেষ হয়ে এলো, তখন কয়েকটি ছোট্ট কাগজে তাদের নামগুলো লিখে উযিরদের (মন্ত্রীদের) কাছে দিয়ে বলল, এগুলো আমাদের নাম ও বংশপরিচয়। নামগুলো পড়ে আমিরুল মুমিনিন যদি আমাদের খোঁজ করেন তাহলে আমাদের খবর দেবেন।[১৪৬] উপরের ঘটনাতে বিবৃত উযিরগণ (মন্ত্রিগণ) খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের নিকটস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং রাজ্যের কার্যনির্বাহী শ্রেণি ছিল এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বরং তাবারির বর্ণিত ৮৫ হিজরি সনের ঘটনাসমগ্রে আমরা পরিষ্কার জানতে পারি যে, সে সময় কাবিসা ইবনে যুআইবের ভূমিকা ছিল আমাদের বর্তমান সময়ের সরকারি মন্ত্রীদের মতো। যার ফলে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বলতেন, দিন হোক, রাত হোক কাবিসা যেন কখনো আমার চোখের আড়াল না হয়। আমি নির্জনে থাকি, কারও সাথে নীরবে সংলাপ করি, বা স্ত্রীদের সঙ্গে থাকি, সবসময় যেন তাকে আমার কাছে আসার সুযোগ দেওয়া হয়। কাবিসা কোথায় আছে সে খবর যেন সবসময় আমার কাছে সরবরাহ করা হয়। রাষ্ট্রীয় সিলমোহর ও মুদ্রা তৈরির নকশা তার কাছেই থাকত। খলিফার পক্ষ থেকে সবসময় তার

---

[১৪৫]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ২৪৭।
[১৪৬]. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৩।

কাছে সংবাদ আসত। খলিফার আগে তিনিই চিঠিপত্র পড়ে নিতেন। খলিফা আবুদল মালিকের কাছে তিনিই পত্র খুলে নিয়ে আসতেন।[১৪৭]

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে পরিষ্কার, উমাইয়া শাসনামলে মন্ত্রিত্বের প্রচলন ছিল। সে যুগে মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব ছিল কেবল খলিফাকে পরামর্শ দেওয়া। তখন মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রীয়ভাবে সরাসরি ক্ষমতা বাস্তবায়নের অধিকার রাখতেন না। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ছিল, যেমনটি উমাইয়া শাসনামলের সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের উযির (মন্ত্রী) বিখ্যাত লেখক আবদুল হামিদের বেলায় আমরা দেখতে পাই।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, আব্বাসি শাসনামলে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। আব্বাসি খিলাফতে উযির নিয়োগের ব্যাপারটি ছিল খুব জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আবু সালাম আল-খাল্লাল নামে খ্যাত হাফস ইবনে সুলাইমানকে (মৃ. ১৩২ হি./৭৫০ খ্রি.) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম উযির (মন্ত্রী) উপাধি পাওয়া ব্যক্তি ধরা হয়। 'মুহাম্মাদ বংশের উযির (মন্ত্রী)' বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচারে তিনি বিপুল অর্থ খরচ করেন।[১৪৮]

আবু জাফর আল-মনসুর ছিলেন আব্বাসীয় শাসনামলের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি আবু আইয়ুব আল-মুরিয়ানি নামে খ্যাত সুলাইমান ইবনে মুখাল্লাদকে সরকারি দফতর সংরক্ষণের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। ইবনে কাসির রহ. তার ব্যাপারে লেখেন, তিনি ছিলেন রচনা ও প্রকাশনা বিভাগের প্রধান।[১৪৯]

আব্বাসীয় শাসনামলে উযিরের (মন্ত্রীর) ক্ষমতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এমনকি রাজ্যের ও জনগণের সকল বিষয় তদারকির একমাত্র দায়িত্ব বর্তায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে। বারমাকি পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে এমনটিই আমরা লক্ষ করি। যেমন ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ আল-বারমাকিকে রাজ্যের যেকোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অবাধ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ফলে রাজ্যের সকল-কিছুতে আদেশ-নিষেধের কর্তৃত্ব তার হাতে চলে যায়। ইবনে কাসির রহ. উল্লেখ করেন, হারুনুর রশিদ

---

১৪৭. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭।
১৪৮. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ২৬৩।
১৪৯. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১১০।

খলিফা হওয়ার পর ইয়াহইয়া ইবনে খালেদের অধিকারকে তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নেন। তাকে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সব পদের দায়িত্ব প্রদান করেন। বারমাকিগণ যতদিন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, ততদিন তাদের এই ক্ষমতা ও অধিকার বলবৎ ছিল।[১৫০]

আব্বাসীয় খলিফাগণ সবসময় শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতাসম্পন্ন উযিরদের সন্ধানে থাকতেন। এমনকি বিখ্যাত আব্বাসি শাসক মামুনুর রশিদ উযির পদে নিয়োগের জন্য কিছু শর্ত ও মানদণ্ড আরোপ করেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি আমার রাজ্যের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনার জন্য এমন একজন লোকের সন্ধান করছি যিনি হবেন সকল উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী। যিনি হবেন একাধারে সচ্চরিত্র। নিজের দায়িত্ব পালনে অটল ও নিষ্ঠাবান। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতায় যিনি সমৃদ্ধ। তার কাছে গোপনীয় কিছু বলা হলে তিনি তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলে আন্তরিকভাবে তা পালন করবেন। তিনি নীরব থাকবেন বিচক্ষণতার সাথে। কথা বলবেন প্রজ্ঞার সাথে। সুযোগকে কাজে লাগাবেন। শত্রুদের রক্তচক্ষুর প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তার মাঝে থাকবে আমিরদের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তিদের শিষ্টাচার। বিদগ্ধ লোকদের বিনম্র স্বভাব। তার থাকবে বিশেষজ্ঞদের মতো বিবেক। তার প্রতি সদাচরণ করা হলে তিনি কৃতজ্ঞ হবেন। দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হলে তিনি ধৈর্যের পথ বেছে নেবেন। আজকের সামান্য কিছুর বিনিময়ে আগামীর অপার সম্ভাবনাকে তিনি বেচে দেবেন না। ভাষার মাধুর্য ও কথার জাদু দিয়ে তিনি মানুষের অন্তর জয় করে নেবেন।[১৫১]

উপর্যুক্ত গুণাবলির বিচারে ফযল ইবনে সাহলকে (মৃ. ২০২ হি.) খলিফা মামুন উযির (মন্ত্রী) হিসেবে নিয়োগ দেন। ইসলামের ইতিহাসে ফযল ছিলেন বিখ্যাত ও মহান উযিরদের একজন। তার মর্যাদা ও বিচারবুদ্ধি দেখে রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ের ভার তার ওপর ন্যস্ত করে তার নাম দেন ذو الرياستين বা দুই ক্ষমতার অধিকারী।[১৫২] কারণ লেখালেখি ও রচনা

---

১৫০. প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২০৪।

১৫১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৩০-৩১।

১৫২. খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১৪, পৃ. ২২৯।

বিভাগের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধবিষয়ক অধিদপ্তরের দায়িত্বও ছিল তার কাঁধে। রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা উভয় বিষয়ের সকল ইস্যু দেখাশোনা ও পরিচালনা করতেন তিনি। এমন যুগপৎ গুণাবলি তার আগে কোনো মন্ত্রীর ছিল না। ঠিক তেমনই মন্ত্রণালয়ের এই মহান দায়িত্ব লিখিতভাবে বিশেষ সম্মাননার সঙ্গে তাকে প্রদান করা হয়। এটি ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদত্ত এক বিরল সম্মাননা। এটি সুস্পষ্ট হয় পত্রের বিবরণ থেকে। খলিফা মামুনুর রশিদের পক্ষ থেকে প্রদেয় সেই লিখিত পত্রের বিবরণে ছিল : আমি আপনাকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিচ্ছি, যে পদের অধিকারী ব্যক্তি কাউকে কোনো আদেশ করলে অবশ্যই তাকে তা পালন করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ পদের চেয়ে বড় আর কোনো পদ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবেন, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন, ততদিন আপনার এই অধিকার বলবৎ থাকবে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আপনাকে এসব ক্ষমতা প্রদান করছি। এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য মহান আল্লাহকেই একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক মেনে নিচ্ছি। ১৯৪ হিজরি সনের সফর মাসে এই অধিকার প্রদানপত্র লেখা সম্পন্ন হলো।[১৫৩]

হিজরি চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত উযির (মন্ত্রী) হলেন ইবনুল আমিদ আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (মৃ. ৩৬০ হি.)। বুওয়াইহি রাজবংশের[১৫৪] উযির হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, খিলাফতের রাজসভায় তার বন্দনা হতো। তাকে বিরাট মর্যাদা দেওয়া হতো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা তায়ি লিল্লাহ তাকে যুল-কিফায়াতাইন নামকরণ করেন। অর্থাৎ তিনিও রচনা ও লেখালেখির পাশাপাশি যুদ্ধবিষয়ক কার্যক্রমও সমানভাবে পরিচালনা করতেন।[১৫৫]

---

১৫৩. হিময়ারি, *আর-রওযুল মিতার*, পৃ. ৩১৬; আবদুল আযিয আদ-দুরি, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৫।

১৫৪. ডায়ালাসের এক রাজবংশ যারা পশ্চিম ইরান এবং ইরাকে ৯৩২-১০৫৬ খ্রি. পর্যন্ত শাসন করেছিল।-সম্পাদক

১৫৫. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২, পৃ. ২৮২; যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ২৬, পৃ. ২১৬।

উযির (মন্ত্রী) ইবনুল আমিদের প্রতি বিখ্যাত আব্বাসি খলিফা তায়ি লিল্লাহর এই অগাধ শ্রদ্ধা ও মর্যাদাদানের বিষয়টি কাকতালীয় কিছু ছিল না। কারণ ইবনুল আমিদ সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন। রণাঙ্গনে সশরীরে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন বীরত্বের প্রতীক। স্বল্পভাষী। কেউ জিজ্ঞেস না করলে অথবা কথা বললে উপকার হবে না এরকম জায়গায় কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। সচ্চরিত্র ও পবিত্র আচরণে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। সুসাহিত্যিক বা বিশেষজ্ঞ কোনো আলেম তার কাছে এলে মন দিয়ে তিনি তাদের কথা শুনতেন। তারপরও রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ ও গোলযোগের কারণে বাগদাদে যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল, স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছিল, তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এ কারণেই তার সংক্ষিপ্ত মন্ত্রিত্বের আমলে তিনি বিরাট মর্যাদার অধিকারী হয়ে যান। চারিদিকে তার প্রশংসা ও স্তুতি ছড়িয়ে পড়ে। তার হস্তক্ষেপে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ফিরে আসে। বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ যথাযথ মর্যাদা লাভ করেন। তার এই অভাবনীয় উন্নতি দেখে বুওয়াইহি রাজবংশের লোকেরা রাজত্ব ও ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে।[১৫৬]

মন্ত্রণালয়ের বিষয়টি ছিল খুবই সূক্ষ্ম, তাৎপর্যপূর্ণ ও দীর্ঘ পরিশ্রমের বিষয়। ইতিহাসবিদ শাবুশতি[১৫৭] উল্লেখ করেছেন, বিখ্যাত উযির সাইদ ইবনে মুখাল্লাদ (মৃ. ২৭৫ হি.) রাত জেগে নামাযে মশগুল থাকতেন। সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত নামায আদায়ে মগ্ন থাকতেন। এরপর অপেক্ষমাণ মানুষদের সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন। নানা প্রয়োজনে আসা জনসাধারণ সালাম দিয়ে তার কক্ষে ঢুকত। এরপর খিলাফতের রাজসিংহাসনে উপবেশন করে প্রায় চার ঘণ্টা সেখানে অবস্থান করে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও অভিযোগ শুনে সেগুলোর ফয়সালা করতেন। সেখান থেকে ঘরে ফিরে যোহর পর্যন্ত আবারও মানুষের দাবিদাওয়া ও আবেদনগুলো দেখতেন। উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলের খোঁজখবর নিতেন। যোহরের নামায আদায়

---

১৫৬. অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি*, খ. ১, পৃ. ১৮৭-১৮৮; ইহসান আব্বাস, *শাযারাতুন মিন কুতুবিন মাফকুদাতিন*, খ. ২, পৃ. ২৪০।

১৫৭. শাবুশতি : পুরো নাম আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাবুশতি। মৃ. ৩৯০ হি., ১০০০ খ্রি.। একজন বিখ্যাত লেখক। তিনি মিশরের আযিয বিল্লাহ ফাতেমির রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তার লিখিত কিতাব হলো *আদ-দিয়ারাত*, *মারাতিবুল ফুকাহা*। ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৩১৯।

করে তিনি দুপুরের খাবার সারতেন। এরপর ঘুমিয়ে পড়তেন। সন্ধ্যায় রাজদরবারের বৈঠকে বসে মধ্যরাত পর্যন্ত অর্থ ও হিসাবসংক্রান্ত কাজগুলো শেষ করতেন। তার নিত্যদিনের কাজ এই রুটিন অনুযায়ী চলত। দৈনন্দিন কোনো রাষ্ট্রীয় কাজই তার অজানা থাকত না। এরপর আর্থিক ঘাটতি ও ক্ষতির বিষয়গুলো সামনে নিয়ে তার কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ে মনোনিবেশ করতেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তার কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে যেতেন। এরপর সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে মনোরঞ্জন শেষ করে ঘুমিয়ে যেতেন।[১৫৮]

ইসলামি সভ্যতায় এমন অনেক উযির-মন্ত্রীই ছিলেন, যারা রাজনৈতিক বিভাগ ও দপ্তরগুলো পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক ছিলেন। ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণে তাদের ছিল বিরাট অবদান। এমনই একজন হলেন সেলজুক সাম্রাজ্যের বিখ্যাত উযির (মন্ত্রী) নিজামুল মুলক হাসান ইবনে আলি ইবনে ইসহাক। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, তিনিই বড় বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন বাগদাদে, নিশাপুরে, ইরানের বিখ্যাত শহর-তুসে। ইলম ও জ্ঞানের প্রচার প্রসারে তিনি ছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক। ছাত্র ও শিষ্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। হাদিস রচনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে পুরো মুসলিম-বিশ্বজুড়ে।[১৫৯]

বড় মাদরাসা বলতে ইমাম যাহাবি রহ. এখানে বাগদাদের মাদরাসায়ে নেজামিয়া উদ্দেশ্য করেছেন। শুনে অবাক হবেন, তিনি বাগদাদের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে মাদরাসায়ে নেজামিয়াতে যেতেন হাদিসের দরস দিতে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল আসিরের বর্ণনায়, মাদরাসায়ে নেজামিয়ায় প্রবেশ করে লাইব্রেরিতে বই নিয়ে অধ্যয়নে বসেন নিজামুল মুলক। সেখানে অসংখ্য গ্রন্থ পাঠ করেন। মানুষ তার কাছ থেকে হাদিসের কিছু অংশ গ্রহণ করে এবং আরও কিছু অংশের শ্রুতলিপি লেখান।[১৬০]

---

১৫৮. শাবুশতি, *আদ-দিয়ারাত*, পৃ. ৬৬।

১৫৯. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৯, পৃ. ৯৬।

১৬০. ইবনুল আসির, *আল-কামিল*, খ. ৮, পৃ. ৪৪৯।

সাহাবি যুগের পর ইসলামি সভ্যতায় নিজামুল মুলক সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও ছিলেন বিখ্যাত উযিরদের (মন্ত্রীদের) একজন। আলেম তথা জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের তিনি ভালোবাসতেন। তাদের যথাযথ মর্যাদা দিতেন। ইমাম আবুল কাসেম আল-কুশাইরি এবং ইমাম আবুল মাআলি আল-জুওয়াইনি যখন নিজামুল মুলকের দরবারে যেতেন, তখন তাদের সম্মানে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। নিজ সিংহাসনে তাদের বসাতেন। আরেক বিখ্যাত আলেম আবু আলি আল-ফারমাযি তার দরবারে এলেও একই রকম করতেন। রাজ আসনে তাকে স্থান দিয়ে তিনি তার সামনে নিচে বসে যেতেন। তার সামনে এরকম কেন করেন এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এ দুজনের (জুওয়াইনি ও কুশাইরি) মতো অনেক আলেম রয়েছেন, যারা আমার দরবারে এসে আমাকে প্রশংসার সাগরে ভাসিয়ে দেন। অতিমাত্রায় স্তুতি ও গুণগান করেন। তাদের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। হতাশা আমাকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু এই শাইখ (ফারমাযি) এসে চোখে আঙুল দিয়ে আমার দোষত্রুটি ধরিয়ে দেন। কারও প্রতি কোনো অবিচার করলে আমাকে সাবধান করে দেন। তা শুনে আমার অন্তর নরম হয়। অহমিকা দূর হয়। সেই ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিই।[১৬১]

ইলম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি নিদারুণ অনুরাগ থেকেই নিজামুল মুলক রচনা করেন যথাক্রমে *সিয়াসতনামা* অথবা *সিয়ারুল মুলুক* নামক বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি তিনি (৪৭৯ হি.) সেলজুক সুলতান মালিকশাহ ইবনে মুহাম্মাদের উদ্দেশে রচনা করেন। এর পেছনে তার লক্ষ্য ছিল পূর্ববর্তী সফল রাষ্ট্রনায়কদের বৃত্তান্ত তুলে ধরে দেশ পরিচালনার সঠিক ও যথার্থ পদ্ধতিগুলো তার সামনে উপস্থাপন করা। যেন সেলজুক সাম্রাজ্য সেই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নীতি ও পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে সফলতার শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করতে পারে। নিজামুল মুলক তার এই উদ্দেশ্য পাঠকদের কাছে স্পষ্ট করেছেন এভাবে, এ কারণেই আমি আমার সারা জীবনের দেখা ও বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে শেখা অভিজ্ঞতাগুলো পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি।[১৬২] কোনো সন্দেহ নেই গ্রন্থটি সুলতানের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। পরবর্তীকালে পাঠকদের

---

[১৬১]. ইবনুল আসির, *আল-কামিল*, খ. ৮, পৃ. ৪৮১।

[১৬২]. নিজামুল মুলক, *সিয়াসাতনামা*, পৃ. ৪৪।

কাছেও বইটি বিরাট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এসবের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয় নিছক সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা পূর্ববর্তী কালের মহাপুরুষদের রেখে যাওয়া প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোয় আলোকিত ছিল।

ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য-সংক্রান্ত আলোচনায় আন্দালুসের ইতিহাস আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। মুসলিমবিশ্বের সর্বপশ্চিমে অবস্থিত এই সাম্রাজ্যে মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো ছিল অনেকটা বর্তমান সময়ে প্রচলিত মন্ত্রিপরিষদের মতো। শুরুতে খলিফা নিজেই প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকা পালন করতেন। এরপর ধীরে ধীরে তা হালনাগাদ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'হাজিব' হন প্রধান মন্ত্রী। হাজিব একটি পদ, যার স্থান ছিল খলিফার ঠিক পরই। আন্দালুসের ইসলামি রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয় অবকাঠামোর বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে খালদুন বলেন, শুরুতে আন্দালুসের উমাইয়া শাসনামলে উযির নামটি যথাযথ অর্থেই ব্যবহার হতো। পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা উযির (মন্ত্রী) নিযুক্ত করা হয়। অর্থনৈতিক বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী। ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখাশোনার জন্য একজন মন্ত্রী। নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য একজন মন্ত্রী। অপরাধী ও বিদ্রোহীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একজন মন্ত্রী। আর প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদা কক্ষ বা দপ্তর নির্ধারণ করা হয়, সেখানে মন্ত্রীদের বসার জন্য উন্নত গালিচা ও সোফা বসানো হয়। সকল বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত কর্মীগণ নিজ নিজ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করতেন। আর তাদের ও খলিফার মাঝে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একজন দায়িত্বশীল রাখা হতো। প্রতিনিয়ত খলিফাকে কাজের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সে অবহিত করত। এ কারণে এই দায়িত্বশীলের পদমর্যাদা অনেক উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর নাম দেওয়া হয় হাজিব। আন্দালুসে মুসলিম শাসনামলের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেখানে একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। সকল সরকারি পদ ছাপিয়ে এই পদটি সবার কাছে হয়ে ওঠে বেশ মূল্যবান। এমনকি স্পেনে খিলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর আন্দালুসের বিভক্ত ইসলামি ভূখণ্ডগুলো স্বাধীনভাবে পরিচালনাকারী 'তাইফা' রাজবংশীয়রা এই উপাধিকে নিজেদের বলে দাবি

করতে থাকে। যার ফলে তাদের অধিকাংশের নামের মধ্যে হাজিব শব্দের উপস্থিতি পাওয়া যায়।[১৬৩]

ইবনে খালদুনের বর্ণনা করা উপরের বিশ্লেষণে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, আন্দালুসের ইসলামি সভ্যতাকেই গ্রহণ করেছে বর্তমান যুগের সকল জাতি ও রাষ্ট্র। স্পেনের বুকে মুসলিমদের আবিষ্কার করা মন্ত্রিপরিষদ-ব্যবস্থাকেই আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে তারা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। কারণ আন্দালুসে উমাইয়া শাসনামলের সূচনা হয় ১৩৮ হিজরি সনে আবদুর রহমান ইবনে মুআবিয়া ইবনে হিশাম আদ-দাখিলের স্পেনে প্রবেশের মাধ্যমে। অর্থমন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়... মন্ত্রিপরিষদের এ জাতীয় বিভক্তি ও বিন্যাস সেখান থেকেই শুরু। এরপর 'হাজিব' উপাধিতে ভূষিত মন্ত্রিপ্রধানের পদ এবং মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের জন্য আলাদা দপ্তর, এ জাতীয় সুশৃঙ্খল বিন্যাস মুসলিমদের আগমনের পর থেকে আন্দালুসেই প্রথম শুরু হয়েছে। মুসলিম বিজ্ঞানী ও মনীষীগণই এসবের আবিষ্কারক।

স্পেনের মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসে সবচেয়ে খ্যাতিমান উযিরদের তালিকা করা হলে প্রথমেই চলে আসবে মনসুর ইবনে আবু আমির মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর নাম। তিনি ছিলেন দারুণ প্রতিভাসম্পন্ন। শুরুতে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের সাধারণ কর্মচারী। সেখান থেকে উন্নতি করতে করতে একপর্যায়ে পুলিশপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন। এরপর কনিষ্ঠ খলিফা হিশাম ইবনুল হাকামের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর হাজিব পদে উন্নীত হন। এরপর মন্ত্রিপ্রধানের পদ লাভ করেন।

বাস্তব কথা হলো, মনসুর ইবনে আবু আমির নামক এই প্রধান মন্ত্রী কখনোই নিজ সংকল্প ও অভিপ্রায় কার্যকরের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন না। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর পথে সংগ্রামী এক সাহসী বীরপুরুষ। ৩৭৩ হিজরি সনে তিনি নিজে লিওন রাজ্য অভিযান করেন। এরপর ৩৭৪ হিজরি সনে বার্সেলোনা বিজয় করেন। ৩৮৬ হিজরি সনে মরক্কোকে আন্দালুসের উমাইয়া শাসনের অধিভুক্ত করেন। মনসুর হাজিব

---

১৬৩. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২৪০।

থাকাকালে স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের এত বেশি বিস্তৃতি ঘটেছে, যেরকমটি আগে কখনো ঘটেনি।[১৬৪]

ইসলামের ইতিহাসে মন্ত্রণালয়ের বিন্যাস ও পদগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ইসলামি রাষ্ট্রের শক্তিমত্তা ও ভাবমূর্তি উন্নত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি খিলাফত ও ইসলামি সাম্রাজ্যের দুর্বল ও জরাগ্রস্ত পরিস্থিতিতেও এমন অসংখ্য উযির বর্তমান ছিলেন, যারা তখনও ইসলামি সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। জেনে অবাক হবেন, খিলাফত যতই বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হোক, এসব বিখ্যাত উযিরগণ কখনোই খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। আন্দালুসে মনসুর ইবনে আবু আমিরের অসামান্য কীর্তি এবং বাগদাদে ইবনুল আমিরের (মৃ. ৩৬০ হি.) অনবদ্য ভূমিকা থেকে এ কথাই আমরা জানতে পারি।[১৬৫]

---

[১৬৪]. দেখুন, হুসাইন মুনিস, *মাওসুআতু তারিখিল উন্দুলুস*, খ. ১, পৃ. ৩৬৩-৩৭২।

[১৬৫]. অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি* খ. ১, পৃ. ১৮৫-১৮৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান

আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিন থেকেই মন্ত্রণালয় ব্যবস্থার সূচনা হয়। আর তাই ইসলামি আইনবিদদের রচিত ওযারাত বা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত অনেক রচনা ও গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়ে, যেগুলোতে ফিকহি মূলনীতি অথবা এমন সাধারণ কিছু নিয়মপদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো প্রত্যেক উযিরের মধ্যে থাকা উচিত। এ তালিকায় যারা অগ্রজের ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অন্যতম হলেন ইবনুল মুকাফফা। তিনি বলেন, উযির বা সহযোগী ছাড়া একজন সুলতান কখনো নিজের কাজগুলো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবেন না। আর উযিরদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কেবল সম্প্রীতি ও উপদেশের মাধ্যমেই।[১৬৬]

অপরদিকে ইবনে আবু রবি[১৬৭] তার বিখ্যাত *সুলুকুল মালিক ফি তাদবিরিল মামালিক* গ্রন্থে লেখেন, জেনে রাখুন একজন খলিফা বা শাসকের জন্য এমন উযিরের প্রয়োজন, যে খলিফার কাজগুলোর বিন্যাস করে দেবে। রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে তাকে সহযোগিতা করবে। সঠিক সিদ্ধান্ত ও মতামত তার সামনে উপস্থাপন করবে। আপনি কি আমাদের বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত পড়েননি?! মহান আল্লাহ তাকে সুস্পষ্ট সব নিদর্শন দিয়ে পাঠান। অলৌকিক সব গুণ দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেন। ইসলামের এই সুমহান জীবনব্যবস্থাকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা প্রদান করেন। সত্য পথের সন্ধান দেন। এত কিছুর পরও তিনি আলি ইবনে আবি তালিব রা.-কে

---

১৬৬. ইবনুল মুকাফফা, *আল-আদাবুস সগির*, পৃ. ৩২।

১৬৭. পুরো নাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু রবি (২১৮-২৭২ হি./৮৩৩-৮৮৫ খ্রি.)। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক এবং আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিমের অন্যতম উযির। তার অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্যে *সুলুকুল মালিক ফি তাদবিরিল মামালিক* অন্যতম। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২০৫।

তার উযির বলে সম্বোধন করেন। আলি রা.-কে উদ্দেশ্য করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى»

মুসার জন্য হারুন যেমন, আমার জন্য তুমিও তেমন।[১৬৮], [১৬৯]

অন্যের সহযোগিতা বা সুপরামর্শ গ্রহণ যদি তুচ্ছ কোনো বিষয় হতো, তাহলে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসা আ.-এর মতো উন্নত মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ উযির বা সহযোগী গ্রহণ থেকে নির্মুখাপেক্ষী থাকতেন। সুতরাং বোঝা গেল, উযির হলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় খলিফার প্রধান সহযোগী। রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো সুরক্ষার প্রধান নীতিনির্ধারক। কাজে ও বক্তব্যের মাধ্যমে সকল-কিছুর ব্যবস্থাপক।[১৭০]

অপরদিকে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যারা কলম ধরেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওয়ারদি। তিনি তার অনবদ্য *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা* গ্রন্থে মন্ত্রণালয়ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোকপাত করেন। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। সেখানে ওযারত বা মন্ত্রণালয়কে তিনি দুভাগে বিভক্ত করেন। এক. ওয়াযারাতু তাফবিয (وزارة تفويض)। দুই. ওয়াযারাতু তানফিয (وزارة تنفيذ)।

ওয়াযারাতু তাফবিয হলো মন্ত্রীদেরকে নিজ চিন্তা ও গবেষণার আলোকে নানা রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশ জারি করা এবং বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার অবাধ ক্ষমতা প্রদান।[১৭১] কোনো সন্দেহ নেই এ ধরনের ক্ষমতা

---

১৬৮. অন্য একটি বাক্যেও হাদিসটি বর্ণিত : ألا ترضى أنْ تكونَ منِّي بمنزلةِ هارونَ من موسى : দেখুন, *বুখারি*, কিতাবুল মাগাযি, বাব : গাযওয়াতু তাবুক ওয়া হিয়া গাযওয়াতুল উসরাতি, হাদিস নং ৪১৫৪। *মুসলিম*, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, বাব : মিন ফাযায়িলি আলি ইবনে আবি তালিব, হাদিস নং ২৪০৪।

১৬৯. ইবনে আবু রবির উচিত ছিল আবু বকর, উমর ও উসমানের ওযারত (মন্ত্রিত্ব) নিয়ে আলোচনা করা। এরপর আলি ইবনে আবু তালিবের কথা উল্লেখ করা। কারণ এ ক্ষেত্রে তার অবস্থান তাদের পরে।

১৭০. ইবনে আবু রবি, *সুলুকুল মালিকি ফি তাদবিরিল মামালিক* গ্রন্থে যাফের কাসেমি রচিত *নিযামুল হুকমি ফিশ শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি* গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন, খ. ১, পৃ. ৪২২-৪২৩।

১৭১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২৪-২৫।

প্রদান খিলাফত ও ইসলামি রাজনৈতিক অঙ্গনের দারুণ কুশলতার পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ ছোট-বড় সব বিষয়ের সমাধানের জন্য একই বিভাগের শরণাপন্ন হয়ে মানুষ যেন ভোগান্তিতে না পড়ে, সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টর ও দপ্তরভিত্তিক বিন্যাসে মন্ত্রণালয়কে সাজানো হয়। এরকম অবাধ স্বাধীন মন্ত্রিত্ব যারা লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে জাফর ইবনে ইয়াহইয়া আল-বারমাকি অন্যতম। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে তাকে সুলতান উপাধি দেওয়া হয়। কারণ খলিফার মতো রাষ্ট্রের সকল-কিছুতে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করার এবং সকল আদেশ-নিষেধ জারি করার একচ্ছত্র অধিকার তারও ছিল।[১৭২] এ তালিকায় আরও যাদের নাম এসে যায়, তাদের মধ্যে বাগদাদে ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণের অগ্রনায়ক নিজামুল মুলক এবং স্পেনের ইসলামি কৃষ্টিতে অবদান রাখা মনসুর ইবনে আবু আমির অন্যতম। এ দুজন সম্পর্কে একটু আগে আমরা জেনে এসেছি।

সে তুলনায় ওয়াযারাতু তানফিয কিছুটা কম মর্যাদার। কারণ এটি কেবল খলিফার আদেশ মান্য করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে ক্ষেত্রে খলিফার নির্দেশ যথাযথ পালন করা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি সাজানোর দায়িত্ব পেতেন এরকম উযিরগণ।[১৭৩] ইসলামি সভ্যতায় বেশিরভাগ উযিরের দায়িত্বই ছিল এ প্রকৃতির। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ইস্যুতে খলিফার আদেশ যথাযথভাবে পালন করার জন্য তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হতো।

সিরাজুল মুলুক গ্রন্থে উযির ও তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেন তারতুশি। একজন উযিরের কাছ থেকে খলিফা কী আশা করেন উক্ত গ্রন্থে তিনি তা স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, একজন উযিরের প্রধান দুটি দায়িত্ব হলো : এক. অজানা বিষয়গুলো তিনি খলিফাকে জানাবেন। দুই. খলিফা আগে থেকে যা জানতেন উযির তা আরও স্পষ্ট ও জোরালো করবেন।[১৭৪] তা ছাড়া মন্ত্রণালয়ের পদে নিন্দিত কোনো ব্যক্তিকে বসানো থেকে সতর্ক করেন তারতুশি। তার গ্রন্থে তিনি বলেন, নিন্দিত বা বিতর্কিত কেউ উন্নত পদে নিয়োগ পেলে তার সহযোগী কমে

---

১৭২. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২৩৮।
১৭৩. প্রাগুক্ত, ২৬। মুনির আল-আজলানি, *আবকারিয়্যাতুল ইসলামি ফি উসুলিল হুকমি*, পৃ. ২২৩।
১৭৪. তারতুশি, *সিরাজুল মুলুক*, পৃ. ৫৬।

যাবে। তার ভালো কাজগুলো সন্দেহের চোখে দেখা হবে। তিনিও নন্দিত ব্যক্তিদের হালকা চোখে দেখবেন। গুণধর ব্যক্তিদের ওপর তিনি অহংবোধ করবেন। এরপর এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তিনি সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক এবং উমর ইবনে আবদুল আযিযের মাঝে সংঘটিত একটি ঘটনা টেনে আনেন, সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ব্যক্তিগত পত্রলেখক ইয়াযিদ ইবনে আবু মুসলিমকে নিজের পত্রলেখক হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন, তখন উমর ইবনে আবদুল আযিয তাকে বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, এই লোকটিকে আপনার পত্রলেখক হিসেবে নিয়োগ করে হাজ্জাজের আলোচনা আবার জাগিয়ে তুলবেন না। উত্তরে তিনি বলেন, হে আবু হাফস, আমি তার বিরুদ্ধে এক দিনার বা এক দিরহাম পরিমাণও দুর্নীতির অভিযোগ পাইনি। তা শুনে উমর বললেন, দিরহাম-দিনারের আলোচনা যখন উঠল, তাহলে আপনাকে আমি দিরহাম-দিনার ব্যবহারে তার চেয়েও সৎ একজনের কথা বলব কি? সুলাইমান জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কে? উত্তরে উমর বললেন, ইবলিস! জীবনেও সে কোনো দিনার বা দিরহাম স্পর্শ করেনি, কিন্তু সে ঠিকই পুরো মানবজাতিকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।[১৭৫]

আরেক বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা শাইযারি (মৃ. ৫৮৯ হি.) *আল-মানহাজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক* গ্রন্থে মাওয়ারদির মতোই মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক ও বিভাগীয় বিন্যাসের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও একজন উযিরের মধ্যে দশটি অপরিহার্য গুণ থাকার কথা বলেছেন শাইযারি। সেগুলো হলো যথাক্রমে : যথেষ্ট জ্ঞান, পরিণত বয়স, সততা, সত্যবাদিতা, অল্পেতুষ্টি, শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় পারদর্শিতা, উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা, প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি, স্বেচ্ছাচারহীনতা এবং সকল-কিছু নিজেই মীমাংসা করতে পারার মতো যোগ্যতা।[১৭৬]

অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল-কালয়ি (মৃ. ৬৩০ হি.) রচনা করেন বিখ্যাত *তাহযিবুর রিয়াসাতি ওয়া তারতিবুস সিয়াসা* গ্রন্থ। বিশাল কলেবরের এ বইয়ে পূর্ববর্তী শাসকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে

---

১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১৭৬. দেখুন, শাইযারি, *আল-মানহাজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক*, পৃ. ২০৭-২১০।

সুষ্ঠু ও সুনিপুণভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্য খলিফা, গভর্নর ও শাসকদের জন্য উপকারী সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। গ্রন্থটি তিনি প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগে তিনি প্রজ্ঞাবানদের নির্বাচিত বাণী ও ভাষাপণ্ডিতদের দুর্লভ সংলাপের বিবরণ দিয়ে সেগুলোকে বিচিত্র উপমা ও বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে সাজিয়ে তোলেন। দ্বিতীয় ভাগে তিনি খলিফা, উযির, গভর্নর, সরকারি কমকর্তা, কর্মচারী ও কার্যনির্বাহীদের জন্য শিক্ষণীয় বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন। এসব ঘটনা থেকে তাদের মানমর্যাদা, সদাচরণ, সচ্চরিত্র ও মনুষ্যত্বের গুণাবলির প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৭৭] মন্ত্রণালয়ের আলোচনা করতে গিয়ে প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের দেওয়া নানা উপমা ও প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করেন। তা ছাড়া ওযারত ও উযিরদের নিয়ে লেখা বিভিন্ন কবিতাও তিনি সেখানে বর্ণনা করেন।

অপরদিকে আবদুর রহমান ইবনে খালদুন (মৃ. ৮০৮ হি.) তার বিখ্যাত *আল-মুকাদ্দিমায়* বিশ্বনবীর যুগ থেকে শুরু করে তার যুগ পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতায় মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনার অভূতপূর্ব উন্নতির ঐতিহাসিক বিবরণ দেন। ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কোনো রাষ্ট্রের বা আমলের মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি ও অবনতির বিস্তারিত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা তুলে ধরেন। এ বইয়ের মাধ্যমে ইসলামি রাজনৈতিক বিষয়ে ইবনে খালদুনের গভীর জ্ঞান ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বনি উমাইয়ার শাসনামলে মন্ত্রিত্বের গুরুত্বের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সে যুগে পুরো বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও উন্নত পদ ছিল মন্ত্রিত্ব। সরকারি সকল বিষয় দেখাশোনা ও পরিচালনা এবং নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা-বিষয়ক সকল ইস্যুতে একমাত্র উযিরগণই হস্তক্ষেপ করতেন। তা ছাড়া সামরিক ইস্যু এবং নাগরিকদের ভাতা প্রদান, এ জাতীয় বিষয়গুলো তারাই পরিচালনা করতেন।[১৭৮] এতে কোনো সন্দেহ নেই তার রচিত রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং তার প্রদর্শিত ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সাংস্কৃতিক রূপকেই পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়েছে।

---

[১৭৭]. কালয়ি, *তাহযিবুর রিয়াসাতি*, পৃ. ৬০।

[১৭৮]. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, পৃ. ২৩৮।

অপরদিকে শামসুদ্দিন ইবনুল আযরাক আল-গারনাতি (মৃ. ৮৯৬ হি.) তার রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে খালদুনের দেখানো পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তার লেখা *বাদায়িয়ুস সিলকি ফি তাবায়িয়িল মুলকি* গ্রন্থে 'যেসব কর্মসূচির আলোকে গড়ে একজন রাষ্ট্রনায়কের সকল দায়িত্ব' শীর্ষক একটি অধ্যায় রচনা করে উযির নিয়োগের কাজকে শাসকের প্রথম দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন। সেজন্য যৌক্তিক ও শরয়ি সকল প্রমাণ উপস্থাপন করে তার এই দাবিকে জোরালো করে তোলেন। তার এ গ্রন্থের বিন্যাস অনেকটা দর্শন ও তর্কশাস্ত্রীয় বইয়ের মতো।[১৭৯]

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আশা করি পাঠক মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তা ছাড়া এটাও জেনে রাখা দরকার, ইউরোপীয় কোনো জাতি এবং ইসলামপূর্ব কোনো জনগোষ্ঠী মন্ত্রণালয় ব্যবস্থাপনায় কোনো অবদান রেখেছে বলে আদৌ প্রমাণিত নয়।

---

১৭৯. ইবনুল আযরাক, *বাদায়িয়ুস ফিলকি ফি তাবায়িয়িল মুলকি*, পৃ. ২৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভাগ ও কার্যালয়

আদ-দিওয়ান (الديوان) শব্দটি মূলত ফারসি। তার বাংলা অর্থ গ্রন্থালয় বা নথি সংরক্ষণের নির্ধারিত স্থান।[১৮০] তবে পরিভাষায় দিওয়ান শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মাওয়ারদি বলেন, রাজ্যের সকল কর্মকাণ্ড ও আর্থিক হিসাব এবং তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য সেনাবাহিনী ও সরকারি কার্যনির্বাহীদের দায়িত্ব ও অধিকারের নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়কে বলা হয় দিওয়ান।[১৮১]

অনেক ইতিহাসবিদের দাবি, ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামল থেকেই দিওয়ান বা বিভাগীয় কার্যালয় ব্যবস্থার সূচনা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় নির্ধারণ এবং সেজন্য দায়িত্বশীল ও কার্যনির্বাহী নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এ দাবিটি ঠিক আছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু এই দিওয়ান ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক গোড়াপত্তন ঘটে মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই। কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সরকারপ্রধান, শাসক, গোত্রনেতা থেকে শুরু করে নিজ দেশের সরকারি কর্মী ও গভর্নরদের কাছে রাষ্ট্রীয় পত্র লেখার জন্য অনেক সুদক্ষ লেখক নিয়োগ করেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, ইসলামি রাষ্ট্রে বিভাগীয় কার্যালয় ব্যবস্থার সূচনা সেই নববি যুগেই হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে দিওয়ান নামে যদিও এর প্রচলন ছিল না, তবে এ ধরনের পত্র লেখালেখি ও আদান-

---

১৮০. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, دون মূল ধাতু, খ. ১৩, পৃ. ১৬৪।

১৮১. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২৫৯।

প্রদানের যাবতীয় কার্যক্রম তখন প্রচলিত ছিল। এ কারণেই এ বিষয়ে আলোচনা আমরা একটু বিস্তারিত আকারে কয়েকটি অনুচ্ছেদে সাজানোর পরিকল্পনা করেছি :

প্রথম অনুচ্ছেদ : পত্র ও রচনা বিভাগ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ভাতা ও সৈনিক বিভাগ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ওয়াকফ বিভাগ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ডাক ও যোগাযোগ বিভাগ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : রাজকোষ বা অর্থ তহবিল

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : পুলিশ প্রশাসন

সপ্তম অনুচ্ছেদ : আল-হিসবাহ

অষ্টম অনুচ্ছেদ : সামরিক বিভাগ

প্রথম অনুচ্ছেদ

১. পত্র ও রচনা বিভাগ

এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল লেখালেখি ও রাষ্ট্রীয় নথিপত্র তৈরি। যুগ যুগ ধরে লেখালেখি বা রচনার কাজ খলিফা পদের পর সবচেয়ে উন্নত ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হতে থাকে। কারণ সমৃদ্ধির সকল পথের মিলন হয়েছে এ পদকে কেন্দ্র করে। মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে এ পদ। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই রচনা বিভাগের কাজ হয়ে ওঠে আরও গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নব্য ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য অনেক রচয়িতা বা লেখক নিযুক্ত করেন, বিশেষজ্ঞগণের মতানুযায়ী বিশ্বনবীর নিযুক্ত লেখকদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।[১৮২]

বিশেষ করে খলিফা ও গভর্নরদের খুব প্রয়োজন দক্ষ লেখকদের। ফলে আমরা দেখি, সেই যুগে লেখকদের নিয়ে প্রচুর প্রশংসাগাথা তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে যুবাইর ইবনে বাক্কার বলেন, লেখকগণ হলেন রাজা আর সকল মানুষ প্রজা।[১৮৩] ইবনুল মুকাফফা বলেন, লেখকগণ শাসকদের মুখাপেক্ষী ঠিক, তবে এর চেয়ে বেশি শাসকগণ লেখকদের মুখাপেক্ষী।[১৮৪]

কালকাশান্দি (মৃ. ৮২১ হি.) রচনাশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, চুক্তিনামা, শপথনামা, প্রাপ্তিস্বীকার, প্রত্যয়নপত্র, জামিননামা, দণ্ডাদেশ, শান্তিচুক্তি, আমানত গ্রহণ ও প্রদানপত্র, রাষ্ট্রীয় ফরমানসহ যেকোনো কথা ও ভাবকে লেখায় রূপান্তর করার নাম রচনাশাস্ত্র।[১৮৫]

---

[১৮২]. ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৯৯।

[১৮৩]. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১, পৃ. ৩৭।

[১৮৪]. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৭।

[১৮৫]. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪।

উপরের এই বিবরণ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, রচনা বিভাগের দায়িত্ব কেবল শাসক ও গভর্নরদের পত্র লেখার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সেজন্য উপযুক্ত বাক্য নির্বাচন এবং কূটনৈতিক পরিভাষা ব্যবহারও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ পদের লোকদের আমরা খলিফা বা গভর্নরের মুখপাত্র হিসেবে অভিহিত করতে পারি। এ ছাড়াও রাষ্ট্রের সকল গোপন নথি ও খলিফার সঙ্গে উযির ও গভর্নরদের সম্পর্কের বিস্তারিত দলিলপত্র তাদের কাছে জমা রাখা হতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও চুক্তির নথিও তাদের কাছে সংরক্ষিত থাকত।

কোনো সন্দেহ নেই, কালকাশান্দির এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, হিজরি অষ্টম ও নবম শতকে লেখালেখি ও রচনা বিভাগ পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ব রূপ লাভ করে।

ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম বিশিষ্ট লেখকদের নিযুক্ত করেন। এ থেকেই ইসলামি সভ্যতায় লেখালেখির গুরুত্ব অনুমান করা যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রের গভর্নর, যুদ্ধাভিযানে থাকা সেনানায়ক সাহাবিদের কাছে রাষ্ট্রীয় পত্র পাঠাতেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসক ও সরকারপ্রধানদের ইসলামের দিকে আহ্বান করে পত্র পাঠাতেন। সাহাবিদের রাষ্ট্রদূত বানিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করতেন। আমর ইবনে হাযমকে ইয়ামেনে নিযুক্ত করার সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উদ্দেশে শপথনামা লেখেন। নিযুক্ত তামিম দারি ও তার ভাইদের উদ্দেশে বিশ্বনবী শামে জায়গির প্রদান মর্মে পত্র লিখে পাঠান। হুদাইবিয়ার বছর তার ও কুরাইশ গোত্রের মাঝে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি লেখান... ।[১৮৬]

খুলাফায়ে রাশেদিনও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো এই পথে হাঁটেন। ফলে আমরা দেখি, খলিফা আবু বকরের জন্য উসমান ইবনে আফফান ও যায়দ ইবনে সাবিত লেখকের ভূমিকা পালন করেন। এরপর দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের জন্য যায়দ ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে খালাফ লেখকের ভূমিকা পালন করেন। তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফানের জন্য মারওয়ান ইবনুল হাকাম লেখকের দায়িত্ব পালন করেন। চতুর্থ খলিফা আলি ইবনে আবু তালিবের জন্য

---

১৮৬. কাত্তানি, *আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ১১৮।

আবদুল্লাহ ইবনে রাফে ও সাইদ ইবনে নাজরান আল-হামদানি লেখকের ভূমিকা পালন করেন। এরপর পঞ্চম খলিফা হাসান ইবনে আলির জন্যও তারা লেখকের দায়িত্বে ছিলেন।[১৮৭]

বনু উমাইয়ার শাসনামলে খিলাফতের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। রাজ্য ও গভর্নরদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় খলিফাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও পত্র আদান-প্রদানের হার বৃদ্ধি পায়। ফলে রচনা ও লেখালেখির গুরুত্ব ও কার্যকারিতা আরও ব্যাপক হয়। উমাইয়া শাসনামলে রচনা বিভাগে যারা কাজ করতেন তাদের মাঝে আরব লেখকদের পাশাপাশি ছিল দাস ও অনারব শ্রেণিও। খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের দাস আবুয যুআইযিআ এবং রুহ ইবনে যানবা আল-জুযামি ছিলেন খলিফার খুব কাছের লেখক। রুহ ইবনে যানবার রচনাদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাকে ফারিসিয়্যুল কিতাবা (فارسي الكتابة) উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৮৮]

সরকারি রচনা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হতো বিখ্যাত ও বিশিষ্ট লেখকদের। তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো গুরুত্বপূর্ণ এসব বিভাগ। 'আবদুল হামিদ আল-কাতেব' উপাধি পাওয়া আবদুল হামিদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আমেরি (মৃ. ১৩২ হি.) ছিলেন উমাইয়া খিলাফতের বিশিষ্ট একজন সরকারি লেখক। পুরো ইসলামি সভ্যতায় বিখ্যাত লেখকদের তালিকা করলে তাকে বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নেই। তো উমাইয়া সাম্রাজ্যে তার উন্নত মর্যাদার দরুন বনু উমাইয়ার সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ (মৃ. ১৩২ হি.) তাকে নিজের একান্ত উযির হিসেবে নিয়োগ করেন। সে সময় তার প্রধান দায়িত্ব ছিল রচনা ও লেখালেখি।

একজন লেখকের মাঝে কী কী গুণ থাকা উচিত এবং রচনা বিষয়ে কী কী সাধারণ মূলনীতি অনুসরণ করা উচিত সেগুলো প্রথম আবদুল হামিদ আল-কাতেবের প্রণয়ন করা। এই শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তার উদ্দেশে বলা হয়,

---

১৮৭. ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০১।

১৮৮. জাহশিয়ারি, *আল-ওয়াযারাউ ওয়াল-কুততাব*, পৃ. ৩৫।

«فُتحت الرسائل بعبد الحميد وخُتمت بابن العميد»

> পত্র লেখালেখির সূচনা হয় আবদুল হামিদ থেকে এবং সমাপ্তি ঘটে ইবনুল আমিদ পর্যন্ত এসে।[১৮৯]

এ কারণেই তার শিষ্যগণ রাষ্ট্রের সব গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করতে সক্ষম হন, বিশেষত খিলাফতের অঙ্গনে। তার অন্যতম শিষ্য ইয়াকুব ইবনে দাউদকে উযির হিসেবে নিয়োগ করেন আব্বাসি খলিফা আল-মাহদি।[১৯০]

আব্বাসি খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিভাগের ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। রচনা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সুযোগ-সুবিধা ছিল, আব্বাসি খিলাফতের সময় তা আরও বাড়ানো হয়। এরকম বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদার একটি ছিল স্বাক্ষর। অর্থাৎ তারা নানা প্রয়োজনে রাজদরবারে আসা মানুষদের আবেদনগুলো গুছিয়ে সংক্ষিপ্ত কথায় লিখে স্বাক্ষর করে খলিফার সামনে পেশ করতেন। খলিফা এক নজর চোখ বুলিয়ে এ বিষয়ে তার মত শুনে পত্রে স্বাক্ষর করতেন। এরপর সেগুলো রাজস্ব বিভাগ, অর্থ তহবিল বা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠিয়ে দিতেন। ওই আবেদনপত্রেই খলিফা বা তার কাতেব মঞ্জুরিমূলক শব্দ লিখে স্বাক্ষর করতেন। এসব নির্দেশনামূলক শব্দ হতো সুসংক্ষিপ্ত ও পাণ্ডিত্বপূর্ণ ভাষায়। তা দ্বারা স্বাক্ষরকারীর ব্যুৎপত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও সুবচন নির্বাচনে তার দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যেত। অধিকাংশ পণ্ডিত খলিফা হারুনুর রশিদের আমলের বিশিষ্ট সরকারি কার্যনির্বাহী ও বিল অনুমোদন বিভাগের প্রধান জাফর ইবনে ইয়াহইয়া আল-বারমাকির স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত। তার পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তি ছিল অনেক উঁচুমানের। এমনকি লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল, তার একটি স্বাক্ষর এক দিনার মূল্যে বিক্রয় হতো।[১৯১]

আব্বাসি খিলাফতের যামানায় আমরা দেখতে পাই, খলিফাগণ এরকম লেখক ও রচয়িতাদের অনেক মর্যাদা দিতেন। আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে কাসেম (মৃ. ২১৩ হি.) ছিলেন খলিফা মামুনের শাসনামলে পত্র ও

---

১৮৯. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ৮, পৃ. ৪৭০-৪৭১।

১৯০. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ৬০।

১৯১. খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ৭, পৃ. ১৫২।

রচনা বিভাগের একজন প্রসিদ্ধ লেখক। রচনা বিভাগে তার দক্ষতা ও যোগ্যতা দেখে আহমাদ ইবনে আবু খালেদ আল-আহওয়ালের ইনতেকালের পর খলিফা মামুন তাকে উযির হিসেবে নিয়োগদান করেন। তার অগাধ পাণ্ডিত্য ও পত্র লেখায় পারদর্শিতার বিষয়ে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। খলিফা মামুন একবার রমযান মাসে রাতের বেলায় শহরের সব মসজিদের বাতির সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সকল গভর্নর ও কর্মী বরাবর ফরমান লিখতে তাকে নির্দেশ দেন। আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে কাসেম বলেন, এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কেউ লেখেনি। কারও লেখা দেখে অনুসরণ করব সে সুযোগও নেই। কী লেখা যায়, কী লেখা যায়, এরকম চিন্তা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখি, একজন আগন্তুক এসে আমাকে বলল, লিখুন,

«فإن فيها أُنْسًا للسابلة، وإضائة للمتهجدة، ونشاطا للمتعبدين، ونفيا لمكامن الريب، وتنزيها لبيوت الله عن وحشة الظُّلم»

> এতে করে পথিকদের জন্য সুবিধা হবে। তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ আলো পাবে। ইবাদতকারীদের জন্য প্রাণবন্ততা বয়ে আনবে। সন্দেহযুক্ত গোপন স্থান বলতে আর কিছুই থাকবে না। তা ছাড়া অন্ধকারের নির্জন পরিবেশ থেকে আল্লাহর ঘরগুলো পবিত্র থাকবে।[১৯২]

মোটকথা, নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অসামান্য রচনাশক্তিই আহমাদ ইবনে ইউসুফ ইবনুল কাসেমকে পরবর্তী সময় উযিরের পদে অধিষ্ঠিত করেছিল।

প্রায় ছয় শতাব্দীজুড়ে আব্বাসি শাসনামলে এমন অসংখ্য খ্যাতিমান ও বিদগ্ধ লেখকের জন্ম হয়েছে, যাদের দ্বারা আব্বাসি খিলাফত দুনিয়াজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। এ কারণেই আব্বাসি শাসনব্যবস্থার আদলে পরবর্তীকালে উবাইদি, আইয়ুবি, আন্দালুসি রাজবংশসহ স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সুলতান ও আমিরগণও নিজ নিজ সাম্রাজ্যে স্বতন্ত্র রচনা বিভাগ চালু করেন, যা পত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গণমাধ্যমের ভূমিকাও পালন করত।

---

১৯২. কুদামা ইবনে জাফর, *আল-খারাজ ওয়া সিনাআতুল কিতাবা*, পৃ. ৩৭।

খলিফা মামুনের রচনা বিভাগে কর্মরত এরকমই একজন বিখ্যাত লেখক হলেন আবু উসমান আল-জাহিয। কিন্তু সহকর্মীদের রাজকীয় পোশাক গ্রহণ ও কথাবার্তায় তাদের অতিউৎসাহী স্বভাব দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি লেখালেখির পেশা বর্জন করে রাজবিভাগ থেকে বের হয়ে যান। তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, মানবপ্রকৃতি ও প্রাণিবিদ্যা নিয়ে লেখালেখি করতে তিনি বাগদাদ ছেড়ে বসরায় চলে আসেন।

মুরাবিতিন সাম্রাজ্যেও রচনা বিভাগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এক বিভাগ। সার্বিক দেখাশোনা ও পরিচালনায় থাকতেন একজন বড় লেখক। মুরাবিতিন রাজবংশীয়গণ বড় বড় সাহিত্যিক থেকে বাছাই করে করে রাজলেখক নিয়োগ করতেন। এমনকি মধ্যযুগে রচনাশৈলী এমন উন্নত পর্যায়ে পৌছে, তর্কশাস্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও তাতে ঢাকা পড়ে যায়। সে সময় আমিরদের একসঙ্গে একাধিক রাজলেখক থাকত। তাদের মাঝে একজন থাকতেন প্রধান হিসেবে। মূলত তিনিই সরকারি রচনা বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন।[১৯৩]

শাসকগণ রচনা বিভাগের লেখক নিয়োগের জন্য নানারকম নির্বাচন-প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। সবচেয়ে বিজ্ঞ ও সুসাহিত্যিক ব্যক্তিকেই রচনা বিভাগের প্রধান করা হতো। তাকে মাননীয়-মহোদয় জাতীয় সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করা হতো। তিনিই সকল আবেদন ও নথিপত্র গ্রহণ করতেন। পরবর্তী সময়ে সেগুলো খলিফার সামনে পেশ করতেন। আবেদন গ্রহণ ও অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে তিনিই বাকি লেখকদের নির্দেশনা দিতেন। খলিফা নিজেও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে তার মতামত গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন। যেকোনো সময় সাক্ষাৎ করতে চাইলে খলিফা নিষেধ করতেন না। আর এ সুযোগ অন্য কারও জন্য ছিল না। এমনকি অনেক সময় রাষ্ট্রীয় কাজের সুবাদে তিনি খলিফার কাছে কয়েক রাত পর্যন্ত অবস্থান করতেন। তার বেতন ছিল প্রতি মাসে একশ বিশ দিনার। এরকম মোটা অঙ্কের বেতন রাজদরবারে তাদের অসামান্য মর্যাদার কথা প্রমাণ করে। এ কারণেই জায়গির প্রদান সংক্রান্ত বিষয়, পোশাক প্রদান সংক্রান্ত, সরকারি ফি প্রবর্তন ও লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়গুলো যারা দেখাশোনা করতেন তাদের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন

---

১৯৩. ইবরাহিম হারাকাত, *আন-নিযামুস সিয়াসি ওয়াল-হারাবি ফি আহদিল মুরাবিতিন*, পৃ. ৯৩-৯৪।

লেখকগণ। রাজপ্রসাদে অবস্থিত তার দফতরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, এমনকি বিশিষ্ট রাজ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কেউ রাজলেখকদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেত না। আমিরশ্রেণি থেকে তার জন্য হাজিব (সহযোগী) নির্ধারণ করা হতো। তার জন্য আলাদা পরিচ্ছন্নতাকর্মী থাকত। তার মর্যাদা ছিল অভাবনীয়। তার প্রাসাদে শোভা পেত রাজসরঞ্জাম, আসবাব, সোফা, উন্নত মসনদ ও লেখালেখির সব উন্নত উপাদান, খলিফার বিশিষ্ট লেখকগণই এগুলো সরবরাহ করতেন।[১৯৪]

সেই যুগের রচনা বিভাগের আলোচনা করতে গেলে বিখ্যাত লেখক কালকাশান্দির কথা বলতেই হবে। তিনি ভূগোল, ইতিহাস ও প্রশাসনিক বিষয়ের প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ *সুবহুল আ'শা ফি সিনাআতিল ইনশা* রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি স্বতন্ত্র রচনা বিভাগ, সেই বিভাগের জন্য যোগ্য লেখক নিয়োগের গুরুত্ব এবং একজন লেখকের মাঝে কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সে বিষয়গুলো তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, লেখক হবেন উজ্জ্বল ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী। তার ভাষা হবে সহজ, শুদ্ধ ও পরিষ্কার। তিনি হবেন সেই দেশের নাগরিক। স্থানীয়ভাবে তিনি হবেন সকলের কাছে সমাদৃত। ভাবগাম্ভীর্যের অধিকারী। অত্যন্ত ভদ্র। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। নম্র ও সহনশীল। বাদশাকে সবসময় সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন। কখনো কৌশল অবলম্বন করবেন না। বাদশার ন্যায্য সিদ্ধান্ত, তার গৃহীত যেকোনো সুপরিকল্পনা ও পদক্ষেপের প্রচারপ্রসার করবেন। এ বিষয়গুলো জনগণের সামনে মহত্ত্ব ও অত্যন্ত সম্মানের সাথে উপস্থাপন করবেন। বারবার আলোচনা করবেন। জনগণকে বাদশার প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ে উৎসাহিত করবেন। রাজদরবারে বা ভরা মজলিসে বাদশা যদি এমন কোনো কথা বলেন যা তার কাছে সঠিক মনে হয়নি, তাহলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। বাদশার সম্মান ও ভাবমূর্তির কথা বিবেচনা করে নীরব থাকবেন। বড় ধরনের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত হলে ধৈর্য ধারণ করে নির্জনে কথা বলার অপেক্ষায় থাকবেন। বাদশা যখন একা থাকেন, তখন বাদশার মেজাজ-মর্জি বুঝে অন্যান্য আলোচনার ফাঁকে সম্পূর্ণ নিরহংকারী মনোভাব নিয়ে প্রজ্ঞার সাথে সত্য

---

১৯৪. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িযু ওয়াল-ইতিবার*, খ. ১, পৃ. ৪০২।

ও সঠিক পরামর্শ বাদশার কাছে উপস্থাপন করবেন। এতে করে যেন বাদশার সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিকভাবে খণ্ডন না করা হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখবেন। নিজের মতামতের কারণে আহমিকা দেখাবেন না। শান্তি ও নিরাপত্তা-রক্ষা, সুবিচার স্থাপন, সমতা বিধান, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়িত মানুষের অধিকার সুরক্ষায় সবসময় কথা ও পরামর্শ দিয়ে বাদশাকে সহযোগিতা করে যাবেন।[১৯৫]

মোটকথা, পত্র ও রচনা বিভাগ ছিল ইসলামি সভ্যতার অন্যতম উৎকর্ষের প্রতীক। এটি ছিল উন্নত ইসলামি ঐতিহ্য, যা ছিল জনগণের সকল চাহিদা পূরণে একটি সুষ্ঠু সরকারি কার্যালয় এবং অনিন্দ্যসুন্দর ইসলামি ব্যবস্থাপনা।

---

১৯৫. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১, পৃ. ১৩৯-১৪০।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২. ভাতা ও সৈনিক বিভাগ

ভাতা ও সৈনিক বিভাগ চালু করার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সৈনিকদের সংখ্যা, তাদের নাম ও জাতীয়তা সংরক্ষণ করে তাদের জন্য উপযুক্ত ভাতা নির্ধারণ করা। সেই সঙ্গে কে কখন ভাতা গ্রহণ করবেন এবং কে কী ধরনের হাতিয়ার বহন করবেন তা নির্দিষ্ট করা। এতে করে যোদ্ধাদের সুবিধার পাশাপাশি তাদের পরিবার ও স্বজনদের জন্যও অনেক সহযোগিতা হতো।[১৯৬] এ ধরনের ভাতা বিভাগ প্রথম চালু করেন আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। এ ব্যাপারে সকল ইতিহাসবিদ একমত।

আবু বকর রা.-এর ইনতেকালের পর মুসলিমদের আমির নিযুক্ত হন উমর ইবনে খাত্তাব রা.। আর রাষ্ট্র পরিচালনায় উমরের ছিল এক বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষত অর্থনৈতিক বিষয়ে। এ কারণেই তিনি ভাতার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করেন। অন্যদিকে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও সহায়তায় খিলাফত যখন সম্প্রসারিত হচ্ছিল, তখন মুসলিমদের দখলে আসতে থাকে একের পর এক ভূখণ্ড এবং প্রচুর অর্থসম্পদ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উমর রা. চাচ্ছিলেন মানুষের মাঝে এসব অর্থসম্পদ সর্বোত্তম উপায়ে বণ্টন করতে। এর আগে আবু বকর রা. কে আগে মুসলিম হয়েছে আর কে পরে তা পার্থক্য না করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সমহারে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। একদল সাহাবি এতে আপত্তি করলে তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কারা আগে মুসলিম হয়েছে আর কারা পরে এ নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না, বরং এগুলো হলো মহান আল্লাহর অনুপম কৃপা ও

১৯৬. আবদুর রহমান আমিরা, *আল-ইসতিরাতিজিয়াতুল হারবিয়্যা ফি ইদারাতিল মাআরিকি ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৭৮।

অনুগ্রহ। এগুলো তাদের রিযিক। রেখে দেওয়ার চেয়ে এগুলো সমহারে তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়াই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে।[১৯৭]

তবে উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। বেতন-ভাতা নির্ধারণে তিনি কয়েকটি স্তর তৈরি করেন। যেমন, আল্লাহর রাসুলের বংশীয় লোকজন এক স্তরে। ইসলাম ও জিহাদে যারা অগ্রজ তারা এক স্তরে। যুদ্ধবিদ্যায় যারা দক্ষতা ও পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন তারা এক স্তরে। শত্রুপক্ষের কাছাকাছি সীমান্ত এলাকায় যারা বসবাস করেন তারা এক স্তরে। যারা দূরে অবস্থান করেন তারা এক স্তরে। এভাবে নানা শ্রেণি ও স্তর আবিষ্কার করে তাদের জন্য উপযুক্ত বেতন-ভাতা ধার্য করেন।[১৯৮]

উপর্যুক্ত মূলনীতির আলোকে স্তর নির্ণয়ের কারণে এর জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ চালু করা জরুরি হয়ে পড়ে। সৈনিকদের অধিকারের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে এরকম অভূতপূর্ব ভাতা ও সৈনিক বিভাগের প্রচলন ছিল ইসলামি সভ্যতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা দেখতে পাই, সূচনালগ্ন থেকেই ভাতা বিভাগ অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং সুনিপুণভাবে পরিচালিত হয়। এমনকি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. রাষ্ট্রের ছোট বড় কাউকেই ভাতা প্রদান থেকে বঞ্চিত করেননি, এমনকি নবজাতক শিশুকেও তিনি ভাতা প্রাপ্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। আর এ বিভাগের পরিচালনানীতি সময় ও কালের পরিক্রমায় আরও সুসংগঠিত ও আধুনিক হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পারস্য ও রোমান সৈনিকদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণ করা যোদ্ধাদেরও শেষ পর্যন্ত এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৯৯]

সাহাবিগণের মধ্যে অনেকে অধিক তাকওয়া অবলম্বন করার লক্ষ্যে ভাতাগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। তাদের একজন হলেন হাকিম ইবনে হাযাম রা.। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উদ্দেশে বলেছিলেন,

---

[১৯৭]. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ৪২।

[১৯৮]. ফাতহিয়্যা নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮৩।

[১৯৯]. আকরাম আল-উমারি, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ*, পৃ. ৩৮০।

«يَا حَكِيْمُ، إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ»

হাকিম, এই (পার্থিব) অর্থসম্পদ খুব সবুজ-সতেজ ও মনোহর। অনীহা নিয়ে যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে লোভের বশবর্তী হয়ে আগ বেড়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।[২০০]

কোনো সন্দেহ নেই, এ ধরনের উপেক্ষানীতি ও লালসা-ত্যাগের ঘটনায় ওইসব উন্নত চরিত্রবান লোকদের পরিচয় পাওয়া যায়, যুগ যুগ ধরে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামি সভ্যতা যাদের সুনিপুণভাবে তৈরি করেছে।

উমাইয়া শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিখ্যাত শাসক মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. ছিন্নমূল, বাস্তুহারা ও সর্বস্বান্তদের জন্য এই বিভাগ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করেন।[২০১]

যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা ও ইসলামের বিজয়াভিযানে সফলতার স্বাক্ষর রাখা সৈনিক ও সেনাপতিদের জন্য এই বিভাগ থেকে বিশেষ ভাতা ও সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৮৩ হিজরিতে আফ্রিকা বিজয়ের পর সেনাপতি মুসা ইবনে নুসাইরকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান। তেমনই আযরাকি খারেজি সম্প্রদায় দমনে অসামান্য অবদান রাখা মুহাল্লাব ইবনে আবু সাফরা ও তার সঙ্গীদেরও বিশেষভাবে সম্মানিত করে তাদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেন আরেক বিখ্যাত শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তাদের ব্যাপারে হাজ্জাজ বলেন, তারাই প্রকৃত কার্যনির্বাহী। তারাই অর্থসম্পদ লাভের সবচেয়ে বেশি অধিকারী। তারাই সীমান্ত শহরগুলো রক্ষা করে এবং শত্রুদের কোণঠাসা করে রাখে।[২০২]

---

২০০. *বুখারি*, কিতাব : যাকাত, বাব : আল-ইসতিফাফ আনিল মুসাআলাতি, হাদিস নং ১৪০৩।
২০১. মুসআব যুবাইরি, *নাসাবু কুরাইশ*, পৃ. ১২৯।
২০২. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ১৩৫।

এই বিভাগের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শাসকগণ সবসময় জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকদের খুঁজে বের করে বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব দিতেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইমাম লাইস ইবনে সাদকে এই বিভাগের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করেন আবু জাফর আল-মনসুর।[২০৩] এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ইসলামি রাজসভা জনগণের সুযোগ-সুবিধা ও উন্নতির কথা বিবেচনা করে সবসময় জ্ঞানী, যোগ্য, দক্ষ ও প্রশাসন পরিচালনায় অভিজ্ঞ লোকদেরকেই নিয়োগ দিতেন। অপরদিকে ভাতা ও সৈনিক বিভাগে কর্মরত লেখকের দায়িত্ব ছিল সকল প্রকার হিসাব, অশ্ব ও বাহনের প্রকার, সদস্যদের নাম, পদবি ও দায়িত্বের বিবরণগুলো সংরক্ষণ করা।[২০৪]

সৈনিক ও জনগণের বিষয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ফলে এই বিভাগের অনেক প্রধানের পদোন্নতি ঘটে। এমনকি তাদের অনেকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদেও উন্নীত হন। আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা 'কারামেতা' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৎকালীন সৈনিক ও ভাতা বিভাগের প্রধান মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমানকে সেনা প্রধানের দায়িত্ব দেন খলিফা মুকতাফি (মৃ. ২৯৫ হি.)।[২০৫]

সরকারি বিভিন্ন নথি সংরক্ষণে এই বিভাগের ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্ব। যেমন, মানুষের মৃত্যুর সন-তারিখ সংরক্ষণ করা। এই বিভাগের সংরক্ষিত তালিকা থেকে অনেক সৈনিক ও মনীষীর মৃত্যুর তারিখ জানা যায়, যা অন্যত্র মৃত্যুবরণের কারণে আর কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। সে হিসেবে এই বিভাগের ভূমিকা ছিল খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি সংরক্ষণের মতো। একবার শামের হিমসে এসে এক শাইখ স্থানীয় এক লোকের সঙ্গে কোনো এক বিষয় নিয়ে আলোচনারত ছিলেন। আলোচনার একপর্যায়ে বিখ্যাত মুজাহিদ খালেদ ইবনে মিদান আল-কুলায়ির মৃত্যু সন নিয়ে কথা ওঠে। স্থানীয় সেই লোকটি ছিল মুজাহিদ খালেদের খুব কাছের ব্যক্তি। সেই শাইখ দাবি করেন যে, ১০৮ হিজরি সনে আরমেনিয়ার যুদ্ধে মুজাহিদ খালেদ ইবনে মিদান আল-কুলায়ির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু মুজাহিদ খালেদের স্বজনদের

---

২০৩. ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ৫০, পৃ. ৩৬৭।
২০৪. ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি, *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু*, খ. ২, পৃ. ৩৩১।
২০৫. মাকরিযি, *ইত্তিআযুল হুনাফা*, পৃ. ৫১।

বক্তব্য, তার ইনতেকাল হয়েছে ১০৪ হিজরিতে। বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য তারা সৈনিক ও ভাতা বিভাগের শরণাপন্ন হলে সেখানে সংরক্ষিত নথি থেকে প্রমাণিত হয় আসলেই তিনি ১০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[২০৬]

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, স্পেনে উমাইয়া শাসনামলে কবি ও ছড়াকারদেরও এই বিভাগ থেকে বিশেষ ভাতা দেওয়া হতো। কাব্যের মান অনুযায়ী তাদের জন্য ভাতা নির্ধারিত হতো। একবার হাজিব মনসুর ইবনে আবু আমিরের প্রশংসায় চমৎকার ভাষাশৈলী ব্যবহার করে কিছু কবিতা রচনা করেন কবি আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসতালি। কিন্তু তার ওই কবিতা আরেক বিখ্যাত কবি সাইদ ইবনুল হাসান আন্দালুসির রচিত কবিতার সাথে সাজ্ঘর্ষিক হওয়ায় তার কবিতা নিয়ে লোকমুখে কুধারণা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তার প্রতি অপবাদের তির ছুড়ে দেয়। মনসুর ইবনে আমিরের আমলে কবিদের ভাতা নির্ধারণের জন্য আলাদা বিভাগ ছিল। কবিদের স্তর অনুযায়ী সেখান থেকে তাদের ভাতা মিলত। তো কুধারণায় পড়ে অনেকে মনসুরের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করে যে, এই লোকটি কাব্যচোর, অন্যের কবিতা আবৃত্তি করে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা আছে তার। ভাতা বিভাগ থেকে কানাকড়িও পাওয়ার যোগ্য নয় সে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে ডেকে পাঠান মনসুর। দিনটি ছিল ৩৮২ হিজরি সনের ৩ শাওয়াল। এরপর মনসুর তাকে কবিতা আবৃত্তি করতে বললে তিনি একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে মনসুরের সামনে তার কাব্যপ্রতিভা প্রমাণ করেন। ফলে সকল অপবাদের অবসান ঘটে। মনসুর তাকে নগদ একশ দিনার পুরস্কার প্রদান করেন এবং ভাতা বিভাগ থেকে তার জন্য মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করে কবি হিসেবে তাকে বরণ করে নেন।[২০৭]

ইবনে খালদুনের বর্ণনা অনুযায়ী মামালিক সাম্রাজ্যে ভাতা বিভাগের প্রধানকে সেনাবাহিনী পর্যবেক্ষক উপাধিতে ডাকা হতো। বোঝা যায়, মামালিক বংশের রাজত্বকালে এই বিভাগের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

---

২০৬. ইবনুল আদিম, *বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালব*, খ. ৩, পৃ. ২৫৩।

২০৭. হুমাইদি, *জাযওয়াতুল মুকতাবাস*, পৃ. ৪০।

মোটকথা, ভাতা ও সৈনিক বিভাগ ছিল সমগ্র ইতিহাসজুড়ে ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য প্রতীক। এই বিভাগের মাধ্যমেই ইসলামি রাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণির বেতন-ভাতা ও সম্মানী নির্ধারণ করে সুনিপুণভাবে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুমহান দায়িত্ব পালন করেছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩. ওয়াকফ বিভাগ

বিশ্বনবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমাজসেবা, জনকল্যাণমূলক কাজ এবং আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠায় পাল্লা দিয়ে এগিয়েছেন মুসলিমগণ। এর মধ্যে ওয়াকফ ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলিম জনসাধারণের বেশি উপকারে আসা উদ্যোগসমূহের একটি। ওয়াকফ ব্যবস্থা ছিল ওই ভিত্তি প্রস্তরের মতো, ইসলামি সভ্যতার পুরো ইতিহাসজুড়ে প্রতিটি সেবামূলক সংগঠন যা সুষ্ঠুরূপে পালন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম সমাজের জাগরণ ও উন্নতি সাধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। সভ্যতা বিনির্মাণে এবং ইসলামি ওয়াকফ ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে মুসলিম মানসে যে মূলমন্ত্র কাজ করেছিল এবং বিশ্বনবীর যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলিম হৃদয়ে যে প্রচেষ্টা নিজ গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলে আসছিল, চিন্তাশীল মাত্রই তার মূল রহস্য জেনে অবাক হবেন। তা ছাড়া এ কথাও দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, ওয়াকফ ব্যবস্থা মানবতার কল্যাণ সাধনে গঠিত নির্ভেজাল একটি ইসলামি উদ্যোগ, ইসলামি সভ্যতার অভ্যুদয়ের প্রাক ও সমকালে অন্য কোনো সভ্যতায় এরকম নজির আছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

প্রথমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল স্তরের মুসলিমের জন্য ওয়াকফ ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ইসলামে প্রথম ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল সাহাবি মুখাইরিকের[২০৮] জমিসমূহ। *তাবাকাতে ইবনে সাদ* গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযির বরাতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মদিনার সাতটি বাগান

২০৮. পুরো নাম মুখাইরিক আন-নাযরি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন একজন বড় ইহুদি আলেম ও বিশিষ্ট শিল্পপতি। পরবর্তী সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার সমুদয় অর্থসম্পদ বিশ্বনবীর জন্য ওসিয়ত করে যান। হিজরি তৃতীয় সনে সংঘটিত ঐতিহাসিক ওহুদের যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। তার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন, ইবনে হাজার, *আল-ইসাবা*, খ. ৬, পৃ. ৫৭।

ওয়াকফ সম্পত্তিভুক্ত ছিল। সেগুলো হলো যথাক্রমে, আল-আওয়াফ, আস-সাফিয়া, আদ-দাল্লাল, আল-মাইসাব, বারকা, হাসনা এবং মাশরাবা উম্মে ইবরাহিম। ইবনে কাব বলেন, এরপর মুসলিমগণ তাদের পুত্র ও পৌত্রদের নামে সেগুলো ওয়াকফ করে দেন।[২০৯]

আল্লাহর রাসুলের জীবদ্দশায় এবং তার ওফাতের পর অধিকাংশ সাহাবি নিজেদের নামে কিছু না কিছু ওয়াকফ করে যান। এর মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাবের ওয়াকফ, উসমান ইবনে আফফানের ওয়াকফ, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর ওয়াকফ, আলি ইবনে আবু তালিবের ওয়াকফ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল ওয়াকফ সম্পত্তি জনসাধারণের সেবা ও কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ওয়াকফনামার বিবরণে লেখেন যে, তার এই ওয়াকফ সম্পত্তির লভ্যাংশ দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, মুক্তিকামী দাস, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অতিথি এবং মুসাফির-ভিক্ষুকদের জন্য ব্যয় করা হবে। তবে এগুলো রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বশীল ব্যক্তি সুষ্ঠু উপায়ে তা থেকে উপকৃত ব্যক্তি হতে পারবে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে তা থেকে যেকোনো বন্ধুকেও খাওয়াতে পারবে।[২১০]

ওয়াকফকারীর মত অনুযায়ী ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পিত হয় উপকারভোগীদের ওপর, অথবা নির্দিষ্ট কমিটির ওপর। তবে প্রথম দিকে ইসলামি রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ সেখানে ছিল না। এরপর উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে কাযি তওবা ইবনে নামির আল-হাদরামি[২১১] মিশরের বিচারক পদে নিযুক্ত হলে তিনি লক্ষ করেন, ওয়াকফ সম্পত্তি ওয়াকফকারীর পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বশীলদের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ফলে সম্পত্তির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রকৃত ভোক্তা শ্রেণি।

---

২০৯. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৫০৩।

২১০. *বুখারি*, কিতাবুশ শুরুত, বাব : আশ-শুরুত ফিল-ওয়াকফ, হাদিস নং ২৫৮৬, *মুসলিম*, কিতাবুল ওয়াকফ, বাব : আল-ওয়াকফ, হাদিস নং ১৬৩২।

২১১. পুরো নাম আবু মিহজান তওবা ইবনে নামির ইবনে হারমাল আল-হাদরামি। তিনি মিশরের বিচারক ছিলেন। তার সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেন, স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ নিজেদের বলে চালিয়ে দেবে বা উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলবে এ আশঙ্কায় ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারিভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা তিনিই প্রথম চালু করেন। ১২০ হিজরি সনে তিনি ইনতেকাল করেন। আরও জানতে দেখুন, ইবনে হাজার, *তাজিলুল মানফাআতি*, পৃ. ৬১।

যার কারণে ওয়াকফের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করতে তিনি নিজে ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। এর ফলাফলও হাতেনাতে পায় মিশরের জনগণ। কাযি তওবার ইনতেকালের পরপরই ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মিশরে স্বতন্ত্র সরকারি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রধান হিসেবে থাকতেন একজন বিচারক। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে এ প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটলে মিশরেই তা পূর্ণতা লাভ করে। এভাবেই একজন বিচারক সবসময় এ বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে থেকে ওয়াকফের শর্তাবলি অনুযায়ী সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতেন। তবে ওয়াকফকারীর শর্তমতে সম্পত্তির কোনো মুতাওয়াল্লি নির্দিষ্ট করা থাকলে তিনিই বিচারকের সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা নিয়ে প্রকল্প দেখাশোনা করতেন।[২১২]

হিজরি চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এ সময় আলাদা মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করে ওয়াকফ প্রকল্প দেখাশোনার সকল দায়দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হতো। তিনিই প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। ওয়াকফ বিভাগের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পত্তির লভ্যাংশ গরিব-মিসকিন ও ভোক্তাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। ওয়াকফ বিভাগ স্বতন্ত্র একটি বিভাগ হওয়ার পেছনে এটাই ছিল কারণ। এই বিভাগ নতুন হওয়া সত্ত্বেও দিন যতই গড়িয়েছে এ বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভাগীয় প্রধানের ততই পদোন্নতি ঘটেছে। এমনকি তাদের অনেকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলেও ইতিহাসে পাওয়া যায়। মিশরে প্রধান বিচারপতির পদকেও ছাপিয়ে যায় ওয়াকফ বিভাগীয় প্রধানের পদ। এরকম ঘটনাও প্রসিদ্ধ আছে, ঈদ বা জাতীয় উৎসবের মৌসুমে জনগণের পক্ষ থেকে সুলতানকে শুভেচ্ছা জানানোর অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণের জন্য মিশরের প্রধান বিচারপতি একবার তার সেবককে বলে পাঠালেন, যাও, রাজদরবারের গেটে দাঁড়িয়ে থাকো। ওয়াকফ বিভাগীয় প্রধান সুলতানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেলে আমাকে এসে সংবাদ দিয়ো। এরপর ঠিকই ওয়াকফ বিভাগীয় প্রধান সুলতানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় হলে প্রধান বিচারপতি এসে সুলতানের প্রতি অভিনন্দন ব্যক্ত করেন। এ ঘটনার

---

২১২. আল-কিন্দি, *আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*, পৃ. ৩৯০; মুহাম্মাদ আবু যাহরা, *মুহাদারাত ফিল-ওয়াকফ*, পৃ. ১২।

কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে *লুমাউল কাওয়ানিনিল মুদিয়্যা ফি দাওয়াবিনিদ দিয়ারিল মিসরিয়্যা* গ্রন্থকার নাবুলুসি[২১৩] বলেন, রাজদরবারে দুজন প্রভাবশালী রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্বের সমাবেশ এড়াতেই তিনি এ ঘটনার জন্ম দেন। যাই হোক, রাজদরবারে ওয়াকফ বিভাগের প্রধানের স্থান ছিল ঠিক সুলতানের বাঁ পাশেই। কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে তার ছিল অসামান্য গুরুত্ব এবং তিনি ছিলেন উন্নত মর্যাদার অধিকারী। মাকরিযি বলেন, ওয়াকফ বিভাগের প্রধান সরাসরি সকল সরকারি বিভাগসমূহে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখতেন। আর সেখানে কেবল একনিষ্ঠ ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মুসলিম লেখকদেরকেই কাজের সুযোগ দেওয়া হতো।[২১৪]

তবে উসমানীয় খিলাফতের সময় সম্পূর্ণ নতুন ওয়াকফ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। যেসব জমিতে ওয়াকফ ভবন নির্মাণ করা হবে এবং যে অর্থসম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয় না এবং ব্যবসার জন্য নির্ধারিত নয় তবে তা প্রবৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করা যায় এবং দায়িত্বশীলগণ তা ভাড়া দিয়ে অথবা তা থেকে অর্জিত লভ্যাংশ থেকে উপকৃত হন এরকম আধুনিক নিয়মনীতি এবং ওয়াকফ ভূমির ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত নীতিমালা ওই নতুন ওয়াকফ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়। আজ পর্যন্ত অনেক আরবরাষ্ট্রে ভূমির সেই বিভাজন ব্যবস্থা ও নীতিমালা পুরোপুরি অনুসরণ করা হচ্ছে। উসমানীয় শাসনতন্ত্রের প্রণয়ন করা ওয়াকফ-বিষয়ক আরেকটি ব্যবস্থা হলো 'নির্দেশনা ও দায়িত্ব প্রদান বিভাগ'। এই বিভাগের কাজ ছিল অলাভজনক ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সঠিক পেশা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা। ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লি হওয়ার জন্য আগ্রহীদের পরীক্ষা গ্রহণ করা। আগ্রহীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ধর্মীয় পেশা প্রাধান্য পেত। যেমন মসজিদের ইমাম হওয়া, মুয়াজ্জিন হওয়া, খতিব হওয়া, ধর্মীয় শিক্ষক হওয়া ইত্যাদি। এভাবেই উসমানীয়

---

২১৩. পুরো নাম উসমান ইবনে ইবরাহিম নাবুলুসি। অপর নাম ফখরুদ্দিন। আইয়ুবি সাম্রাজ্যের অন্যতম আমির। সুলতান নাজমুদ্দিন আইয়ুব আন-নযর ৬৩২ হিজরি সনে মিশরের দিওয়ানে তাকে অধিষ্ঠিত করেন। এই সুলতানের আদেশেই তিনি *লুমাউল কাওয়ানিনিল মুদিয়্যা ফি দাওয়াবিনিদ দিয়ারিল মিসরিয়্যা* রচনা করেন। ৬৮৫ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন। যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২০২।

২১৪. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয*, খ. ২, পৃ. ২৯৫; কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৩, পৃ. ৫৬৭; নাবুলুসি, *লুমাউল কাওয়ানিনিল মুদিয়্যা ফি দাওয়াবিনিদ দিয়ারিল মিসরিয়্যা*, পৃ. ২৮; সামাররায়ি, *আল-মুআসসাসাতুল ইদারিয়্যা ফিদ-দাওলাতিল আব্বাসিয়া*, পৃ. ২৯৮-৩০৭।

খিলাফতের সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পুরো মুসলিম-বিশ্বজুড়ে অব্যাহত আছে এই ওয়াকফ ব্যবস্থা। অবশেষে ওয়াকফের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয়ও গঠন করা হয়।[২১৫]

আর ওয়াকফ ব্যবস্থাপনায় স্থান পায় গুরুত্বপূর্ণ সব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। মসজিদ নির্মাণ, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল নির্মাণ, সড়ক ও পথ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, অতিথি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠাসহ ধর্মীয় ও মানবিক দিক থেকে ইসলামি সমাজের চাহিদা পূরণে কার্যকর এরকম অনেক প্রকল্পই ছিল ওয়াকফ ব্যবস্থার আওতাধীন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ওয়াকফ ব্যবস্থার অসামান্য অবদান আমাদের চোখের সামনেই। আর মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজারো মসজিদ প্রতিষ্ঠার পেছনে ওয়াকফকারীদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, মুসলিমদের জন্য জামাতে নামায আদায়ের সুব্যবস্থা করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন এবং পরকালে অফুরন্ত প্রতিদান লাভ।

শিক্ষাঙ্গনে আমরা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াকফ ব্যবস্থায় নির্মিত শত শত মাদরাসা দেখতে পাই, যা হাজার বছর ধরে বিদগ্ধ মুসলিম মনীষী তৈরি করে বিশ্ব দরবারে মুসলিমজাতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছে, যার সওয়াব ওয়াকফকারীগণ অবিরাম পেয়ে আসছেন এবং পেতে থাকবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়াকফ ব্যবস্থার পুনর্জাগরণে অসামান্য অবদান রাখা সব থেকে বিখ্যাত সুলতান হলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.। মিশরে তার ওয়াকফকীর্তির অন্যতম হলো, তিনি কায়রোতে অবস্থিত ইমাম হুসাইন ওয়াকফ আলি স্কয়ার হিসেবে খ্যাত সেই পবিত্র স্থানের পাশেই একটি বড় মাদরাসা নির্মাণ করে তা ওয়াকফ করে দেন। মিশরের জনগণের কল্যাণে নিবেদিত 'দারে সায়িদিস সুআদা' নামে একটি সর্বজনীন খানকা নির্মাণ করে তাও ওয়াকফ করে দেন। 'দারে আব্বাস ইবনুস সাল্লার' নামে একটি হানাফি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তা ওয়াকফ করে দেন। মিশরে শাফিয়ি মাযহাবের ওপর পড়াশোনার জন্য তিনি 'যাইনুন নাজ্জার' নামে বিখ্যাত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তা ওয়াকফ করে যান। তা ছাড়া মালেকি

---

২১৫. মুহাম্মাদ আবু যাহরা, *মুহাদারাত ফিল-ওয়াকফ*, পৃ. ২৬-২৭; ইকরামা সাবরি, *আল-ওয়াকফুল ইসলামি*, পৃ. ২১-২২।

মাযহাবের ওপর পড়াশোনা করার জন্যও তিনি মিশরে স্বতন্ত্র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২১৬]

সামাজিক অঙ্গনে ওয়াফক ব্যবস্থার অবদান হিসেবে পথঘাট নির্মাণ, দরিদ্র-নিকেতন ও অভাবগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ গরিব মিসকিনদের জন্য আরও অনেক ওয়াকফ প্রক্রিয়া চলমান ছিল, যা ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রচলিত যৌথ সামাজিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমির নুরুদ্দিন মাহমুদ আলেপ্পোসহ সমগ্র মুসলিমবিশ্বে অসুস্থ, এতিম ও দরিদ্রদের জন্য নানাবিধ ওয়াকফ প্রকল্পের সূচনা করেন। পবিত্র নগরী মক্কায় একেবারে হারাম শরিফের কাছে নির্মিত বিরাট বাগানটি ৬৯৭ হিজরি সনে দরিদ্র, মিসকিন, মুসাফির ও হাজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন শাইখ আয়ুদুদ্দৌলা রাইহানুন্নাদা শিহাবি, যাকে সবাই হারাম শরিফের সেবকদের শাইখ বলে ডাকেন।[২১৭]

মামলুকি রাজবংশের সুলতান যাহের বারকুক জাবাল দুর্গে[২১৮] বসবাসরত এতিম শিশুদের জন্য কুরআন পাঠ ও হিফয করার একটি বড় মক্তব প্রতিষ্ঠা করে তা ওয়াকফ করে দেন। ওই দুর্গ থেকেই মিশর ও শামসহ সুলতানের অনুগত সকল অঞ্চল শাসন করা হতো। পূর্ববর্তীকালের বাদশা, সুলতান, ধনী ও মুসলিম সমাজসেবকগণ ওয়াকফের কাজে কী পরিমাণ অগ্রগামী ছিলেন, তা এই উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট। এসব ওয়াকফ প্রকল্প মুসলিম সামাজিক জীবনের মানোন্নয়নে যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সিরিয়ার দামেশকেও এরকম অনেক ওয়াকফ প্রকল্প প্রচলিত ছিল যা ইসলামের সৌন্দর্য ও সৌহার্দ্যের প্রতীককে সমুন্নত করেছে। বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা বড় আশ্চর্য ও বিস্ময় ভরা কণ্ঠে সেই ওয়াকফ প্রকল্পগুলোর বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দামেশকে আওকাফ প্রকল্পের সংখ্যা এবং এ খাতে ব্যয়ের বাজেট হিসাব করে শেষ করার মতো নয়। এর মধ্যে একটি ছিল অপারগ হাজিদের জন্য হজের ব্যয়ভার বহন করা। সেই তহবিল থেকে প্রয়োজন অনুপাতে প্রত্যেক

---

২১৬. ইয়াফেয়ি, *মিরআতুল জিনান ওয়া-ইবরাতুল ইয়াকযান ফি মারিফাতি হাওয়াদিসিয যামান*, খ. ৩, পৃ. ৩৫১।

২১৭. ইবনুদ দিয়া, *তারিখু মাক্কাতাল মুকাররামা ওয়াল-হারামিশ শারিফ*, পৃ. ২৪৭।

২১৮. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ৪৪৮।

হাজিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হতো। অন্য একটি প্রকল্প হলো, দরিদ্র পরিবারের বিয়ের উপযুক্ত মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করে প্রসাধনী ও আসবাবপত্রসহ স্বামীর হাতে তুলে দেওয়া। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে ছিল বন্দিমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। দুঃস্থ, অভাবী, পথিক, মুসাফিরদের জন্য সহযোগিতা প্রদান, এই প্রকল্প থেকে তাদের জন্য অন্নবস্ত্র ও নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় পাথেয়ের ব্যবস্থা করা হতো। আরও ছিল সড়ক ও ফুটপাত সংস্কার। তৎকালীন দামেশকের প্রধান সড়কগুলোর দুপাশে পথচারীদের হাঁটার জন্য ফুটপাতের ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া দামেশকে আরও অনেক সেবামূলক কাজ প্রচলিত ছিল ওয়াকফ বিভাগের তত্ত্বাবধানে।[২১৯] যার সুফল দামেশকে বসবাসরত সকল মুসলিম-অমুসলিম সমানভাবে ভোগ করত।

ইবনে বতুতার বর্ণনা করা আরেক বিস্ময়কর বিবরণ হলো পাত্র মেরামত ওয়াকফ প্রকল্প। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, একবার আমি দামেশকের একটি গলি পার হওয়ার সময় দেখি, অল্পবয়স্ক একজন দাসের হাত থেকে চীনের তৈরি দামি একটি থালা মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। তা দেখে আশপাশের মানুষেরা জড়ো হলে একজন বলতে থাকেন, বাসনের এই ভাঙা অংশগুলো নিয়ে গিয়ে পাত্র মেরামত ওয়াকফ বিভাগের দায়িত্বশীলকে দেখাও। এরপর দাস সেগুলো তাড়াতাড়ি উঠিয়ে ওই বিভাগে যায়। সঙ্গে যায় ওই লোকটিও। ওখানে গিয়ে বাসনের ভাঙা অংশগুলো দেখালে এরকম পাত্র কেনার মতো মূল্য সে দিয়ে দেয়। ফলে ওই ভৃত্য গিয়ে অনুরূপ নতুন আরেকটি বাসন কিনে নেয়। এটি খুব সুন্দর একটি উদ্যোগ। কারণ ভৃত্য হওয়ায় দামি একটি বাসন ভাঙার অপরাধে মনিব অবশ্যই তাকে গালমন্দ বা প্রহার করত, এতে বালকটি কষ্ট পেত। এরকম পাত্র মেরামত ওয়াকফ প্রকল্পের মতো সুন্দর উদ্যোগ মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়। যারা এরকম অসাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ করে সমাজসেবা করেছেন তাদের আল্লাহ ভরপুর প্রতিদান দিন সবসময়, আমরা এই দোয়াই করি।[২২০]

---

২১৯. ইবনে বতুতা, *রিহলাতু ইবনে বতুতা*, পৃ. ৯৯।

২২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

এমনকি একাধিক ইসলামি রাষ্ট্রে বিয়েশাদিতে কনের সাজগোজের জন্য দামি প্রসাধনী ও স্বর্ণালংকার ভাড়া দেওয়ার মতো ওয়াকফ প্রকল্পগুলোও ছিল উল্লেখযোগ্য। এতে করে বরকনে উভয়ের আনন্দ-উৎসবে ভিন্ন মাত্রা যোগ হতো। এরকম দামি অলংকার পরিয়ে স্ত্রীকে ঘরে তোলার মতো সাধ ও সাধ্য যাদের নেই, সেইসব দরিদ্র, অসহায় ও গরিবের জন্যই ছিল এই ওয়াকফ প্রকল্পের ব্যবস্থা। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে আবার সেগুলো ওয়াকফ কার্যালয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। এভাবেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরমানন্দে বিয়ের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে উপলক্ষ্যটি সুখময় ও স্মৃতিবহ করে তুলত।[২২১]

তিউনিসিয়ায় ছিল দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য খতনার ওয়াকফ বিভাগ। খতনা করিয়ে শিশুকে নতুন পোশাক ও কিছু দিরহাম উপহার দেওয়া হতো। সেখানে রমযান মাসে বিনামূল্যে মিষ্টি বিতরণও ছিল একরকম ওয়াকফ উদ্যোগ। বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে তিউনিসিয়ার সমুদ্রতীরে প্রচুর পরিমাণ মাছ ভেসে উঠত। এ কারণে সেখানে এক ধরনের ওয়াকফ প্রচলন ছিল, যার লভ্যাংশ দিয়ে প্রচুর পরিমাণ মাছ কিনে বিনামূল্যে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হতো। আরও একটি আশ্চর্যকর ওয়াকফের ব্যবস্থা ছিল সেখানে, কারও কাপড়ে প্রদীপের তেল পড়ে গেলে কিংবা কোনো কিছুর আঁচড়ে কাপড় ছিঁড়ে গেলে ওয়াকফ অফিসের শরণাপন্ন হলে সেখান থেকে কাপড়ের মূল্য দিয়ে দেওয়া হতো, তা দিয়ে সে অনায়াসে নতুন কাপড় কিনতে পারত।[২২২]

'দারুদ দুক্কা' নামে আরও আশ্চর্যকর এক ওয়াকফ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল মরক্কোর মারাকেশ শহরে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদবশত রাগ করে যেসব নারী ঘর থেকে বের হয়ে যেত, তারা এই সংগঠনে এসে আশ্রয় নিতে পারত। স্বামীর সঙ্গে তাদের বিবাদ না মেটা পর্যন্ত যতদিন ইচ্ছা তারা সেখানে বিনামূল্যে পানাহার ও অবস্থান করতে পারত।

অপরদিকে হিজরি প্রথম শতাব্দী থেকেই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ওয়াকফ ব্যবস্থার ছিল নানা উদ্যোগ। প্রথমে বড় আকারে চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক। তিনি

---

২২১. শাকিব আরসালান, *হাদিরুল আলামিল ইসলামি*, খ. ৩, পৃ. ৮।

২২২. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

দামেশকে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে তা অসুস্থদের ফ্রি চিকিৎসার জন্য ওয়াকফ করে দেন।[২২৩] তা ছাড়া কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসায় তিনি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করে তাদের জন্য সেবা ফ্রি করে দেন। কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে যেন চিকিৎসার জন্য কারও কাছে হাত পাততে না হয়, সেই ব্যবস্থা তিনি নিশ্চিত করেন। পুরো একটি শহর তাদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য ওয়াকফ করে দেন। তা ছাড়া প্রত্যেক অবসরপ্রাপ্ত ও দুর্বল বয়োবৃদ্ধের জন্য তিনি একজন করে সেবক এবং প্রত্যেক অন্ধ প্রতিবন্ধীর জন্য একজন করে গাইড নিযুক্ত করেন।[২২৪]

বাগদাদে ওয়াকফসূত্রে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলোর অন্যতম ছিল আল-আযুদি হাসপাতাল। বুওয়াইহি রাজবংশের অন্যতম শাসক আযুদুদ্দৌলা ৩৬৬ হিজরি/৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ শহরের পশ্চিমাংশে তা নির্মাণ করেন। এই হাসপাতালে বিভিন্ন রোগচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চব্বিশজন ডাক্তার সবসময় কর্মরত থাকতেন।[২২৫] হাসপাতালটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আযুদুদ্দৌলা বহুবিধ প্রবৃদ্ধিমূলক প্রকল্প ওয়াকফ করেন। এখানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক বিনামূল্যে চিকিৎসা পেত। রোগীরা এখানে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও বিভিন্ন সেবা লাভ করত। যেমন নতুন পোশাক, স্বাস্থ্যসম্মত বাহারি খাবার, জরুরি ওষুধ ইত্যাদি। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি পৌঁছার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পাথেয় ও পথখরচও দিয়ে দেওয়া হতো তাদের।[২২৬]

হাসপাতালগুলোতে এত উন্নত, আরামদায়ক ও বিলাসবহুল স্বাস্থ্যসেবা ও দামি খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হতো যে, অনেকে এগুলো ভোগ করার জন্য অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হতো। কোনো কোনো ডাক্তার তাদের এই বাহানা দেখে কখনো কখনো মুখ ফিরিয়ে নিতেন। বিশিষ্ট

---

২২৩. যাহরানি, *নিযামুল ওয়াকফ*, পৃ. ২৪৮।

২২৪. ইবনুল আসির, *আল-কামিল*, খ. ৪, পৃ. ২৯২; ইবনে দুকমাক, *আল-জাওহারুস সামিন*, পৃ. ৬৫।

২২৫. এর দ্বারা বোঝা যায় হাসপাতালটি বিশাল আয়তনের ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।-অনুবাদক

২২৬. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ৬৭; মুহাম্মাদ হুসাইন আলি, *তারিখুল আরবি ওয়াল-মুসলিমিন*, পৃ. ১৯৬; কাদরি হাফেজ তুকান, *আল-উলুমু ইনদাল আরাবি ওয়াল-মুসলিমিন*, পৃ. ৩২-৩৪।

ইতিহাসবিদ খলিল ইবনে শাহিন যাহেরি[২২৭] বর্ণনা করেন, ৮৩১ হিজরি/১৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে একবার তিনি দামেশকের একটি হাসপাতাল দেখতে যান। তার বর্ণনামতে, এরকম বিলাসবহুল চিকিৎসাকেন্দ্র তিনি পৃথিবীর আর কোথাও দেখেননি। সেখানে তিনি লক্ষ করেন, এক লোক অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তিন দিন পার হওয়ার পর ডাক্তার তার চিকিৎসাপত্রে লিখে দেন, মেহমান কখনো তিন দিনের বেশি অবস্থান করেন না।[২২৮]

এরকম নানা আয়োজন আর বিচিত্র সব উদ্যোগের কারণে ইসলামি সভ্যতায় অনন্য হয়ে ওঠে এই ওয়াকফ ব্যবস্থা। ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য শুধু ওয়াকফ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি, যা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে কাজ করে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কোনো সভ্যতাই এরকম সংহতি, পরোপকার ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনসেবায় অংশগ্রহণের নজির স্থাপন করতে পারেনি।

---

২২৭. খলিল ইবনে শাহিন যাহেরি (৮১৩-৮৭৩ হি./১৪১০-১৪৬৮ খ্রি.)। ইবনে শাহিন নামে তিনি পরিচিত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদগ্ধ একজন গবেষক। তার অনেক গ্রন্থ মিশরে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে *যুবদাতু কাশফিল মামালিক ওয়া বায়ানিত তুরুকি ওয়াল-মাসালিক* অন্যতম। তার সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ৩১৮।

২২৮. ইকরামা সাইদ সাবরি, *আত-তামরিয ফিত-তারিখিল ইসলামি*, পৃ. ২৯-৩০।

৪. চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ডাক ও যোগাযোগ বিভাগ

ডাক ও যোগাযোগের সকল উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে অনেক গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে সেজন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান নিশ্চিত করেছে ইসলামি সভ্যতা। ইসলামি রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল সময়ের দাবি, যা খিলাফতের রাজধানীর সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য শহরের, বিশেষ করে খলিফার সাথে প্রাদেশিক গভর্নরদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ নিশ্চিত করবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেজন্য পুরো একটি বিভাগ এবং স্বতন্ত্র একটি কার্যালয় গঠন করা হয়, যা ইসলামি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে এবং বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে সদা সতর্ক ও অবগত থাকতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ইসলামি সভ্যতা যে উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেছিল, তারই উজ্জ্বল প্রমাণ এই ডাক ও যোগাযোগ বিভাগ।

আরবি বারিদ শব্দের অর্থ ও তার আধুনিকায়নঃ

بريد শব্দের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে ঠিক, তবে এটি যে নিখাদ আরবি শব্দ এ নিয়ে কারও মাঝে বিরোধ নেই। এ শব্দের অনেকগুলো অর্থের একটি হলো : দূত, বার্তাবাহক। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে :

«اَلْحُمّٰى بَرِيْدُ الْمَوْتِ»

জ্বর হলো মৃত্যুর দূত।

অর্থাৎ জ্বর মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসে, জীবনাবসানের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজেয বলেন,

«رَأَيْتُ لِلْمَوْتِ بَرِيْدًا مُبْرَدًا»

আমি মৃত্যুর বার্তাবাহককে আসতে দেখেছি।

সিংহের আগমনি বার্তা দেয় বিধায় সারসপাখিকেও আরবিভাষীগণ 'বারিদ' বলে থাকেন।[২২৯]

গাধা বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যারা বার্তা আদান-প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন, তাদেরকেও 'বারিদ' বলা হয়। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا، فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الِاسْمِ»

আমার কাছে কোনো বার্তাবাহক পাঠানোর সময় তোমরা সুদর্শন ও সুন্দর নামের অধিকারী কাউকে পাঠিয়ো।[২৩০]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

«إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُرْدِ»

আমি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না এবং কোনো দূতকে গ্রেফতার করি না।[২৩১]

যামাখশারি রহ. বলেন, بُرْدٌ শব্দের راء-তে সাকিন করে পড়লে সেটি بَرِيدٌ শব্দের বহুবচন ধরা হবে। তখন অর্থ হবে বার্তাবহক। رُسُلٌ শব্দটির سين-এ যেমন পেশ ও সাকিন উভয়টাই চলে, তেমনই بَرِيدٌ শব্দের বহুবচন بُرْدٌ-এর راء-তে পেশ ও সাকিন উভয়টাই চলবে।[২৩২]

এ কারণেই পত্রবাহক জন্তুকেও বলা হয় বারিদ। তানুখি বলেন, পত্র বহন ও পৌছানোর দায়িত্বটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। কারণ একজন-দুজন নয়, পুরো একটি সংঘবদ্ধ দলকে কাজ করতে হতো এর জন্য। দরকার হতো দূরের পথ পাড়ি দেওয়ার বহু সরঞ্জাম ও ভ্রমণ পাথেয়ের। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল পত্রবাহকদের চলাচলের পথগুলো সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে নিরাপদ রাখা। চোর-ডাকাত ও শত্রুদের আনাগোনা থেকে

---

২২৯. ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, মাদ্দাহ, برد, খ. ৩, পৃ. ৮৪।

২৩০. তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৭, পৃ. ৩৬৭। ইবনে হাজার আসকালানি, *আল-মাতালিবুল আলিয়া*, খ. ১১, পৃ. ৬৮৫ (২৬৮৫)।

২৩১. আবু দাউদ, হাদিস নং ২৭৫৮। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৮৭৭।

২৩২. যামাখশারি, *আল-ফায়িক ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল-আসার*, খ. ১, পৃ. ৪০৫; ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরব*, মাদ্দাহ, برد, খ. ৩, পৃ. ৮৪।

তা সুরক্ষিত রাখা। গোয়েন্দাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। কারণ সীমান্তরক্ষীদের থেকে আসা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র তাদেরকেই বহন করতে হতো। প্রাদেশিক অঞ্চল থেকে আসা বার্তাগুলো তাদেরকেই পুরোপুরি আমানতের সাথে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত পথ ধরে শাসকদের কাছে পৌঁছে দিতে হতো। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্বাচন করতে হতো দ্রুতগামী বাহন ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের। পত্র বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ শাসকদের কাছে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দাদের মর্যাদা পেতেন। কারণ শাসকগণ যদি তাদের প্রতি শৈথিল্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহলে কিছুতেই বন্ধুমহল ও শত্রুপক্ষের সার্বিক খবরাখবর তিনি রাখতে পারবেন না। এসব ব্যক্তিবর্গের হাত ধরেই তার হস্তগত হতো পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সকল সংবাদ। ডাক যোগাযোগ বিষয়ে অনীহা প্রদর্শন করলে শাসকদের রাজনীতি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং টের পাওয়ার আগেই তারা শত্রুপক্ষের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়বে।[২৩৩]

ডাকবিভাগের প্রধান দায়িত্বশীলের কাজ হতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিভাগের কাছে সকল সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করা। তারা ছিলেন সাংবাদিকের ভূমিকায়। রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শাসক শ্রেণির কাছে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের সকল অবস্থা এবং সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতির সংবাদ সরবরাহ করা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলমান সন্দেহজনক ষড়যন্ত্র, বড় কর্মকর্তা বা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় কোনো অঞ্চল স্বাধীন বা রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার চক্রান্তে লিপ্ত কি না এ জাতীয় সকল সংবাদ জানানোই ছিল এ বিভাগের দায়িত্বশীলদের মূল কাজ।[২৩৪]

ইসলামের সূচনালগ্নে পত্রবাহকদের দায়িত্ব ছিল শুধু খলিফাদের বার্তাগুলো প্রাদেশিক গভর্নর ও সরকারি দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের বার্তাগুলো খলিফার কাছে হস্তান্তর করা। ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়িত্বও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। শেষ-পর্যন্ত এ বিভাগের প্রধানকে খলিফার প্রধান গোয়েন্দা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তিনিই খলিফার আদেশ-নিষেধগুলো বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছে পত্রযোগে পাঠাতেন এবং তাদের কার্যক্রমের ওপর

---

[২৩৩]. তানুখি, *আল-ফারাজু বা'দাশ শিদ্দাতি*, খ. ১, পৃ. ৫০।

[২৩৪]. তারতুশি, *সিরাজুল মুলুক*, পৃ. ৪৯।

সবসময় সজাগ দৃষ্টি রেখে খলিফাকে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। তেমনই শত্রুদের গতিবিধির প্রতিও তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। শত্রুদের হালচাল সম্পর্কে অবগত থাকতেন। তার দায়িত্ব ছিল অনেকটা বর্তমান সময়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা গোয়েন্দা শাখার মতো। সাহিব আলাউদ্দিন বলেন, তাদের মৌলিক কাজ ছিল আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিটি স্থানে ডাকঘর স্থাপন করা এবং যথাস্থানে ত্বরিত সংবাদ পৌঁছে দেওয়া।[২৩৫] পত্র আদান-প্রদান ও চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়টি প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে পরবর্তী সময় এই সেবাটি সর্বসাধারণের জন্য অনুমোদন করা হয়।[২৩৬]

মুসলিমগণ এই যোগাযোগব্যবস্থার কল্যাণে প্রথম একক পথ ও পয়েন্ট তৈরি করেন। প্রতিটি পয়েন্টে দ্রুতগামী অশ্ব ও সুদক্ষ দায়িত্বশীলগণ অবস্থান করতেন। তারা পালাক্রমে পত্র বহনের দায়িত্ব পালন করতেন। ইবনুত তিকতাকি বলেন, বেশ কিছু পয়েন্টে কিছু দ্রুতগামী ঘোড়া ও দায়িত্বশীল রাখা হতো। নিকটবর্তী পয়েন্ট থেকে কেউ বার্তা নিয়ে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কালক্ষেপণ না করে উক্ত পয়েন্ট থেকে অপর দায়িত্বশীল দ্রুত সংবাদ পৌঁছানোর লক্ষ্যে নতুন ঘোড়া নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটতেন। এভাবেই তারা পালাক্রমে পত্র বহন ও পৌঁছানোর কাজ করতেন।[২৩৭]

ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন

এটা সুস্পষ্ট যে, ডাকব্যবস্থা একটি প্রাচীন যোগাযোগ ব্যবস্থা। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যেও এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।[২৩৮] ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যেও এ রীতির প্রচলন পাওয়া যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরও এটি ছিল একটি প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বিষয়। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ইসলামের দাওয়াত প্রদানের লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দূত পাঠিয়ে পত্র আদান প্রদান করেছেন। বিষয়টি

---

[২৩৫]. ইবনুত তিকতাকি, *আল-ফাখরিয়্যা ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১০৬।
[২৩৬]. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৩৯।
[২৩৭]. ইবনুত তিকতাকি, *আল-ফাখরিয়্যা ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১০৬।
[২৩৮]. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪১২।

তিনি এতই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন যে, সুদর্শন ও সুন্দর নামের অধিকারী লোকদের এ কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। এরই ফলে পারস্যের সম্রাট খসরু, রোমসম্রাট কাইসার, মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিস, আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশির কাছে যেসব দূত পাঠিয়েছেন সবার মাঝেই এ বৈশিষ্ট্য সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। কারণ তিনি জানতেন একজন দূত হলেন একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। প্রেরকের আগ্রহ ও সিদ্ধান্তের প্রতিচ্ছবি। এর বিপরীত হলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। শূন্য হাতে ফিরে আসতে হবে দূতকে।[২৩৯]

তা ছাড়া বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সিল বা আংটি তৈরির নির্দেশ দেন। কারণ তৎকালীন সম্রাটগণ রাষ্ট্রীয় সিল ছাড়া কোনো পত্র গ্রহণ করতেন না এবং সিলমোহরকে তারা প্রাপকের সম্মান বলে মনে করতেন।[২৪০]

প্রথম যুগের মুসলিমগণ যুদ্ধ-জিহাদকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন, বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে অসংখ্য বিজয়ের বীরোচিত উপাখ্যান রচনা করে ইসলামি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করেন, তা ধরে রাখার জন্য এবং প্রাদেশিক গভর্নর ও সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তৎকালীন ইসলামি রাষ্ট্রের সৈনিকগণ জিহাদের গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পত্র বহন ও পৌঁছানোর দায়িত্বও সমানভাবে পালন করতেন। আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাপতিদের পক্ষ থেকে নিয়মিত চিঠি আসত। যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে আমিরুল মুমিনিন সবসময় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বরং প্রতিটি পদক্ষেপ ও ঘটনা

---

[২৩৯]. ইবরাহিম আলি আল-কাল্লা, *নুযুমুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৪।

[২৪০]. আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনারব জনগোষ্ঠী বরাবর পত্র লেখার ইচ্ছা করলে তাকে অবগত করা হলো যে, অনারবগণ সিল ছাড়া কোনো পত্র গ্রহণ করেন না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি (সিল হিসেবে ব্যবহারের জন্য) রুপার একটি আংটি তৈরি করেন যাতে লেখা ছিল محمد. رسول. الله। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বা আঙুলে সেই আংটি শোভা পেত। দেখুন, *বুখারি*, হাদিস নং ৬৫; *মুসলিম*, হাদিস নং ২০৯২।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে অবহিত করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। যেন তারা একাকিত্ব বোধ না করেন, সবসময় আমিরুল মুমিনিন ও মুসলিমবিশ্ব তাদের পাশে আছে, তাদের বিজয়াভিযান ও দুঃখ-কষ্ট তাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে এই ধারণা যেন সবসময় তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। তা ছাড়া সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রতিকূল অবস্থায় সাহায্য প্রেরণ যেন সম্ভব হয়, যোগাযোগ রক্ষার পেছনে সেটিও ছিল আমিরুল মুমিনিনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

উমাইয়া শাসনামলে মুআবিয়া রা. ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদ ও বিধি প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা। আর এভাবেই মুআবিয়া রা. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এর জন্য স্বতন্ত্র কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে রোম ও পারস্য থেকে সুদক্ষ কর্মী নিয়ে আসেন।[২৪১]

এরপর আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এসে ডাকবিভাগের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে নতুন নতুন বিষয় তাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য তা আরও কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে ছিল প্রতিটি ভূখণ্ডের জন্য সীমা নির্ধারণ করা এবং দামেশক থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত বিস্তৃত স্বতন্ত্র চারটি পথ তৈরি করা। বাদশা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান দিনরাতের যেকোনো সময় পত্রবাহক এলে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে কোনো প্রকার বাধা না দিতে প্রধান প্রহরীকে আদেশ দেন। বর্ণিত আছে, তিনি রাজপ্রহরী ইবনুদ দোগাইদাগাকে ডেকে বলেন, চার প্রকার লোক ছাড়া আমার দরজায় যে-ই আসবে, অবশ্যই তুমি তাদের পরীক্ষা করবে : এক. মুয়াজ্জিন, কারণ সে হলো আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। তার ওপর কোনো বাধা চলে না। দুই. রাতের আগন্তুক। কারণ কঠিন বিপদে পড়েছে বলেই সে এসেছে। তা না হলে সে ঘুমিয়ে থাকত। তিন. পত্রবাহক। দিনরাতের যখনই সে আসবে, তাকে বারণ করবে না। কারণ বছরজুড়ে বিশৃঙ্খলায় পড়ে থাকা পুরো রাজ্যকে একটি সংবাদের মাধ্যমে মুহূর্তেই শান্ত করে দিতে পারেন একজন পত্রবাহক।

---

২৪১. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা ফি সিনাআতিল ইনশা*, খ. ১৪, পৃ. ৪১৩; কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৪-১০৫।

চার. খাবার। যখনই আসবে, দরজা খুলে দেবে। সবাইকে খাবারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দেবে।[২৪২] বাদশা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে পত্রবাহকের কী পরিমাণ গুরুত্ব ছিল, এ ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিখ্যাত উমাইয়া শাসক ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে অর্থনৈতিক ও নাগরিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার পরিধি আরও সম্প্রসারিত হয়। বিপুল পরিমাণ উট ও ঘোড়া বরাদ্দ করা হয় এ কাজের জন্য। রাষ্ট্রজুড়ে অনেকগুলো ডাকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়। তার আমলে ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার অসামান্য উন্নতি সাধিত হয়, এমনকি কনস্টান্টিনোপল থেকে দামেশক পর্যন্ত দীর্ঘ পথে দায়িত্বরত বাহনগুলোকে স্বর্ণখচিত আবরণ পরানো হয়। এরকম আচ্ছাদন কেবল বড় বড় মসজিদ, মক্কা, মদিনা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের দেয়ালগুলোতেই শোভা পেত।[২৪৩]

ডাকবিভাগের উন্নয়নে বিখ্যাত শাসক উমর ইবনে আবদুল আযিযও ব্যাপক অবদান রেখে যান। ডাকপয়েন্টগুলোর সম্প্রসারণ, বিশ্রামাগার তৈরি, এ কাজের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি সড়কে বাহনের পানের জন্য পানির হাউজ এবং খাদ্যশালা স্থাপন করেন। উমর ইবনে আবদুল আযিয ঘোষণা করে দেন, এই বাহনগুলো কেবল যেন মুসলিমদের সেবায় এবং পত্র বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কারণ বাহনগুলো ছিল রাষ্ট্রীয় সম্পদ। একবার তিনি সরকারি এক কর্মীকে তার এলাকা থেকে মধু নিয়ে আসতে বলেন। ওই কর্মী ডাকবাহনের পিঠে করে সেই মধু নিয়ে আসে। উমর ইবনে আবদুল আযিয জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে নিয়ে এসেছে? দরবারিগণ উত্তর দিলেন, ডাকবাহনের পিঠে করে। এ কথা শুনে তিনি ওই মধু বিক্রি করে তার মূল্য মুসলিমদের সাধারণ অর্থ তহবিলে জমা করার নির্দেশ দেন। আর ওই কর্মীকে বলেন, এই বাহনে করে এনে তুমি তোমার মধু নষ্ট করে ফেলেছ![২৪৪]

---

২৪২. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪১৩।
২৪৩. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪১৩।
২৪৪. ইবনুল জাওযি, *সিরাতু ওয়া মানাকিবু উমর*, পৃ. ২১০; আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ফাসাবি, *আল-মারিফাতু ওয়াত-তারিখু*, খ. ১, পৃ. ৩৩৭।

ইতিহাসে দেখা যায় আব্বাসি খলিফাগণও ডাকব্যবস্থার উন্নয়নকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তা প্রধান নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করেন। আবু জাফর মনসুর বলতেন, আমার ঘরে সবসময় চার প্রকার ব্যক্তির উপস্থিতি জরুরি। সবসময় তাদের দরকার হয় আমার। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা হে আমিরুল মুমিনিন? বললেন, তারা হলেন রাষ্ট্রের ভিত্তি। তাদের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র অচল। ঠিক যেমন চৌকাঠের খুঁটি থাকে চারটি। একটি যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে তা দুর্বল ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। এক. বিচারক, যিনি আল্লাহপ্রদত্ত বিচারব্যবস্থা কার্যকরে কারও হুমকি-ধমকির তোয়াক্কা করেন না। দুই. নিরাপত্তারক্ষী বা পুলিশ, যারা দুর্বল-সবল সবার প্রতি ন্যায্য আচরণ করেন। তিন. কর উসুলকারী, যিনি জনগণের ওপর জুলুম না করে সবার অবস্থা খতিয়ে দেখে কর আদায় করেন। এ ব্যাপারে কেউ জুলুম করলে আমি তা বরদাশত করব না। এরপর তিনি তিনবার দাঁতে শাহাদাত আঙুল চাপলেন। প্রতিবার তিনি আহ আহ বলে আওয়াজ করলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, চতুর্থ ব্যক্তিটি কে হে আমিরুল মুমিনিন? তিনি বললেন, পত্রবাহক বা সংবাদবাহক, যিনি সঠিকভাবে সকলের সংবাদ লেখেন।[২৪৫]

ভন ক্রেমার বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনের মূলে ছিলেন একজন ডাকবিভাগের কর্মী। গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ সম্পর্কে খলিফাকে অবহিত করাই ছিল তার দায়িত্ব। বরং প্রাদেশিক গভর্নরদের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি করার দায়িত্বও ছিল তার ওপর। এক কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন তারা। খলিফাগণ ডাকবিভাগের কার্যক্রমকে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করতেন। তাদের সাহায্যেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কি না তা শাসকগণ জানতে পারতেন।[২৪৬]

খলিফা হারুনুর রশিদ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান এবং বিভাগীয় গভর্নরদের উদ্দেশে ত্বরিত ফরমান জারি করার লক্ষ্যে পুরো মুসলিম সাম্রাজ্যকে নিখুঁত ডাক-যোগাযোগের আওতাভুক্ত করেন। এজন্য ত্বরিত

---

২৪৫. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৬, পৃ. ৩১৩।

২৪৬. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৪১।

ব্যবস্থা নেন। অনেকগুলো ডাকপয়েন্ট স্থাপন করেন, প্রতিটি পয়েন্টে স্বতন্ত্র কর্মী ও অশ্ব বরাদ্দের ব্যবস্থা করে তাদের জন্য খাদ্য, পানীয় ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।[২৪৭]

১৬৬ হিজরি/৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনাসমগ্র বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাসির রহ. বলেন, মক্কা, মদিনা ও ইয়ামেনের মাঝে উন্নত ডাকব্যবস্থা স্থাপনের নির্দেশ দেন খলিফা মাহদি। এর আগে অন্য কেউ এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় না।[২৪৮]

মামলুক রাজবংশের শাসনামলেও ডাকব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বিশেষ করে সুলতান বাইবার্সের রাজত্বকালে। এ সময় স্থল ও সামুদ্রিক উভয় পরিমণ্ডলে ডাকপায়রার আনাগোনার জন্য তিনি সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন, যা ৫৭২ হিজরি/১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নির্মিত পশ্চিম কায়রোর জাবাল দুর্গকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো। সেখান থেকে তৈরি হয় চারটি স্থলকেন্দ্রিক পথ :

১। একটি পথ চলে যায় আফ্রিকা মহাদেশের সুদানে অবস্থিত কুসের দিকে। সেখান থেকে আসওয়ানের দিকে। এরপর সেখান থেকে সুদান ও ইথিউপিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে।

২। আরেকটি পথ চলে যায় কুস হয়ে লোহিত সাগরের তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর আয়যাব ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে।

৩। আরেকটি পথ চলে যায় আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে।

৪। চতুর্থ পথটি দিময়াত হয়ে গাজা শহর অভিমুখে।

সুলতান বাইবার্সের রাজত্বকালে প্রতি সপ্তাহে দুবার করে মিশরে ডাক আসত। আর ডাকবিষয়ক সকল-কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন রচনা বিভাগের প্রধান।[২৪৯]

ইসলামি সভ্যতায় ডাক ও ডাক পরিভাষা

ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থার বিচিত্র কিছু প্রকার ছিল, যা ইসলামি সভ্যতায় ডাকব্যবস্থার উন্নতি ও সামসময়িক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ

---

২৪৭. ইবরাহিম আলি আল-কাল্লা, *নুযুমুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৫-১০৬।

২৪৮. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১৫৮।

২৪৯. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৪৫।

তুলে ধরে। নিচে আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ডাকব্যবস্থার কথা তুলে ধরছি :

১। স্থলপথে ব্যবহৃত ডাকব্যবস্থা

স্থলপথে ডাকসেবা পরিচালনায় যারা দায়িত্ব পালন করতেন তাদের ফুয়ুজ বা সুআত নামে ডাকা হতো। বিরতিহীন ভ্রমণ ও নিরলস পরিশ্রমে তারা ছিলেন সুপরিচিত। মুসলিমগণ সে যুগে ডাকসেবা পরিচালনায় ব্যাপকভাবে উট, ঘোড়া ব্যবহার করতেন। খচ্চরের প্রচলনও ছিল উল্লেখযোগ্য হারে। স্থলপথে অবস্থিত সকল শহর ও পয়েন্টে ডাকবাহন ও দায়িত্বশীলদের জন্য পৃথক পৃথক বিশ্রামাগার থাকত, সেখানে বাহনের খাবার ও বিশ্রামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হতো। প্রয়োজনে বাহন পালটে নতুন করে নেওয়ার মতো অনেক ঘোড়া ও গাধা সবসময় সেখানে প্রস্তুত থাকত।[২৫০] ডাকব্যবস্থায় 'শাহারা' নামক একপ্রকার দ্রুতগামী ঘোড়া ও 'নাজিব' নামক একপ্রকার দ্রুতগামী উট ব্যবহৃত হতো, যা অন্যসব ঘোড়া ও উট থেকে তুলনামূলক ক্ষিপ্র ও কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতির হতো।[২৫১]

ডাকব্যবস্থার পথ ও সীমা সুদূরপ্রসারী ও সুবিস্তৃত হওয়ায় নির্জলা মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তর দিয়ে গমন করা ছিল খচ্চরের জন্য কঠিন ও দুঃসাধ্য, ফলে যথাসম্ভব মরুপ্রান্তর এড়িয়ে যেসব অঞ্চলে পানি ও বৃক্ষরাজির অস্তিত্ব পাওয়া যায় সেসব নিরাপদ ও শক্ত মাটি বিশিষ্ট প্রান্তরকে ডাকপথ হিসেবে বেছে নেওয়া হতো।[২৫২]

২। জলপথে ব্যবহৃত ডাকব্যবস্থা

সমুদ্রপথে ডাক-যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো উন্নত ও অত্যাধুনিক সব নৌযান। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, সামুদ্রিক অঞ্চলে দ্রুত ও হালকা নৌযান ব্যবহৃত হতো ডাক বাহন হিসেবে।[২৫৩] প্রথম হাজ্জাজ

---

[২৫০]. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৩৭৭; জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরাবি কাবলাল ইসলাম*, খ. ৯, পৃ. ৩২০।

[২৫১]. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৬।

[২৫২]. জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরাবি কাবলাল ইসলাম*, খ. ৯, পৃ. ৩২০-৩২১।

[২৫৩]. হাসান ইবনে আবদুল্লাহ, *আসারুল উওয়াল ফি তারতিবিদ দুওয়াল*, পৃ. ৮৯; মুহাম্মাদ যয়ফুল্লাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৮ থেকে উদ্ধৃত।

ইবনে ইউসুফ সমুদ্রে আলকাতরার আবরণে তৈরি শক্ত কাঠ ও লোহার পেরেক দ্বারা নির্মিত দ্রুতগামী নৌযান পরিচালনা করেন।[২৫৪]

৩। আকাশপথে ব্যবহৃত ডাকব্যবস্থা

আকাশপথে ডাকব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হতো ডাকপায়রা। ক্ষুদেবার্তা আদান-প্রদানের জন্য এটি ছিল একটি কার্যকর ব্যবস্থা। বার্তাটি ডাকপায়রার পিঠে, বা পালকের নিচে, অথবা পায়ে বেঁধে দেওয়া হতো। আর তা নিয়ে সে গন্তব্যের দিকে রওনা হতো। এ ধরনের পায়রাকে ডাকা হতো হাদি (الهدي) নামে।[২৫৫]

মুসলিমগণ শুধু স্থল ও জলপথে ডাকসেবা নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হননি, বরং অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও উন্নত ডাকব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নানামুখী পদক্ষেপ ও প্রকল্প হাতে নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ছিল ডাকপায়রা।

ডাকপথে ব্যবহৃত কবুতরের অনেক কদর ছিল এবং সে সময় তা চড়া দামে বিক্রি হতো। বিশেষত বসরা নগরীতে মানুষ তা কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ডাকপায়রার জন্য সে সময় স্বতন্ত্র মার্কেট ছিল। এমনকি একটি পায়রার দাম সাতশ দিনার পর্যন্ত উঠত সেখানে। সুলতান নুরুদ্দিন যিনকির শাসনামলে এবং উবাইদি-ফাতেমি বংশের রাজত্বকালে এ ধরনের পায়রার ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। সুদূর বসরা থেকে কায়রো পর্যন্ত এবং কায়রো থেকে দামেশক পর্যন্ত পায়রাযোগে পত্র আদান-প্রদানের রীতি চালু ছিল। পায়রার বিরতি গ্রহণ ও অবতরণের জন্য তখন স্বতন্ত্র উঁচু টাওয়ার নির্মিত হয়। টাওয়ার থেকে টাওয়ারে গমন করতে করতে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট গন্তব্যের টাওয়ারে এসে অবতরণ করত ডাকপায়রা। দামেশকের টাওয়ারগুলোতে মিশরের পায়রা রাখা হতো এবং মিশরের টাওয়ারগুলোতে দামেশকের পায়রা রাখা হতো। সাধারণত একবার পত্র প্রেরণের জন্য দুটি চিঠি ও দুটি পায়রা প্রস্তুত করা হতো। একটি ওড়ানোর প্রায় দু-ঘণ্টা পর দ্বিতীয়টি ওড়ানো হতো। প্রথমটি পথ হারিয়ে ফেললে বা দুর্ঘটনায় মারা গেলে দ্বিতীয় পায়রাটি যেন গন্তব্যে পৌঁছে।

---

২৫৪. জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত-তিবয়ান*, পৃ. ৩৬৪।

২৫৫. মুহাম্মাদ যয়ফুল্লাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়া*, পৃ. ১৯৮।

বৃষ্টির সময় বা বৈরী আবহাওয়ার কালে সাধারণত পত্র পাঠানো হতো না। পেটভরতি আহার না করিয়ে কখনো পায়রা ছাড়া হতো না।[২৫৬]

পায়রাযোগে পাঠানো পত্রগুলো হতো অতি সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতবহ ভাষায় লেখা। এ ধরনের বার্তা যুদ্ধের সময় বেশি পাঠানো হতো। ছোট্ট ও হালকা কাগজে সংক্ষিপ্ত করে লিখে বৃষ্টিবাদল বা ঝড় থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তা পায়রার পায়ে বা পালকের নিচে বেঁধে দেওয়া হতো। আর তাতে লেখা হতো খুবই চিকন ও হালকা অক্ষরে।[২৫৭]

এই ছিল আকাশপথে পরিচালিত মুসলিমদের ব্যবহৃত ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থা, যা স্থলীয় ডাকব্যবস্থা থেকে কোনো অংশে কম গুরুত্বের ছিল না।

৪। অগ্নিসংযোগ করে সতর্কবার্তা প্রদান

উল্লিখিত ডাকব্যবস্থা ছাড়াও মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত ছিল আগুন জ্বালিয়ে সতর্ক করার মতো ব্যবস্থাও। কালকাশান্দি বলেন, নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্ট ও স্থাপনা ছিল, যেখানে রাতেরবেলা অগ্নি প্রজ্বলন করা হতো এবং দিনেরবেলা ধোঁয়া উত্তোলন করা হতো। এর জন্য কোনো এলাকায় পাহাড়ের চূড়ায়, আবার কোনো এলাকায় উঁচু ভবনের ওপর জায়গা নির্ধারণ করা হতো। সরকারি কর্মকর্তা ও নিরাপত্তারক্ষীদের মাঝে এ ধরনের সংকেত আদান-প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। ইসলামি ভূখণ্ডের সর্বশেষ সীমান্ত এলভিরা ও রাহবা থেকে জাবাল দুর্গ পর্যন্ত এ সংকেতসীমা বিস্তৃত ছিল। ফলে ফুরাত নদীর তীরবর্তী এলাকায় (ইরাকে) কিছু ঘটলে রাতের মধ্যেই সে খবর মিশর পর্যন্ত চলে আসত। রাতে কিছু ঘটলে সকালের মধ্যেই সবাই তা জেনে যেতেন। বিচিত্র সাংকেতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আগুন প্রজ্বলন ও ধোঁয়া উত্তোলন করা হতো, যা দিয়ে শত্রুদের সর্বশেষ অবস্থা, তাদের গতিবিধি ও অপতৎপরতার খবর দেওয়া হতো, কখনো কখনো আক্রমণকারী শত্রুদের সংখ্যাও জানিয়ে দেওয়া হতো নানাভাবে আগুন জ্বালিয়ে।[২৫৮]

---

[২৫৬]. মুহাম্মাদ যয়ফুল্লাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৮-১৯৯; আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৪৬।

[২৫৭]. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৭-১০৮।

[২৫৮]. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪৪৫।

এসব বাতিঘরগুলো সমুদ্র উপকূলে নির্মিত হতো আর এতে দায়িত্বরত রক্ষীগণ সমুদ্রপথে শত্রুদের আগমন সম্পর্কে রাজধানীকে সতর্ক করার জন্য দিনরাত উপকূলীয় এলাকাগুলো পাহারা দিতেন। নিজেদের মধ্যে পরিচিত ভাষায় নানাভাবে আগুন জ্বালিয়ে সংকেত দিতেন। যখনই কোনো শত্রুপক্ষের আগমন টের পেতেন, রাতেরবেলা হলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে পার্শ্ববর্তী বাতিঘরে দায়িত্বরত রক্ষীদের সংকেত দিতেন। আর দিনেরবেলা হলে ধোঁয়া উৎক্ষেপণ করে সাবধান করতেন। এজন্যই বলা হতো, আলোকবার্তা সুদূর মরক্কোর টাঙ্গিয়ার থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত মাত্র এক রাতের ব্যবধানে পৌঁছে যেত। প্রতিরক্ষা দুর্গগুলোর মাঝে দ্রুততম উপায়ে সংবাদ আদান-প্রদানের লক্ষ্যে উপকূলীয় চৌকিগুলোর মসজিদের মিনার থেকে আলোক-সংকেত পাঠানো হতো। এই পদ্ধতি বিশেষভাবে চালু ছিল আফ্রিকার তিউনিসিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো সউসে শহরের মুনাস্তির[২৫৯] চৌকি।[২৬০]

কালকাশান্দি বাতিঘর সম্পর্কিত তার আলোচনার শেষে উল্লেখ করেন, সুবিশাল ইসলামি ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বশীলগণ যে প্রজ্ঞা ও কৌশল উদ্ভাবন করেছেন, তা পরিমাপ করার মতো নয়। সংবাদ সরবরাহের ক্ষেত্রে তারা উন্নত ও আধুনিক সব ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন। কারণ শুরুতে বাহনে করে পত্র আদান-প্রদান ছিল সবচেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা। এর চেয়েও দ্রুত ডাকসেবা হয় পায়রা। এর চেয়েও আরও দ্রুত যোগাযোগ সেবা হয়ে ওঠে আলোক-সংকেত ব্যবস্থা। আপনি জেনে অবাক হবেন, ইরাক থেকে মিশর পর্যন্ত যেকোনো সংবাদ এক রাতের ব্যবধানে পৌঁছে যেত। কত দ্রুত ও উন্নত ডাকব্যবস্থা হলে এরকমটি সম্ভব![২৬১]

উপর্যুক্ত বৃত্তান্তের আলোকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, ইসলামি সভ্যতা সামসময়িক যুগের সবচেয়ে উন্নত ও আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন করেছে। এভাবে রাষ্ট্র সবসময় একজন নেতা বা খলিফার অধীনে পরিচালিত ছিল। তিনিই সবকিছু

---

২৫৯. মুনাস্তির শহরটি সউসে শহর থেকে ৩০ কি.মি দক্ষিণে অবস্থিত।

২৬০. দেখুন, সাদ যাগলুল গং, *দিরাসাত ফি তারিখিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৮০-৪৮১; কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১০৮।

২৬১. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৪৪৭।

সম্পর্কে একের পর এক অবগত হতেন। আর এসব ব্যবস্থা ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীগুলো বহু যুগ ও বহু শতাব্দী পার হওয়ার পর আবিষ্কার করতে পেরেছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫. রাজকোষ বা অর্থ তহবিল

ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে স্বাধীন, নিরাপদ ও সুরক্ষিত অর্থব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সুসমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। কুরআনুল কারিমেও সেই উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত এসেছে,

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

(অর্থসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে) যেন ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে যায়।[২৬২]

এই আয়াতের লক্ষ্য পুরোপুরিরূপে বাস্তবায়নের স্বার্থে ইসলামি সভ্যতা অর্থ কেবল ধনীদের কাছে নয়, সর্বস্তরের মানুষের মাঝে এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছে। কারণ, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাছে অর্থ সীমাবদ্ধ থাকলে মুসলিম সমাজে গোলযোগ ও বিপর্যয় এবং সমাজের একটি শ্রেণির কাছে মানুষের জিম্মি হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

বাইতুল মাল বা ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ তহবিল বলতে রাষ্ট্রীয় অর্থ যে তহবিলে জমা হয় এবং যে বিভাগ থেকে রাষ্ট্রের সকল চাহিদা পূরণ করা হয় সেই তহবিলকে বোঝায়। আর সেই অর্থ-তহবিলে হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে সরাসরি খলিফার বা তার নিযুক্ত গভর্নরের। তিনি মুসলিম উম্মাহর কল্যাণার্থে যুদ্ধ-জিহাদ পরিচালনায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সেই অর্থ ব্যয় করবেন।[২৬৩]

---

২৬২. সুরা হাশর : ৭।

২৬৩. মুনির হাসান আবদুল কাদির, *মুআসসাসাতু বাইতিল মাল ফি সাদরিল ইসলাম*, পৃ. ৪৭।

এই তহবিলে যেসব খাত থেকে অর্থ আসত, তা হলো: যাকাত, ভূমিকর, রাজস্ব, জিযয়া, গনিমত ও আওকাফ। যার মধ্যে আওকাফ ছাড়া বাকি সবই হলো সম্পদ, জমিন ও মানুষের ওপর ধার্যকৃত কর বা ট্যাক্স।[২৬৪]

বাইতুল মালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, স্বাভাবিকভাবে যে অর্থসম্পদ সাধারণ মুসলিমদের অধিকার এবং যার স্বত্বাধিকারী এখনো নির্ধারিত হয়নি সেটাই বাইতুল মালের অর্থ বলে গণ্য হবে। যে অর্থ মুসলিমদের কল্যাণে খরচ হওয়ার কথা তা বাইতুল মালে যাবে।[২৬৫] এই পারিভাষিক অর্থের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বাইতুল মাল হলো ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। মুসলিমদের সকল চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের একমাত্র তহবিল হলো বাইতুল মাল। যা অনেকটা বর্তমান সময়ের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো।

বাইতুল মাল থেকে ব্যয়ের খাতগুলো ছিল যথাক্রমে :

১। গভর্নর, বিচারক, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, কর্মচারী, সরকারি কর্মীদের বেতন। স্বয়ং আমিরুল মুমিনিন বা খলিফাও এ খাত থেকে বেতন গ্রহণ করতেন।

২। সেনাবাহিনীর বেতন।

৩। সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতকরণের যাবতীয় ব্যয়। যুদ্ধাস্ত্র তৈরি। ঘোড়া, উট ইত্যাদি ক্রয়।

৪। জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ করতে এবং তাদের অধিকার সমুন্নত রাখতে সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ ও সড়ক নির্মাণ। সরকারি কার্যালয়ের ভবন, বিশ্রামাগার ও মসজিদ নির্মাণ।

৫। সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। যেমন হাসপাতাল, জেলখানা ইত্যাদি।

৬। অনাথ, দরিদ্র, বিধবা ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ। সরকার তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পূর্ববর্তী অন্য সব সভ্যতাকে ছাপিয়ে সূচনালগ্নেই ইসলামি সভ্যতা অর্থ ব্যয়ের সূক্ষ্ম ও নিখুঁত খাতগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের মাঝে সুষ্ঠুভাবে

---

[২৬৪]. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৩১।
[২৬৫]. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২৭৮।

সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে। উপর্যুক্ত আয়-ব্যয়ের পরও আরও অনেক জরুরি খাত থেকে যায়, যেমন রাষ্ট্রে যদি দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ বা মহামারি দেখা দেয়, তাহলে সরকার ধনীদের কাছ থেকে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত দান-সদকা গ্রহণ করে সাধারণ মুসলিমদের জন্য তা খরচ করবে। ঠিক যেমন আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর শাসনামলে মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থে উসমান ইবনে আফফান রা. বিপুল পরিমাণ অর্থ সদকা করেন। তেমনই উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-ও বিশাল অঙ্কের অর্থ অনুদান দেন। ইসলামি ইতিহাসে এরকম হাজারও স্বতঃস্ফূর্ত দানের উদাহরণ পাওয়া যায়, যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামি অর্থ তহবিল অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থবিভাগরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৬৬]

মুসলিমগণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই বাইতুল মালের গোড়াপত্তন করেন। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বিভিন্ন এলাকায় সরকারি প্রতিনিধি ও প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাদের প্রধান কাজ ছিল সদকা, জিযয়া, কর ও রাজস্ব এবং গনিমতের একপঞ্চমাংশ উসুল করা। আবার কখনো শুধু আর্থিক বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতেন, যাদের দায়িত্ব থাকত শুধু সদকা, ভূমিকর, ট্যাক্স, উশর ইত্যাদি উসুল করে বাইতুল মালে হস্তান্তর করা। মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েই ইয়ামেনে পাঠান। তা ছাড়া আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-কে যখন বাহরাইনে পাঠান, তাকেও সেখানকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে কর উসুলের দায়িত্ব প্রদান করেন।[২৬৭]

নবীযুগে মুসলিমদের কল্যাণে বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূচনালগ্ন থেকেই ইসলাম অর্থব্যবস্থাকে সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই যুগচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের মূলনীতি ঠিক রেখে অর্থব্যবস্থার অনেক আধুনিকায়ন হওয়ার ফলে পরবর্তী সময় তা আরও সুন্দর ও নিখুঁত আকার ধারণ করেছে।

---

২৬৬. আলি ইবনে নায়েফ শুহুদ, *আল-হাযারাতুল ইসলামিয়্যা বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া আমালিল মুসতাকবিল*, পৃ. ২৫৭।

২৬৭. আবু উবাইদ, *আল-আমওয়াল*, পৃ. ৪১।

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে বিজিত হয় শাম, ইরাক, মিশর, আলজেরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, আরমেনিয়া, আযারবাইজান ও ইস্পাহান। আর উসমান ইবনে আফফান রা-এর শাসনামলে বিজিত হয় ইরানের কিরমান, সিজিস্তান, নিশাপুর, পারস্য অঞ্চল, তাবারিস্তান, হেরাত, খোরাসানের অবশিষ্ট এলাকা এবং আফ্রিকা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। অসংখ্য বিজয় মুসলিমদের পদচুম্বন করে। স্বাভাবিকভাবেই তখন প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলিমদের অধিকারে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানীতে এসে জমা হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ।[২৬৮]

বিজিত অঞ্চল থেকে মদিনায় আসা এসব গনিমতের মাল, বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রুপা, দামি দামি পাথর ও মণিমুক্তা, মিলিয়ন মিলিয়ন দিরহাম ও দিনার, অজস্র দাস ও মূল্যবান গালিচা দেখে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কাঁদতেন। এ কারণেই দেরি না করে তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন দ্রুত একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থবিভাগ প্রতিষ্ঠা করে সুষ্ঠু ও সঠিক খাত খুঁজে বের করে এসব অর্থ কাজে লাগাতে। খলিফার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত ব্যয়ের খাতগুলো নির্ণীত হয়। অনুদান বিভাগের আলোচনায় আমরা ইতিমধ্যে সে সম্পর্কে জেনে এসেছি।[২৬৯]

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সবসময় বাইতুল মালে অর্থ জমা করে রাখার বিপক্ষে ছিলেন। প্রকৃত অধিকারী ও প্রয়োজনগ্রস্তদের মাঝে পর্যায়ক্রমে অর্থ বিতরণ করে দিতেন। ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, বছরে একবার বাইতুল মাল খালি করার নির্দেশ দিতেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.।[২৭০] অর্থাৎ প্রকৃত অধিকারীদের মাঝে সকল অর্থসম্পদ বিতরণ করে বছরে একবার বাইতুল মাল শূন্য করার জন্য বলতেন। কোনো সন্দেহ নেই, এরকম দানশীলতা ও মহানুভবতার পরিচয় ইসলামি সভ্যতার এক অনন্য অবদান। ইসলামি রাষ্ট্র সবসময় তার যাবতীয় অর্থ প্রজা ও জনগণের স্বার্থে ব্যয় করেছে। অভাবগ্রস্তদের সঙ্গে সকল অর্থ-রাজস্ব ভাগ করে নিয়েছে। আবার তা শতাব্দীতে একবার নয়, বরং

---

২৬৮. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫।

২৬৯. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৫১৯।

২৭০. ইবনুল জাওযি, *মানাকিবু আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনিল খাত্তাব*, পৃ. ৭৯।

কোনোপ্রকার কালক্ষেপণ ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই প্রতি বছর! এটাই ছিল ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক ও জনগণের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির অপরূপ উদাহরণ।

এ ব্যাপারে আলি ইবনে আবু তালিব রা. ছিলেন আরও একধাপ এগিয়ে। অর্থের প্রাচুর্যকে কেন্দ্র করে যেন শাসকশ্রেণি ও জনগণের মাঝে নৈরাজ্য সৃষ্টি না হয়, সেজন্য প্রতি শুক্রবার তিনি বাইতুল মালের সমুদয় অর্থ বণ্টন করে দিতেন। যেন কোনো অর্থই রাজকোষে জমা না থাকে।[২৭১] এরই ধারাবাহিকতায় একদিন তিনি বাইতুল মালে প্রবেশ করে দেখেন, তাতে প্রচুর স্বর্ণ-রুপা জমা হয়ে আছে। তা দেখে তিনি বললেন, হে হলুদ স্বর্ণ, তুমি যতই আকর্ষণীয় হও; হে শুভ্র রুপা, তুমি যতই লোভনীয় হও; তুমি তোমার সৌন্দর্য আমি ছাড়া অন্যদের সামনে প্রকাশ করো। তোমার মধ্যে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।[২৭২]

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রশাসন ও অর্থব্যবস্থাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে, সমস্যা এড়াতে এবং কর্তৃত্বমুক্ত রাখতে মুসলিম খলিফাগণ সবসময়, এ দুটোকে আলাদা রেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন কুফার শাসনকর্তা হিসেবে আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে পাঠান, তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বাইতুল মালের প্রধান দায়িত্বশীল ও উযির হিসেবে তার সঙ্গে প্রেরণ করেন।[২৭৩]

উমাইয়া শাসনামলে বাইতুল মালে জমা হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ। ইবনে আবদুল হাকাম (মৃ. ২৫৭ হি.) বর্ণনা করেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর শাসনামলে মিশরের গভর্নর মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ রা. যে পরিমাণ অর্থ পাঠান, সরকারি সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন, তাদের পরিবারের ভাতা, সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সহকারীদের সম্মানী, বিভিন্ন প্রদেশে কর্মরত সরকারি দায়িত্বশীল ও লিপিকার এবং হেজায অঞ্চলে খাদ্য রপ্তানির কাজে নিয়োজিতদের যথাযথ প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার পরও তা থেকে ছয় লাখ দিনার অবশিষ্ট থেকে যায়।[২৭৪] মুসলিমদের অধিকৃত একটিমাত্র অঞ্চল মিশর থেকেই এত বিপুল পরিমাণ

---

[২৭১]. আবুল আব্বাস আন-নাসিরি, *আল-ইসতিকসা*, খ. ১, পৃ. ১১২।

[২৭২]. ইবনুল ওয়ারদি, *তারিখু ইবনিল ওয়ারদি*, খ. ১, পৃ. ১৫৭।

[২৭৩]. ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৫৫।

[২৭৪]. ইবনে আবদুল হাকাম, *ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ১১৭।

অর্থ স্থানান্তর থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, অন্যান্য অঞ্চল থেকে কী পরিমাণ অর্থ এসে জমা হতো বাইতুল মালে। এত বিশাল পরিমাণ অর্থ আসার ঘটনা থেকে আমরা বাইতুল মালের গুরুত্ব এবং ইসলামি খিলাফতের বড়ত্ব অনুমান করতে পারি।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, উমাইয়া শাসনামলে ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে বাইতুল মালের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল দামেশকে। তবে প্রত্যেক প্রদেশে বাইতুল মালের শাখা ছিল। ওই শাখার কার্যালয় থেকে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও আঞ্চলিক সকল প্রয়োজন পূরণ করা হতো। এসব ব্যয় পরিপূর্ণরূপে শেষ হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকত, তা খিলাফতের রাজধানীতে বাইতুল মালের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থানান্তর করা হতো।

অপরদিকে প্রতিটি অঞ্চলের স্থানীয় মুসলিমদের অধিকার ছিল খিলাফতের রাজধানীতে স্থানান্তরিত হতে যাওয়া এসব অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার। স্থানীয় সকল মুসলিমের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে-কেউ যেকোনো সময় তদন্ত করার অধিকার রাখতেন। মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে মিশরে এমন ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার মিশরের বাইতুল মালের অবশিষ্ট অর্থ রাজধানী দামেশকের বাইতুল মালে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে মিশর থেকে রাজস্ববাহী উটের বহর যাত্রা শুরু করে। কিন্তু বারাহ ইবনে হাসকাল আল-মাহরি নামক মিশরীয় এক ব্যক্তি পথিমধ্যে বাধ সেধে বসে। উটের বহর দেখে বলতে থাকে, কী হলো, আমাদের দেশের অর্থ কী করে দেশের বাইরে যাচ্ছে? এ বহর ফিরিয়ে নাও। এরপর তা ফিরিয়ে মসজিদের কাছে আনা হলে লোকটি সমস্বরে মানুষের উদ্দেশে ঘোষণা করে, আপনারা কি আপনাদের নিজেদের ও কর্মচারীদের সব বেতন-ভাতা ও অধিকার এবং আপনাদের পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত যাবতীয় দান-অনুদান গ্রহণ করেছেন? সবাই বলল, হ্যাঁ..।[২৭৫] সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ সবাই নিজ নিজ প্রাপ্য ও অধিকার যথাযথরূপে বুঝে পেয়েছে নিশ্চিত হওয়ার পর বারাহ সেই উটের বহর দামেশকে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেন। কোনো সন্দেহ নেই, খিলাফতের অধীনে জনসাধারণ কী

---

২৭৫. ইবনে আবদুল হাকাম, *ফুতুহ মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ৩৪৫।

পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন, এই ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খলিফাতুল মুসলিমিন ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক (মৃ. ৯৬ হি.)-এর ব্যাপারেও এমন একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। অযথা খরচ করে মুসলিমদের সম্পদ নষ্ট করছেন এরকম একটি অভিযোগ তার ব্যাপারে ছড়িয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব মানুষকে মসজিদে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ দেন। সবাই মসজিদে সমবেত হলে মিম্বরে উঠে তিনি ঘোষণা দেন, আমি জানতে পেরেছি, আপনারা বলাবলি করছেন, ওয়ালিদ বাইতুল মালের সব অর্থ অযথা ব্যয় করে ফেলেছেন। এরপর তিনি একজনকে লক্ষ করে বলেন, হে আমর ইবনে মুহাজির, যাও! বাইতুল মালের সব অর্থ এখানে নিয়ে এসো। এরপর বাইতুল মালে জমা থাকা যাবতীয় অর্থসম্পদ তিনি অনেকগুলো খচ্চরে করে মসজিদে নিয়ে আসেন। এরপর আন-নাসর গম্বুজের নিচে অনেকগুলো চামড়ার মাদুর বিছিয়ে সেখানে সব স্বর্ণ-রুপা ঢেলে রাখেন। এভাবে সবগুলো ঢালা শেষ হলে তা বিরাট স্তূপে পরিণত হয়। যা ছিল তখনকার সময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ। এরপর পাল্লা এনে তা পরিমাপ করা হয়। গুনে দেখা হয়, এই অর্থ পরবর্তী তিন বছরের জন্য পুরো রাজ্যের মানুষের জীবিকার জন্য যথেষ্ট। অন্য বর্ণনামতে, মানুষের যদি আর কোনো উপার্জন নাও থাকে, তবুও তা পরবর্তী ষোলো বছরের যাবতীয় ব্যয়ের জন্য এই অর্থ যথেষ্ট হবে। এরপর খলিফা ওয়ালিদ মানুষের উদ্দেশে বলেন, আল্লাহর শপথ! এই মসজিদের নির্মাণকাজে আমি বাইতুল মাল থেকে এক দিরহামও গ্রহণ করিনি, যা ব্যয় হয়েছে সবই ছিল আমার নিজস্ব অর্থ। ওয়ালিদের এ কথা শুনে মানুষ যারপরনাই আনন্দিত হয়। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেয়। এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করে খলিফার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে বাড়ি ফেরে।[২৭৬]

বাইতুল মাল থেকে যেকোনো সময় যেকোনো মুসলিম ঋণ গ্রহণ করতে পারতেন। এ ব্যাপারে কে সরকারি কর্মকর্তা আর কে সাধারণ নাগরিক তা বিবেচনা করা হতো না। একবার উসমান ইবনে আফফান রা. বাইতুল মাল থেকে এক লাখ রৌপ্যমুদ্রা ধার নেন। সেজন্য ঋণগ্রহণ চুক্তিনামা

---

২৭৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ১৭০-১৭১।

লেখেন আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম। সাক্ষী হিসেবে ছিলেন আলি ইবনে আবু তালিব, তালহা, যুবাইর, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। এরপর উসমান রা. সময়মতো সে ঋণ বাইতুল মালে পরিশোধ করে দেন।[২৭৭]

উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর শাসনামলে বাইতুল মালের অবকাঠামোতে কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়। তখন বাইতুল মালের আয়ের খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে: যাকাত, জিযয়া, ভূমিকর, উশর ও গনিমতের এক পঞ্চমাংশ। এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিয জনগণের ওপর ভাতা-অনুদান বৃদ্ধি করে নতুনভাবে অর্থনৈতিক ব্যয়প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। লুণ্ঠিত ও অপহৃত ব্যক্তিদের জন্য তিনি বাইতুল মাল থেকে বরাদ্দ রাখেন। যার ফলে অল্পদিনের মধ্যে ইরাকের বাইতুল মাল শূন্য হয়ে যায়। যার কারণে তিনি শাম থেকে অর্থ গ্রহণ করেন।[২৭৮]

বাইতুল মালের যাবতীয় আয়ের উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করার মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উমর ইবনে আবদুল আযিযের শাসনামলে অভাবনীয়ভাবে সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে। যার ফলে এসব অর্থসম্পদ ব্যয়ের জন্য তিনি অভিনব সব পদ্ধতি ও খাত আবিষ্কার করেন, যার মাধ্যমে তিনি রাজ্যের অনেক বিপদ ও সংকট দূর করতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ইরাকের গভর্নর আবদুল হামিদ ইবনে আবদুর রহমানকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান, মানুষের সকল অধিকার ও বেতন-ভাতা বুঝিয়ে দাও। আবদুল হামিদ উত্তরে লেখেন, সব মানুষের বেতন-ভাতা ও যাবতীয় সম্মানী বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও বাইতুল মালে অনেক অর্থ রয়ে গেছে। এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিয বাইতুল মালে বেঁচে যাওয়া অর্থ থেকে সকল ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, নির্বুদ্ধিতা ও অপচয় না করে যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে, তাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও। এরপর আবদুল হামিদ পত্র লেখেন, তাদের ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও বাইতুল মালে অনেক অর্থ রয়ে

---

২৭৭. বালাজুরি, *আনসাবুল আশরাফ*, খ. ৬, পৃ. ১৭৩।
২৭৮. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা*, পৃ. ৩৩৬।

গেছে। এরপর যেসব যুবক-যুবতী অর্থের অভাবে বিয়ে করতে পারছে না, উমর ইবনে আবদুল আযিয বাইতুল মালের অর্থ থেকে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে চায়, বাইতুল মাল থেকে মোহরের ব্যবস্থা করে তাদের বিয়ে দিয়ে দাও। এরপর আবদুল হামিদ লেখেন, আমরা এরকম বিয়ে করতে আগ্রহী সকল যুবকের বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তারপরও বাইতুল মালে অনেক অর্থ রয়ে গেছে।

এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিয বাইতুল মালকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের ভূমিকায় এনে সেখান থেকে কৃষকদের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র ও বিপর্যস্ত কৃষকদের জন্য অগ্রীম ঋণ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ভূমিকর আদায় করার ফলে জমি আবাদ করে যেসব কৃষক অভাবে পড়ে গেছে, পুনরায় জমি আবাদের জন্য বাইতুল মাল থেকে তাদের ঋণ প্রদান করো। কারণ আমরা শুধু এক বছর বা দু-বছরের জন্য তাদের কাছ থেকে কর আশা করি না।[২৭৯]

তৎকালীন বাইতুল মাল ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের এক প্রতিরক্ষা দুর্গের মতো, বিপদ ও দুর্যোগের মুহূর্তে মুসলিম সরকার সে দুর্গে আশ্রয় নিত। হিজরি ১৮ সনে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের সময় খলিফা উমর রা. বাইতুল মাল থেকে জনসাধারণকে খাদ্য ও অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেন। এমনকি জনগণের মাঝে খাদ্য ও অর্থ বিতরণ করতে করতে একসময় রাজকোষ পুরোপুরি শূন্য হয়ে যায়।[২৮০]

স্পেনের উমাইয়া শাসনামলের সময় আবু জাফর মনসুর (মৃ. ১৫৮ হি.) খলিফাতুল মুসলিমিন হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার গৃহীত অর্থনীতি ছিল খুবই নিয়ন্ত্রিত ও যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার অজান্তে বাইতুল মাল থেকে একটি কানাকড়িও বের হতে পারত না। তার এই কঠোর ব্যয়নীতির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব পড়া শুরু করে। এমনকি তাকে কৃপণ বলেও অনেকে আখ্যায়িত করতে থাকে। মনসুরের পর তার পুত্র মাহদি খলিফা হলে পিতার ব্যয়নীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে আসেন। তার চিন্তাধারা ছিল, অর্থ জমা রেখে

---

২৭৯. ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, খ. ৪৫, পৃ. ২১৩।
২৮০. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ১০৩।

মুসলিম জনসাধারণকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে জনকল্যাণে তা ব্যয় করে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করাটাই অধিক মঙ্গলজনক। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে খলিফা হিসেবে শপথ নেওয়ার পরপরই তিনি পিতার আমলে বাইতুল মালে জমা করা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রুপা বের করে মানুষের মাঝে বিতরণ করে দেন। পরিবার ও একান্ত অনুগতদের জন্য সেখান থেকে কিছুই রাখেননি, বরং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে মাসিক পাঁচশ দিরহাম করে বেতন ধার্য করেন। অথচ পিতার নীতি ছিল যথাসম্ভব বাইতুল মালে অর্থ সঞ্চিত রেখে তহবিল সমৃদ্ধ করা। ধনীদের এই অর্থ থেকে প্রতি বছর তিনি দুই হাজার দিরহাম খরচ করতেন।[২৮১]

বিশিষ্ট খলিফাগণ ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করার ফলে তাদের আমলে বাইতুল মাল বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে প্রতি বছর সাত হাজার পাঁচশ কিনতার[২৮২] পরিমাণ অর্থ জমা হতো বাইতুল মালে।[২৮৩] অপর আব্বাসি খলিফা মুতাযিদ বিল্লাহর (মৃ. ২৭৯ হি.) ইনতেকালের সময় বাগদাদের অর্থ তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ জমা ছিল, ইবনে কাসিরের মতো আরও কিছু ইতিহাসবিদের বর্ণনা অনুযায়ী তার পরিমাণ ছিল সতেরো মিলিয়ন বা এক কোটি সত্তর লক্ষ দিনার।[২৮৪] ওই সময়ের হিসাবে এটি ছিল বিশাল অঙ্ক। কারণ তখন এক দিনার ছিল ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণের সমান।

যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিপদ-দুর্যোগের সময় পুরো রাষ্ট্র যখন চাপের মুখে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাহিদা যখন তীব্র, ঠিক তখনও আমরা দেখি বিশিষ্ট আমির ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ অক্ষম, দরিদ্র ও আলেমদের জন্য অর্থ প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। মূলত তখন বাইতুল মালের প্রধান ভূমিকা ছিল দুটি: যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা এবং যোগ্য দাবিদারদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা। বিখ্যাত মুসলিম শাসক নুরুদ্দিন মাহমুদ যিনকির রাজসহচরগণ যখন দেখলেন যে, তিনি প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করছেন এবং এই যুদ্ধ ও জিহাদের জন্য রাষ্ট্রকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে

---

২৮১. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১৬৩।
২৮২. অধিকাংশ আলেমের কাছে কিনতারের পরিমাণ হলো : ১৪৩.৮ কিলোগ্রাম।
২৮৩. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ১৮১।
২৮৪. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ১০৬।

হচ্ছে, তখন তারা তাকে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনার এই বিশাল রাজ্যে অনেক কার্যালয় ও বিভাগ আছে। এই রাজ্যে ফকিহ, দরিদ্র, সুফি, দরবেশ ও কারিদের জন্য অনেক অর্থ বরাদ্দ আছে। এই সময়ে যদি আপনি সেই অর্থ থেকে কিছু অংশ কেটে রাখেন, তাহলে ভালো হয়। সহচরদের এ প্রস্তাব শুনে তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার এসব যুদ্ধাভিযানের বিজয় ওই ফকিহ, সুফি দরবেশ ও কারিদের দোয়া ও ভালোবাসা ছাড়া আশাই করতে পারি না। এমনকি রাজদরবারে আপনাদের রিযিকের ব্যবস্থা হয় সেইসব অভাবী ও দুর্বল লোকদের কারণেই। আরামদায়ক রাজবিছানায় আমি ঘুমিয়ে থাকি, আর সেই দুর্বল লোকেরা আমার জন্য দোয়া-কান্নাকাটি করে থাকে। আর আল্লাহর কাছে তাদের এই কাকুতিমিনতি কখনো লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার নয়। আপনারা বলছেন, তাদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ আমি ওইসব লোকদের দিয়ে দেবো, যারা যতক্ষণ আমাকে দেখে ততক্ষণই আমার হয়ে যুদ্ধ করে, যাদের ধনুকের তির লক্ষ্য ভেদ করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। অবশ্যই সেই শ্রেণির জন্য বাইতুল মাল থেকে সবসময় অর্থ বরাদ্দ থাকবে। তাদের এই অধিকার আমি অন্য কাউকে দিতে পারি না।[২৮৫]

স্পেনের ইসলামি সভ্যতায় বাইতুল মাল ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। পাশ্চাত্যের সুসমৃদ্ধ এই অর্থ তহবিলের প্রাণকেন্দ্র হতো জামে মসজিদ। বাইতুল মালের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশেষ করে এই প্রক্রিয়া বিরাজমান ছিল স্পেনের উমাইয়া শাসনামলজুড়ে।[২৮৬]

মামলুকি রাজবংশের শাসনামলে বাইতুল মাল থেকে যেসব খাতে ব্যয় করা হতো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি খাত ছিল দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য নির্মাণ, যেগুলো আজ পর্যন্ত কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন সুলতান আয-যাহির বাইবার্স মসজিদ, মাদরাসা ও কালাউন হাসপাতাল, সুলতান আন-নাসির মসজিদ, কাইতাবায়ি দুর্গ, সুলতান কনসুওয়া ঘুরি মসজিদ ইত্যাদি।[২৮৭]

---

[২৮৫]. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ৪৬৩।

[২৮৬]. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, খ. ২, পৃ. ২৩০।

[২৮৭]. বায়ুমি ইসমাইল, *আন-নুযুমুল মালিয়্যা ফি মিসর ওয়াশ-শাম যামানা সালাতিনিল মামালিক*, পৃ. ২৬৪।

মামলুকি আমিরগণ বাইতুল মালে সবসময় বড় বড় ফকিহ ও বিদ্বানদের দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ দিতেন, যারা যোগ্যতা ও জ্ঞান উভয় দিক থেকেই ছিলেন সমৃদ্ধ। যেমন বিখ্যাত ফকিহ ইযযুদ্দিন ইবনে জামাআ। তিনি ৭৩১ হিজরি সনে আহমাদ ইবনে তুলুন মসজিদ সংলগ্ন বাইতুল মালের দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।[২৮৮]

মোটকথা, বাইতুল মাল বা ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ তহবিল ছিল একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান, যা রাষ্ট্রীয় সকল কাজে প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেছে। সকল চাহিদা ও প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই বাইতুল মাল অত্যন্ত নিখুঁত ও সুনিপুণভাবে এই সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে অসামান্য অবদান রেখেছে।

---

২৮৮. মাকরিযি, *আস-সুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১৪৬।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

পুলিশ প্রশাসন

পুলিশ প্রশাসন ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে গণ্য হয়। পুলিশ প্রশাসনের প্রধান দায়িত্ব হলো সকল পর্যায়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। বিশেষত ব্যক্তি ও সমাজজীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর এ কাজের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গ হবেন এমন সুশৃঙ্খল বাহিনী, যারা ব্যক্তি ও সমাজের যাবতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে আদালতের দেওয়া বিচারিক নির্দেশগুলো যথাযথভাবে কার্যকর করবেন। মানুষের জানমাল, ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করবেন।

মুসলিমগণ সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। যদিও এখনকার মতো এতটা পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত রূপে ছিল না। *সহিহুল বুখারি*তে বর্ণিত আছে, একজন বাদশার যেমন পুলিশ প্রধান থাকে, কাইস ইবনে সাদ রা.-ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ঠিক সেরকম ছিলেন।[২৮৯]

রাতেরবেলা নগরীর অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেওয়া এবং শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখার যে নিয়ম, তা প্রথম চালু করেন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তিনি রাতেরবেলা মদিনায় টহল দিতেন। জনগণকে পাহারা দিতেন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতেন।[২৯০]

বলা যায়, খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে বড় পরিসরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠিত হয়। এরপর উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফাদের যুগে তা আরও সমৃদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়। শুরুলগ্নে এ বাহিনীর কাজ ছিল কেবল দণ্ড ও বিচার বাস্তবায়ন। আদালতের পক্ষ থেকে যে বিচার ও

---

২৮৯. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৩৬।

২৯০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৫৬৭।

দণ্ডের নির্দেশ হতো, সেগুলোই তারা কার্যকর করতেন। এরপর ধীরে ধীরে তাদের কর্মতৎপরতা আরও সমৃদ্ধ হয়। ফলে এক সময় পুলিশদের কাঁধে আসে অপরাধ তদন্ত করার দায়িত্বও। প্রতিটি শহরে এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। তারা ছিল পুলিশ মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর পুলিশ মহাপরিচালকের অধীনে থাকত অনেক ডেপুটি, তারা ব্যবহার করত বিশেষ ধরনের পোশাক ও ছোট্ট বর্শা। পদ অনুযায়ী তাদের পোশাকে থাকত নানা প্রতীক। পোশাকের গায়ে সবার নাম ও পদবি লেখা থাকত। রাতেরবেলা দায়িত্ব পালনের সময় তারা ফানুস বা মশাল ব্যবহার করতেন। প্রশিক্ষিত কুকুরও সঙ্গে রাখতেন।[২৯১]

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. এই পুলিশ বাহিনীকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করেন। ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর পদ সৃষ্টি করেন। ইসলামি ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তিগত দেহরক্ষী গ্রহণ করেন।[২৯২] কারণ, তার আগে ইসলামি রাষ্ট্রের তিন তিনজন রাষ্ট্রনায়ক উমর রা., উসমান রা. ও আলি রা. দুর্বৃত্তদের হাতে শাহাদতবরণ করেন।

উমাইয়া শাসনামলে পুলিশ বিভাগই ছিল রাষ্ট্রীয় সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নকারী বিভাগ। কখনো কখনো পুলিশ প্রধান পদোন্নতি পেয়ে আমির বা গভর্নরের পদেও উন্নীত হতেন। যেমন ১১০ হিজরিতে বসরার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন পুলিশ প্রধান খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ।[২৯৩]

উমাইয়া শাসনামলে খলিফাগণ পুলিশ প্রধানের পদকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেন। আইন প্রয়োগে এই পদের তাৎপর্য ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে পুলিশ প্রধানের কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তা রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যিয়াদ ইবনে আবিহি বলেন, পুলিশ প্রধানকে হতে হবে সদা সতর্ক ও দাপটের অধিকারী। নিরলস। নিরাপত্তারক্ষীদের প্রধানকে হতে হবে সচ্চরিত্র ও বিশ্বস্ত, যাকে চাইলেও অপবাদ দেওয়া যায় না।[২৯৪]

---

[২৯১]. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩৭-১৩৮।
[২৯২]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ১৫৬।
[২৯৩]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ১৩৬।
[২৯৪]. ইয়াকুবি, *তারিখুল ইয়াকুবি*, খ. ২, পৃ. ২৩৫।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে ইরাক ও হেজাযের গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুফা নগরীর জন্য একজন যোগ্য পুলিশ প্রধান অনুসন্ধানে রাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী ও মান্যবর মহলের পরামর্শ কামনা করলে তারা জিজ্ঞেস করেন, কী ধরনের ব্যক্তি চান আপনি? উত্তরে হাজ্জাজ বলেন, আমি এমন একজন ব্যক্তি চাই, যে হবে চরম ধৈর্যশীল ও বিশ্বস্ত। যার বিরুদ্ধে বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস ভঙ্গের প্রমাণ নেই। কারও সামান্য অধিকারও হেলার চোখে দেখেন না। ক্ষমতা প্রয়োগ ও সত্য প্রতিষ্ঠায় কোনো ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির সুপারিশের তোয়াক্কা করেন না। এরপর সবাই পরামর্শ দিলেন আবদুর রহমান ইবনে উবাইদ তামিমিকে এ পদের জন্য নিয়োগ দিতে। এরপর হাজ্জাজ পুলিশ প্রধানের পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য তার কাছে লোক পাঠান। তাদের প্রস্তাব শুনে তিনি হাজ্জাজকে বলে দেন, আপনার পরিবার, সন্তান ও রাজদরবারের লোকদের বলুন, আমার দায়িত্ব বাস্তবায়নে তারা যেন কখনো অন্তরায় না হয়। হাজ্জাজ তার গোলামকে বললেন রাজদরবারে ঘোষণা করে দাও, আবদুর রহমানের কাছে তারা যদি কোনো সুপারিশ করে বা কিছু দাবি করে, তবে আবদুর রহমান সেই সুপারিশ ও দাবি বাস্তবায়ন থেকে মুক্ত থাকবে।[২৯৫] সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় তার যোগ্যতা ও সফলতা দেখে শাবি বলেন, এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, চল্লিশ রাত তিনি অতিবাহিত করেছেন, তার কাছে কারও বিচার আসেনি আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে তার অসামান্য সফলতা দেখে হাজ্জাজ কুফার পাশাপাশি বসরার পুলিশ প্রশাসনও তার কাছে হস্তান্তর করেন।[২৯৬]

এ কারণেই উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইবনে খালদুন লেখেন, বাগদাদের আব্বাসি শাসনামলে, আন্দালুসে উমাইয়া শাসনামলে এবং মিশর ও মরক্কোয় ফাতেমিদের রাজত্বকালে অপরাধ তদন্ত করা এবং দণ্ড প্রয়োগ করা, এগুলো ছিল ধর্মীয় অন্যান্য কর্তব্যের পাশাপাশি একটি শরয়ি গুরুদায়িত্ব। ধীরে ধীরে এ দায়িত্বগুলো সম্প্রসারিত হয়। ফলে

---

২৯৫. ইবনে কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার*, খ. ১, পৃ. ৭; ইবনে হামদুন, *আত-তাযকিরাতুল হামদুনিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৯১; আবু ইসহাক কায়রাওয়ানি, *যাহরুল আদাব ওয়া সামারুল আলবাব*, খ. ২, পৃ. ৩৮১।

২৯৬. ইবনে কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার*, খ. ১, পৃ. ১৬।

অপবাদ আরোপের মামলাও সেখানে স্থান পায়। আর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে সেখানে প্রাথমিক শাস্তির বিধান স্থির করা হতো। অপরাধ প্রমাণিত হলে তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হতো। কেসাস বা রক্তের বদলাও বাস্তবায়ন করা হতো। কোনো আসামী অপরাধ থেকে বিরত না হলে তাকে সাবধান করা বা সৎ পথে আনার চেষ্টাও করা হতো।[২৯৭]

আর এভাবেই খিলাফতে রাশেদার সময় থেকে নিয়ে উমাইয়া শাসনকালের সূচনালগ্ন পর্যন্ত পুলিশ প্রধানের ওপর রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশ কার্যকরের যে দায়িত্ব ছিল তা সমৃদ্ধ হতে হতে একপর্যায়ে অপরাধ তদন্ত করা এবং দণ্ড কার্যকর করা পর্যন্ত পৌঁছায়। এ কারণেই অপরাধীদের আবদ্ধ রাখতে এবং দুর্বৃত্ত ও বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে কারাগার নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয় ইসলামি রাষ্ট্র। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ তাবারির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, যিয়াদ ইবনে আবিহি অনেক বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করেন। বিশেষ করে কুখ্যাত ইবনুল আশআসের সহচরদের। তাদের মধ্যে বিশেষ করে কাবিসা ইবনে যুবাইআ আসদিকে আটক করেন।[২৯৮]

বাইতুল মালের অর্থায়নে এসব কারাগার নির্মিত হয়। সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের অনিষ্ট হতে জনগণকে নিরাপদ রাখতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শুধু তাই নয়, কারাবন্দিদের যাবতীয় খরচ ও দেখাশোনার সকল ব্যয়ভার বহন করে ইসলামি রাষ্ট্র। এমনকি আসামিদের জন্য দুধরনের পোশাক সরবরাহ করতে খলিফা হারুনুর রশিদকে প্রস্তাব করেন কাযি আবু ইউসুফ। গরমে আরামদায়ক সুতি কাপড়ের পোশাক এবং শীতে পশমের মোটা পোশাক।[২৯৯] কারণ দণ্ড কার্যকরের পাশাপাশি বন্দিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাও ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আব্বাসীয় খলিফাগণ পুলিশ প্রধান পদে সবসময় জ্ঞানী, ধার্মিক ও দণ্ড কার্যকরে কোনো ভয় ও হুমকি-ধমকি প্রশ্রয় না দেওয়া ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিতেন। *তাবসিরাতুল হুক্কাম* গ্রন্থে ইবনে ফারহুন লেখেন, বিখ্যাত পুলিশ প্রধান ইবরাহিম ইবনে হুসাইন ইবনে খালেদ একবার মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা

---

২৯৭. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২২।
২৯৮. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ২২৪-২২৫।
২৯৯. আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ১৬১।

এক আসামিকে রাজদরবারের পশ্চিম পাশের মধ্যবর্তী ফটকের সামনে দাঁড় করিয়ে চল্লিশটি চাবুক মারেন। শাস্তিস্বরূপ তার[৩০০] দাড়ি মুণ্ডন করেন। মুখে কালি মেখে দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এগারো বার তাকে প্রদক্ষিণ করান। প্রতিবার ঘোষণা করা হয়, এই হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার শাস্তি। এই পুলিশ প্রধান ছিলেন একজন ন্যায়বান, সৎ, জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তি। ছিলেন ফকিহ ও তাফসির বিষয়ক আলেম। ষষ্ঠ আব্বাসি খলিফা আল-আমিন মুহাম্মাদের আমলে তিনি পুলিশ মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম মালেক রহ.-এর উস্তাদ মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহর সামসময়িক ছিলেন তিনি। মুতাররিফ থেকে বর্ণিত একাধিক হাদিস *মুআত্তায়* বর্ণিত আছে।[৩০১]

আব্বাসীয় শাসনামলে অনেক সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। তেমনই একজন হলেন বিখ্যাত সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে তাহের ইবনে হুসাইন। যুদ্ধাভিযান পরিচালনা এবং তাতে অসামান্য বিজয় অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে খিলাফতের রাজধানী বাগদাদের পুলিশ মহাপরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করেন খলিফা মামুন।[৩০২]

অপরদিকে যেসব পুলিশ প্রধান সীমালঙ্ঘন করেছে, জনগণের সঙ্গে অবিচার করেছে, মাত্রাতিরিক্ত দণ্ড প্রয়োগ করেছে, প্রমাণ ছাড়া ধরপাকড় করেছে, তাদের পদচ্যুত করতে কালক্ষেপণ করেনি খিলাফত কার্যালয়। যেমন চারিত্রিক অবনতি ও অবিচারে জড়িত থাকার অভিযোগে বাগদাদের পুলিশ প্রধান মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুতকে পদচ্যুত করে সরকারি দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেন আব্বাসি খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ।[৩০৩]

ওই যুগে নানাবিধ দায়িত্ব ছিল পুলিশ প্রধানের। সকল ইসলামি প্রদেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা; সামাজিক বিধিনিষেধ রক্ষা করার জন্য তারা নানা কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। মিশরের গভর্নর মুযাহিম ইবনে খাকান (মৃ. ২৫৩ হি.) পুলিশ প্রধান আযজুর আত-তুর্কির উদ্দেশে

---

৩০০. দাড়ি মুণ্ডন একটি গর্হিত অপরাধ। দাড়ি মুণ্ডন করে শাস্তি প্রদান করা শরিয়ত সমর্থিত না। তবে ইবরাহিম ইবনে হুসাইন ইবনে খালেদ এর বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট না।-সম্পাদক

৩০১. ইবনে ফারহুন, *তাবসিরাতুল হুক্কাম*, খ. ৫, পৃ. ৩১৯।

৩০২. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ৪৫৫।

৩০৩. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ১৬৬।

কিছু নির্দেশ দেন। উক্ত নির্দেশে নারীদেরকে বেপর্দায় চলাফেরা এবং কবরস্থান যিয়ারত থেকে বারণ করতে বলা হয়। নারীসুলভ আচরণকারীদের মারধর করা এবং লাশের ওপর পড়ে বিলাপকারী নারীদের প্রহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তা ছাড়া পুলিশ প্রধান গানবাদ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং মদ্যপান নির্মূল করেন।[৩০৪]

এ ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন নগরীতে কর্মরত পুলিশ প্রধানদের মধ্যে কেউ দায়িত্ব পালনে অলসতা করলে খলিফাগণ প্রতিকারস্বরূপ দ্রুত ভুল সংশোধন করতে তাদের বাধ্য করতেন। কারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিজেই যদি আইন ভঙ্গ করে, তবে তার কুপ্রভাব জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আব্বাসি খলিফার অধীনে থাকা একজন পুলিশ প্রধানের সংকটকালে চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার বিবরণ দিতে গিয়ে *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা* গ্রন্থে ইবনুল কাইয়িম রহ. লেখেন, একবার খলিফা মুকতাফি বিল্লাহর আমলে একদল চোর বিপুল অঙ্কের অর্থ চুরি করে নিয়ে যায়। যে করেই হোক চোরদের গ্রেফতার করতে অথবা অর্থের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পুলিশ প্রধানকে দায়িত্ব দিলেন খলিফা। খলিফার নির্দেশ পালনে জড়িতদের ধরার জন্য তিনি একা তদন্তে বের হলেন। রাতদিন নগরীর অলিগলিতে একা বাহনে চড়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন শহরতলির একটি নির্জন গলির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সন্দেহজনক কিছু একটা দেখতে পেয়ে গলিতে ঢুকলেন। দেখলেন সেখানে একটি বাড়ির সামনে বড় বড় মাছের অনেক কাঁটা ও পিঠের হাড্ডি স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। তা দেখে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে যে পরিমাণ মাছের কাঁটা ও হাড় দেখা যায়, সেই পরিমাণ মাছের মূল্য কত হতে পারে? উত্তরে লোকটি বলল, প্রায় এক দিনার। তা শুনে তদন্তকারী পুলিশ প্রধান বললেন, মরুভূমির পাশে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরতলির দারিদ্র্যপীড়িত গলির বাসিন্দা এত বেশি পরিমাণ মাছ কেনার সামর্থ্য রাখে না। তা ছাড়া গলিটিও মরুভূমির সাথে লাগোয়া, তাই কারও কাছে মূল্যবান কিছু থাকলে, অথবা এমন বড় ধরনের খরচের মতো অর্থ থাকলে সে এখানে থাকতে পারে না, স্বাভাবিকভাবে এটি তার জন্য হুমকিস্বরূপ, বিষয়টি সন্দেহজনক মনে

৩০৪. নাসির আল-আনসারি, *তারিখু আনযিমাতিশ শুরতাতি ফি মিসর*, পৃ. ৪৬।

হচ্ছে। তদন্ত করা দরকার। লোকটি তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার চিন্তা অনেক গভীর। পুলিশ প্রধান বললেন, স্থানীয় কোনো নারীকে ডাকুন, তার সাথে আমি কথা বলব। তখন মাছের হাড় স্তূপ করে রাখা গলিটির একটি বাড়িতে নক করে পানি চাওয়া হলে সেখান থেকে একজন দুর্বল বৃদ্ধা নারী বেরিয়ে এলেন। সেই নারীর কাছ থেকে একের পর এক পানি চাচ্ছিলেন। তিনি সময় নিয়ে তা পান করছিলেন আর গলির লোকদের সম্পর্কে বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করছিলেন। বৃদ্ধা সরল মনে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাছের হাড়ের স্তূপ রাখা বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন, কে থাকে ওই বাড়িতে? বৃদ্ধা বলল, পাঁচজন শক্তিশালী যুবক। দেখতে তাদের ব্যবসায়ী মনে হয়। এক মাস হলো তারা এসেছে। দিনের বেলায় খুব বেশি তাদের দেখা যায় না। তাদের কেউ যদি কোনো সময় বের হয়, দ্রুত কাজ সেরে এসে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সারাদিন তারা ঘরে একসঙ্গে থাকে। খায়দায়-ঘুমায় আর দাবা-পাশা খেলে। অল্পবয়স্ক এক কিশোর তাদের সেবা করে। কারখ শহরে তাদের বাড়ি, রাতের বেলায় ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কিশোরকে রেখে তারা ওখানে চলে যায়। ভোর রাতে তারা ফিরে আসে, আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি বিধায় তা টের পাই না। এরপর বৃদ্ধা নিজেই বলতে লাগল, এগুলো তো চোরের স্বভাব। পুলিশ প্রধান বললেন, অবশ্যই। তৎক্ষণাৎ তিনি পুলিশ ফোর্স ডাকলেন। দশজন পুলিশ চলে এলো। তাদের তিনি পাশের ঘরগুলোর ছাদে অবস্থান নিতে বললেন। এরপর তিনি সন্দেহজনক বাড়ির দরজায় নক করলে ওই কিশোর এসে দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সদস্যরা সেখানে ঢুকে সবাইকে গ্রেফতার করলেন। কেউ আর পালানোর সুযোগ পেল না। পরে তদন্তে প্রমাণ হলো, এরাই সেই অর্থ চুরি করেছিল।[৩০৫] বাগদাদের পুলিশ প্রধানের কী পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা ও সৎসাহস ছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে খলিফার নির্দেশ পালনে তাদের কী পরিমাণ আন্তরিকতা ছিল এই ঘটনা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর এ কারণেই শক্তিশালী লোকদের নয়, বরং মুসলিম সরকার পুলিশ প্রধান পদে সবসময় বুদ্ধিমান, সচেতন ও দূরদর্শী লোকদের নিয়োগ

---

৩০৫. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা*, পৃ. ৬৫।

দিতেন। নিচের ঘটনা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এক পুলিশ প্রধানের কাছে একবার চুরির অপবাদে দুজন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলে পুলিশ প্রধান একমগ পানি আনতে বললেন। মগটি হাতে নিয়ে তিনি সজোরে ছুড়ে মারলেন, এতে মগটি ভেঙে গেল। এই দৃশ্য দেখে একজন ভয় পেয়ে গেল আর দ্বিতীয়জন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, যেন কিছুই হয়নি। যে ভয় পেয়েছে তাকে ডেকে পুলিশ প্রধান বললেন, তুমি চলে যাও। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, চুরির অর্থ কোথায় রেখেছ, বের করো! জিজ্ঞেস করা হলো, কী করে বুঝলেন এই লোকটিই চুরি করেছে? উত্তরে তিনি বললেন, চোরের মন সবসময় শক্ত হয়। খুব সহজে সে ভয় পায় না। আর নির্দোষ ও সরল লোকেরা ঘরে ইঁদুর নড়াচড়া করলেই ভয় পেয়ে যায়। যদি ইঁদুরের আওয়াজ শুনে ভয় পায়, তাহলে সে চুরি করবে কীভাবে?![৩০৬]

বেশিরভাগ অঞ্চলেই পুলিশ প্রধানের উপস্থিতি ছিল। অঞ্চলভেদে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হতো। আফ্রিকায় পুলিশ প্রধানকে বলা হতো হাকেম। মামলুক বংশের রাজত্বকালে বলা হতো ওয়ালি। আর মিশরে এই পদটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ। সেখানে পুলিশ প্রধান ছিলেন রাষ্ট্রীয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। গভর্নরের অনুপস্থিতিতে তিনিই নামাযের ইমামতি করতেন। দান-সদকা ও সরকারি অনুদান বিতরণসহ অনেক কাজ তিনিই সম্পাদন করতেন। মিশরে পুলিশ কার্যালয় ছিল জামে আল-আসকার নামক জামে মসজিদের পাশেই। এ পদের নাম ছিল الشرطة العليا (পুলিশ মহাপরিচালক)।[৩০৭] সেখানে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, পুলিশ প্রধান প্রতিনিধিদের থেকে নিত্যদিনের সংবাদপ্রবাহ জানতেন। রাষ্ট্রে কেউ নিহত হয়েছে কি না, বড় কোনো অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে কি না সে সম্পর্কে প্রতিনিধিগণ পুলিশ প্রধানকে অবহিত করতেন। এরপর সুন্দরভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে প্রতিদিন সকালে সুলতানের কাছে পৌছানো হতো আর তিনি অবগত হতেন।[৩০৮]

---

৩০৬. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা*, পৃ. ৬৭।

৩০৭. মাকরিযি, *আল-খুতাতুল মাকরিযিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৮৪০-৮৪১।

৩০৮. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৪, ৬১ পৃ.।

শুধু তাই নয়, পুলিশ প্রধানগণ সে আমলে কোমরের দিকে বিশেষ এক ধরনের লম্বা তরবারি বহন করতেন। বিশেষ এই তরবারির নাম ছিল তাবারযিন।[৩০৯]

অপরদিকে আন্দালুসিয়ার ইসলামি রাষ্ট্রে পুলিশ প্রধানের দুটি পৃথক বিভাগ ছিল। একটি বিভাগকে বলা হতো الشرطة الكبرى (উর্ধ্বতন পুলিশ বিভাগ)। সুলতানের নিকটস্থ বন্ধু, দরবারি, রাজবংশীয়, সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা ছিল এই বিভাগের দায়িত্ব। এই বিভাগের পক্ষ থেকে রাজদরবারের প্রধান ফটকে একটি আসন (চেকপোস্ট) থাকত। শুধু উযির বা হাজিবদেরকেই (দারোয়ান) রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেওয়া হতো। কোনো সন্দেহ নেই, এ ধরনের পৃথক বিভাগ গঠন প্রমাণ করে যে, ইসলামি সভ্যতা সবসময় শরিয়তের সংবিধান এবং সামাজিক রীতিনীতি ও ন্যায়বিচারকে যথাযথ মর্যাদা দান করতে সক্ষম হয়েছে। এতে কে গরিব, কে ধনী, কে রাজা, কে প্রজা তা পৃথক করে দেখেনি। আর দ্বিতীয় বিভাগকে বলা হতো الشرطة الصغرى (অধস্তন পুলিশ বিভাগ)। এই বিভাগটি ছিল জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের মাঝে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করার দায়িত্বে। আন্দালুসে পুলিশ প্রধানের উপাধি ছিল সাহিবুল মাদিনা।[৩১০]

ইসলামি সভ্যতা একটি আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ গঠনমূলক সভ্যতা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পুলিশ প্রধানের পদ আগেও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে বিদ্যমান ছিল। সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সর্বত্র ও সবসময় এই পদের বিকল্প নেই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জটিলতা নিরসনের এই পদ যেকোনো ক্ষেত্রে ও মুহূর্তে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, কিন্তু ইসলামি সভ্যতায় পরিচিত এই পুলিশ প্রধানের পদ ছিল সমকালীন পারস্য ও রোম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিমগণ নিত্যনতুন পদ্ধতি ও কৌশল আবিষ্কার করে ও শরয়ি বিধিবিধান জুড়ে দিয়ে এই পদকে আধুনিক ও প্রগতিশীল করেছেন।

---

৩০৯. অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি*, খ. ২, ২৭৫ পৃ.।

৩১০. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২৫১; শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩১৩-৩১৪।
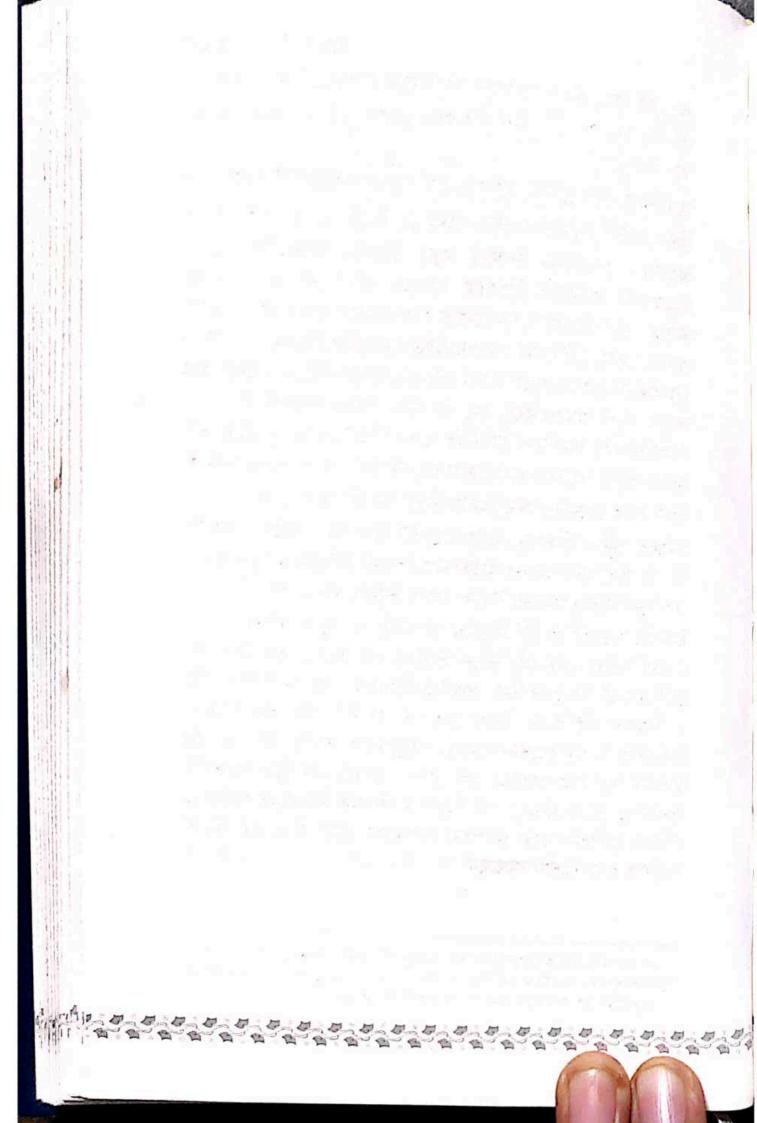
সপ্তম অনুচ্ছেদ

আল-হিসবাহ

খিলাফতের অধীনে দৈনন্দিন সমাজজীবনে মানুষের ব্যস্ততা ও জীবনোপকরণ বৃদ্ধির ফলে বিচারবিভাগের পাশাপাশি আরেকটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে ওঠে, যার নাম আল-হিসবাহ। ধর্মীয় এ বিভাগের মূল কার্যক্রম ছিল মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ও সচেতন করা। মুসলিম জনসাধারণের শাসনভার গ্রহণকারী ব্যক্তির ওপর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। আর এ কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করাও তার একটি বড় দায়িত্ব। অন্যদের ওপর যদিও এ দায়িত্বটি ফরযে কেফায়ার পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু গোটা জনসাধারণের শাসনভার গ্রহণের কারণে তার ওপর এ দায়িত্বটি ফরযে আইন হিসেবে বর্তায়।[৩১১] কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎ কর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[৩১২]

এই বিভাগের কার্যক্রম ও কর্মসূচি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমদের জন্য এ বিভাগে অনেক কল্যাণকর বাস্তবিক কার্যধারার সূচনা হয়। সামাজিক আরও অনেক বিষয় এ বিভাগের দায়িত্বে যুক্ত হয়। যেমন সড়ক ও জনপথ পরিচ্ছন্ন রাখা, কোনো নিরীহ পশুর ওপর সাধ্যাতীত

---

৩১১. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২৫।

৩১২. সুরা আলে-ইমরান : ১০৪।

কোনো বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে তার প্রতি রহম করা, পাত্র ঢেকে রাখার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, শিক্ষাপ্রদান করতে গিয়ে শিক্ষকগণ যেন কোমলমতি শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত প্রহার না করেন তা নিশ্চিত করা, কেউ মদের দোকান খুলেছে কি না, মদ পান করেছে কি না, নারীরা বেপর্দায় বের হচ্ছে কি না সে বিষয়ে নজরদারি করা। মোটকথা, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা, চারিত্রিক স্খলন প্রতিরোধ করা এবং সামাজিক উন্নতি-অগ্রগতি বজায় রাখাই ছিল এ বিভাগের প্রধান কাজ। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে নজরদারি করাও ছিল এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। কারণ ইসলামি রাষ্ট্র সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি শহরের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে মুসলিম সাম্রাজ্যে নানা পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী শ্রেণির আনাগোনা। এই বিভাগের মৌলিক দায়িত্ব ছিল কর্ম, শিল্পব্যবসা ও লেনদেনে প্রতারণা প্রতিরোধ করা। বিশেষত ওজন ও মাপদণ্ডের পরিমাপ ও বিশুদ্ধতা যাচাই করা।[৩১৩]

ইসলামি সভ্যতার প্রাক ও সমকালীন কোনো যুগে অন্য কোনো সমাজে এ ধরনের কোনো উদ্যোগের ইতিহাস পাওয়া যায় না। অথচ এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা জনগণের চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনে নজরদারি করে। একটি বিষয় সবাই জানেন যে, ইসলামি সভ্যতা মূলত দুটি মৌলিক ইস্যুকে সামনে রেখে কাজ করে থাকে। একটি হচ্ছে বাহ্যিক, অপরটি হচ্ছে আত্মিক। এর মধ্যে আত্মিক উন্নতি ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যেই আল-হিসবাহ বিভাগ ইসলামের চিরন্তন সত্য ও সুন্দর চরিত্রকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিয়েছে।

ইসলামি সভ্যতায় প্রথম এ কাজের সূচনা করেন স্বয়ং বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বাজারে একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় খাবারের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দেখেন ভেতরে ভেজা। তা দেখে তিনি বললেন, হে খাদ্যওয়ালা, ভেতরে এগুলো কী? উত্তরে সে বলল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে হে আল্লাহর

---

৩১৩. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ২১১ ও এর পরের পৃষ্ঠাগুলো; ইবনে খালদুন, *আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২৫; আবদুন মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ৫৭।

রাসুল। তারপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেন তুমি ভেজা খাদ্যগুলো ওপরের দিকে রাখোনি, তাহলে তো মানুষ খাদ্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারত। মনে রেখো, যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩১৪]

প্রথম যখন একটি স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্র গঠিত হয়, তখনই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম মক্কা বিজয়ের পর ইতিহাসে প্রথম মুহতাসিব (হিসবার দায়িত্বশীল) হিসেবে মক্কা নগরীর বাজারে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন।[৩১৫] তার নাম সাইদ ইবনে সাইদ ইবনুল আস রা.। ইসলামের সূচনালগ্নেই এরকম কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত হয়।

মজার বিষয় হলো, নবীযুগে অনেক নারী সাহাবিও এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইবনে আবদুল বার লেখেন যে, সামরা বিনতে নাহিক আল-আসাদিয়া রা. নামক একজন নারী সাহাবি, তিনি মহানবীর সাক্ষাৎ পান এবং দীর্ঘায়ু লাভ করেন। তিনি বাজারে যেতেন এবং মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করতেন ও অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করতেন। তার সঙ্গে একটি চাবুক থাকত, কেউ অসৎ কিছু করছে দেখতে পেলেই তাকে চাবুক দিয়ে পেটাতেন।[৩১৬] এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাকে বাজারের মুহতাসিবাহ হিসেবে বহাল রাখেন। ইবনুল জাওযির বক্তব্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, উমর রা. যখনই বাজারে যেতেন, ওই নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।[৩১৭] অর্থাৎ মহিলার বাড়িতে নয়, বরং বাজারে তিনি যেখানে বসতেন, সেখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাজারের খোঁজখবর নিতেন। এখানে মহিলার কাছে গেছেন শুনে পাঠকদের সন্দেহ করার কিছু নেই।[৩১৮]

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নিজেও মুহতাসিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ

---

৩১৪. *মুসলিম*, হাদিস নং ১০২; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৪৫২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩১৫; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২২২৪; *আহমাদ*, হাদিস নং ৭২৯০।

৩১৫. ইবনে আবদুল বার, *আল-ইসতিআব*, খ. ১, পৃ. ১৮৫।

৩১৬. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬৩।

৩১৭. ইবনুল জাওযি, *সিরাতু উমর ইবনুল খাত্তাব*, পৃ. ৪১।

৩১৮. যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি*, খ. ২, পৃ. ৫৯২।

থেকে নিষেধ করতেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে মানুষকে উৎসাহ দিতেন। ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বারণ করতেন ও সাবধান করতেন। বাজারে গেলে একটি চাবুক বা লাঠি সাথে করে নিয়ে যেতেন। প্রতারণা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িতদের ওই লাঠি বা চাবুক দিয়ে শাসন করতেন।[৩১৯]

এরকম নজরদারি ও হিসবার কর্মসূচি খুলাফায়ে রাশেদিন এবং উমাইয়া শাসনামলে বিদ্যমান ছিল, তবে মুহতাসিব নামে নয়। এই নামটি প্রসিদ্ধি পায় আব্বাসীয় শাসনামলে। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর শাসনামলে বসরার বাজারে প্রথম মুহতাসিব নিয়োগ করেন সেনাপ্রধান যিয়াদ ইবনে আবিহি।[৩২০]

আব্বাসীয় যুগ থেকেই মুহতাসিবের পদ ও দায়িত্ব নতুনভাবে পরিচিতি পায়। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মনসুরের শাসনকাল থেকেই এ পদটি মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই সমাজের পুনর্বিন্যাস ও মুহতাসিবদের জন্য সুষ্ঠুরূপে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আবু জাফর মনসুর বাগদাদ ও আল-মাদিনাতুশ শারকিয়্যার বাজারগুলো কেন্দ্রীয় শহর ও সরকারি কার্যালয় থেকে দূরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে স্থানান্তর করে দেন। এরই ফলে বাবুল কারখ এবং বাবুশ শাইর শহরদুটিতে বাজার স্থানান্তরিত হয়। সেখানে নিযুক্ত হয় পৃথক পৃথক মুহতাসিব। বাজারে সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং মার্কেটের ত্রুটিপূর্ণ বিষয়গুলো সংস্কারের দায়িত্ব ছিল এসব মুহতাসিবের ওপর।[৩২১]

শুরুতে বাজারের পরিমাপ ও ওজন নির্ণয় করা, পণ্য মজুদ করা থেকে মানুষকে বারণ করা, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা, এগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল মুহতাসিবের দায়িত্ব। কিন্তু আব্বাসীয় যুগে মুহতাসিবের দায়িত্ব আরও সম্প্রসারিত হয়। ফলে মার্কেট ও মসজিদ পরিচ্ছন্নতার ওপর নজরদারি করা, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সময়মতো দায়িত্ব পালন করছেন কি না তা তদন্ত করা, এমনকি মুয়াজ্জিনগণ সময়মতো আযান দিচ্ছেন কি না তাও যাচাই

---

[৩১৯]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৫৭৮।
[৩২০]. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৩১৫।
[৩২১]. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৪৮০।

করার দায়িত্ব ছিল মুহতাসিবদের ওপর। শুধু তাই নয়, কাযি ও বিচারকগণ সময়মতো এজলাসে বসছেন কি না তাও খতিয়ে দেখার দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল মুহতাসিবের। শুনে অবাক হতে হয়, এমনকি নানা পেশার মানুষ যথাযথ যোগ্যতা নিয়ে কাজে বসছেন কি না, তাও তদন্ত করার অধিকার ছিল মুহতাসিবদের। যেন সাধারণ মানুষ তাদের কাছে এসে প্রতারিত না হয়। একবার আব্বাসি খলিফা মুতাযিদ (মৃ. ২৭৯ হি.) প্রধান ডাক্তার সিনান ইবনে সাবিতকে নির্দেশ দেন বাগদাদের সকল ডাক্তারের পরীক্ষা নিতে। সর্বমোট ডাক্তারদের সংখ্যা ছিল ৮৬০ জন। অপরদিকে মুহতাসিবকে নির্দেশ দেন পরীক্ষায় টিকতে না পারলে কোনো ডাক্তারকে যেন চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া না হয়।[৩২২]

অনেক মুহতাসিব দণ্ড কার্যকর করতেন। আইন অমান্যকারী সরকারি আমলা ও সুলতানদের ওপর সাধারণ মানুষদের মতো শাস্তি প্রয়োগ করতেন। *সিয়ারুল মুলুক* গ্রন্থে নিজামুল মুলক লেখেন, একবার সেলজুক সুলতান মাহমুদ ইবনে মালিকশাহ রাজ সঙ্গীসাথি ও সরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে রাতভর মদ্যপানে লিপ্ত ছিলেন। ওই রাতে সেখানে দুজন সেনাপতি ও সুলতানের একান্ত কাছের ব্যক্তি আলি ইবনে নৌশতিকিন এবং মুহাম্মাদ আল-আরাবিও উপস্থিত ছিলেন। তারাও সুলতান মাহমুদের সঙ্গে সারা রাত মদ্যপানে লিপ্ত ছিলেন। ভোর হওয়ার সাথে সাথে আলি ইবনে নৌশতিকিনের মাথায় নেশা চড়ে যায়। রাতভর নির্ঘুম থাকা ও অতিরিক্ত মদ্যপানের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার চেহারায়। এই অবস্থায় তিনি সুলতানের কাছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সুলতান মাহমুদ তাকে বলেন, দিনের আলোতে মানুষের সামনে দিয়ে এরকম মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরা তোমার ঠিক হবে না। এখানে থাকো। আসর পর্যন্ত কোনো কামরায় বিশ্রাম নাও। নেশা চলে গেলে বাড়ি যেয়ো। এখন গেলে আমার আশঙ্কা, বাজারে দায়িত্ব পালনরত মুহতাসিব তোমাকে দেখে ফেলবে। আর এই অবস্থায় তুমি মুহতাসিবের সামনে পড়লে নিশ্চিত তোমাকে গ্রেফতার করে তোমার ওপর মদ্যপানের দণ্ড প্রয়োগ করবেন। তোমার মানসম্মান সব ধুলায় মিশে যাবে। আমিও টেনশনে পড়ে যাব, মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারব না। কিন্তু আলি ইবনে নৌশতিকিনের

৩২২. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবায়ি ফি তাবাকাতিল আতিব্বায়ি*, খ. ১, পৃ. ১১২।

হাতের ইশারায় পরিচালিত হতো পঞ্চাশ হাজার বলিষ্ঠ বীর সেনা। তিনি একাই এক হাজার মানুষের সমান বলে লোকমুখে প্রসিদ্ধি ছিল। তার কল্পনায়ও আসেনি যে, একজন মুহতাসিব তাকে গ্রেফতার করে তার ওপর মদ্যপানের শাস্তি প্রয়োগের দুঃসাহস দেখাবেন। তাই নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন ও সুলতানের পরামর্শ না শুনে তিনি মাতাল অবস্থায়ই বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। সুলতান রক্ষীদের বললেন, তাহলে নিজের মতেই চলবে, ঠিক আছে, তাকে যেতে দাও। এরপর আলি ইবনে নৌশতিকিন তার সেনা, কর্মচারী ও সেবকদের নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। আল্লাহর কী ইচ্ছা, ঠিক সে সময় মুহতাসিব অশ্বারোহী ও পদাতিকদের সমন্বয়ে একশ সঙ্গী নিয়ে বাজারে টহল দিচ্ছিলেন। সেনাপতি আলিকে মাতাল অবস্থায় দেখে তাকে ঘোড়া থেকে নামানোর নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমতো সেনাপতি নিজেই ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। এরপর তার সঙ্গী একজনকে বললেন আলির মাথায় চেপে বসতে। আরেকজনকে বললেন তার পা চেপে ধরে বসে যেতে। এরপর বাজারের মাঝখানে কোনোরকম দয়াপ্রদর্শন ছাড়া তার গায়ে শক্তভাবে চল্লিশটি চাবুক মারেন। চাবুকের আঘাতে তার দাঁত গিয়ে মাটির সঙ্গে লেগে যায়। অপরদিকে সেনাপতির ওপর দণ্ড প্রয়োগের দৃশ্য দেখছিলেন তার সহযোদ্ধা ও সঙ্গীসাথিরা। প্রতিবাদ করবে তো দূরের কথা, মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ উচ্চারণ করার সাহস পর্যন্ত পায়নি কেউ।[৩২৩]

এটিই সেই ইসলামি সভ্যতা যার দৃষ্টিতে, হাতের ইশারায় পঞ্চাশ হাজার সেনাকে পরিচালনায় সক্ষম সেনাপতির মাঝে ও মাত্র একশ জনবলের অধিকারী মুহতাসিবের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উপরন্তু মুহতাসিব সেনাপতির ওপর শুধু শাস্তিই প্রয়োগ করেননি, বরং প্রয়োগ করেছিলেন তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে। কিন্তু নীরবতা ভঙ্গ করে সামান্য টুঁ শব্দটুকুও করার কারও সাধ্য ছিল না। কারণ সত্য তো সচেতন মুহতাসিবের পক্ষেই ছিল, যিনি সেনাপতির ওপর শাস্তি প্রয়োগ করে শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছেন।

এ কারণেই খলিফা, আমির ও সুলতানগণ সবসময় মুহতাসিব পদের জন্য যোগ্য, জ্ঞানী ও সাহসী মানুষদের নিয়োগ দিতেন। *নিহায়াতুর রুতবা*

---

৩২৩. নিজামুল মুলক, *সিয়াসাতনামা*, পৃ. ৮০-৮১।

গ্রন্থে ইবনুল ইখওয়া বলেন, দামেশকের সুলতান আতাবেক তুগতেকিন একবার মুহতাসিব খোঁজ করলে তাকে একজন বিজ্ঞ ও সাহসী মানুষের সন্ধান দেওয়া হলো। তিনি তাকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত করতে বললেন। তিনি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলে সুলতান তাকে বললেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য মুহতাসিব হিসেবে আমি আপনাকে নিয়োগ দিচ্ছি। তা শুনে তিনি বললেন, তাই যদি হয় তবে আপনার এই তোষক থেকে উঠে দাঁড়ান এবং ওই দামি গদি অপসারণ করুন। কারণ উভয়টি রেশমের তৈরি। আপনার হাতের ওই আংটি খুলে ফেলুন। কারণ তা স্বর্ণের। স্বর্ণ ও রেশমের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْحَرِيْرُ وَالذَّهَبُ حَرامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»

> রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। তবে নারীদের জন্য হালাল।[৩২৪]

এ কথা শোনামাত্রই সুলতান তোষক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। গদি সরিয়ে নিতে বললেন। হাত থেকে আংটি খুলে ফেললেন। বললেন, এ দায়িত্বের পাশাপাশি এখন থেকে পুলিশদের ওপর নজরদারি করার দায়িত্বও আপনাকে দেওয়া হলো। সে সময়ে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী মুহতাসিব।[৩২৫]

এ কারণেই মুহতাসিবের পদটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় গোলযোগ, বিপর্যয় ও মূল্যস্ফীতির সময়। ৩০৭ হিজরি সনে একবার বাগদাদে জিনিসপত্রের দাম লাগামহীনভাবে বেড়ে যায়। জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়ে। মিম্বরগুলো ভেঙে ফেলে। মসজিদে গিয়ে নামায পড়া বর্জন করে। ব্রিজ ও কালভার্টগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে।[৩২৬] তৎকালীন মুহতাসিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ইবরাহিম ইবনে বাতহা তখন বিদ্রোহ দমনে জরুরি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। এক কোর (২,৩৫৪.৮৩ কেজি প্রায়) পরিমাণ আটার দাম

---

৩২৪. তাহাবি, *মুশকিলুল আছার*, হাদিস নং ৪২০৯।

৩২৫. ইবনুল ইখওয়া, *নিহায়াতুর রুতবাতি ফি তলাবিল হিসবাতি*, পৃ. ৭৮।

৩২৬. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক আল-হামাযানি, *তাকমিলাতু তারিখিত তাবারি*, পৃ. ২১।

বেঁধে দেন পঞ্চাশ দিনার। যার ফলে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা অনেকটাই কমে যায়।[৩২৭]

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই পদের জন্য যাদের নিয়োগ দেওয়া হতো, তাদের জন্য এটি অপমানজনক বা বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ছিল না। কারণটি সবাই জানেন, ইসলামি সভ্যতা সবসময় অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং সাধ্যমতো অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো মহান আদর্শের ওপরই সকল মুসলিমকে গড়ে তুলেছে। এর চেয়েও আরও মহত্ত্বের দিক হচ্ছে, আমাদের এই চিরন্তন সভ্যতা প্রতিটি মুসলিমকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মুহতাসিবের দায়িত্ব প্রদান করেছে। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে ইমাম ইবনে কাসির রহ. লেখেন, একবার আবুল হুসাইন নুরি নামক এক ব্যক্তি একটি নৌযানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তাতে মদ বোঝাই করা অনেকগুলো বড় মাটির পাত্র। নাবিককে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? এগুলো কার? উত্তরে নাবিক বলল, এগুলো বাদশা মুতাযিদের জন্য আমদানি করা মদ। এ কথা শোনামাত্রই ওই ব্যক্তি নৌযানে উঠে একটি ছাড়া বাকি সব পাত্র নিজ হাতে থাকা লাঠির আঘাতে ভেঙে দিলেন। শেষের পাত্রটি ভাঙার জন্য নাবিকের সহযোগিতা চাইলেন। ততক্ষণে সেখানে পুলিশ এসে হাজির। তাকে গ্রেফতার করে বাদশা মুতাযিদের সামনে উপস্থিত করা হলো। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি মুহতাসিব। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে মুহতাসিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন? তিনি বললেন, যে আপনাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছেন! এ কথা শুনে বাদশা মুতাযিদ মাথা নিচু করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ তুমি কেন করেছ? তিনি বললেন, আপনার ওপর এহসান করার জন্য। আপনার থেকে অনিষ্ট দূর করার জন্য। তা শুনে বাদশা আবারও মাথা নিচু করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে একটি পাত্র বাকি রেখেছ কেন? উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমে আমি সব পাত্র ভেঙেছি একমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশকে সম্মান দেখিয়ে। কাউকে পরোয়া করিনি। কিন্তু শেষ পাত্রটি যখন ভাঙতে যাব তখন আমার মনে একপ্রকার

---

৩২৭. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক আল-হামাযানি, *তাকমিলাতু তারিখিত তাবারি*, পৃ. ২১।

গর্ববোধ চলে আসে যে, বাদশার নিজস্ব কোনো বস্তু ভেঙে আমি মস্ত বড় বাহাদুরি করে ফেলেছি। যার ফলে আমি তা ভাঙিনি। লোকটির এ উত্তর শুনে মুতাযিদ বললেন, তাহলে যাও। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। যেসব অন্যায় ও অপরাধে বাধা দিতে চাও, বাধা দাও। তা শুনে তিনি বললেন, এখন আর আমি কোনো অপরাধে বাধা দেবো না। বাদশা বললেন, কেন? বললেন, এর আগে আমি এ কাজ করতাম একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে। আর এখন আমি বাধা দেবো মুক্তির শর্ত পূরণের জন্য। বাদশা বললেন, তোমার কোনো প্রয়োজন থাকলে বলতে পারো। তিনি বললেন, শুধু নিরাপদে আমাকে এখান থেকে যেতে দিন, ব্যস, এটুকুই। এরপর তাকে নিরাপদে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে বললে তিনি সেখান থেকে বের হয়ে বসরায় চলে আসেন। কেউ তাকে ব্যবহার করে মুতাযিদের কাছে কিছু প্রার্থনা করতে পারে এই আশঙ্কায় বসরায় তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর বাদশা মুতাযিদের ইনতেকাল হয়ে গেলে আবার তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন।[৩২৮]

মুহতাসিব অবস্থা অনুপাতে নিজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী নম্রতা ও কঠোরতা অবলম্বন করার ক্ষমতা রাখতেন। অপাত্রে বিনয়ের ব্যবহার বা কড়াকড়ি আরোপ তার করণীয় ছিল না। এ কারণেই খলিফা মামুন একজন কঠোর মুহতাসিবকে দেখে বলেছিলেন, শুনে রাখুন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদেরকে আমার চেয়েও নিকৃষ্ট একজনের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং মুসা আ. ও হারুন আ.-কে বলেছিলেন,

﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ﴾

> এরপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় করবে।[৩২৯]

ইসলামি সমাজের প্রতি একজন মুহতাসিবের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ দিতে গিয়ে সমকালীন একজন গবেষক বলেন, আমাদের বর্তমান সময়ে বিভিন্ন শহরে যে পৌরসভা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা কসাই, রুটিওয়ালা, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর হয়তো নজরদারি

---

৩২৮. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৮৯।

৩২৯. সুরা তহা : ৪৪।

করে থাকে। চিকিৎসাবিভাগও কখনো নজরদারি করে থাকে। কিন্তু বাণিজ্যবাজার যাতে বস্ত্র, নির্মিত পণ্য ও উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করা হয় তার ওপর এসব পৌরসভার কোনো প্রভাব আছে বলে আমার মনে হয় না। অপরদিকে স্বাধীন পেশার মানুষ যারা আছেন, বিশেষ করে ডাক্তার, অ্যাডভোকেট, উকিল, ফার্মাসিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, প্রভাষক; তাদের কার্যক্রমের ওপর নজরদারি করার কোনো অধিকার পৌরসভার নেই বললেই চলে। এ কারণেই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ইসলামি সভ্যতায় একজন মুহতাসিবের ক্ষমতা ও আধিপত্য নিশ্চিতভাবে বর্তমান সময়ের একজন পৌর মেয়র বা গভর্নরের ক্ষমতার চেয়ে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল।[৩৩০]

মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণে সচেষ্ট ছিলেন মুহতাসিবগণ। এ ব্যাপারে অনেক রচনা ও পুস্তকও সংকলন করা হয়েছে। এর চেয়েও আকর্ষণীয় বিষয় হলো, কিছু সূক্ষ্ম বিষয়, যেগুলো সাধারণত কারও চোখে পড়ে না, কেউ গুরুত্ব দেয় না সেসব বিষয়কেও মুহতাসিবগণ গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিয়েছেন। যার মাধ্যমে আমাদের এই চিরন্তন সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষের দিকটি ফুটে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশিষ্ট লেখক জিয়াউদ্দিন ইবনুল ইখওয়া (মৃ. ৭২৯ হিজরি) একজন মুহতাসিব যেসব নিয়ম ও বিধান সমাজে প্রয়োগ করবেন সে বিষয়ে একটি সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতিপূর্বে এরকম দিক-নির্দেশনা অন্য কারও লেখায় পাওয়া যায়নি। খাদ্যসামগ্রী ও রুটি প্রস্তুতকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারি করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, মুহতাসিব নির্দেশ দেবেন তারা যেন চুলার ওপরে ছাদ খোলা রাখে। যাতে ধোঁয়া বের হওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। প্রতিবার রুটি তৈরির আগে রান্নাঘর ঝাড়ু দেবে এবং পরিষ্কার রাখবে। আটা বা ময়দা মাখার পাত্রটি প্রতিবার ধৌত করবে এবং সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখবে। সেজন্য খেজুরগাছের পাতা দিয়ে তৈরি একপ্রকার ছোট চাটাই ব্যবহার করবে, তার মাঝে প্রতিটি খামিরা মাখার পাত্রের জন্য স্থাপিত থাকবে দুটি শক্ত কাঠ। পায়ের সাহায্যে বা হাঁটু মাড়িয়ে বা কনুই দিয়ে কেউ যেন খামিরা তৈরি না করে। কারণ এতে খাদ্যদ্রব্যের অপমান হয়। এরকম

---

৩৩০. আজলানি, *আবকারিয়্যাতুল ইসলাম ফি উসুলিল হুকমি*, পৃ. ৩৪৩; তিনি বর্ণনা করেছেন কুসাই আল-হুসাইনের লেখা *মিন মাআলিমিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৯৪।

করলে বগলের নিচের বা শরীরের যেকোনো জায়গা থেকে সেখানে ঘাম পড়তে পারে। খামিরা তৈরির সময় যেন আস্তিন ছাড়া জামা ব্যবহার করে। যাতে আস্তিন ঝুলে গিয়ে খামিরা স্পর্শ না করে। আর খামিরা যেন আবৃত থাকে। কেউ হাঁচি দিলে বা কথা বললে নাক বা মুখের ময়লা বা থুথু গিয়ে যেন সেখানে না পড়ে। আর খামিরা তৈরির সময় অবশ্যই মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে নেবে, যেন মাথার ঘাম খামিরায় না পড়ে। দুই হাতের পশম মুণ্ডন করে রাখবে, সেখান থেকেও যেন খামিরাতে কিছু না পড়ে। দিনের বেলায় খামিরা তৈরি করলে পাশে অবশ্যই একজন লোক রাখতে হবে, যে মাছি তাড়ানোর যন্ত্র দিয়ে মাছি তাড়াবে।[৩৩১]

একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামি সভ্যতা সকল পেশার মানুষের ওপর নজরদারি অব্যাহত রেখে মুসলিমদের কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করেছে। যার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এই সভ্যতা জনকল্যাণ ও মানবাধিকার রক্ষা করেছে। জনগণের সুখ ও শান্তির জন্য সকল উপকরণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ইবনুল ইখওয়ার দেওয়া এসব জোরালো নির্দেশনা হালের অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের জনসেবাতেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। বরং আজকাল আমরা পরিচ্ছন্নতার ও শিষ্টাচারের সকল কায়দাকানুন গ্রহণ করেছি ইউরোপীয় কৃষ্টি ও পশ্চিমা সভ্যতা থেকে। অপরদিকে ভুলে গেছি যে, ইসলামি সভ্যতা একজন মুসলিমের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মুহতাসিবদের সমন্বয়ে নিরাপত্তামূলক নীতিমালা নির্ধারণের অনিবার্যতা বিষয়ে উজ্জীবিত করেছে। যারা কঠোরভাবে সেসব নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে। *মাআলিমুল কুরবাতি ফি তলাবিল হিসবাতি* গ্রন্থটি মুহতাসিবের দায়িত্ব ও সামাজিক নীতি-আদর্শ রক্ষার আলোচনাধর্মী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্বকোষ বলা চলে। এ গ্রন্থটি আমলে নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে সেখানে বর্ণিত সকল নিয়মকানুন অনুসরণ করা সময়ের দাবি। কারণ এগুলো বাস্তবায়ন করে বহু দেশের বহু যুগের বহু সমাজের সংস্কার সাধন সম্ভব।

মরক্কো এবং স্পেনেও খিলাফতের সূচনালগ্ন থেকে মুহতাসিবের পদ বিদ্যমান ছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সেখানকার মুহতাসিবগণ শিশু ও দাসীদের সাহায্যে ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ীদের খুঁজে বের করতেন। যেমন

---

৩৩১. ইবনুল ইখওয়া, *মাআলিমুল কুরবাতি ফি তলাবিল হিসবাতি*, পৃ. ১৫০।

একজন ব্যবসায়ীর কাছে একজন শিশু বা দাসীকে পাঠাতেন কিছু পণ্য কেনার জন্য। এরপর পরীক্ষা করতেন, সেই পণ্যের মাপ ও ওজন যথাযথ কি না। এভাবেই অন্য মানুষের সঙ্গে তার বিশ্বস্ততা ও লেনদেনের বিষয়টি অনুমান করে নিতেন। হেরফের হলে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করতেন। একাধিকবার প্রতারণার বিষয়টি প্রমাণিত হলে এবং বারবার প্রহার ও বাজারে লোকদের সামনে লজ্জিত করার পরও সংশোধন না হলে তাকে শহর থেকে বিতাড়িত করতেন। ফকিহগণ যেভাবে ফিকহের বিধিবিধান নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করতেন, মুহতাসিবগণও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করতেন। কেননা, হিসবা লেনদেনসহ নানা বিষয়ের (যার আলোচনা সময়সাপেক্ষ) সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখে।[৩৩২]

স্পেনের মুহতাসিবগণ মর্যাদার যে সুউচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন, তার পুরস্কারস্বরূপ মালাগার নবনিযুক্ত মুহতাসিব মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম আশ-শুদাইদের উদ্দেশে করে একটি অভিবাদন ও সতর্কতামূলক পত্র লেখেন আন্দালুসের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও জ্ঞানী লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিব। চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

> হে পবিত্র ও গুণধর মুহতাসিব, আপনাকে আপনার কাঙ্ক্ষিত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় সাদর সম্ভাষণ। আপনাকে মিছে প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়া থেকে সতর্ক করছি। এমন এক সময়ে আপনাকে পত্র লিখছি যখন বিক্রেতারা আপনার বাহন ঘিরে উপচে পড়েছে, আপনার আনুগত্য সকলে মেনে নিয়েছে, আপনাকে তোষামোদ করতে মানুষের লালসা বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি কালক্ষেপণ না করে সকল প্রতারক ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করেছেন। তাদের উঠবস করাচ্ছেন। আপনার প্রভাব প্রবল বাতাসতুল্য। আপনার সামনে আছে সরল এক দাঁড়িপাল্লা। মনে রাখবেন, আপনার শত্রুপক্ষ কখনোই বসে থাকবে না। তারা ফাঁদ পাতবে। বিত্তশালীরা আপনার বিরোধিতায় নানা চক্রান্ত করবে। আপনি যদি নির্লোভ থাকতে পারেন তাহলে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ থাকবে আর যদি তাদের জালে পা দিয়ে ফেঁসে যান, আর সম্পদের পাহাড় গড়ে

৩৩২. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ২১৯।

তোলেন, তাহলে আপনি আপনার ক্ষমতাকে বিসর্জন দিয়ে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন।[৩৩৩]

মামুলক রাজবংশের শাসনামলেও মুহতাসিবের অনেক কদর ছিল। উপর্যুক্ত বর্ণিত সকল দায়িত্বের সাথে সেখানে যুক্ত ছিল সকল প্রকার ফেতনা ও গোলযোগ দমন করার মতো কঠিন কাজও। তা ছাড়া মানুষের মাঝে বিভেদ তৈরি করে এমন সব গুজব ও প্রোপাগান্ডা নির্মূল করাও ছিল সে আমলের মুহতাসিবদের অন্যতম দায়িত্ব। ৭৮১ হিজরি সনে সুলতান বারকুকের শাসনকালে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যায়। একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, একটি প্রাচীর থেকে একজন মানুষের কণ্ঠ ভেসে আসছে। এই ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর মানুষ ফেতনায় পড়ে যায়। রজব ও শাবান এ দুই মাস এভাবেই প্রোপাগান্ডা চলতে থাকে। মানুষ ভাবতে থাকে, ভেতর থেকে কোনো জিন বা ফেরেশতা কথা বলছে। কেউ কেউ বলছিলেন, হায় আল্লাহ! আমাদের রক্ষা করুন, প্রাচীর কথা বলছে। এ সম্পর্কে ইবনুল আত্তার একটি কবিতাও রচনা করেন,

يا ناطقا من جدار وهو ليس يرى ☆ اظهر وإلا فهذا الفعل فتان

لـم تسمع الناس للحيطان ألسنة ☆ وإنـمـا قيل للحيـطان آذان

প্রাচীরের ভেতর থেকে ভেসে আসা অদৃশ্য হে বক্তা, তুমি প্রকাশ হও। তা না হলে এটি বিরাট ফেতনা বয়ে আনবে। কারণ প্রাচীরের মুখ আছে এ কথা কখনো মানুষ শোনেনি। তবে প্রসিদ্ধি আছে যে, দেয়ালেরও কান থাকে।

ঘটনার বাস্তবতা জানার জন্য অনুসন্ধান ও তদন্তে নামেন মুহতাসিব জামালুদ্দিন। প্রথমে তিনি ওই বাড়িতে ঢুকে সেখানে দেয়াল থেকে আওয়াজ শুনতে পান। এরপর একজন সেনাকে সেখানে টহল দিতে বলেন ও তার গোলামকে বাড়ি বিরান করতে নির্দেশ দেন আর তাই করা হয়। কিছুদিন পর সেই প্রাচীর থেকে আবার কণ্ঠ ভেসে আসতে থাকে। ফলে আবার তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রাচীরকে সম্বোধন করে এ কথা বলার আদেশ করেন, আর কতদিন তুমি মানুষকে ফেতনায় ফেলবে? প্রাচীরের ওপাশ থেকে উত্তর আসে, আজকের পর আর করব না। এ কথা

---

৩৩৩. ইবনুল খতিব, *আল-ইহাতাতু ফি আখবারি গারনাতাহ*, খ. ১, পৃ. ৪১৩।

শুনে মুহতাসিব চলে যান। কিছুদিন পর শুনতে পান পুনরায় সেখান থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে। এবার তার ধারণা বদ্ধমূল হয় যে ঘটনাটি পরিকল্পিত, তাই আবারও তিনি কোমর বেঁধে ঘটনার তদন্তে নামেন। শেষ পর্যন্ত রহস্য উন্মোচিত হয় যে, এখানে রুকনুদ্দিন উমর নামক এক ব্যক্তি আহমাদ আলফিশি নামক অপর ব্যক্তির সঙ্গে মিলে এই কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন। তারা দুজনে মিলে আহমাদ আলফিশির স্ত্রীকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দেন, আর ওই নারী প্রাচীরের ওপাশ থেকে লাউয়ের খোলে অদ্ভুত কণ্ঠে সেগুলো বলতে থাকে। যা শুনতে একদম মানুষের আওয়াজের মতো নয়। সুলতান বারকুক এ ঘটনা জানতে পেরে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ওই দুই ব্যক্তিকে চাবুক দিয়ে পেটানোর এবং ওই নারীর পায়ের নিচে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। কারণ তাদের কারণে দীর্ঘদিন অনেক মানুষের প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে।[৩৩৪] আর এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সুলতান মুহতাসিব জামালুদ্দিনকে সম্মানসূচক পোষাক পরিয়ে দেন।

উপর্যুক্ত ঘটনাটি ইতিহাসের একটি রসাত্মক ও মজাদার ঘটনা হতে পারে, কিন্তু ইসলামি সভ্যতা সবসময় মানুষের স্বাভাবিক নীতি-আদর্শ বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত কোনো পরিবর্তন সাধন হওয়ার আশঙ্কা করলে তাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনায় প্রথমে সবাই ভাবতে শুরু করে, এখানে জিন বা কোনো ফেরেশতা কথা বলছে। এই ফিতনা নির্মূলের জন্য মুহতাসিব বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে বিচারের মুখোমুখি করেন। কারণ এরকম আওয়াজ করে তারা মানুষের কাছ থেকে টাকা চাইত। যার ফলে এ ঘটনাটি সরাসরি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করে। মানুষের অর্থ চুরি করার একটি অভিনব কৌশল তারা আবিষ্কার করে। আর মানুষ না জেনে না বুঝে নিজেদের বিশ্বাসকে বিক্রি করে তাদেরকে টাকা দিতে শুরু করে। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের সুদক্ষ ও বিজ্ঞ মুহতাসিবগণ ঠিকই প্রায় দুই মাস ধরে চলমান এ ফেতনা ও অস্থিরতা মূলোৎপাটন করে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছেন।

---

৩৩৪. ইবনে হাজার আসকালানি, *ইনবাউল গুমর বি আবনায়িল উমর ফিত-তারিখ*, খ. ১, পৃ. ৩০৯-৩১০।

এমনকি মহামারি ও দুর্যোগেও মুহতাসিবদের দায়িত্ব ছিল অসামান্য। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ মাকরিযি লেখেন, ৮২২ হিজরি সনে একবার মিশরের কায়রো ও পল্লি অঞ্চলগুলোতে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে মুহতাসিবের পক্ষ থেকে ৮ রবিউস সানি বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয় সবাই যেন পরবর্তী ১৫ রবিউস সানি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনটি রোযা রাখে। শেষদিন ১৫ রবিউস সানি বৃহস্পতিবার সবাই সুলতানের নেতৃত্বে উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরে জড়ো হয়ে মহামারি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। এরপর পুনরায় আবার ঘোষণা করা হয় যে, আগামীকাল থেকে রোযা পালন করতে হবে। এইরকম সুন্দর ও অভিনব উদ্যোগের ফলে ঠিকই মানুষের মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে কমে যায়।[৩৩৫]

মুহতাসিবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধের সময় সড়ক ও অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে জিহাদে অংশ নিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। তারা আমির বা সুলতানের সাথে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতেন। শামের সীমান্তবর্তী তারাসুস শহরের মুসলিমগণ কীভাবে জিহাদের জন্য বের হতেন, সেই বিবরণ উঠে এসেছে বিখ্যাত লেখক ইবনুল আদিম[৩৩৬] রচিত *বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালাব* গ্রন্থে। সে সময়ের মুহতাসিবের কর্মতৎপরতার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লেখেন, মুহতাসিব তার পায়দল লোকবল নিয়ে সকল ছোটখাটো সড়ক প্রদক্ষিণ করতেন। দিনের বেলায় হলে অনেক শিশু-কিশোর তার দলে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে মানুষকে জিহাদে বের হওয়ার আহ্বানে তাকে সহযোগিতা করত। অনেক সময় জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে বিপুল পরিমাণ যোদ্ধার প্রয়োজন হতো জিহাদের জন্য। তখন বাজারের লোকদেরকেও জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো। যেদিকেই হোক, যত দূরেই হোক, সেখানে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো।[৩৩৭]

---

[৩৩৫]. মাকরিযি, *আস-সুলুক*, খ. ৬, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬।

[৩৩৬]. পুরো নাম উমর ইবনে আহমাদ ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবি জারাদাহ আল-উকাইলি (৫৮৮-৬৬০ হি./১১৯২-১২৬২ খ্রি.)। আলেপ্পোয় তার জন্ম। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে দামেশক, ফিলিস্তিন, হেজায ও ইরাক সফর করেন। শেষ পর্যন্ত তার ইনতেকাল হয় কায়রোয়। তার অন্যতম গ্রন্থ *বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালাব*। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৪০।

[৩৩৭]. ইবনুল আদিম, *বুগয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালাব*, খ. ১, পৃ. ৮৪।

এরকম কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মুহতাসিবের দায়িত্ব ছিল অসামান্য। কারণ জিহাদের জন্য সৈন্যদলে যোগদান সে সময় জোরপূর্বক ছিল না। মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদে শরিক হতে চাইত, কেবল তাদেরকেই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। এ কারণেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কাজটি তখন খুব সহজ ছিল না। এজন্য মানুষের ঘরবাড়ি ও বাজার সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন ছিল। এ সত্ত্বেও এ সময় একজন মুহতাসিব তার মূল দায়িত্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ঘোষকের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে ওঠা শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে তাদের উৎসাহিত করতেন।

সব মুহতাসিব যে সাধু ও ভালো ছিলেন, তা কিন্তু নয়। কিছু মুহতাসিব দণ্ড প্রয়োগে সীমালঙ্ঘন করেছে। অবৈধভাবে করারোপ করেছে, অন্যায়ভাবে অর্থ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামি সরকার তাদের বিন্দুমাত্রও ছাড় দেয়নি। দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে লাগামহীনভাবে তাদের ছেড়ে দেয়নি। কায়রোতে এরকমই একজন মুহতাসিব ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে শাবান আশ-শামস। একসময় তিনি মানুষের ওপর জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন চাপিয়ে দেন। কিছু সহচরকে নিযুক্ত করেন দরিদ্র ও ব্যবসায়ীদের থেকে চাঁদা ওঠানোর জন্য। মামলুক সুলতান আল-মুআইয়াদ শেখ (৮১৫-৮২৪ হি.) এ ঘটনা জানতে পেরে সেই মুহতাসিবকে গ্রেফতার করে সুলতানের সামনেই তিনশবারের অধিক লাঠিপেটা করে তাকে চাকরিচ্যুত করার নির্দেশ দেন।[৩৩৮]

সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মধ্যযুগে বিশেষ করে ক্রুসেড যুদ্ধের সময় মুসলিমদের অনুসৃত আল-হিসবাহ নীতি মুসলিমদের থেকে গ্রহণ করে ইউরোপ। প্রাচ্যের যেসব নগরী ক্রুসেডাররা দখল করে সেসব নগরীতেও তারা মুহতাসিবের পদ বহাল রাখে এমনকি ইউরোপের বিভিন্ন শহরে তা প্রচলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকার করার পর ক্রুসেডারদের কর্তৃক সেখানকার বিচারিক নীতিমালা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে এর নাম দেওয়া হয় *আন-নুযুমুল কাযায়িয়্যা লি-বাইতিল মুকাদ্দাস*। এই বিচারিক নীতিমালা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মুহতাসিব শপথ

---

৩৩৮. ইবনে হাজার, *ইনবাউল গুমর বি আবনায়িল উমর ফিত-তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১১০।

করবেন যে, সবসময় তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। বাদশার অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করবেন। মুহতাসিবের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে বাজারে গিয়ে মাংস বিক্রয়ের দোকান ও নানা খাদ্যসামগ্রী ও পানীয়ের বিপণীগুলোতে গিয়ে অনুসন্ধান করবেন। সাধারণ বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালারা তাদের পণ্যে কোনো ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে কি না তা তদন্ত করবেন। মার্কেটে রুটির দোকানগুলোতে গিয়ে দেখবেন রুটিগুলো পর্যাপ্ত পরিমাপে আছে কি না। এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপের সঙ্গে রুটির ওজনের মিল আছে কি না।[৩৩৯]

জনগণের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রশান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ও নানা সংকট, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত রাখতে আগ্রহী এবং সমাজকে আধ্যাত্মিক, শিষ্টাচার ও বস্তুগত দিকসীমা ও শর্তের ঊর্ধ্বে (তবে নিরাপত্তাধর্মী ও বৈধ রুচিগত সীমা তো মেনে নিতেই হবে) ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত করতে আগ্রহী দূরদর্শী একজন শাসকের চিন্তার চূড়ান্ত ফসল ইসলামের 'হিসবাহ' ব্যবস্থা হতে পারে বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের কোনো শাসক এমন নেই যিনি, হিসবাহ ও মুহতাসিবের মতো সুনির্দিষ্ট কোনো পদের আদলে জনগণের সুরক্ষার এমন কোনো কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়নের সৎসাহস রাখেন।[৩৪০]

ইসলামি সভ্যতায় এভাবেই বিচারবিভাগ এবং তার অধীনে থাকা সকল পদ ও দায়িত্বের লোকজন ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় অবিরাম কাজ করে গেছেন। জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। যার নজির পূর্বের ও সমকালের যেকোনো সভ্যতা ও জনগোষ্ঠীর মাঝে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে।

---

৩৩৯. *আল-হিসবা ওয়াল-মুহতাসিব*, পৃ. ৩৯-৪১; যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি*, খ. ২, পৃ. ৬১২-৬১৩।

৩৪০. মুস্তাফা আশ-শাকআ, *মাআলিমুল হাযারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮৪।

অষ্টম অনুচ্ছেদ
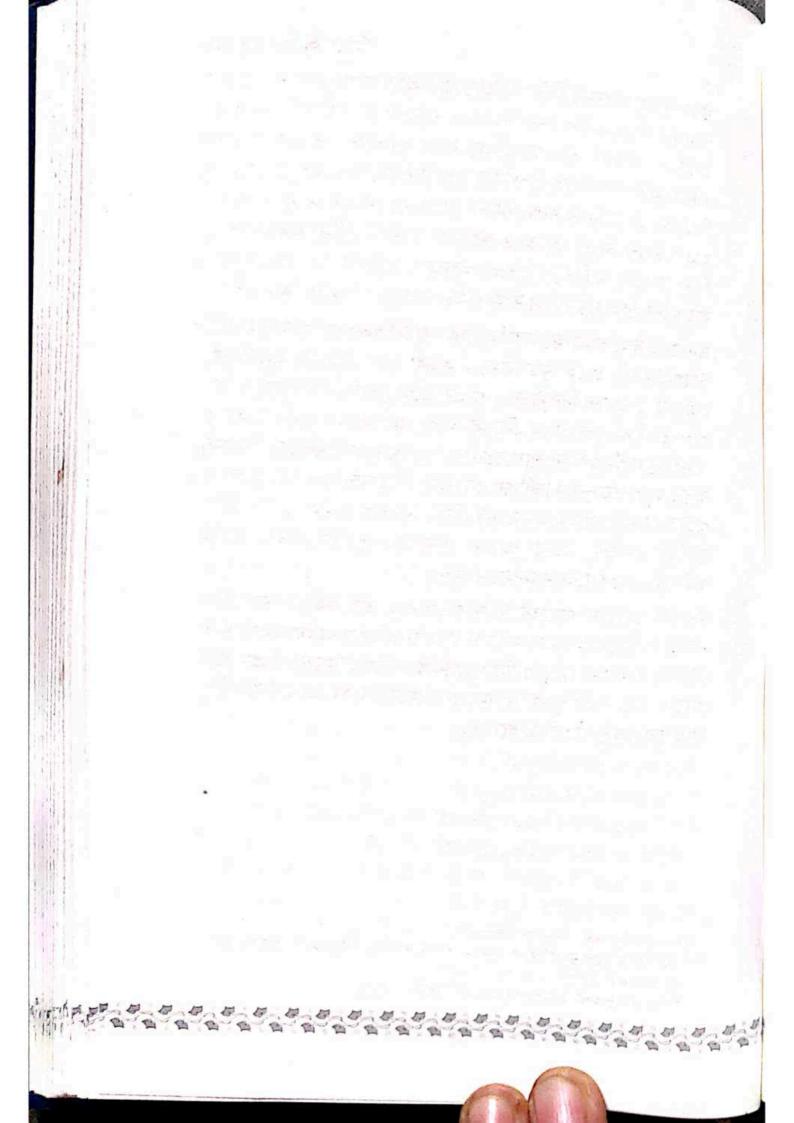
সামরিক বিভাগ

আরবি ভাষায় (الجيش) জাইশ শব্দটি সৈন্যবাহিনী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত একদল সশস্ত্র যোদ্ধা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। একটি মতে, কোনো যুদ্ধ সংঘটিত করার জন্য অথবা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে সশস্ত্র অংশগ্রহণের জন্য যে সামরিক বাহিনী তৈরি করা হয় তাকেই বলা হয় জাইশ। ইসলামের সূচনালগ্নে সেনাবাহিনী গঠন ও বিন্যাসের বিষয়টি ছিল একেবারেই প্রাথমিক স্তরের। কিন্তু সময় যতই গড়িয়েছে, ততই তা আরও আধুনিক ও সুসংগঠিত হয়েছে। সেজন্য স্বতন্ত্র সামরিক নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম আগমনের পূর্বে আরবদের সুসংগঠিত কোনো সামরিক নীতিমালা ছিল না। সবাই অস্ত্র বহন করতে পারত। যখনই যুদ্ধের ডাক আসত, নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করার জন্য সকলেই তির, তলোয়ার, ধনুক নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। গোত্রের একজন যুদ্ধপ্রিয় দুর্ধর্ষ ও সাহসী যোদ্ধা তাদের নেতৃত্ব দিতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি হতেন গোত্রাধিপতি।[৩৪১]

ইসলাম আসার পর মুসলিমদের জন্য আল্লাহর পথে কিতাল ও জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়। সে হিসেবে প্রতিটি মুসলিমই একেকজন সেনা। ধর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও অসামান্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর পথে শহিদ হওয়ার বাসনাই তাদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।[৩৪২]

---

[৩৪১]. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৫০।

[৩৪২]. প্রাগুক্ত।
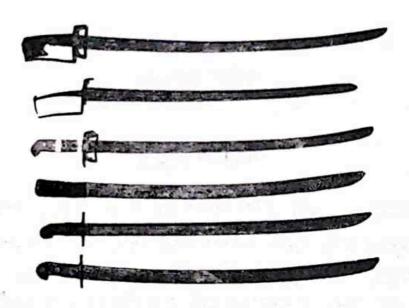
চিত্র নং-২
তরবারি

অপরদিকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ছিলেন মুসলিম সেনাপ্রধান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর যখন ইসলাম আরব উপদ্বীপ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হতে থাকে, যুদ্ধের পটভূমি বাড়তে থাকে, নানা অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য একাধিক সেনাদল তৈরি হয়ে যায়, তখন স্বয়ং খলিফার একার পক্ষে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করা কঠিন ও দুষ্কর হয়ে পড়ে। ফলে এই পদের জন্য যোগ্য, সাহসী, দূরদর্শী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও সুসমন্বয়কারী একজনকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেন। সকল যোদ্ধার ওপর আবশ্যক ছিল সেই সেনানায়কদের দিক-নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা। প্রস্তুতি ও যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষার লক্ষ্যে প্রতিটি যুদ্ধের আগে এবং প্রতিবার শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে সেনাপতিগণ সৈনিকদের কুচকাওয়াজ করাতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাই করতেন। আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেনাপতির দায়িত্ব ছিল সেনাদের প্রস্তুতি, ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র আরও নিখুঁত ও কার্যকর করা এবং আরও বেশি উন্নত করা।[৩৪৩]

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সৈনিকদের কল্যাণের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি স্বতন্ত্র

৩৪৩. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৫৩।

সামরিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। যার বিবরণ আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। সৈনিকদের নাম, পদবি, দায়িত্ব, ভাতা ইত্যাদি আলাদা করে রেজিস্ট্রেশন করা এবং সেনাদের সকল বিষয় সুবিন্যস্তরূপে সম্পাদন করাই ছিল ওই বিভাগের কাজ। এরপর যখন একের পর এক মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হতে থাকে, খিলাফতের রাজধানীতে যুদ্ধলব্ধ অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য ঘটতে থাকে, পুরো পৃথিবীজুড়ে মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন শহরে মুসলিমগণ স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন, তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আশঙ্কা করেন যে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় সকল যোদ্ধা জিহাদ থেকে হাত ধুয়ে বসে পড়বে, অবসর গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন ও বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে যাবে। ফলে তিনি সবাইকে আবারও জিহাদের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। সৈনিকদের পরিবারের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভাতার ব্যবস্থা করেন। কোনো যোদ্ধা বিনা অজুহাতে জিহাদ বর্জন করলে তাকে তিরস্কৃত করতেন।

তা ছাড়া শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়া মুজাহিদ বাহিনীর বিশ্রামের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিভিন্ন প্রদেশের নির্দিষ্ট পয়েন্টে পয়েন্টে বড় বড় দুর্গ ও সেনানিবাস স্থাপন করেন। বিভিন্ন শহর স্থাপন করেন। যেমন বসরা, কুফা, ফুসতাত। এগুলো সেনাবাহিনীর বিশ্রামের পাশাপাশি শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখত।

সৈনিকদের কল্যাণের জন্য উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যে অবদান ছিল, উমাইয়া শাসনামলে তাতে আরও অনেক বিষয় যুক্ত হয়। সামরিক বিভাগকে তারা আরও বিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেন। দেশ বিজয়ের পর অনেক সেনা অবসর গ্রহণ করলে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনী গঠন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন।[৩৪৪]

ঠিক তেমনই মুসলিমগণ আবিষ্কার করেন নানা সামরিক কৌশল এবং যুদ্ধবিদ্যার নানা পদ্ধতি। জাহিলিয়া যুগে আরবদের মাঝে যুদ্ধবিদ্যার সুবিন্যস্ত কোনো রূপরেখা ছিল না। অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। ইসলামের আগমনের পর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো,

---

৩৪৪. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৫০-১৫১।

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾

আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।[৩৪৫]

তখন মুসলিমগণ সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলেন। বিশেষ করে যখন ক্রমান্বয়ে বিজয় অর্জিত হতে থাকে এবং পারসিক ও রোমানদের মতো সুবিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন হয়, যাদের সেনাবাহিনী ছিল পূর্ব থেকেই সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত।

চিত্র নং-৩
সামরিক পোশাক (বর্ম)

যুদ্ধের সারি ও কাতার প্রস্তুত করতে মুসলিমগণ পরিচিত হন ইউনিট ব্যবস্থার সঙ্গে। যার ফলে যেকোনো যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে প্রধানত পাঁচটি ইউনিটে ভাগ করা হতো। সেগুলো ছিল যথাক্রমে, অগ্রবর্তী সেনাদল, ডানদিকের সেনাদল, বাঁ দিকের সেনাদল, মধ্যবর্তী সেনাদল এবং একেবারে পেছনে পশ্চাৎবর্তী সেনাদল।[৩৪৬]

ইয়ারমুক, কাদেসিয়া, আজনাদিন এই যুদ্ধগুলো ছিল সেনাবাহিনী গঠন ও শ্রেষ্ঠ কমান্ডিং বিবেচনায় মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে আদর্শ যুদ্ধ। ইয়ারমুক যুদ্ধে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. যে সমরপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং

---

৩৪৫. সুরা সফ : ৪।

৩৪৬. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৬৭।

যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করেছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঠিক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে ইউরোপীয় মিত্রবাহিনী।[৩৪৭]

মুসলিম যোদ্ধাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্রসহ যাবতীয় যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করত ইসলামি রাষ্ট্র। দু-ধরনের সৈনিকদের মাধ্যমে সেনাবাহিনী গঠিত হতো, অশ্বারোহী ও পদাতিক। তাদের অস্ত্র ছিল একাধিক। ব্যক্তিগতভাবে সবার সঙ্গেই থাকত তরবারি, তির, ধনুক ও বর্শা। পাশাপাশি সম্মিলিত ব্যবহারের জন্য ছিল ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ। যেমন মানজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) ও ট্যাংক। ট্যাংকের ভেতরে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হয়ে সৈনিকগণ যুদ্ধ পরিচালনা করত। তা ছাড়া শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তাদের ছিল নানা অস্ত্র। যেমন শিরস্ত্রাণ, বর্ম, ঢাল ইত্যাদি। রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল মুসলিমদের মাঝে। গ্রিক পদ্ধতিতে গোলা ব্যবহারেও মুসলিমগণ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং আরও আধুনিকায়ন করে এই পদ্ধতিকে অধিকতর কার্যকর করে তোলেন। সেজন্য তারা আবিষ্কার করেন বিস্ফোরকদ্রব্য। সে সময় ইসলামি সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র ছিল ঘোড়া, সেজন্য ঘোড়া প্রতিপালন ও যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত করার বিষয়টি তারা গুরুত্বের সঙ্গে নেন। যুদ্ধের সময় ঘোড়াগুলোর সুরক্ষার প্রতিও তারা মনোযোগী থাকতেন। শত্রুদের আক্রমণ ও আঘাত থেকে রক্ষা করতে অশ্বগুলোকে তাজফিক নামক বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরিয়ে নিতেন।[৩৪৮]

---

৩৪৭. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৫৯।
৩৪৮. কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭২-১৭৭।

চিত্র নং-৪
শিরস্ত্রাণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই মুসলিমগণ বিশেষ এক ধরনের ট্যাংক ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। এই যুদ্ধযানটি সাধারণত দুর্গের প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ছিদ্র করার জন্য ব্যবহৃত হতো। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে ইবনে কাসির রহ. বলেন, একদল সাহাবি ট্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করে তায়েফবাসীর প্রাচীর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য দুর্গে আক্রমণ করেন।[৩৪৯]

বনু উমাইয়ার শাসকগণ মানজানিক (ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ) আবিষ্কার ও আধুনিকায়নকে গুরুত্বের সঙ্গে নেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 'আরুস' নামক বিশেষ এক ধরনের মানজানিক আবিষ্কার করেন, যা তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করতে পাঁচশ যোদ্ধার প্রয়োজন হতো। ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমকে[৩৫০] এ ধরনের কয়েকটি মানজানিক দিয়ে এশিয়া অভিযানে পাঠান। ৮৯ হিজরি সনে সেই অভিযানে তিনি দেবল (করাচি)-সহ সিন্ধু উপত্যকার বেশ কয়েকটি শহর জয় করেন।[৩৫১]

---

৩৪৯. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৪, পৃ. ৩৯৯।

৩৫০. পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাকাম ইবনে আবু উকাইল আস-সাকাফি (৬২-৯৮ হি./৬৮১-৭১৭ খ্রি.) সিন্ধু এলাকার পার্শ্ববর্তী নগরগুলো বিজয় করে সেখানে ইসলামের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ৩৩৪।

৩৫১. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৬২।
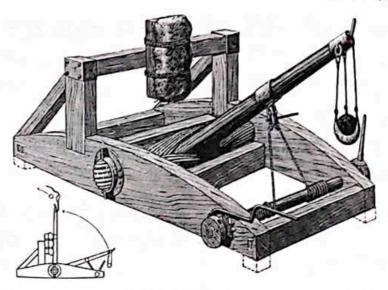
চিত্র নং-৫

ক্ষেপণাস্ত্রের নমুনা

মুসলিম সামরিক শক্তি 'নাফফাতা' নামক বিশেষ এক বাহিনী গঠন করে, যারা রণাঙ্গনে ঘোড়ার ওপর থেকে জ্বালানি বিস্ফোরক ব্যবহার করতেন। অথবা বিশেষ এক পাত্রে জ্বালানি ভরতি করে তা শত্রুদের উদ্দেশে ছুড়ে মারতেন। আব্বাসীয় শাসনামলে এই নাফফাতা বাহিনী বিরাট কদর পায়। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই বাহিনীর ওপর নির্ভরতা এবং তাদের কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে যায়। ৫৮৬ হিজরির ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাসির রহ. বলেন, বিশিষ্ট আব্বাসি খলিফা আন-নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ (মৃ. ৬২২ হি.) সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সাহায্যার্থে বেশ কিছু জ্বালানি ও বর্শা বোঝাই করা যুদ্ধযান প্রেরণ করেন। সাথে জ্বালানি ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং সুড়ঙ্গ তৈরিতে দক্ষ একদল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা পাঠান।[৩৫২]

এর চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মুসলিম বাহিনীই প্রথম বারুদের ব্যবহার নিশ্চিত করেন। পশ্চিমাদের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই মুসলিমগণ বারুদ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। অনেক প্রাচ্যবিদের ধারণা ছিল, ইউরোপ মুসলিমদের আগে বিভিন্ন যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এ ধারণাটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রথম বারুদের ব্যবহার ঘটে মিশরে। কারণ প্রাকৃতিকভাবেই মিশরে বিপুল পরিমাণ ন্যাট্রনের অস্তিত্ব

---

৩৫২. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ৪০৯।

ছিল। ৭২৭ হিজরি সনের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মাকরিযি বলেন, মিশরের বিখ্যাত সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ ইবনে কালাউনের কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠানে জ্বালানি দ্রব্যের পাশাপাশি বারুদের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। তিনি বলেন, আমির কাজলিস দুর্গে বারুদ ও জ্বালানি দ্রব্যের একটি টাওয়ার নির্মাণ করেন।[৩৫৩]

মোটকথা, ওই সময়ের আরও বহু আগে থেকেই মুসলিমগণ বারুদের সঙ্গে পরিচিত। ইবনে খালদুন বর্ণনা করেন, মরক্কোয় মারিনি সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধে বারুদ ব্যবহার করেছিলেন। বিশেষ করে সিজিলমাসা নগর বিজয়ের সময়। তিনি লেখেন, মারিনি সুলতান ইয়াকুব ইবনে আবদুল হক নগরের প্রাচীর ধ্বংস করতে খাঁটি জ্বালানি দ্রব্যভরতি কামান স্থাপন করেন, যার ভেতর থেকে গোলা ছোড়া হতো। বারুদের সাহায্যে প্রজ্বলিত আগুন থেকে উৎপাত হতো গোলা। যা লক্ষ্যভেদ করতে এবং শত্রুদের কোণঠাসা করতে দারুণ কার্যকর ছিল।[৩৫৪]

এটি ছিল ৬৭২ হিজরি সনের ঘটনা। এ থেকে বোঝা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমগণ সপ্তম শতাব্দী থেকেই কামানের সঙ্গে পরিচিত। তখন থেকেই রণক্ষেত্রে বারুদ থেকে উৎসারিত বোমার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল মুসলিম বাহিনী। এ কারণেই ইবনে খালদুন তা বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

মামলুক রাজবংশের শাসনামলেও প্রচুর পরিমাণে কামানের ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। তারা নানা শক্তির, নানা বৈশিষ্ট্যের কামান আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এর মধ্যে কিছু ছিল ছোট প্রকৃতির, আর কিছু বড় প্রকৃতির কামান। *সুবহুল আ'শা* গ্রন্থে কালকাশান্দি রহ. সেই কামান ও বারুদের ব্যবহার সম্পর্কে লেখেন, জ্বালানি দ্রব্য পরিচালিত কামান ছিল নানা প্রকৃতির। কিছু কামান থেকে বড় আকারের তির বা গোলা ছোড়া হতো। যা পাথরকে পর্যন্ত ভেদ করে ছাড়ত। আর কিছু কামান থেকে মিশরে প্রচলিত রিতিল মতে দশ রিতিল থেকে শুরু করে একশ রিতিল পরিমাণ ওজনের লৌহধাতু নিক্ষেপ করা হতো। আশরাফি সাম্রাজ্যের

---

৩৫৩. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ১০১।

৩৫৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ৭, পৃ. ১৮৮।

বিখ্যাত আমির সালাহুদ্দিন ইবনে আরামের সহযোগী শাবান ইবনে হুসাইনের শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়ায় তামা ও সিসা দিয়ে বিশেষ এক ধরনের কামান তৈরি করা হয়, যা লোহার শিকল দিয়ে বেষ্টিত ছিল। একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে তা থেকে বিশাল আকারের ভারী গোলা ছোড়া হতো যা আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত বাবুল বাহার নামক কবরস্থানের বাহিরে অবস্থিত বাহরুস সিলাসিলা নামক সাগরের একেবারে গভীরে গিয়ে পড়ত। যার দূরত্ব নেহাত কম ছিল না।[৩৫৫]

কালকাশান্দির উক্ত বিবৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি, সে সময় দু-ধরনের কামানের প্রচলন ছিল। একপ্রকার কামান থেকে বিশাল আকারের তির ছোড়া হতো যা ক্ষিপ্র গতিতে লক্ষ্যভেদ করত। আরেক প্রকার কামান থেকে জ্বলন্ত লৌহ ধাতুর গোলা নিক্ষেপ করা হতো। উভয় প্রকার কামানই তীব্র গতিতে দূরবর্তী গন্তব্যে আঘাত হানত। কালকাশান্দি নিজে ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ৭৭৫ হিজরি সনে। এ থেকেই বোঝা যায়, মুসলিমগণ নানা যুদ্ধ সরঞ্জাম ও ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করে সেগুলো প্রয়োগ করে আসছেন বহু আগে থেকেই।

মুসলিমগণ শক্তি-সামর্থ্য ও সেনাবাহিনীর সংখ্যার বিচারে এগিয়ে থাকা অনেক সামরিক শক্তিকে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে তাদের নামনিশানা মুছে দিয়েছে। মুসলিমজাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজয়ের উপাখ্যান সম্পর্কে যারা অবগত আছেন এ বিষয়টি তারা ভালোভাবেই জানেন। এখান থেকেই অনুমান করা যায়, বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয় রক্ষা, দূরদর্শী পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামরিক প্রস্তুতি ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র উদ্ভাবনের বিচারে ইসলামি সভ্যতায় মুসলিম সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল ছিল।

যুদ্ধবিষয়ক নতুন তত্ত্ব

অন্য সব সামরিক শক্তি থেকে মুসলিম সেনাবাহিনী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। ইসলামপূর্ব পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো সভ্যতার সমরকৌশলেও নব্যসভ্যতার সামরিক শক্তিতে সেই বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি পাওয়া যায় না। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যোদ্ধাদের ঈমানি শক্তি। আল্লাহর পথে জিহাদ ও

৩৫৫. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ২, পৃ. ১৫৩।

সংগ্রামের জন্য তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। এ বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যত দামি ও মূল্যবান বস্তুই হোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা প্রদান করতে কুরাইশ গোত্রের প্রায় সকল নেতা একমত হয়ে তাকে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার থেকে বিরত হওয়ার প্রস্তাব করেন। তাদের এই প্রস্তাব শুনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবু তালিবকে বলেন, চাচাজান, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তারা সূর্যকে আমার ডান হাতে আর চাঁদকে আমার বাঁ হাতে এনে দিয়ে বলে, এই নাও, এখন থেকে এ দুটোই তোমার। তুমি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিচালনা করবে। কিন্তু এর বিনিময়ে তুমি তোমার এ বাণী প্রচার থেকে বিরত থাকো, তারপরও কিছুতেই আমি এ বাণী প্রচার থেকে বিরত হব না।[(৩৫৬)]

তেমনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর কিছু মুসলিম যাকাত প্রদানে অস্বীকার করলে তৎকালীন খলিফা আবু বকর রা. ঠিক একই ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এখন যদি কেউ আল্লাহর রাসুলের কাছে আদায় করা একটি রশিও যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। যাকাত অবশ্যই সম্পদের অধিকার। নামায ও যাকাত এ দুটোকে যে আলাদা করে দেখবে আমি তারও বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব।[(৩৫৭)]

এরকম ইস্পাতকঠিন মনোবল এবং বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি নিয়েই মুসলিম সেনানীরা ইসলামের বিজয়ইতিহাস রচনা করেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা ছিল তাদের জীবনের সর্বোচ্চ বাসনা। প্রায় সকল সামরিক অভিযানে বিজয় অর্জনের পেছনে এটিই ছিল তাদের মূল চালিকাশক্তি। তাদের মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত ছিল যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। মহান আল্লাহই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

---

৩৫৬. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৩, পৃ. ১০১।

৩৫৭. আবু রবি আন্দালুসি, *আল-ইকতিফাউ বিমা তাযমানুহু মিন মাগাযি রাসুলিল্লাহ ওয়াস-সালাসাতিল খুলাফা*, খ. ৩, পৃ. ৭।

আর বিজয় একমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই।[৩৫৮]

ইসলামি সভ্যতায় যুদ্ধ কখনো শত্রুতা ও বিদ্বেষবশত ছিল না। হত্যা, লুণ্ঠন, অপহরণের উদ্দেশ্যে ছিল না। ছিল না তাতে জাগতিক কোনো অভিসন্ধিও। বরং জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার পেছনে তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা। এ কারণেই পর্বতসম সকল দুঃসাধ্য কাজও মুজাহিদদের জন্য সহজ হয়ে যেত। তাদের সুউচ্চ মনোবলের সামনে কঠিন ও শক্ত পাথরও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

আর লড়াই করো আল্লাহর জন্য তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৩৫৯]

এই উন্নত অভিলাষ এবং অসীম মনোবলই বিজয়ের সবচেয়ে বড় নিয়ামকের কাজ করেছে মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে। এ কারণেই কিবতি সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপী সম্রাট মুকাওকিসের সামনে বিশিষ্ট সাহাবি ও মুসলিম সেনাপতি উবাদা ইবনে সামিত রা. উচ্চারণ করেছিলেন,

আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জন্য জিহাদ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়া। আল্লাহর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা জাগতিক কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে লড়াই করি না। এ পৃথিবীতে শুধু অর্থের প্রাচুর্য ঘটানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে হ্যাঁ, মহান আল্লাহ সেই অর্থ আমাদের অধিকারে এনেছেন। সুতরাং যুদ্ধে আমরা যে সম্পদ লাভ করি তা আমাদের জন্য হালাল। আমাদের মাঝে কে স্বর্ণের অট্টালিকা তৈরি করে ফেলল আর কে শুধু এক দিরহাম নিয়ে পড়ে থাকল এতে কারও কিছু যায় আসে না। সেদিকে আমাদের

---

[৩৫৮]. সুরা আলে-ইমরান : ১২৬।

[৩৫৯]. সুরা বাকারা : ১৯০।

বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। এ পৃথিবীতে ক্ষুধা নিবারণের জন্য যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন, শরীর ঢাকার জন্য যতটুকু কাপড়ের প্রয়োজন, এর বাইরে আমরা কিছুই আশা করি না। ওইটুকু ছাড়া যদি আর কিছু আমাদের না থাকে, তাহলে সেটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের কারও যদি অঢেল সোনা-রুপা থাকে, তবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করে নিজের জন্য যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। আর পৃথিবীতে যে অর্থ তার অধিকারে আসার কথা, সেটি কোনো-না-কোনোভাবে তার অধিকারে আসবেই, এ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর ধনসম্পদ প্রকৃত ধনসম্পদ নয়। পৃথিবীর ভোগবিলাস আসল ভোগবিলাস নয়। প্রকৃত ধনসম্পদ ও ভোগবিলাস আখেরাতে। আর আখেরাতের সেই চিরস্থায়ী ধনসম্পদ ও ভোগবিলাস অধিকার করতেই মহান আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকেই আমাদের পথনির্দেশ করেছেন। ঠিক যতটুকু হলে আমাদের ক্ষুধা নিবারণ হয় এবং শরিয়ত নির্ধারিত সতর পরিমাণ দেহ আবৃত হয়, এর চেয়ে বেশি অর্জন করা যেন আমাদের উদ্দেশ্য না হয়; আমাদের যেন একমাত্র লক্ষ্য হয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন করে আমৃত্যু শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবিচল থাকা; এ বিষয়ে তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। মহান আল্লাহ যেন শাহাদত নসিব করেন, আর যেন বাড়ি ফিরে যেতে না হয়, দেশে প্রত্যাবর্তন করতে না হয়, পরিবার ও সন্তানদের কাছে ফিরে যেতে না হয়, আমাদের এ বাহিনীর সবাই সকাল-সন্ধ্যা শুধু এ প্রার্থনাই করে থাকেন। পেছনে কী রয়ে গেছে সেদিকে আমাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পরিবার ও সন্তানদের আমরা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি, তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছি। আমরা শুধু সামনের দিকে তাকাই। আখেরাতের দিকে চেয়ে থাকি।[৩৬০]

---

৩৬০. ইবনে তাগরি বারদি, *আন-নুযুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল-কাহিরা*, খ. ১, পৃ. ৪।

ইসলামি সেনাবাহিনীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের মাঝে সমন্বয় ও একতা বজায় ছিল। আর মুসলিম সমাজের প্রতিটি নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব হলো সেই ঐক্য সুরক্ষা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৩৬১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ»

ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীর পক্ষেই আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়।

বদর যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গীদের নিয়ে প্রথমে বদর কূপের সন্নিকটে এক স্থানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবি হুবাব ইবনুল মুনযির রা.-এর কাছে বিষয়টি মনঃপূত হয়নি। যেহেতু মুসলিমদের অবস্থানকৃত জায়গাটি শত্রুদের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে না বলে তার মনে হচ্ছিল। তিনি গিয়ে মুসলিম সেনাপতি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আল্লাহর আদেশে এ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন, এখানে কিন্তু সামনে-পেছনে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই, নাকি রণকৌশল হিসাবে আপনি এই জায়গাটি পছন্দ করেছেন? বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা স্রেফ রণকৌশল। এ কথা শোনার পর হুবাব রা. বললেন, এই জায়গায় অবস্থান করাটা আমি সমীচীন মনে করছি না। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। কুরাইশ বাহিনীর অবস্থানের সবচেয়ে নিকটবর্তী কূপ আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য কূপগুলো বন্ধ করে দেবো। তাহলে ফল দাঁড়াবে এই, যুদ্ধ শুরু হলে আমরা পানি পান করতে পারব আর কুরাইশ বাহিনী পানির অভাবে ছটফট করবে। হুবাব রা.-এর এই সুপরামর্শ আল্লাহর রাসুলের দারুণ পছন্দ হলো। তিনি খুশি হয়ে বললেন, তুমি সঠিক পরামর্শ দিয়েছ। এরপর তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে চললেন।

---

৩৬১. সুরা আলে-ইমরান : ১০৩।

মাঝরাতে শত্রুদের অবস্থানের কাছাকাছি কূপের কাছে পৌঁছে তাঁবু খাটালেন। এরপর সাহাবিগণ হাউজ বানালেন, তাতে পানি ভরতি করে পানি উত্তোলনের সহজতার জন্য তাতে পাত্র ফেলে রাখলেন এবং বাকি সব কূপ বন্ধ করে দিলেন।[৩৬২]

তাবুক যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় মদিনায় যে অভাব ও দুর্ভিক্ষ চলছিল, সেই জটিল ও কঠিন মুহূর্তে মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামরিক মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থসম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার যে নজির মুসলিমগণ স্থাপন করেন তার নজির অন্য কোনো সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য সেনাপ্রধান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে নিজ নিজ সাধ্য অনুপাতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। সাহাবিগণ আল্লাহর পথে ধনসম্পদ বিলিয়ে দিতে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। ঠিক সে সময় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় পাঠানোর জন্য দুইশ উট প্রস্তুত করেছিলেন উসমান ইবনে আফফান রা.। কিন্তু জিহাদের পথে খরচের ডাক আসায় সেই দুইশ উট সাজসরঞ্জামসহ আল্লাহর পথে সদকা করে দেন। এরপর অনুরূপ আরও একশ উট দান করেন। এরপর এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এনে আল্লাহর রাসুলের সামনে পেশ করেন। এরপর আরও দান করেন, আরও সদকা করেন। শেষ পর্যন্ত একা উসমান ইবনে আফফান রা.-এর দেওয়া দানের পরিমাণ দাঁড়ায় নয়শ উট, একশ সামরিক অশ্ব। নগদ অর্থের কথা আলাদা। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. (প্রায়) দুইশ উকিয়া চব্বিশ হাজার চারশ চুরানব্বই গ্রাম রৌপ্য দান করেন। আবু বকর রা. তার অধিকারে থাকা সমুদয় অর্থ আল্লাহর রাসুলের সামনে উপস্থাপন করেন, যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। পরিবারের জন্য শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে আসেন। তার দানটাই ছিল প্রথম। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার পুরো অর্থের অর্ধেক দান করেন। আব্বাস রা. প্রচুর দান করেন। তালহা, সাদ ইবনে উবাদা, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. প্রমুখ সাহাবিও দানের জন্য প্রচুর অর্থ নিয়ে আসেন। আসেম ইবনে আদি রা. প্রদান করেন নব্বই ওয়াসাক (সতেরো টন ছয়শ

---

৩৬২. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ২৬০; ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৪০২; সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ৩, পৃ. ৬২; তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ২৯।

আটান্ন গ্রাম প্রায়) খেজুর। এ ছাড়াও সবাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করেন। কেউ অল্প, কেউ অধিক, এভাবে সবাই দানে শরিক হন। এমনকি অনেকে সামর্থ্যের অভাবে এক মুদ (৮১৭.৬৫ গ্রাম প্রায়), দুই মুদ (১৬৩৫.৩০ গ্রাম প্রায়) পরিমাণও দান করেন। নারী সাহাবিগণও নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী সুগন্ধি, বালা, অলংকার, পায়ে পরিধানের গহনা, কানের দুল, আংটি, জমানো মুদ্রার থলে ইত্যাদি দান করে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।[৩৬৩]

মুসলিম সামরিক বাহিনীতে সেনাপ্রধান ও সৈনিকদের মাঝে যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আস্থার সম্পর্ক ছিল, তা যুদ্ধাভিযানে মুসলিমদের বিজয় রচনায় বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় যোদ্ধাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। প্রিয় নাম ধরে সবাইকে সম্বোধন করতেন। আবু উবাইদা রা.-এর উদ্দেশে তিনি বলেন,

«لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»

প্রত্যেক জাতির মাঝে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। এই উম্মতের সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।[৩৬৪]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর উদ্দেশে বলেন,

«لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ»

প্রত্যেক নবীর কিছু একান্ত সহযোগী থাকে, আমার সেই সহযোগী যুবাইর।

রণক্ষেত্রে শত্রুদের আক্রমণ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে একজন সেনাপ্রধান হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। আহযাব তথা খন্দকের যুদ্ধে এমনটিই আমরা দেখতে পাই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর যারা মুসলিমদের শাসক হয়েছেন, নেতা হয়েছেন, সেনাপ্রধান হয়েছেন সৈনিকদের সঙ্গে নম্রতা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখার আন্তরিক অভিপ্রায় তাদের মাঝেও আমরা দেখতে পাই। এ কারণেই কিবতি সম্রাট

---

৩৬৩. ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৪, পৃ. ৬ (সামান্য পরিমার্জনসহ)।

৩৬৪. *বুখারি*, হাদিস নং ৪১২১।

মুকাওকিসের পাঠানো দূতের বিবৃতিতে মুসলিমদের পরিচয় খুব ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, আমি এমন এক জনগোষ্ঠী দেখে এসেছি, যাদের কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা বেশি প্রিয়। মর্যাদার অধিকারী হওয়ার চেয়ে বিনম্র থাকা যাদের ভূষণ। জাগতিক বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ-অভিলাষ নেই। তারা মাটিতে বসেন। হাঁটুর ওপর ভর করে তারা খাবার আহরণ করেন। তাদের নেতা তাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ। তাদের মাঝে কে উচ্চমর্যাদার আর কে সাধারণ, কে নেতা আর কে দাস তা বোঝার কোনো উপায় নেই।[৩৬৫]

যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের যত উদ্ভাবন

সমরাস্ত্র আবিষ্কারের মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধকৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগে মুসলিম বাহিনীর রয়েছে বিরাট সাফল্য। ঐতিহাসিক কাদেসিয়ার ঘটনাটি সামরিক কৌশল উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। ময়দানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিনই মুসলিমগণ এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। পারসিক বাহিনীর সম্মুখভাগে হস্তিবাহিনী দেখে মুসলিমগণ কিছুটা বিচলিত হয়ে যান। মুসলিমদের ঘোড়াগুলো হাতির বিশালাকার দেহ ও বিকট আওয়াজে ভয় পেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাহস না হারিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সেনাপতিগণ রণপরিকল্পনা পালটে হাতিগুলোকে পরাস্ত করার নিখুঁত প্ল্যান তৈরি করেন। সেজন্য সাদ রা. আসেম ইবনে আমর তামিমি রা.-এর কাছে লোক পাঠান। তখন আসেম ইবনে আমর রা. তামিমি গোত্রের লোকদের নিকট গিয়ে ঘোষণা করেন, হে তামিম গোত্রের মুসলিম, উট ও অশ্ব চালনায় তোমরাই তো আরবের বিখ্যাত গোত্র! এই হাতিগুলো দমনে তোমাদের কাছে কি কোনো কৌশল নেই? তারা উত্তরে বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আছে। এরপর নিজ গোত্রের সুদক্ষ ধনুর্বিদদের সামনে ঘোষণা করেন, হে তিরন্দাজ দুঃসাহসী যোদ্ধাগণ, প্রচণ্ড তিরের আক্রমণে শত্রুবাহিনীর সম্মুখভাগে থাকা হস্তি আরোহীদের তোমরা বিচ্ছিন্ন করে দাও। আরেকদল দুর্ধর্ষ যোদ্ধার উদ্দেশে তিনি ঘোষণা করেন, হে দুর্ধর্ষ মুজাহিদগণ, তোমরা হাতিগুলোর পিছু ধাওয়া করে তাদের বন্ধনীগুলো কেটে দাও। যেন তাতে সংযুক্ত সৈনিকবাহী কাঠের বাক্সগুলো মাটিতে পড়ে যায়। এরপর তাদেরকে

---

৩৬৫. ইবনে তাগরি বারদি, *আন-নুযুমুয যাহিরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল-কাহিরা*, খ. ১, পৃ. ১১।

উদ্দীপ্ত করতে তাদের সাথে তিনি নিজেও আক্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। অদূরেই অবস্থান করছিল ডানদিকের ও বাঁ দিকের সেনাদল। আসেম রা.-এর সঙ্গীরা এসে হাতিগুলোর ওপর আক্রমণ করেন। হাতির লেজ কর্তন করেন। এরপর দ্রুত হাতির পিঠে বহন করা কাঠের বক্সগুলোর সকল বাঁধন কেটে দেন। এতে করে হাতিগুলো প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকে। সকল হাতিই সেদিন আহত হয়ে চিৎকার করতে থাকে এবং হস্তীসৈনিক সকলে নিহত হয়।[৩৬৬]

ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমদের উদ্ভাবিত অত্যাধুনিক আরও একটি যুদ্ধপরিকল্পনা ও কৌশল আমরা দেখতে পাই বিখ্যাত উসমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের কনস্টান্টিনোপল অভিযানে। বিশাল আকারের কামানবাহী রণতরীগুলো নিয়ে তিনি কনস্টান্টিনোপল অভিযান শুরু করেন। দার্দানেলিস প্রণালি পর্যন্ত এসে দেখেন, নৌপথে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে বাইজান্টাইন বাহিনী দুই উপকূলের মাঝে মজবুত ও বিশাল আকারের লোহার শিকল স্থাপন করেছে। কিন্তু তাতেও দমে যাননি মহান সেনাপতি সুলতান মুহাম্মাদ। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসাধ্য যুদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ও নৌবহর বহনের সিদ্ধান্ত নেন। স্থলপথে কাঠ দিয়ে পথ তৈরি করে লোহার শিকল দিয়ে সেই পথে রণতরীগুলো টেনে এনে অপর প্রান্তে থাকা সমুদ্রের পানিতে অবতরণ করানোর মতো অকল্পনীয় ও দুরূহ কাজটি করে মুসলিম সেনাবাহিনী। মুসলিম সেনাদের এ অভিনব উদ্ভাবন ও রণকৌশল দেখে বাইজান্টাইন বাহিনী ভড়কে যায়। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোনো সেনাপতি স্থলপথে রণতরী টেনে আনার ও সেই রণতরীগুলো শিকল দিয়ে পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত টেনে ওঠানো, এরপর সেগুলো নিখুঁতভাবে পানিতে অবতরণ করানোর মতো দুঃসাধ্য কাজটি সাধন করলেন। সেই রণতরীগুলো হালকা ছিল না, বরং তাতে বোঝাই ছিল যুদ্ধসরঞ্জাম, বিশাল আকৃতির কামান ও গোলা। এর ফলাফলও হাতেনাতে পায় মুসলিম বাহিনী। খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পুরো কনস্টান্টিনোপল শহর মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে।[৩৬৭]

---

৩৬৬. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ২, পৃ. ৪১২।

৩৬৭. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যা আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত*, পৃ. ৮৮।

এই ছিল ইসলামি সামরিক শক্তির উদ্ভাবিত কিছু রণকৌশলের নমুনামাত্র। যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি সভ্যতা সমকালীন সকল সভ্যতাকে ছাপিয়ে এক অনন্য আসন তৈরি করেছিল। বিশ্বের বুকে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করেছিল।

নৌপথে মুসলিমদের অভিযান

ইসলাম আগমনের পূর্বে ও তার সূচনালগ্নে নৌপথে ভ্রমণ এবং সামুদ্রিক অভিযানের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত ছিল না আরবরা। কারণ মরুভূমিতে বসবাসে অভ্যস্ত আরবদের ব্যবসাবাণিজ্য সবই ছিল স্থলপথকেন্দ্রিক। বিশিষ্ট সাহাবি আলা ইবনুল হাযরামি রা. উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে প্রথম নৌপথে অভিযান পরিচালনা করেন। পারস্যে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে হিজরি ১৭ সনে বাহরাইনের অধিবাসী মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানান। তারা তার আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয়। এরপর তাদেরকে নিয়ে তিনি পারস্য অভিযানে বের হন। খলিফা উমর রা.-এর অনুমতি ছাড়াই তিনি তাদেরকে নিয়ে নৌযানে করে আরব উপসাগর পাড়ি দেন। এরপর পারস্য আক্রমণ করে সেখান থেকে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে বসরায় ফিরে আসেন। কিন্তু নৌযানগুলো আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। বিষয়টি খলিফা উমর রা.-কে বেশ পীড়া দেয়। শুরু থেকেই তিনি নৌপথে অভিযানের বিরোধী ছিলেন। এ কারণে আলা ইবনুল হাযরামি রা.-কে তিনি গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহিত প্রদান করেন।[৩৬৮]

এরপর যখন আরব উপদ্বীপের চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়তে থাকে, একের পর এক দেশ মুসলিমদের অধিকারে আসতে থাকে, সিরিয়া বিজয় হয়, মিশর বিজয় হয়, তখন রোমানদের মতো নৌপথকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের উপকূলগুলো সুরক্ষিত করা এবং রোমানদের আক্রমণ থেকে তীরবর্তী অঞ্চল ও অন্যান্য বিজিত অঞ্চলসমূহ নিরাপদ রাখার প্রতি মনোযোগ দেন মুসলিম বাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় হিমসে অবস্থানরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. নৌপথে রোম আক্রমণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে পত্র লেখেন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে। কিন্তু উমর রা. তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন

---

৩৬৮. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৭, পৃ. ৯৬-৯৭।

করেন। উমর রা.-কে এ ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য অনুনয়বিনয় করে মুআবিয়া রা. দ্বিতীয়বার পত্র লেখেন, হিমসের একটি গ্রামে বসবাসরত মানুষ রোমানদের এত কাছাকাছি যে, সেই এলাকা থেকে কুকুর আওয়াজ করলে, মোরগ ডাক দিলে এই গ্রাম থেকে শোনা যায়। মুসলিম সাম্রাজ্যে বাস করা লোকজন এতটাই নিকটে যে, যেকোনো সময় রোমানদের আক্রমণের মুখে পড়তে পারে। পত্রের মাধ্যমে খলিফাকে এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল মুআবিয়া রা.-এর। এইবার উমর রা. বিষয়টি একটু গভীরভাবে নেন। আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে পত্রযোগে সমুদ্র অভিযানের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে আমর উত্তরে লেখেন, আমি মনে করি বিশাল সমুদ্রের বুকে তুলনামূলক ছোট বাহিনী নিয়ে অভিযানে বের হওয়ার মাঝে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি। সেখানে শুধু পানি ও আকাশ, তৃতীয় কোনো উপায় নেই। সাগর শান্ত হলে বাহিনীটি আতঙ্কিত হবে আর অশান্ত হলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। নৌপথে নিরাপদে ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আশঙ্কা প্রবল। সেখানে অভিযানে নামলে সেটা হবে বিশাল কাঠের টুকরায় ছোট্ট পোকার মতো। একটু উনিশ-বিশ হলেই পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা গুরুতর। আর যদি বেঁচে ফেরে, তবে সেটা হবে এক অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার।[৩৬৯] আমর ইবনুল আস রা.-এর এ প্রত্যুত্তর পেয়ে খলিফা উমর রা. মুআবিয়া রা.-কে উত্তর দেন, ওই সত্তার শপথ! যিনি মুহাম্মাদকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, নৌপথে অভিযানের জন্য কোনো মুসলিমকে আমি অনুমতি দেবো না। আমি তো সমুদ্র অভিযানের বিষয়ে আমার অসম্মতির কথা আপনাকে পূর্বেই জানিয়েছি। আল্লাহর শপথ! পুরো রোম সাম্রাজ্যের তুলনায় একজন মুসলিমের জীবনের নিরাপত্তা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার এ সিদ্ধান্ত জানানোর পর দ্বিতীয়বার আপনি আর আমাকে নৌপথে অভিযানের প্রস্তাব দেবেন না। আমি তো সমুদ্র অভিযানের বিষয়ে আমার সম্মতির কথা আপনাকে পূর্বেই জানিয়েছি। অনুমতি ছাড়া আলা ইবনুল হাযরামি সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করে যে বিচারের মুখোমুখি হয়েছে, নিশ্চয় আপনি তা জানেন। তাকে কিন্তু আমার অসম্মতির কথা পূর্বে জানাইনি।[৩৭০]

---

৩৬৯. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ২, পৃ. ১৩০।
৩৭০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ৩১৬।

এর ফলে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলের শেষ পর্যন্ত মুসলিমগণ নৌপথে কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। তিনি বাইজান্টাইনদের আক্রমণ ইস্যুতে সবসময় প্রতিরক্ষামূলক নীতি অবলম্বনের পক্ষে ছিলেন। সীমান্ত ও উপকূলীয় এলাকায় অনেক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং পাহারা জোরদার করেছিলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাহাদাতের পর যখন উসমান ইবনে আফফান রা. খলিফা হন, তখন মুআবিয়া রা. খলিফা উসমান রা.-এর কাছেও সেই বিষয়টি উত্থাপন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত উসমান রা. নৌপথে অভিযানের অনুমতি প্রদান করেন। তবে তিনি মুআবিয়া রা.-কে বলে দেন, আপনি নিজের মতো করে মানুষকে নির্বাচন করবেন না। নৌপথে অভিযানে যোগদানের জন্য লটারি করবেন না। তাদের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণ করতে চায়, তাদেরকেই শুধু আপনার সঙ্গে নিন ও তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করুন। খলিফা উসমান রা.-এর নির্দেশনামতো তিনি তাই করেন।[৩৭১]

এরপর যখন মুসলিমদের বিজয়ার্জন হয়, তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সবাই মুসলিমদের সামনে নতি স্বীকার করে, সকল-কিছুর উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং শিল্প ঘটতে থাকে মুসলিমদের কেন্দ্র করে, খ্যাতিমান ও সুদক্ষ নাবিকদের ব্যবহার করতে থাকে সামুদ্রিক প্রয়োজনে, নৌপথে যুদ্ধ পরিচালনা ও বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানির ব্যাপক ব্যবহার ঘটতে থাকে, নৌ-বিদ্যা ও চর্চায় উৎকর্ষ হতে থাকে তখন মুসলিমগণ পরিপক্ব নাবিক তৈরিতে মনোনিবেশ করেন, নৌপথে জিহাদ পরিচালনায় মনোযোগ দেন, বড় বড় নৌযান ও রণতরী তৈরি করেন। সামুদ্রিক অভিযানের জন্য নৌবাহিনী ও বিশেষ অস্ত্রে সজ্জিত নৌবহর উদ্ভাবন করেন। সমুদ্রপথে অভিযানের জন্য সাগরপাড়ের যোদ্ধা ও সৈন্যরাই নৌবহরকে যাত্রার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেন। সিরিয়া, আফ্রিকা, মরক্কো, স্পেন ইত্যাদি সমুদ্রবর্তী অঞ্চল এবং উপকূলে বাস করা বিজ্ঞ যোদ্ধারাই বিশেষত কাজটি আঞ্জাম দেন।[৩৭২]

---

৩৭১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩১৭।
৩৭২. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ২৫৩।

মুসলিমদের পরিচালিত প্রথম নৌ অভিযানগুলো ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। কুবরুস অভিযান এবং ৩৪ হি./৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত 'যাতুস সাওয়ারি' অভিযান মুসলিমদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এই অভিযানগুলোর পর নৌ ইতিহাসের গতি পালটে যায়, ভূমধ্যসাগরের পুরো নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার মুসলিমদের হাতে চলে আসে। পৃথিবীর বুকে মুসলিম নৌবাহিনী নতুন এক অদম্য পরাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে ভূমধ্যসাগরকে সবাই 'রোম সাগর' বা 'রোম উপসাগর' নামে চিনত, এরপর থেকে তার নাম হয়ে যায় 'ইসলামি উপসাগর'। এরপর মুসলিমগণ যখন স্পেন বিজয় করেন, তখন এই অঞ্চলের সমুদ্রসীমানায় মুসলিম নৌবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে সিরিয়া, মিশর, পশ্চিমে স্পেনের নৌপথগুলো মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে ওঠে।

জলযান তৈরি

যখন থেকে মুসলিমগণ সামুদ্রিক অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করেন, বিশেষত 'যাতুস সাওয়ারি' (Battle of the Masts) অভিযানে বিজয় অর্জন করেন, তখন থেকেই তারা নানাপ্রকার যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ কারখানা তৈরি শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৫৪ হি./৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের 'আর-রাওযা' দ্বীপে প্রথম যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের জন্য বিশেষ কারখানা তৈরি করে তার নাম দেওয়া হয় دَارُ الصِّنَاعَةِ। তেমনই বিশেষ রণতরী নির্মাণের জন্য সিরিয়ার ভূমধ্যসাগর আক্কা (বর্তমানে এটি ভূমধ্যসাগর ও ফিলিস্তিনের উত্তর বা পশ্চিমাংশে ও বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ১৮১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) এবং সুর অঞ্চলেও কারখানা নির্মিত হয়। এরপর একে একে আফ্রিকা এবং স্পেনেও এরকম বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান আবদুর রহমান নাসিরের শাসনামলে স্পেনের নৌবহরে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা দুইশতে গিয়ে পৌঁছে। আফ্রিকার নৌবহরেও প্রায় সমান সংখ্যক রণতরী যুক্ত হয়।[৩৭৩]

যুদ্ধের নৌবহর নির্মাণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক নৌবহর তৈরিতেও মনোযোগ দেন মুসলিমগণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অঙ্গনে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত

---

৩৭৩. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ২৫৩।

হওয়ার পর মুসলিমগণ পশ্চিম ও দক্ষিণের সামুদ্রিক অঞ্চলে বাণিজ্যিক যাতায়াত বৃদ্ধি করেন। সমুদ্র ও নৌপথের প্রয়োজন বুঝে নানা ধরনের ইসলামি বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজ নির্মিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিমগণ একে একে তৈরি করেন শাওনা, হারবাকা, (এক প্রকার জাহাজ, যাতে অগ্নি নিক্ষেপের অনেকগুলো জায়গা থাকত, যেগুলো থেকে সমুদ্রে শত্রু পক্ষকে অগ্নি নিক্ষেপ করা হতো), বাতসা, গুরার, শালানদিয়া, হামমালা, তরিদা। একেকটির ধরন, প্রকৃতি ও গতি ছিল একেকরকম। الشونة (শাওনা) নামক রণতরী ছিল আকারে সবচেয়ে বিশাল। তাতে ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সেনাবাহিনী অবস্থান করত। সবচেয়ে ছোট নৌযান ছিল الطريدة (তরিদা) যা দ্রুত চলাচল করত। আর সামুদ্রিক অভিযানে ব্যবহৃত বিশেষ অস্ত্রের মধ্যে ছিল كلاليب (কালালিব), যাতুস সাওয়ারি অভিযানে মুসলিমগণ তাদের রণতরীগুলো রোমানদের যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে বেঁধে রাখার কাজে ব্যবহার করেন। তা ছাড়া মুসলিমগণ النفاطة (নাফফাতা) নামক দাহ্য পদার্থ মিশ্রিত বিশেষ এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতেন। জাহাজের সম্মুখভাবে একটি খুঁটি স্থাপিত হতো, সেখান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হতো। একে গ্রিক আগুন নামেও ডাকা হতো। উপর্যুক্ত এ যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম ব্যবহার হতো কেবল সামুদ্রিক অভিযানে। এ ছাড়াও স্থলপথে ব্যবহারের প্রচলিত অন্যান্য অস্ত্রও ছিল।[৩৭৪]

নৌশিল্পে মুসলিমদের যে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অসামান্য অবদান, এই বিষয়ে লেখা মুসলিম মনীষীদের গ্রন্থের তালিকা থেকেও বড় ধারণা পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হলো, *আসাদুল বাহর* তথা সমুদ্রের সিংহ খ্যাত ইবনে মাজেদের (মৃ. ৯০৪ হি./১৪৯৮ খ্রি.) লেখা اَلْفَوَائِدُ فِيْ أُصُوْلِ عِلْمِ الْبَحْرِ وَالْقَوَاعِدِ এবং রাজায ছন্দে রচিত তার কাব্যগ্রন্থ حَاوِيَةُ الْاِخْتِصَارُ فِيْ أُصُوْلِ عِلْمِ الْبِحَارِ।[৩৭৫] এ ছাড়াও রয়েছে مُعَلِّمُ الْبَحْرِ (সমুদ্রবিষয়ক শিক্ষক) খ্যাত সুলাইমান আল-মাহরি (মৃ. ৯৬১ হি./১৫৫৪

৩৭৪. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১৬৯-১৭০; কামাল আনানি ইসমাইল, *দিরাসাত ফি তারিখিন নুযুমিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৩-১৮৭।

৩৭৫. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২০১।

খ্রি.) রচিত দুটি গ্রন্থ : *আল-মিনহাজুল ফাখির ফি ইলমিল বাহরিয যাখির* এবং *আল-উমদাতুল মাহরিয়্যা ফি যাবতিল উলুমিল রাহরিয়্যা।*[৩৭৬]

তেমনই সমুদ্রবিষয়ক অভিধানও ইসলামি নৌ-পরিভাষায় ভরপুর, যা কালের পরিক্রমায় ইউরোপীয়রা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে Admiral শব্দটি মূলত أَمِيْرُ الْبَحْرِ-এর পরিবর্তিত রূপ। Cable শব্দটি মূলত حَبْلٌ শব্দের পরিবর্তিত রূপ। Resif শব্দটি মূলত رَصِيْفٌ-এর পরিবর্তিত রূপ। এবং Darsinal শব্দটি মূলত دَارُ الصِّنَاعَةِ-এর পরিবর্তিত রূপ।

সামরিক চারিত্রিক নীতি

যুদ্ধ এবং সচ্চরিত্রের মাঝে প্রথম মেলবন্ধন তৈরি করেছে মুসলিমজাতি। আর এ কথা জেনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সামরিক নীতিতে কখনোই সমকালীন পারসিক ও রোমান সেনাবাহিনীর আচরণ অনুসরণ করেনি মুসলিম সেনাবাহিনী। কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বমানবতার জন্য ইসলামি সভ্যতার এ এক বড় অবদান। ইসলাম সবসময় মানুষের অন্তর ও স্বভাব পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়। সামরিক বা বেসামরিক সবার সঙ্গেই আচরণের ক্ষেত্রে মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলিকে অগ্রাধিকার দেয়।

সমকালীন রোম ও পারস্য সামরিক শক্তি, যুদ্ধ ইস্যুতে যে গণহারে রক্তপাত ও নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যার নীতি গ্রহণ করেছে, তাতারজাতি যেভাবে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষদের হত্যা করেছে, গর্ভবতী নারীর পেট ছিঁড়ে শিশুকে বের করে হত্যা করেছে, পশু হত্যায় নির্মমতার পরিচয় দিয়েছে এবং এ ছাড়া আরও অনেক নির্দয়, মর্মন্তুদ, পাশবিক ও অমানবিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে, ইসলামি সভ্যতা শুরু থেকেই সেই নীতি বর্জন করে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের নজির স্থাপন করে ধর্মের প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছে।

এ কারণেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর সঙ্গীদের দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

«لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ»

৩৭৬. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১২১।

শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে রক্তপাত ঘটানোর প্রত্যাশা করো না, আল্লাহর কাছে মুক্তি কামনা করো।[৩৭৭]

কুরআনুল কারিম এবং সুন্নাতে নববির আলোকে চারিত্রিক শিক্ষা ও যে স্বভাবের ওপর একজন মুসলিম বেড়ে ওঠে, সেই স্বভাব হত্যা, খুন, রাহাজানিকে ঘৃণা করে। আগ বেড়ে কখনোই অন্যকে সে হত্যা করতে যায় না। মানবতার কল্যাণ সাধনে সবসময় সে চায় যথাসম্ভব যুদ্ধ ও খুনাখুনি এড়িয়ে যেতে।

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায়পরায়ণতা ছিল এই যে, কেবল লড়াই করতে আসা যোদ্ধাদেরকেই হত্যা করতেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা নিরপরাধ মানুষদের তিনি হত্যা করতেন না। ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে দুমাতুল জান্দাল এলাকায় বাস করা খ্রিষ্টান কালব গোত্রের উদ্দেশে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-কে পাঠানোর সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ওসিয়ত করেন,

«اُغْزُوْا جَمِيْعًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَقَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَغْدِرُوْا، وَلَا تُمَثِّلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا»

তোমরা সকলেই আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। যারা আল্লাহর প্রতি কুফরি লালন করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তবে যুদ্ধে কিছু চুরি বা দুর্নীতি করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। লাশ বিকৃত করবে না। নবজাতক শিশুকে হত্যা করবে না।[৩৭৮]

অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধে এসব নীতিই ছিল মুসলিমদের প্রধান সমরনীতি। ইসলামের যুগে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলিমদের যুদ্ধগুলোতে রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার হার অন্যসব জাতি-গোষ্ঠীর যুদ্ধসমূহ থেকে বহুগুণ বেশি। মুসলিম সেনাপতিগণ সবসময় সম্মুখ লড়াই এড়িয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করার সুযোগ খুঁজতেন। এ বিষয়ে তাদের আদর্শ হলেন রাসুল আলাইহি ওয়া

---

৩৭৭. *বুখারি*, হাদিস নং ২৮০৪; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৪২।

৩৭৮. *মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৩১; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৬১৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৪০৮; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৮৫৭; *দারেমি*, হাদিস নং ২৪৩৯; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৮১১৯; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৮৬২৩।

সাল্লামের জীবদ্দশায় যতটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সবকটি যুদ্ধে মুসলিম-অমুসলিম নিহতের সংখ্যা হিসাব করে বর্তমান সময়ে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর সঙ্গে এর তুলনা করলে বড় বিস্ময়কর ফল বেরিয়ে আসে।

মদিনায় হিজরত করার পর দশ বছর যাবৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে মুসলিমদের মধ্যে সর্বমোট শহিদ হন ২৬২ জন এবং শত্রুপক্ষের নিহত হয় ১০২২ জন। এই পরিসংখ্যান বের করতে গিয়ে যেসব নিহত হওয়ার ঘটনা রণক্ষেত্রে নয়, শুধু বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোকেও আমি অন্তর্ভুক্ত করেছি। তুলনামূলক আকর্ষণীয় ফলাফল বের করতে ও ন্যূনতম পরিসংখ্যান তুলে ধরার জন্য অনেকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা উল্লেখ করে থাকেন,[৩৭৯] তা না করে আমি শুধু নির্ভরযোগ্য সূত্র ঘেঁটেই এই পরিসংখ্যান বের করেছি।[৩৮০]

এভাবে মহানবীর জীবদ্দশায় সকল যুদ্ধে মুসলিম-অমুসলিম উভয় পক্ষের সর্বমোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৮৪ জনে।

নিহতের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে অনেকে বলতে পারেন যে, সৈনিকদের সংখ্যা তখন কম ছিল। তাই নিহতও কম হয়েছে। এটা বের করতে গিয়ে আমি ওই দশ বছরে সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সৈনিকদের সংখ্যা গণনা করি। এরপর ওই সংখ্যা থেকে নিহতের শতকরা হার দেখে অবাক হয়ে যাই। দেখি মুসলিমদের মধ্যে শতকরা এক ভাগ নিহত হয়েছেন। আর শত্রুপক্ষের নিহত হয়েছে শতকরা দুই ভাগ। তাহলে উভয় পক্ষ মিলিয়ে গড়ে নিহত হয়েছে মাত্র ১.৫%!!

---

৩৭৯. এই পরিসংখ্যান বের করতে গিয়ে আমি আশ্রয় নিয়েছি প্রথমে সিহাহ সিত্তার ওপর। এরপর সুনান ও মুসনাদসমূহের ওপর। এরপর বিশুদ্ধতা যাচাইপূর্বক সিরাত বিষয়ক গ্রন্থের ওপর। যেমন *সিরাতে ইবনে হিশাম*, *উয়ুনুল আসার*, *যাদুল মাআদ*, *সিরাতুন নাবাবিয়া* (ইবনে কাসির এবং তাবারি রচিত)।

৩৮০. যেমন অনেকে বিরে মাউনা ট্রাজেডিতে শহিদের সংখ্যা বলেন ২৭ জন। কিন্তু সঠিক সংখ্যা হলো ৭০ জন। আবার অনেকে বনু কুরাইযায় নিহতদের সংখ্যা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন। যুক্তি হিসেবে তারা বলেন যে, বনু কুরাইযার অধিবাসী ইহুদিগণ নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই করুণ পরিণতি বরণ করেছে। তবে উচিত হলো, তাদের নিহতের সংখ্যাও এখানে উল্লেখ করা। কারণ সেটিও ছিল একটি যুদ্ধ। যুদ্ধের মৌলিক কারণ যাই হোক না কেন এভাবে নানা যুক্তিতে নিহতদের পরিসংখ্যান ছোট করার চেষ্টা করা হয়।

পঁচিশ কি সাতাশটির মতো যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৩৮টি যুদ্ধে তিনি নিজে অংশগ্রহণ না করে সৈনিকদের প্রস্তুত করে অভিযানে পাঠিয়েছেন। সব মিলে মোট যুদ্ধাভিযানের সংখ্যা ৬৩টি। এতগুলো যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা মাত্র ১.৫%?!! এতেই বোঝা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে, তাতে রক্তপাত ও খুনাখুনির হার ছিল অনেক কম। মুসলিমগণ যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করে মানুষের জীবন সুরক্ষার বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

বর্তমান সময়ে যতগুলো সভ্যতার কথা আমরা জানি, সেসব সভ্যতার মাঝে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যার দিকে যদি আমরা তাকাই, বিশেষ করে তাতে অশংগ্রহণ করা যেসব দেশ এখনো নিজেদের সভ্যতার ধ্বজাধারী বলে দাবি করে এবং কথায় কথায় মানবাধিকারের বুলি আওড়ায়, এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সৈনিকদের সংখ্যার সঙ্গে নিহতের সংখ্যা তুলনা করি তাহলে আমরা হতবাক হয়ে যাই। সভ্যতার এই যুদ্ধে নিহতের সহস্রাংশের হার ছিল ৩৫১%!!

এ পরিসংখ্যান মিথ্যা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়া সেনাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৫,৬০০,০০০ (এক কোটি ছাপ্পান্ন লাখ)। কিন্তু এই যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল ৫৪,৮০০,০০০ (পাঁচ কোটি আটচল্লিশ লাখ) মানুষ। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সংখ্যার চেয়ে আরও তিন গুণ বেশি মানুষ নিহত হয়। নিহতের সংখ্যা বেশি হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল, প্রতিটি সেনাদল নিরপরাধ বেসামরিক মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। হাজার হাজার টন বোমা ও বিস্ফোরক তারা বিভিন্ন শহর ও জনবসতির ওপর নিক্ষেপ করে মানুষের বাড়িঘর ধ্বংস করে, অর্থনৈতিকভাবে তাদের পঙ্গু করে এবং সাধারণ মানুষদের দেশান্তর করে জাতিগতভাবে তাদের নির্মূল করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে।

কোনো সন্দেহ নেই, সব দিক থেকেই এটি ছিল চরম মানবিক বিপর্যয়। আর সেই যুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় থাকা জাতি-গোষ্ঠীগুলোই ছিল তৎকালীন উন্নত সভ্যতার দাবিদার। যেমন ফ্রান্স, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জার্মানি, ইতালি, জাপান।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর মুসলিমগণ তাঁর দেখানো পথেই হাঁটেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মহানবীর আদর্শের ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর সাহাবি সিদ্দিকে আকবর রা. শাম অভিযানে বের হওয়া সেনাবাহিনীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, তোমরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করো না। এ কথাটির মাধ্যমে প্রশংসাযোগ্য সকল কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথার মাধ্যমে তিনি সকল প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে সৈনিকদের সাবধান করে দেন। উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেন,

> «وَلَا تُغْرِقُنَّ نَخْلًا وَلَا تَحْرِقُنَّهَا، وَلَا تَعْقِرُوا بَهِيمَةً، وَلَا شَجَرَةً تُثْمِرُ، وَلَا تَهْدِمُوا بَيْعَةً...»
>
> কখনো কোনো খেজুরগাছ তোমরা নষ্ট করবে না। বৃক্ষে আগুন দেবে না। যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কোনো পশু হত্যা করবে না। ফলদায়ক কোনো গাছ তোমরা বিনষ্ট করবে না। কোনো গির্জা বা উপাসনালয় ধ্বংস করবে না।[৩৮১]

এসব বিবরণ বিশৃঙ্খলা না করার মর্মে আবু বকর রা.-এর প্রদত্ত ওসিয়তের উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করেছে যাতে কোনো সেনাপতি এ কথা ভাবতে না পারে যে, প্রতিপক্ষের সাথে শত্রুতাস্বরূপ কিছু বিশৃঙ্খলা করা যেতে পারে। কারণ যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ইসলামে বর্জনীয়।

যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. প্রথমেই সৈনিকদের তাকওয়ার উপদেশ দিতেন। প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে কি না অন্তরে এ ভয় লালন করার ওপর গুরুত্বারোপ করতেন। এরপর মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগে সেনাপতির অবস্থান নির্দেশক ঝান্ডা বেঁধে দেওয়ার সময় বলতেন,

> «بسم الله وعلى عون الله، وامضوا بتأييد الله بالنصر، وبلزوم الحق والصبر، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ﴿وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾، لا تجبنوا عند اللقاء، ولا تمثلوا عند القدرة، ولا

৩৮১. বাইহাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং ১৭৯০৪।

تسرفوا عند الظهور، ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وفي شن الغارات، ولا تغلوا عند الغنائم، ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا، وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به، وذلك هو الفوزالعظيم»

আল্লাহর নাম নিয়ে ও তাঁর সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে শুরু করছি। বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আস্থা রেখে এবং সত্য ও ধৈর্যের চেতনা লালন করে রওয়ানা করো। যারা আল্লাহর প্রতি কুফরি লালন করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আর কখনো সীমালঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[৩৮২] রণাঙ্গনে শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার পর কাপুরুষতা দেখাবে না। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লাশ বিকৃত করবে না। বিজয়ের মুহূর্তেও সীমালঙ্ঘন করবে না। বৃদ্ধ, নারী ও নবজাতককে হত্যা করবে না। তাদের হত্যা থেকে বিরত থাকবে রণাঙ্গনে শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সময় এবং আক্রমণ করার মুহূর্তে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে চুরি, দুর্নীতি করবে না। জিহাদের মতো মহান ইবাদতকে তোমরা পার্থিব হীন উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র রাখবে এবং আল্লাহর সঙ্গে যে লেনদেন হয়েছে তার সুফল ও চিরস্থায়ী লাভের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এটিই তো মহা সাফল্য।[৩৮৩]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ হোক বা শান্তিপূর্ণ সমাধান, সব ক্ষেত্রেই ইসলাম ও তার সভ্যতা উন্নত চরিত্র অবলম্বনের যে বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছে, এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, ইসলামি সভ্যতা নামক বৃক্ষের শিকড় হলো উন্নত চরিত্র, কাণ্ড হলো দয়া, ডালপালা হলো ক্ষমা, ফল হলো ভ্রাতৃত্ব। কারণ অদম্য পরাশক্তি এবং বিশ্বমানচিত্রে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও ইসলাম কখনো বিধর্মী জাতি-গোষ্ঠীকে লাঞ্ছিত করেনি। কখনো তাদের প্রতি অবিচার প্রদর্শন করেনি। ইসলাম সবসময় তাদের বিশ্বাসকে সম্মান দিয়েছে। (তারা কুফরি বিশ্বাস লালন করা সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাসে

---

৩৮২. সুরা বাকারা : ১৯০।

৩৮৩. ইবনে কুতাইবা, *উয়ুনুল আখবার*, খ. ১, পৃ. ১০৭।

ইসলাম কোনো বাধা দেয়নি)। ইসলামি ভূখণ্ডে মুসলিম নাগরিকদের মতো তাদেরকেও অবাধ ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করার সুযোগ দিয়েছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো, ক্রুসেডারদের দখল থেকে জেরুজালেম উদ্ধারকারী বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর আচরণ। ক্রুসেডার বন্দিদের ও সেনাপতিদের সঙ্গে তিনি যে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করেন, নিরপেক্ষ খ্রিষ্টান জ্ঞানী ও জাতি-গোষ্ঠী আজও তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

17.07.'21
2:50 AM

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচারবিভাগ

ইসলামি বিচারবিভাগ এবং গোটা মানবসভ্যতার উন্নয়নে তার সুস্পষ্ট অংশগ্রহণের ইতিহাস পড়ে সত্যিই অবাক হতে হয়। ইসলামি বিচারবিভাগ শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও যথার্থতার যে নজির স্থাপন করেছে, ইসলাম আগমনের পূর্বে অন্য কোনো সভ্যতায় এর নজির পাওয়া যায় না। এমনকি ইসলাম আগমনের পরেও এর কোনো জুড়ি ছিল না, শত শত বছর যাবৎ ইসলামের বিচার চর্চার এ ইতিহাস সভ্যতার পরিপূর্ণ ভান্ডারে পরিণত হয়েছে আর বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে যে ন্যায় ও ইনসাফ আবিষ্কারের কথা বলা হচ্ছে, নিঃসন্দেহে তার সবগুলো উপাদান এই চিরন্তন ইসলামি সভ্যতা থেকেই নেওয়া। কারণ কোনো অসাধু বিষয় ইসলামি সংবিধানের সামনে টিকে থাকতে পারে না। শত শত বছর ধরে ইসলামি সভ্যতায় আলোকিত এই বিচারবিভাগের আগাগোড়া অধ্যয়ন করার পর তার সুফল ও সাফল্যের ইতিবৃত্ত জেনে তা গ্রহণ করে আজ নিজেদের উন্নত ও সুসভ্য বলে তারা দাবি করছে। বিপরীতে আমরা শুধু তাদের চাপানো সামান্য কিছু নীতি গ্রহণ করে তাদের অনুসারী হয়ে গেছি। ভুলে গেছি, বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠায় একসময় আমরাই ছিলাম সর্বাগ্রে, সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠ জাতি।

বিচারবিভাগের আলোচনা আমরা নিম্নবর্ণিত একাধিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করছি :

প্রথম অনুচ্ছেদ : সভ্য জাতি বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি ন্যায়বিচার অনুসন্ধানের আগ্রহ লালন

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বিচারকের ন্যায় প্রতিষ্ঠার সহায়ক কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার

প্রথম অনুচ্ছেদ

১. সভ্য জাতি বিনির্মাণের মৌলিক ভিত্তি ন্যায়বিচার অনুসন্ধানের আগ্রহ লালন

অন্যসব সভ্যতাকে ছাপিয়ে ইসলামি সভ্যতা যে-কয়েকটি কারণে উন্নত আসন লাভ করেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইসলামি সভ্যতা এমন কিছু নীতি ও ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে যা সরাসরি মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আর তা কারও ব্যক্তিগত স্বার্থকে পরোয়া করে না। ইসলামি সভ্যতার আগমনের পূর্বে গোটা মানবজাতি ছিল আত্মিক ও মানসিক পবিত্রতা থেকে অনেক দূরে। ইসলামি সভ্যতার আগমনের পর মানুষ তা গ্রহণ করে সেই আত্মিক ও মানসিক পবিত্রতার সন্ধান লাভ করে ধন্য হয়েছে। ইসলামি সভ্যতার পবিত্র মূল্যবোধ বাস্তবিক জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর যে সুফল মুসলিমগণ পৃথিবীবাসীর সামনে তুলে ধরেছে, তা যুগ যুগ ধরে বিশ্বমানবতাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ধর্মবর্ণনির্বিশেষে যারাই ইসলামি বিচারবিভাগের শরণাপন্ন হয়ে মোকদ্দমা দায়ের করেছে, ইসলামি বিচারবিভাগ সবসময় তাদের জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর সুফল শুধু যে বিচারপ্রার্থীরা একাই ভোগ করেছে তা নয়, বরং পুরো মুসলিমজাতি তা থেকে উপকৃত হয়েছে। কারণ এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল জনগণের মাঝে ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণের মৌলিক উৎস, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিমগণ নিজ থেকেই সে মূল্যবোধ আবিষ্কার করেছে এমনটি নয়, বরং এই মহান ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছে কুরআনুল কারিম এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আদর্শ থেকে। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে কুদসিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণী এভাবে বর্ণনা করেন,

«يَا عِبَادِيْ، إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوْا»

হে আমার বান্দাগণ, অবিচারকে আমি নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের জন্যও তা নিষিদ্ধ করেছি। কাজেই কখনো তোমরা অবিচার করো না।[৩৮৪]

এখান থেকেই মুসলিমগণ ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অনুধাবন করে সমাজজীবনে তা প্রয়োগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন।

ন্যায়বিচার শুধু মুসলিমদের মধ্যেই প্রয়োগ করতে হবে এমনটি নয়, বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য সুবিচার প্রয়োগ করতে। বিধর্মীদের প্রতি সুবিচার প্রয়োগের এমন সিদ্ধান্ত বিশ্বসভ্যতায় ছিল একেবারেই নতুন বিষয়। এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করো, এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।[৩৮৫]

ইসলাম বিধর্মীদের প্রতিও ন্যায় ও সাম্যের আচরণ করার আদেশ করেছে। যথাযথভাবে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। দুর্বল ভেবে তাদের ওপর বিন্দুমাত্র অবিচার বা খেয়ানত না করতে মুসলিমদের সতর্ক করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

« مَنْ ظَلمَ مُعَاهَدًا أوِ انتقصَه حَقًّا، أو كلَّفَه فوقَ طاقتِه أو أخذَ منهُ شيئًا بغيرِ طيبِ نفسٍ فأنا خَصمهُ يومَ القيامةِ»

---

৩৮৪. *মুসলিম*, হাদিস নং ২৫৭৭।

৩৮৫. সুরা মায়িদা : ৮।

> যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোনো (বিধর্মী) লোকের ওপর অবিচার করবে বা তার প্রাপ্য কম দেবে বা সামর্থ্যের বাইরে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেবে অথবা সন্তুষ্টিপূর্ণ সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, কেয়ামতের দিন আমি নিজে তার বিপক্ষে বাদী হব।[৩৮৬]

এ কারণেই ইসলাম মুসলিমজাতির কাঁধে স্বধর্মী-বিধর্মী সকলের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব চাপিয়েছে। শুধু দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, এর জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«تَعْدِيْلٌ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ»

দুজন ব্যক্তির মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সদকা।[৩৮৭]

শুধু তাই নয়, বাদী-বিবাদী উভয়কে বাস্তবতা জাল করা, নিজ স্বার্থের পক্ষে অসাধু যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করা এবং অন্যায়ভাবে তাকে সমর্থন দেওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, এই সঠিক ইসলামি শিক্ষাই প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়কে সকল অনিষ্টের বিরুদ্ধে সচেতন রাখে। সত্য বিকৃতি ও গোপন করা থেকে তাদের বারণ করে। তাই তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّما أنا بَشَرٌ وإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، وأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ ما أَسْمَعُ، فَمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أَخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أَقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

> আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাকো। তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের চেয়ে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী হতে পারে। ফলে আমি যেভাবে শুনেছি, সেভাবে রায় দেওয়ার ফলে কাউকে যদি তার অপর ভাইয়ের অধিকার দিয়ে দিই, তাহলে সে যেন তা

---

৩৮৬. *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩০৫২; *বাইহাকি*, হাদিস নং ১৮৫১১।

৩৮৭. *বুখারি*, হাদিস নং ২৮২৭; *মুসলিম*, হাদিস নং ১০০৯।

গ্রহণ না করে। কারণ বস্তুত আমি তার জন্য জাহান্নামের এক টুকরো আগুন প্রদান করেছি।[৩৮৮]

এ থেকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, ইসলামি সভ্যতা মানুষকে সচ্চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়েছে। পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে ঐশী ইনসাফের বীজ বপন করেছে। এই সভ্যতার ধারকবাহকদের কোনো ভয় নেই, কারণ তারা বাদী-বিবাদীকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ হিসেবে পৃথক করে দেখেনি। সুতরাং এই চিরন্তন সভ্যতার মাঝে যারা সন্দেহের বীজ বপন করতে চায়, তাদের হীন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য কতটা অন্যায় ও অযৌক্তিক, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

৩৮৮. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৫৬৬; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৭৩১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২. বিচারকের ন্যায়প্রতিষ্ঠার সহায়ক কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার

বিচারবিভাগ খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যালয়। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এটাই ইসলামের সর্বোচ্চ বিভাগ। এই বিভাগের দায়িত্ব হলো কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে শরিয়তসম্মত বিধান মোতাবেক বাদী-বিবাদীর মাঝে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসা ও সমাধান করা।[৩৮৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ছোট-বড়, শাসক-শাসিত সকলের সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শরিয়ত অনুযায়ী বিচার বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে। পাশাপাশি বিচারকগণ যেন কথা ও কাজে সবসময় আল্লাহর ভয় লালন করেন, ইসলাম সেই দীক্ষা তাদের শুরু থেকেই দিয়ে আসছে। কারণ কোনো বিচারক যদি শরিয়তের গণ্ডির বাইরে গিয়ে বিচার সমাধা করেন, তবে তা বাদী-বিবাদীর প্রতি চরম অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহর বিচারনীতি অবজ্ঞার ফলে দ্বিগুণ অপরাধী সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই ইসলাম জুলুমকারী এবং সুবিচার বর্জনকারী বিচারকদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ»

বিচারক তিন প্রকারের। দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামি এবং এক প্রকারের বিচারক জান্নাতি। জেনেশুনে যে বিচারক অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামি। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করেই যে বিচারক মানুষের অধিকারসমূহ বিনষ্ট করে দেয়, সেও

---

৩৮৯. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২০।

জাহান্নামি। আর যে বিচারক ন্যায় বিচার করে সে জান্নাতের অধিকারী।[৩৯০]

এতে কোনো সন্দেহ নেই, সূক্ষ্মভাবে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল আস্থার জায়গা হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। এতে করে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির পথ বন্ধ হয়। পাশাপাশি ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে একই বিচারনীতি প্রয়োগ হয় এবং দীর্ঘ সময়ের পরম্পরায় তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

বিচারকার্যে যদিও প্রধান দুটি উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। তারপরও যেসব মোকাদ্দমা নিষ্পত্তিতে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস- এ চারটি মৌলিক উৎসে কোনো উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না, তখন বিচারক সেসব বিষয়ে নিজে ইজতিহাদ বা গবেষণা করতে পারবেন। সেই ইজতিহাদে তিনি পুরস্কার লাভ করবেন। আমর ইবনুল আস রা. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

«إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فَلَهُ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أخْطَأَ فَلَهُ أجْرٌ»

একজন বিচারক বিচারকার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে যখন ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করে সঠিক রায় প্রদান করেন, তখন তার জন্য দুটি পুরস্কার লেখা হয়। আর ইজতিহাদ করতে গিয়ে যখন ভুল করেন তখন তার জন্য একটি পুরস্কার লেখা হয়।[৩৯১]

দুটি পুরস্কারের একটি হলো সত্য অনুসন্ধানে আন্তরিক প্রচেষ্টার এবং দ্বিতীয়টি হলো সত্য খুঁজে পেয়ে সে মতে বিচার সাধনের। আর যে বিচারক ভুল করবে, তার পুরস্কার এজন্য যে, সত্য অনুসন্ধানে তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। সে ক্ষেত্রে বিচারক ভুল সিদ্ধান্ত দিলেও কোনো গুনাহ হবে না, কারণ তার মনের ইচ্ছা ছিল সৎ। তবে বিচারক ইজতিহাদ তখনই করতে পারবেন, যখন তার মাঝে ইজতিহাদ করার সব যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে।

---

[৩৯০]. *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩২২; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৫৭৩; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ২৩১৫।

[৩৯১]. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৯১৯; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৫।

বিচার-মীমাংসায় বিচারককে বাদী-বিবাদীর মাঝে পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

«إذا تَقاضى إليكَ رجلانِ فلا تَقضِ للأَوَّلِ حتَّى تَسمعَ كلامَ الاخرِ فإنَّك إذا فعَلَت ذٰلكَ تبيَّنَ لَكَ القضاءُ»

তোমার কাছে যখন দুই ব্যক্তি বিচারের আবেদন করবে, তখন দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণ না শুনে প্রথম পক্ষের কথার ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করো না। আর খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, তুমি কীভাবে ফয়সালা করছ।[৩৯২]

তেমনই একজন বিচারকের জন্য আবশ্যক হলো, রাগের মাথায় রায় প্রদান না করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»

কোনো বিচারক যেন রাগের মাথায় দুইজনের মাঝে ফয়সালা না করে।[৩৯৩]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারককে উপযুক্ত বেতন প্রদান করতে হবে। কোনো প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করা[৩৯৪] থেকে তাকে নিষেধ করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فرَزَقْنَاه رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ»

বেতন ধার্য করে কাউকে আমরা কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান করার পর সে যদি তা থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তাহলে সেটা চুরি বলে বিবেচিত হবে।[৩৯৫]

বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে কখনো বিরোধপূর্ণ বিষয় সরাসরি দেখার প্রয়োজন পড়ে। সে ক্ষেত্রে বিচারক নিজেই তা নির্ধারণ করবেন। একাকীও যেতে

---

৩৯২. *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৩৩১; *আহমাদ*, হাদিস নং ১২১০।
৩৯৩. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৩৯; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৬।
৩৯৪. আবদুল মুনয়িম মাজেদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ৫৩।
৩৯৫. *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৯৪৩; ইবনে খুযাইমা, হাদিস নং ২৩৬৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৪৭২।

পারেন। পরিদর্শন শেষে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তিনি রায় দেবেন। উদাহরণ : একবার আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। তাদের আসার অপেক্ষা না করে বিরোধ মীমাংসায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দ্রুত সেখানে ছুটে যান। কারণ, পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক ও সংঘাতময়। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। একজন মুহাজির একজন আনসারির নিতম্বে আঘাত করে। প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে সে আনসার গোষ্ঠীকে ডেকে বলে, কোথায় আনসার গোষ্ঠী? অপরদিকে মুহাজিরও ডাকতে থাকে, হে মুহাজির গোষ্ঠী! কিন্তু তাদের এ ডাকাডাকি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনিয়ে দেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? সবাই বলল, একজন মুহাজির একজন আনসারের নিতম্বে আঘাত করেছে। এরপর প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে পরস্পরে আনসার ও মুহাজির গোষ্ঠীকে ডাকাডাকি শুরু করে। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এগুলো ছাড়ো। এ ধরনের ডাকাডাকি বড় দুর্গন্ধময়।[৩৯৬]

আরেকটি ঘটনা। মুহাম্মাদ ইবনে রুমহের বিবরণ অনুযায়ী আল-কিন্দি বলেন, বাড়ির প্রাচীর নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে আমার বিরোধ চলছিল। আমার মা আমাকে বললেন, তুমি বিচারক মুফাদদাল ইবনে ফুদালার (১৭৪-১৭৭ হি. পর্যন্ত বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) কাছে গিয়ে বলো, তিনি যেন এখানে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তদন্ত করেন। তখন তার কাছে গিয়ে আবেদন করলে তিনি বলেন, আসরের পর বসার ব্যবস্থা করো, আমি এসে এর মীমাংসা করব। তিনি এসে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে প্রাচীরটি দেখলেন। পরে প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢুকে তা দেখলেন। অতঃপর এই বলে প্রস্থান করলেন যে, প্রাচীরটি তোমাদের প্রতিবেশীর।[৩৯৭]

এমনকি বিচারকের অধিকার আছে প্রয়োজন হলে কারও কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার। আলি রা. একবার অদ্ভুত এক মামলার এজলাসে ছিলেন। নিত্যনতুন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছিল। উত্তেজক জবানবন্দি

---

৩৯৬. *বুখারি*, হাদিস নং ৪৬২৪; *মুসলিম*, হাদিস নং ২৫৮৪।

৩৯৭. আল-কিন্দি, *আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*, পৃ. ৩৭৮; যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামি*, খ. ২, পৃ. ৫১৫।

রেকর্ড করা হচ্ছিল। ফলে মামলাটি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তখন আলি রা. পুত্র হাসান রা.-এর কাছে পরামর্শ চান। এর দ্বারা বোঝা যায়, একজন বিচারক মামলার বিষয়ে অনায়াসে যে-কারও সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। বিস্ময়কর এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবনুল কাইয়িম রহ. তার বিখ্যাত *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা* গ্রন্থে। তিনি বলেন, একবার আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর কাছে একজন লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়। যাকে একজন রক্তাক্ত নিহত ব্যক্তির ঘটনাস্থলে হাতে রক্তমাখা ছুরিসহ পাওয়া গিয়েছিল। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি হত্যা করেছি! আলি রা. রায় দেন, কেসাস হিসেবে তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করো। তাকে নিয়ে গেলে এক ব্যক্তি ছুটে এসে বলতে থাকে, হে আমার জাতি, তোমরা তাড়াহুড়া করো না বরং একে আলি রা.-এর কাছে নিয়ে চলো। তাকে আলি রা.-এর কাছে নিয়ে আসা হলে দ্বিতীয় লোকটি বলতে থাকে, হে আমিরুল মুমিনিন, সে হত্যাকারী নয়, বরং আমি হলাম প্রকৃত হত্যাকারী। তখন আলি রা. প্রথম লোকের উদ্দেশে বলেন, হত্যা না করেও কেন তুমি হত্যার দাবি করেছ? উত্তরে সে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমার আর কীই-বা করার ছিল! পুলিশ এসে আমাকে এমন অবস্থায় পেয়েছে যে, আমার হাতে তখন রক্তমাখা ছুরি এবং ঘটনাস্থল থেকে আমাকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। আমি যদি অস্বীকার করতাম, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত না। উপরন্তু ওই এলাকায় হত্যার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলে হত্যাকারী অজানা থাকায় বিচারকের সামনে এসে এলাকাবাসীকে কাসামা[৩৯৮] (শপথ) করতে হতো। এসব কিছু বিবেচনা করে আমি নিজেকে হত্যাকারী বলে স্বীকার করেছি। এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাব বলে আশা করেছি। উত্তরে আলি রা. বলেন, তোমার কাজটি ভালো হয়নি। এখন বলো, রক্তমাখা ছুরি নিয়ে ওখানে তুমি কী

---

৩৯৮. কাসামার একটি পদ্ধতি হলো, হত্যাকারী অজানা থাকলে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে পঞ্চাশজন ব্যক্তি বিচারকের সামনে হত্যার ক্ষতিপূরণ দাবি করে শপথ করবে। সংখ্যায় তারা পঞ্চাশজন না হলে যতজন উপস্থিত থাকবে, সবাই পঞ্চাশ বার শপথ করে এই দাবি করবে। তবে সেই পঞ্চাশজনের মাঝে নারী, শিশু, পাগল, দাস থাকা যাবে না। কাসামার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, যাদের বিরুদ্ধে হত্যার অপবাদ এসেছে, তারা হত্যার সঙ্গে জড়িত নয় বলে উপর্যুক্ত নিয়মে শপথ করবে। এভাবে দাবিদারগণ যদি শপথ করে, তবে ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। আর যদি অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ শপথ করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

করছিলে? উত্তরে সে বলল, পেশায় আমি একজন কসাই। ভোরের আবছা অন্ধকারে আমি দোকানের উদ্দেশে বের হই। এরপর একটি গরু জবাই করে তার চামড়া ছেলা শুরু করি। এমন সময় আমার প্রস্রাবের বেগ হলে দোকানের পাশে ঘটনাস্থলে প্রস্রাব করতে যাই। প্রস্রাব শেষে আমি দোকানের দিকে ফিরতে গিয়ে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি নিহত হয়ে পড়ে আছে। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। ছুরি হাতে নিয়েই আমি ঘটনা জানার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপনার বাহিনী এসে দাঁড়ায় এবং আমাকে গ্রেফতার করে। আশপাশের মানুষজনও বলতে থাকে, আর কেউ নয়, এই লোকই হত্যা করেছে। এরপর আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, এতগুলো মানুষের সাক্ষ্যের সামনে আমার একার সাক্ষ্য কোনো কাজে আসবে না। তাই বাধ্য হয়ে, অপরাধ না করেও তা স্বীকার করে নিই। আলি রা. দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলেন, এবার তোমার বৃত্তান্ত বলো! সে বলল, ইবলিসের প্ররোচনায় অর্থের মোহে পড়ে ওই ব্যক্তিকে আমি হত্যা করেছি। এরপর নৈশ প্রহরীর আগমন টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে কেটে পড়ি। কসাই লোকটি যে বিবরণ দিয়েছে, পালানোর সময় ঠিক সেই অবস্থায়ই তাকে আমি সেখানে দেখতে পাই। নৈশ প্রহরী আসার আগেই আমি নিকটস্থ একটি জায়গায় আত্মগোপন করি। তখন প্রহরীরা তাকে ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসে। আপনি যখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তখন ভাবলাম, আমি ইতিমধ্যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, এখন এ লোকটিও যদি আমার কারণে বিনা অপরাধে মারা যায়, তাহলে এর শাস্তিও পরকালে আমাকে ভোগ করতে হবে। তাই আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। আলি রা. পুত্র হাসান রা.-এর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, এই লোকটি যদিও একজনকে হত্যা করেছে। কিন্তু অপরদিকে সে একজন নিরপরাধ লোকের জীবন বাঁচিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

এবং যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করে।[৩৯৯]

৩৯৯. সুরা মায়িদা : ৩২।

আলি রা. উভয়কে মুক্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থ তহবিল থেকে এর দিয়ত (রক্তপণ) প্রদান করেন। এই ঘটনায় ইবনুল কাইয়িম রহ. টীকা যোগ করে বলেন, এখানে যদি নিহতের অভিভাবকদের সম্মতিতে রক্তপণ চুক্তি সম্পাদন হয়ে থাকে, তাহলে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু যদি তাদের সম্মতি না থাকে, তাহলে ফকিহদের মতামত হলো, এই অবস্থায় কেসাস বহাল থাকবে। কারণ অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। আর যেহেতু কেসাস প্রত্যাহার করার কোনো কার্যকারণ নেই, তাই কেসাস কার্যকর করা আবশ্যক হয়ে যায়।[৪০০]

মানুষের মাঝে বিচারবিভাগের ছিল সুউচ্চ মর্যাদা ও প্রভাব। বিচারক ও তার অবস্থানের সম্মানার্থে এজলাসে সকলের নীরবতাবলম্বন ছিল সাধারণ নিয়ম। *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস* গ্রন্থে ইবনে যাকওয়ানের বৃত্তান্ত বর্ণনায় লেখক বলেন, তিনি ছিলেন প্রবল ভাবমূর্তিসম্পন্ন একজন বিচারক। তার উপস্থিতিতে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। তার এজলাসের চেয়ে অধিক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এজলাস কখনো দেখিনি। এজলাসে বসলে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। তার সামনে বাদী-বিবাদী ছাড়া কেউ আওয়াজ করার দুঃসাহস করত না। তার এজলাসে উপস্থিত লোকেরা হাতের ইশারায় কথা বলত। মানুষ তার কথা শুনে অভিভূত হতো।[৪০১]

ইসলামি সমাজে বিচারবিভাগের অপরিসীম গুরুত্বের কথা চিন্তা করে মুসলিম জ্ঞানী-মনীষী ও বিজ্ঞজনেরা সমাজে সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিচারকদের উপদেশ দিতেন। আবু মুসা আশআরি রা.-কে কুফার বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠানোর সময় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার উদ্দেশে একটি নাতিদীর্ঘ উপদেশবাণী লেখেন। যার সারমর্ম ছিল,

> পর সমাচার এই যে, মনে রাখবেন বিচারকাজ একটি চিরন্তন ফরয এবং অনুসৃত রীতি। আপনাকে যেহেতু এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে, তাই এ কাজটি আপনি ভালো করে উপলব্ধি করুন। কারণ বাস্তবায়ন ছাড়া শুধু মুখে বলে কোনো লাভ নেই। আপনার অবয়ব, আপনার ন্যায়বিচার এবং আপনার বিচারিক

---

৪০০. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৮২-৮৪।
৪০১. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৮৪।

মজলিসের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সুখ বিতরণ করুন। আপনার দুর্বলতা দেখে কোনো অসাধু ব্যক্তি যেন লোভের চিন্তা না করতে পারে এবং আপনার সুবিচার থেকে কোনো দুর্বল ব্যক্তি যেন হতাশ না হয়ে পড়ে। মনে রাখবেন, বাদীর কর্তব্য হলো উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করা। আর বিবাদীর কর্তব্য হলো শপথ করা। মুসলিমদের মাঝে চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ। তবে এমন কোনো চুক্তি করা যাবে না যা হারামকে হালাল করে অথবা কোনো হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে। গতকালের করা ফয়সালা যদি আজ আপনার কাছে ভুল মনে হয়, তাহলে ওই রায় প্রত্যাহার করে নিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। কারণ সত্য চিরন্তন। আর মিথ্যা রায়ের ওপর অবিচল না থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসাটাই উত্তম। কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে যে বিষয়ের সমাধান আপনি খুঁজে পাবেন না, তার সমাধান আপনি আপনার বোধশক্তি, উপলব্ধি এবং হৃদয়ে উদিত হওয়া ফয়সালার ওপর ছেড়ে দেবেন। অনুরূপ মামলা ও মীমাংসার ওপর অনুমান করে রায় দিয়ে দেবেন।[৪০২]

---

৪০২. ইবনে খালদুন, আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি, খ.১, পৃ. ২২১।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩. বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নয়ন

হিজরি প্রথম দুই তিন শতকে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। সেই বিস্তৃতির ফলে যেহেতু নানা দেশের নানা বর্ণের জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ ইসলামি সভ্যতার শীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাই শুরু থেকেই ইসলামি সাম্রাজ্যের জন্য এমন একটি সুগঠিত ও স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থা প্রণয়ন করা ছিল অতীব জরুরি, যা ইসলামি সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের মানুষের মাঝে বিচারিক সমতা সাধন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই ইসলামি বিচারব্যবস্থা জন্মলাভ করে।

জীবদ্দশায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতেন। সকল ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর ইসলামের সূচনালগ্নে খলিফাগণ সরাসরি বিচারকাজের ফয়সালা করতেন। এরপর যখন ইসলামি সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তার ঘটতে থাকে, অন্যসব সভ্যতার লোকদের সঙ্গে মুসলিমদের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে, খলিফার দায়িত্ব বেড়ে যায়, তখন মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য সরকারিভাবে স্বতন্ত্র বিচারকদের নিয়োগ দেওয়া হয়। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামল থেকেই বিচারক নিয়োগের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। তখন মদিনার বিচারক হিসেবে আবু দারদা রা.-কে, বসরার বিচারক হিসেবে শুরাইহ রা.-কে এবং কুফার বিচারক হিসেবে আবু মুসা আশআরি রা.-কে নিয়োগ করা হয়। আবু মুসা আশআরি রা.-কে নিয়োগ দেওয়ার সময় খলিফা উমর রা. তার কাছে বিচারনীতি সংবলিত প্রসিদ্ধ সেই নাতিদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন।[৪০৩]

---

৪০৩. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২১।

এরপর উমাইয়া শাসনামলে বিচারবিভাগের আরও উন্নতি ঘটে। নতুন অনেক বিষয় তাতে সংযোজন করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের অনুসরণে উমাইয়া শাসকগণও সরাসরি বিচারবিভাগ ও আদালত পরিচালনা করতেন। কিন্তু যুগ-চাহিদা ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে উমাইয়া শাসকগণ বিভিন্ন বিভাগকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে দেন। কিন্তু বিচারবিভাগ সংশ্লিষ্ট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারা নিজেদের অধীনে রাখেন। সেগুলো হলো যথাক্রমে খিলাফতের রাজধানী দামেশকে সরাসরি বিচারক নিয়োগ করা, বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নজরদারি, সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে বিচারকার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিশ্চিত এবং বিচারক নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ক বিশেষ দিকগুলো তদারকি করা। এরপর ফৌজদারি বিধি, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিষয়ে ফয়সালা করার যে দায়িত্ব সেগুলো উমাইয়া শাসকগণ সরাসরি পরিচালনা করতেন। বিশেষ করে অপরাধদণ্ড ও ফৌজদারি মামলার বিচারগুলো সরাসরি উমাইয়া শাসকগণ দেখাশোনা করতেন এবং এজন্য তারা স্বতন্ত্র ইউনিট উদ্ভাবন করেন।[৪০৪]

এরপর আব্বাসীয় খিলাফতের সময় বিচারব্যবস্থার প্রশাসনিক অবকাঠামো উন্নতির শিখরে পৌঁছে। নানা শাখাপ্রশাখা ও ব্যবস্থাপনা তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। শাসনামল শুরু হওয়ার পর থেকেই আব্বাসীয় খলিফাগণ বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে উমাইয়া শাসনামলের শেষদিকে এ বিভাগের যে দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো ধরা পড়েছিল, তা সংশোধন করেন। আব্বাসীয় খিলাফতের মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যাকে ধরা হয় সেই বিখ্যাত আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মনসুর বিচারবিভাগকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য চারটি অনুষঙ্গের একটি মনে করতেন।[৪০৫]

খিলাফতের অঞ্চল ও প্রদেশ বেড়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে প্রাদেশিক গভর্নরগণ বিচারক নিয়োগ ও তাদের অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। তবে আব্বাসি খিলাফতের পরিমণ্ডলে নতুন

---

৪০৪. মুহাম্মাদ যুহাইলি, *তারিখুল কাযা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ১৬৬-১৬৭।
৪০৫. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৫২০।

আরেকটি পদ যোগ হয়, যার নাম দেওয়া হয় 'কাযিউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি)। তিনি রাজধানী বাগদাদের প্রধান বিচারপতি হওয়ার পাশাপাশি সরকার তাকে আঞ্চলিক বিচারক নিয়োগ, বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নজরদারি, সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে বিচারকাজ সম্পাদনের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং বিচারকদের পদচ্যুত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। এ কারণেই আব্বাসীয় শাসনামলে বিচারবিভাগ পুরোপুরি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করে এবং উন্নতির শিখরে পৌঁছে। আঞ্চলিক বিচারক নিয়োগ এবং বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নজরদারি করার জন্য প্রথম যাকে কাযিউল কুযাত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তিনি হলেন বিখ্যাত কাযি ইমাম আবু ইউসুফ রহ.। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত কাযি এবং তার বিশিষ্ট উযির। তিনি বাগদাদের পাশাপাশি ইরাক, খোরাসান, মিশর এবং শামের বিচারক নিয়োগের অধিকার রাখতেন।[৪০৬]

বিচারবিভাগের পরিধি এবং অবকাঠামোতে ব্যাপক বিস্তার ঘটার ফলে আব্বাসীয় সরকার প্রধান বিচারপতি ও আঞ্চলিক বিচারপতিদের জন্য যোগ্য সহকারী নিয়োগ করে। তারা বিচারিক কাজে এবং মামলা নিষ্পত্তির কাজে বিচারপতিদের সহায়তা করতেন। তাদের পদগুলো ছিল :

এক. সহকারী বিচারপতি। তিনি বিভিন্ন শহরে ও দূরের গ্রাম্য এলাকায় বিচারকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

দুই. বিচারকের লেখক বা আদালতের লেখক। তিনি এজলাসে উভয় পক্ষের বক্তব্য, সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং বিচারকের রায় লিপিবদ্ধ করা, বাদী-বিবাদীর উপস্থিতি অনুসারে মামলা প্রস্তুত করা, এরপর বিচারকের সামনে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা এবং মুসাফির বা অচল ব্যক্তি ছাড়া কারও সঙ্গে অতিরিক্ত সম্প্রীতি না রাখা ইত্যাদি কাজগুলো তিনি পালন করতেন।

তিন. ঘোষক। তিনি বিচারকের পাশে দাঁড়িয়ে বিচারকের সম্মান ও মর্যাদা ঘোষণা করতেন। বাদী-বিবাদীর সম্মুখে বিভিন্ন ঘোষণা দিতেন।

---

৪০৬. আরনুস : তারিখুল কাযা মুহাম্মাদ যুহাইলি রচিত (*তারিখুল কাযা ফিল-ইসলাম* থেকে উদ্ধৃত।) পৃ. ২২৭।

চার. প্রহরী। তিনি মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। বিচারকের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য তিনি শতভাগ নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের লোকজন কে কোথায় বসবে সেগুলো নির্ণয় করতেন। এক পাশে নারী এবং অন্য পাশে পুরুষ বসার বিষয়টি নিশ্চিত করতেন।

পাঁচ. তদন্ত কর্মকর্তা। এ পদটির সংযোজন ঘটে আব্বাসীয় শাসনামলে। এটি উদ্ভাবনের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, বিচারকের সামনে যেসব বিষয় উত্থাপন করা হবে তার যথার্থতা তদন্ত করা। এ কাজের প্রথম উদ্ভাবক ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সহচর ও বিশিষ্ট কাযি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা। বিশিষ্ট দার্শনিক ও পণ্ডিত আল-কিন্দি বলেন, ১৭৪ হিজরি সনে মিশরের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া মুফাযযাল ইবনে ফুযালা তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। তার কাজ ছিল সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা। সাক্ষীগণ কতটুকু সৎ তা যাচাই-বাছাই করা।

ছয়. বণ্টনকারী। তিনি নিজ নিজ অংশ হকদারদের মাঝে সুষ্ঠুরূপে বণ্টন করে দিতেন। জমি সংক্রান্ত মামলা হলে উভয় পক্ষের জন্য জমির পরিমাণ ও সীমা নির্ণয় করে দিতেন। কোনো কোনো অঞ্চলে তাকে 'হাসসাব' বা হিসাবকারী বলেও ডাকা হতো। বিশিষ্ট লেখক মাওয়ারদি তার জন্য প্রযোজ্য শর্ত ও গুণাগুণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাত. আমিন। এরকম কিছু লোককে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যারা কাযিদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সুষ্ঠুভাবে দেখাশোনা করবে। যেমন এতিম, অক্ষম-অপারগ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অনুপস্থিত লোকদের সম্পদ দেখাশোনা করা; উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করার আগ পর্যন্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেখভাল করা। কাযি সিওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ প্রথম আমিন নিয়োগ প্রদান করে তাদেরকে এ কাজগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব দেন।

আট. নথি সংরক্ষক। তিনি বিচারকের যাবতীয় নথি, কাগজ, দলিল-দস্তাবেজ নিরাপদ ও নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি পদ, সেটি হলো দোভাষী। বাদী-বিবাদী বা সাক্ষীদের কেউ ভিনদেশি বা অনারব হলে বিচারকের সামনে তাদের বক্তব্য অনুবাদ

করার দায়িত্ব পালন করতেন। খিলাফতের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় এবং নানা জাতির ও নানা ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আব্বাসি শাসনামলে দোভাষীদের সংখ্যা বেড়ে যায়।[৪০৭]

তা ছাড়া ইসলামি সভ্যতায় বিচারিক এজলাস বা আদালত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পদ্ধতিও ছিল ভিন্নরকম। এজলাসে বিচারকের সামনে প্রথমে বাদী বিবাদীকে ডাকা হতো। আন্দালুসে একটি সুন্দর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যার নাম ছিল 'তাবে' পদ্ধতি। বিচারকের স্বাক্ষর ও সিল থাকা একটি কাগজের মাধ্যমে বাদী-বিবাদীকে ডাকা হতো। কে ধনী, কে গরিব, কে আমির, কে সাধারণ তার পরোয়া না করে সবাইকে একই নিয়মে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হতো।[৪০৮]

---

৪০৭. মুহাম্মাদ যুহাইলি, *তারিখুল কাযা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ২৪৬-২৫০।

৪০৮. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৫০-১৫১।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

বিচারক নিয়োগ ও যাচাই পদ্ধতি

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হতো, যাদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠা, সুবিচার, সাম্য প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকার পাশাপাশি যথেষ্ট জ্ঞান, ধার্মিকতা, সততা ও চারিত্রিক স্বচ্ছতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটত।[৪০৯]

এ কারণেই খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিচারক নিয়োগে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিতেন। সেগুলো হলো, এমন ব্যক্তি যে ঘুষ নেবে না। আত্মপ্রদর্শনের মোহে পড়বে না। লোভের পেছনে পড়বে না।[৪১০] যার ফলে আমরা দেখি, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বিভিন্ন অঞ্চলের বিচারকদের গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ইসলামি সভ্যতায় এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনার ওপরই বিচারব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়। পরবর্তীকালে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সেগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং নানা সমস্যার সমাধানে বিরাট অবদান রাখে।

খিলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া খলিফাগণও বিচারক নিয়োগের বেলায় জ্ঞান, যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাকে প্রাধান্য দিতেন। বিখ্যাত উমাইয়া শাসক উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. মিশরের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন ইবনে খাযামির সানআনিকে। কিন্তু এর আগেই তিনি ইবনে খাযামিরের যোগ্যতা, জ্ঞান, পরিপক্বতা, ধার্মিকতা ও দায়িত্ব গ্রহণে তার সামর্থ্যের পরিচয় পেয়ে যান। ইবনে খাযামিরকে বিচারপতি নিয়োগের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে হাজার রহ. লেখেন, একবার মিশর থেকে একদল অভিযাত্রী খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের কাছে আগমন করে। ওই দলের একজন ছিলেন ইবনে খাযামির। কথাপ্রসঙ্গে খলিফা

---

৪০৯. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৫৩-৫৪; ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২১।

৪১০. ওয়াকি ইবনে খালাফ, *আখবারুল কুযাত*, খ. ১, পৃ. ৭০।

সুলাইমান তাদের কাছে মরক্কোর অধিবাসীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা সবাই মরক্কোবাসী সম্পর্কে নিজেদের মতামত ও মূল্যায়ন পেশ করেন। কিন্তু ইবনে খাযামির তাদের ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে অস্বীকার করেন। সবাই বের হয়ে যাওয়ার পর উমর ইবনে আবদুল আযিয তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মাসউদ, কেন তাদের ব্যাপারে আপনি মতামত দেননি? উত্তরে ইবনে খাযামির বলেন, আমার মুখ থেকে মিথ্যা কথা বের হয়ে যাবে এই ভয়ে কোনো মত দিইনি। এ ঘটনার পর থেকেই উমর তাকে চিনে রাখেন। এরপর তিনি যখন খলিফা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন, তখন মিশরের গভর্নর আইয়ুব ইবনে শুরাহবিলের কাছে ইবনে খাযামিরকে মিশরের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপত্র লেখেন। যার ফলে তিনি হিজরি ১০০ থেকে ১০৫ সন পর্যন্ত মিশরের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪১১]

যোগ্য ব্যক্তি শনাক্ত করা এবং বিশেষ বিশেষ পদে তাদের নিয়োগ দেওয়া রাষ্ট্র পরিচালনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ কারণেই খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের উযির থাকা অবস্থায় উমর ইবনে আবদুল আযিয যোগ্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করেন। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের যাচাই করেন। যার ফলে ওই ঘটনার পর থেকে উমর ইবনে আবদুল আযিয ইবনে খাযামিরকে ইসলামি সাম্রাজ্যের কোনো একটি অঞ্চলের বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের জন্য মনস্থির করে রাখেন। পরে তিনি তা বাস্তবায়নও করেন। উমরের অনুমান বৃথা যায়নি। পাঁচ বছর বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি পুরো নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করেন। এ কারণেই ইবনে খাযামির সম্পর্কে ইবনে হাজার লেখেন, অনারবদের মধ্যে ইবনে খাযামিরই প্রথম মিশরের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে এক দিরহাম বা এক দিনারও তিনি গ্রহণ করেননি।[৪১২]

যদিও উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামল থেকেই বিচারব্যবস্থা পৃথক হয়ে যায়, যা উমাইয়া শাসনামলে পূর্ণতা লাভ করে, তারপরও আমরা দেখি বড় বড় ফকিহ ও বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ বিচারপতির পদ লাভ

---

৪১১. ইবনে হাজার, *রফউল ইসরি আন কুযাতি মিসর*, খ. ২, পৃ. ৩০৫।

৪১২. প্রাগুক্ত।

করা থেকে অনীহা প্রদর্শন করতেন। আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পুরোপুরি বাস্তবায়ন ঘটাতে যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায় এবং এর ফলে পরকালে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় এই আশঙ্কায়। *আখবারুল কুযাত* গ্রন্থে ওয়াকি বলেন, মিশরের গভর্নর ইয়াযিদ ইবনে হাতেম (মৃ. ১৭৭ হি.) একবার মিশরের বিচারপতি নিয়োগের ইচ্ছা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ এবং রাজসভাসদদের পরামর্শ চাইলে তারা তিনজন ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগের পরামর্শ দেন। তারা হলেন যথাক্রমে, হাইওয়া ইবনে শুরাইহ, আবু খুযাইমা (ইবরাহিম ইবনে ইয়াযিদ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস গাসসানি। ঘটনার দিন আবু খুযাইমা আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাকে রাজপ্রাসাদে ডাকা হলে অনতিবিলম্বে তাকে গভর্নরের সামনে উপস্থিত করা হয়। প্রথম ডাক পড়ে হাইওয়া ইবনে শুরাইহের। তিনি বিচারপতির পদ গ্রহণে সাফ না করে দিলে শাস্তি দেওয়ার জন্য তরবারি ও চাবুক আনতে বলা হয়। পরিস্থিতি দেখে হাইওয়া নিজের সঙ্গে থাকা একটি চাবি বের করে বলেন, এটি আমার বাড়ির চাবি। আপনাদের কাছে রাখুন। কারণ আমি আমার পরকালে গমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। সভাসদগণ যখন দেখলেন, কোনোভাবেই তাকে রাজি করানো সম্ভব নয়, তখন তাকে ছেড়ে দেন। তখন হাইওয়া বলেন, বাকি দুজনের কাছে আমার এ সিদ্ধান্ত ও অবস্থানের কথা বলবেন না। তাহলে তারাও আমার মতো অস্বীকার করতে পারেন। এরপর হাইওয়া রাজদরবার থেকে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যান।[৪১৩]

অপরদিকে অনেক বিচারক বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। তারা ভাবতেন, এ মহান কাজের বিনিময় গ্রহণ করলে এ পদের অবমূল্যায়ন হবে। তাদের অন্যতম হলেন আন্দালুসের বিখ্যাত বিচারক ইবনে সাম্মাক হামাযানি। তার গুণাগুণ ও কীর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট লেখক নাবাহি *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস* গ্রন্থে লেখেন, কাযি ইয়ায ও অন্যান্য মনীষীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইবনে সাম্মাক নিজেই ড্রেন বা নালা পরিষ্কার করতেন। ঘরের দরজায় বসে লাকড়ি কাটতেন। আর এই অবস্থায়ই মানুষ তার কাছে মামলার

---

৪১৩. ওয়াকি ইবনে খালাফ, *আখবারুল কুযাত*, খ.৩, পৃ.২৩২-২৩৩; আবদুর রহমান মিশরি, *ফুতুহ মিসর ওয়া আখবারুহা*, পৃ. ২৬১।

নিষ্পত্তি করার জন্য হাজির হতো। তার কাছে সমাধান জিজ্ঞেস করত। তিনি শক্ত মোটা পশমের কাপড় পরিধান করতেন। যতদিন তিনি বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন, ততদিন তিনি শহরে কোনো বাহনে আরোহণ করেননি। তার বসত ছিল দূরের গ্রামে। দিন শেষে যখন গ্রামে অবস্থিত তার বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন তখন ক্ষীণগতির গাধার পিঠে চড়ে রওয়ানা হতেন। সামান্য উপার্জন থেকে যা আসত, তা দিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিচারকের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে তিনি কানাকড়িও গ্রহণ করতেন না।[৪১৪]

অনেক সময় বিচারক নিয়োগ হতো নির্বাচনের মাধ্যমে। গুরুত্বপূর্ণ এই পদের জন্য জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি সুন্দর ঐতিহ্য ছিল এই পদ্ধতি। বুওয়াইহি নামক এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে বিশিষ্ট দার্শনিক আল-কিন্দি বলেন, গভর্নর ইবনে তাহের একবার মিশরের জনগণকে এক জায়গায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। সবাই এক জায়গায় একত্র হয়। সেদিন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ইবনে তাহেরের কাছে উপস্থিত হলাম। তার পাশেই ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম। ইবনে তাহের ঘোষণা করলেন, এখানে আপনাদের জমায়েত করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো, আপনারা নিজেরাই পছন্দমতো একজনকে বিচারক হিসেবে নির্বাচন করুন। সেদিন প্রথম নিজের মতামত উপস্থাপন করেন ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর। তিনি বলেন, হে আমাদের আমির, আপনিই বরং একজনকে কাযি হিসেবে নির্বাচন করে দিন। তবে দু-ধরনের ব্যক্তিকে আমরা বিচারকের আসনে দেখতে চাই না। এক. অপরিচিত। দুই. পরনিন্দাকারী, যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে বেড়ায় আর শত্রুতা তৈরি করে।[৪১৫] ঘটনাটি ছিল হিজরি ২১২ সনের। বোঝা যায়, বিচারক নির্বাচনে মিশরের জনগণের মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।

বিচারক নিয়োগে খলিফাগণ সবসময় জ্ঞান, যোগ্যতা ও ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিতেন। যোগ্য হলে বয়স সেখানে কোনো বাধা হতো না। খতিবে বাগদাদি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম যখন বসরার বিচারক

---

[৪১৪]. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৩২।
[৪১৫]. আল-কিন্দি, *আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*, পৃ. ৪৩৩।

নিযুক্ত হন তখন তার বয়স মাত্র বিশ বছর বা তার কাছাকাছি। তখন হিজরি ২০২ সন। বসরার অধিবাসীগণ তাকে অপরিপক্ব মনে করে জিজ্ঞেস করল, বিচারকের বয়স কত? উত্তর শুনে তারা তাকে অযোগ্য ও ছোট ভাবলে ইয়াহইয়া বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আততাব ইবনে আসিদ রা.-কে মক্কার বিচারক হিসেবে পাঠান, তখন আততাবের বয়স ছিল আমার চেয়ে কম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামেনের বিচারক হিসেবে পাঠান, তখন মুআয রা.-এর বয়স ছিল আমার চেয়েও কম। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন কাব ইবনে সুরকে বসরার বিচারক হিসেবে পাঠান, তখন তার বয়সও ছিল আমার চেয়ে কম। ইয়াহইয়া এ উত্তরের মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন করেন।[৪১৬]

এবার আসি আন্দালুসে। আন্দালুসের বিচারকগণ মালেকি মাযহাব অনুযায়ী রায় দিতেন। কারণ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার মতো আন্দালুসের বড় ও বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ইমাম মালেক ইবনে আনাসের ছাত্র ছিলেন। আর হিশাম ইবনে আবদুর রহমানের মতো বনু উমাইয়ার শাসকগণও ইমাম মালেক রহ.-কে ভালোবাসতেন এবং তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।[৪১৭]

কিন্তু মামলুক রাজবংশের শাসনামলে ব্যতিক্রমধর্মী একটি উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। তখন চার মাযহাবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগে বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হতো শুধু শাফিয়ি মাযহাব অনুসারে। বিশিষ্ট লেখক কালকাশান্দি সমকালীন বিচারব্যবস্থার স্তর বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, ওই সময় দামেশকের মতো সর্বত্রই চার মাযহাবের বিচারকগণ ফয়সালা করতেন। তবে দামেশকে এই পদ্ধতির স্বাক্ষরিক সফল প্রচলন শুরু হওয়ার পরই তা সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। তবে মূল শহরের সকল কার্যালয়ে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদন হতো শাফিয়ি মাযহাব অবলম্বনে। আর পুরো নগরজুড়ে অন্যান্য মাযহাব অনুযায়ী

---

৪১৬. খতিবে বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১৪. পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৪১৭. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

বিচারকাজ সম্পাদিত হতো। মিশর ও দামেশকেও একই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন চলে আসছিল।[৪১৮]

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো কঠিন পরীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। নতুন বিচারকের যোগ্যতা, দক্ষতা, পরিপক্বতা পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে যাচাই করা হতো সেই পরীক্ষায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, খলিফা নিজেই এ পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। সুলাইমান ইবনে সাদ আল-খুশানি *কুযাতু কুরতুবা* গ্রন্থে প্রধান বিচারপতি হিসেবে আহমাদ ইবনে বাকির নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমিরুল মুমিনিন তাকে এ পদের জন্য নিযুক্ত করেন। এরপর একে একে তাকে জায়েন, এলভিরা, টলেডো অঞ্চলের বিচারক হিসেবে মনোনীত করেন। সব দিক দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেন। সকল পদ্ধতিতে তাকে যাচাই-বাছাই করেন। সব পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় আমিরুল মুমিনিন তাকে একনিষ্ঠ ও যোগ্য বিচারক হিসেবে বাছাই করেন। এরপর তাকে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব প্রদান করেন।[৪১৯]

---

[৪১৮]. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৪, পৃ. ২২৮।

[৪১৯]. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

৫. বিচারকদের দায়িত্ব নির্ধারণ

একজন বিচারকের প্রধান দায়িত্ব ছিল, মামলামোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা, বিরোধ নিরসন করা, পাওনা আদায়ে যে লোক টালবাহানা করছে তার কাছ থেকে প্রকৃত মালিকের কাছে সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া। আপন সম্পদের হস্তক্ষেপে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অর্থসম্পদ দেখাশোনা করা, অপরাধীদের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা। তার সাক্ষী ও আমিনদের পর্যবেক্ষণ করা, তার প্রতিনিধিদের নিয়োগ ও বিচারিক কাজে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি।[৪২০]

শুধু তাই নয়, একজন বিচারকের দায়িত্ব এমন আরও অনেক ধর্মীয় বিষয়জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল, বিচারিক কাজের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। শরিয়ত সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় অধিকাংশ সময় বিচারকদেরই জামে মসজিদে নামাযের ইমামতি করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করা, অনুপস্থিত ও হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পদ দেখাশোনা করা, হজের বিষয়গুলো তদারকি করা এবং লোকদের থেকে খলিফার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হতো।[৪২১]

জ্ঞানের গভীরতার কারণে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অসামান্য মর্যাদার অধিকারী হওয়ায় অনেক প্রধান বিচারপতি উন্নতি করতে করতে উযিরের পদে অধিষ্ঠিত হন। মনসুর ইবনে আবু আমিরের শাসনামলে আন্দালুসের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনকারী আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ানের জীবনবৃত্তান্তে নাবাহি বলেন, মনসুর ইবনে আবু আমির

---

৪২০. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৫৩-৫৪; ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২১।

৪২১. আবদুল মুনয়িম মাজেদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ৪৮-৪৯।

তাকে প্রধান বিচারপতির পাশাপাশি উযিরের দায়িত্ব প্রদান করেন। বনু আমিরের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পদে বহাল ছিলেন।[৪২২]

মামলুক রাজবংশের শাসনামলে মিশরে বিচারকের পদটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী। বিচারকাজ সম্পাদনের পাশাপাশি আরও অনেক দায়িত্ব বিচারকদেরকেই সম্পাদন করতে হতো। *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* গ্রন্থে তাজুদ্দিন ইবনে বিনতুল আআয-এর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কাসির রহ. লেখেন, তার হাতে একে একে সতেরোটি পদ ছিল। এর মধ্যে ছিল বিচারিক দায়িত্ব, জুমার ইমামতি, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দেখাশোনা, রাষ্ট্রীয় অর্থ তহবিল দেখাশোনা ইত্যাদি।[৪২৩]

ইসলামের স্বর্ণযুগে কাযি বা বিচারকগণ যে অসামান্য সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এসব দায়িত্ব পালন তাদের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাজুদ্দিন সুবকির বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথমে প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত হন। এ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি শাফিয়ি মাযহারের ওপর ফিকহের দরস দিতেন, তুলুনের জামে মসজিদে জুমা ও ঈদের নামাযের ইমামতি করতেন, মাদরাসায়ে শাইখুনিয়ায় শিক্ষকতা করতেন, বিচারালয়ে ফতোয়া প্রদান করতেন। তা ছাড়া দামেশকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করতেন। এতসব দায়িত্বের মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে তিনি যা করতেন তা হলো, মিশরে তিনি বিচারকাজ পরিচালনা করতেন এবং সুলতানের অনুমতিক্রমে দামেশকের মাদরাসাগুলোতে প্রতিনিধি হিসেবে কাউকে পাঠাতেন দরস দেওয়ার জন্য।[৪২৪]

---

[৪২২]. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৮৬।
[৪২৩]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১৩, পৃ.৩৮০।
[৪২৪]. শামসুদ্দিন ইবনে তুলুন, *কুযাতু দিমাশক*, পৃ. ১০৪।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

৬. বিশেষ বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন

ইসলামি সভ্যতায় বিচারব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত ও সুসংগঠিত। বিশেষ গোষ্ঠী অথবা বিশেষ কোনো মোকদ্দমায় বিশেষ বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হতো। বেসামরিক ও সেনাবাহিনী উভয় গোষ্ঠীর বিচারপ্রক্রিয়া পৃথক রাখার জন্য আব্বাসি শাসনামলে সেনাবাহিনীর জন্য সামরিক আদালত গঠন করে সেজন্য স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগ করা হয়। বোঝা যায়, ইসলামি সভ্যতায় সামরিক আদালত অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। খলিফা হওয়ার পূর্বে আল-মাহদি নিজেই সৈনিকদের মধ্যে ঘটিত বিরোধ ও মামলা নিরসন করতেন। তেমনই খলিফা মামুনের মন্ত্রী হাসান ইবনে সাহল সেনাবিষয়ক বিশেষ বিচার ট্রাইব্যুনাল পরিচালনার জন্য ২০১ হিজরি সনে সাদ ইবনে ইবরাহিমকে নিয়োগ করেন।[৪২৫]

তা ছাড়া ইসলামি বিচারব্যবস্থায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ক্ষেত্রভেদে বাদী-বিবাদীর কল্যাণার্থে অনতিবিলম্বে মামলার নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এর মধ্যে একটি ছিল স্থানীয়দের আগে মুসাফির ব্যক্তিদের মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা। ইমাম শাফিয়ির বরাতে মাওয়ারদি লেখেন, (ইমাম শাফিয়ি বলেন,) আদালতে যদি স্থানীয় ও মুসাফির উভয় প্রকার লোক এসে হাজির হয়, তবে মুসাফিরদের সংখ্যা কম হলে তাদের মামলাগুলো আগে শেষ করতে হবে। বিচারক মুসাফিরদের জন্য আলাদা একটি দিন ধার্য করবেন। তবে স্থানীয়দের যেন কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর যদি মুসাফিরদের সংখ্যা বেশি হয়, যার ফলে স্থানীয় ও মুসাফিররা সংখ্যায় সমান হয় তবে সমতা বিধান করতে হবে যেন উভয় পক্ষের কারও কোনো কষ্ট না হয়। সবারই হক আছে। তবে মুসাফিরদের যেহেতু স্বদেশ ফেরার তাড়া আছে, সে হিসেবে মামলাগুলো বিলম্ব করলে

---

৪২৫. ওয়াকি ইবনে খালাফ, *আখবারুল কুযাতি*, খ. ৩, পৃ. ২৬৯।

তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সংখ্যায় কম হলে মুসাফিরদের মামলাগুলো অবশ্যই আগে শেষ করতে হবে।[৪২৬]

ভিসা বা অনুমতি নিয়ে অন্য ধর্মের মানুষও ইসলামি সাম্রাজ্যে অবাধে বসবাস করতে পারতেন। তাই ইসলামি বিচারবিভাগ তাদের জন্য পৃথক বিচার ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম শাসনামলে স্ব স্ব ধর্মের পাদরি, যাজক, বিশপরাই তাদের মাঝে সংঘটিত মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করতেন। মুসলিম বিচারকগণ সেখানে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতেন না। কারণ ফকিহগণও যিম্মিদের বিচারকাজ যিম্মি বিচারকদের ওপর ন্যস্ত করার বৈধতা দান করেছেন। *সুবহুল আ'শা* গ্রন্থে কালকাশান্দি রহ. যিম্মিদের বিচারব্যবস্থার নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরেন। যাতে বোঝা যায়, যিম্মি বিচারকদের এই বিচারকাজ সম্পাদনের ক্ষমতা খলিফার অনুমতিক্রমেই প্রচলিত ছিল। অপরদিকে আন্দালুসে যেহেতু যিম্মিদের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তাই মুসলিমগণ তাদের জন্য বিশেষ যিম্মি বিচারকের ব্যবস্থা করেন। তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেউ খ্রিষ্টানদের বিচারক, কেউ অনারবদের বিচারক। তবে মুসলিমের সঙ্গে কোনো যিম্মির বিরোধ ঘটলে মুসলিম বিচারকগণই তার মীমাংসা করতেন। তেমনই বিচারকগণ এক খ্রিষ্টানের বিপক্ষে অপর খ্রিষ্টানের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। এক ইহুদির বিপক্ষে অপর ইহুদির সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। তবে মুসলিমের বিরুদ্ধে কোনো বিধর্মীর সাক্ষ্য তারা গ্রহণ করতেন না।[৪২৭]

---

[৪২৬]. মাওয়ারদি, *আদাবুল কাযি*, খ. ২, পৃ. ২৮৪।

[৪২৭]. আবদুল মুনয়িম মাজেদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ৫৩-৫৪।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

৭. বিচারব্যবস্থার ওপর নজরদারি

ইসলামি রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণি বিচারব্যবস্থাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। বিচারবিভাগকে সকল প্রকার স্বার্থসিদ্ধির ঊর্ধ্বে রাখতে এবং যাবতীয় অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্ত রাখতে শাসকগণ বিচার কার্যক্রমের ওপর কঠোর নজরদারি আরোপ করেছেন। কোনো বিচারক দুর্নীতি, অবিচারের আশ্রয় নিলে তাকে পদচ্যুত করেছেন। বিশিষ্ট লেখক আল-কিন্দি লেখেন, ১০৫ হিজরি সনে ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুনের বিচারিক অঞ্চলে একবার এক এতিমের মামলা সামনে আসে। ওই এতিমের বিষয়টি দেখার জন্য এতিমের গ্রামের একজন নেতাকে তিনি দায়িত্ব প্রদান করেন। এতিম ছেলেটি ওই নেতার প্রতিপালনেই বড় হচ্ছিল। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ওই নেতার বিরুদ্ধে ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুনের কাছে জুলুমের অভিযোগ করেও ন্যায়সম্মত প্রতিকার পায়নি। যার ফলে এতিম ছেলেটি একটি কবিতায় তার অভিযোগ লিখে ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুনের কাছে পাঠায়। কবিতাটি ছিল :

ألا أبـلـغ أبـا حـسـان عني ☆ بأن الحكم ليس على هـواكا

حكمت بباطل لم تـأت حقا ☆ ولم يـسـمـع بحكم مثل ذاكا

وتـزعـم أنـهـا حـق وعـدل ☆ وأزعـم أنـهـا ليسـت كذاكا

ألـم تـعـلـم بـأن الله حـق ☆ وأنك حين تحكم قد يـراكا

আবু হাসসান (ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুন)-কে জানিয়ে দাও যে, বিচারব্যবস্থা তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলবে না। আপনি অন্যায় বিচার করেছেন। তাতে ন্যায় বলতে কিছুই ছিল না। এরকম বিচার কখনো হয়েছে বলে লোকমুখে প্রসিদ্ধ নয়। আর আপনি ভাবছেন যে, আপনি সত্য ও সুবিচার করেছেন। আর আমি দেখছি, তা

> একেবারে ন্যায়-বহির্ভূত। আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে মহান আল্লাহ সত্য, আপনি যখন বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করেন তখন তিনি আপনাকে দেখেন?!

কবিতাটি পড়ে ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুন এতিম বালকটিকে কারাবন্দি করেন। শেষ পর্যন্ত এতিমের ইস্যুটি খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের কানে যায়। তিনি বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেন এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাইমুনকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি দেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে রিফাআর কাছে যে পত্রটি তিনি লেখেন তার ভাষা ছিল এই, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত করে ইয়াহইয়াকে পদচ্যুত করার ব্যবস্থা নিন।[৪২৮]

ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অবিচার দমনে শাসকদের এরকম সুউচ্চ মনোবল ও অদম্য ইচ্ছা সমকালীন অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসে একেবারেই বিরল। সাধারণ জনগণ এবং অনাথ শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ইস্যুগুলো শাসক ও খলিফাগণ যে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন, অন্য কোনো সভ্যতায় তার নজির পাওয়া যায় না। ইসলামি সভ্যতার যাত্রা এবং মানবতার কল্যাণ সাধনায় তার অবদান কত সুদূরপ্রসারী ছিল এর দ্বারা তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে এ বিভাগেরও উন্নতি ঘটে। একপর্যায়ে বিচারকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো বিশেষভাবে তদন্ত করার জন্য প্রাদেশিক বিচারপতিদের সঙ্গে কাযিউল কুযাতগণ (প্রধান বিচারপতিগণ) যুক্ত হন। ফলে অভিযোগ প্রমাণিত হলে জড়িত বিচারকদের তারা পদচ্যুত করতেন। অন্যথায় স্বপদে বহাল রাখতেন। অনেক সময় বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ষড়যন্ত্রমূলক হতো। *কুযাতু কুরতুবা* গ্রন্থে বর্ণিত আছে, শাসক আল-হাকামের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন বিচারক জিয়ান অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। একবার স্থানীয় লোকজন তার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অবিচারের অভিযোগ দায়ের করে। ফলে শাসক আল-হাকাম ওই বিচারকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করতে কর্ডোভার কাযিউল জামাআ (প্রধান বিচারপতি) সাইদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে বশিরকে দায়িত্ব দেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পদচ্যুত করার আর

---

৪২৮. আল-কিন্দি, *আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*, পৃ. ৩৪১।

অভিযোগ প্রমাণিত না হলে স্বপদে বহাল রাখার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি তদন্ত করে বিচারককে নির্দোষ পান। ফলে তাকে বলে দেন, আপনি আপনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে থাকুন।[৪২৯]

সে সময় আরও একটি স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠা হয়, যা অনেকটা আমাদের বর্তমান সময়ে প্রচলিত সুপ্রিম কোর্টের মতো। ওই আদালতকে বলা হতো খুততাতুর রদ (خطة الرد)। এই আদালতের বিচারকগণ শুধু বিচারব্যবস্থায় দায়িত্বরত বিচারকদের রায়গুলো পর্যবেক্ষণ করতেন ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং সাধারণ বিচারকরা যে ক্ষেত্রে রায় দিতে ব্যর্থ হতেন সে ক্ষেত্রে রায় দিতেন। ওই আদালতের কাজ ছিল বিচারিক রায় ও বিচারকদের পর্যবেক্ষণ করা, স্থানীয় লোকদের গতিবিধি লক্ষ রাখা এবং বিচারক ও জনগণের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজরদারি করা।

এই বিভাগের প্রধানের পদে যারা সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের অন্যতম হলেন আল-হাকাম মুস্তানসিরের (মৃ. ৩৬৬ হি.) শাসনামলে মুহাম্মাদ ইবনে তামলিখ আত-তামিমি এবং আবদুল মালিক ইবনে মুনযির ইবনে সাইদ। উক্ত আদালতের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকের পদবি ছিল সাহিবুর রদ (صاحب الرد)। কারণ সকল অভিযোগ ও সংবিধান তাদের কাছে উত্থাপিত হতো। এই পদটি ছিল প্রধান বিচারপতি থেকে এক স্তর নিচের ও কাছাকাছি পর্যায়ের।[৪৩০]

৪২৯. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৫।
৪৩০. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৫।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

৮. খলিফা ও শাসকগণও বিচারের আওতাধীন

কোনো সন্দেহ নেই, মানবসভ্যতার ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বরং ইসলামি সভ্যতার যুগে আরও উৎকৃষ্ট ও সমুজ্জ্বলরূপে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপ ও সমগ্র বিশ্ব গত দু-শতাব্দী ধরে যে স্বাধীন বিচারবিভাগের সঙ্গে পরিচিত, ইসলাম তা প্রতিষ্ঠা করেছে আরও বারো শতাব্দী পূর্বেই।

একবার আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনে আবু তালিব রা. একটি ঢাল নিয়ে একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধের জের ধরে বিচারকের শরণাপন্ন হন। বিখ্যাত লেখক ইবনে কাসির রহ. সেই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, আলি ইবনে আবু তালিব রা. তার হারিয়ে যাওয়া একটি ঢাল একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তির কাছে খুঁজে পান। এরপর ওই খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে নিয়ে তৎকালীন বিচারক শুরাইহ রা.-এর কাছে গিয়ে বিচার দাবি করে বলেন, এই ঢালটি আমার। ঢালটি তার কাছে পাওয়া গেছে। তার কাছে এটি আমি বিক্রিও করিনি আর তাকে দানও করিনি। তা শুনে শুরাইহ রা. ওই খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে বললেন, আমিরুল মুমিনিন যা বলছেন সে ব্যাপারে তোমার কী মত? উত্তরে খ্রিষ্টান বলল, ঢালটি আমারই। আর আমিরুল মুমিনিনকে মিথ্যুক বলার সাহস আমার নেই। এরপর শুরাইহ রা. আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে? এ কথা শুনে আলি রা. হেসে ওঠেন এবং বলেন, শুরাইহ ঠিক ধরেছে, আমার কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই। এরপর শুরাইহ রা. খ্রিষ্টান ব্যক্তির পক্ষে রায় দিয়ে দেন। ইবনে কাসির রহ. লেখেন, এরপর ঢালটি নিয়ে খ্রিষ্টান লোকটি হেঁটে কিছুদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে এবং বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আজ যে নিরপেক্ষ বিচার-মীমাংসা করা হলো নিঃসন্দেহে এটি নবী-রাসুলদের বিচারব্যবস্থা। কী আশ্চর্য, একজন বিচারক স্বয়ং আমিরুল

মুমিনিনের বিপক্ষে আমার জন্য রায় দিলেন। নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহর শপথ! এই ঢালটি আপনারই হে আমিরুল মুমিনিন।[৪৩১]

খ্রিষ্টান লোকটি বিচারবিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা দেখে, এই ন্যায্য বিচার পেয়ে এবং বিচারক শুরাইহ রা. ও আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর অবস্থান দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়। তার আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, এই সভ্যতা বড় সুন্দর ও অতিশয় মহান। তার বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত ন্যায়সংগত। তাই তো দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই সে চিরদিনের জন্য এই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের ও চিরন্তন সভ্যতায় আশ্রয় নেওয়ার ঘোষণা পাঠ করে।

আব্বাসি শাসনামলে বিচারবিভাগ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। যার ফলে আমরা দেখি, অনেক বিচারক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী খলিফা বা সরকারি উচ্চপদস্থ লোকদের বিরুদ্ধে শক্ত ও কঠিন অবস্থান নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সুষ্ঠু ও ন্যায্য বিচার প্রতিষ্ঠায় তারা কারও হুমকি-ধমকির ও নিন্দাবাক্যের তোয়াক্কা করতেন না। একবার বিখ্যাত প্রতাপশালী আব্বাসি শাসক আবু জাফর মনসুর বসরার বিচারক সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহর কাছে পত্র লেখেন, অমুক জমি নিয়ে একজন সেনাপতি এবং একজন ব্যবসায়ীর মাঝে বিরোধ চলছে, সেই জমিটি আপনি সেনাপতির কাছে হস্তান্তর করুন। উত্তরে সাওয়ার লেখেন, উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, জমিটি ওই ব্যবসায়ীর। তাই কোনো প্রমাণ ছাড়া তার কাছ থেকে আমি জমি নিয়ে সেনাপতিকে দিতে পারব না। প্রত্যুত্তরে বাদশা মনসুর লেখেন, ওই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অবশ্যই আপনি ওই জমিটি সেনাপতির কাছে হস্তান্তর করবেন। এর উত্তরে সাওয়ার লেখেন, ওই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া জমিটি ব্যবসায়ীর হাতছাড়া করব না। এই পত্রটি পড়ে মনসুর বলেন, আল্লাহর

---

৪৩১. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৮, পৃ. ৫।

শপথ, এই ভূখণ্ডকে আমি ন্যায়বিচার দিয়ে পরিপূর্ণ করেছি। আমার বিচারকগণ সত্য ও ন্যায়ের দিকে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।[৪৩২]

বিচার, সাক্ষ্য ও দাবিদাওয়া প্রমাণের জন্য বিচারকগণ খলিফা ও শাসকদেরকে আদালতে হাজির করতেন। আর খলিফা ও বাদশাগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নিতেন। বিচারকের রায় মাথা পেতে মেনে নিতেন। এর ব্যতিক্রম ঘটনাও আছে। তবে সেগুলো নিতান্তই কম। বিচারবিভাগের রায় মানলে বা আদালতে উপস্থিত হতে অস্বীকার করলে খলিফাদেরকে সিংহাসন থেকে পদচ্যুত করার বা তাদের বিষয়টি জনগণের ওপর ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন বিচারকগণ। তবে সর্বাবস্থায় বিচারকদের রায়কে সম্মান করা হতো। পুরোপুরিভাবে তা কার্যকর করা হতো। জনগণ ও খলিফার মাঝে সংঘটিত যে মামলাগুলোর কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো বাদশা আবু জাফর মনসুরের শাসনামলে বাগদাদের বিচারপতি মুহাম্মাদ ইবনে ইমরান আত-তালহির কাছে দায়ের করা কুলিদের মামলা। ঘটনার সারমর্ম হলো, একবার খলিফা আবু জাফর মনসুর কুলিদেরকে শামে পাঠিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। প্রচণ্ডরকম কষ্ট ও দুর্ভোগে পড়তে হবে বিধায় খলিফার এই ইচ্ছা কুলিদের মনঃপূত হয়নি। ফলে বিষয়টি তারা কাযি মুহাম্মাদ ইবনে ইমরানের কাছে উত্থাপন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খলিফা মনসুরকে আদালতে ডাকেন। লেখককে বলে দেন, কাঠগড়ায় ডাকার সময় খলিফা না বলে শুধু নাম দিয়ে তাকে সম্বোধন করতে। এরপর খলিফা মনসুর বিচারের মজলিসে উপস্থিত হলে খলিফার সম্মানে আসন ছেড়ে না দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের মতো আচরণ করেন। পরিশেষে তিনি কুলিদের পক্ষে রায় দেন। বিচারপ্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি উঠে গিয়ে মনসুরকে খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন হিসেবে সালাম দেন। তার এই ন্যায়বিচার দেখে মনসুর খুশি হয়ে যান। সুষ্ঠু এই বিচারিক কর্মকাণ্ডের জন্য তার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। সাধুবাদ জানান এবং তাকে দশ হাজার দিনার পুরস্কার প্রদানের নির্দেশ দেন।[৪৩৩]

---

[৪৩২]. সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, পৃ. ২২৯।

[৪৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

বিচারকদের এই বলিষ্ঠ অবস্থানের কারণে খলিফাগণও তাদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। বিচারবিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতেন না। এমনকি বিচারকদের সামনে বিনয়ের সাথে সোজা দণ্ডায়মান হওয়ার যে সাধারণ নিয়ম, তা পালনেও তারা সামান্য ত্রুটি করতেন না। বর্ণিত আছে, খলিফা আল-মাহদি (ইনতেকাল ১৬৯ হি.) একবার কোনো এক মামলায় বিবাদীপক্ষকে সাথে নিয়ে বসরায় বিচারক আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল-আনবারির কাছে আসেন। বিচারক খলিফাকে আসতে দেখেও মাথা নিচু করে স্বাভাবিকভাবে নিজ আসনে নীরবে বসে থাকেন। এরপর খলিফা বিচারপ্রার্থীদের আসনে বিবাদী পক্ষের সাথে তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের মতো বসে পড়েন। বিচারপ্রক্রিয়া শেষে কাযি আবদুল্লাহ উঠে গিয়ে খলিফাকে অভিবাদন দেওয়ার সময় খলিফা আল-মাহদি বলেন, আল্লাহর শপথ! আদালতে প্রবেশের সময় আমাকে দেখে যদি আপনি দাঁড়িয়ে যেতেন, তাহলে অবশ্যই আমি আপনাকে পদচ্যুত করতাম। আর বিচার শেষে যদি আপনি আসন ত্যাগ না করতেন, তাহলেও আমি আপনাকে পদচ্যুত করতাম।[৪৩৪]

আব্বাসি শাসনামলে বিচারবিভাগের প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। বিচারব্যবস্থা ছিল সকল স্বার্থসিদ্ধির উর্ধ্বে। বিচারবিভাগের কাছে সকল মানুষ ছিল সমান। বাগদাদের বিচারপতি আবু হামিদ আল-ইসফারায়িনি (মৃ. ৪০৬ হি.) একবার আব্বাসি খলিফার কাছে পত্র লেখেন। শরিয়া বিচার ব্যবস্থা কার্যকর করা না হলে এবং বিচারবিভাগের ওপর আস্থা প্রদর্শন না করলে তাকে খলিফার পদ থেকে বিচ্যুত করার হুমকি দেন। শুধু তাই নয়, পত্রে তিনি অনমনীয় ও শক্ত ভাষা প্রয়োগ করে লেখেন,

> জেনে রাখবেন, মহান আল্লাহ আমাকে যে বিচারক বানিয়েছেন সেই পদ থেকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা আপনার নেই। আর আমি ইচ্ছা করলে খোরাসানের উদ্দেশে দু-কথার ছোট পত্র লিখে আপনাকে খিলাফতের পদ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা রাখি।[৪৩৫]

বক্তব্য শুনতে বা সাক্ষ্য প্রদান করতে আমির ও খলিফাদের বিচারালয়ে ডাকা হতো। এটিকে খলিফাগণও বিন্দুমাত্র অসম্মানজনক বা কলঙ্ক মনে

---

৪৩৪. মাওয়ারদি, *আদাবুল কাযি*, খ. ১, পৃ. ২৪৮।

৪৩৫. সুবকি, *তবাকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরা*, খ. ৪, পৃ. ৬৪।

করতেন না। যেমন আব্বাস ইবনে ফিরনাস[৪৩৬] ছিলেন আন্দালুসের বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী। তার হাত ধরে বহু আবিষ্কার সাধন হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, ইতিহাসে তিনিই প্রথম আকাশে উড্ডয়নের প্রয়াস পেয়েছেন। তার এ যোগ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তি তাকে শাসক শ্রেণির সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

এই তাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি, ব্যাপক সুখ্যাতি ও খলিফাদের নিকট সম্মানিত হওয়ার কারণে হিংসুক ও নিন্দুক শ্রেণি তৈরি হয়। জাদু ও ভেলকি চর্চা করে এবং উদ্ভট ও আজব বিষয় নিয়ে সারাদিন ঘরে ও গবেষণার ল্যাবে পড়ে থাকে এ ধরনের অপবাদ আরোপ করতে থাকে তার বিরুদ্ধে। কারণ তিনি ক্যামিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করতেন। ফলে সবসময় তার বাড়ি থেকে এক প্রকার ধোঁয়া উঠতে দেখা যেত।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের জন্য তাকে কর্ডোভার আদালতে ডাকা হয়। তখন খলিফা ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে হাকাম ইবনে হিশাম উমাবি। তাকে বলা হয়, আপনি অনেক উদ্ভট বিষয় নিয়ে পড়ে থাকেন। এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তু সংমিশ্রণ করে অদ্ভুত ও আজগুবি বিষয় আবিষ্কার করেন। এরকম তো আমরা আগে কখনো দেখিনি। এর উত্তরে তিনি বলেন, ধরুন আমি যদি পানির সঙ্গে আটা মিলিয়ে খামিরা তৈরি করি। এরপর আগুনের সাহায্যে ওই খামিরা থেকে রুটি বানাই, তাহলে কি সেটি জাদু হবে? সবাই বলল, না। বরং এই প্রক্রিয়া মহান আল্লাহই মানুষকে শিখিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, বাড়িতে আমি ঠিক এই কাজটিই করে থাকি। এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তু সংমিশ্রণ করে আগুনের সাহায্যে এরকম অনেক বিষয় আবিষ্কার করি, যা মুসলিমদের উপকারে আসবে। তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজে লাগবে।[৪৩৭]

তার এই দাবির যথার্থতা সম্পর্কে আদালত সাক্ষী তলব করলে খলিফা আবদুর রহমান ইবনে হাকাম ইবনে হিশাম নিজেই আদালতে উপস্থিত

---

৪৩৬. আবুল কাসেম আব্বাস ইবনে ফিরনাস : বনু উমাইয়ার শাসনামলের অনারব মুসলিম কবি, দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। প্রথম পাথর থেকে কাচ আবিষ্কার করেন ও আকাশে উড্ডয়নের চেষ্টা করেন। এজন্য পালক পরে ও দুটি ডানা যুক্ত করে দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত ওড়েন। এরপর পড়ে গিয়ে পিঠে আঘাত পান। মৃত্যু ২৭৪ হি.। সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৬ , পৃ. ৩৮০-৩৮১; মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ৩ , পৃ. ৩৭৪।

৪৩৭. ইবনে সাইদ আল-মাগরিবি, *আল-মুগরিব ফি হুলাল মাগরিব*, পৃ. ২০৩।

হয়ে তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তিনি এরকম এরকম কাজ করেন (অর্থাৎ যা-কিছুই করেন, সেজন্য তিনি সুনির্দিষ্ট মূলনীতি অনুসরণ করেন)। আমাকে যা জানিয়েছেন, তিনি তাই করেছেন। আমি মনে করি তার কাজগুলো মুসলিমদের উপকারে আসবে। জাদুবিদ্যার সঙ্গে জড়িত কিছু করতে দেখলে সবার আগে আমিই তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করতাম।

রাষ্ট্রের কর্ণধার ও মুসলিম শাসক নিজেই আদালতে হাজির হয়ে ন্যায়ের সাক্ষ্য দিয়েছেন এই বিজ্ঞানীর পক্ষে। আর বিচারকও ইবনে ফিরনাসের পক্ষে রায় দিয়েছেন। সমকালীন ফকিহগণও তার প্রশংসা করে তার কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আরও বেশি করে উপকারী বিষয় আবিষ্কার করে যেন মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করতে পারেন, সে বিষয়ে তাকে নিয়মিত উৎসাহ প্রদান করছেন। এভাবেই সর্বমহলে তার মর্যাদা সুরক্ষিত হয়।

খলিফা, আমির, শাসকশ্রেণির উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের কেউ ভুল ও অন্যায় কিছু করলে বিচারকগণ তাদের আদালতে হাজির হতে বাধ্য করতেন। *কুযাতু কুরতুবা* গ্রন্থে আল-খুশানি লেখেন, একবার বিচারক আমর ইবনে আবদুল্লাহর কাছে কর্ডোভার একজন সাধারণ দুর্বল নাগরিক এসে আমির মুহাম্মাদের একজন প্রভাবশালী আমলার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সরকারি স্তরে ওই আমলার বিরাট প্রভাব ও দাপট ছিল। নগরপতি হওয়ার মনোনয়ন পেয়েছিল। পরে এক সময় সে গভর্নর হয়ে যায়। ওই দুর্বল লোকটি আদালতে এসে মামলা দায়ের করে যে, বিচারক মহোদয়, অমুক ব্যক্তি আমার বাড়ি জবরদখল করেছে। বিচারক বললেন, আপনি জমির কাগজ নিয়ে তার কাছে যান। তা শুনে দুর্বল লোকটি বলল, আমার মতো দুর্বল ও সাধারণ নাগরিক তার কাছে যাবে জমির দলিল দেখাতে?! নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আমি শঙ্কিত। বিচারক বললেন, আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে জমির কাগজ নিয়ে তার কাছে যান। দেখুন কী হয়। এরপর লোকটি বিচারকের নির্দেশমতো দলিলপত্র নিয়ে তার কাছে যায়। কিছুক্ষণ পর লোকটি ফিরে এসে বলল, বিচারক মহোদয়, আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। দূর থেকে তাকে জমির কাগজ দেখিয়ে পালিয়ে এসেছি। বিচারক আমর বললেন, বসুন। সে আসবে এখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই আমলা সদলবলে এসে উপস্থিত হলো। তার সামনে ছিল অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক নিরাপত্তারক্ষী। এরপর তিনি

পা ভাঁজ করে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বিচারক ও মজলিসে বসা সকলকে সালাম দিলেন। এরপর যথারীতি দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতে মসজিদের দেয়ালে টেক্কা দিয়ে দাঁড়ালেন। বিচারক আমর ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, আপনি ওখানে যান। বাদীর মুখোমুখি হয়ে ওই জায়গায় বসুন। উত্তরে ওই আমলা বললেন, বিচারককে আল্লাহ সংশোধন করুন। এটি মসজিদ। মসজিদে তো কোনো কাঠগড়া নেই। এখানে সব জায়গাই সমান। আমর বলেন, আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে বাদীর সামনে গিয়ে বসুন। বিচারককে তার বক্তব্যে অনড় দেখে তিনি দুর্বল লোকটির সামনে বসতে বাধ্য হলেন। এরপর বিচারক দুর্বল লোকটিকেও বললেন আমলার মুখোমুখি হয়ে বসতে। এরপর তিনি দুর্বল লোকটিকে বলেন, এবার আপনি আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। তিনি বললেন, আমার বক্তব্য হলো এই লোকটি আমার ঘর জবরদখল করেছেন। এরপর আমলার উদ্দেশে বললেন, এখন আপনি আপনার বক্তব্য তুলে ধরুন। তিনি বললেন, আমার বক্তব্য হলো, আমার মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে জবরদখলের অভিযোগ মানহানির শামিল। তার এ কথা শুনে বিচারক বললেন, এ ধরনের বক্তব্য কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির মুখেই মানায়, আপনার মতো মানুষের জমি জবরদখলে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মুখে নয়। এরপর বিচারক আদালতে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কয়েকজনকে বললেন, আপনারা তার সাথে যান। তার ব্যাপারে খেয়াল রাখুন, যদি লোকটিকে তার ঘর বুঝিয়ে দেয় তাহলে তো সমাধান হলো। তা না হলে তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। আমি নিজে আমিরের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। তার সকল অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির কথা বাদশাকে খুলে বলব। এরপর ওই আমলা পুলিশদের সাথে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পুলিশ ও দুর্বল ব্যক্তিটি ফিরে এলো। দুর্বল লোকটি বিচারককে বলল, আজ আপনি যে বিচার করলেন তার জন্য আপনাকে মহান আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। ওই আমলা আমার বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছে। বিচারক বললেন, এবার নিরাপদে বাড়ি ফিরে যান।[৪৩৮]

---

৪৩৮. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ১৫০-১৫১।

এ ধরনের ন্যায্য বিচারের দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় : এক. অভিযোগ দায়ের করা ব্যক্তিকে আদালতে ডাকা হতো বিভিন্ন নিয়মে এবং বিচারকাজ সম্পাদন করা হতো নানা পদ্ধতিতে। দুই. ইসলামি সভ্যতায় বিচারবিভাগ ছিল স্বাধীন। তার প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তিন. বিচারকের সামনে সবাই ছিল সমান। কে দুর্বল, কে সবল, কে প্রভাবশালী, কে আমলা, কে ধনী, কে গরিব এর কোনো তারতাম্য ছিল না। চার. রায় প্রদান ও সিদ্ধান্ত কার্যকর হতো খুব দ্রুত। দুর্বল ওই লোকটির বাড়ি যেদিন জবরদখল করা হয়, ঠিক সেদিনই সে মামলা করে। আর সেদিনই ন্যায্য বিচার পেয়ে সে তার বাড়ি ফিরে পায়।

ইসলামি সভ্যতায় বিচারালয়ের এই অনিন্দ্যসুন্দর বৈশিষ্ট্য ও ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সুমহান এই বিচারব্যবস্থার ছত্রছায়ায় মুসলিম সমাজে ন্যায়, নিষ্ঠা ও ইনসাফের জয়জয়কার ছিল। এই স্বাধীন বিচারবিভাগের অধীনে মুসলিমগণ যে ন্যায়নিষ্ঠা ও সুবিচারের পরিবেশে বসবাস করতেন, ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রায় তা মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

নবম অনুচ্ছেদ

৯.অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ এবং তার উন্নয়ন

খিলাফতের ভূখণ্ডে মানুষের জীবনযাত্রার উপকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচারকার্যক্রমের পাশাপাশি অপরাধ ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ক্রমান্বয়ে এই কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিচারিক পদ হিসেবে এটি আত্মপ্রকাশ করে। এই বিভাগ গঠনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, অনিয়ম, দুর্নীতির করালগ্রাস থেকে সর্বস্তরের মানুষকে মুক্ত রাখা। বিচার কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিচারকগণ এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারতেন না। যার ফলে স্বয়ং খলিফা অথবা তার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন গুরুত্বপূর্ণ কেউ এ বিভাগের কার্যক্রম সরাসরি দেখাশোনা করতেন।[৪৩৯]

এই পদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে খালদুন লেখেন, রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন অথবা ন্যায়বিচারের জন্য বিখ্যাত বিচারক শ্রেণি থেকে নির্বাচন করে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হতো, এজন্য তিনি হতেন প্রবল প্রতাপী ও ক্ষমতাসম্পন্ন; যারা উভয় পক্ষের মধ্য হতে অন্যায়-অবিচারকারীকে দমন করতে পারেন। আসামিকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন। সাধারণ বিচারকগণ যা কার্যকর করতে পারেন না, তারা সাহসের সঙ্গে তা কার্যকর করেন। তাদের দৃষ্টি থাকে প্রমাণ ও উভয় পক্ষের বিবৃতির ওপর। তারা নির্ভর করেন বিভিন্ন নিদর্শন ও আলামতের ওপর। অনেক সময় সত্য অনুসন্ধান করতে তারা রায় বিলম্বিত করেন। উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিপূর্ণ সমাধান বা আপস করেন। সাক্ষীদেরকে হলফ করিয়ে থাকেন। আর এসব কাজ বিচারকদের ক্ষমতার উর্ধ্বে।[৪৪০]

বিখ্যাত লেখক মাওয়ারদি বলেন, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মূল দায়িত্ব ছিল ভীতি প্রদর্শন করে অপরাধ ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের

---

৪৩৯. খুশানি, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ. ৫৪।

৪৪০. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ২২২।

ন্যায়সম্মত অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করা। ভয় দেখিয়ে বাদী-বিবাদীর মুখ থেকে ঘটনার সত্যতা উদ্‌ঘাটন করা। তবে অপরাধ ও দুর্নীতি দমনকারী হবেন সম্মানিত, প্রচণ্ড প্রতাপশালী। দণ্ড কার্যকরে সক্ষম। প্রভাবশালী। সৎ। লোভ-লালসা থেকে মুক্ত। ধার্মিক। কারণ, অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে সেনাপতিদের মতো প্রভাব ও বিচারকদের মতো সিদ্ধান্তে অনড় উভয় প্রকার যোগ্যতার সমাবেশ ঘটবে তার চরিত্রে। আর প্রচণ্ডরকম প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান হওয়ার ফলে উভয় দিক থেকে দণ্ড বিধান করা তার জন্য সহজ হবে।[৪৪১] এ ছাড়াও এ বিভাগে কর্মরতদের আরও যেসব দায়িত্ব ছিল, জনগণের ওপর আমির ও গভর্নরদের অন্যায় আচরণ পর্যবেক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখা, বিভিন্ন শহর ও নগর থেকে আসা রাজস্ব ও কর গ্রহণের ব্যাপারে আমলারা দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে কি না, বিভিন্ন সরকারি বিভাগে কর্মরত কেরানিগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে কি না, নিরাপত্তাবাহিনী, চাকরিজীবীদের, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা আদায়ে কোনোরকম দুর্নীতি করছে কি না বা কালক্ষেপণ করছে কি না, তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে কি না এগুলো তদন্ত করা। তাদের আরও দায়িত্ব ছিল, অপহৃত বস্তুকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হলে ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, না হয়ে থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সাধ্যের বাইরে থাকায় বা রাষ্ট্রীয় কোনো বিষয় হওয়ায় বা প্রভাবশালী কেউ তাতে জড়িত থাকায় যেসব রায় সাধারণ বিচারকগণ প্রদান করতে পারছেন না, বিশেষ ক্ষমতাবলে সেসব রায় প্রদান করা।[৪৪২]

এখান থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ ছিল অধিক প্রভাবশালী। দ্রুত আইন কার্যকর করতে সক্ষম ও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন। অনেকটা বর্তমান সময়ের সুপ্রিম কোর্ট বা প্রশাসনিক, বিচার ট্রাইব্যুনাল Council of State-এর ক্ষমতার মতো। রায় কার্যকর ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ ও এর দায়িত্বশীল ব্যক্তির ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এর বিচারব্যবস্থা ছিল

---

[৪৪১]. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ৬৪।
[৪৪২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

যথার্থ। এ ব্যবস্থা সম্প্রতি অনেক দেশে চালু হলেও ইসলামি সভ্যতায় তা প্রায় বারো শতাব্দী আগে থেকেই চলমান।[৪৪৩]

এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা দরকার। আর তা হলো, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগটি আমাদের বর্তমান সময়ে আরববিশ্বের অনেক দেশে আন্তঃবিভাগীয় প্রশাসনিক বিচার ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা নামে প্রচলিত আছে। মিশরে এ ব্যবস্থার বর্তমান নাম মাজলিসুদ দাওলা (مجلس الدولة–Council of State) আর এই মাজলিসুদ দাওলা (প্রশাসনিক বিচার ট্রাইব্যুনাল) সমগ্র ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে চালু হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। অথচ ফ্রান্সকে আজ সংবিধান ও আইন প্রণয়নের জন্য আদর্শ দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ আঠারো শতকের শেষদিকে ১৭৯৯ সনে প্রণীত সংবিধানের আলোকে প্রাথমিকভাবে তার প্রচলন হয়। আর বর্তমান রূপে এর প্রচলন ঘটে ১৮৭২ সাল থেকে। এর আগে ফরাসি সাম্রাজ্যে রাজসভা নামে একটি বিভাগ চালু ছিল। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইস্যুতে দিক-নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি এই পরিষদের দায়িত্ব ছিল প্রশাসনিক বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা। তবে ফরাসি আইন বিষয়ক ইতিহাসবিদদের বিবৃতি অনুযায়ী ওই বিভাগের কার্যক্রম ছিল লৌকিকতা প্রদর্শন ও ফরাসি গৌরবের প্রকাশ ঘটানোর জন্য, যাকে প্রশাসনিক বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় কখনো দেখা যায়নি। অপরদিকে আমরা যখন উমাইয়া শাসনামলের ইতিহাসে এ কথা পড়ি যে, খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান (মৃ. ৮৬ হি.) অপরাধ ও দুর্নীতি দমনের বিচার কার্যক্রম পরিচালনার আসনে নিজে বসেছেন, তখন এ কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, আন্তঃবিভাগীয় প্রশাসনিক বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় ইসলামি সভ্যতা সেই তেরো শতাব্দী আগেই সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন করে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে। আর ফরাসি বুদ্ধিজীবীগণ তা আবিষ্কার করে বাস্তবায়ন শুরু করেছেন মাত্র এক বা দুই শতক হলো![৪৪৪]

---

৪৪৩. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ১২৮।

৪৪৪. মুস্তাফা আল-বারুদি, *আল-ওয়াজিয ফিল-হুকুকিল ইদারিয়্যা*, পৃ. ৫৭-৫৮; যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকমি ফি-শারিআতি ওয়াত-তারিখ*, খ. ২, পৃ. ৫৫৫।

কোনো সন্দেহ নেই, দুর্নীতি ও আন্তঃবিভাগীয় অপরাধ পর্যবেক্ষণ করে সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তবে সেটি উমাইয়া শাসনামলের মতো প্রাতিষ্ঠানিকরূপে নয়, বরং স্বভাবগত পদ্ধতিতে। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ওই রকম বড় কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, যার দরুন অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগ গঠনের প্রয়োজন ছিল। তবে কিছু কিছু প্রেক্ষাপটে যখন দুর্নীতি চোখে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুধরে দিয়ে কঠোরভাবে উম্মতকে তা থেকে সতর্ক করেছেন। একবার ইবনুল উতবিয়া আযদি রহ. নামক এক সাহাবিকে তিনি বনু সুলাইম গোত্রের সদকা উসুলের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। আবু হামিদ সাইদির বর্ণনায় সে ঘটনার আদ্যোপান্ত উঠে এসেছে। তিনি বলেন, ওই সাহাবি সদকা উসুল করে নিয়ে আসার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হিসাব করে বলল, এই নিন আপনার অর্থ, আর এই হচ্ছে আমার অর্জিত হাদিয়া। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে হাদিয়া পৌঁছে যেত! এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে এমন কোনো কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ শেষ করে এসে বলে, এই হলো তোমাদের মাল আর এ হলো আমাকে দেওয়া হাদিয়া। তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরেই বসে থাকল না, সেখানে এমনিতেই তার কাছে হাদিয়া পৌঁছে যেত! আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায়ভাবে কোনোকিছু গ্রহণ করবে, সে কেয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আমি তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিদের খুব ভালো করেই চিনতে পারব। সে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে উট বহন করে, আর উট আওয়াজ করতে থাকবে। অথবা গাভি বহন করে, আর সেটা হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে। অথবা ছাগল বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে।[৪৪৫]

---

৪৪৫. *বুখারি*, হাদিস নং ৬৭৫৩; *মুসলিম*, হাদিস নং ১৮৩২।

আল্লাহর রাসুলের ইনতেকালের পর ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যাবতীয় অনিয়ম ও অবিচার দূর করে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি তার প্রথম ভাষণে বলেন,

> হে লোকসকল, আমাকে আপনাদের আমির বানানো হয়েছে। তবে আমি আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নই। আমি ন্যায়ের পক্ষে কাজ করলে আমাকে সহযোগিতা করবেন। অন্যায় কিছু করলে আমাকে শুধরে দেবেন। সততাই বিশ্বস্ততা, মিথ্যাই বিশ্বাসঘাতকতা। আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল, তার হক যথাযথভাবে আদায় করার ব্যাপারে আমার কাছে সেই শক্তিশালী। আর আপনাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, তার কাছ থেকে প্রকৃত অধিকার আদায় করার ব্যাপারে আমার কাছে সে অত্যন্ত দুর্বল।[৪৪৬]

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামল থেকে অপরাধ ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রতিবার হজের মওসুমে বিভিন্ন শহর ও রাজ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত আমির ও গভর্নরদের জমায়েত করে তাদের ব্যাপারে জনগণের অভিযোগ শুনতেন। শাসক ও গভর্নরদের মধ্যে কেউ অন্যায় কিছু করলে তাদের শাস্তি দিতেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গভর্নরদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি করার ব্যাপারে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. অনুসরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে তার গৃহীত পদক্ষেপ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে নিম্নবর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে। মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রা.-এর এক পুত্র একবার এক মিশরীয়কে চপোটাঘাত করে, যে দৌড় প্রতিযোগিতায় তাকে হারিয়ে দিয়েছিল। সেই অন্যায়ের বিচার সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, একবার মিশর থেকে এক লোক এসে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি অন্যায় থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। উমর রা. বললেন, তুমি আশ্রয় পেয়ে গেছ। বলো তোমার অভিযোগ। সে বলল, আমি আমর ইবনুল আসের এক পুত্রের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। একপর্যায়ে

---

৪৪৬. ইবনে হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ. ৬, পৃ. ৮৬।

আমি জয়ী হয়ে গেলে সে আমাকে চাবুক দিয়ে পেটায় আর বলতে থাকে, আমি ইবনুল আকরামাইন (দ্বৈত সম্মানের অধিকারীর সন্তান)। এরপর উমর রা. পত্র লেখেন আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে। পত্রে তিনি তার ওই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে খিলাফতের রাজধানী মদিনায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন। খলিফার নির্দেশমতো পুত্রকে নিয়ে তিনি দ্রুত মদিনায় চলে আসেন। উমর রা. বললেন, ওই মিশরীয় কোথায়? মিশরীয়কে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন, চাবুক হাতে নাও এবং আমরের পুত্রকে পেটাও। এরপর লোকটি তাকে পেটাতে লাগল। উমর বলতে লাগলেন, পেটাও পেটাও। ইবনুল আকরামাইনকে পেটাও। আনাস বলেন, এরপর লোকটি তাকে বেদম প্রহার করতে থাকে। আল্লাহর শপথ, সে তাকে চাবুক দিয়ে মারতে থাকে। আর আমরাও চাচ্ছিলাম তাকে মারুক (তার দম্ভ চূর্ণ হোক)। একপর্যায়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমরা চাচ্ছিলাম এবার যেন ক্ষান্ত হয়। এরপর উমর রা. ওই মিশরীয়কে বললেন, চাবুকটি তুমি আমর ইবনুল আসের মাথায় রাখো। সে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমাকে প্রহার করেছে তার পুত্র। আর এখন আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি। এরপর আমর ইবনুল আস রা.-এর উদ্দেশে উমর রা. বললেন, কখন থেকে তোমরা মানুষকে দাস বানিয়ে ফেলেছ?! অথচ মায়েরা পৃথিবীর বুকে তাদের স্বাধীন করে জন্ম দিয়েছে! আমর রা. উত্তর দিলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, এ ঘটনাটি আমার জানা ছিল না। বিচারের জন্যও সে আমার কাছে আসেনি।[৪৪৭]

অন্য কোনো সভ্যতায় এরকম ঘটনা কিংবা এর কাছাকাছিও কোনো নজির খুঁজতে গেলে আমাদের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হতে হয়। পিতার সামনে পুত্রের ওপর এরকম প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। তাও আবার যেমন তেমন পুত্র নয়, মিশরের শাসকের পুত্র। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার সামনে সকল মানুষ একসমান। ইসলাম জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদে বিশ্বাসী নয়।

উমাইয়া শাসনামলে বিখ্যাত খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এ বিভাগের প্রধান হিসেবে নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেন। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। সেটি হলো, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন

---

৪৪৭. আল-মুত্তাকি হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*, খ. ১২, পৃ. ৬৬০; ইবনুল জাওযি, *মানাকিবু উমার*, পৃ. ৯৯।

বিভাগের প্রধান হতে গেলে তাকে শরিয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। কুরআন-হাদিসের সরাসরি নস থেকে ইজতেহাদ করে নীতিমালা বের করার যোগ্যতা থাকতে হবে। তার মানে এই বিভাগের প্রধানকে হতে হবে বিজ্ঞ ফকিহ ও অভিজ্ঞ আলেম। ইসলামি সভ্যতায় যে-সকল খলিফা এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন, তারা সবাই ফিকহ, তার শাখাগত মূলনীতি ও বিধানাবলি সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলেন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে যারা এ বিভাগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নামটি সেই তালিকায় প্রথম সারিতে থাকবে। এই শাসকগণ যথেচ্ছ ফতোয়া প্রদান করতেন না বা ফিকহের মূলনীতির বাইরে গিয়ে কোনো দণ্ড কার্যকর করতেন না।

এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিযের শাসনামলে দুর্নীতি দমন বিভাগে আরও সম্প্রসারণ ঘটে। তার শাসনামলে একবার বসরার গভর্নর আদি ইবনে আরতাত (মৃ. ১০২ হি.) এক লোকের জমি জবরদখল করে। এরপর ওই লোক আদির ব্যাপারে অভিযোগ করতে সোজা উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী দামেশকে চলে আসে। ইবনে আবদুল হাকাম সেই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, একদিন উমর ইবনে আবদুল আযিয ঘর থেকে বের হলেন। এক লোক বাহনে করে তার বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। এরপর বাহনটি বসিয়ে ওই লোক নেমে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, উমর ইবনে আবদুল আযিয কোথায়? উত্তর এলো, তিনি একটু বাড়ির বাইরে গেছেন। এখনই চলে আসবেন। এরপর উমর চলে এলে লোকটি তার কাছে আদি ইবনে আরতাতের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তা শুনে উমর বললেন, আল্লাহর শপথ! তার ওই কালো পাগড়ি দেখেই আমরা ধোঁকা খেয়েছি। আমি তার কাছে ওসিয়ত লিখেছিলাম, যে ব্যক্তি প্রমাণসহ তোমার কাছে আসবে, তার কাছে তুমি তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু সেই ওসিয়ত থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে এবং তোমাকে আমার কাছে আসতে বাধ্য করেছে। এরপর উমর ওই লোকের জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবার তাকে পত্র লেখেন। পরক্ষণে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ পর্যন্ত আসতে আপনার কত খরচ হয়েছে? সে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমার জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপরও আমার পথখরচ জিজ্ঞেস করছেন! ওই

জমিই তো আমার কাছে এক লাখ দিরহামের চেয়ে বেশি মূল্যবান। তখন উমর বললেন, যা আপনার প্রাপ্য ছিল সেটিই আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন বলুন, এখানে আসতে কত খরচ হয়েছে? সে বলল, আমি তো হিসাব করিনি। উমর বললেন, অনুমান করুন। সে বলল, ষাট দিরহামের মতো হবে। এরপর উমর ইবনে আবদুল আযিয বাইতুল মাল থেকে তাকে ষাট দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেন।[৪৪৮]

এ ঘটনায় আমিরুল মুমিনিনের পদক্ষেপ দেখে অবাক হতে হয়। সাংস্কৃতিক, সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অন্যান্য সব দিক থেকে সমৃদ্ধ একটি রাষ্ট্রের প্রধান হয়ে সাধারণ একজন নাগরিকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক গভর্নরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। শুধু তাই নয়, বাদীকে রাজধানী দামেশক পর্যন্ত আসতে যে খরচ হয়েছে তাও তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন। এটিই ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্য, এটিই ইসলামের কৃষ্টি। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের যথাযথ অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য পোষণের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ ঘটনা।

হিজরি পঞ্চম শতকে আব্বাসি শাসনামলে অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। এ বিভাগের স্বতন্ত্র কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক আমাদের বর্তমান সময়ের মন্ত্রণালয়ের মতো। এ বিভাগের যে লোকবল ছিল বিখ্যাত লেখক মাওয়ারদি তার বিবরণ খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। তারা হলেন,

এক. বিশেষ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এদের কাজ ছিল ক্ষমতাশালী আসামিদের গ্রেফতার করে তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা। সাহসী ও অভিজ্ঞ সেনাপতিগণ এ দায়িত্ব পালন করতেন। বিচারবিভাগের বিশেষ পুলিশ বাহিনীও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দুই. বিচারক ও জজ। তারা প্রকৃত মালিকের অধিকার প্রমাণের জন্য তদন্ত কাজে নিয়োজিত থাকতেন। অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়িত্বশীলগণ যেসব বিচারিক বিধি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতেন, সেসব বিধান তাদের জানানোই ছিল এদের কাজ।

---

[৪৪৮]. ইবনে আবদুল হাকাম, *সিরাতু উমার ইবনে আবদুল আযিয*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

তিন. ফকিহ শ্রেণি। যেসব বিষয় দুর্বোধ্য ও জটিল মনে হয় সেগুলো ফকিহদের কাছে পেশ করা হতো। তারাই এগুলোর সুষ্ঠু সমাধান দিতেন।

চার. লেখক শ্রেণি। বাদী-বিবাদীর মাঝে চলমান মামলার ধারা ও পারস্পরিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ করার কাজ করতেন।

পাঁচ. সাক্ষী। যথাযথ অধিকার প্রমাণে সাক্ষ্য প্রদান করা ও বিধান প্রমাণের দায়িত্ব ছিল এই শ্রেণির।

আব্বাসি শাসক ও খলিফাগণও অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হলো, একবার এক লোক আবু জাফর মনসুরের দরবারে এলো। আবু জাফর তখন আপন ভাই আবুল আব্বাস আস-সাফফাহের শাসনামলে আরমেনিয়ায় অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ওই লোকটি বলল, আমার একটি অভিযোগ আছে। অভিযোগটি বলার আগে আমি একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। আবু জাফর বললেন, বলুন। সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি। তিনি সকল সৃষ্টিকে অনেকগুলো স্তরে সৃষ্টি করেছেন। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সবার আগে সে তার মাকেই চেনে। একমাত্র মায়ের কাছেই সবকিছু প্রার্থনা করে। ভয় পেলে দৌড়ে তার মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। এরপর সে পরবর্তী স্তরে পদার্পণ করে। তখন সে বুঝতে পারে মায়ের চেয়ে পিতার ক্ষমতা বেশি। তখন বিপদে পড়লে সে তার বাবার কাছে আশ্রয় নেয়। এরপর সে বড় হয়। পরিণত বয়সে পৌঁছে। তখন কোনো সমস্যায় জর্জরিত হলে সে বাদশার কাছে অভিযোগ করে। কেউ তার প্রতি অবিচার করলে বাদশার মাধ্যমে তার বিচার প্রার্থনা করে। তবে বাদশা নিজেই যদি তার প্রতি অন্যায় করে, তখন একমাত্র প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাওয়া বা রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। আমার বেলায় ঠিক সেরকমটিই ঘটেছে। ইবনে নাহিক তার এলাকায় অবস্থিত আমার একটি জমির ব্যাপারে আমার প্রতি অবিচার করেছে। এখন আপনিই এর বিচার করুন। হৃত ভূসম্পত্তি আমাকে ফিরিয়ে দিন। তা না হলে মহান আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না। এবার আপনার ইচ্ছা, চাইলে বিষয়টি তদন্ত করতে

পারেন অথবা খারিজ করতে পারেন। তার কথা শুনে আবু জাফর বিচলিত হয়ে বলেন, তোমার অভিযোগটি আবার বলো। এরপর দ্বিতীয়বার অভিযোগটি পেশ করার পর আবু জাফর বললেন, প্রথম পদক্ষেপ হলো, সবার আগে ইবনে নাহিককে আমি রাজপ্রহরী প্রধানের পদ থেকে বিচ্যুত করছি। এরপর ইবনে নাহিককে ওই লোকের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৪৪৯]

সে সময় জনগণের জন্য শাসকের কাছে গিয়ে স্বয়ং শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার অধিকার ছিল। এটি ছিল ইসলামি সভ্যতার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সুমহান দৃষ্টান্ত। মিসওয়ার ইবনে মিসাওয়ার নামক এক ব্যক্তি বলেন, একবার খলিফা আল-মাহদির একজন উকিল অন্যায়ভাবে আমার জমি দখল করে নেয়। এরপর সে বিষয়ে প্রতিকার চাইতে আমি তখনকার অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের প্রধান সাল্লামের কাছে অভিযোগ দায়ের করি এবং তাকে ছোট্ট একটি চিরকুট প্রদান করি। চিরকুটটি তিনি খলিফা আল-মাহদির কাছে পৌঁছান। সেই মুহূর্তে তার কাছে আপন চাচা আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ এবং বিচারক আল-আফিয়াত উপস্থিত ছিলেন। চিরকুট পড়ে আল-মাহদি বললেন, তাকে এখানে নিয়ে এসো। এরপর আমি রাজদরবারে উপস্থিত হলে আল-মাহদি আমাকে বললেন, কী হয়েছে বলুন! আমি বললাম, আপনি আমার প্রতি অন্যায় করেছেন। তিনি বললেন, এখানে দুজন বিচারক উপস্থিত আছেন (অর্থাৎ আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ এবং আফিয়াত আল-কাযি)। বিচারক হিসেবে এ দুজনকে আপনার পছন্দ হয়? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আসুন। এরপর কাছে গিয়ে আমি রাজগালিচার ওপর বসি। তিনি বললেন, এবার আপনার অভিযোগ বলুন। আমি বললাম, আল্লাহ বিচারককে বিবাদ মেটানোর তাওফিক দিন। আমার অভিযোগ হলো, তিনি আমার ভূসম্পত্তির ব্যাপারে আমার প্রতি অবিচার করেছেন। বিচারক বললেন, আপনার মতামত বলুন হে আমিরুল মুমিনিন। তিনি বললেন, আমার অধিকারে যা আছে তা আমারই সম্পত্তি। আমি বললাম, আল্লাহ বিচারককে বিবাদ মেটানোর তাওফিক দিন! আপনি খলিফাকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি খলিফা হওয়ার আগে থেকেই এই জমির মালিক

---

৪৪৯. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৩২, পৃ. ৩৯২।

ছিলেন, নাকি খলিফা হওয়ার পর? এরপর বিচারক খলিফাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, খলিফা হওয়ার পর মালিক হয়েছি। তখন বিচারক বললেন, এই জমি আপনি তাকে দিয়ে দিন। খলিফা বললেন, ঠিক আছে দিয়ে দিলাম। এরপর বিচারক আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ বললেন, আল্লাহর শপথ! হে আমিরুল মুমিনিন, এই মুহূর্তটি আমার কাছে বিশ লাখ দিরহামের চেয়েও বেশি মূল্যবান![৪৫০]

ইসলামি সভ্যতা রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। বিচার প্রয়োগের বেলায় ইসলামি শরিয়া ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করেনি যেমনটা করেছিল সমকালীন রোমান ও পারস্যসভ্যতা। অথচ ইসলামপূর্ব আরব সমাজেও সেই বর্ণবৈষম্য প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইসলামি সভ্যতা আসার পর সেই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এমনকি স্বয়ং খলিফাও বিচারব্যবস্থার একজন সাধারণ নাগরিক বিবেচিত হতেন। আর যারা দণ্ড কার্যকরের দায়িত্ব পালন করতেন, তারাও ছিলেন সাধারণ মুসলিম, যারা হয়তো বড় কোনো গোত্রের বা পদের অধিকারী ছিলেন না। ইসলামি সভ্যতা কত উঁচু, কত মহান, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কত সফল, এর দ্বারা সেটিই প্রমাণ হয়। আরও প্রতীয়মান হয়, ইসলামি সভ্যতা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের যথাযথ মর্যাদা দিতে সমর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আমরা দেখতে পাই, অনেক খলিফা অসুস্থ মায়ের সেবা-শুশ্রূষার চেয়ে অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্ণিত আছে, খলিফা আল-হাদি (মৃ. ১৭০ হি.) একদিন তার অসুস্থ মা খিযরানকে দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহনে চড়লেন। ঠিক সে সময় উমর ইবনে বাযি এসে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনার কাছে এমন একটি বিষয় পেশ করছি যার সেবা করা আপনার জন্য আরও বেশি দরকার। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কোনটি? তিনি বললেন, দুর্নীতি দমন বিভাগের কার্যক্রম। তিন দিন হলো আপনি সেই বিভাগের কোনো মামলা দেখেননি। এরপর তিনি পদাতিক বাহিনীকে বললেন, ওই বিভাগের কার্যালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করো। আর

---

৪৫০. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৫৮৬।

মা খিযরানের কাছে একজন সেবককে পাঠিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তিনি বলে দিলেন, মাকে গিয়ে বলবে, আপনার কাছে আসার উদ্দেশ্যে বাহনে চেপেছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে উমর ইবনে বাযি এসে এমন বিষয় উত্থাপন করল, যা সমাধান করা আপনাকে দেখতে আসার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজ আমরা সেই কাজ পূর্ণ করতে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা আপনাকে দেখতে আসছি।[৪৫১]

আব্বাসি খলিফা আল-মামুন সপ্তাহের প্রতি রোববার এ বিভাগের অধীনে দুর্নীতির মামলার তদন্তে বসতেন। একদিন তিনি মামলার অভিযোগ শোনার জন্য বসেছিলেন, এমন সময় জীর্ণ কাপড় পরিহিত এক নারী এসে কবিতার ভাষায় তার অনুযোগ পেশ করল,

يا خير منتصف يهدى له الرشد ☆ ويـا إماما بـه قد أشرق البلد

تشكو إليك عميد الملك أرملة ☆ عدا عليها فما تقوى به أسد

فابتز منهـا ضيـاعا بعد منعتها ☆ لما تفرق عنهـا الأهل والـولد

যার সারমর্ম হলো,

> হে ন্যায়ের ঝান্ডাবাহী, শ্রেষ্ঠ সুবিচারক; হে দিগ্‌বিজয়ী শাসক, হে রাষ্ট্রের কর্ণধার, স্বামীহারা একজন নারী আপনার কাছে অনুযোগ করছে। এক ব্যক্তি তার প্রতি অবিচার করেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা তার নেই। ওই নারীর পরিবার ও সন্তান যখন আলাদা হয়ে গেছে, তখন একাধিকবার নিষেধ করার পরও হুমকি-ধমকি দিয়ে ওই লোকটি তার জমি ছিনিয়ে নিয়েছে।

কবিতা শুনে খলিফা মামুন মাথা নিচু করে ফেললেন। একটু পর মাথা উঁচিয়ে বললেন,

من دون مـا قلت عيل الـصبر والجلد ☆ وأقـرح القلب هـذا الحزن والكمد

هـذا أوان صـلاة الـظهـر فـانصـرفي ☆ وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد

المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا ☆ أنصفك منـه وإلا المـجلس الأحـد

---

৪৫১. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৬১০।

আপনার অভিযোগ শুনে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। প্রচণ্ড উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন যোহরের নামাযের সময়। আপনি ফিরে যান। যেদিন আমি বলি সেদিন বিবাদীকে নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হবেন। শনিবারের মজলিসে যদি সব মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায়, তাহলে আপনার বিষয়টি দেখব। অন্যথায় রোববারের মজলিসে এ বিষয়টি মীমাংসা করব।

এরপর ওই নারী চলে গেল। রোববার দিন সে সবার আগে চলে এলো। তাকে দেখে খলিফা আল-মামুন বললেন, বিবাদী কে? সে বলল, আপনার পাশে দাঁড়ানো আমিরুল মুমিনিনের পুত্র আব্বাস। এরপর খলিফা বিচারক ইয়াহইয়া ইবনে আকসামকে ডেকে বললেন, ওই নারীর সঙ্গে বসে মামলার নিষ্পত্তি করুন। এরপর খলিফার উপস্থিতিতে উভয়ের মাঝে বিচার সম্পাদনের একপর্যায়ে ওই নারী উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে শুরু করলে রাজপ্রহরীগণ তাকে ধমক দেওয়ার চেষ্টা করল। তাদের দেখে খলিফা মামুন বললেন, তাকে হক কথা বলতে দাও। মিথ্যা আজ পরাভূত হবে। এরপর তিনি ওই নারীর হৃত ভূসম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বললেন। এখানে খলিফা নিজে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বিচার নিষ্পত্তির ভার তুলে দিয়েছেন বিচারকের হাতে। এর দুটি কারণ হতে পারে। এক. এখানে বিচার সম্পাদন হচ্ছে নিজ পুত্রের। রায় তার পক্ষেও যেতে পারে আবার বিপক্ষেও। তবে খলিফা নিজে তার পুত্রের বিপক্ষে রায় প্রদান বৈধ হলে পক্ষে রায় প্রদান করলে সেটিতে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার আভাস পাওয়া যায়। আর পুত্রের বিপক্ষে রায় প্রদান বৈধ হলেও পক্ষে রায় প্রদান বৈধ নয়। দুই. এখানে বাদী যেহেতু একজন নারী, তাই খলিফা তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এড়িয়ে যেতে চাইলেন এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে বেশি মনোযোগ দিলেন।[৪৫২]

অবিচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গভর্নরদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার লক্ষ্যে খলিফা মনসুর যখনই কোনো কমকর্তাকে পদচ্যুত করতেন, তার সমুদয় অর্থ ও পাওনা বাইতুল মালে হস্তান্তর করতেন। এটির নাম দিতেন দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের অর্থ তহবিল। এরপর

---

৪৫২. মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

ওই অর্থের ওপর তার নামও লিখে দিতেন।[৪৫৩] তবে এই প্রক্রিয়া খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল কেবল গভর্নরদের ভয়ে রাখা এবং তাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। এ কারণেই খলিফা মনসুর শেষদিকে পুত্র আল-মাহদিকে ওসিয়ত করে যান, আমি তোমার জন্য একটি তালিক প্রস্তুত করেছি। যাদের অর্থ আমি বাইতুল মালে জমা করেছি, আমার মৃত্যুর পর তাদের সে অর্থ তুমি ফিরিয়ে দিয়ো। তাহলে তাদের কাছে এবং জনসাধারণের সামনে তোমার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। পিতার ওসিয়ত অনুযায়ী আল-মাহদি তাই করেন।[৪৫৪]

অপরদিকে আন্দালুসে এ বিভাগের পরিচিতি ঘটে خطة المظالم (দুর্নীতি দমন কমিশন) নামে। যা আন্দালুসে উমাইয়া শাসনামলের একেবারে গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সে বিভাগের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও পরিধি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় খিলাফত আমলের চতুর্থ শতাব্দীতে।

মরক্কো এবং আন্দালুসে এ বিভাগের ব্যতিক্রমধর্মী উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটে। যা প্রাচ্যের উমাইয়া ও আব্বাসি শাসনামলে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে অনেকটা ভিন্নরকম ছিল। কারণ সে বিভাগের পদটি ছিল প্রধান বিচারপতির পদের অব্যবহিত পরেই। প্রাচ্যে যাকে কাযিউল কুযাত বলা হতো। আর মরক্কো এবং আন্দালুসে কোনো আমির বা খলিফা এই পদের জন্য নির্বাচিত হননি। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এ কারণেই সেখানে এ পদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্তদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম ও ফকিহ শ্রেণির। আফ্রিকায় এ পদে নিয়োজিত সবচেয়ে বিখ্যাত বিচারক ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (মৃ. ৩৯৮ হি.)। যার ব্যাপারে ইবনে ইযারির মূল্যায়ন, দুর্বৃত্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জন্য তিনি ছিলেন ত্রাস। যত ক্ষমতাবান ও প্রতাপীই হোক, ধরে ধরে তাদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতেন। প্রহার করতেন। হত্যা করতেন। হাত বা পা কেটে দিতেন। এ ব্যাপারে কারও হুমকি-ধমকির তোয়াক্কা করতেন না তিনি।[৪৫৫]

আন্দালুসে যারা এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের অনেকের সুনাম ও সুখ্যাতি সরকারি-বেসরকারি সব মহলে বিপুলভাবে ছড়িয়ে

---

৪৫৩. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ২২৪।

৪৫৪. প্রাগুক্ত।

৪৫৫. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, পৃ. ১১২।

পড়ে। তাদের অনেকে আবার রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন প্রশাসনিক পদে উন্নীত হন। আবু মুতাররিফ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসা ইবনে ফাতিস অপরাধ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়িত্ব পান আল-মনসুর মুহাম্মাদ ইবনে আবু আমিরের শাসনামলে। তার নীতি ছিল খুবই কঠোর। সংকল্প ছিল অদম্য। দুর্বৃত্তি ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত লোকেরা তাকে মারাত্মকভাবে ভয় করত। উযিরদের সঙ্গেও তিনি মতামত শেয়ার করতেন। শেষ পর্যন্ত উন্নতি করতে করতে কর্ডোভার বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হন। সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভাগের দায়িত্বও ছিল তার কাঁধে। আন্দালুসে এর আগে খুব কম ব্যক্তিই এরকম বহু প্রতিভা ও একাধিক পদের অধিকারী হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৪৫৬]

খলিফাদের অনুকরণে অনেক প্রাদেশিক গভর্নরও দুর্নীতি দমন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মিশরের বিখ্যাত ইখশিদি শাসক আবুল মিসক আল-কাফুর সপ্তাহের প্রতি শনিবার এ বিভাগের বিচার-মীমাংসার জন্য বসতেন। আমৃত্যু তিনি এ রীতির ওপর অটল ছিলেন।[৪৫৭] তেমনই সেলজুক শাসকগণও একই রীতি অবলম্বন করেন। আমির তুঘরিল বেগ সপ্তাহের দুই দিন এ বিভাগের বিচার কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য নির্দিষ্ট করেন। সকল সেলজুক আমির নিজ নিজ রাজ্যে একই রীতির প্রচলন করেন।[৪৫৮] আইয়ুবি সাম্রাজ্যের সুলতান আল-আযিয প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এ বিভাগের কার্যক্রম দেখাশোনা করতেন।[৪৫৯] মরক্কোর সাদি সাম্রাজ্যেও (৯৬১-১০৬৯ হি.) একই নিয়ম প্রচলিত ছিল। সুলতান আহমাদ আল-মনসুর (মৃ. ১০১১ হি.) এ বিভাগের কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে তার নাম দেন 'আদ-দিওয়ান'। প্রতি বুধবার সেই দিওয়ান-সভা বসত এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সেখানে পরামর্শ হতো। যারা অন্য সময় সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে পারত না, এ দিন তারাও সুলতানের কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করার সুযোগ পেত।[৪৬০]

---

৪৫৬. নাবাহি, *তারিখু কুযাতিল উন্দুলুস*, পৃ. ৮৬।

৪৫৭. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ৪, পৃ. ৩১৫।

৪৫৮. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮২।

৪৫৯. মাকরিযি, *আস-সুলুক*, খ. ১, পৃ. ২৪৭।

৪৬০. নাসিরি, *আল-ইসতিকসা লি-আখবারিল মাগরিবিল আকসা*, খ. ৫, পৃ. ১৮৮।

মামলুকি শাসকগণও দুর্নীতি দমন বিভাগকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে সেই বিভাগ পরিচালনার জন্য বিশিষ্ট বিচারক ও বিখ্যাত ফকিহদের দায়িত্ব প্রদান করেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও তাতে হস্তক্ষেপ করতেন। ৬৬১ হিজরির ঘটনাসমগ্র বর্ণনা করতে গিয়ে মাকরিযি লেখেন, আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী দুই ব্যক্তি মিশরের সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স আল-বুন্দুকদারির (মৃ. ৬৭৬ হি.) দরবারে এলো। তাদের একজনের নাম ছিল ইবনুল বাওরি আর দ্বিতীয়জনের নাম মুকাররম ইবনে যাইয়াত। তাদের সঙ্গে কিছু কাগজ ও নথি ছিল। তাতে আত্মসাৎকৃত অর্থ উদ্ধারের বিবরণ উল্লেখ ছিল। সুলতান মঙ্গলবার তার ষষ্ঠ যুবরাজ, সহযোগী, বিচারকবৃন্দ ও ফকিহদের ডাকলেন এবং তাদের সামনে সেই নথি পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। এরপর নথি পড়া শুরু হলো। দুর্নীতির বিবরণ পড়ার সময় তা এড়িয়ে যেতে লাগলেন এবং জড়িতদের নির্দোষ আখ্যায়িত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত নথি পাঠ সমাপ্ত হলে সুলতান বললেন, মনে রাখবেন, নিশ্চয় আমি একমাত্র আল্লাহর জন্য ছয় লাখ দিনার অনুমোদন করেছি যা বিভিন্ন ব্যবহৃত বস্তু সংরক্ষণ ও সংশোধনের কাজে ব্যয় হয়েছে। পথিক, দাস, দাসিনী ও খেজুরবৃক্ষ প্রতিপালনের কাজে খরচ হয়েছে। ফলে মহান আল্লাহ এর চেয়ে বেশি অর্থ হালাল উপায়ে আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি সকল বিভাগ থেকে অর্থের সুষ্ঠু ব্যয়ের হিসাব চেয়েছিলাম আর তা দুর্নীতির সকল অর্থ বাদ দিয়েও অনেক বেশি হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কিছু বর্জন করবে, মহান আল্লাহ এর চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে তার বিনিময় দেবেন। সুলতান এরপর ইবনুল বাওরিকে সেই নথি প্রচার করার নির্দেশ দিলেন।[৪৬১]

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতান রাজ্যের সকল বিভাগ ও মন্ত্রণালয় থেকে হিসাব গ্রহণ করতেন। মন্ত্রী, আমলা, বিচারবিভাগ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তেমনই জনগণের অর্থসম্পদ নষ্ট করার ব্যাপারে ফকিহগণও তাদের কাছে কৈফিয়ত চাইতেন। বারবার তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। সুলতান বিষয়টি নিজের অধিকারে নয় প্রমাণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছেড়ে দেন। এর পেছনে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনগণের অর্থের সুরক্ষা ও

---

৪৬১. মাকরিযি, *আস-সুলুক*, খ. ১, পৃ. ৫৬০।

সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। বরং যে দুই ব্যক্তি এ নথিপত্র নিয়ে আসেন তাদের একজনকে সুলতান পদচ্যুত করেন। তার ব্যাপারটি প্রচার করার জন্য এবং পুরো কায়রো শহরে তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য সুলতান নির্দেশ প্রদান করেন। কারণ সুলতান তখন পর্যন্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত জানতেন না।

জনগণের অর্থের ব্যাপারে অভিযোগ ও বিচার কার্যক্রম দেখাশোনা করতে মামলুকি সুলতানদের অনেকে সরকারি ক্ষেত্রগুলোতে চলে যেতেন। এমনই একজন ছিলেন সুলতান সাইফুদ্দিন বারকুক (মৃ. ৮০১ হি.)। ৭৯২ হিজরির ঘটনাসমগ্র বর্ণনা করতে গিয়ে মাকরিযি লেখেন, সুলতান বারকুক যথারীতি দুর্গের বাইরে এসে দুর্নীতির মামলা ও অভিযোগ শোনার জন্য জনগণের সামনে বসতেন। মানুষও তার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। প্রচুর পরিমাণ অভিযোগ নিয়ে আসত। যার ফলে বড় বড় সরকারি মন্ত্রী-আমলাগণ সবসময় তটস্থ থাকতেন। কার বিরুদ্ধে কখন অভিযোগ চলে আসে সেজন্য সবাই সাবধান থাকতেন।[৪৬২]

ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে খলিফা ও শাসকদের এ মহান উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার দ্বারা এটিই প্রমাণ হয় যে, রাজ্যের কোনো মানুষই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। ভুল করলে এর শাস্তি তাকে পেতেই হবে, তা সে যত ক্ষমতার অধিকারীই হোক। এ ব্যাপারে কে আমির, কে সাধারণ নাগরিক, কে ধনি, কে গরিব এর কোনো তারতম্য ছিল না। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো মানুষই বিচারের আওতার বাইরে নয়, এমনকি আমির, গভর্নর, সেনাপতি, উযির, মন্ত্রী এবং রাজ্যের ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গও বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন। ইসলামি সভ্যতা কত মহান, কত ন্যায়পরায়ণ এ ঘটনাগুলোর দ্বারা তারই প্রমাণ মিলে। পারসিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, এমনকি বর্তমান সময়ের আন্তর্জাতিক আদালতও ইসলামি সভ্যতার সমপর্যায়ের হওয়া তো দূরের কথা, ধারেকাছেও আসতে পারেনি। কারণ, জালিম যত বড় ও প্রতাপশালীই হোক, ইসলাম তার ওপর যথাযথ দণ্ড প্রয়োগ করে সবার জন্য তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। আজকের সভ্য (!) পৃথিবীতে এরকম নজির দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

[৪৬২]. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৮৬।

এরপরও আমরা বলব, ইসলামি সভ্যতায় বিচারব্যবস্থা যেরকম স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করত, তার বিশদ বিবরণ সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এটি নিতান্তই দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু যেসব ঘটনা ও পদক্ষেপের বিবরণ আমরা এ কয়েক পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি, তার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি সভ্যতাই বিচার সংক্রান্ত আধুনিক বিধিবিধান ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার এমন সব সংবিধান ও নিয়মকানুন আবিষ্কার করেছে, যেগুলো বর্তমান সময়ের সংবিধান প্রণয়নকারী সংগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সংস্থার জন্য উত্তম আদর্শ ও প্রধান ভিত্তি ছিল এবং দেশ পরিচালনার পথে সরল ও সুন্দর পদ্ধতি ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ[৪৬৩]

স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা বিভাগ

ইসলামি সভ্যতা মানুষের শারীরিক ও আত্মিক প্রয়োজনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছে, শরীরের যত্ন ও সুস্থতায় গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং একে একটি আবশ্যিক উদ্দেশ্য বলে স্থির করেছে। এটি ইসলামি সভ্যতার একটি মৌলিক ও অনুপম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুখময় ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে চেয়েছে, যেখানে স্বাস্থ্য হবে সবল ও সুঠাম এবং আত্মা হবে আলোকিত ও জ্যোতির্ময়। ইসলামি সভ্যতার রূপকার মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

«إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»

নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার শরীরের হক রয়েছে।[৪৬৪]

রোগ-ব্যাধির জন্ম ও প্রাদুর্ভাব যাতে না ঘটে তার জন্য ইসলাম সুরক্ষাব্যবস্থা দিয়েছে। রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ হলে পর্যাপ্ত চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ করেছে। এসব বিষয়ে আমরা জেনেছি। আমরা আরও জানব যে, স্বাস্থ্যসেবার ময়দানে ইসলামি সভ্যতার ভিত কতটা শক্তিশালী। এই সভ্যতা থেকে শিক্ষা নিয়েই গোটা বিশ্ব হাসপাতাল, চিকিৎসা-সংস্থা ও স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ইসলামি সভ্যতায় যে-সকল চিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটেছে, বিজ্ঞানে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে

---

৪৬৩. এই পরিচ্ছেদ থেকে বইটির শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন আবদুস সাত্তার আইনী সাহেব।

৪৬৪. *বুখারি*, কিতাব : আস-সাওম, বাব : হাক্কুল জিসমি ফিস-সাওমি, হাদিস নং ১৮৭৪; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সিয়াম, বাব : আন-নাহ্য়ু আন সাওমিদ দাহ্রি লিমান তাদাররারা বিহি, হাদিস নং ১১৫৯।

তাদের অবদানের জন্য গোটা মানবসমাজ এখনো গর্ব করে চলেছে।[৪৬৫]

ইসলামি সভ্যতায় স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলো স্বাস্থ্যসেবায়, রোগীদের সেবা-শুশ্রূষায়, বিশেষ করে দরিদ্র ও নিঃসহায় রোগীদের যত্ন ও সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ-সংস্থাগুলো স্বাস্থ্য-সেবাকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। বিশেষায়িত স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ প্রচুর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান রোগীদের চিকিৎসায়, তাদের আপ্যায়নে ও যত্ন-আত্তিতে সার্বক্ষণিক সেবা দিয়েছে। যারা হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিয়েছে বা যাদের অসুস্থ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে। এভাবে হাসপাতালগুলো গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে। ইসলামি বিশ্বের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এসব হাসপাতাল। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা ছিল হাসপাতালগুলো। রোগীরা এগুলোতে চিকিৎসা ও পরিপূর্ণ সেবাযত্নের পাশাপাশি পেত উন্নতমানের খাবার ও পোশাক। অনেক হাসপাতাল চিকিৎসা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবার পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা পালন করেছে। এগুলোতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য-সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামি সভ্যতার আরেকটি মানবিক দিক পরিস্ফুট করেছে।

পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদ থেকে আমরা এ-ব্যাপারে জানব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতাল

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অসুস্থের সেবা ও মানবিক বন্ধন

---

[৪৬৫]. ড. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০৭।

প্রথম অনুচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতাল

বিশ্বসভ্যতায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান হলো বিশ্বের প্রথমবারের মতো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। তারা বরং অন্যান্য জাতি থেকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নয়শ বছরেরও বেশি সময় এগিয়ে রয়েছে!

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে প্রথম ইসলামি হাসপাতাল নির্মিত হয়।[৪৬৬] তার শাসনকাল ছিল ৮৬ হি./৭০৫ খ্রি. থেকে ৯৬ হি./৭১৫ খ্রি. পর্যন্ত। এই হাসপাতাল ছিল কুষ্ঠরোগের জন্য বিশেষায়িত। এটির পরপরই ইসলামি বিশ্বে বেশ কয়েকটি হাসপাতাল নির্মিত হয়। এগুলোর কোনো-কোনোটি অত্যন্ত অগ্রগতি লাভ করে। এ হাসপাতালগুলো চিকিৎসা ও জ্ঞানের দুর্গ বলে বিবেচিত হতো। এগুলোই বিশ্বের প্রথম মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইসলামি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নয়শ বছরেরও বেশি সময় পরে প্যারিসে প্রথম ইউরোপীয় হাসপাতাল তৈরি করা হয়!

ইসলামি বিশ্বে হাসপাতালগুলো বিমারিস্তান অর্থাৎ রোগী সেবাকেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। স্থায়ী হাসপাতাল যেমন ছিল, তেমনই ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালও ছিল। স্থায়ী হাসপাতাল বলতে বোঝাচ্ছে যেগুলো শহরে ও নগরে নির্মিত হয়েছিল। মুসলিম নগরী খুব কমই ছিল যেখানে হাসপাতাল নির্মিত হয়নি। এমনকি ছোট ছোট শহরেও হাসপাতাল ছিল। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল হলো যেগুলো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, মরুভূমিতে ও পাহাড়ি এলাকায় ঘুরে বেড়াত।

ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল একদল উটের ওপর বহন করে নিয়ে যাওয়া হতো। উটের সংখ্যা কখনো কখনো পৌঁছত চল্লিশে। এগুলো সুলতান মাহমুদ আস-সালজুকির শাসনামলের ঘটনা। তার শাসনকাল ছিল ৫১১

---

৪৬৬. তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ২৯।

হি./১১১৭ খ্রি. থেকে ৫২৫ হি./১১৩১ খ্রি. পর্যন্ত। ভ্রাম্যমাণ কাফেলাগুলোর সঙ্গে থাকত পর্যাপ্ত চিকিৎসা-সরঞ্জাম ও ওষুধপত্র। কয়েকজন চিকিৎসক থাকতেন তাদের সঙ্গে। মুসলিম উম্মাহর সকলের নাগালে পৌঁছে যেত এসব চিকিৎসা-কাফেলা।[৪৬৭]

বড় শহরগুলোতে স্থায়ী হাসপাতাল সংখ্যায় ও গুণেমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল বাগদাদের আল-আদুদি হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠাকাল ৩৭১ হি./৯৮১ খ্রি.; দামেশকের আন-নুরি হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠাকাল ৫৪৯ হি./১১৫৪ খ্রি.; কায়রোর আল-মানসুরি বড় হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠাকাল ৬৮৩ হি./১২৮৪ খ্রি.। কেবল কর্ডোভাতেই পঞ্চাশটির বেশি হাসপাতাল ছিল।[৪৬৮]

বিশেষায়ণের বিবেচনায় এসব বিশাল বিশাল হাসপাতালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। কিছু বিভাগ ছিল দেহের অভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসার জন্য, শল্যচিকিৎসার জন্য ছিল কিছু বিভাগ। চর্মরোগের জন্য যেমন আলাদা বিভাগ ছিল, তেমনই চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্যও ছিল ভিন্ন বিভাগ। ছিল মনোরোগ বিদ্যাবিভাগ, অর্থোপেডিক বা হাড়ভাঙার চিকিৎসার জন্যও আলাদা বিভাগ ছিল। আরও বিভিন্ন ধরনের বিভাগ ছিল।

এসব হাসপাতাল কেবল আরোগ্যকেন্দ্র ছিল না, প্রকৃতপক্ষে বরং উন্নতমানের চিকিৎসা-মহাবিদ্যালয় ছিল। যতটা চিকিৎসাসেবা হতো তার চেয়ে বেশি মাত্রায় হতো চিকিৎসাবিদ্যার পড়াশোনা। বিশেষজ্ঞ প্রধান চিকিৎসক, যিনি আল-উস্তাদ বা অধ্যাপক নামে পরিচিত হতেন, প্রতিদিন সকালে ঘুরে ঘুরে রোগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রাথমিক স্তরের চিকিৎসকগণ থাকতেন তার সঙ্গে। তিনি তাদের শেখাতেন এবং কী পর্যবেক্ষণ করছেন তার নোট নিতে বলতেন। সাথে সাথে চিকিৎসার পদ্ধতি বলে দিতেন, তারা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং শিখতেন। তারপর অধ্যাপক একটি বড় হলঘরে গিয়ে উপস্থিত হতেন, তাকে ঘিরে বসত শিক্ষার্থীরা। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থ থেকে তাদের পাঠ করে শোনাতেন, যতটুকু পাঠ করতেন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও

---

৪৬৭. ইবনুল আল-কিফতি, *তারিখুল হুকামা*, পৃ. ৪০৫।

৪৬৮. মাহমুদ আল-হাজ কাসিম, *আত-তিব্বু ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, পৃ. ৩২৮-৩২৯।

করতেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। প্রতিটি শিক্ষা-কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে তিনি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। যারা শিক্ষা-কার্যক্রম শেষ করেছে তারা পরীক্ষায় অংশ নিত। বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতো তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সনদ দিতেন।

ইসলামি হাসপাতালগুলোর অভ্যন্তরে থাকত বড় বড় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারগুলোতে থাকত অসংখ্য গ্রন্থ। যেসব বিষয়ের গ্রন্থ এখানে স্থান পেত তা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, ওষুধপ্রস্তুতপ্রণালি, শারীরস্থান বা অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলি, চিকিৎসা-সংক্রান্ত ফিকহি বিষয়াবলি। চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জ্ঞানশাখার গ্রন্থাবলিও স্থান পেত হাসপাতালের গ্রন্থাগারে।

হাসপাতালগুলোতে কত বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল তা বোঝার জন্য এখানে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। কায়রোতে অবস্থিত ইবনে তুলুন হাসপাতালের গ্রন্থাগারে এক লাখেরও বেশি গ্রন্থ ছিল।

হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী জমিগুলোতে ওষুধি বড় বড় বাগান ছিল। এসব বাগানে ওষুধি বৃক্ষ ও তৃণলতার চাষ হতো। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের জন্য এসব বাগান তৈরি করা হতো।

রোগের সংক্রমণ যাতে না ঘটে বা না ছড়ায় তার জন্য হাসপাতালে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তা ছিল এক কথায় অনন্য ও বিস্ময়কর। কোনো রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করামাত্রই তার পরনের পোশাক পালটে নতুন পোশাক দেওয়া হতো। নতুন পোশাক দেওয়া হতো সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়। এটা করা হতো যাতে তার পরনের পোশাক থেকে সে যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা না ছড়ায়। তারপর প্রত্যেক রোগী সংশ্লিষ্ট রোগের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে প্রবেশ করত। কোনো রোগীর নির্ধারিত ওয়ার্ড ব্যতীত অন্য ওয়ার্ডে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। রোগের সংক্রমণ যাতে না ঘটে সে জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা ছিল। প্রত্যেক রোগীই ঘুমাত তার জন্য নির্ধারিত খাটে। খাটে দেওয়া হতো নতুন বিছানা-বালিশ ও নির্ধারিত সরঞ্জামাদি।

এসব ইসলামি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নয় শতাব্দীরও বেশি সময় পরে প্যারিসে যে হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল তার সঙ্গে এগুলোর তুলনা

চিত্র নং-৭
মানসুরি বড় হাসপাতাল

ইসলামের ইতিহাসে আরও একটি বিশাল হাসপাতালের উদাহরণ হলো আল-মানসুরি বড় হাসপাতাল। হাসপাতালটি কায়রোতে ৬৮৩ হিজরিতে/১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন বাদশাহ মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন। যথার্থতায়, শৃঙ্খলায় ও পরিচ্ছন্নতায় আল-মানসুরি হাসপাতাল ছিল পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুগুলোর অন্যতম। এই হাসপাতাল এত বিশাল ছিল যে এখানে দৈনিক চার হাজারেরও বেশি রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মারাকেশ হাসপাতালের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আল-মানসুর আবু ইউসুফ ইয়াকুব। তিনি মরক্কোয় আল-মুওয়াহহিদ (আল-মোহাদ)

খিলাফতের (রাজ্যের) শাসক ছিলেন। তার শাসনকাল ছিল ৫৮০ হি./১১৮৪ খ্রি. থেকে ৫৯৫ হি./১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। মারাকেশ হাসপাতালের নির্মাণশৈলী ছিল নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। নৈসর্গিক পরিবেশও এখানে তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে ছিল। হাসপাতালের এরিয়ায় সব ধরনের গাছ ও লতাগুল্ম রোপণ করা হয়েছিল। তৈরি করা হয়েছিল চারটি ছোট কৃত্রিম জলাশয় বা লেক। হাসপাতালটির চিকিৎসাব্যবস্থাও ছিল অতি উন্নত। ছিল আধুনিক ওষুধপত্র ও দক্ষ চিকিৎসকবৃন্দ।[৪৭০] ইসলামি সভ্যতার ললাটে মারাকেশ হাসপাতাল ছিল সত্যিকার অর্থেই একটি মূল্যবান রত্ন।

এখানে বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোর একেকটিতে নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা দেওয়া হতো। যেমন চক্ষু হাসপাতাল, কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল, মানসিক হাসপাতাল ইত্যাদি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ও অভিনব ব্যাপার এই যে, কোনো কোনো বড় মুসলিম নগরীতে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-পল্লিই ছিল। আন্দালুসীয় ভূগোলবিদ ও পর্যটক ইবনে জুবায়ের তার ৫৮০ হিজরি/১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ভ্রমণবৃত্তান্তে এ ব্যাপারে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা অতি চমকপ্রদ। তিনি আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-পল্লি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটি একটি ছোট শহরের সমান। এই পল্লির মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে একটি বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা। অট্টালিকাটির চারপাশে রয়েছে বাগান এবং বেশ কিছু ঘর। এ-সবকিছুই রোগীদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই চিকিৎসা-পল্লি পরিচালনা করতেন। আরও ছিল ওষুধ প্রস্তুতকারী (ফর্মুলেশন) বিজ্ঞানীদের দল, ছিল চিকিৎসাবিদ্যার বহু শিক্ষার্থী। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সকলের খরচ বহন করা হতো। উম্মাহর ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্র ও নিঃসহায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য যেসব সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছিলেন তা থেকেও আসত খরচের একটি বড় অংশ।[৪৭১]

---

৪৭০. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১১০-১১৮।

৪৭১. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অসুস্থের সেবা ও মানবিক বন্ধন

ইতিপূর্বে আমরা যা আলোচনা করেছি, তা তো গেলই। এখন আমরা ইসলামি সভ্যতার যুগে মুসলমানদের চিকিৎসাসেবার আরেকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করব। সেটা হলো মানবিক বন্ধন। সাধারণভাবে মানুষের প্রতি সম্মান এবং তাদের দুঃখকষ্ট ও রোগ-ব্যাধি-যখম দূর করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয়ের মধ্য দিয়ে এই বন্ধন দৃশ্যমান হয়। মানুষটা কে এবং তার সমস্যা কী সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হয় না।

মুসলিম চিকিৎসকেরা অসুস্থদের সেবাদানের ক্ষেত্রে মানবিক বন্ধনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের জন্য এটা কোনো অভিনব ব্যাপার ছিল না। কারণ ইসলামি শরিয়ার আইনকানুনই এই অসাধারণ নৈতিক দায়িত্ববোধের কথা বার বার উচ্চারণ করেছে। ইসলাম অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেছে বিপদগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন মানুষ হিসেবে, এ কারণেই কে তার পাশে দাঁড়াবে, তার হাত ধরবে, তার ভয় ও শঙ্কা দূর করবে এবং তার শারীরিক ও মানসিক দুঃখকষ্ট লাঘব করবে তার জন্য এমন মানুষের প্রয়োজন।

ইসলামি শরিয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা হলো যেকোনো উপায়ে অসুস্থের সংকট দূর করা এবং যতটুকু সম্ভব তার দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করা। তাই তো ইসলামি শরিয়া অসুস্থকে রমযানে রোযা ভাঙার অনুমতি দিয়েছে। কারও হজ পালনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত বাধা থাকলে তার হজ পালনের দরকার নেই। এ কারণে তার কোনো গুনাহ হবে না। যে অসুস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে নামায পড়তে পারে না তাকে তার জন্য উপযোগী অবস্থায় নামায পড়ার অনুমোদন দিয়েছে। সে বসে অথবা শুয়ে বা এমনকি চোখের ইশারায়[৪৭২] নামায পড়তে পারে! যে অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহারে

---

৪৭২. এ মতটি শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত ও সারাবিশ্বের সর্ববহুল চর্চিত হানাফি মাযহাবমতে চোখের ইশারায় নামাযের অনুমতি নেই। তাই মাথার

অক্ষম তার জন্য অজুর বদলে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। কেউ যদি কোনো কারণে অজু বা তায়াম্মুম কোনোটাই করতে না পারে তাহলে সে এই অবস্থাতেই নামায পড়বে।[৪৭৩] শরিয়তের পরিভাষায় তাকে 'ফাকিদুত তাহুরাইন' (দুটি পদ্ধতিতেই পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম) বলে।

এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদের মুহূর্তে রুগ্ন ব্যক্তি থেকে ইসলামি শরিয়া বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছে। ফলে সে জিহাদ না করলেও তার কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾

অন্ধের জন্য গুনাহ নেই, ল্যাংড়ার জন্য গুনাহ নেই, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য কোনো গুনাহ নেই।[৪৭৪]

ইশারায় নামায পড়তে সক্ষম হলে মাথার ইশারাতেই নামায পড়বে! অন্যথায় অক্ষম হলে চোখের ইশারায় নামায পড়বে না। বরং সক্ষমতা ফিরে পেলে ছুটে যাওয়া নামাযগুলো আদায় করে নেবে।

রাসুলের হাদিস থেকেও এমনটিই বুঝে আসে। ইবনে উমর রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْجُدَ فَلْيَسْجُدْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَلْيَكُنْ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ»

তোমাদের মধ্যে যে সেজদা করতে সক্ষম, সে যেন সেজদা করে। যে অক্ষম সে যেন সেজদা করার জন্য কপাল বরাবর কোনো বস্তু না ওঠায়, তবে সে রুকু-সেজদা আদায়ার্থে মাথা দিয়ে ইশারা করবে।

দেখুন, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৩৩৫৮; *নাসবুর রায়া*, খ. ২, পৃ. ১৭৬ (দারুল কিবলা, জেদ্দা); *হিদায়া*, খ. ১, পৃ. ১৪১; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যা*, খ. ২৭, পৃ. ২৬৪।-সম্পাদক

৪৭৩. ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে তাকে এ অবস্থায় নামাযও পড়তে হবে, পরবর্তী সময়ে অজু বা তায়াম্মুমে সক্ষম হলে কাযাও করতে হবে। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে তাকে নামাযও পড়তে হবে না, কাযাও করতে হবে না। হাম্বলি মাযহাবে এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী সে নামাযের নিয়ত ব্যতীত নামাযের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে ও পরে অজু বা তায়াম্মুমে সক্ষম হলে কাযা পড়ে নেবে। কারণ পবিত্রতাবিহীন নামায গ্রহণযোগ্য নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকেও এমনটি বুঝে আসে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» পবিত্রতাবিহীন নামায গ্রহণযোগ্য নয়। দেখুন, *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ১; *মাআরেফুস সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩১-৩২; *রদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ২৫২-২৫৩।-সম্পাদক

৪৭৪. সুরা নুর : আয়াত ৬১।

ইসলামি শরিয়া কেবল কিছু বিধান উঠিয়ে নিয়ে ও কতিপয় ফরয ইবাদতে রুখসত (ছাড়) দিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, বরং অসুস্থের পাশে থেকে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে এবং তার মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তির ব্যবস্থা করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থকে তার বাড়িতে বা হাসপাতালে দেখতে যাওয়া মুসলমানদের একটি অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ.... وَذَكَرَ مِنْهَا: وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ»

মুসলমানের ওপর মুসলমানের হক ছয়টি, ...(ছয়টির মধ্যে একটি এই যে,) যখন সে অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাবে।[৪৭৫]

যে ব্যক্তি অসুস্থকে দেখতে যাবে তার জন্য জান্নাত লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন,

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً»

যে ব্যক্তি অসুস্থকে দেখতে যায় তার জন্য আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, তোমার কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক তোমার আগমনের, তুমি তো জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ।[৪৭৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তির কাছে ভালো ভালো ও কল্যাণের কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করতে বলেছেন। সে দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবে এবং দীর্ঘজীবী হবে,

---

৪৭৫. *বুখারি*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : আল-আমরু বিত্তিবায়িল জানায়িয, হাদিস নং ১১৮৩; *মুসলিম*, কিতাব : আস-সালাম, বাব : এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার হলো সালামের জবাব দেওয়া, হাদিস নং ২১৬২।

৪৭৬. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : যিয়ারাতুল ইখওয়ান, হাদিস নং ২০০৮, ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান গরিব বলেছেন। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৪৪৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮৫১৭; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ২৯৬১।

এমন আশাদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِي الْأَجَلِ؛ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يَطِيْبُ نَفْسَ الْمَرِيْضِ»

তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে আয়ু ও রোগমুক্তির ব্যাপারে আশান্বিত করো[৪৭৭]। এটা (তাকদিরে নির্ধারিত) কোনোকিছু প্রতিহত করবে না বটে, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির চিত্তকে প্রশান্ত করবে।[৪৭৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরং অসুস্থের আত্মবিশ্বাস ও মনোবলকে আসমানি বিষয়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, যখন তিনি জানিয়েছেন যে, ধৈর্যধারণ-সাপেক্ষে রোগ-ব্যাধি ও অসুস্থতা হলো তার পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত ও আখেরাতে মুক্তির কারণ। ইমাম বুখারি আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

মুসলিমের ওপর যেসব ক্লান্তি ও রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুঃখ, কষ্ট ও উদ্বেগ আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিঁধে, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[৪৭৯]

ইমাম বুখারি আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন,

---

৪৭৭. ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, খ. ১০, পৃ. ১২১-১২২; *তুহফাতুল আহওয়াযি বি-শারহি জামি আত-তিরমিযি*, খ. ৬, পৃ. ২৬৩।

৪৭৮. *তিরমিযি*, কিতাব : আত-তিব্ব, তিনি বলেছেন, এটি গরিব হাদিস, হাদিস নং ২০৮৭। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ১৪৩৮; *ইবনে আবি শাইবা*, হাদিস নং ১০৮৫১; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৯২১৩; আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ. ২, পৃ. ২০৮।

৪৭৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-মারদা, বাব : মা জাআ ফি সাওয়ারিল মারাদ, হাদিস নং ৫৩১৮; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : সাওয়াবুল মুমিন ফি-মা ইয়ুসিবুহু মিন মারাদ আও হুযন, হাদিস নং ২৫৭৩।

« إِنَّ اللهَ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ »

নিশ্চয় আল্লাহ বলেন, আমি যদি আমার বান্দাকে তার দুটি অতিপ্রিয় জিনিসের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দুটি জিনিসের বিনিময়ে জান্নাত দান করি।[৪৮০]

অসুস্থ মুমিন বান্দার আত্মবিশ্বাস এভাবেই আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়। ফলে সমাজে সে নিজেকে অক্ষম-অপদার্থ ও ফেলনা মনে করে না। বরং বিশ্বাস করে যে, সবাই তাকে গুরুত্ব দেয় এবং যত্ন নেয়।

ইসলামের এই উন্নত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কেবল মুসলিম রোগীদের জন্য নয়, বরং যেকোনো অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তা প্রযোজ্য, তার ধর্মাদর্শ যা-ই হোক না কেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে এটাই বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...﴾

আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করেছি...।[৪৮১]

সাধারণভাবে সব মানুষই সম্মানিত। এ কারণেই কেউ অসুস্থ হলে তার সেবাযত্ন করতে হবে এবং রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা করতে হবে, সে মুসলিম না হলেও। একটি ইহুদি বালক অসুস্থ হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গিয়েছিলেন।[৪৮২] এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইমাম বুখারি রহ. তার *সহিহে* একটি বাব (অনুচ্ছেদ) রচনা করেছেন, বাবটির নাম : ইয়াদাতুল মুশরিক (মুশরিক অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া)।

এই গভীর মানবিক বন্ধনের শেকড় আমাদের মধ্যে প্রোথিত করে দিয়েছে ইসলামি শরিয়া। এর ফলেই ইসলামি সভ্যতার যুগে যুগে মুসলিম

---

৪৮০. বুখারি, কিতাব : আল-মারদা, বাব : ফাদলু মান যাহাবা বাসারুহু, হাদিস নং ৫৩২৯; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২৪৯০; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৩৭১১; তাবারানি, *আল-আওসাত*, হাদিস নং ২৫০; বায়হাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৯৯৫৮।

৪৮১. সুরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৭০।

৪৮২. *বুখারি*, আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মারদা, বাব : ইয়াদাতুল মুশরিক, হাদিস নং ৫৩৩৩।

চিকিৎসকরা রোগীদের সঙ্গে তাদের 'মানুষ' ভেবেই আচরণ করতেন, তাদের 'অনুভূতিহীন বস্তু' মনে করতেন না। অথবা এটাও মনে করতেন না যে, রোগীরা হলো টাকাপয়সা রোজগারের হাতিয়ার, তাদের থেকে টাকাপয়সা খসানোর ফন্দি বের করতে পারলেই হয়! বরং রোগীদের মনে করা হতো বিপদগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন মানুষ বলে, যাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ও পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। শুধু চিকিৎসা ও সেবামূলক সাহায্য নয়, বরং মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এমন মহৎ অনুভূতি ও প্রেরণা নিয়েই মুসলিম চিকিৎসকেরা তাদের রোগীদের সেবা দিতেন। ইসলামি রাষ্ট্রে ধনী-নির্ধন, আরব-অনারব, সাদা-কালো, শাসক-শাসিত, রাজাপ্রজা, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে অতি উন্নত চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। অধিকাংশ সময়ই সকলের জন্য চিকিৎসা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রোগীদের সামাজিক অবস্থান ও স্তরভেদ যা-ই হোক না কেন, তারা সবাই একই মানের চিকিৎসাসেবা পেত।

আসুন আমরা ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলার দিকটি দেখি, তাহলেই আমরা মানবিক বন্ধন সম্পর্কে একটি ধারণা পাব।

কোনো রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করামাত্রই একটি বহিঃকক্ষে তার প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হতো। তার রোগ বা অসুস্থতা হালকা পর্যায়ের হলে তাকে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়া হতো। সে চিকিৎসাপত্র দেখিয়ে হাসপাতালের ওষুধালয় থেকে ওষুধ নিয়ে যেত। রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ ও হাসপাতালে ভর্তির উপযোগী হলে তার নাম রেজিস্ট্রি করা হতো। তারপর তাকে গোসলের জন্য গোসলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো এবং তার পরনের পোশাক খুলে নিয়ে একটি বিশেষ বস্ত্রভান্ডারে রাখা হতো। তারপর তাকে দেওয়া হতো হাসপাতালের বিশেষ এক প্রস্থ নতুন পোশাক। এরপর তাকে তার মতো রোগীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। নতুন বিছানা-বালিশে সজ্জিত একটি খাট পেত সে। তার মানসিক দিকটি বিবেচনা করেই এই খাটে অন্যকোনো রোগীর অবস্থানের অনুমতি ছিল না।

রোগী ইসলামি হাসপাতালে প্রবেশের পর চিকিৎসক তাকে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন সে অনুযায়ী ওষুধ দেওয়া হতো। তার স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্য ও পথ্যও দেওয়া হতো নির্ধারিত পরিমাণে। রোগীরা সাধারণত যে প্রকারের খাবার খায় তাদের সেসব খাবার খেতে বাধ্য করা হতো না। বরং উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হতো তাদের। রোগীদের খাদ্য-তালিকার মধ্যে ছিল খাসি ও গরুর গোশত এবং পাখি ও মুরগির গোশত। খাবারের পরিমাণের ক্ষেত্রেও কোনো কৃপণতা ছিল না এবং রোগীদের কষ্ট দেওয়া হতো না। বরং একজন রোগীর সুস্থতার আলামত ছিল এই যে, সে একই বৈঠকে পুরো একটি রুটি ও একটি আস্ত মুরগি খেয়ে শেষ করবে!

রোগী যখন আরোগ্যলাভের পর্যায়ে পৌঁছে যেত, তাকে আরোগ্য লাভকারীদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এখানে তার পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভের পর তাকে আরেক প্রস্থ নতুন পোশাক দেওয়া হতো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শুধু তা-ই নয়, তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও দেওয়া হতো, যাতে সে কর্মক্ষম হওয়া পর্যন্ত খরচ চালিয়ে নিতে পারে! অর্থাৎ, সে যেন পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার আগে কাজ করতে বাধ্য না হয়, কারণ এতে তার স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়তে পারে।[৪৮৩]

এখন আপনার প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই যে ইসলামি সমাজে দরিদ্র মানুষেরা কী পরিমাণ স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। যেহেতু তারা জানতই যে অসুস্থ হলে এই পর্যায়ের চিকিৎসাসেবা, যত্ন-আত্তি ও সাহায্য-সহযোগিতা পাবে। এমন চিকিৎসা ও সাহায্য পাওয়ার জন্য তাদের কপালের ঘাম ঝরানোর প্রয়োজন হতো না, প্রয়োজন হতো না কারও সুপারিশের বা কারও মধ্যস্থতার। আর চিকিৎসা পরিপূর্ণ করার আবেদন জানিয়ে কাকুতিমিনতি করা তো দূরেরই কথা!

মহান চিকিৎসক আবু বকর রাযি তার ছাত্রদের উদ্দেশে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা কত চমৎকার। তিনি তাদের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে রোগীদের সুস্থ করে তোলা, তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ নয় এবং তারা আমির-উমারা ও ধনী ব্যক্তিদের চিকিৎসা যতটা গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে করবে, ততটাই আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সঙ্গে করবে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের চিকিৎসা; তারা নিজেরা

---

৪৮৩. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১১০।

বিশ্বাস না করলেও রোগীদের বোঝাবে যে তারা আরোগ্যলাভ করবে, সুস্থ হয়ে উঠবে।[৪৮৪] কারণ শারীরিক অবস্থার ওপর মানসিক অবস্থারই প্রতিফলন ঘটে।

স্বাস্থ্যসেবার এমন উন্নত ব্যবস্থা কেবল বড় বড় শহর ও নগরে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইসলামি রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পেত। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালগুলো তাদের চিকিৎসাসেবার আঞ্জাম দিত। আগের অনুচ্ছেদে আমরা এসব হাসপাতাল সম্পর্কে বলেছি। ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালগুলো সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চল, ছোট পল্লি, পাহাড়ি জনপদ ও দূরবর্তী এলাকাগুলোয় ঘুরে বেড়াত।

ইসলামি রাষ্ট্র স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দিয়েছে; পরিবেশ, সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক ভিন্নতা ইত্যাদিকে আমলে নেয়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে যে-কেউ এরূপ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হবেন।

অসুস্থের প্রতি ইসলামের মমতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বরং সমাজের সকল স্তরের প্রতিই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল; এর অন্তর্ভুক্ত ছিল জেলখানার কয়েদিরা, যারা মুসলিম সমাজের অনিষ্ট করেছে! এসব কয়েদিও পরিপূর্ণ চিকিৎসাসেবা পেত। কারণ তারাও মানুষ। যেকোনোভাবেই হোক, তারাও সমাজের সন্তান। তাদের যে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তা তাদের সংশোধনের জন্যই, ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য নয়। অথচ আজকের বিশ্বে অসংখ্য কারাগারের বন্দিদের সঙ্গে এমনই আচরণ করা হচ্ছে, তাদেরকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

উজির আলি ইবনে ঈসা ইবনে জাররাহ বাগদাদের প্রধান চিকিৎসক (সিভিল সার্জন) সিনান ইবনে সাবিতকে চিঠি লিখে জানান, আমি জেলখানার কয়েদিদের ব্যাপারে ভেবেছি। তাদের সংখ্যাধিক্য এবং পরিবেশের রুক্ষতার কারণে তাদের রোগাক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই আপনার উচিত কয়েদিদের জন্য কয়েকজন চিকিৎসক নির্ধারণ করা, যারা প্রতিদিন গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন, ওষুধপত্র ও পথ্য

---

৪৮৪. আবদুল মুনয়িম সাফ্‌ব, *তা'লিমুত তিব্ব ইনদাল আরাব, আবহাসুন নাদওয়াতি ইলমিয়্যাহ লিল-জামইয়্যাতিস সুরিয়্যাহ লি-তারিখিল উলুম*, পৃ. ২৭৯।

দেবেন, গোটা জেলখানা ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং অসুস্থ কয়েদিদের চিকিৎসা করবেন।[৪৮৫]

মানবিকতার এই তরঙ্গ ইসলামি সভ্যতায় যুগ যুগ ধরে প্রবহমান ছিল। কারণ এর পেছনে সক্রিয় ছিল মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের উদারচিত্তে ও মুক্তহস্তে দান, এই দান ছিল অবিরাম প্রস্রবণের মতো এবং তা ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যও সহায়ক। আমি এখানে জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ-ব্যবস্থার কথা বোঝাতে চাচ্ছি। অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা, যত্ন ও আপ্যায়ন এবং তাদের সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ-ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উন্নত হাসপাতালগুলো সম্পূর্ণরূপে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল, মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন দায়িত্বশীল এসব সম্পত্তির দেখভাল করতেন। কখনো কখনো স্বয়ং বিচারকও এই দায়িত্ব পালন করতেন। ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় থেকেই হাসপাতালগুলোর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হতো। রোগীদের প্রয়োজনীয় খরচ, চিকিৎসকদের বেতন-ভাতা, বিছানাপত্র ও খাদ্য ক্রয়, ওষুধি বাগান তৈরি, ওষুধ প্রস্তুতকরণ—সবকিছুর খরচ আসত ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি থেকে। এমনকি হাসপাতালে অনুশীলনরত মেডিকেল শিক্ষার্থীদের খরচাদিও মেটাত এ থেকে!

এই ক্ষেত্রে একটি প্রসিদ্ধ নমুনা হলো কায়রোতে অবস্থিত আল-মানসুরি বড় হাসপাতাল। বাদশাহ মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন ৬৮৩ হিজরি ১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। হাসপাতালটির বার্ষিক খরচ মেটানোর মতো সম্পত্তিও ওয়াক্ফ করেন। যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ এবং তা মুসলমানদের মানবিক ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা উল্লেখ করা হলো। এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা জরুরি। তা এই যে, রোগীর মন-মানসিকতা সজীব ও সতেজ রাখার কিছু অভিনব ও অভূতপূর্ব কৌশল অবলম্বন করা হতো। ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির একটি অংশের আয় নির্দিষ্ট ছিল এমন দুজন লোককে বেতন দেওয়ার জন্য, যারা প্রতিদিন হাসপাতালে ঘুরে বেড়াবে এবং রোগীদের অন্তরালে

---

[৪৮৫]. ইবনুল কিফতি, *তারিখুল হুকামা*, পৃ. ১৪৮।

দাঁড়িয়ে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের সুস্থতার ব্যাপারে কথা বলবে। অর্থাৎ তারা রোগীর পাশে থেকে নিচুস্বরে কথা বলবে এমনভাবে যে, রোগী তাদের কথা শুনতে পেলেও তাদের দেখতে পাবে না। তারা নিজেদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রোগীকে তার আরোগ্যলাভ ও সুস্থতার কথা জানান দেবে! ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির এই অংশটির নাম ছিল ওয়াক্ফু খিদায়িল মারিদ (রোগীর মন ভোলানোর জন্য ওয়াক্ফিয়া সম্পত্তি)। রোগীর মন সতেজ ও মনোবল চাঙা করে তোলার জন্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। ফলে দেখা যেত রোগী খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠছে![৪৮৬]

রোগীদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দৃঢ় মানবিক বন্ধন ব্যক্তিগত আচরণে সীমাবদ্ধ ছিল না যে, কতিপয় চিকিৎসকই তা চর্চা করেছেন এবং তা কেবল জনগণের হৃদয় থেকে উৎসারিত জাতীয়তাভিত্তিক মমতা ও কল্যাণার্থে, বরং এমন আচরণ ছিল সর্বজনীন ও সামগ্রিক, রাষ্ট্রীয় নীতিই এমন আচরণের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। উম্মাহর সকল সদস্য–রাজা ও প্রজা এবং শাসক ও শাসিত সবাই–এই নীতি অবলম্বন করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খলিফা বা আমির নিজে এসে রোগীদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানসুর মুওয়াহহিদি (মরক্কোর মুওয়াহহিদি রাজ্যের সুলতান) সাপ্তাহিক রুটিনমাফিক মারাকেশে মানসুরি হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেন। প্রতি সপ্তাহে জুমআর নামাযের পর হাসপাতালটি পরিদর্শন করতেন এবং রোগীদের অবস্থা দেখে-শুনে নিশ্চিন্ত হতেন।[৪৮৭]

ইসলামি চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে আরেকটি মানবিক দিক বিবেচনায় রাখা হতো। ইসলামি শরিয়া এ ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছে। তা হলো রোগীর সম্মান রক্ষা করা ও তার লজ্জা হেফাজত করা। ফলে রোগীর ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মসম্মান যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই যাবতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হতো।

---

[৪৮৬]. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১১২।

[৪৮৭]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ইসলামি শরিয়ার বিধান অনুযায়ী প্রয়োজন ছাড়া রোগীর ছতর উন্মোচন করা জায়েয নয়। পরীক্ষা বা অস্ত্রোপচার করতে যতটুকু অংশ উন্মোচিত করা প্রয়োজন ততটুকু উন্মোচিত করা যাবে, এর বেশি নয়। বাইরের কারও জন্যে রোগীর পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপারগুলো দেখা জায়েয নয়, আর যদি তারা হয় ভিন্ন লিঙ্গের তাহলে তো কথাই নেই। একইভাবে মাহরাম পুরুষের[৪৮৮] অথবা অন্য নারীর (যেমন নার্স) উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোনো পুরুষ চিকিৎসক কোনো মহিলা রোগীর সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না, এটা তার জন্য কোনোভাবেই জায়েয নয়। এ কারণেই ইসলামি সভ্যতায় হাসপাতালগুলোর অভ্যন্তরে নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল।

ইসলামি চিকিৎসা-ব্যবস্থায় রোগীদের সাথে আরও একটি মানবিক দিককে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়েছে। শরিয়া আইন চিকিৎসাগ্রহণের ক্ষেত্রে রোগীদের অধিকারকে সুরক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ, পুরুষ চিকিৎসকের জন্য মহিলা রোগীর চিকিৎসা করার অনুমোদন রয়েছে এবং একইভাবে নারী চিকিৎসকের জন্যও পুরুষ রোগীর চিকিৎসা করার অনুমোদন রয়েছে। এই অনুমোদন তখনই কার্যকর হবে যখন সমলিঙ্গের অভিজ্ঞ চিকিৎসক না পাওয়া যাবে যিনি পূর্ণরূপে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। যাতে রোগীদের—পুরুষ হোক বা নারী—সঠিক চিকিৎসার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে না যায়। এমনকি শরিয়া এই অনুমতিও দিয়েছে যে, মুসলিম রোগী অমুসলিম চিকিৎসকের কাছেও চিকিৎসা নিতে পারবে, যখন তার যথার্থ চিকিৎসা করতে পারে এমন মুসলিম ডাক্তার পাওয়া দুষ্কর হবে। রোগীদের স্বাস্থ্য ও জীবন সুরক্ষার জন্যই শরিয়ার এই অনুমতি।

যে কথাটি বলে আমরা এই অধ্যায় শেষ করতে চাই তা এই যে, ইসলামি সভ্যতায় স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলোর ভিত্তি ছিল নিখাদ ইসলামি সম্পর্ক ও মানবিক বন্ধন; ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই। এই ব্যাপারটার সঙ্গে পাশ্চাত্যের এখনো পরিচয় ঘটেনি। ইসলামি স্বাস্থ্য-সংস্থাগুলো রোগীদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, পথ্য ও খাদ্য দিত তো বটে, দরিদ্র রোগীদেরকে উট বা অন্যান্য পশু এবং নিজের খরচের অর্থও দিত।

---

৪৮৮. স্বামী অথবা বাবা, ভাই, ছেলে, ভাগনে, ভাতিজা... অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম।

যাতে তারা পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে এবং কর্মক্ষম হয়ে কাজ করে খেতে পারে এবং এভাবে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতে পারে। ইসলামি সভ্যতায় এই মানবিক প্রবণতা সর্বজনীনতা ও সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পান্থনিবাস ও সরাইখানা

ইসলামি সভ্যতা ইসলামের শুরুর যুগ থেকেই সরাইখানা-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত। আল-কুরআন সাধারণ গৃহস্থলে প্রবেশের বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। যা ইসলামের বাস্তববাদিতা ও সামাজিকতাকেই প্রমাণ করে। সাধারণ গৃহস্থলের মধ্যে সরাইখানাও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾

> যে ঘরে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো গুনাহ নেই (প্রয়োজন হলে প্রবেশ করতে পারো)।[৪৮৯]

ইমাম তাবারি এই আয়াতে টীকা সংযুক্ত করে বলেছেন, হে লোকসকল, যেসব ঘরে কেউ বসবাস করে না অর্থাৎ বাসিন্দা নেই সেখানে তোমরা অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করতে পারো, তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই, অসুবিধাও নেই। তবে মুফাসসিরদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে এখানে ঘর বলতে কোন ধরনের ঘর বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল বলেছেন, এখানে ঘর বলতে সরাইখানা ও পান্থনিবাস বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে স্থায়ী বা পরিচিত বাসিন্দা থাকে না। এসব ঘর পথিক ও মুসাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে তারা এগুলোতে আশ্রয় নিতে পারে এবং তাদের মালপত্র সুরক্ষিত রাখতে পারে।[৪৯০]

মুসলিম সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই পান্থনিবাস ও সরাইখানা নির্মাণের যে ইতিহাস তা সত্যিকার অর্থেই ইসলামি নগরায়ণ ও সভ্যতার উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। পথিক, মুসাফির ও আগন্তুকদের অবস্থা কতটা গুরুত্বের সঙ্গে

---

৪৮৯. সুরা নুর : আয়াত ২৯।

৪৯০. ইমাম তাবারি, *জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন*, খ. ১৯, পৃ. ১৫১।

বিবেচিত হতো তাও বোঝা যায়। মুসাফির ও আগন্তুক যদি যাকাতের সম্পদের হকদার হতো তাহলে ইসলামি প্রশাসন তাদের খাদ্য-পানীয়-বাসস্থান–প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করত। ফলে পান্থনিবাস ও সরাইখানা ছিল জনকল্যাণেরই একটি অংশ, আর জনকল্যাণের ধারণাটি দিয়েছে ইসলামি শরিয়া। ইসলামি সভ্যতা তার সুদীর্ঘ ইতিহাসকালে চমৎকার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে।

ইসলামি শহরগুলোর মধ্যে যেসব ব্যবসায়িক পথ ছিল সেগুলোজুড়ে সরাইখানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এগুলোতে আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিল ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থী। সরাইখানা-কর্তৃপক্ষ দরিদ্র, মিসকিন ও মুসাফিরদের বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করত। বিনামূল্যে আপ্যায়ন করত বলে সরাইখানাগুলোর নাম হয়ে গিয়েছিল 'দারুয যিয়াফাত' বা আপ্যায়নগৃহ।[৪৯১]

সরাইখানা ও পান্থনিবাসগুলো ছিল পথিক ও মুসাফিরদের প্রকৃত আশ্রয়স্থল; রাষ্ট্র যেমন এগুলো প্রস্তুত করে দিয়েছিল, তেমনই কল্যাণকর কাজে ব্রতী মুসলমানগণও এগুলো তৈরি করে দিয়েছিলেন। সরাইখানায় এসে মুসাফির ও পথিকেরা গ্রীষ্মের তাপদাহ ও শীতকালের শৈত্য থেকে রক্ষা পেত।

সা'দান ইবনে ইয়াযিদ হিজরি তৃতীয় শতকের একজন আলেম ছিলেন। তিনি তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি ২৬২ হিজরির ঘটনা। এক ঝঞ্ঝাপূর্ণ বর্ষণমুখর রাতে তিনি একটি সরাইখানায় এসে আশ্রয় নেন। দেখতে পান যে সরাইখানার সব কামরা ও বিছানা লোকে পরিপূর্ণ। কারণ প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ ছিল।[৪৯২]

এসব পান্থনিবাসে তালিবুল ইলম ও শিক্ষার্থীদের জন্য চমৎকার ব্যবস্থাপনা ছিল। তারা গোলমাল ও হইচই থেকে নিরাপদ থেকে পড়াশোনা ও আলোচনা করতে পারত। ইবনে আসাকির এ ব্যাপারে একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, আবু উমর আস-সাগির বলেন, আমরা দামেশকে প্রাসাদের কাছাকাছি একটি সরাইখানায় উঠলাম। আসরের নামায আদায় করলাম। পরের দিন সকালে আমরা আহমাদ ইবনে

---

৪৯১. ফুয়াদ ইয়াহইয়া, *জারদুন আসারিয়্যুন লি-খানাতি দিমাশক*, পৃ. ৬৯।

৪৯২. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম*, খ. ৫, পৃ. ৩৯।

উমায়েরের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। এ সময় আল-খানি বা সরাইখানার দায়িত্বশীল এলেন। বললেন, আবু আলি হাফিজ কোথায়? আমি বললাম, এখানেই আছেন। তিনি বললেন, শাইখ (আহমাদ ইবনে উমাইর) তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। গিয়ে দেখি শাইখ সরাইখানার সামনে তার খচ্চরের ওপর বসে আছেন। আমাদের দেখে খচ্চর থেকে নামলেন। আমরা যে কামরায় উঠেছি সেখানে এলেন। শাইখ আবু আলিকে সালাম দিলেন, তাকে অভিনন্দন জানালেন। তার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। শাইখ আবু আলির সঙ্গে ইলমি আলোচনায় মশগুল হয়ে গেলেন। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আলোচনা চলল। তারপর শাইখ বললেন, আবু আলি, আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে দিনারের হাদিস সংকলন করেছেন? আবু আলি বললেন, হ্যাঁ, করেছি। শাইখ বললেন, সেগুলো আমাকে দিন। আবু আলি হাদিসগুলোর সংকলন বের করে সামনে রাখলেন। শাইখ সেগুলো নিয়ে আস্তিনে রাখলেন। তারপর উঠে গিয়ে সওয়ারিতে আরোহণ করলেন।[৪৯৩]

এসব সরাইখানা শিক্ষার্থীদের ইসলামি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়ার জন্য প্রকৃত অর্থেই বেশ বড় সহায়ক ছিল। ইমাম যাহাবি এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের বিখ্যাত আলেম বাকি ইবনে মাখলাদ রহ. বাগদাদে এলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে হাদিস শেখার জন্য। ইমাম আহমাদ তখন জাবরিয়্যাদের চাপের মুখে ছিলেন। সদ্যই খালকুল কুরআনের ঘটনায় কারাগার থেকে বেরিয়েছেন। বাকি ইবনে মাখলাদ নিশ্চিত হলেন যে তাকে দীর্ঘদিন বাগদাদে কাটাতে হবে। তাই তিনি সরাইখানার একটি কামরা ভাড়া নিয়ে নিলেন। এখান থেকে তিনি প্রতিদিন একজন মিসকিন লোকের বেশে আহমাদ ইবনে হাম্বলের কাছে যেতেন এবং তার থেকে একটি বা দুটি হাদিস শুনতেন। তারপর সরাইখানার কামরায় ফিরে আসতেন। এভাবে চলতে থাকল। অবশেষে আহমাদ ইবনে হাম্বলকে প্রকাশ্যে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হলো![৪৯৪]

---

৪৯৩. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৫, পৃ. ১১৫।

৪৯৪. ইমাম যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৩, পৃ. ২৯৩।

ইসলামি সভ্যতায় সরাইখানার কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে, এগুলো কেবল ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীদের আশ্রয়স্থলে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও বড় কিছু হয়ে ওঠে। আমরা দেখি যে, কতিপয় খলিফা তাদের সফরকালে সরাইখানাতেই ওঠেন এবং যাত্রাবিরতি করেন। আব্বাসি খলিফা আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ ইস্কানদারুন (Iskenderun) শহরের কাছে হুসাইন সরাইখানায় ওঠেন। এটা ২৮৭ হিজরির ঘটনা। এ সময় তিনি উপকূলীয় এলাকা ও শামীয় (সিরিয়ান) শহরগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছিলেন। ইস্কানদারুন শহরটি বর্তমানে তুরস্কের হাতাই প্রদেশের অন্তর্গত।[৪৯৫]

অনেক খলিফা পান্থনিবাস ও সরাইখানাকে কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন, ফলে এগুলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অধীনে চলে যায়। সরাইখানার ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মুসাফির, দরিদ্র মানুষজন ও শিক্ষার্থীদের ব্যয়ভার ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হতো। আব্বাসি খলিফা আল-মুস্তানসির বিল্লাহ (মৃ. ৬৪০ হিজরি) সরাইখানা ও পান্থনিবাস নির্মাণে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এগুলোতে দরিদ্র মানুষ ও মুসাফিরদের আশ্রয় দেওয়া হতো।[৪৯৬]

প্রসিদ্ধ সরাইখানা ও পান্থনিবাস

ফ্রি সরাইখানা নির্মাণ করে যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের অন্যতম হলেন আমির নুরুদ্দিন মাহমুদ। আবু শামাহ *'আর-রাওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন'* গ্রন্থে ইবনুল আসির থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, নুরুদ্দিন মাহমুদ পথে পথে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। এতে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়, তাদের মালপত্রও সুরক্ষিত থাকে; শীতকালে শৈত্য ও বর্ষা থেকে বাঁচার জন্য তারা এগুলোতে আশ্রয় নেয়।[৪৯৭]

এ ব্যাপারটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, কতিপয় নারীও পান্থনিবাস ও সরাইখানা নির্মাণে অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পুণ্য ও প্রতিদান লাভের আশাতেই তারা এসব কাজ করেছেন। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির স্ত্রী ইসমাতুদ্দিন বিনতে

---

[৪৯৫]. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৫, পৃ. ৬৩৫।
[৪৯৬]. প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৮৬।
[৪৯৭]. আবু শামাহ, *আর-রাওদাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, পৃ. ১২।

মুইনুদ্দিন উনুর (মৃ. ৫৮১ হিজরি) দামেশকে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। এটি ইসমাতুদ্দিন সরাইখানা নামে পরিচিত ছিল।[৪৯৮]

আরেকজন নারী—ইবনে আসাকির তার নাম উল্লেখ করেননি—দামেশকে একটি পান্থনিবাস নির্মাণ করেছিলেন। এটির নাম ছিল ইবনুল আন্নাযাহ পান্থনিবাস।[৪৯৯]

বড় বড় অঞ্চলগুলোর রাজধানীতেই যে কেবল পান্থনিবাস ও সরাইখানা ছিল তা নয়, বরং প্রত্যন্ত এলাকা ও গ্রামাঞ্চলেও সরাইখানা ছিল। সাইমন নামের একজন ফরাসি চিত্রকর ১০৮৪ হিজরিতে ইস্পাহান ভ্রমণ করেন। তিনি ইস্পাহানে কী পরিমাণ সরাইখানা আছে তা গণনা করেছেন। তার গণনা অনুযায়ী সরাইখানা ছিল ১৬০০টি।[৫০০]

কোনো কোনো সরাইখানায় একটি বিশেষ বিভাগ ছিল যেখানে মানুষের আমানত, টাকাপয়সা ও সম্পদ গচ্ছিত রাখা হতো। এটিকে আমাদের যুগের ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নারী-পুরুষ সমানভাবে এগুলোর দায়িত্ব পালন করত, মালিক ব্যতীত অন্যদের হাতে গচ্ছিত অর্থ ও মালামাল ফেরত দেওয়ার অনুমতি ছিল না। ইবনুল জাওযি রহ. ৫৭১ হিজরির ঘটনাবলিতে এ বিষয়ে একটি কাহিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, একজন ব্যবসায়ী তার একটি পণ্য এক হাজার দিনারে বিক্রি করল। সে তার টাকা ও মালপত্র আনবারের (বাগদাদে) একটি সরাইখানায় গচ্ছিত রেখে খালি হাতে বাড়িতে এলো। একটি কৃষ্ণাঙ্গ দাস ছাড়া বাড়িতে তার আর কেউ ছিল না। এই দাসকে সে কয়েকদিন আগেই কিনে এনেছিল। রাতেরবেলা দাসটি মনিবের (ব্যবসায়ীর) কাছে উঠে এলো এবং একটি ছুরি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড বরাবর আঘাত করল। তারপর চাবি হাতিয়ে নিয়ে আনবারের সরাইখানার দিকে ছুটল। দাসটি সেখানে গিয়ে সরাইখানার দরজায় টোকা দিলো। দায়িত্বশীল মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, কে তুমি? দাসটি বলল, আমি অমুকের দাস। তিনি আমাকে সরাইখানা থেকে তার কিছু জিনিস নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। মহিলাটি বলল, আল্লাহর কসম, তোমার মনিব না আসা

---

৪৯৮. ইবনুল ইমাদ হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৪, পৃ. ৩১৯।
৪৯৯. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ২, পৃ. ৩২০।
৫০০. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৪, পৃ. ৪৯৮।

পর্যন্ত আমি তোমার জন্য দরজা খুলব না। দাসটি এখানে ব্যর্থ হয়ে বাড়িতে যা-কিছু আছে তা চুরি করার জন্য গেল। ঘটনাক্রমে সে যখন তার মনিবের বুকে ছুরি মেরেছিল তখন রাস্তার পাহারাদার লোকটির চিৎকার শুনেছিল। তাই তারা দাসটিকে আটক করল। মনিব আরও দুই দিন বেঁচে ছিল। তার মৃত্যুর পর দাসটিকে হত্যা করার জন্য সে নির্দেশ দিয়ে যায়। ফলে মনিবের মৃত্যুর পর দাসটিকে খোলা জায়গায় শূলে চড়ানো হয়।[৫০১]

কোনো কোনো সরাইখানায় ছিল পাকশালা। এসব সরাইখানার মালিকেরা বা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠ পাচকদের নিয়োগ দিত। পাকশালা থেকে সরাইখানায় আগত প্রত্যেক মুসাফিরকে তিন উকিয়া[৫০২] পরিমাণ রুটি দেওয়া হতো। মুসলিম বা অমুসলিম, স্বাধীন বা দাস– কোনো বাছবিচার ছিল না। অর্থাৎ সবাই প্রায় এক কেজি পরিমাণ রুটি পেত। ভুনা গোশত দেওয়া হতো ২৫০ গ্রাম। সঙ্গে এক বাটি অন্য খাবার ইত্যাদি দেওয়া হতো। সেলজুক শাসনামলে কারা-তাই নামের একটি সরাইখানা ছিল। এই সরাইখানা সম্পর্কে কিছু দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কারা-তাই সরাইখানায় আগত প্রত্যেক মুসাফির ও আগন্তুককে প্রতিদিন তিন উকিয়া পরিমাণ ভালো মানের রুটি দেওয়া হতো, বড় একবাটি তরকারি এবং এক উকিয়া রান্না-করা গোশত দেওয়া হতো। মুসলিম ও অমুসলিম, নারী ও পুরুষ, স্বাধীন ও দাস– সবাই সমানভাবে তা পেত।[৫০৩]

আমরা একটু আগে কারা-তাই সরাইখানা সম্পর্কে যে দস্তাবেজের কথা বলেছি তার কিছু বিষয় এখানে পর্যালোচনা করতে পারি। এ দস্তাবেজ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামি সভ্যতায় অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমতাবিধান বাস্তবায়নের ওপর খুব জোর দেওয়া হতো। অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম, স্বাধীন ও দাস এবং নারী ও

---

[৫০১]. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুক ওয়াল উমাম*, খ. ১০, পৃ. ২৬৫।

[৫০২]. উকিয়া : নববি যুগে মক্কার হিসাবমতে উকিয়ার পরিমাণ ছিল ৪০ দিরহাম। এর ভিত্তিতে হানাফিদের কাছে এক উকিয়া সমান ২০০.৮ গ্রাম এবং অন্যদের কাছে প্রায় ২০১ গ্রাম। আধুনিক হিসেবে উকিয়ার বিভিন্ন পরিমাপে তফাত রয়েছে।

[৫০৩]. ফাহিম ফাতহি ইবরাহিম, *ইনখান ফিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, http://www.arabicmagazine.com/ArtDetails.aspx?id/56

পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। সরাইখানার পাকশালা থেকে প্রতি শুক্রবার রাতে মধু দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন দেওয়া হতো। এই মিষ্টান্ন সকল মুসাফির ও আগন্তুকের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হতো। কারা-তাই সরাইখানার দস্তাবেজে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রত্যেক জুমআর রাতে মধুময় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হতো এবং সরাইখানায় আগত প্রত্যেক মুসাফির ও আশ্রয়প্রার্থীকে সমানভাবে দেওয়া হতো। কেউ কম বা বেশি পেত না।[৫০৪]

আন্দালুসের কিছু শহর পান্থনিবাসের উন্নতি ও আধিক্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। আল-হিময়ারি তার *'সিফাতু জাযিরাতিল আন্দালুস'* গ্রন্থে বলেছেন, আন্দালুসের আলমেরিয়া শহরে ত্রিশটি কম এক হাজার সরাইখানা ছিল।[৫০৫] এত বেশি সরাইখানা থাকায় প্রমাণিত হয় যে, এই সুপ্রাচীন শহরটিতে বিপুল সংখ্যক পর্যটক ও ভ্রমণকারী আসত।

উমাইয়া শাসনামল থেকেই আন্দালুসে ব্যাপকভাবে সরাইখানা নির্মাণ করা হয়, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সরাইখানায় সামাজিক শিষ্টাচারের বালাই ছিল না। ফলে আমিররা সেগুলো ধসিয়ে দিয়েছেন। কারণ এগুলো সমাজে নৈতিক স্খলন সৃষ্টি করছিল। ২০৬ হিজরিতে হাকাম ইবনে হিশাম রাবাদে যে সরাইখানাটি ছিল তা ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেন। কারণ এ সরাইখানায় যারা আসত তারা ছিল পাপাচারে লিপ্ত ও নৈতিভাবে অধঃপতিত। ফলে তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।[৫০৬]

কোনো সন্দেহ নেই যে, অতীতকালে কোনো কোনো সরাইখানায় ও পান্থনিবাসে এ ধরনের গর্হিত কার্যকলাপ হতো, ঠিক এমনই গর্হিত ও অসামাজিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে আমাদের আধুনিক হোটেলগুলোতে, যা আমরা দেখি ও শুনি। কিন্তু দুটি বিষয়ের মধ্যে যোজন যোজন পার্থক্য রয়েছে। আমির ও খলিফারা সর্বোচ্চ ইচ্ছা ও শক্তি দিয়ে এসব অন্যায়, অশ্লীল ও গর্হিত কার্যাবলি প্রতিহত করতেন এবং সরাইখানাগুলোর ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতেন, ফলে সেগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে

---

৫০৪. Turan (Osman), Celâleddin Karatay, Vkiflari ve Vakfiyeleri, Belleten, Cilt: XII, Sayi: 45, 46, 47, 48, Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 1948, p. 95- 96.

৫০৫. আল-হিময়ারি, *সিফাতু জাযিরাতিল আন্দালুস*, পৃ. ৬৪।

৫০৬. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, খ. ১, পৃ. ১৭৩।

দিতেন। কিন্তু এই আধুনিক যুগের হোটেলগুলোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি অনেকটাই বিপরীত!

কতিপয় সুলতানও অধিক হারে সরাইখানা নির্মাণে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সরাইখানাগুলোকে দরিদ্র মানুষ, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। মরক্কোর মারিনীয় সুলতান আবু ইয়াকুব ইউসুফ মারিনি (মৃ. ৭০৬ হিজরি) ফেজ শহরে শাম্মায়িন সরাইখানা পুনর্নির্মাণ করেন। সরাইখানাটি বিরান ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল পুনর্নির্মাণের পর এটিকে তিনি ফেজ জামে মসজিদে যারা আসতেন তাদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।[৫০৭]

মামলুকি শাসনামলে সরাইখানা ও পান্থনিবাসের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। অত্যন্ত ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে এগুলো, কিন্তু মামলুকি রাজ্য ইসলামি সভ্যতার অভিযাত্রায় এই ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয় যোগ করে। তারা মিশরে ও সিরিয়ায় যেসব পাশ্চাত্যের বণিক ও পর্যটকদের ছোট ছোট কলোনি গড়ে উঠেছিল তাদের জন্য বিশেষ সরাইখানা নির্মাণ করেন। মাকরিযি উল্লেখ করেছেন যে, সাইপ্রিয়টরা (সাইপ্রাসের অধিবাসী) ৭৮৩ হিজরিতে আলেকজান্দ্রিয়ায় আক্রমণ চালায়। তারা বিপুল সংখ্যক বাড়িঘর, দোকানপাট ও সরাইখানা জ্বালিয়ে দেয়। তিনি বলেন, মালাউনরা (সাইপ্রিয়টরা) কাইতালানি সরাইখানা, জানুয়ি সরাইখানা, মুযাহ সরাইখানা ও মুসিলি সরাইখানা জ্বালিয়ে দেয়। ভেতরের সব মালপত্র ও আসবাবসহ সরাইখানাগুলো পুড়ে যায়।[৫০৮]

মাকরিযি যেসব সরাইখানার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো ইউরোপীয় ও ইতালীয় বণিকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইতালির জেনোয়া (Genoa) শহরের অসংখ্য বণিক এখানে আসত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগে ইউরোপীয় বণিকেরা ইসলামি সভ্যতায় (মুসলিম দেশগুলোতে) বেশ গুরুত্ব পেয়েছে।

ইসলামি রাজ্যের আগ্রহ ছিল প্রত্যেক পেশার লোকদের আলাদা আলাদা সরাইখানা নির্মাণ করা এবং বিভিন্ন শহরে এ ব্যাপারটিই দেখা গেছে।

---

৫০৭. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ৫, পৃ. ৬৬৭।

৫০৮. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ১১৪।

শামীয় (সিরিয়ান) তেল ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সরাইখানা নির্মাণ করা হয়েছিল, এটি হলো কায়রোতে অবস্থিত ফুন্দুক তারান্তাই।[৫০৯]

ইসলামি সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই পান্থনিবাস ও সরাইখানার অস্তিত্ব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ফলে বোঝা যায় যে, এই সভ্যতায় কতটা ছিল সামাজিক বন্ধনের গুরুত্ব। বৈষয়িক ও মানসিক সব দিক থেকেই সামাজিক বন্ধনের উদার পরিচর্যা মিলেছে ইসলামি সভ্যতায়। বরং এই সভ্যতা যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বন্ধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা পূর্ববর্তী কোনো সভ্যতায় দেখা যায়নি। অসংখ্য সরাইখানা ও পান্থনিবাস নির্মাণ করেছে যেগুলোতে সব সুবিধাই বিনামূল্যে পাওয়া যেত। সমাজের সকল স্তরের ও সকল ধর্মের মানুষের জন্য এগুলো উন্মুক্ত ছিল। মানুষ যতদিন চেয়েছে—মাশাআল্লাহ—এগুলোতে অবস্থান করেছে। এতে তাদের জীবনের শুভ্রতা কলঙ্কিত হয়নি এবং তাদের পেশা ও কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়নি। সে যেই হোক—বণিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, মুসাফির। এতে কোনো সন্দেহ নেই, ইসলামি সভ্যতার এই উজ্জ্বল ইতিহাস দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বার বার মনে করিয়ে দেয় এই অবিনশ্বর সভ্যতার যে মানবিক দান তা কত মহান!

আমরা কিছু মহৎ ও অনুপম ইসলামি ব্যবস্থার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলাম। আমরা অনুধাবন করছি যে, এই পর্বের অনুচ্ছেদগুলোতে একটি মূল্যবোধ আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তা হলো এই সভ্যতার মানবিকতা ও মানবতাবোধ। এই সভ্যতা যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা থেকে কখনো বিচ্যুত হবে না। সেটা হলো আখলাক ও শিষ্টাচার এবং নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তি, এসব বৈশিষ্ট্য ঐশী প্রস্রবণ থেকে উৎসারিত, তাই এগুলোর কোনো শেষ নেই। এ কারণেই ইসলামি সভ্যতা যে আখলাক ও নৈতিকতায় ভূষিত তা আমরা এই সভ্যতার প্রত্যেক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাই। ইসলামি সভ্যতার এসব মূল্যবোধ গোটা বিশ্বের জন্য আলোকবর্তিকারূপে বিদ্যমান।

।। তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।।

---

৫০৯. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪।

আল-আযুদি হাসপাতাল

বাগদাদে ওয়াকফসূত্রে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলোর অন্যতম ছিল আল-আযুদি হাসপাতাল। বুওয়াইহি রাজবংশের অন্যতম শাসক আযুদুদ্দৌলা ৩৬৬ হিজরি/৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ শহরের পশ্চিমাংশে তা নির্মাণ করেন। এই হাসপাতালে বিভিন্ন রোগচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ চব্বিশজন ডাক্তার সবসময় কর্মরত থাকতেন। হাসপাতালটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আযুদুদ্দৌলা বহুবিধ প্রবৃদ্ধিমূলক প্রকল্প ওয়াকফ করেন। এখানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক বিনামূল্যে চিকিৎসা পেত। রোগীরা এখানে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াও বিভিন্ন সেবা লাভ করত। যেমন নতুন পোশাক, স্বাস্থ্যসম্মত বাহারি খাবার, জরুরি ওষুধ ইত্যাদি। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি পৌঁছার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পাথেয় ও পথখরচও দিয়ে দেওয়া হতো তাদের।

এসব হাসপাতালগুলোতে এত উন্নত, আরামদায়ক ও বিলাসবহুল স্বাস্থ্যসেবা ও দামি খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হতো যে, অনেকে এগুলো ভোগ করার জন্য অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হতো। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ খলিল ইবনে শাহিন যাহেরি বর্ণনা করেন, ৮৩১ হিজরি/১৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে একবার তিনি দামেশকের একটি হাসপাতাল দেখতে যান। তার বর্ণনামতে, এরকম বিলাসবহুল চিকিৎসাকেন্দ্র তিনি পৃথিবীর আর কোথাও দেখেননি। সেখানে তিনি লক্ষ করেন, এক লোক অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তিন দিন পার হওয়ার পর ডাক্তার তার চিকিৎসাপত্রে লিখে দেন, মেহমান কখনো তিন দিনের বেশি অবস্থান করেন না।

ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ হলো তা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের থেকে বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে পেরেছে যে, তাদের ও শাসক শ্রেণির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং শাসকবর্গ তাদের সেবক ও হিতৈষী। একজন শাসক সচ্ছলতা ও বিপদের মুহূর্তে জনগণের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক অটুট রাখবেন সেই মহান শিক্ষা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন।

মাকতাবাতুল হাসান

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান পরিচিতি

মানুষের প্রতিটি স্বপ্ন হাঁটিহাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলে বাস্তবায়নের পথে। প্রতিটি স্বপ্ন পূরণের পেছনে থাকে ঘড়ির কাঁটার অবিরাম ছুটে চলা।

প্রায় এক দশক হতে চলল মাকতাবাতুল হাসানের পথ চলা। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে তার অভীষ্ট গন্তব্যে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে জড়িয়ে আছে লক্ষ্যে পৌছার দুর্বার চেতনা।

একটি একটি করে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা এখন সত্তর অধিক। আছে ইতিহাস, উপন্যাস, আত্মশুদ্ধি ও শিশুদের জন্য নানা আয়োজন। পাঠকচাহিদা ও সামসময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় রয়েছে আরও কিছু চমকপ্রদ সংযোজন। আছে মৌলিক, সংকলন, অনুবাদের অঢেল ভান্ডার। একটি বইকে পাঠোপযোগী করে তুলতে, পাঠকের হাতে পৌছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে আমাদের দক্ষ কয়েকটি টিম। তাদের ঘাম ঝরানো পরিশ্রম মাকতাবাতুল হাসানের গন্তব্যে পৌছানোর মূল চালিকাশক্তি।

এতকিছুর পেছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কী? আমরা কী চাই?

আমরা চাই সুস্থ একটি পাঠকশ্রেণি গড়ে উঠুক, আর তার ভিত্তি হোক ইসলামি চেতনা। বাংলায় ইসলামি প্রকাশনা সমৃদ্ধ হোক বিশুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসের সংযোজনে। প্রজন্ম বেড়ে উঠুক ইসলামি শিক্ষার শীতল ছায়ায়।

আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে এখনো বাকি অনেকটা পথ। বাকি আরও অনেক কিছু পাঠকদের উপহার দেওয়ার। সে পর্যন্ত আমরা আল্লাহর কৃপার ভিখিরি। আর পাঠকদের দোয়ার মোহতাজ।

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

চতুর্থ খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (৪র্থ খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২/ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-64-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২৯০০/- টাকা মাত্র [চার খণ্ড একত্রে]

MuslimJati Bisshoke ki Diyece (4th Part)
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

* * *

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾

বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর এর দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষরাজি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো ইলাহ আছে কি? তবু তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়।[১]

* * *

১. সুরা নামল : আয়াত ৬০।

সূচিপত্র

সপ্তম অধ্যায়
ইসলামি সভ্যতায় সৌন্দর্যচর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামি শিল্পকলা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রীর নান্দনিকতা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
পরিবেশের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাম, পদবি ও শিরোনামের সৌন্দর্য

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ডোভা : একটি নান্দনিক ইসলামি শহরের নমুনা

অষ্টম অধ্যায়

ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপে ইসলামি সভ্যতার পারাপারস্থল বা সেতু

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব : কিছু নিদর্শন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতার মূল্যায়নে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

চিত্র সূচি

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতায় সৌন্দর্যচর্চা

ইসলামি সভ্যতার মহত্ত্ব ও পূর্ণতার একটি দিক এই যে, তা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে সৌন্দর্যের চর্চা করেছে। সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত বিষয় এবং তা সকল মানবমনের গভীরে প্রোথিত—এই চেতনাকে ধারণ করার ফলে ইসলামি সভ্যতা নন্দনচর্চাকে কখনোই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেনি। মানবমন সৌন্দর্যকে ভালোবাসে এবং যা-কিছু সুন্দর তার প্রতি আকর্ষিত হয়। অসুন্দরতা ও কদর্যতাকে ঘৃণা করা এবং যা-কিছু অসুন্দর ও কুৎসিত তা থেকে দূরে সরে থাকাও মানবমনের বৈশিষ্ট্য।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সৌন্দর্যের চর্চা ও নান্দনিক সৃজনশীলতা ইসলামি সভ্যতায় একটি মৌলিক মাত্রা সংযোজন করেছে। যে সভ্যতা সৌন্দর্যের উপাদানশূন্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করার মতো উপায় যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না সেই সভ্যতা মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেয় না, মানসিক পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পারে না এবং সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ-আকাঙ্ক্ষাকে মেটাতে পারে না।

এই অধ্যায়ে আমরা ইসলামি সভ্যতার সৌন্দর্যচর্চা ও নন্দনকলা বিষয়ে আলোকপাত করব। এ বিষয়গুলো একটি বিশাল পরিসর তৈরি করে এই সভ্যতার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ফলে তা পূর্ণতা ও মহত্ত্ব এবং মানবিক রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচিত হবে :

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামি শিল্পকলা

শিল্প বা আর্ট সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ইসলামি আর্ট বা শিল্প বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতাকে পরিস্ফুট করে তোলার একটি পরিচ্ছন্ন ও যথার্থ চিত্র; বরং মানব সভ্যতার একটি স্বচ্ছ আয়না। কারণ বিশ্বের সভ্যতাগুলো আধুনিক যুগে ও প্রাচীন কালে যত শিল্পের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে ইসলামি শিল্পকলাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহৎ বলে গণ্য করা হয়। তা সত্ত্বেও ইসলামি শিল্পকলার ভাগ্যে যথার্থ গবেষণা ও বিচারবিশ্লেষণ জোটেনি। যারা এ বিষয়ে লিখেছেন তাদের অধিকাংশেরই রচনা ইসলামি শিল্পকলা যে চৈন্তিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তারা বরং পাশ্চাত্য মানদণ্ডের ভিত্তিতে ইসলামি শিল্পকলার বিচারবিশ্লেষণ করেছেন।

ইসলামি চারিত্র্যগুণমণ্ডিত শিল্পকলার কয়েকটি প্রকার রয়েছে, যা ইসলামি সভ্যতাকে অনন্য ও অসাধারণ করে তুলেছে। নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে এগুলোর ওপর আলোকপাত করা হলো।

প্রথম অনুচ্ছেদ : স্থাপত্যকলা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অলংকরণ-শিল্প

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আরবি লিপিকলা

প্রথম অনুচ্ছেদ

স্থাপত্যকলা

ইসলামি স্থাপত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতেই তা প্রতিভাত হয়। সামগ্রিক নকশা বা স্বতন্ত্র স্থাপত্য-শৈলি অথবা ব্যবহৃত অলংকরণের বা মেটিফের কারণে এটা হয়ে থাকে।

মুসলিম স্থপতিরা স্থাপত্য-প্রকৌশলে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তারা প্রাথমিক মাপজোকের পাশাপাশি নির্মাণের জন্য আবশ্যক নকশা প্রণয়ন, সূক্ষ্ম বিবরণ প্রদান ও ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরি করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলোর জন্য প্রয়োজন হলো প্রকৌশল, গণিত ও নির্মাণকলায় গভীর জ্ঞান অর্জন। এসব জ্ঞানশাখায় মুসলিমরা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইসলামি স্থাপত্যকলার কয়েকটি প্রযুক্তি ও নির্মাণকৌশল নিয়ে আলোচনা করব। যাতে এগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং এগুলোর উদ্ভাবন ও বিকাশে মুসলিমরা কী অবদান রেখেছেন তা অনুধাবন করা যায়।[২]

গম্বুজের নির্মাণকলা

বড় বড় গম্বুজ নির্মাণে মুসলিমরা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এগুলোর জটিল পরিমাপে সফলতা দেখিয়েছেন। এসব পরিমাপ খোলস-কাঠামো (শেল স্ট্রাকচার) বিশ্লেষণের পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। জটিল ও উন্নত খোলস-কাঠামোর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বাইতুল মুকাদ্দাসের কুব্বাতুস সাখরা (Dome of the Rock) এবং আস্তানা, কায়রো ও আন্দালুসের মসজিদগুলোর গম্বুজ। এসব গম্বুজ জটিল গাণিতিক হিসাবনিকাশের ওপর নির্ভরশীল। মসজিদগুলোকে অনুপম নান্দনিক কাঠামো দিয়েছে এসব গম্বুজ। এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে

---

২. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩৯-৪৭।
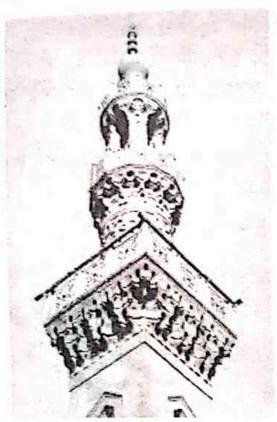
চিত্র নং-৩
বহিঃগাত্রীয় মুকারনাস
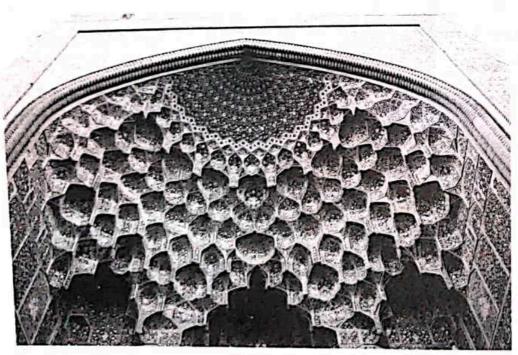
চিত্র নং-৪
অভ্যন্তরীণ মুকারনাস (মেহরাব)

মাশরাবিয়াত নির্মাণকলা

মাশরাবিয়াতের অপর নাম শানশুল বা রুশান। ইসলামি স্থাপত্যশিল্পের বহিঃগাত্রীয় প্রদর্শনমূলক অংশ হলো মাশরাবিয়াত। বাড়িঘরে দুই ধরনের মাশরাবিয়াত নির্মাণ করা হতো : ছিদ্রযুক্ত ও অলংকৃত। মাশরাবিয়াত বৃত্তাকার হলে তার নাম হতো চাঁদনি (কামারিয়্যাহ) এবং বৃত্তাকার না হলে নাম হতো সৌরীয় (শামসিয়্যাহ)। এগুলো হতো কাঠের তৈরি, যাতে জানালার পর্দার মতো শেপ বা আকার দেওয়া হতো। মাশরাবিয়াতের উপকার ছিল অনেক, রোদের তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখত, কমিয়ে রাখত আলোর তেজ এবং মহিলারা বাইরের দৃশ্য দেখতে পেত, যদিও তাদের কেউ বাইরে থেকে দেখতে পেত না। মাশরাবিয়াত ছিল ইসলামি সভ্যতায় নির্মিত বাড়িঘরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৪]

চিত্র নং-৫
মাশরাবিয়াত

[৪]. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়া ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২৬৮-২৬৯।

স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন নির্মাণকলা : মুসলিমরা ধ্বনিবিজ্ঞানের (Acoustics) প্রয়োগ ঘটিয়ে শ্রুত্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নতি সাধন করেছিলেন। যা বর্তমানে স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন প্রযুক্তি (architectural acoustics technology) নামে পরিচিত। ধ্বনিবিজ্ঞানের উদ্ভব ও তার বিশুদ্ধ পদ্ধতিগত নীতিমালার প্রতিষ্ঠায় মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তারা জানতেন যে, ধ্বনি অবতল (ভেতরের দিকে ধনুকের মতো বক্রতাযুক্ত) পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রতিধ্বনিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট পার্শ্বস্থ অবলম্বে এসে কেন্দ্রীভূত হয়। ব্যাপারটি অবতল দর্পণতল থেকে আলোর প্রতিবিম্বিত হওয়ার মতোই।
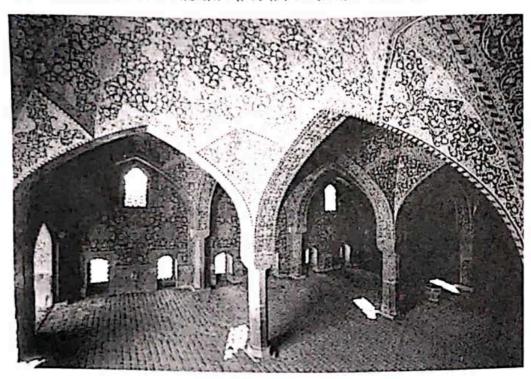
চিত্র নং-৬
স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন নির্মাণকলা

মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা শব্দের কেন্দ্রীভবনের (Focusing of sound) বৈশিষ্ট্যকে নির্মাণকলা ও স্থাপত্যশিল্পে কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে বড় বড় জামে মসজিদে তারা এ কাজটি করেছেন। যাতে জুমআর দিন ও ঈদের দিন ইমাম ও খতিবের আওয়াজ উচ্চকিত হয় ও সমভাবে পরিবেশিত হয়। যেমন : ইস্পাহানের প্রাচীন জামে মসজিদ, আলেপ্পোর আল-আদিলিয়্যাহ মসজিদ, বাগদাদের কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ। এ মসজিদগুলোর ছাদ ও দেয়াল অবতল পৃষ্ঠদেশের আকারে নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা মসজিদের মূল অংশে ও কোণগুলোতে যথার্থ বিন্যাসে

ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে ধ্বনি ও আওয়াজ মসজিদের সর্বত্র সমান পরিমাপে পরিবেশিত হয়।

এসব ইসলামি কীর্তি স্থাপত্যশিল্পে ধ্বনি-পরিবেশন প্রকৌশল ও প্রযুক্তিতে ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী হিসেবে আজও বিদ্যমান। প্রখ্যাত মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী ও স্থাপত্য শ্রুতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ালেস সি. সাবিন (Wallace Clement Sabine, ১৮৬৮-১৯১৯ খ্রি.) ১৯০০ সালের দিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার হলের দুর্বল ধ্বনি-পরিবেশন ব্যবস্থা ও শ্রুতিগুণের সমস্যা ও কারণ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তা ছাড়া তিনি মিউজিক রুম ও হলঘরের ধ্বনি-সরঞ্জামের (Acoustical properties) কার্যাবলি নিয়েও গবেষণা করেন।[৫]

স্থাপত্যশিল্পে ধ্বনি-পরিবেশন প্রযুক্তির উন্নতিতে মুসলিমদের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য ধ্বনির কেন্দ্রীভবনের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট। মুসলিমরা তার প্রায়োগিক উপকারিতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। সমকালীন সভ্যতায় ধ্বনির কেন্দ্রীভবনের এই বৈশিষ্ট্য স্থাপত্যে ধ্বনি-পরিবেশন প্রকৌশলের (architectural acoustics engineering) একটি মৌলিক অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় নাট্যশালা ও বিশাল বিশাল সম্মেলন কক্ষ সজ্জিত হয় গোপনীয় অবতল দেওয়ালে, যা শব্দের প্রতিধ্বনি ও অধিকতর স্পষ্টীকরণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

খিলান নির্মাণকলা

ইসলামি স্থাপত্য-সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গবেষণা ও তথ্যসূত্র থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, মুসলিমদের স্থাপত্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তির প্রথম যে কাঠামো ও উপাদান দৃষ্টি আর্কষণ করে তা হলো ফাঁপা খিলান। ৮৭ হিজরিতে/৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকের মসজিদে উমাইয়াতে প্রথম ফাঁপা খিলান ব্যবহার করা হয়। তারপর এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এটি ইসলামি স্থাপত্যের একটি অনন্য উপাদানে পরিণত হয়। বিশেষ করে মরক্কোয় ও আন্দালুসে ফাঁপা খিলানের ব্যবহার চোখে পড়ে।

---

৫. Robert Jacobus Forbes ও Eduard Jan Dijksterhuis, *A History of Science and Technology*, পৃ. ৬৮।

তারপর ইউরোপীয় স্থপতিরা এই নকশা গ্রহণ করেন এবং তা তাদের স্থাপত্যশিল্পে বিশেষ করে গির্জায় ও অট্টালিকায় ব্যবহার করেন।

চিত্র নং-৭
ফাঁপা খিলান (মসজিদে উমাইয়া)

মুসলিমরা তিনটি ফাঁকযুক্ত বা গহ্বরবিশিষ্ট খিলান নির্মাণের প্রযুক্তিতেও উন্নতি সাধন করেন। গণিতভিত্তিক প্রকৌশলীয় চিন্তাভাবনার ফসল এটি। আন্দালুসের আয-যাহরা শহরের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত দেয়ালের নকশা থেকে গবেষকেরা তা প্রমাণ করেছেন। স্প্যানিশ, ফরাসি ও ইতালীয় গির্জাগুলোতেও এ ধরনের খিলান নির্মাণ করা হয়েছিল।

মাল্টিফয়েল খিলানের নির্মাণকলা

এই খিলানের অভ্যন্তরীণ বা নিচের প্রান্ত অর্ধবৃত্তের মালার আকারে গঠিত। সম্ভবত এই অর্ধবৃত্তের মালার নকশা এসেছে শঙ্খের পার্শ্বদেশের আকার থেকে। তবে তা মুসলিমদের হাতে ইসলামি স্থাপত্যের একটি বিশুদ্ধ প্রকৌশলীয় রূপ নিয়েছে। হিজরি দ্বিতীয় শতক (খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক)-এ নির্মিত স্থাপত্যের যা-কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তাতে এই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এর যাবতীয় জ্যামিতিক বা প্রকৌশলীয় বৈশিষ্ট্য ২২১ হিজরিতে/৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কায়রাওয়ান জামে মসজিদের গম্বুজ

নির্মাণে সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়। মাল্টিফয়েল খিলান তার বিকাশ ও উন্নতির পথে জ্যামিতিক চেহারা ধরে রেখেছে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মাল্টিফয়েল খিলান আরও জটিল রূপ ধারণ করে, ফয়েলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ছোট আকৃতি ধারণ করে, এতে ফুল ও গোলাপের নকশা দেওয়া হয়। এভাবে তা এক মনোমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম অলংকরণখচিত কাঠামোতে পরিণত হয়। এগুলোর দ্বারা সজ্জিত হয় মিহরাব ও আজানখানা।

ইসলামি স্থাপত্যকলায় এসব খিলানের পাশাপাশি আরও নানান আকারের খিলানের দেখা মেলে। যেমন : সূচ্যগ্র খিলান (acute-arch), অন্ধ খিলান (blind arch), ভোঁতা কৌণিক খিলান (obtuse angle arch) ইত্যাদি। ভোঁতা কৌণিক খিলানের ব্যবহার প্রাচ্যে যেমন, তেমনই পাশ্চাত্যেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয় স্থাপত্যে এর বহু উদাহরণ মেলে। যেমন প্রচলিত আছে যে, ভোঁতা কৌণিক খিলানের প্রথম ব্যবহার শুরু হয় ব্রিটিশ স্থাপত্যে, তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে এর ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। খিলানটির নামও পালটে যায়, তখন এটির নাম হয় টিউডার খিলান (Tudor arch)। কিন্তু ইউরোপে ব্যবহারের পাঁচ শতাব্দীরও বেশি পূর্বে এই খিলান ইসলামি স্থাপত্যকলায় ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন মসজিদে তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য রয়েছে। যেমন : (উজির বদরুদ্দিন আল-জামালি (মৃ. ৪৮৭ হি./১০৯৪ খ্রি.) কর্তৃক নির্মিত কায়রোর আল-জুয়ুশি মসজিদ, উজির আল-মামুন আল-বাতায়িহি (মৃ. ১১২৫ খ্রি.) কর্তৃক নির্মিত কায়রোর আল-আকমার মসজিদ এবং আল-আযহার জামে মসজিদ।[৬]

বাঁধ ও পুল নির্মাণকলা

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামি স্থাপত্য প্রকৌশলের নান্দনিকতা ছিল অনেক ব্যাপক; জলবন্ধক, পুল, কৃত্রিম খাল ও নালাগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর নির্মাণকলা ছিল অত্যন্ত নান্দনিক, নকশার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও। তা নদী ও নালায় প্রবহমান পানিতে যোগ করেছিল সৌন্দর্যের নতুন মাত্রা, দর্শক তাতে অভিভূত হয়ে পড়ত।

---

৬. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি*, পৃ. ৪১।

ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষের যুগে মুসলিম স্থাপত্য এবং তার প্রকৌশলীয় ও নান্দনিক নির্মাণকলা ছিল একটি স্বাভাবিক অনুষঙ্গ।

প্রাচীর নির্মাণকলা

ইসলামি স্থাপত্য কৌশলবিজ্ঞানের (মেকানিক্স) প্রায়োগিক দিকগুলোর ওপর নির্ভরশীল ছিল। উঁচু-উঁচু মসজিদ ও লম্বা-লম্বা মিনার নির্মাণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নদীনালার উপরে বড় বড় বাঁধ ও বিশাল পুল নির্মাণ থেকেও তা স্পষ্ট হয়। যেমন : নাহরাওয়ান (নদীর ওপর) বাঁধ, রাস্তান বাঁধ, ফুরাত নদীর ওপর বাঁধ। সালাহুদ্দিন আইয়ুবির যুগে কায়রোতে নির্মিত উঁচু জলপ্রাচীর থেকেও তা প্রমাণিত হয়। এই জলপ্রাচীর নীলনদের উপর দিয়ে ফামুল খলিজ[৭] থেকে মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর নির্মিত দুর্গ পর্যন্ত পানি পৌঁছে দিত।

প্রাণীদের দ্বারা একটি জলসেচক যন্ত্র ঘোরানো হতো যা দশ মিটার উঁচু পর্যন্ত পানি তুলতে পারত। এই যন্ত্রের দ্বারা প্রাচীরের উপর থেকে নালায় জলের প্রবাহ অব্যাহত রাখা হতো।

দুর্গ নির্মাণকলা

ইসলামি সভ্যতায় আরব দুর্গগুলো ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। পাশ্চাত্যের স্থপতিরা এসব দুর্গের নকশা ও নির্মাণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সিগরিড হুংকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। দুর্গ নির্মাণে বৃত্তাকার নকশা ছাড়া পাশ্চাত্য সমাজের আর কিছু জানা ছিল না। মুসলিমরা প্রথমে প্রবেশ করল আন্দালুসে, তারপর গেল সিসিলিতে, তারপর ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংশ্লেষ ঘটল। এরপর থেকেই ইউরোপীয় স্থাপত্যকলার নমুনাগুলো নির্মিত হতে শুরু করল আরব স্থাপত্যকলার নমুনাগুলোর অনুসারে। আরব স্থাপত্যে দুর্গের নির্মাণকলায় প্রাধান্য ছিল বর্গাকারের নকশার, যার কোণগুলোতে থাকত পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরক্ষা টাওয়ার। দুর্গের পার্শ্বদেশেও কখনো কখনো এসব টাওয়ার নির্মিত হতো।[৮]

---

৭. কায়রোর একটি এলাকার নাম।

৮. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪৪০ ও তার পরবর্তী।

চিত্র নং-৮
কাইতবাই দুর্গ

কোনো সভ্যতার স্থাপত্যকলার সৌষ্ঠব ও নান্দনিকতা ওই সভ্যতারই শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বকে প্রমাণ করে। এটি একটি ঐতিহাসিক নীতি। যেমন ইবনে খালদুন বলেছেন, রাষ্ট্র এবং নগরায়ণ একটি মৌল বস্তুর চিত্রের মতো, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সুরক্ষার জন্য এটাই যথার্থ কাঠামো। একটির থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। নগরায়ণ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। তেমনই রাষ্ট্র ছাড়া নগরায়ণও দুঃসাধ্য। তাই এদের একটিতে অসামঞ্জস্য ও সমস্যার সৃষ্টি হলে অন্যটিতে তা অনিবার্য। একইভাবে এদের একটির অনস্তিত্ব অন্যটির অনস্তিত্বকে আবশ্যক করে তোলে।[১]

---

১. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৩৭৬। দেখুন, আদিল ইওয়াজ, আল-মাদিনাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-মাদিনাতুল উরুব্বিয়্যাহ, *মাজাল্লাতুল ইলম ওয়াত-তিকনুলুজিয়া*, সংখ্যা ২৭, ১৯৯২ খ্রি. পৃ. ৩২।
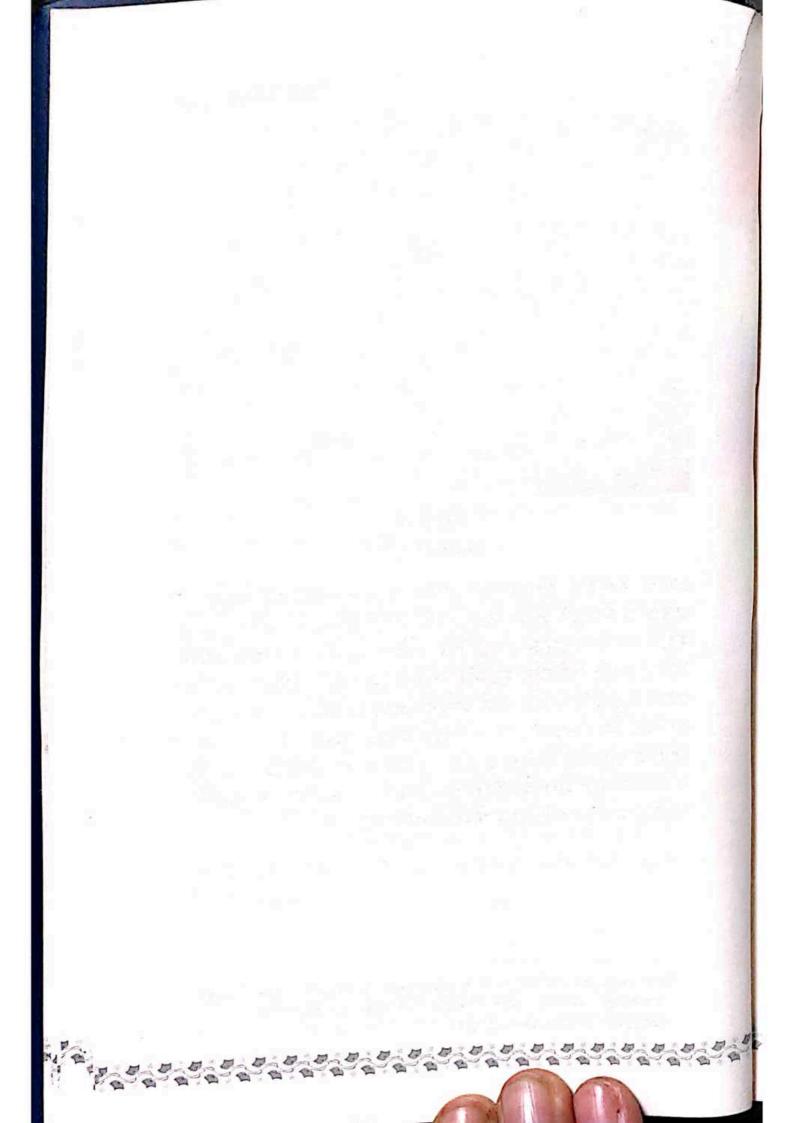
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অলংকরণ-শিল্প

মুসলিম শিল্পীরা নতুন নতুন শিল্পবিশ্বের প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন, যেখানে মানুষ ও প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ঠাঁই পায়নি এবং প্রকৃতিকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করারও প্রয়োজন পড়েনি। এখানেই তাদের প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে, তাদের উদ্ভাবনশক্তি, চিন্তার সক্রিয়তা, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মৌলিক রুচিবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। এসব নতুন বিশ্বের একটি হলো অলংকরণ-বিশ্ব।

চিত্র নং-৯
আরাবেস্ক-শিল্প

সৌন্দর্য সৃষ্টিই ছিল ইসলামি আর্ট বা শিল্পের দায়িত্ব। সৌন্দর্য সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর অন্যতম হলো অলংকরণ। অলংকরণ এমন নির্ভেজাল শিল্পকর্ম, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য সৃষ্টি। এখানে শিল্পকর্মের কাঠামো তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলে গেছে এবং

উভয়টি মিলে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য সৃষ্টির এক সুসংগত ঐক্যের সৃষ্টি করেছে। এই ব্যাপারটি আমরা শিল্পের আর কোনো প্রকারে পাই না।[১০]

চিত্র নং-১০
ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ

ইসলামি অলংকরণ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য

ইসলামি অলংকরণ-শিল্প অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলির অধিকারী, মুসলিমদের জাগরণের সভ্যতাকেন্দ্রিক উপস্থিতি তুলে ধরতে এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। তা ছাড়া ইসলামি অলংকরণ-শিল্প উচ্চ মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করেছে। নকশা ও নির্মাণের দিক থেকে যেমন, তেমনই বিষয়বস্তু ও শৈলীর দিক থেকেও।

মুসলিম প্রযুক্তিবিদরা অনুপম গঠনযুক্ত ও দৃশ্যমানতায় উজ্জ্বল আলংকারিক রেখা ব্যবহার করেছেন এবং সামগ্রিকতার বিচারে অলংকরণের এমনসব নমুনা তৈরি করেছেন যেখানে তাদের ভাবনা স্পর্শ করেছে অন্তিমতাকে, যেখানে রয়েছে পৌনঃপুনিকতা, নতুনত্ব, অনুবর্তন ও বিজড়ন। তারা

১০. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৬৯।

উদ্ভাবন করেছেন তারকা-বহুভুজ (star polygon) এবং পাতা-কাটা নকশার নানা আঙ্কিক। আরবীয় লতানো ও ফুলেল অলংকরণের আরও কিছু শৈলী তারা উদ্ভাবন করেছিলেন, ইউরোপীয়রা যার নাম দিয়েছে আরাবেস্ক (Arabesque)[১১]। আরাবেস্কের প্রথম প্রকাশ ঘটে হিজরি চতুর্থ/খ্রিষ্টীয় দশম শতকে ফাতিমীয় অলংকরণ-শিল্পে আল-আযহার জামে মসজিদে। তারপর থেকে অলংকরণের এই আরবীয় শৈলী বেশ কয়েকটি দেশে অত্যন্ত সমাদর পায়। ইসলামি স্থাপত্যের অলংকরণবিদরা কাঠ, পাথর ও মার্বেলের ওপর সমতল ও নিমজ্জিত খোদাইচিত্রে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন এবং রঙিন উপকরণের ব্যবহার ও নকশার অভিনবত্বেও পরিচয় দেন অসাধারণ দক্ষতার।[১২]

উদ্ভিজ্জ উপাদান ও জ্যামিতিক উপাদানকে এই শিল্পের বিনির্মাণে মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসব উপাদানের মধ্যে কখনো সহযোগিতামূলক সংশ্লেষ ঘটেছে এবং কখনো সম্পূর্ণ আলাদারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে অলংকরণ-শিল্পের দুটি ফর্ম বা শৈলী দাঁড়িয়ে গেছে : একটি হলো ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ এবং অপরটি হলো জ্যামিতিক অলংকরণ।[১৩]

ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ

ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতা ও নানা ধরনের ফুলের তৈরি মোটিফের ওপর নির্ভরশীল। ফুলেল ও লতায়িত অলংকরণ কয়েকটি শৈলীতেই উৎকর্ষ লাভ করেছে; যেমন : একক ও জোড়া অলংকরণ, মুখোমুখি ও আলিঙ্গনাত্মক অলংকরণ। একক অলংকরণ অধিকাংশ সময় একগুচ্ছ উদ্ভিদ্‌জাতীয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়, যা আন্তঃপ্রবিষ্ট, আন্তঃবিজড়িত ও পারস্পরিক অনুরূপ, একটি শৃঙ্খলিত রূপ নিয়ে যার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে।

---

১১. ডালপালা, পাতা, ফুল, সর্পিল বস্তু ইত্যাদির কারুকার্যময় নকশা।

১২. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৪৪।

১৩. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ১৭০-১৭৩।
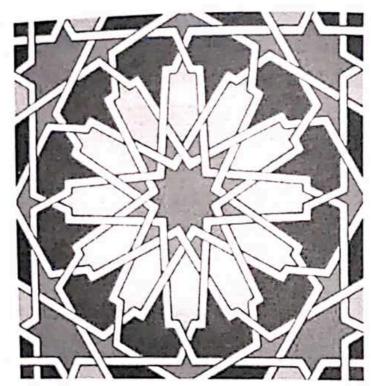
চিত্র নং-১১
জ্যামিতিক অলংকরণ

মুসলিম শিল্পীরা তাদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বলে তারা অলংকরণশিল্পে প্রকৃতির অনুকরণ থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসতেও সক্ষম হন। ফলে পাতা ও ফুলের নকশাগুলো জ্যামিতিক কারুকার্যের রূপ নেয়, যেখানে জীবিত উপাদানের মৃত্যু ঘটে। বিমূর্ত রীতির ধারণটি এখানে সক্রিয় থাকে। দেয়াল ও গম্বুজের অলংকরণে ফুলেল ও লতানো অলংকরণের ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন শিল্পকর্মে (যেমন : তামা ও কাঁচের তৈজসপত্র ও চীনামাটির বাসনকোসন) এবং বইয়ের পৃষ্ঠা ও বাঁধাইয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এই অলংকরণ।

জ্যামিতিক অলংকরণ

ইসলামি অলংকরণশিল্পের এটি আরেকটি প্রকার। জ্যামিতিক রেখার ব্যবহারে ও রুচিস্নিগ্ধ শৈল্পিক কাঠামো প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলিমরা অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বিভিন্ন ধরনের বহুভুজ, তারকা-আকৃতি, আন্তঃপ্রবিষ্ট বৃত্ত ইত্যাদি অলংকরণের বিস্তার ঘটে। এসব অলংকরণে ভবন ও অট্টালিকা সজ্জিত হয়ে ওঠে। কাঠ ও পিতলের শিল্পকর্মে এবং ছাদ ও দরজার নির্মাণেও জ্যামিতিক অলংকরণ ব্যবহার করা হয়। মুসলিমরা যে জ্যামিতিক জ্ঞানে প্রাগ্রসর ছিলেন, এটা তারই প্রমাণ।
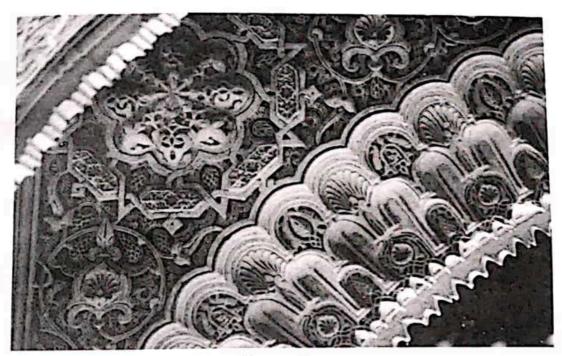
চিত্র নং-১২
নিখুঁত কারুকার্য

মুসলিমরা অলংকরণশিল্পে নানা ধরনের বৃত্তাকার জ্যামিতিক আকৃতি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ষড়ভুজ, অষ্টভুজ ও দশভুজ। এগুলোর সঙ্গে আরও রয়েছে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও পঞ্চভুজ। এসব আকৃতির আন্তঃপ্রবেশন ঘটিয়ে অলংকরণের নতুন নতুন প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে। কিছু জায়গা পূরণ করা হয়েছে এবং কিছু ফাঁকা রাখা হয়েছে এভাবে ক্রমান্বয়ে অংশ থেকে পূর্ণতায়, আংশিক পূর্ণতা থেকে পরিপূর্ণ পূর্ণতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ফলে এসব মনোমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম অলংকরণের অসংখ্য রূপ তৈরি হয়েছে।

মুসলিম শিল্পীদের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানজ্ঞান ছিল নতুন ও অভিনব কাঠামো তৈরি করা, যার মূলে থাকবে কোণ-ছেদকের জটিল জড়াজড়ি বা জ্যামিতিক কাঠামোর জোড়। এতে আরও বেশি শান্ত ও পরিমিত সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটবে।

বহুল ব্যবহৃত জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর মধ্যে রয়েছে : সংলগ্ন বৃত্ত ও আন্তঃপ্রবিষ্ট বা জোড় বৃত্ত, বিনুনি, ভাঙা-ভাঙা রেখা ও জড়াজড়ি রেখা।

যেসব আঙ্গিকের জ্যামিতিক অলংকরণ ইসলামি শিল্পকে বিশিষ্টতা দিয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো : বিভিন্ন সংখ্যক ভুজবিশিষ্ট তারকা-আকৃতি, গঠিত

ফর্ম বা কাঠামোকে বলা হয় তারকা প্লেট (Stellar plates)। অলংকরণের এই আঙ্কিকটিকে কাষ্ঠ ও ধাতব শিল্পকর্মে, কুরআন ও গ্রন্থাবলির সোনালি রঙে গিলটি করা পৃষ্ঠায় এবং ছাদের নকশায় ব্যবহৃত হয়।

ফরাসি শিল্প-ঐতিহাসিক ও শিল্প-সমালোচক অঁরি ফকিলোন (Henri Focillon) ইসলামিক আর্ট সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণধর্মী সূক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এমনকিছু ভাবতে পারি না যা প্রাণকে তার বাহ্যিক আবরণ থেকে মুক্ত করে নিতে পারে এবং আমাদেরকে তার নিহিত বিষয়বস্তুর প্রতি আকর্ষিত করতে পারে। অথচ ইসলামি অলংকরণশিল্পে জ্যামিতিক কারুকার্য ও নকশাগুলোর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটিই ঘটেছে। এসব কারুকার্য ও নকশা সূক্ষ্ম গণিতভিত্তিক চিন্তার ফসল। এই গণিত মূলত দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার বর্ণনাত্মক অলংকরণের একটি শৈলীতে পরিণত হয়েছে। তবে আমাদের এ কথা বলতেই হবে যে, এই বস্তুনিরপেক্ষ অলংকরণশৈলীতে রেখা ও নকশার মধ্যে উচ্ছল প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে। রেখা ও নকশার কাঠামোগুলোতে আনুপাতিক হারে বেড়েছে; কখনো কখনো আলাদা-আলাদাভাবে রয়েছে এবং কখনো কখনো জড়াজড়ি করে রয়েছে। যেন এখানে এক উচ্ছল প্রাণশক্তি রয়েছে এবং সেটাই এসব কাঠামোর মধ্যে সংশ্লেষ ঘটিয়েছে, আবার দূরত্বও তৈরি করেছে; তারপর আবার নতুন করে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে। অলংকরণের প্রতিটি কাঠামোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, ব্যাখ্যাটা নির্ভর করে মানুষ এটিকে কোন দৃষ্টিতে দেখছে এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে কী ভাব উদিত হচ্ছে তার ওপর। এসব কাঠামো একই সময়ে একটি রহস্যের জন্ম দিচ্ছে এবং একটি রহস্যকে উন্মোচিত করছে, যা অনিঃশেষ শক্তি ও সম্ভাবনার পরিচয় বহন করে।[১৪]

ইসলামি অলংকরণশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ শৈলীগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ: আত-তারসি', আত-তাকফিত, আত-তালবিস, আত-তাশিক, আত-তাতইম, আত-তাজসিস, আল-কারনাসা, আত-তাযবিক, আত-তাসফিহ, আত-তাওশি'।

---

[১৪]. সারওয়াত উকাশা, *আল-কিয়ামুল জামালিয়্যা ফিল-ইমারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৯।

অলংকরণশিল্পে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : মার্বেল পাথর, চুন, কাঠ, ধাতব বস্তু, ইট, মোজাইক, চিত্রিত মৃৎপাত্র ও চিনামাটির পাত্র।

অলংকরণশিল্প এবং এর উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনায় ফরাসি দার্শনিক রোজার গারাউডি[১৫] (Roger Garaudy) যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আরব অলংকরণশিল্পকে আলংকারিক ধারণার একটি বৈশিষ্ট্যসূচক ও প্রতিনিধিমূলক প্রকাশ বলে বোধ হয়। তা একই সময়ে বিমূর্ততা ও মূর্ততার মধ্যে সংশ্লেষ ঘটিয়েছে। আরব অলংকরণশিল্পের গাঠনিক উপাদানগুলোর মধ্যে সবসময়ই সমন্বয় সাধন করেছে সংগীত-প্রকৃতির দ্যোতনা ও বৌদ্ধিক জ্যামিতির ব্যঞ্জনা।[১৬]
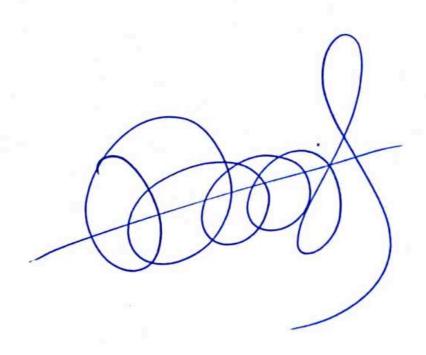
১৫. রোজার গারাউডি : (১৩৩১ হি./১৯১৩ খ্রি.) ফরাসি দার্শনিক। সাংস্কৃতিক, ইতিহাস, সাহিত্য ও মানব বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ উঁচুমানের গবেষক। বিভিন্ন দর্শন গবেষণার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তিনি জায়নবাদী রাজনীতির বিরোধিতা করেন।

১৬. রোজার গারাউডি, *ফি সাবিলি হিওয়ারিল হাদারাত*, পৃ. ১৭৪।
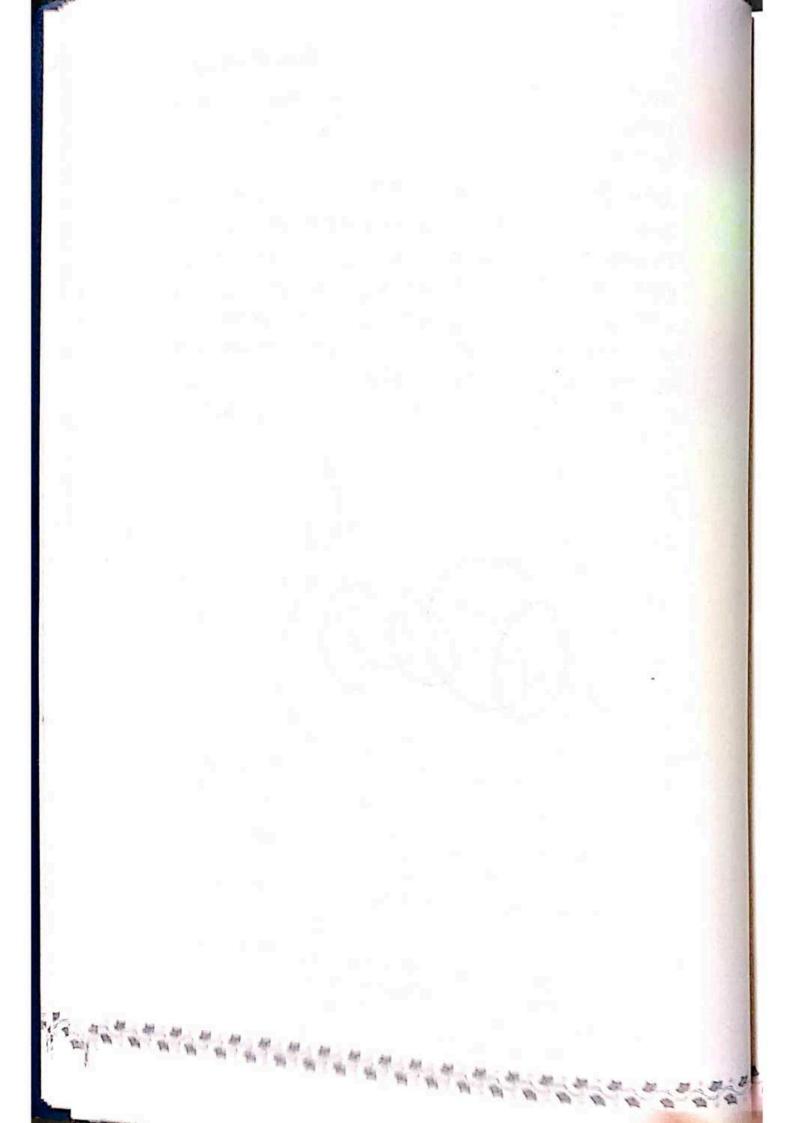
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আরবি লিপিকলা

আরবি লিপির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য

আরবি লিপিকলা একটি বিশুদ্ধ ইসলামি শিল্প। এটি ইসলামধর্মের অন্যতম সৃষ্টি। আরবি লিপিকলার সঙ্গে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার আগে কোনো জাতির মধ্যেই বর্ণ ও বর্ণমালা কোনো দৃশ্যমান শিল্প (দৃশ্যকলা) ছিল না। যদিও প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা ছিল, ভাষা লেখার বিভিন্ন রীতি ছিল। তাদের ভাষার লেখ্য রীতি কেবল ভাষার অন্তর্গত ভাবকেই প্রকাশ করেছে, কারণ ভাষার লিখিত রূপ নিহিত ভাবেরই দৃশ্যমান প্রতীক। কিন্তু এসব প্রতীক বা চিহ্ন (বা বর্ণমালা) নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত হয়নি। তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি ঘটেনি। কিন্তু আরবি বর্ণমালার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটিই ঘটেছে যথাযথভাবে, কারণ আল-কুরআন আরবি ভাষাকে মর্যাদার চাদরে মুড়িয়ে দিয়েছে।[১৭]

ড. ইসমাইল ফারুকি[১৮] বলেছেন, ওইসব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কোনো জাতি-গোষ্ঠীর কেউ-ই–অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ান জাতিসমূহ, হিব্রু জাতিসমূহ, ভারতীয় জাতিসমূহ, তাদের মতো গ্রিক ও রোমান জাতি-গোষ্ঠী... আরবরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত–ভাষার দৃশ্যমান প্রতীকের সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেনি। 'লিখন' ছিল একটি স্থূল ব্যাপার, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো রয়েছে। একে ঘিরে বিশ্বের সংস্কৃতিগুলোতে কোনো নন্দনতাত্ত্বিক প্রচেষ্টা দানা বাঁধেনি। ভারতে, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে,

---

১৭. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৯৬।

১৮. ড. ইসমাইল ফারুকি (১৩৩৯-১৪০৬ হি./১৯২১-১৯৮৬ খ্রি.) : বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি পণ্ডিত। ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত। দর্শনশাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পড়াশোনা করেছেন আমেরিকায় ও পাকিস্তানে। আমেরিকায় অবস্থিত International Institute of Islamic Thought-এর প্রধান ছিলেন।

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী পশ্চিমে 'লিখন' কেবল ভাব-প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত থেকেছে, অর্থাৎ ভাবের দৃশ্যমান প্রতীকরূপেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। হিন্দুধর্মে ও খ্রিষ্টধর্মে ফিগারেটিভ আর্ট মূর্ত শিল্পকলার ক্ষেত্রে 'লিখন' একটি পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ, তা কেবল ভাব-প্রকাশক প্রতীকরূপে শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করেছে...। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাব শৈল্পিক অভিব্যক্তি প্রকাশের উপাদান হিসেবে বর্ণমালা ও শব্দের সামনে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। এই ক্ষেত্রে ইসলামি প্রতিভা সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আরবি লিপিকলা আরাবিস্কের একটি প্রকরণ হিসেবে তার স্থান দখল করে নিয়েছে। ফলে আমাদের জন্য একে স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। এটি অবিমিশ্র ইসলামি শিল্পকলা। লিপিকলার চৈন্তিক বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত না করেই এ কথা বলা যায়।[১৯]

ড. মুস্তাফা আবদুর রহিম এ বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আরবি লিপিকলা একমাত্র শিল্প যার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে আরবে; এটি অবিমিশ্র আরব শিল্প, যা কোনোকিছুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়নি, যার সঙ্গে কোনোকিছুর সংশ্লেষ ঘটেনি...। কতিপয় প্রাচ্যবিদ বলেছেন, তুমি যদি ইসলামি আর্ট সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে সরাসরি আরবি লিপিকলার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।[২০]

আরবি তথ্যসূত্রগুলো, যেমন : *আল-ইকদুল ফারিদ*, *খুলাসাতুল আসার*, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, *আল-ফিহরিসত*, *সুবহুল আ'শা* ও অন্যান্য উৎসগ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, আরবি লিপিকলা মুসলিমদের কাছে যে যত্ন ও পরিচর্যা লাভ করেছে এবং শৈল্পিক উৎকর্ষে মণ্ডিত হয়েছে, অন্যকোনো সভ্য জাতির বেলায় এটা ঘটেনি।[২১]

অল্প কালের মধ্যেই মুসলিম শিল্পীরা আরবি বর্ণমালাকে তার শ্রুত কর্তব্যের পাশাপাশি একটি দৃশ্যমান কর্তব্যে ভূষিত করেন। আরবি বর্ণমালা এই নান্দনিক ময়দানে প্রবেশ করামাত্রই তার বিকাশ দ্রুত এগিয়ে যায়। অলংকরণশিল্পের নকশা ও রেখাগুলোর সঙ্গে তার মিশ্রণ ঘটে, তা

---

১৯. *মাজাল্লাতুল মুসলিমিল মুআসির*, সংখ্যা ২৫, ১৪০১ হি.।

২০. পরিশিষ্ট, *আল-আনবাউল কুয়েতিয়্যাহ*, সংখ্যা ৫১৭, তারিখ : ১৬/০৭/১৯৮৬ খ্রি.।

২১. নাজি যাইনুদ্দিন, *মুসাওয়ারুল খাত্তিল আরাবি*, পৃ. ৩১৫।

বরং অলংকরণশিল্পকে অনেক এগিয়ে দেয়। আরবি লিপিকলা ও অলংকরণশিল্পের মধ্যে রয়েছে দৃঢ় সহযোগিতামূলক সম্পর্ক।[২২]

এই মৌলিক শিল্পের প্রতি মুসলিমদের যে মনোযোগ ও পরিচর্যা এবং তাদের যে বহুবিধ উৎকর্ষ সাধন তার সবকিছু এখানে আমি উল্লেখ করতে পারব না। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি লিপির উল্লেখ করছি : কুফি লিপি[২৩], নাসখি লিপি, সুলুস লিপি, আন্দালুসি লিপি, রুকআ লিপি, দিওয়ানি লিপি, তা'লিক (ফার্সি) লিপি, ইজাযা লিপি ইত্যাদি।

এসব লিপির বহু শাখালিপি রয়েছে, যা আরবি লিপিকলাকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। ফলে আরবি লিপির রয়েছে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা, তা সর্বাবস্থায় ও সব জায়গায় নিজের ভূমিকা পালন করতে পারে। শাখালিপির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। কুফি লিপির শাখালিপি হলো কুফি আল-মুওয়াররাক, কুফি আল-মুযহির, কুফি আল-মুনহাসির, কুফি আল-মুআশশাক বা আল-মুযাফফার বা আল-মুওয়াশশাহ। দিওয়ানি লিপির একটি শাখালিপি হলো জালি আদ-দিওয়ানি। সুলুস লিপির শাখালিপি হলো জালি আস-সুলুস। অন্য লিপিগুলোরও শাখালিপি রয়েছে।[২৪]

মুসলিম শিল্পীদের সৃজনশীলতা

মুসলিম শিল্পীরা কখনো কখনো একাধিক লিপিকে একই পটে সাজিয়েছেন। এতে লিপির সৌন্দর্য ও চাকচিক্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এই শিল্প সৃজনশীলতায় নতুনত্ব ও অভিনবত্বের দিকে এগিয়ে গেছে। লিপিশিল্পে যে প্রতিযোগিতা ছিল তা একে পূর্ণতা দিয়েছে, এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, নান্দনিক উৎকর্ষের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।[২৫]

লিপিকলায় মুসলিম শিল্পীরা কেবল হরফ-বিন্যাস ও তার সৌন্দর্য-বর্ধনে ক্ষান্ত থাকেননি; বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে অভিনবত্বের সৃষ্টি

---

২২. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৯৮।

২৩. মুসলিম বিজেতারা তাদের দ্বীন ও শরিয়তের প্রচারের জন্য এই লিপিকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত মুসহাফগুলো কুফি লিপিতেই লেখা হয়েছে। কুফার আলেমগণই কুফি লিপির উৎকর্ষ সাধন করেন। দেখুন, নাজি যাইনুদ্দিন, *মুসাওয়ারুল খাত্তিল আরাবি*, পৃ. ৩৩৯।

২৪. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

২৫. সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, পৃ. ১৯৯।

করেছেন, সৃজনশীলতা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা স্বয়ং হরফকেই অলংকরণের উপাদান হিসেবে প্রস্তুত করেছেন। ফলে লিপির পটগুলো নান্দনিক আলংকারিক পটে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলিম শিল্পীরা পটের ওপর কী অসীম দক্ষতা ও নিয়ন্ত্রণের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আপনি অবশ্যই বিস্মিত হবেন। তারা হরফকে দিয়ে একই সময়ে দুটি কাজ করিয়ে নিয়েছেন। একটি হলো ভাব প্রকাশের কাজ, অপরটি হলো অলংকরণের কাজ। তারা দ্বিতীয় কাজকে প্রথম কাজের সাজরূপে উপস্থাপন করেছেন!

মুসলিম শিল্পীরা আরবি লিপিকলায় অভিনবত্ব ও সৃজনশীলতার শিখরে পৌঁছেও ক্ষান্ত থাকেননি, তারা হরফের ডানায় চড়ে শিল্পের নতুন নতুন দিগন্তে ভ্রমণ করেছেন। হরফ এখানে কাঠামোগত শিল্পের (ফিগারেটিভ আর্টের) হাতিয়ার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। চাকচিক্যময় নান্দনিক শিল্পের কার্যকরী উপাদানে পরিণত হয়েছে। লিপির আলংকারিক পটের ওপর চোখ পড়ামাত্র প্রথম মুহূর্তে পটে আপনি একটি চিত্র দেখতে পাবেন, সেটা হতে পারে পাখির, হতে পারে কোনো প্রাণীর, ফলের বা প্রদীপের। কিন্তু আপনি একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে চিত্রটি আরবি হরফ ও শব্দ ছাড়া কিছু নয়। এগুলো শিল্পীদেরই আবিষ্কার। বাহ্যিক চিত্রের সঙ্গে এসব শব্দ ও হরফের অর্থগত সামঞ্জস্য থাকে। এটাই অভিনবত্ব।[২৬]

আরবি লিপিকলার ক্ষেত্রে মুসলিমদের ঐতিহ্য এমনই ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাদের এমন কৃতিত্ব ও সৃজনশীলতা আরবি লিপিকলাকে ইসলামি সভ্যতার জন্য যুগ যুগ ধরে ও ইসলামি বিশ্বের সব ভূখণ্ডে এক অনন্য শিল্পরূপে ভাস্বর করে তুলেছে।

---

[২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যসামগ্রীর নান্দনিকতা

আমরা এখানে মুসলিমদের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ও প্রস্তুতকৃত দ্রব্যসামগ্রীর নান্দনিক সৌন্দর্যের কথা বলতে চাচ্ছি। যন্ত্রপ্রকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অতি চমৎকার পন্থায় এগুলো তৈরি করা হয়েছে। এগুলোতে সৌন্দর্য যেন তার উজ্জীবনী শক্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মুসলিম প্রযুক্তিবিদ ও কারিগররা কেবল নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যই এসব যন্ত্র প্রস্তুত করেননি; বরং এগুলোতে অনুপম সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটেছে, যা চিত্তকে মোহিত করে, হৃদয়কে প্রশান্ত করে।

এই পরিচ্ছেদে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সৌন্দর্য

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিল্প-সামগ্রীর সৃজনশীলতা
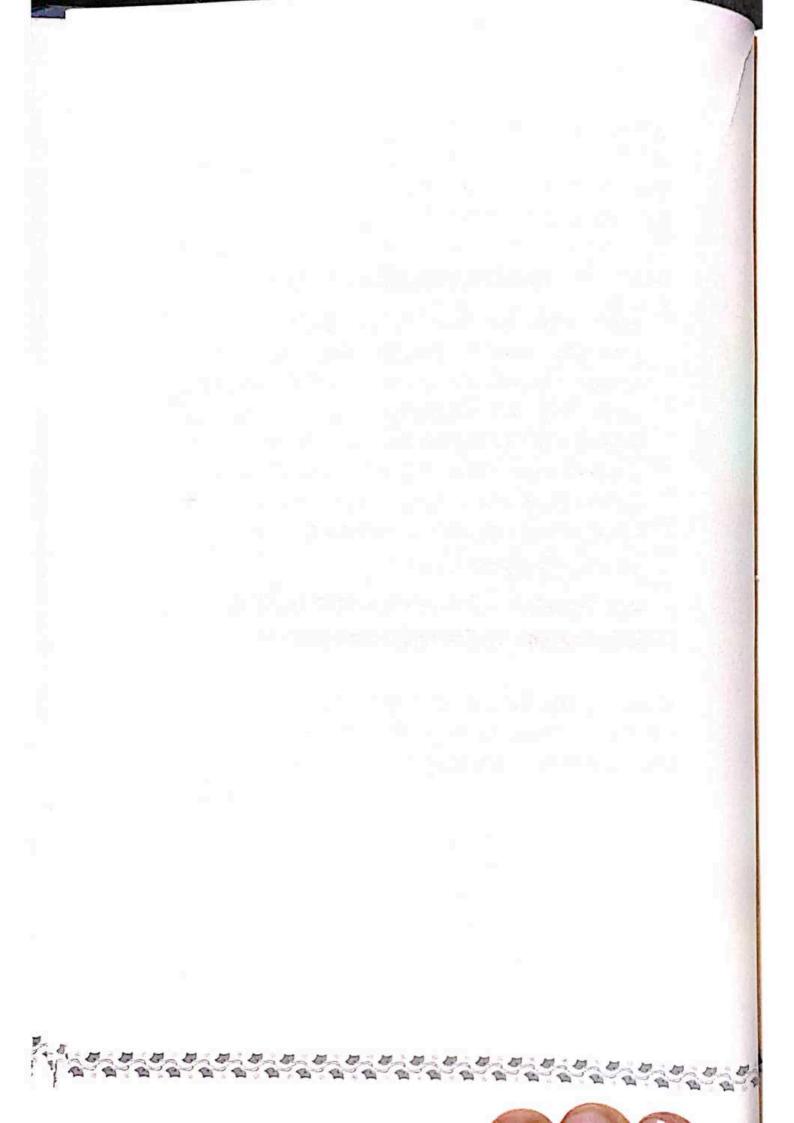
প্রথম অনুচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সৌন্দর্য

প্রযুক্তিবিদ্যায় মুসলিমদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা কেবল মসজিদ, আজানখানা ও গম্বুজ নির্মাণ এবং বাঁধ ও পুল নির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা এমনকিছু অভিনব বস্তু আবিষ্কার করেছেন যেখানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সৌন্দর্য-অনুভূতি ও নান্দনিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। তারা এ ধরনের বিজ্ঞানকে কতটা আয়ত্ত করেছিলেন তারও প্রমাণ মেলে এসব বস্তু থেকে। এসব বস্তু যেমন দৃষ্টিনন্দন তেমনই চিত্তাকর্ষক ও মনোহর।

ইসলামি সভ্যতায় মুসলিম বিজ্ঞানীরা কয়েকটি জটিল যান্ত্রিক আবিষ্কার সম্পন্ন করেছেন। এসব যন্ত্র কেবল এদের সেই ভূমিকাই পালন করবে যে, প্রতিভাবান কেবল উদ্ভাবক এতেই সন্তুষ্ট থাকেননি। বরং কীভাবে এগুলো আরও বেশি নান্দনিক ভূমিকা পালন করবে, সেদিকেও তারা মনোযোগী ছিলেন। কিছু যন্ত্রের উদাহরণ নিচে পেশ করা হলো।

ঘড়ি

ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন যে, জামে দিমাশকের[২৭] একটি ফটকের নাম ছিল বাবুস সাআত বা ঘড়ি-ফটক।[২৮] কারণ এই ফটকে কিছু ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছিল। ঘড়িগুলো উদ্ভাবন করেছিলেন ঘড়ি-নির্মাতা প্রকৌশলী মুহাম্মাদ ইবনে আলি, যিনি ছিলেন ফখরুদ্দিন রিদওয়ান ইবনুস সাআতির পিতা।[২৯] প্রধান ঘড়ি থেকে দিবসের প্রতি ঘণ্টার অতিক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটি টের পাওয়া যেত।

---

[২৭]. উমাইয়া মসজিদ, দামেশক গ্রেট মসজিদ নামেও পরিচিত।-অনুবাদক

[২৮]. অন্য বর্ণনামতে, এটি ছিল দামেশকের একটি ফটক। যা বাবে শারকি বা পূর্ব ফটক নামেও পরিচিত ছিল।-অনুবাদক

[২৯]. ইবনুস সাআতি : দিরদওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে রুস্তম, ফখরুদ্দিন আল-খুরাসানি, ইবনুস সাআতি (মৃ. ৬১৮ হি./১২২১ খ্রি.)। চিকিৎসক, দার্শনিক ও কবি। তার পিতা ছিলেন ঘড়িনির্মাণ-প্রকৌশলী। এ কারণেই তার নাম হয়েছিল আস-সাআতি (ঘড়ি-

এই ঘড়ির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন ইবনে জুবায়েরও। তিনি বলেছেন, বাবে জিরুনের (জিরুন ফটক) বাইরের দিকে ডানপাশে সম্মুখবর্তী যে প্রাসাদ রয়েছে তার প্রাচীরে একটি কক্ষ বিদ্যমান। কক্ষটিতে একটি বড় গোলাকার খিলানের মতো কাঠামো রয়েছে, দিবসের ঘণ্টার সংখ্যানুপাতে এতে রয়েছে পিতলের তৈরি কয়েকটি বৃত্তাকার ছোট খিলান, প্রকৌশলীয় পরিমাপে প্রস্তুত করা হয়েছে এগুলো। দিবসের একটি ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেই পিতলের কাঠামোতে নির্মিত দুটি বাজপাখির মুখ থেকে পিতলের দুটি করতাল পতিত হয়। বাজপাখি দুটি দাঁড়িয়ে আছে পিতল-নির্মিত দুটি ছড়ানো পাত্রের (থালার) ওপর। একটি বাজপাখি আছে এই দরজাগুলোর[৩০] প্রথমটির নিচে, এবং দ্বিতীয় বাজপাখিটি আছে শেষ দরজাটির নিচে। থালা দুটি ছিদ্রযুক্ত; এগুলোতে গোল বল দুটি আঘাত করলে দেয়ালের অভ্যন্তরের কক্ষে ঢুকে যায় এবং দেখা যায় যে, বাজপাখি দুটি থালার দিকে বলসহ তাদের গলা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং খুব দ্রুত বল দুটি নিক্ষেপ করছে। আশ্চর্যজনক কৌশল! দেখলে মনে হয় জাদু ছাড়া কিছু নয়। বল দুটি যখন থালা দুটির ওপর পড়ে, ঝনঝন আওয়াজ শোনা যায়। তখনই দিবসের অতিক্রান্ত ঘণ্টাটির জন্য নির্ধারিত দরজাটি একটি পিতলের পাতের দ্বারা ঢেকে যায়। দিবসের প্রতি ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার সময় ঘড়িটি এভাবেই সচল থাকে। দিবসের ঘণ্টাগুলো শেষ হয়ে যায়, সেগুলোর নির্ধারিত দরজাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পরের দিন আবার প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে।[৩১]

রাতেরবেলার জন্য ঘড়িটির অন্য কৌশল রয়েছে। তা এই যে, উপরিউক্ত ছোট খিলানগুলোর উপরে স্থাপিত বাঁকযুক্ত ধনুকটিতে পিতলের বারোটি বৃত্ত রয়েছে, বৃত্তগুলো ছিদ্রযুক্ত। কক্ষে প্রাচীরের ভেতর থেকে বৃত্তগুলোর উপরে রয়েছে কাচের আড়াল। কাচের পেছনে রয়েছে একটি বাতি, পানির সাহায্যে ঘণ্টার সময়ের অনুপাতে বাতিটি ঘোরে। রাতের একটি ঘণ্টা কেটে গেলে কাচের ওপর বাতির আলো পরিপূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং কাচের সামনে যে বৃত্ত রয়েছে তাতে কাচের রশ্মি ছড়িয়ে যায়, তখন

নির্মাতা)। তিনি দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২১, পৃ. ৪৭১।

৩০. কক্ষের খিলানের মতো কাঠামোতে যেসব বৃত্তাকার ছোট খিলানকে দরজার রূপ দেওয়া হয়েছে।

৩১. ইবনে জুবায়ের, *রিহলাতু ইবনে জুবায়ের*, পৃ. ২৪০-২৪১।

দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে একটি লালাভ বৃত্ত। তারপর ওই বাতি অন্য বৃত্তের কাছে চলে যায়, রাতের ঘণ্টাগুলো কেটে যেতে থাকে এবং একটির পর একটি লালাভ আকৃতি নিয়ে দৃশ্যমান হতে থাকে। ঘড়িটির তত্ত্বাবধান ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কক্ষে একজন লোক নিযুক্ত করা হয়েছে, সে ঘড়ির কার্যক্রম ও পরিবর্তন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। দরজাগুলো পুনরায় খুলে দেওয়া ও করতাল যথাস্থানে রাখা তার কাজ। মানুষ এটির নাম দিয়েছে 'আল-মিনজানা' (অর্থাৎ ঘড়ি)।[৩২]

এ তো গেল ঘড়ির কথা। আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ হিজরি দ্বিতীয় শতকে (খ্রিষ্টীয় নবম শতক, ৮০৭ সালের দিকে) তার বন্ধু ফরাসি সম্রাট শার্লেমাইনের[৩৩] কাছে একটি আশ্চর্যজনক উপঢৌকন পাঠান। উপঢৌকনটি ছিল একটি বিরাটাকার ঘড়ি, ঘড়িটি কামরার দেয়ালের সমান উঁচু এবং অভ্যন্তরীণ জলীয় (ব্যবস্থায় উৎপাদিত) শক্তিতে সঞ্চালিত হয়। প্রতি ঘণ্টা শেষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাতব বল ঘণ্টার সংখ্যানুপাতে একের পর এক পতিত হয়। বলগুলো পতিত হয় একটি পিতলের পাত্রের ওপর, ফলে একটি সংগীতময় অনুরণন শোনা যায়, পুরো প্রাসাদজুড়ে অনুভূত হয় তার গুঞ্জরণ। ঠিক একই সময়ে ঘড়িটির অভ্যন্তরীণ বারোটি দরজার একটি দরজা খুলে যায় এবং সেই দরজা দিয়ে একজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে ঘড়িটির চারপাশে ঘোরে। তারপর যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেখানেই ফিরে যায়। ঘড়িতে বারোটা বাজার সময় বারোটি দরজা দিয়ে একসঙ্গে বারোজন অশ্বারোহী বেরিয়ে আসে এবং ঘড়িটির

---

৩২. প্রাগুক্ত।

৩৩. শার্লেমাইন বা শার্ল দা গ্রেট (Charlemagne) : ৭৬৮ সাল থেকে ফরাসিদের রাজা এবং ৮০০ সাল থেকে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রোমান সম্রাট ছিলেন। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের তিন শতাব্দী পর, শার্লেমাইন ছিলেন পশ্চিম ইউরোপের প্রথম সম্রাট। তিনি ফরাসি সাম্রাজ্যকে অনেক বর্ধিত করে তার মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজত্বকালে তিনি ইতালীয় সাম্রাজ্য দখল করেন এবং পোপ তৃতীয় লিয়ো ৮০০ খ্রি. ২৫ ডিসেম্বর রোম নগরে তাকে ইমপেরাতোর আউগুস্তুস হিসেবে অভিষিক্ত করেন। ৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে পেপিন দা শর্ট-এর মৃত্যুর পর শার্লেমাইন তার ভাই প্রথম কার্লোমানের সাথে ফরাসিদের রাজা হন। ৭৭১ সালে প্রথম কার্লোমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি ফরাসি রাজ্যের (বর্তমান কালের বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং পশ্চিম জার্মানি) নিরঙ্কুশ আধিপত্য গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তিনি রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন, যা ছিল পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। তার জন্ম ৭৪২ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি।-অনুবাদক

চারপাশে পূর্ণ এক চক্কর দিয়ে ফিরে যায়। দরজাগুলো দিয়ে ভেতরে প্রবেশের পর দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এই ঘড়ি সম্পর্কে আরব ও অনারব উৎস-গ্রন্থসমূহে এমনই বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণিত হয়েছে। ঘড়িটি তৎকালে শিল্পের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বস্তু বলে বিবেচিত হয়েছিল। এমনকি তা ফরাসি সম্রাট ও তার সহচরদেরও বিস্ময়াভিভূত করে তুলেছিল। কিন্তু প্রাসাদের পুরোহিতদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাল যে, ঘড়ির ভেতরে নিশ্চয় একটি শয়তান রয়েছে, ওই শয়তানই ঘড়িটিকে নাড়ায়। ফলে তারা রাতের অপেক্ষায় থাকল। রাতেরবেলা কুড়াল নিয়ে উপস্থিত হলো। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে ঘড়িটি পুরো ধ্বংস করে ফেলল। তবে তারা ভেতরে কিছুই পেল না।

ইতিহাসের উৎসগুলো বরাবরই এসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে এবং বলেছে, আরবরা এই ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নতিসাধনে যুগধর্মকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার আরও উদাহরণ আছে। খলিফা আল-মামুনের যুগে ফরাসি সম্রাটকে অধিকতর উন্নত একটি ঘড়ি উপহার দেওয়া হয়েছিল। ঘড়িটি চলত শিকলের সঙ্গে যুক্ত পাথরের বলের সাহায্যে উৎপাদিত যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা। এই শক্তি ছিল জলীয় শক্তির বিকল্প।[৩৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, চিন্তা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইসলামি প্রতিভা সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছিল। এসব উদ্ভাবনে জ্ঞানগত দিক ও নান্দনিক দিকের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

যন্ত্রমানব!

বিশ্ব তো এখন সেই যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে যে যুগকে বলা হচ্ছে যন্ত্রমানবের যুগ। গত কয়েক দশকে যন্ত্রমানবের প্রযুক্তি দ্রুত ও অভাবিত উন্নতি লাভ করার ফলে এ কথা বলা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের ইসলামি জ্ঞান-উৎসগুলো ইঙ্গিত করে যে, যন্ত্রমানবের প্রযুক্তির সূচনা ঘটেছিল ইসলামি সভ্যতার যুগে।

---

[৩৪]. লুইস সিডিও তার Histoire des Arabes 1854, আরবি অনুবাদ : *তারিখুল আরাবিল আম* গ্রন্থে বিষয়টির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেখুন, মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ২২৬।

যন্ত্রপ্রকৌশলী, বিজ্ঞানী বদিউযযামান আবুল ইয্য ইসমাইল ইবনে রাযায জাযারির হাতে যন্ত্রমানবের প্রযুক্তি সূচিত হয়েছিল। তিনি হিজরি ষষ্ঠ শতকে তার জীবৎকাল কাটিয়েছেন। তিনিই প্রথম যন্ত্রমানব উদ্ভাবন করেছিলেন, যা ঘরের মধ্যে সেবাদানে সক্রিয় ছিল। খলিফা তার কাছে এমন একটি যন্ত্র প্রস্তুত করে দেওয়ার আবেদন জানান, যার ফলে খলিফা যখনই নামাযের জন্য অজু করতে চাইবেন খাদেমদের প্রয়োজন পড়বে না, যন্ত্রই সেই প্রয়োজন পূরণ করবে। আল-জাযারি তার জন্য খাদেমের আকৃতিতে খাড়া একটি যন্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন। যন্ত্রটির এক হাতে ছিল একটি পানির পাত্র, অপর হাতে ছিল একটি তোয়ালে। তার পাগড়ির ওপর দাঁড়ানো ছিল একটি চড়ুই। নামাযের সময় হলে পাখিটি কিচিরমিচির ডেকে উঠত। তারপর খাদেমটি তার মনিবের দিকে এগিয়ে আসত। পানির পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ঢেলে দিত। মনিব অজু শেষ করলে সে তোয়ালে এগিয়ে দিত। তারপর সে তার জায়গায় ফিরে যেত এবং চড়ুইটি গান গেয়ে উঠত![৩৫]

আল-কুরআনের ইলেক্ট্রনিক বাহক!

এই আধুনিক কালে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের লরেন্তিয়ান গ্রন্থাগারে (Laurentian Library)[৩৬] উপকারী কলাকৌশল (প্রকৌশল)-বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। পাণ্ডুলিপিটির শিরোনাম '*আল-আসরার ফি নাতায়িজিল আফকার*'। স্প্যানিশ-আরবীয় যুগে রচিত হয়েছে এই পাণ্ডুলিপি। এতে ওয়াটারমিল (Watermill) ও ওয়াটার কম্প্রেসর (Water compressor)-সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ

---

৩৫. জাযারি : তার *আল জামে বাইনাল ইলমি ওয়াল আমাল আল নাফি ফি সিনায়াতিল হিয়াল* গ্রন্থ থেকে। ১৯৭৪ সালে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন এই নামে : *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices*. আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস-রচয়িতা গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত এটিই সবচেয়ে ব্যাখ্যামূলক ও বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থ। মুসলিমদের এই ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এটিকে শিখর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দেখুন, ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩১।

৩৬. লরেন্তিয়ান গ্রন্থাগার (Biblioteca Medicea Laurenziana or BML) ইতালির ফ্লোরেন্সে অবস্থিত। এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে ১১ হাজারেরও বেশি পাণ্ডুলিপি ও ৪ হাজার প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। গ্রন্থাগারটি মেডিসি পোপ ক্লিমেন্ট সপ্তমের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্যশৈলীর জন্য গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত বিখ্যাত। মহান শিল্পী মাইকেলেঞ্জেলো গ্রন্থাগারটির নকশা করেছিলেন।-অনুবাদক

যন্ত্রাংশের (পার্টস) বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রের বা মেকানিক্যাল মেশিনের ত্রিশটিরও বেশি প্রকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। রয়েছে অত্যন্ত উন্নত সূর্যঘড়ি নির্মাণের কলাকৌশল। ইউনিভার্সিটি অব বার্সেলোনার আরবীয় বিজ্ঞান-ইতিহাসের অধ্যাপক জুয়ান ভার্নেট গিনেস (Juan Vernet Ginés) বলেন, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, '*আল-আসরার ফি নাতায়িজিল আফকার*' গ্রন্থটি স্প্যানিশ-আরবীয় লেখক আহমাদ (অথবা মুহাম্মাদ) ইবনে খাল্‌ফ আল-মুরাদির রচনা। তিনি হিজরি পঞ্চম শতকে (খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে) তার জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যান্ত্রিক খেলনা প্রস্তুতকরণের কৌশল শিক্ষাদান। এসব খেলনার অধিকাংশই ছিল ব্যবহার-উপযোগী, যেমন সূর্যঘড়ি। ভার্নেট আরও জোরালোভাবে মন্তব্য করেন যে, এই গ্রন্থ এবং Schmelzer কর্তৃক ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় অনূদিত অপর একটি গ্রন্থের মধ্যে নিকট-সম্পর্ক রয়েছে। ভার্নেট নিশ্চিতভাবে এটাও জানিয়েছেন যে, ফরাসি নকশাবিদ ও স্থপতি Villard de Honnecourt–আরবীয় বিশ্বের প্রযুক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন, যিনি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তার জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন। আরবীয় প্রযুক্তি-বিজ্ঞান একটি স্থায়ী আন্দোলন জিইয়ে রেখেছে।[৩৭]

আল-মুরাদির গ্রন্থে উন্নত প্রযুক্তির যেসব নমুনার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার মধ্যে 'হামিলুল মুসহাফ' বা আল-কুরআনের বাহক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সবচেয়ে বেশি। এটি কর্ডোভার জামে মসজিদে রয়েছে। কুরআনুল কারিমের একটি দুর্লভ কপি এতে বিদ্যমান। হাত দিয়ে ধরা ছাড়াই কপিটি হাতের নাগালে পাওয়া যায় এবং পাঠ করা যায়। কারণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খুলে যায় কুরআন শরিফের হোল্ডার বা ধারকটি। কুরআন শরিফটি রয়েছে একটি বন্ধ সিন্দুকের মধ্যে একটি সচল তাকের ওপর, সিন্দুকটি রয়েছে মসজিদের উঁচু অংশে। সিন্দুকের চাবি ঘোরানো হলে তার দুটি দরজা সঙ্গে সঙ্গে ভেতর দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায় এবং তাকটি নিজ থেকেই কুরআনের কপিটি বহন করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে উঠে যায়। একই সময়ে কুরআনের ধারকটি খুলে যায় এবং

---

৩৭. দেখুন, ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি*, পৃ. ৩৫-৩৬।

সিন্দুকের দরজা দুটি বন্ধ হয়ে যায়। সিন্দুকের তালায় নতুনভাবে চাবি ঢোকালে এবং বিপরীত দিকে ঘোরালে আগের ক্রিয়াগুলোই একের পর এক বিপরীতভাবে ঘটে। এসব ব্যাপার ঘটে এমন কলাকৌশল ও যন্ত্রের সাহায্যে যেগুলো চোখের আড়ালেই থেকে যায়।[৩৮]

মুসলিমরা এসব উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে উপহার দিয়েছে এমন এমন যন্ত্র ও বস্তু যা তাদের সভ্যতার সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা এবং তাদের রুচির সূক্ষ্মতা ও উৎকৃষ্টতাই প্রমাণ করে।

---

৩৮. জোয়ান ভার্নেট, *আল-ইনজাযাতুল মিকানিকিয়্যা ফিল-গারবিল ইসলামি*, মাজাল্লাতুল উলুমিল *আমরিকিয়্যাহ*, আরবি অনুবাদ, কুয়েত, অক্টোবর-নভেম্বর, ভলিউম ১০, ১৯৯৪ খ্রি.। প্রাগুক্ত উৎস থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৫।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
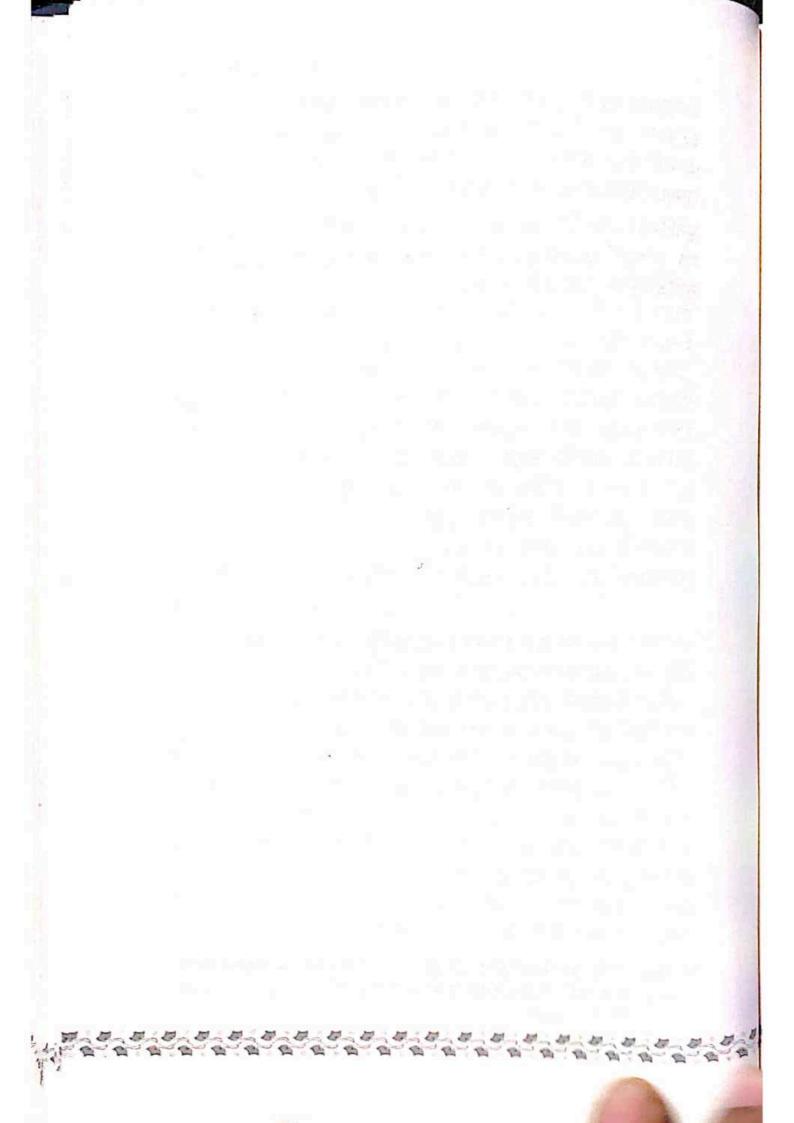
শিল্প-সামগ্রীর সৃজনশীলতা

নান্দনিকতার ক্ষেত্রে শিল্পসামগ্রীর মূল্য তেমন কোনো প্রভাব রাখে না। কারণ এখানে সামগ্রীটির যে সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা রয়েছে তারই আলোচনা হয়, তার মূল্যের নয়। অকিঞ্চিৎকর সামগ্রীর মধ্যেও সৌন্দর্যের এমন নমুনা পাওয়া যায় যা জনজীবনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিষয়কে ফুটিয়ে তোলে, তাদের শৈল্পিক নির্মাতাদের জ্ঞানজগৎকে মূল্যায়ন এবং তাদের উদ্ভাবক ও সংগ্রাহকদের প্রয়োজন অনুধাবনে সাহায্য করে।

গুস্তাভ লি বোঁ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আরবদের মধ্যে সব জায়গাতেই শিল্পকলার বিস্তৃতি ঘটেছিল। আরবরা যেসব বস্তু প্রস্তুত করেছে, চমৎকারিত্ব ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের আদলে সেগুলোকে গড়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের সামান্যতম নির্মাণও শৈল্পিক রুচির পরিচয় বহন করে।[৩৯]

ইসলামি শিল্পকলায় শোভা ও অলংকারের অশেষ আঙ্গিক ও রীতি সব স্থানেই পাওয়া যায়, তা কেবল কুরআনুল কারিমের পৃষ্ঠাগুলোতে অলংকৃত লিপির অনন্য উদাহরণগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়। গল্প-সংকলন বা কবিতা-সংকলনের যেসব কপি খলিফাদের বা আমিরদের উপহার দেওয়া হতো অনুরূপ আঙ্গিকে অলংকারে শোভিত থাকত। উৎকর্ষপূর্ণ ও শিখরস্পর্শী অলংকরণশিল্পের অস্তিত্ব কেবল মসজিদে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা পান্থশালা, মাদরাসা ও আবাসগৃহেও তার উজ্জ্বলতা ছড়িয়েছে।

একইভাবে সংখ্যাহীন শৈল্পিক আঙ্গিক কেবল মসজিদে কুরআন শরিফের কপি রাখার তেপায়াকে আচ্ছাদিতকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং একজন মুসলিম যেসব পাত্র থেকে খাদ্য গ্রহণ করত তাতেও পাওয়া যেত। পাওয়া যেত সৈনিকের বর্মে, তার তরবারিতে এবং মাথা ঢাকার রুমালেও।

---

৩৯. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৫০৭।

অলংকরণগুলো হতো একই পদ্ধতি মেনে। এ কারণে এটাই সবচেয়ে সংগত যে আমরা ইসলামি শিল্পকে একটি অনন্য ও অসাধারণ প্রকরণ হিসেবে বিবেচনা করব। সকল শোভামণ্ডিত বস্তু ও নান্দনিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবহারের জন্য এগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েও এ কথা বলা যায়।[৪০]

ইসলামি শিল্পসামগ্রীতে, সেগুলোর গুরুত্ব যত কমই হোক না কেন, নান্দনিকতার বিস্তার একটি বিষয়, ইসলামি সভ্যতার মর্যাদা প্রকাশে এর আলাদা প্রদর্শনীর প্রয়োজন নেই।

নান্দনিকতার সূচনা ঘটেছে ইসলামের শুরুর যুগেই। বর্ণিত হয়েছে যে, ওহুদ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু দুজানাকে যে তরবারিটি দিয়েছিলেন তার একপাশে খচিত ছিল নিম্নরূপ পঙ্‌ক্তি :

> في الجبن عارٌ وفي الإقبال مكرمة ☆ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر
>
> ভীরুতায় রয়েছে কলঙ্ক, এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই রয়েছে সম্মান। মানুষ ভীরুতা অবলম্বন করে তার ভাগ্যলিপি থেকে মুক্তি পায় না।[৪১]

কবিতা হলো সেই জাদু যার জন্য আরবেরা সবসময় ছিল উল্লসিত ও পাগলপারা।

এরপর থেকেই ইসলামি শিল্পসামগ্রীর উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে এবং অবশেষে নান্দনিকতার এক আশ্চর্যজনক পর্যায়ে পৌছায়। একইসঙ্গে ইসলামি রাজ্যগুলোতে তার সাংস্কৃতিক বিস্তৃতিও ঘটে।

গুস্তাভ লি বোঁ তো ইসলামি শিল্পকলাকে পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়েছেন; তিনি শিল্পকৌশল, অলংকরণ ও নকশাখচিত করা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কোনো কোনো বিষয় তাদের এতটাই আয়ত্তে এসেছিল এবং তারা এতটা দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে আমাদের এ যুগেও সেই পর্যায়ে পৌছা অসম্ভব মনে হয়।[৪২]

---

৪০. ড. ইসমাইল রাযি ফারুকি ও ড. লুইস লামিয়া ফারুকি, *আতলাসুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫৩৯।

৪১. ফারুকি, *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৪৯৭।

৪২. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৫১১।

যাবতীয় ইসলামি শিল্পসামগ্রীই মহৎ শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়েছে : তরবারি, বর্ম, বর্শা, কিরিচ, খঞ্জর, শিরস্ত্রাণ, চিঠি আদান-প্রদানের নল বা বেলন; গৃহের তৈজসপত্র ও সাজসরঞ্জাম, যেমন : চেয়ার, টেবিল, অলংকারের বাক্স, বিভিন্ন জিনিস সংরক্ষণের সিন্দুক, খাবারের পাত্র ও থালা, জগ, পানপাত্র ও কাপ, চীনামাটির বাসনকোসন, দোয়াত এবং দরজা ও জানালা, কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা-বালিশ, ঘোড়ার জিন, মসজিদের বাতি, মিম্বার, মোমদানি, দাঁড়িপাল্লা, চাবি, তালা, দরজার চৌকাঠ, কুঠার, লেখার যন্ত্রপাতি, চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, এমনকি হুক্কাও। এগুলো তো বটেই, এ ছাড়াও এমনকিছু শিল্পসামগ্রী রয়েছে যেগুলোর মধ্যে খচিত নকশা ও অলংকরণই মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যেমন : কানের দুল, গলার হার, হাতের আংটি, পাগড়ির প্রান্ত, নূপুর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও রয়েছে অলংকরণের আরও বিভিন্ন উপকরণ।

উইল ডুরান্ট সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আরবরা তাদের পূর্ববর্তীদের যেসব শিল্পের আয়ত্তীকরণ করেছে, তা তারা যথার্থভাবে আয়ত্তীকরণ করেছে, অনুকৃতি বা নকল করা নয়। আয়ত্তীকরণের মধ্য দিয়ে তারা নতুন নতুন ও মৌলিক বহু কিছু উদ্ভাবন করেছে। তিনি বলছেন, বরং তাদের শিল্পকলায় বিভিন্ন কাঠামো ও আকৃতির মধ্যে সৃজনশীল ও উজ্জ্বল সমন্বয় ঘটেছে। মুসলিমরা অন্যান্য জাতি থেকে যা-কিছু গ্রহণ করেছে তাতে এর মর্যাদা হ্রাস পায় না। যে ইসলামি শিল্পকলা ছড়িয়ে পড়েছে আন্দালুসের আল-হামরা প্রাসাদ থেকে ভারতের তাজমহল পর্যন্ত তা অতিক্রম করেছে স্থানের ও কালের সকল সীমা। উপাদান ও জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে তা মূলত কৌতুক করেছে এবং এক অনন্য শৈলীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সেই শৈলীর বিভিন্ন প্রকরণ রয়েছে। ইসলামি শিল্পকলা মানবাত্মাকে প্রকাশ করেছে অফুরন্ত সৌষ্ঠব ও রুচিবোধের মধ্য দিয়ে, যাকে ওই সময় পর্যন্ত কোনোকিছু ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।[৪৩]

'*আতলাসুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*'[৪৪] গ্রন্থের প্রণেতাদ্বয় (ড. ইসমাইল রাযি ফারুকি ও ড. লুইস লামিয়া ফারুকি) মনে করেন, ইসলামি

---

৪৩. উইল ডুরান্ট, *The Story of Civilization*, আরবি অনুবাদ : *কিসসাতুল হাদারাহ* থেকে উদ্ধৃত, খ. ১৩, পৃ. ২৪০।

৪৪. গ্রন্থটির মূল নাম *The Cultural Atlas of Islam*। আরবি অনুবাদ : ড. আবদুল ওয়াহিদ লু'লু।-অনুবাদক

অলংকরণ তার অশেষ প্রকরণ ও রীতির মধ্য দিয়ে একটি বিষয় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যত্নশীল থেকেছে, তা হলো একত্ববাদ বা তাওহিদ। সবকিছুতে ইসলামি অলংকরণের বিস্তৃতি ইসলামি চিন্তাকেই প্রতিফলিত করেছে। একজন মুসলিমের প্রতিটি উদ্যোগ ও কর্ম হবে আবশ্যিকভাবে ইসলামি চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটাই ইসলামি চিন্তার দাবি।

এ কারণেই উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন মুসলিম শিল্পী লেখালেখির সরঞ্জামাদি রাখার কাঠের একটি সাধারণ বাক্স অলংকরণ করেন, তা তিনি অলংকৃত করেন হাতির দাঁত, ঝিনুক ও রঞ্জিত কাঠের টুকরো দিয়ে; ফলে কাঠের মূল কাঠামোটি কেবল যে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে তা নয়, অপরিচিতও হয়ে ওঠে। ফলে বোঝাই যায় না এটি কি ওক কাঠ, না সেগুন, না মেহগনি।

বড় বড় প্রাসাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যেখানে নির্মাণের মূল উপাদানগুলো অলংকরণ-স্তরের নিচে পুরোপুরিই ঢাকা পড়ে গেছে। যে চিন্তা মৌলিক উপাদানরাশির বস্তুগত মূল্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে না তা-ই এখানে সৌন্দর্যকে বস্তুগত মূল্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত না করার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে; এটাই সাধারণ ইসলামি চিন্তার নির্যাস, যে চিন্তা বস্তুগত মূল্যের ক্ষেত্রে বিমুখ। এই চিন্তার ফলে সৌন্দর্য তার ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সাধারণ ও বস্তুগত দিক থেকে নগণ্যমূল্য জিনিসের মধ্যেও। এ সবকিছু প্রথমত নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যকে তার মূল্য দিয়েছে এবং সবচেয়ে বড় মূল্য দিয়েছে মানবের অস্তিত্বকে।[৪৫]

এই যে দৃষ্টিভঙ্গি—যা ইসলামের শিল্পদর্শনকে মূর্ত করে তোলে তা নিজেই একটি বড় অবদান, দীর্ঘ সময় নিয়ে তার সামনে দাঁড়ানো উচিত। ইসলামি ভাবপ্রবণতাকে কাঠামোবদ্ধ রূপদান এবং প্রকৃতি ও স্রষ্টা, জীবন ও বিশ্বের জন্য মানবিক বোধ নির্মাণে তা কী গভীর অবদান রেখেছে তা পুঙ্খানুরূপে যাচাই করা উচিত।

নিচের চিত্রগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলামি শিল্পসামগ্রীতে—তার মূল্য যত কমই হোক না কেন—সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা ছিল একটি মৌলিক উপাদান এবং তার উপস্থিতি সব ধরনের সামগ্রীতেই ছিল।

---

[৪৫]. ড. ইসমাইল রাযি ফারুকি ও ড. লুইস লামিয়া ফারুকি, আতলাসুল হাদারাতিল ইসলামিয়া, পৃ. ৫৪০ ও তার পরবর্তী।

চিত্র নং-১৩
কুঠার

চিত্র নং-১৪
তালা ও চাবি

চিত্র নং-১৫
অশ্বপৃষ্ঠের জিন

চিত্র নং-১৬
জগ

চিত্র নং-১৭
পট

চিত্র নং-১৮
অলংকার

চিত্র নং-১৯
থালা

চিত্র নং-২০
পানপাত্র

চিত্র নং-২১
মোমবাতি
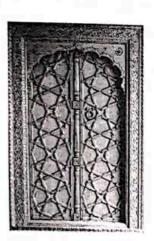
চিত্র নং-২২
দরজা
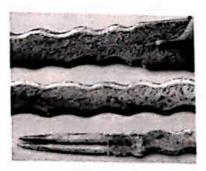
চিত্র নং-২৩
তরবারির খাপ

চিত্র নং-২৪
খিলান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিবেশের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা

আল-কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস যে অপরিসীম সৌন্দর্যের ভান্ডার বিলি করছে তা থেকেই মুসলিমরা প্রেরণা লাভ করতে চেয়েছেন সবসময়। পৃথিবীর বুকে জান্নাত রচনা করতে তারা প্রেরণা পেয়েছেন এখান থেকেই।

আল-কুরআনের আয়াত যে জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছে ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস যে জান্নাতের চিত্র তুলে ধরেছে তা অবশ্যই শ্রোতার মধ্যে নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যের অনুভূতি তৈরি করে। ইসলাম যখন প্রায়োগিক ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা তাহলে তো এটা আশাই করা যায় যে, শ্রোতা শ্রবণানন্দকে নির্মাণানন্দে রূপান্তরিত করবে।

ইসলাম পরিবেশের সৌন্দর্য রক্ষার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে তা এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকেই বোঝা যায়। একে মানবসভ্যতার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবেও আখ্যায়িত করেছে। অথচ পরিবেশ, পরিবেশ-সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে সাম্প্রতিক কালে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিচ্ছেদে আমরা ইসলামি সভ্যতা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যে সৌন্দর্য নির্মাণ করেছে, যার ফলে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে চিত্তাকর্ষক ও নয়নাভিরাম... যা দর্শকদের মুগ্ধ করে। আমরা এই পরিচ্ছেদে নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সৌন্দর্য-বিষয়ক আলোচনা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি সভ্যতায় বাগানের বিস্তার

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি বাগানগুলোর অনন্যতা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ফোয়ারা
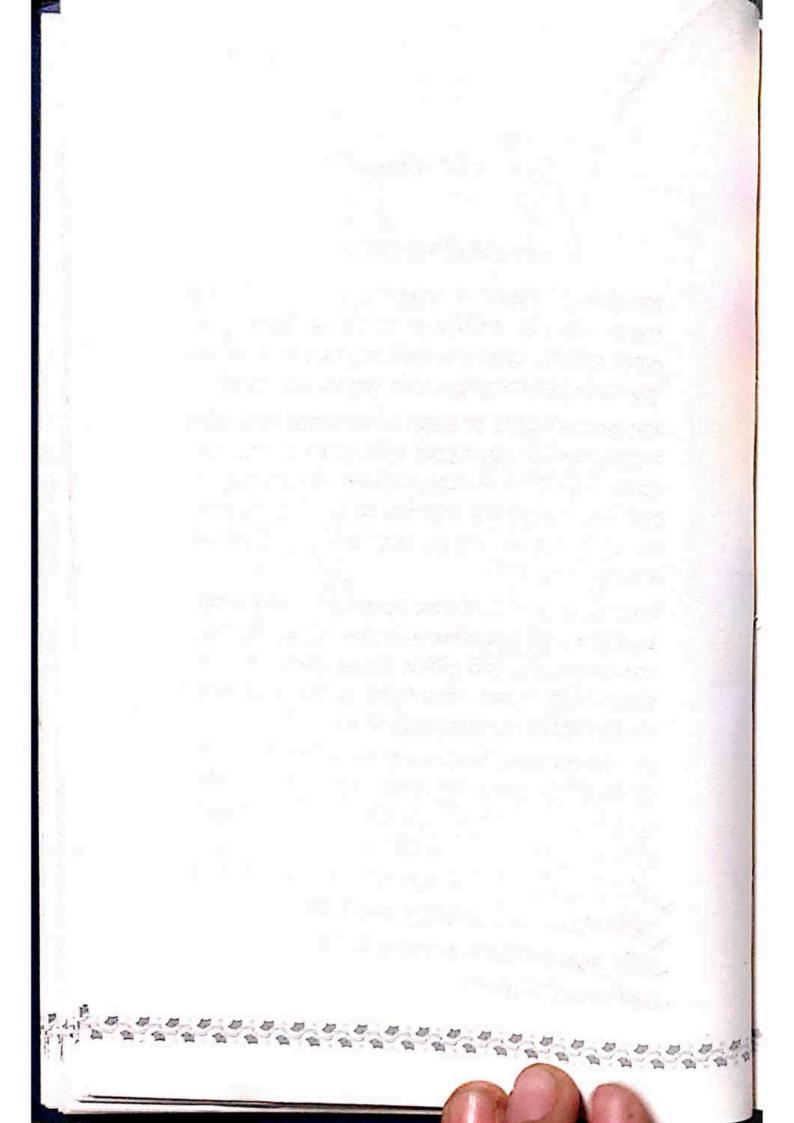
প্রথম অনুচ্ছেদ

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সৌন্দর্য-বিষয়ক আলোচনা

গাছ, লতাপাতা, উদ্ভিদ, ফল ও ফসল সৃষ্টির পেছনে যে প্রজ্ঞা নিহিত তা কেবল আমাদের পরিচিত প্রাণিজগতের জন্য অপরিহার্য উপকারিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ, তা কেবল মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য নয় অথবা কেবল প্রকৃতির শ্বাস নেওয়ার ফুসফুস নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কিতাবে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বৃক্ষরাজি ও উদ্যানসমূহ মানবজীবনে আরও একটি ভূমিকা পালন করে, মানবহৃদয়ে আনন্দ ও সজীবতা এবং উদ্যম ও প্রাণোচ্ছলতা জাগরূক রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾

> বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর এর দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষরাজি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো ইলাহ আছে কি? তবু তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়।[৪৬]

যে নান্দনিক বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিকে তার ভিন্ন ভিন্ন অজস্র উপাদান সত্ত্বেও অনন্য ও অসাধারণ করে তুলেছে তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত একটি সাধারণ রীতিরই বাস্তবিক রূপ। পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। তিনি তার বান্দাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন যে তারা এই

---

[৪৬]. সুরা নামল : আয়াত ৬০।

নীতিকে তাদের চরিত্রে ধারণ করবে। তা হলো সৌন্দর্যের নীতি (সৌন্দর্যতত্ত্ব)! আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন।[৪৭]

কুরআনুল কারিমে যে বৃক্ষরাজি, ফল ও ফসল এবং বাগান ও উদ্যান সম্পর্কে অনেক আলোচনা রয়েছে তা সম্ভবত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যেমন : আল-কুরআনে শাজার (গাছ) শব্দটি তার থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দসহ ছাব্বিশবার এসেছে; সামার (ফল) শব্দটি তার থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দসহ এসেছে বাইশবার; নাবাত (তৃণ ও উদ্ভিদ) শব্দটি তার থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দসহ এসেছে ছাব্বিশবার; হাদিকাহ (বাগান) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তিনবার; জান্নাত (উদ্যান) শব্দটি একবচন ও বহুবচনসহ বর্ণিত হয়েছে একশ আটত্রিশবার।

বরং কুরআনুল কারিমে মানুষ ও প্রাণিকুলের খাদ্য হিসেবে গাছ ও ফলের প্রসঙ্গ যতবার এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যগত সৌন্দর্যের দিকটিও এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾

মানুষ তার খাদ্যের দিকে লক্ষ করুক! আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি, তারপর আমি ভূমি উৎকৃষ্টরূপে বিদারিত করি; এবং তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; আঙুর, শাকসবজি, যাইতুন, খেজুর, বহুবৃক্ষশোভিত উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য, তা তোমাদের ও তোমাদের প্রাণীদের ভোগের জন্য।[৪৮]

---

[৪৭]. *মুসলিম*, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : তাহরিমুল কিব্‌র ওয়া বায়ানুহু, হাদিস নং ৯১; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৩৭৮৯; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৪৬৬।

[৪৮]. সুরা আবাসা : আয়াত ২৪-৩২।

বৃক্ষরাজিশোভিত ও ফলরাশিপূর্ণ উদ্যান সৃষ্টির পেছনে যে নন্দনতাত্ত্বিক প্রজ্ঞা, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এমন চমৎকার পদ্ধতিতে। এর পাশাপাশি কুরআন মাজিদ ও পবিত্র সুন্নাহ জান্নাত বা উদ্যানের যে চিত্রাঙ্কন করেছে সেখানেও রয়েছে মানসিক সুখ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নানা উপকরণ। পরিবেশের সঙ্গে জীবনযাপনে এই অনন্য চিত্রায়ণের অনুকরণ করতে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধকরণে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে এসব বিষয়।

কুরআনুল কারিমে উদ্যানের যেসব দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে তার কিছু ফুটে উঠেছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে,

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ مُدْهَامَّتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ○ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾

আর যে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়ই বহু শাখা-

পল্লববিশিষ্ট। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুটি প্রস্রবণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেইসবের মাঝে রয়েছে বহু আনত-নয়না, যাদেরকে পূর্বে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে? সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? এই উদ্যান দুটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ঘন সবুজ এই উদ্যান দুটি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? যেখানে রয়েছে ফলমূল—খেজুর ও আনার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? সেই উদ্যানসমূহে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীরা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা হুর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তাদেরকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার ওপর।[৪৯]

---

[৪৯]. সুরা রহমান : আয়াত ৪৬-৭৬।

এ ছাড়াও কুরআনের আরও অনেক আয়াতে অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহ দ্বিতীয় উৎস, যেখান থেকে মুসলিমরা প্রাকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি তাদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিকে শাণিত করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنَا عَنِ الْـجَنَّةِ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: لَبِنَةُ ذَهَبٍ وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ، وَمِلاَطُهَا الْـمِسْكُ الأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلاَ يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلاَ يَمُوتُ، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُه»

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাত সম্পর্কে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, তার নির্মাণ কী দিয়ে? তিনি বললেন, জান্নাতের একটি ইট রুপার, আরেকটি ইট সোনার। তার প্রলেপ (প্লাস্টার) সুরভিত মিসকের। মুক্তা ও পদ্মরাগ হলো তার কঙ্কর। তার মাটি হলো জাফরান। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো কষ্ট পাবে না । সে সেখানে হবে চিরঞ্জীব, কখনো তার মৃত্যু হবে না। তার পোশাক জীর্ণ হবে না, কখনো ফুরাবে না তার যৌবনকাল।[৫০]

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ لِلْـمُؤْمِنِ فِي الْـجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيْلاً، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْـمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

নিশ্চয় মুমিনের জন্য জান্নাতে একটি শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা মুক্তা দিয়ে তৈরি তাঁবু থাকবে। তাঁবুটির দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। মুমিন বান্দার

---

৫০. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮০৩০। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি সহিহ।

জন্য সেখানে হুর-বালা থাকবে। মুমিন বান্দা তাদের কাছে যাবে, কিন্তু তাদের একজন অপরজনকে দেখতে পাবে না।[৫১]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ فِي الْـجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا»

নিশ্চয় জান্নাতে এত বড় গাছ থাকবে, অশ্বারোহী তার ছায়ায় একশ বছর ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।[৫২]

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْـجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْـمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ. فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ»

আমি জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, এ সময় একটি ঝরনার কাছে এলে দেখি তার দুই ধারে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী হে জিবরাইল? তিনি বললেন, এই কাউসারই আপনাকে দিয়েছেন আপনার প্রতিপালক। তার মাটি (বা তার ঘ্রাণ) সৌরভময় মিসক।[৫৩]

এই নান্দনিকতা ও সৌন্দর্য প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহে প্রচুর দলিল রয়েছে। সর্বজনীন ইসলামি চেতনার কাঠামো নির্মিত হয়েছে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগ্য উপকরণের প্রতি কৌতূহলের ওপর ভিত্তি করে, তাই মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহর উপর্যুক্ত অনন্য চিত্র অনুকরণ করে মানবসভ্যতাকে দুহাত ভরে উপহার দিয়েছেন।

---

৫১. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাফসির, বাব : তাফসিরু সুরাতির রাহমান, হাদিস নং ৪৫৯৮; মুসলিম, কিতাব : আল-জান্নাতু ওয়া সিফাতু নাইমিহা ওয়া আহলিহা, বাব : সিফাতু খিয়ামিল জান্নাতি ওয়া মা লিল মুমিনিনা ফিহা মিনাল আহলিনা, হাদিস নং ২৮৩৮।

৫২. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খালকি, বাব : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া আন্নাহা মাখলুকাহ, হাদিস নং ৩০৭৯; মুসলিম, কিতাব : আল-জান্নাতু ওয়া সিফাতু নাইমিহা ও আহলিহা, বাব : ইন্না ফিল জান্নাতি শাজারাতান ইয়াসিরু রাকিবু ফি যিল্লিহা মিআতা আমিন লা ইয়াকতাউহা, হাদিস নং ২৮২৭।

৫৩. *বুখারি*, আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : আর-রিকাক, বাব : আল-হাউদ, হাদিস নং ৬২১০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৩০১২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় বাগানের বিস্তার

বাগানের দৃশ্য বুকের মধ্যে আনন্দ, প্রফুল্লতা, উদ্যম ও প্রাণশক্তি সৃষ্টি করে। এই আনন্দের অনুভূতি এবং সজীব-সপ্রাণ সৌন্দর্যের চিন্তা হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করে তোলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বাগানে-উদ্যানে অসাধারণ নৈসর্গিক নিদর্শন-সম্পর্কিত ভাবনা সেই স্রষ্টার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ করে, যিনি এই বিস্ময়কর সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। একটিমাত্র ফুলকে রঞ্জিত ও সুসজ্জিত করে প্রাণময় করে তোলা মানবজাতির সমস্ত বড় শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব নয়। একটি ফুলে রঙের বিস্তার ও বৈচিত্র্য, আঁকিবুকির কারুকাজ ও পাপড়িগুলোর বিন্যাস এমন মুজিযা ও অলৌকিকতা প্রকাশ করে যার সামনে প্রাচীন কালের ও আধুনিক কালের যাবতীয় শিল্পপ্রতিভাই অক্ষম। বৃক্ষরাজিতে যে বর্ধনশীল প্রাণের অস্তিত্ব তার কথা তো বলাই বাহুল্য, কারণ তা এমন অদ্ভুত রহস্য যা মানুষের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য...।[৫৪]

কুরআন ও সুন্নাহ চোখ ধাঁধানো দীপ্তিময় চিত্ররাশি দ্বারা পরিপূর্ণ, তার বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটেছে ইসলামি সভ্যতার ওপর। প্রাচ্যে ও মাগরিবে[৫৫] ইসলামের এমন কোনো সভ্যতা নেই যেখানে নয়নাভিরাম বাগান ও উদ্যান রচিত হয়নি, এসব বাগান ও উদ্যানে চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা ছড়িয়েছে ইসলামি স্থাপত্য-চেতনা। আন্দালুস, তুরস্ক, সিরিয়া

---

৫৪. সাইয়িদ কুতুব, *তাফসির ফি যিলালিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৩৯০।

৫৫ বর্তমানে মাগরিব কথাটি দিয়ে মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার সমগ্র অঞ্চলকে বোঝানো হয়; ব্যাপকতর অর্থে লিবিয়া ও মোরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতীতকালে আরবি ভাষায় মাগরিব বলতে অবশ্য দেশ তিনটির যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, সেগুলোকে বোঝানো হতো। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ স্পেন, পর্তুগাল, সিসিলি দ্বীপ এবং মাল্টা দ্বীপপুঞ্জকেও মাগরিবের অন্তর্ভুক্ত করেন। মাল্টা দ্বীপপুঞ্জে আজও আরবি ভাষার একটি মাগরিবীয় উপভাষা প্রধান ভাষা হিসেবে প্রচলিত। অ্যাটলাস পর্বতমালা এবং সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি আফ্রিকার বাকি অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন। জলবায়ু, ভূমিরূপ, অর্থনীতি ও ঐতিহাসিক দিক থেকে এটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেই বেশি সম্পৃক্ত।-অনুবাদক

(শাম), পারস্য, মিশর, সমরকন্দ, মরক্কো, তিউনিসিয়া, ইয়ামেন, ওমান, ভারত ও অন্যান্য এলাকায় এসব বাগান ও উদ্যানের ছড়াছড়ি ছিল।

আন্দালুসে[৫৬]

কর্ডোভা : আবদুর রহমান আদ-দাখিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'আর-রুসাফা' (রুসাফা আল-আন্দালুস)। ইসলামের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় উদ্যান হিসেবে বিবেচিত হয়। সিরিয়ায় (শামে) যে রুসাফাটি ছিল তার অনুকরণেই তিনি এটি তৈরি করেছিলেন। সিরিয়ার রুসাফাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার দাদা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক। দাদার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্ডোভার শহরতলিতে আবদুর রহমান তৈরি করেন তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় উদ্যান। তিনি উদ্যানটির জন্য সব এলাকা থেকে বিস্ময়কর সব উদ্ভিদ ও মহামূল্য সব গাছ সংগ্রহ করেন। ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক[৫৭] যেসব গাছের সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন সেগুলোও তিনি এই উদ্যানে নিয়ে আসেন। তার দুইজন দূত গোটা সিরিয়া ভ্রমণ করে বাছাই করা বীজ ও দুর্লভ দানা সংগ্রহ করেন। এগুলো ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও যথাযথ পরিচর্যার ফলে কিছুকালের ব্যবধানেই মনোরম গাছগাছালিতে পরিণত হয়। গাছগুলোতে ফলে আশ্চর্যজনক সব ফল। কয়েক বছরের মধ্যেই এসব গাছ গোটা আন্দালুসে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য গাছের তুলনায় এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।[৫৮]

গ্রানাডা[৫৯] : গ্রানাডার নগরপ্রাচীর ঘিরে চতুর্দিকে উদ্যান আর বাগান চোখে পড়ে। এগুলোকেও আরেকটি প্রাচীর মনে হয়।[৬০] এটা হলো

---

৫৬. বিস্তারিত দেখুন, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সালমা খাদরা জাইয়ুশি (সম্পাদনা), অধ্যায় : العلم والتكنولوجيا والزراعة (Science, Technology and Agriculture), অনুচ্ছেদ : الحديقة الأندلسية : دراسة أولوية في مدلولاتها الرمزية (The Hispano-Arab Gerden : Notes towards A Typology), লেখক : জেমস ডিকি (James Dickie), খ. ২, পৃ. ১৪১১ ও তার পরবর্তী।

৫৭. ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইবনে আবুল আস (৬৮৭-৭২৪ খ্রি.) ছিলেন আবদুর রহমানের দাদার ভাই এবং উমাইয়া খেলাফতের নবম খলিফা। তিনি দ্বিতীয় ইয়াযিদ নামেও পরিচিত।-অনুবাদক

৫৮. আহমাদ মুহাম্মাদ আল-মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ৪৬৭।

৫৯. ইবনে খতিব, *আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা*, অনুচ্ছেদ : ওয়াসফু হাদাইকি গারনাতা, পৃ. ১১৫ ও তার পরবর্তী।

শহরের বাইরের দৃশ্য। শহরের ভেতরে প্রাসাদগুলোতেও বাগান ছিল। আল-হামরা প্রাসাদের বাগানগুলোকে ইসলামি সভ্যতার বাগানগুলোর মধ্যে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা যায়।

গ্রানাডায় আরও আছে 'জান্নাতুল আরিফ'[৬১] বাগান। বাগানটি নির্মাণ করা হয়েছে পাহাড়ের উপরে, মুসলিম শিল্পীরা এটিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে সাজিয়েছেন। বাগানটির প্রশস্ততা প্রায় তেরো মিটার এবং স্তর প্রায় ছয়টি। এই বাগানে পানি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বাগানটির উপরের স্তর থেকে ঝরনার মধ্য দিয়ে পানি নেমে আসছে এবং কয়েকটি নালা দিয়ে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে। এই বাগানের কারিগরেরা যে কুরআনের এই আয়াত, ﴿وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ﴾—'সদা প্রবহমান পানি'[৬২]-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।[৬৩]

চিত্র নং-২৫
আন্দালুসের বাগান

৬০. প্রাগুক্ত।
৬১. বর্তমানে এটি Generalife নামে পরিচিত।
৬২. সুরা ওয়াকিআ : আয়াত ৩১।
৬৩. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২২৩।

কর্ডোভার স্বর্ণযুগ যখন শেষ হয়ে গেল এবং তায়িফা[৬৪] আমিরদের যুগ শুরু হলো, তখনও বাগান নির্মাণের ধারা অব্যাহত ছিল। এক্সপিরাসিওন গার্সিয়া সানচেজ[৬৫] আন্দালুসের বাগানগুলোর চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, খেলাফত যখন ভেঙে গেল এবং তায়িফা নৃপতিদের উদ্ভব ঘটল, নতুন শাসকরা পদচ্যুত খলিফাদের রীতিনীতি অনুকরণ করতে কিছুমাত্র পিছপা হলো না। ফলে ওইসব কৃত্রিম বাগানের আধিক্য দেখা গেল, নতুন নৃপতিদের প্রাসাদগুলোর প্রত্যেকটিতেই একাধিক বাগান তৈরি হলো। এসব বাগানের প্রতিটিতে থাকতেন একজন কৃষিবিদ, যিনি বাগানটির তত্ত্বাবধান করতেন।[৬৬]

আন্দালুসে বাগান ছিল বাড়ির সমান সংখ্যক। প্রত্যেক বাড়িতে ছোট করে হলেও একটি বাগান থাকত। জেমস ডিকি[৬৭] গ্রানাডার ছোট ছোট বাড়ি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, অধিকাংশ বাড়ি ছোট হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই ছিল প্রবহমান জল, অজস্র ফুল, সৌরভময় গোলাপরাশি, তরুগুল্ম এবং আরাম ও সুখ লাভের সব উপকরণ। এসব বিষয় প্রমাণ করে যে, এই পৃথিবী যখন মুরদের

---

৬৪. ৪২২ হিজরিতে/১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে উজির আবুল হায্‌ম ইবনে জাহওয়ার আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের পতনের ঘোষণা দেন। ফলে এলাকাগুলো কোনো একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধীন না থেকে আমিরদের স্বাধীন আমিরাত বা রাজ্যভূমিতে পরিণত হয়। তাদেরকে তায়িফা আমির বা গোত্রভিত্তিক আমির বলা হতো।-অনুবাদক

৬৫. এক্সপিরাসিওন গার্সিয়া সানচেজ (Expiración García Sánchez) : গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি ইতিহাসের অধ্যাপিকা এবং মাদ্রিদে অবস্থিত স্প্যানিশ ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) আরবি ভাষা বিভাগের গবেষক।

৬৬. বিস্তারিত দেখুন, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সালমা খাদরা জাইয়ুশি (সম্পাদনা), অধ্যায় : العلم والتكنولوجيا والزراعة (Science, Technology and Agriculture), অনুচ্ছেদ : الزراعة في إسبانيا المسلمة (Agriculture in Muslim Spain), লেখক : এক্সপিরাসিওন গার্সিয়া সানচেজ, খ. ২, পৃ. ১৩৭০।

৬৭. জেমস ডিকি (ইয়াকুব যাকি) : আন্দালুস বা ইসলামি স্পেনের ইতিহাস এবং ইসলামি শরিয়ায় বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী পণ্ডিত। পণ্ডিত হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করেছেন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে, লানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটিতে (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি)। ইসলামিক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স ১৯৭৪-১৯৭৬-এ তিনি উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৫ সালে তিনি কায়রো থেকে ইবনে গুহাইদ আল-আন্দালুসির নৃবিজ্ঞানের ওপর একটি রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেন।

(আরবদের) হাতে ছিল তখন আজকে যেমন আছে তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ছিল।[৬৮]

ইসলাম বুল[৬৯] (কনস্টান্টিনোপল)

যদি আমরা ইসলামি মধ্যপ্রাচ্যের দিকে ভ্রমণ করতে শুরু করি তাহলে আমরা উসমানি খেলাফতের রাজধানীতে পৌঁছে যাব। আমরা দেখব যে, সেখানে কেবল ইসলাম প্রবেশের ফলেই দেশের সর্বত্র বাগান ও উদ্যানের বিস্তার ঘটেছে। আনাতোলিয়ান বাগানগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যরকম, প্রথমে বাগানের নকশা তৈরি করা হতো, তারপর সেই নকশা অনুযায়ী বাগান তৈরি করা হতো। এ কারণেই ইস্তাম্বুলের প্রাসাদগুলোর নাম ছিল 'হাদিকাহ' বা বাগান। যদিও প্রাসাদগুলো থাকত বাগানের অভ্যন্তরীণ অংশে। এসব বাগান বিনোদন, সামাজিক অনুষ্ঠান ও সরকারি সভার কাজে ব্যবহৃত হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাগানগুলো তৈরি করা হয়েছে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে, যেমন ইস্তাম্বুলে।

উসমানি খেলাফতের যুগে মসজিদগুলোর স্থাপত্য কাঠামোতে সবুজ চত্বর রাখা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থেকে মসজিদগুলোকে সুরক্ষাদানের জন্য এসব চত্বর নির্মাণ করা হতো। যেমন ইস্তাম্বুলের সুলাইমানিয়া মসজিদ। জনশ্রুতি ছিল যে, যেসব বাড়িঘর কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো সেগুলোতে আগুন লাগত, সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ত পার্শ্ববর্তী মসজিদগুলোতে। বিষয়টি স্থপতি সিনানকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি জামে মসজিদ ও তার সংলগ্ন অংশগুলোকে বহিঃপ্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। বহিঃপ্রাচীর ও মসজিদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে বড় বড় চত্বর, এসব চত্বরে লাগানো হবে অসংখ্য গাছ। বিভিন্ন জাতের নানা ধরনের ফুল। মসজিদকে পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর থেকে আলাদা রাখবে এগুলো। ওই সময়েই এসব বাগানের অনন্য নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

---

৬৮. বিস্তারিত দেখুন, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সালমা আল-খাদরা আল-জাইয়ুশি (সম্পাদনা), অধ্যায় : التاريخ (Histoy), অনুচ্ছেদ : غرناطة.. مثال من المدينة العربية في الأندلس (Granada : A Case Study of Arab Arbanism in Muslim Spain), লেখক : জেমস ডিকি (James Dickie), খ. ১, পৃ. ১৭৬।

৬৯. ইসলাম বুল অর্থ ইসলামের শহর। জয় করার পর কনস্টান্টিনোপলকে উসমানিরা এই নামেই ডাকত। বর্তমানে শহরটির নাম ইস্তাম্বুল।
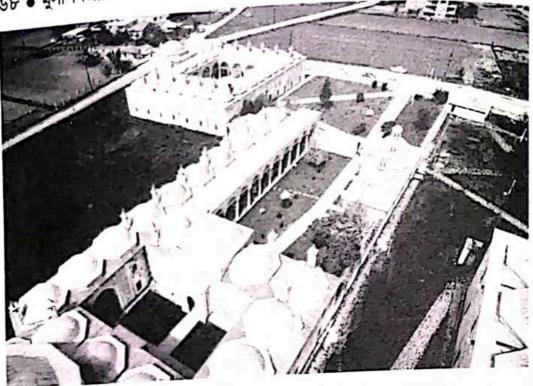
চিত্র নং-২৬
বায়জিদ কমপ্লেক্স (তুরস্ক)

উসমানি যুগে বড় বড় মসজিদের প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনে বৃক্ষ রোপণ করা হতো। এসব মসজিদের উদাহরণ হলো পবিত্র মসজিদে নববি ও তুরস্কের মসজিদে বাইজিদ।

চিত্র নং-২৭
তোপকাপি প্রাসাদের বাগান

তোপকাপি প্যালেসের বাগানগুলোকে অনন্য বিবেচনা করা হয়। তোপকাপি প্যালেসের নির্মাণকাজ শুরু হয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের যুগে।[৭০] হিজরি দশম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক (খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক) পর্যন্ত এই প্যালেস ছিল উসমানি সুলতানদের আবাসস্থল। প্রাসাদটির চারপাশে উনসত্তর হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃতি ছিল সেসব বাগানের। জায়গার মোট আয়তন ছিল পাঁচ বর্গ কিলোমিটার। বাগানের মধ্য দিয়ে রেখা টানার মতো ছিল উন্মুক্ত চলার পথ, এসব পথ প্রাসাদটিকে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। এসব বাগানের মধ্যে ফল ও সবজির বাগানও ছিল। শিকারের জন্যও একটি বিশাল জায়গা রেখে দেওয়া হয়েছিল।[৭১]

মিশর

ফুসতাত ছিল ইসলামি মিশরের প্রথম রাজধানী। 'বিরকাতুল হাবাশ' হলো ফুসতাতের একটি অংশ। এই বিরকাতুল হাবাশের বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে সাইদ। তিনি বলেছেন, বিরকাতুল হাবাশ ছিল তুলুন পরিবারের উজির আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আলি মাদরায়ির রাজ্যের আওতাধীন। পূর্ব প্রান্তের বাগানগুলো ব্যতীত এখানকার যাবতীয় ফসলি খেত, বাগান ও উদ্যানও ছিল তার মালিকানাধীন। আমি ধারণা করি, পূর্ব প্রান্তের বাগানগুলো ছিল ওয়াহাব ইবনে সাদাকার, যিনি আল-হাবাশ নামে পরিচিত ছিলেন। এই বিরকাহর পূর্ব প্রান্ত শেষ হয়েছে উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে, ওই উন্মুক্ত প্রান্তর পর্যন্তই রয়েছে হাবাশের বাগানগুলো। বিরকাতুল হাবাশের আগে রয়েছে কাতাদা ইবনে কাইস ইবনে হাবাশ সাদাফির বাগানগুলো। তিনি মিশর বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার নামেই বাগানগুলোও বিরকাহ পরিচিতি পেয়েছে।[৭২]

খুমারাওয়াইহ ইবনে আহমাদ ইবনে তুলুনের শাসনামলে (৮৮৪-৮৯৬ খ্রি.)—তুলুনি রাজবংশের যুগে—কিছুকালের জন্য মিশরের রাজধানী ছিল আল-কাতায়ি। মিশরীয় ঐতিহাসিক আল-মাকরিযি (১৩৬৪-১৪৪২ খ্রি.)

---

৭০. শাসনকাল ১৪৪৪-১৪৪৬ খ্রি. এবং ১৪৫১-১৪৮১ খ্রি.। জন্ম ১৪২৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দে।-অনুবাদক

৭১. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২২৪-২২৬।

৭২. আহমাদ আদিল কামাল, *আতলাসু তারিখিল কাহেরা*, পৃ. ৩৫ থেকে উদ্ধৃত। তিনি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে দুকমাক রচিত *আল-ইনতিসার লিওয়াসিতাতি আকদিল আমসার* থেকে।

এই রাজধানীর নিসর্গ সম্পর্কে বলেন, খুমারাওয়াইহ ইবনে আহমাদ তার পিতার প্রাসাদে আসেন এবং প্রাসাদটিকে সংস্কার ও বড় করেন। তার পিতার যে বিশাল ময়দান ছিল তার পুরোটাকে উদ্যানে রূপান্তরিত করেন। উদ্যানে রোপণ করেন নানা জাতের সুগন্ধ গুল্ম ও ফুল, বিভিন্ন রকমের গাছ। তিনি উদ্যানটির জন্য সুন্দর সুন্দর চারা[৭৩] নিয়ে আসেন, এগুলোতে যেসব ফল ফলেছিল দাঁড়িয়েই সেগুলোর নাগাল পাওয়া যেত। বিভিন্ন উৎকৃষ্ট জাতের খেজুরগাছ ছিল, বসে থেকে হাত বাড়ালেই এসব খেজুর ছেঁড়া যেত। উদ্যানের জন্য আরও নিয়ে আসেন অদ্ভুত ও মনোরম সব গাছ, সব ধরনের গোলাপ। এখানে জাফরানও চাষ করেন তিনি। খুমারাওয়াইহ খেজুরগাছের দেহে পরিয়ে দেন চমৎকার করে বানানো সোনালি পাত দিয়ে মোড়া তামার কাঠামো। তামার কাঠামো ও খেজুরগাছের দেহের মাঝখানে বসিয়ে দেন সিসার তৈরি নালি। তিনি এতে প্রবাহিত করিয়ে দেন নিয়ন্ত্রিত জলের ধারা। খেজুরগাছের দীর্ঘ কাঠামোর খাঁজ বেয়ে নেমে আসত পানির ঝরনা এবং তা পতিত হতো কৃত্রিম ফোয়ারাবিশিষ্ট হাউজে; হাউজ থেকে পানি প্রবাহিত হতো বিভিন্ন ধারায়, ধারাগুলো বাগানকে সিঞ্চিত করত। উদ্যানে তিনি কৃত্রিম পত্রপল্লব ও নকশার (খোদাইকর্ম ও ভাস্কর্য) ওপর রোপণ করেছিলেন সুগন্ধ ফুল ও লতাগুল্ম। বাগানের মালি কাঁচি দিয়ে নিয়মিত এগুলোর পাতা কেটে দিত, যাতে পাতার ওপর পাতা জড়িয়ে না যায়। কৃত্রিম জলাশয়ে জলপদ্মের চাষও তিনি করেছিলেন। লাল, নীল ও হলুদ রঙের জলপদ্ম বাগানটির শোভা বাড়িয়ে দিয়েছিল...। আল-মাকরিযি এভাবেই ওইসব নয়নাভিরাম দৃশ্যের বর্ণনা দিতে থাকেন।[৭৪]

বাগদাদ

আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মানসুর[৭৫] ১৪৫ হিজরি থেকে ১৪৯ হিজরির মধ্যে বাগদাদ শহর নির্মাণ করেন। একে আব্বাসি খেলাফতের রাজধানী ঘোষণা করেন। বাগদাদে তার প্রাসাদের নাম দেন 'আল-খুলদ'। খতিব বাগদাদি বলেন, আল-মানসুরের প্রাসাদের নাম 'আল-খুলদ' রাখা হয় কুরআনে বর্ণিত 'জান্নাতুল খুলদ' নামানুসারে।

---

৭৩. মূল বইয়ে এখানে মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে।-অনুবাদক

৭৪. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, খ. ১, পৃ. ৮৭২।

৭৫. দ্বিতীয় আব্বাসি খলিফা। রাজত্বকাল ১৩৬ হি. থেকে ১৫৮ হি.।

কারণ এই প্রাসাদে ছিল অপরূপ সব দৃশ্য, চমৎকার সব বস্তু এবং খলিফার আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত সব চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল এখানে।[৭৬]

আব্বাসি খলিফাদের যুগে বাগদাদ ছিল গোটা পৃথিবীর বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ শহর। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলার দিক থেকে তা ছিল গোটা বিশ্বের রাজধানী। বাগদাদের পর আরও অনেক শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে... কর্ডোভা, কায়রো, কনস্টান্টিনোপল ইত্যাদি। এরপর অন্যান্য শহরের কথাও উল্লেখ করা যায়।

ইয়াকুত হামাবি প্রাচীন বাগদাদের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাগদাদ হলো পৃথিবীর জান্নাত, শান্তির শহর, ইসলামের চূড়া, আগন্তুকদের মিলনমেলা, অন্য শহরগুলোর ললাট, ইরাকের চোখ, দারুল খিলাফা, ভালো ও উত্তম সবকিছুর সমাবেশস্থল, দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তাকর্ষক বস্তুরাশির খনি; বাগদাদে ছিল সব শাস্ত্রের সীমাহীন প্রতিভাবানদের বসবাস, সব বিষয়ের যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের আবাস। আবু ইসহাক আয-যুজাজ বলতেন : বাগদাদ হলো পৃথিবীর নগরী, তা বাদে সবকিছু গ্রাম ও মরুভূমি।[৭৭]

যাকারিয়া কাযবিনি আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাদির বিল্লাহর প্রাসাদ-উদ্যানের বর্ণনা দিয়ে বলেন, আল-মুকতাদির বিল্লাহর (২৮২-৩২০ হি.) ভবনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো বৃক্ষভবন (দারুশ শাজারাহ)। ভবনটি বেশ প্রশস্ত, চারপাশে বাগান দ্বারা বেষ্টিত। ভবনটির ফটকের সামনে রয়েছে একটি বড় কৃত্রিম জলাশয়। জলাশয়ের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটি বৃক্ষ, বৃক্ষটি তৈরি করা হয়েছে সোনা ও রুপা দিয়ে। বৃক্ষের শরীরে রয়েছে সোনা ও রুপার তৈরি আঠারোটি ডাল। প্রতিটি ডালে রয়েছে অসংখ্য শাখা, শাখাগুলো ফলের আকারে বিভিন্ন ধরনের অলংকারে শোভিত। ডালগুলোতে আরও রয়েছে সোনা-রুপার তৈরি নানা জাতের রং-বেরঙের পাখি। বাতাস বয়ে গেলে শোনা যায় সুরেলা ধ্বনি ও গুঞ্জরণ। এই বৃক্ষের জন্যই ভবনটির নামকরণ হয়েছে বৃক্ষভবন।[৭৮]

---

৭৬. খতিব বাগদাদি, *তারিখু বাগদাদ*, পৃ. খ. ১ , পৃ. ৭৩।

৭৭. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ১, পৃ. ৪৬১।

৭৮. কাযবিনি, যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ, *আসারুল বিলাদি ওয়া আখবারুল ইবাদ*, খ. ১, পৃ. ১২৭।

অঙ্কের নীতি মেনে, যা চারবাগ

চিত্র নং-২৮

তাজমহলের বাগান

---

*. তাজমহলের সামনের চত্বরে একটি বড় চারবাগ (মুঘল বাগান পূর্বে চার অংশে বিভক্ত থাকত) করা হয়েছিল। ৩০০ মিটার × ৩০০ মিটার জায়গার বাগানের প্রতি চতুর্থাংশ উঁচু পথ ব্যবহার করে ভাগগুলোকে ১৬টি ফুলের বাগানে ভাগ করা হয়। মাজার অংশ এবং দরজার মাঝামাঝি অংশে এবং বাগানের মধ্যখানে একটি উঁচু মার্বেল পাথরের পানির চৌবাচ্চা বসানো আছে এবং উত্তর-দক্ষিণে একটি সরলরৈখিক চৌবাচ্চা আছে যাতে তাজমহলের প্রতিফলন দেখা যায়। এ ছাড়া বাগানে আরও বেশ কিছু বৃক্ষশোভিত রাস্তা এবং ঝরনা আছে। চারবাগ বাগান ভারতে প্রথম করেছিলেন প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর, যা পারস্যের বাগানের মতো করে নকশা করা হয়েছিল। চারবাগ মানেই যাতে স্বর্গের বাগানের প্রতিফলন ঘটবে। প্রায় সব মুঘল চারবাগ চতুর্ভুজাকৃতির, যার বাগানের মধ্যখানে মাজার বা শিবির থাকে। কিন্তু তাজমহল এ ব্যাপারটিতে অন্যগুলোর থেকে আলাদা, কারণ এর মাজার অংশটি বাগানের মধ্যখানে হওয়ার বদলে বাগানের একপ্রান্তে অবস্থিত। যমুনা নদীর অপর প্রান্তে নতুন আবিষ্কৃত মাহতাব বাগ অন্যরকম তথ্যের আভাস দেয়, যমুনা নদীটি বাগানের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যাতে তা স্বর্গের নদী হিসেবে অর্থবহ হয়। মুঘল সম্রাটদের উত্তরোত্তর অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাগানেরও অবক্ষয় ঘটে। ইংরেজ শাসনামলে তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইংরেজরা নেয়। তারা এ প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যকে পরিবর্তন করে বাগানের চেহারা পালটে দেয়।-অনুবাদক

আগ্রাতেই অবস্থিত ই'তিমাদুদ দাওলার সমাধিসৌধের উদ্যানটিও এরূপ নকশায় তৈরি করা হয়েছে। সমাধিসৌধটি চতুর্ভুজ আকৃতির উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে একটি উঁচু চত্বরের ওপর নির্মিত। সমাধিসৌধের বহির্ভাগে চারদিকে রয়েছে চারটি চৌবাচ্চা। উদ্যানটি চারটি অংশে বিভক্ত, চারটি অংশ সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গাছপালায় শোভিত।

দিল্লিতে অবস্থিত সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিসৌধেও একইরকম নকশা লক্ষ করা যায়। সমাধিটি উদ্যানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। উদ্যানে রয়েছে পানির হাউজ ও নালা, এগুলো অক্ষীয় চতুর্ভুজ আকৃতিতে বিন্যস্ত।[৮০]

মাগরিব

মুওয়াহহিদিনদের শাসনামলে (আল-মুহাদ রাজবংশের যুগে) উদ্যান ও বাগান সবচেয়ে বেশি ছিল মারাকেশে, আঙুর ও অন্যান্য সব ধরনের ফলের বাগান ছিল প্রচুর। মারাকেশের বাগানগুলোর মধ্যে দুটি ছিল বেশ বিখ্যাত : বুসতানুল মাসাররাহ ও বুসতানুস সালিহিয়্যাহ। বাগান দুটি নির্মাণ করেন আবদুল মুমিন ইবনে আলি। কয়েকটি বড় লেক বা কৃত্রিম জলাশয়ও ছিল এই শহরে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইয়াকুব আল-মানসুরের তৈরি লেক। এটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩৮০ গজ। লেকটির একপাশে রয়েছে চারশ কমলালেবুগাছ। প্রতি দুই কমলালেবু গাছের মাঝে রয়েছে একটি লেবুগাছ বা ফুল গাছ।[৮১]

মারাকেশের বাগানগুলোই মাগরিবের একমাত্র বাগান ছিল না। অন্যান্য শহরেও বাগান ও উদ্যান ছিল। যেমন : মিকনাস (Meknes), ফাস (ফেজ), আল-মাকারমিদাহ, তাযারাইন (Tazzarine)[৮২], সালা (Salé) ও সাবতাহ (Ceuta)।[৮৩],[৮৪]

ইবনে ফাদলুল্লাহ উমারি (১৩০০-১৩৮৪ খ্রি.) সাবতাহর বাগানগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিররুল আওদায় অবকাশযাপনের

---

৮০. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২২৭-২২৮।

৮১. মুহাম্মাদ বিন আবদুল হাদি আল-মানুনি, *হাদারাতুল মুওয়াহহিদিন*, পৃ. ১৬২।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৮৩. ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অবস্থিত একটি স্প্যানিশ স্বায়ত্তশাসিত শহর। শহরটি মরক্কো দ্বারা বেষ্টিত।-অনুবাদক

৮৪. হাসান আলি হাসান, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-মাগরিব ওয়াল-উন্দুলুস আসরুল মুরাবিতিন ওয়াল-মুওয়াহহিদিন*, পৃ. ৪২৮ ও তার পরবর্তী।

বেশ কিছু স্থান ছিল। স্থানগুলো সবার চিত্তাকর্ষণ করত, চোখ ধাঁধিয়ে দিত দর্শকদের। সমুদ্রের কূল ঘেঁষে সাবতাহর উপকণ্ঠে বেলিওনেচ[৮৫]-এ রয়েছে উদ্যান ও বিনোদনকেন্দ্র। এটির নকশা ও নির্মাণ অত্যন্ত চমৎকার। এখানকার পানি এক শ্রুতিমধুর গুঞ্জরণ তুলে পাথরের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে, রয়েছে দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষরাজি...।[৮৬]

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, ইসলামি সভ্যতার উদ্যান ও বাগানগুলোতে এই আনন্দময় ভ্রমণ এই সভ্যতার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসকেই দৃঢ় করে। ইসলামি সভ্যতার এসব উত্তরাধিকার আজ পর্যন্ত মানবিক ও পরিবেশগত উৎকর্ষের মাইলফলক হয়ে আছে। দ্বীনে ইসলাম ও মানবস্বভাবের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক বিদ্যমান, এসব বিষয় তারই অকাট্য প্রমাণ। কারণ মানবহৃদয় স্বাভাবিকভাবেই সবুজ রং এবং ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজি ও ফলরাশির প্রতি আকর্ষিত হয়।

---

৮৫. Belyounech (بليونش). সাবতাহ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে সাগরের কূল ঘেঁষে অবস্থিত একটি পাহাড়ি এলাকা।-অনুবাদক

৮৬. শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে ফাদলুল্লাহ উমারি, *মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার*, খ. ৩, পৃ. ১১৭, (হাসান আলি হাসান, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-মাগরিব ওয়াল-উন্দুলুস আসরুল মুরাবিতিন ওয়াল-মুওয়াহিহিদিন*, পৃ. ৪২৯ থেকে উদ্ধৃত।)

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামি বাগানগুলোর অনন্যতা

জেমস ডিকি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামি বাগানগুলোর নকশা ও নির্মাণ ইসলামি স্থাপত্যকলার মর্যাদা রাখে। পাশ্চাত্যের অভিধা ও পরিভাষা ব্যবহার করে এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কারণ তা কেবল পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অগ্রগতির ঘটনাপঞ্জির বাইরের বিষয় নয়, বরং তা বিভিন্ন চিন্তাগত ঐক্যসূত্রের ফল। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ইসলামি শিল্প কোনোদিনই উর্বরতাসমৃদ্ধ পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সম্মোহনের নিচে চাপা পড়েনি, অথচ ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের মূল ভিত্তিই এটি।[৮৭]

ড. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি তার *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ* গ্রন্থে[৮৮] ইসলামি অনন্য বাগানসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনুপ্রেরণা

ইসলামি বাগানগুলো কুরআন ও সুন্নাহে জান্নাতের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে অনুপ্রেরণাজাত। গাছ, পানি, নালা, আসন, মজলিস, ঘ্রাণ ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনারও অনুকরণ করা হয়েছে।

আল-কুরআনের যেসব আয়াত থেকে মুসলিমরা পার্থিব উদ্যান ও বাগান তৈরি করার জন্য 'আদর্শমূলক স্থানে'র চিন্তা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন তার অন্যতম হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

---

৮৭. সালমা খাদরা জাইয়ুশি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, খ. ২, পৃ. ১৪৩৫। তাতে জেমস ডিকির আলোচনা (الحديقة الاندلسية دراسة في مدلولاتها الرمزية) শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৮. ইয়াহইয়া ওয়াযিবি, *আল ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২১৪ ও এর পরের পৃষ্ঠাগুলো।

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোনো উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৮৯]

মুসলিমরা এখানে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের প্রতি লক্ষ করেছেন। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতে কারিমা স্পষ্টভাবে বলছে যে, বাগান ও উদ্যানের জন্য আদর্শ স্থান কেবল ভূমি থেকে উঁচু জায়গাতেই হতে পারে। আয়াতে 'রাবওয়া' শব্দটি এসেছে, এর অর্থ উঁচু জায়গা, উঁচু ভূমি। উঁচু জায়গায় গাছ রোপণ করলে তা গাছের শেকড়কে ভূমির অভ্যন্তরীণ পানির সংস্পর্শে আসতে দেয় না। কারণ ভূমির অভ্যন্তরীণ পানি গাছের বর্ধনকে বাধাগ্রস্ত করে। একইভাবে উঁচু জায়গা অতিরিক্ত পানি ভালোভাবে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে।

গাছের পরিচর্যার প্রতি গুরুত্ব ও মনোযোগ এত বেশি ছিল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছের গুঁড়িতে সোনার পাত বাঁধিয়ে দেওয়া হতো। খুমারাওয়াইহ ইবনে আহমাদ ইবনে তুলুন তার প্রাসাদের বাগানগুলোর এত বেশি যত্ন নিতেন যে খেজুরগাছের শেকড়কে সোনার গিলটি করা তামার পাত দিয়ে মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুসলিমরা এই বৃক্ষের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই নীতিটি পেয়েছেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ»

৮৯. সুরা বাকারা : আয়াত ২৬৫।

জান্নাতে প্রতিটি গাছেরই গুঁড়ি হবে স্বর্ণের।[১০]

২. স্বর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামি স্থাপত্যকলা যে অনন্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত তাকে আমরা 'স্বর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি' বলে আখ্যায়িত করতে পারি। প্রতিকূল আবহাওয়ায় দুর্যোগ-কবলিত পরিবেশে পার্থিব বাগান ও উদ্যান তৈরিতে যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে উঠেছে। বাগান তৈরির উদ্দেশ্য ছিল এই পরিবেশকে আরও সুন্দর ও পরিপাটি করে তোলা। ইসলামি শিল্পকলা ও স্থাপত্যকলার উৎকর্ষ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের নকশা তৈরি ও নির্মাণের প্রবণতাকে আরও রুচিশীল, অভিজাত ও জাঁকজমকপূর্ণ করার চেষ্টা অব্যাহত থেকেছে, সেই সৌন্দর্য ও নান্দনিকতাকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য, কুরআন তাকে পৃথিবীর উদ্যানসমূহ বলে চিহ্নিত করেছে।

﴿فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهۡجَةٖ﴾

তারপর এর দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি...।[১১]

৩. উদ্যানের ফটকগুলোতে ও দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ করা হয়েছে কুরআনের আয়াত বা হাদিসের অংশ বা অন্যান্য ইসলামি বাণী।

৪. বাড়িগুলোতে প্রচুর বাগান থাকত। আর এ বাগানগুলো হতো বাড়ির ভেতর-আঙিনায়, যাতে গোপনীয়তা যথার্থভাবে বজায় থাকে এবং বাড়িগুলোতে যেন বড় চত্বর, উদ্যান ও গণমাঠের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে।

৫. ইসলামি যুগে বাগানগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল গোপনীয়তা। এ কারণেই বাগানগুলো ঘেরাও দেওয়া থাকত উঁচু প্রাচীর দিয়ে বা চারপাশে থাকত খেজুরগাছ, যাতে অভ্যন্তরীণ দৃশ্য বাইরে থেকে দেখা না যায়।

বাগানের প্রতি ইসলামি ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পর্যবেক্ষণের দিকটি উল্লেখ করে এই অনুচ্ছেদ শেষ করাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যবেক্ষণ থেকে ইসলামি দর্শনের ও পাশ্চাত্য দর্শনের সারমর্ম স্পষ্ট

---

১০. *তিরমিযি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, কিতাব : সিফাতুল জান্নাহ আন রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বাব : সিফাতু শাজারিল জান্নাহ, হাদিস নং ২৫২৫।

১১. সুরা নামল : আয়াত ৬০।

হয়েছে; ইসলামি দর্শন সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার প্রতি আবেগ ও আগ্রহের দিকটি গুরুত্ব দেয়, অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় বস্তুগত দিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতাকে। এই পর্যবেক্ষণ আমাদের নয়, জেমস ডিকির। তার এই পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি 'ইসলামি বাগানচর্চার ঐতিহ্য হত্যা'র কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, (আন্দালুসীয়-আরব বাগানের মৃত্যুর কারণ হলো একটি অনুমেয় প্রস্তাব, যা জনসংখ্যাতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ স্থানে রয়েছে। আমরা যে অনুমেয় প্রস্তাব এখানে পেশ করছি, অর্থাৎ বাগানের নকশা ও নির্মাণশিল্প কৃষিবিজ্ঞানেরই একটি সম্প্রসারিত অংশ এবং এরই ওপর বাগানচর্চা নির্ভরশীল ছিল তা যদি সত্য হয়,) তা হলে মোরিস্কোদের[৯২] বিতাড়ন অবশ্যই স্পেনে ইসলামি বাগানচর্চার ঐতিহ্যকে হত্যা করছিল, এমনকি (খ্রিষ্টান শক্তি কর্তৃক) গ্রানাডার দখলও (ইউরোপীয়) রেনেসাঁসের দ্বারা প্রবর্তিত রুচি ও ফ্যাশনের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। ইউরোপীয় রেনেসাঁস বাগানকে স্থাপত্যকলার সম্পূরক হিসেবে দেখেছে, যেখানে মুসলিমরা প্রাসাদকে বাগানের অনুগামী হিসেবে দেখার প্রবণতা দেখিয়েছেন। এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংশ্লেষ ঘটানো বা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব ছিল না। (এ ছাড়া যেকোনো রূপে ইসলামিক আর্টের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যক্তিকে ইনকুইজিশন[৯৩]-এ নিযুক্ত লোকদের চোখে সন্দেহভাজন করে তুলছিল।)[৯৪]

---

[৯২]. মোরিস্কো (Morisco) একটি স্প্যানিশ কাতালান শব্দ। স্পেনে ইসলামি শাসনব্যবস্থার পতনের পর খ্রিষ্টীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেনে তখন যেসব মুসলিম ছিল তারা মর্মন্তুদ নির্যাতনের শিকার হয়। রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও স্প্যানিশ রাজপরিবার তাদের মৃত্যুর হুমকির মুখে খ্রিষ্টধর্মগ্রহণে বা স্বনির্বাসনে বাধ্য করে। বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রকাশ্যে ধর্মপালনও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এসব মুসলিমকেই মোরিস্কো বলে আখ্যায়িত করা হয়।-অনুবাদক

[৯৩]. ইনকুইজিশন (the Inquisition) অর্থ নির্দয় ধর্মীয় বিচার। স্পেনের মুসলিমদের ইনকুইজিশনের মুখোমুখি করে নির্যাতন ও বিভিন্নভাবে হত্যা করা হতো।-অনুবাদক

[৯৪]. সালমা খাদরা জাইয়ুশি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, খ. ২, পৃ. ১৪৩৫। এই অংশটি আমি মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি।-অনুবাদক

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

ফোয়ারা

বাগানে পানির ব্যবহারে মুসলিম কৃষিবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও শিল্পীর দক্ষতার অসাধারণ নজির হলো ইসলামি বাগানগুলোতে ফোয়ারার বিস্তার।
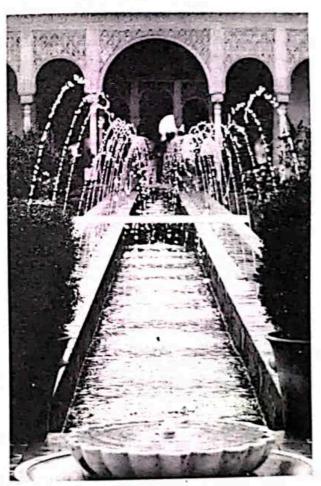
চিত্র নং-২৯
আন্দালুসের ফোয়ারা (গ্রানাডা)

মুসলিমদের বাগানগুলোতে পানিকে বিভিন্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছেঃ বৃক্ষরাজির ঘন ছায়াঢাকা কৃত্রিম জলাশয়রূপে; পানির পৃষ্ঠদেশের পরিবর্তন-সহায়ক ফোয়ারারূপে, ফলে পানি প্রতিবিম্বিত পৃষ্ঠদেশরূপে

কাজ করে না; বা উঁচু নলের সারিরূপে, যা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে এবং শ্রুতিমধুর কুলকুল ধ্বনি তোলে অথবা ঝরনারূপে।[৯৫]

আমরা লক্ষ করেছি, মুসলিমবিশ্বজুড়ে বাগানের বিস্তৃতি ছিল ব্যাপক এবং আমরা আরও লক্ষ করেছি, ঘরবাড়ির ভেতর-আঙিনাতেও বাগানের বিস্তৃতি ছিল। তাই আমরা বলতে পারি, মুসলিম শহরগুলোর প্রত্যেক বাগানে ফোয়ারার সংখ্যা অনুমান করার জন্য আমাদের পক্ষে এই চিন্তাকে দ্বিগুণ করে নেওয়া সম্ভব। কারণ ফোয়ারার সংখ্যা এত বেশি যে তা গোনা সম্ভব নয়।
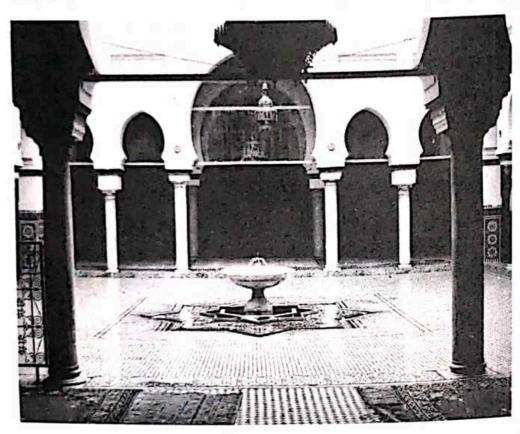
চিত্র নং-৩০
কারাউন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণের ফোয়ারা (মরক্কো)

মুসলিম সমাজের দরিদ্র ঘরগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন উইল ডুরান্ট। তিনি বলেছেন, তখনকার দিকে দরিদ্রদের ঘরগুলোও ছিল—এখনো যেমন রয়েছে—আয়তক্ষেত্রকার; মাটি দিয়ে সংযুক্ত ইটের কাঠামোতে তৈরি, ছাদে থাকত মাটির মিশ্রণ, উদ্ভিদের অংশ, গাছের ডাল, খেজুরগাছের

---

৯৫. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২১৭।

ডাল ও খড়। এগুলোর চেয়ে উন্নত এক শ্রেণির ঘর ছিল, সেগুলোর ভেতর দিকে থাকত উন্মুক্ত উঠান, পানির ছোট হাউজ, কখনো কখনো গাছও থাকত। মাঝে মাঝে এসব ঘরে থাকত একগুচ্ছ কাঠের খুঁটি, ঘরের কামরাগুলো ও উঠানের মাঝ বরাবর থাকত বারান্দা।[৯৬]

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, উসমানি খেলাফতের যুগে কেবল বেলগ্রেডেই[৯৭] ছিল ছয়শ পাবলিক ফোয়ারা।[৯৮]

গত কয়েক বছর ধরে মরোক্কান কর্তৃপক্ষ ফেজ শহরের প্রাচীন ফোয়ারাগুলোর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। যে পরিসংখ্যান বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ফেজের সড়কগুলোতে সত্তরটি পাবলিক ফোয়ারা পাওয়া গেছে। পুরোনো আবাসিক ভবন, মসজিদ ও মাদরাসার অভ্যন্তরীণ আঙিনায় পাওয়া গেছে প্রায় চারশ ফোয়ারা। ঐতিহাসিক উৎসগুলো নির্দেশ করে যে, এই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহরে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে এসব ফোয়ারা ছিল। পানির জন্য সব মানুষ এসব ফোয়ারার ওপর নির্ভরশীল ছিল; নিজেরা পানি পান করত, পশুপাখিদের পান করাতো এবং বাগানেও পানি সেচ দিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, প্রায় দশ শতাব্দী আগে ফেজ শহরে পানি-সরবরাহের যে জটিল সিস্টেম ছিল তার সঙ্গে এসব ফোয়ারার অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৯৯]

সেই সময় ফোয়ারা কেবল আভিজাত্য ও বিলাসিতার বিষয় ছিল না, বরং পানি ব্যবহারে ইসলামি সভ্যতার যে দর্শন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল এটি। এই দর্শনের মূলকথা হলো, ব্যবহারিক দিকগুলোর সঙ্গে আত্মিক ও অনুভূতিগত উপভোগের দিকগুলোর সমন্বয় সাধন।[১০০]

গ্রানাডার জান্নাতুল আরিফে ফোয়ারাগুলো থেকে পানি উচ্ছলিত ধারায় প্রবাহিত হতো। পানির হাউজের কিনারা-সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ দক্ষতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। ফোয়ারার উচ্ছলিত পানি নিচের হাউজে পড়ার সময় অর্ধবৃত্তাকার তরঙ্গ সৃষ্টি করত। এই শিল্পরীতি একটি ইসলামি সংযোজন,

---

৯৬. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ২৪১।

৯৭. সার্বিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।

৯৮. *জারিদাতুশ শারকিল আওসাত*, তারিখ : ২৫ শে নভেম্বর, ২০০৮।

৯৯. *জারিদাতুশ শারকিল আওসাত*, তারিখ : ২৭ শে অক্টোবর, ২০০২।

১০০. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২১৭।

ইতিপূর্বে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।[১০১] পানির হাউজগুলোতে মাঝেমধ্যে নানা জাতের মাছ থাকত বা বিভিন্ন ধরনের পাখি থাকত, যেমন হাঁস। এসব হাউজের পাশে অবস্থিত ফোয়ারাগুলো পানির উপরিভাগে কীটপতঙ্গ জন্মাতে দিত না। এসব ফোয়ারা বাতাসে জলকণা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজেও ব্যবহৃত হতো, সম্ভবপর সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিটিয়ে দিয়ে বায়ুকে কোমল ও সজীব রাখত।[১০২]

পাবলিক ফোয়ারাগুলো প্রতীকী, নন্দনতাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক–এই তিনটি দিকের সম্মিলন ঘটিয়েছিল। এগুলোতে পানির সবচেয়ে চমৎকার ব্যবহার চোখে পড়ত। এসব সৃজনশীল ও নান্দনিক কাজের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলো পাওয়া যেত মসজিদের চত্বরে। বলকান অঞ্চল যখন উসমানি খেলাফতের ছায়াতলে ছিল তখন সেখানে এসব নান্দনিক কাজের শ্রেষ্ঠ নমুনা তৈরি হয়েছে। যেমন : মুহাম্মাদ কুসকি পাশা মসজিদ[১০৩], হারতাদাউস বেগ মসজিদ, কাইনাইনিচে অবস্থিত সিনান পাশা মসজিদ, বাইচায় অবস্থিত সুলতান ইসমি মসজিদ, স্কপিয়েতে[১০৪] অবস্থিত মুস্তাফা পাশা মসজিদ, সারায়েভোতে[১০৫] গাজি খসরু বেগ (হুরসেভ বেগ) মসজিদ, ফোচায়[১০৬] অবস্থিত আলাজা মসজিদ (Aladža Mosque)–এগুলোর ফোয়ারাসমূহ। ফোয়ারাকে বিশ্বজুড়ে মুসলিম শহরগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, বিশেষ করে বলকানে। ফোয়ারাগুলোর পানি পানের উপযুক্ত, অজু ও গোসলের কথা তো বলাই বাহুল্য।[১০৭]

---

১০১. সালমা খাদরা জাইয়ুশি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, খ. ২, পৃ. ১৪৩৩।

১০২. ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, পৃ. ২১৭-২১৮।

১০৩. বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়ার মোস্তার শহরে অবস্থিত। ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত।-অনুবাদক

১০৪. উত্তর মেসিডোনিয়ার রাজধানী স্কপিয়ের পুরোনো বাজারে অবস্থিত।-অনুবাদক

১০৫. বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়ার রাজধানী।-অনুবাদক

১০৬. ফোচা (Foča) : বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়ার একটি শহর।-অনুবাদক

১০৭. আবদুল বাকি খলিফা, *আল-আসারুত তারিখিয়্যাহ ফিল-বালকান*, *জারিদাতুশ শারকিল আওসাত*, তারিখ : ২৫ শে নভেম্বর, ২০০৮।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য

আল্লাহ তাআলা মানুষ সুন্দর ও শোভনীয় করে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোত্তম গঠনে ও শ্রেষ্ঠ অবয়বে মানুষের আকৃতি দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে (দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে) সুন্দরতম গঠনে।[১০৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে (সেই আকৃতিতে) গঠন করেছেন।[১০৯]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে যে শোভা ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে দিয়েছেন তার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন,

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সেগুলোকে আমি তার শোভা করেছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।[১১০]

---

১০৮. সুরা তিন : আয়াত ৪।

১০৯. সুরা ইনফিতার : আয়াত ৭-৮।

১১০. সুরা কাহফ : আয়াত ৭।

কুরআনুল কারিমে সুন্দর ও পরিপাটি থাকা এবং সাজ গ্রহণের নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তাআলা প্রাকৃতিক বিশ্বে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের যা দান করেছেন তা উপভোগ করার অনুমতি দিয়েছেন। যারা এর বিরোধিতা করে তাদের মত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এই আয়াতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ○ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

হে বনি আদম, প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে[১১১], আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। বলে দিন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলে দিন, এইসব তাদের জন্য যারা পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে ঈমান আনে।[১১২] এইভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি।[১১৩]

ইসলাম মানুষকে সুন্দর ও পরিপাটি থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এর অর্থ এই যে, ইসলামের উদ্দেশ্য কেবল পরিবেশের ও স্বাস্থ্যগত সৌন্দর্য, যেমন : দেহ ও পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করা নয়, বরং এর চেয়েও বেশি চারিত্রিক মাধুর্য ও আচার-আচরণের সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা উদ্দেশ্য। ইসলামের মানবিক সভ্যতায় এ দিকটি বাস্তবায়িত

---

[১১১]. হজ্জ ও উমরার সময় কাফেররা উলঙ্গ হয়ে কাবার তাওয়াফ করত। এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিধি মোতাবেক পোশাক পরে ইবাদত করতে।-অনুবাদক

[১১২]. আল্লাহপ্রদত্ত জীবিকা গ্রহণ করে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। এই হিসেবে দুনিয়ার সবকিছু অনুগত বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু কাফেরদের এইসব বস্তু থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। অবশ্য আখেরাতে তাদের কোনো অংশ থাকবে না।-অনুবাদক

[১১৩]. সুরা আরাফ : আয়াত ৩১-৩২।

হয়েছে ও পূর্ণতা পেয়েছে। সুতরাং মানবিক সৌন্দর্য দুই প্রকারের :

১. বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং

২. অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক সৌন্দর্য।

এই পরিচ্ছেদে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে পরিবেশ ও দৃশ্যমান বস্তুরাশির সৌন্দর্য নিয়ে আলোকপাত করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : শরীরের সৌন্দর্য

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পোশাকের সৌন্দর্য

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ঘরবাড়ি, পথ ও শহরের সৌন্দর্য

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সুন্দর রুচিবোধ
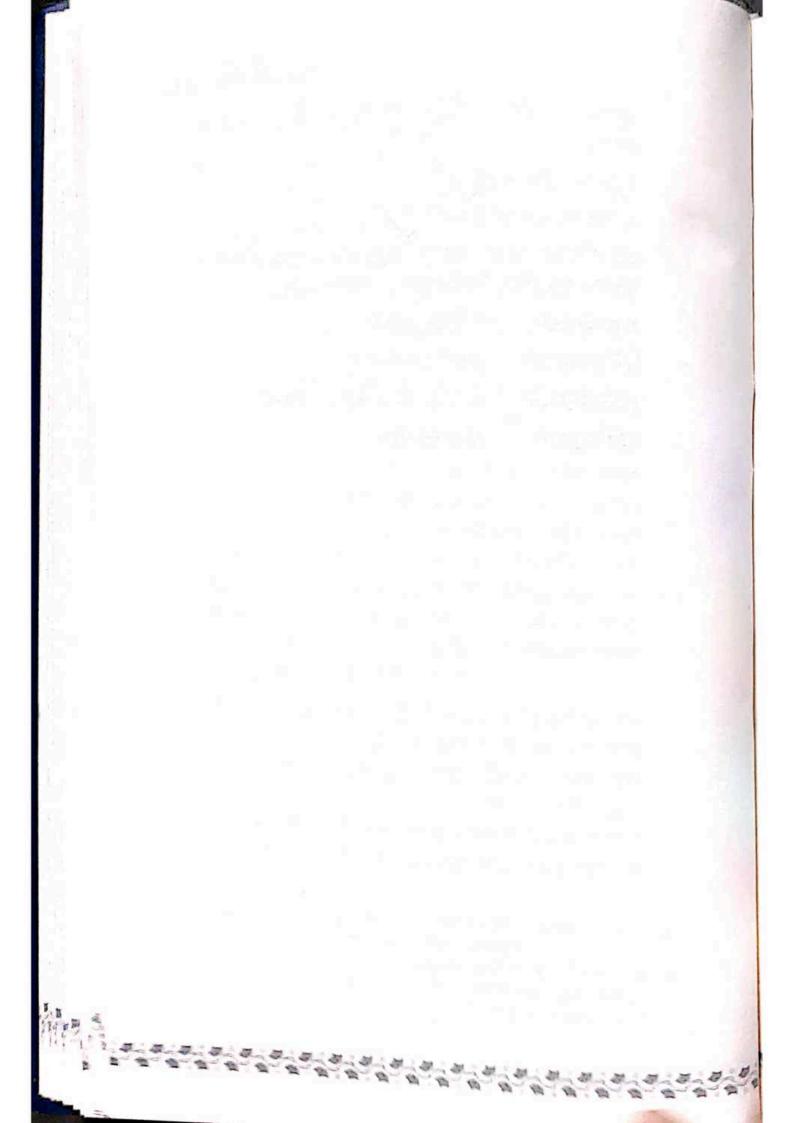
প্রথম অনুচ্ছেদ

শরীরের সৌন্দর্য

এ ব্যাপারটি কারও অজানা নয় যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এবং এগুলোর ব্যাপারে গুরুত্বপ্রদান মানবসভ্যতার সবচেয়ে উজ্জ্বল একটি দিক। ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য বা বাহ্যিক সৌন্দর্য বলতে যা-কিছু বোঝায় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা।

বাস্তবতা এই যে, ইসলাম এই ক্ষেত্রে এক অলৌকিক জীবনধারার প্রবর্তন করেছে। এই জীবনধারায় শরীর, মন ও সমাজই সুরক্ষিত থাকে না কেবল, বরং গোটা মানবতাই সুরক্ষিত থাকে। এমনকি কুরআনুল কারিম নির্দেশনা দিচ্ছে যে,

﴿يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

যারা পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।[১১৪]

﴿يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন।[১১৫]

অর্থাৎ, যারা নোংরা-ময়লা ও অশুচিতা থেকে পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।[১১৬]

এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন যে,

«اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ»

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।[১১৭]

---

১১৪. সুরা বাকারা : আয়াত ২২২।

১১৫. সুরা তাওবা : আয়াত ১০৮।

১১৬. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ১, পৃ. ৫৮৮।

এই হাদিসের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম যা-কিছু বলেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য এই যে, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার জন্য ঈমানের যে সওয়াব তার অর্ধেক পর্যন্ত সওয়াব দেওয়া হবে।[১১৮]

এখানে একটি বিষয়ে সবার দৃষ্টি আর্কষণ করা সংগত মনে করি, ইসলামের এসব নির্দেশনা ছিল এমন যুগে যখন নোংরামি ও অপরিচ্ছন্নতা ছিল ইউরোপীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের লোকেরা তখন বছরে একবার বা দুইবারের বেশি গোসল করত না![১১৯] নোংরামি এই পর্যায়ে পৌছেছিল যে দেহে ও কাপড়চোপড়ে লেগে থাকা ময়লা-আবর্জনাকে 'বরকত' মনে করা হতো এবং ভাবা হতো যে এসব ময়লা শরীরের শক্তিবর্ধক।

ঠিক এই সময়টাতে ইসলামি জীবনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, তা মুসলিমদের পবিত্রতা, ক্ষেত্রভেদে গোসলের আবশ্যকতা ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ, ক্ষেত্রভেদে গোসল ছাড়া তাদের শরীরের পবিত্রতা অর্জিত হবে না এবং অজু ছাড়া নামায হবে না। আর অজু দৈনিক পাঁচবার করতে হতে পারে।

জানাবাতের সময়[১২০] ও ঋতুস্রাব শেষে এবং অন্যান্য কিছু সময়ে গোসল আবশ্যক। দুই ঈদ, হজের জন্য ইহরাম বাঁধা ও অন্যান্য সময়ে গোসল মুস্তাহাব। জুমআর দিন গোসল ওয়াজিব (আবশ্যক) নাকি মুস্তাহাব—এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে প্রণিধানযোগ্য মত এই যে, জুমআর দিন গোসল করা মুস্তাহাব। আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«غُسْلُ يَوْمِ الْـجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ»

---

[১১৭]. *মুসলিম*, কিতাব : তাহারাত, বাব : ফাদলুল অজু, হাদিস নং ২২৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২২৯৫৩।

[১১৮]. ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ*, খ. ৩, পৃ. ১০০।

[১১৯]. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫৪।

[১২০]. শরীরের এমন অবস্থা যখন শরয়ি ও ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে গোসল ফরয বা আবশ্যক।

> জুমআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কর্তব্য হলো গোসল করা ও মিসওয়াক করা এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি ব্যবহার করা।[১২১], [১২২]

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই গোসলের মাঝখানে সর্বোচ্চ কতদিন সময় থাকবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»

> প্রত্যেক মুসলমানের ওপর (আল্লাহ তাআলার) হক এই যে, প্রতি সাত দিনে একদিন সে গোসল করবে, সেদিন সে তার মাথা ও শরীর ধুয়ে নেবে।[১২৩]

কতিপয় ফকিহ বিভিন্ন প্রকারের গোসলের কথা বলেছেন, এমনকি তারা সতেরো প্রকারের গোসল নিয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে গোসলের গুরুত্বের ব্যাপারটি বোঝা যায়। ইসলাম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে আহ্বান জানিয়েছে, যেসব অঙ্গে রোগ-ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং যেগুলো বেশি বেশি নোংরা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে।

পবিত্রতার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনাকে আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি : এক. ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা; দুই. পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার নির্দেশ এবং তিন. পরিপাট্য ও সাজসজ্জার ব্যাপারে নির্দেশনা, এটা পরিচ্ছন্নতারও অধিক।

মুসলিমরা জানে যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে অবহেলা ও শিথিলতা দেখানো শাস্তির কারণ। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১২১. এগুলোর বিধান ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত। দেখুন, ইমাম নববি, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৩৫; আল-মুনাবি, *ফাইদুল কাদির*, খ. ৪, পৃ. ৫৪১।

১২২. *বুখারি*, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : আত-তিবু লিল জুমুআতি, হাদিস নং ৮৪০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : আত-তিব ওয়াস-সিওয়াক ইয়াওমাল জুমুআ, হাদিস নং ৮৪৬।

১২৩. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : হাল আলা মান লা ইয়াশহাদিল জুমুআ গুস্‌ল.., হাদিস নং ৮৫৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জুমুআ, বাবঃ আত-তিব ওয়াস-সিওয়াক ইয়াওমাল জুমুআ, হাদিস নং ৮৪৯।

ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কবর দুটিতে তাদের বাসিন্দাদের ওপর কী ঘটছে তা তিনি তার সঙ্গীদের জানালেন। তার বক্তব্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ»

নিশ্চয় এই দুইজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো বিষয়ে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, তাদের একজন পেশাব থেকে নিজেকে পবিত্র রাখত না এবং অপর মানুষের গিবত (পরচর্চা) করে বেড়াত।[১২৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার একটি লোককে দেখলেন যে, তার মাথার চুল উশকোখুশকো এবং দাড়ি অপরিপাটি। তিনি লোকটিকে 'বেরিয়ে যাও' বলে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। যেন তিনি তাকে চুল-দাড়ি ঠিক করে আসতে বললেন। লোকটি চলে গেল এবং চুল ও দাড়ি সুন্দর করে পরিপাটি করে আবার এলো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ»

তোমাদের কারও শয়তানের মতো উশকোখুশকো মাথা নিয়ে আসার চেয়ে এভাবে (পরিপাটি হয়ে) আসাই কি ভালো না![১২৫]

একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীরের সেসব জায়গাও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন যেখানে ঘাম ও ময়লা জমে এবং রোগজীবাণুর জন্ম হয়। বরং তিনি এটিকে মানুষের স্বভাবজাত রীতি বা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১২৪. *বুখারি*, কিতাব : আল-অজু, বাব : মিনাল কাবাইরি আল-লা ইয়াসতাতিরা মিন বাওলিহি, হাদিস নং ২১৩; *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাহারা, বাব : আদ-দালিল আলা নাজাসাতিল বাওলি ওয়া উজুবিল ইসতিবরাই মিনহু, হাদিস নং ২৯২।

১২৫. মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুআত্তা*, ইয়াহইয়া লাইসি থেকে বর্ণিত, হাদিস নং ১৭০২।

«خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْـخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ»

পাঁচটি বিষয় মানুষের স্বভাবজাত : খতনা করা, নাভির তলদেশের পশম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, বগলের পশম পরিষ্কার করা এবং মোচ ছোট রাখা।[১২৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তা বোঝা যায় নিম্নলিখিত হাদিস থেকে,

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ»

যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদের জন্য প্রতিবার অজুর সময় মেসওয়াক করা বাধ্যতামূলক করে দিতাম।[১২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, মেসওয়াক করার ব্যাপারে আমরা এত বেশি নির্দেশ পেতাম যে, আমাদের মনে হলো এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হবে।[১২৮]

এতকিছুর পর এ ব্যাপারে আমাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই যে, ইসলামি সভ্যতার যুগে শহরগুলোর সব প্রান্তে গণগোসলখানা নির্মাণ করা হয়। যা এসব শহরের স্থাপত্যের দিকটি আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলে। জার্মান প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে এই ব্যাপারে ওই সময়ের ইসলামি সভ্যতা এবং ইউরোপের অবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আন্দালুসীয় ফকিহ তারতুশি ফিরিঙ্গিদের (ইউরোপের) দেশগুলো ভ্রমণকালে যেসব অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন তা শুনলে গা শিউরে ওঠে। তিনি একজন মুসলিম, যার জন্য গোসল এবং দৈনিক পাঁচবেলা অজু করার বিধান রয়েছে। তারতুশি কী বলছেন শুনুন,

১২৬. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-লিবাস, বাব : কাসসুশ শারিব, হাদিস নং ৫৫৫০; *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাহারা, বাব : খিসালুল ফিতরা, হাদিস নং ২৫৭।

১২৭. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-জুমুআ, বাব : আস-সিওয়াক ইয়াওমাল জুমুআ, হাদিস নং ৮৪৭; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৭; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৮৪০।

১২৮. ইবনে আবি শাইবা তার *মুসান্নাফে* বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং ১৭৯৩।

তুমি কখনো এদের চেয়ে বেশি নোংরা কাউকে পাবে না। এরা নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে না, শীতল পানি দিয়ে বছরে বড়জোর একবার বা দুইবার গোসল করে। এরা এদের কাপড়চোপড় পরিধানের পর আর কখনো ধৌত করে না, এই অবস্থাতেই কাপড়গুলো জীর্ণ ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সিগরিড হুংকে আরও বলেছেন, নোংরামির এই ব্যাপারগুলো সংস্কৃতিমান ও রুচিশীল আরবদের পক্ষে বোধগম্য করা কিছুতেই সম্ভব নয় এবং তারা নিতেও পারবে না। কারণ আরবদের জন্য শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা কেবল ধর্মীয় দিক থেকে আবশ্যক নয়, বরং গরম আবহাওয়ায় বসবাসের ফলেও তা অতি জরুরি। তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাগদাদে হাজার হাজার গরম জলের গোসলখানা ছিল। গোসলখানাগুলোতে ছিল পর্যাপ্ত কর্মচারী। তারা আগন্তুকদের খেজুরগাছের ছোবড়া দিয়ে দলাইমলাই করত এবং চুল কেটে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিত।[১২৯]

আমরা বলতে পারি, গরম আবহাওয়ায় যে অবস্থা বিরাজমান থাকে তার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক, তবে নদীনালা ও পানির উৎস না থাকার বিষয়টি সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের সাপ্তাহিক ও দৈনিক শৃঙ্খলার ওপর কঠোর জোর না দেওয়ার জন্য একটি যৌক্তিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে। অন্যদিকে ইউরোপের পুরো অঞ্চলটা শীতপ্রধান নয়। উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এলাকাও রয়েছে। গোটা ইউরোপজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রচুর নদীনালা ও খালবিল। তারপরও তারা অপরিচ্ছন্নতাকে তাদের মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছিল এবং ময়লা-আবর্জনা ছিল গর্বের বিষয়।

ইসলাম কেবল পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা নয়, তারও অধিক পরিপাট্য ও সাজসজ্জা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশ করা হয়েছে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি সুগন্ধি ভালোবাসেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ»

১২৯. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫৪।

* তোমাদের দুনিয়ার মধ্য থেকে আমার কাছে প্রিয় হলো নারী ও সুগন্ধি। আর নামাযে রয়েছে আমার চোখের শীতলতা।[১৩০] *

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ—তাকে সুগন্ধি দেওয়া হলে তিনি তা ফিরিয়ে দিতেন না।[১৩১] বরং তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। বলেন,

«مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ»

কাউকে সুগন্ধি (উপহার) দেওয়া হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ, সুগন্ধি বহন করা সহজসাধ্য এবং ঘ্রাণও চমৎকার।[১৩২]

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি কালো চাদর বানানো হলো। তিনি তা পরিধান করলেন। পরে তার শরীর ঘামলে চাদর থেকে পশমের গন্ধ বের হলো। তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন।[১৩৩]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম আনাস ইবনে মালিক রা. তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এভাবে,

«وَلاَ مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلاَ حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

আমি এমন কোনো রেশমি বস্ত্র স্পর্শ করিনি যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের তালু থেকে নরম এবং এমন কোনো মিশক ও আম্বরের ঘ্রাণ গ্রহণ করিনি যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (শরীরের) ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম।[১৩৪]

---

১৩০. *নাসায়ি*, কিতাব : ইশরাতুন নিসা, বাব : হুব্বুন নিসা, হাদিস নং ৩৯৪০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৪০৬৯।

১৩১. *নাসায়ি*, কিতাব : জিনাত, বাব: আত-তিব, হাদিস নং ৫২৫৮। *মুসনাদে আহমাদ*, ১২১৯৭।

১৩২. *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আলফায মিনাল-আদাব ও গাইরিহা, বাব : ইসতি'মালুল মিসক..., হাদিস নং ২২৫৩; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৭৯১।

১৩৩. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-লিবাস, বাব : *আস-সাওয়াদ*, হাদিস নং ৪০৭৪।

১৩৪. *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : তিবু রায়িহাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া লিনি মাসসিহি ওয়াত-তাবাররুক বি-মাসহিহি, হাদিস নং ২৩৩০।

এসব কারণেই পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা মুসলিমদের কাছে একটি দ্বীনি বিষয়। এর বাস্তবায়ন করে তারা প্রতিদান ও সওয়াবের আশা করেন এবং তারা মনে করেন যে, এভাবে তারা তাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পোশাকের সৌন্দর্য

পরিধেয় বস্ত্র বা পোশাকের ব্যাপারেও ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোশাক যেমন তার মালিকের জন্য ভালো, তেমনই তার পাশে যারা রয়েছে তাদের জন্যও ভালো। বরং অপরিচিত ব্যক্তিরা যারা তাকে দেখে তাদের জন্যও ভালো।

কুরআনুল কারিম পোশাকের নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে পোশাক লজ্জাস্থান আবরিত রাখে এবং তা শোভাও।

মানুষের স্বভাবই এমন যে তা সবসময় শরীরের গোপনীয় অংশ ঢেকে রাখতে উদ্‌গ্রীব। তবে পশুপাখির মধ্যে এ ব্যাপারটি নেই। মানুষের এই স্বভাব কেবল সুন্দর বিষয় নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। আদম আ. ও তার স্ত্রী গাছের ফল খাওয়ার পর তাদের শরীর অনাবৃত হয়ে পড়ে। যখন হুঁশ ফিরে পান,

﴿طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾

জান্নাতের পাতা দ্বারা তারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলেন।[১০৫]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আদি পিতা ও মাতা পাতা দিয়ে শরীরের এমন গোপনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করছিলেন যা প্রকাশিত হয়ে পড়লে মানুষ স্বভাবগত কারণেই লজ্জা পায়। মানুষের এই স্বভাবে বিপর্যয় ঘটলেই কেবল তারা নিজেদের নগ্ন ও উন্মোচিত করতে পারে।[১০৬]

সুতরাং, পোশাক মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল স্বভাবগত বিষয় এবং জীবনযাপনের অতি আবশ্যক উপাদানগুলোর অন্যতম। তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নেয়ামতও বটে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের দৃষ্টি

---

১০৫. সুরা আরাফ : আয়াত ২২।

১০৬. সাইয়িদ কুতুব, *তাফসির ফি যিলালিল কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ১২৬৯।

আকর্ষণ করেছেন যে, পোশাক যেমন বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে, উপরন্তু অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য গ্রহণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾

হে বনি আদম, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ,[১৩৭] এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।[১৩৮]

শুরুর দিকে কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা পাই, ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾—'তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো।'[১৩৯] যেদিন কুরআন মানুষের জন্য প্রথম নাযিল হয়েছে সেদিন থেকেই ইসলাম মানুষের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, যেমন অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআন তাওহিদকে মানুষের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে, বলছে,

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো।[১৪০]

এখানে পবিত্রতা বাহ্যিকভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে যেমন জরুরি, তেমনই পাপাচার ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে জরুরি। ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, আয়াতটি অন্তরের পবিত্রতার পাশাপাশি সব ধরনের পবিত্রতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ আরবরা পোশাক বলতে সব ধরনের পবিত্রতা বুঝে থাকে।[১৪১]

---

১৩৭. তাকওয়ার পরিচ্ছদ অর্থাৎ সৎকাজ ও আল্লাহভীতি।
১৩৮. সুরা আরাফ : আয়াত ২৬।
১৩৯. সুরা মুদ্দাসসির : আয়াত ৪।
১৪০. সুরা মুদ্দাসসির : আয়াত ৩-৪।
১৪১. ইবনে কাসির, তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, খ. ৮, পৃ. ২৬৩।

আল্লাহ তাআলা সাজসজ্জা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

হে বনি আদম, প্রত্যেক মসজিদে প্রবেশের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না।[১৪২]

পরবর্তী আয়াতে যারা আল্লাহ যা-কিছু শোভনীয় করেছেন তা নিষিদ্ধ করতে চায় তাদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?[১৪৩]

কতিপয় আলেম আয়াতটি বোঝার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছেন। তারা শর্ত দিয়েছেন যে, শরীরের নাপাকি গোলাপজল দিয়ে ধৌত করতে হবে। যেমন ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি তার তাফসিরগ্রন্থে তাদের এরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, আল্লাহর এই ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾—'তোমরা নামায কায়েম করো' বাণীতে আমাদের নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সালাত বা নামায বলতে দোয়া বোঝায়। তা তো করাই হয়, কারণ আদিষ্ট বিষয় আদায়ের দ্বারাই দায়িত্ব পালন করা হয়। এই দলিলের দাবি এই যে, নামাযের শুদ্ধতা সতর বা লজ্জাস্থান ঢাকার ওপর নির্ভরশীল নয়। (যেহেতু এই আয়াতে শুধু নামাযের কথা বলা হয়েছে, পোশাকের কথা বলা হয়নি।) তবে আমরা এই অর্থ (পোশাক পরিধানের বিধান) গ্রহণ করেছি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ওপর আমল করার জন্য,

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

১৪২. সুরা আরাফ : আয়াত ৩১।
১৪৩. সুরা আরাফ : আয়াত ৩২।

প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে।[১৪৪]

পরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত পর্যায় মেনে নিয়ে গোলাপজল দিয়ে ধোয়া পোশাক পরিধানের অর্থ হলো সাজ গ্রহণ বা শোভামণ্ডিত হওয়া। সুতরাং এমন পোশাক পরিধানই নামাযের শুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক।[১৪৫]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে ময়লা কাপড়ে দেখলেন। দেখে বললেন,

«أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟!»

এই লোক তার কাপড় ধোয়ার মতো কোনো পানি পায়নি?[১৪৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পোশাক পরিধান করতেন। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ নির্দেশও দিয়েছেন,

«الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ»

তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কারণ তা অধিকতর পবিত্র ও চমৎকার।[১৪৭]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতে দুটি অবস্থান রয়েছে যা নিয়ে চিন্তাভাবনা জরুরি, এমন ব্যক্তির অবস্থান যিনি সৌন্দর্য অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং এ ব্যাপারে এতটা উৎসাহী যে এই আশঙ্কাও করেন তা অহংকারের পর্যায়ে পড়ে কি না, আরেক ব্যক্তির অবস্থান যিনি সে ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»

যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

---

১৪৪. সুরা আরাফ : আয়াত ৩১।

১৪৫. ইমাম রাযি, *আত-তাফসিরুল কাবির*, খ. ১৪, পৃ. ২৩২।

১৪৬. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-লিবাস, বাব : গুসলুস সাওব ওয়াল-খুলকান, হাদিস নং ৪০৬২।

১৪৭. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২০১৬৬, ২০২১৩, ২০২৩১।

তখন এক ব্যক্তি বলল, যে লোক পছন্দ করে যে তার পোশাক চমৎকার হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, সেও কি এই শ্রেণিতে পড়বে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»

নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হলো সত্য অস্বীকার করা ও মানুষকে অবজ্ঞা করা।[১৪৮]

ইসলাম একটি সূক্ষ্ম সমীকরণ প্রস্তুত করেছে, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রতি আকুলতা এবং একইসঙ্গে তা যেন আত্মার ওপর প্রভাব না ফেলে এবং অহংকারের দিকে ঠেলে না দেয় সে ব্যাপারে ব্যাকুলতা। অহংকার হলো অন্যদের তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা ও হেয়জ্ঞান করা এবং নিজেকে অন্যদের বিবেচনায় বড় মনে করা। আপনি সৌন্দর্যের প্রতিভূ হতে পারেন, এতে কোনো বাধা নেই, কারণ আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য ভালোবাসেন; কিন্তু আপনাকে অবশ্যই অণু পরিমাণ অহংকার থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ এক অণু অহংকারও আপনার জন্য জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেবে।

তবে এই ব্যাপারে এতটা ভীতি ও সতর্কতা থাকা ঠিক নয় যা সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাকে পরিপূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। এখানে আমরা রাসুলের জীবনচরিতের দ্বিতীয় অবস্থানটি তুলে ধরছি। আবুল আহওয়াস আওফ তার পিতা মালিক ইবনে নাদলাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমি জীর্ণ পোশাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তিনি বললেন, أَلَكَ مَالٌ؟–'তোমার কি ধনসম্পদ নেই?'

আমি বললাম, 'জি, আছে।'

তিনি বললেন, مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟–'কী কী ধনসম্পদ আছে?'

আমি বললাম, 'উট, ভেড়া-ছাগল, ঘোড়া, দাস-দাসী সবই আছে।' তখন তিনি বলেন,

«فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ»

---

১৪৮. *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : তাহরিমুল কিব্র ওয়া বায়ানুহু, হাদিস নং ৯১।

আল্লাহ যখন তোমাকে মাল দিয়েছেন তখন তোমার গায়ে যেন আল্লাহর নেয়ামত ও বদান্যতার আলামত প্রকাশ পায়।[১৪৯]

ইসলাম এভাবে শিথিলতা ও কঠোরতা এবং অহংকার ও নোংরামির মধ্যে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তিনি চান তার বান্দাদের গায়ে তার নেয়ামতের নিদর্শন থাকুক। কিন্তু তিনি যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার রয়েছে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। এ ব্যাপারটি আমরা জেনেছি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বক্তব্য থেকে। তিনি আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর পক্ষ থেকে দূত হিসেবে হারুরিয়্যা খারিজিদের[১৫০] সঙ্গে আলোচনা করতে এবং সত্যটাকে তাদের বুঝিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। তিনি এই দায়িত্ব পালনের জন্য তার কাছে থাকা শ্রেষ্ঠ পোশাকটি বাছাই করেছিলেন। ইমাম আবু দাউদ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হারুরিয়্যা খারিজিরা বিদ্রোহ করলে আমি আলি রা.-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, তুমি এই দলটির কাছে যাও এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করো। তখন ইয়ামেনের সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করলাম।—আবু যুমাইল (সিমাক ইবনুল ওয়ালিদ আল-হানাফি) জানিয়েছেন, ইবনে আব্বাস ছিলেন সুদর্শন ও শুভ্রোজ্জ্বল মানুষ।—ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি তাদের কাছে এলাম। তারা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, তোমাকে স্বাগতম হে ইবনে আব্বাস। এই পোশাকটি কী? আমি বললাম, (এত সুন্দর ও দামি পোশাকের জন্য) তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরতে দেখেছি।[১৫১]

পোশাক-পরিচ্ছদ ও তার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব এতটা বেশি ছিল যে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো মুসলমানের ময়লা কাপড়ে সমাবেশে আসা, বিশেষ করে জুমআর নামাযে আসা অপছন্দ করতেন।

---

[১৪৯] [illegible], হাদিস নং ৫২২৪।

[১৫০] [illegible] নামের সঙ্গে সংগতি রেখে খারিজিদের এ [illegible]

[১৫১] [illegible], হাদিস নং ৪০৩৭।

এমনকি যারা সপ্তাহজুড়ে কাজ করে এবং কাজের ফলে জামাকাপড় ময়লা হয়ে যায় তিনি তাদের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। তারা যেন জুমআর নামাযের জন্য আলাদা পরিচ্ছন্ন পোশাক রাখে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জুমআ

«مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ؟»

তোমাদের কেউ যদি তার জুমআর দিনে দৈনন্দিন পরিধানের কাপড় দুটি ছাড়া ভিন্ন দুটি কাপড় পরে তাহলে সমস্যা কী?[১৫২]

ফকিহগণ কাপড়ে কোনো ধরনের নাপাকি (নাপাক বস্তু) লাগার দ্বারা কাপড়কে নাপাক বিবেচনা করেন। যেমন : পেশাব, পায়খানা, রক্ত। নাপাক দূর করা (ভালো করে ধোয়া) ব্যতীত এমন পোশাক পরে নামায সহিহ-শুদ্ধ হবে না। এমনকি নাপাকির পরিমাণ অল্প হলেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে। আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, যে কাপড়ে পেশাব বা পায়খানা লেগেছে এমন কাপড় পরে নামায পড়লে নামায পুনরায় পড়তে হবে, সেই নাপাকির পরিমাণ কম হোক বা বেশি।[১৫৩]

ইমাম মুনাবি এই প্রসঙ্গের একটি উপসংহার টেনেছেন এবং বলেছেন, পোশাক ও শরীরের পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি শরয়ি দিক থেকে যেমন, তেমনই বিবেক ও প্রথার দিক থেকেও জরুরি...। শাইখুল ইসলাম বুরহান ইবনে আবু শরিফ রহ.-এর পোশাক ও কাপড়চোপড় থাকত অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও শুভ্র; তা এতটা বেশি যে, তখনকার যুগে রাজা-নৃপতিরাও এত শুভ্র ও পরিপাটি পোশাক পরতেন না। পোশাকের সঙ্গে তাকে মনে হতো একটি আলোকখণ্ড।

পরিচ্ছন্নতা মানুষের চোখে সমীহ বাড়িয়ে দেয়, তাদের মনে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে। 'দরিদ্রদের' একটি শ্রেণি পরিচ্ছন্নতার দিকটি উপেক্ষা করে চলে, গুরুত্বই দেয় না। তাদের কারও কারও কাপড়চোপড় এতটাই নোংরা হয়ে পড়ে যে, বিবেক ও প্রথা উভয় দিক থেকে তার নিন্দা করা যায়। শয়তান তাদের কাছে পরিচ্ছন্নতার দিকটি অপ্রয়োজনীয় করে তোলে এবং

---

১৫২. *আবু দাউদ*, কিতাব : আস-সালাহ, বাব : আল-লুবসু লিল-জুমুআহ, হাদিস নং ১০৭৮; ইবনে *মাজাহ*, হাদিস নং ১০৯৬।

১৫৩. দেখুন, *মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ*, পৃ. ৪১। তিনি ছাড়া অন্যান্য ইমাম ও ফকিহের মতও এটি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে দেয় না। শয়তান মন্ত্রণা দেয়, আগে অন্তর পরিষ্কার করো, তারপর পোশাক পরিষ্কার করা যাবে। শয়তান তো এদের কল্যাণ চায় না, বরং আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে যারা ওঠাবসা করে তাদের হক আদায় করতে দেয় না এবং মজলিসের সৌজন্য সে রক্ষা করতে পারে না, যেহেতু মজলিসে পরিচ্ছন্নতাই কাম্য। তারা যদি যাচাই করে দেখত তাহলে বুঝতে পারত যে বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারই নিয়ামক। বর্ণিত হয়েছে যে, এ কারণে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক কখনো নোংরা হতো না। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর শরীর থেকে সবসময় ঘ্রাণ বের হতো।[১৫৪]

---

১৫৪. মুনাবি, ফয়জুল কাদির, খ. ২, পৃ. ২৮৫।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বাড়িঘর, পথ ও শহরের সৌন্দর্য

বাড়িঘর, পথ ও শহর মিলে একটি পরিমণ্ডল তৈরি করে, যেখানে মানুষ বসবাস করে। আজকের যুগের মানবসভ্যতা এই পরিমণ্ডলকে 'পরিবেশ' নামে জানে।

এখানে একটি ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা এই পরিমণ্ডলের সৌন্দর্যকে পৃথিবীতে মানব-অস্তিত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে স্থির করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সালিহ আ.-এর জবানিতে বলেন,

«هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا»

> তিনি তোমাদেরকে ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন।[১৫৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. বলেন, অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের পৃথিবীতে আবাদকারী বানিয়েছেন, তোমরা পৃথিবীর মাটি আবাদ করবে এবং ফসল ফলাবে।[১৫৬]

যায়দ ইবনে আসলাম বলেছেন, 'তিনি তোমাদের বসবাস করিয়েছেন' কথাটির অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বসবাসের জন্য তোমাদের যা-কিছু প্রয়োজন—ঘরবাড়ি নির্মাণ, গাছপালা রোপণ, বীজ বোনা ও ফসল ফলানো—এ সবকিছু করার নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন। এটাও বলা হয় যে, তিনি তোমাদের মনের মধ্যে গাছপালা রোপণ ও ফসল ফলানো এবং নদীনালা খনন ও অন্যান্য কাজের প্রেরণা জুগিয়েছেন।[১৫৭]

---

১৫৫. সুরা হুদ : আয়াত ৬১।

১৫৬. আবু হাইয়ান আন্দালুসি, *তাফসিরুল বাহরিল মুহিত*, খ. ৫, পৃ. ২৩৬।

১৫৭. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ৪, পৃ. ৩৩১।

মুসলিমদের অন্তরে প্রোথিত ঈমানের সঙ্গে পথের একটি সামান্য সৌন্দর্যের বিষয়কে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোকে ঈমানের একটি অংশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً؛ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ»

ঈমান সত্তরটিরও বেশি বা ষাটটিরও বেশি শাখায় বিভক্ত, শ্রেষ্ঠ শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।[১৫৮]

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর অর্থ হলো যা-কিছু পথচারীকে কষ্ট দেয় বা কষ্ট দিতে পারে তা সরিয়ে রাখা বা দূরে ফেলে দেওয়া। তা হতে পারে পাথর বা ইটের টুকরো, হতে পারে কাঁটা বা অন্যকিছু।

কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়ার সওয়াব সদকার সওয়াবের অনুরূপ। আবু হুরাইরা রা. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«يُمِيطُ الأَذٰى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো সদকা।[১৫৯]

কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া বরং এমন একটি কাজ, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১৫৮. *মুসলিম*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু আদাদি শুআবিল ঈমান ওয়া আফদালুহা ওয়া আদনাহা, হাদিস নং ৫৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮৯১৩; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ১৬৬।

১৫৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : মান আখাযা বির-রিকাব ওয়া নাহবিহি, হাদিস নং ২৮২৭।

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»

এক লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, সে পথের ওপর একটি কাঁটাযুক্ত ডাল পেল, ডালটি সে সরিয়ে দিলো। আল্লাহ তাআলা তার কাজটি কবুল করে নিলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[১৬০]

*ইবনে মাজাহ*র বর্ণনায় রয়েছে,

«كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ، فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ»

পথের ওপর একটি গাছের ডাল পড়ে ছিল, মানুষকে তা কষ্ট দিচ্ছিল। একজন লোক তা সরিয়ে দিলো। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো।[১৬১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ কাজ,

«عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ»

আমার সামনে আমার উম্মতের আমলসমূহ পেশ করা হলো, ভালো আমলও, খারাপ আমলও। আমি তাদের ভালো কাজের মধ্যে রাস্তা থেকে 'কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া'-ও পেলাম।[১৬২]

প্রখ্যাত সাহাবি আবু বুরযাহ আসলামি রা. একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ভালো কাজের কথা জানতে চাইলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমাকে এমন কাজের কথা বলুন, যার দ্বারা

---

১৬০. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : মান আখাযাল গুসনা ওয়া-মা ইয়ুযিন নাসা ফিত-তারিকি ফা-রামা বিহি, হাদিস নং ২৩৪০; মুসলিম, কিতাব : আল-ইমারাহ, বাব : বায়ানুশ শুহাদা, হাদিস নং ১৯১৪।

১৬১. *ইবনে মাজাহ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইমাতাতুল আযা আনিত তারিক, হাদিস নং ২৬৮২।

১৬২. *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস-সালাহ, বাব : আন-নাহয়ু আনিল বুসাকি ফিল-মাসজিদি ফিস-সালাতি ওয়া-গাইরিহা, হাদিস নং ৫৫৩।

উপকৃত হব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব ছিল এরূপ,

«اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْـمُسْلِمِينَ»

মুসলিমদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।[১৬৩]

আমরা আরও বেশি হতবাক হয়ে যাই যারা পথের এই বিধান লঙ্ঘন করে তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী শুনে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ»

যে লোক মুসলিমদের চলার পথে কষ্ট দেয়, তার ওপর তাদের অভিসম্পাত আবশ্যক হয়ে যায়।[১৬৪]

ভেবে দেখেছেন কি! 'চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া' প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে সাতটি দলিল এখনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সবগুলো দলিলই আমরা সন্নিবিষ্ট করেছি তা বোঝাচ্ছি না। আমরা কোনো ধর্মাদর্শ, কোনো নীতি ও দর্শনের কথা জানি না, যা পথের সৌন্দর্যের ব্যাপারে এই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছে। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে, এরকম কিছু ঘটেছে (অন্য কোনো ধর্মাদর্শ বা দর্শন রাস্তার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে), তবুও কেউ কি বলতে পারবে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা রাখা ও যত্নশীল হওয়া গুনাহ মাফের ও জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে?

এখানে আরও একটি কাহিনি অনুধাবন করা যাক। একজন নারী সাহাবি, তার সম্পর্কে এতটুকুই জানি যে তিনি মসজিদ পরিষ্কার করতেন। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খোঁজ করলেন, তার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। যখন জানলেন এই নারী মারা গেছেন, তিনি তাঁর সাহাবিদের তিরস্কার করলেন। কারণ, তারা সেই নারীর ব্যাপারটিকে

---

১৬৩. মুসলিম, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : ইযালাতুল আযা আনিত-তারিক, হাদিস নং ২৬১৮।

১৬৪. তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৩০৫১।

তুচ্ছভাবে দেখেছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার মৃত্যুসংবাদ জানাননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي... دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا. فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا»

> তোমরা আমাকে তার খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। সাহাবিরা মহিলাটির কবরটি দেখিয়ে দিলেন। নবীজি (তার কবরের কাছে গেলেন এবং) তার জানাযার নামায আদায় করলেন।[১৬৫]

ইসলামের ইতিহাস এই নারীকে স্মরণীয় করে রেখেছে এবং তিনি সুনানের (হাদিসের) গ্রন্থাবলিতে অমর হয়ে রয়েছেন। তার কীর্তি তেমন কিছু নয়, তিনি শুধু মসজিদের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যত্নশীল ছিলেন। তাই তিনি–কেবল ইসলামি জীবনদর্শনে–অমরত্ব লাভের অধিকার পেয়েছেন; নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে সাহাবিদের তিরস্কার করেছেন এবং মৃত্যুর পর তার জানাযার নামায পড়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের চলাফেরার জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اِتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ. قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»

> তোমরা লানতের দুটি কাজ থেকে বিরত থাকো। সাহাবিরা বললেন, সে দুটি কাজ কী, ইয়া রাসুলাল্লাহ? তিনি বললেন, মানুষের চলাচলের পথে বা তাদের (বিশ্রাম নেওয়ার) ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করা।[১৬৬]

এই হাদিসের অর্থ এই যে, যে লোক মানুষের চলাচলের জায়গায় বা মানুষ যেখানে বসে ও বিশ্রাম নেয় সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে সে নিজের

---

১৬৫. *বুখারি*, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাব : কানসুল মাসজিদি ওয়ালতিকাতুল খিরাকি ওয়াল-কাযা ওয়াল-ঈমান; হাদিস নং ৪৪৬, *মুসলিম*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : আস-সালাতু আলাল-কাব্‌র, হাদিস নং ৯৫৬। উদ্ধৃত হাদিসটি *মুসলিম* থেকে।

১৬৬. *মুসলিম*, কিতাব : আত-তাহারাহ, বাব : আন-নাহয়ু আনিত-তাখাল্লি ফিত-তুরুকি ওয়ায-যিলাল, হাদিস নং ২৬৯।

অভিসম্পাত ডেকে আনে। ইমাম সুলাইমান খাত্তাবি[১৬৭] বলেছেন, লানতের দুটি কাজের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন দুটি বিষয় যা লানত টেনে আনে, মানুষকে লানত করতে উদ্বুদ্ধ করে ও আহ্বান জানায়।[১৬৮]

কোনো বিশেষ জায়গা হলে সেখানকার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বও ছিল অত্যধিক, যেমন মসজিদ। এমনকি এ ব্যাপারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْبُزَاقُ فِي الْـمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ। তার কাফফারা হলো তা (মাটির সঙ্গে) মিটিয়ে দেওয়া।[১৬৯]

ইহুদিরা তাদের বাড়িঘর-আঙিনা পরিষ্কার রাখত না। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের এ কথা বলে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন,

«طَهِّرُوا أَفْنِيَتَكُمْ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ لاَ تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا»

তোমরা তোমাদের ঘরবাড়ির আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো, কারণ ইহুদিরা তাদের আঙিনা পরিচ্ছন্ন রাখে না।[১৭০]

অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে,

«نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ؛ فَإِنَّ الْيَهُودَ أَنْتَنُ النَّاسِ»

তোমরা তোমাদের আঙিনা পরিচ্ছন্ন রাখো, কারণ ইহুদিরা সবচেয়ে নোংরা মানুষ।[১৭১]

---

[১৬৭]. আবু সুলাইমান খাত্তাবি (৩১৯-৩৮৮ হি./৯৩১-৯৯৮ খ্রি.) : হামদ ইবনে ইবরাহিম ইবনুল খাত্তাব বাসতি। ফকিহ ও মুহাদ্দিস। আফগানিস্তানের বাস্ত এলাকার অধিবাসী। যায়দ ইবনুল খাত্তাবের বংশধর। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *মাআলিমুস সুনান*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ২৭৩।

[১৬৮]. নববি, *আল-মিনহাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৬১।

[১৬৯]. *বুখারি*, আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাব : কাফফারাতুল বুযাকি ফিল-মাসজিদ, হাদিস নং ৪০৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত, বাব : আন-নাহয়ু আনিল বুযাকি ফিল-মাসজিদি ফিস-সালাত ওয়া গাইরিহা, হাদিস নং ৫৫২।

[১৭০]. তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, খ. ৪, পৃ. ২৩১।

[১৭১]. *তিরমিযি*, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আন-নাযাফাহ, হাদিস নং ২৭৯৯; *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ৭৯০।

এই বিশেষ নির্দেশ প্রমাণ করে যে, ইসলামে সৌন্দর্যচর্চা একটি মৌলিক বিষয়, তা উষ্ণ পরিবেশের প্রভাবের ফল ছিল না—যেমনটি বিশ্বাস করেন কতিপয় পশ্চিমা গবেষক—এবং পূর্ববর্তী কোনো ধর্মাদর্শ বা জীবনাদর্শের প্রভাবও ছিল না।

ইসলাম নফল নামায ঘরে আদায় করতে উৎসাহিত করেছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا»

তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায আদায় করে, সে যেন তার কিছু নামায (সুন্নত ও নফল) বাড়িতেও আদায় করে। কারণ আল্লাহ তাআলা তার বাড়িতে আদায় করা কিছু নামাযের মধ্যে কল্যাণ রেখেছেন।[১৭২]

এই হাদিসের দ্বারা ঘরগুলোও ভিন্ন ধরনের ছোট ছোট মসজিদে পরিণত হয়েছিল। তাই ঘরগুলোর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ছিল অপরিহার্য, যাতে নামায শুদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে মসজিদ (নামায পড়ার নির্দিষ্ট জায়গা) বানিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৭৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ»

---

১৭২. *মুসলিম*, কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : ইসতিহবাবু রামই জামরাতিল আকাবাহ ইয়াওমান নাহরি রাকিবান.., হাদিস নং ১২৯৮।

১৭৩. *আবু দাউদ*, কিতাব : আস-সালাত, বাব : ইত্তিখাযুল মাসাজিদ ফিদ-দুর, হাদিস নং ৪৫৬; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২০১৯৬; *তিরমিযি*, হাদিস নং ৫৯৪; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৭৫৯; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ১৬৩৪।

এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কেউ তার গোসলখানায় পেশাব করল, অতঃপর সে সেখানেই অজু করল।[১৭৪]

এই হলো বাড়িতে বা পথে অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক কিছু হাদিস।

চারপাশের পরিমণ্ডল ও পরিবেশের ব্যাপারে কেবল নিষেধাজ্ঞাই আসেনি, বরং ইসলাম বৃক্ষরোপণের প্রতিও উৎসাহিত করেছে। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. وفي رواية مسلم: وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ... وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»

যে মুসলিম একটি গাছ রোপণ করবে বা কোনো বীজ বপন করবে, তারপর তা থেকে কোনো পাখি বা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খাবে, এর জন্য সে সদকার সওয়াব পাবে।[১৭৫]

মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, তা থেকে কিছু চুরি হলে সেটাও সদকা এবং কেউ তা নষ্ট করলেও সে সদকার সওয়াব পাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরং কিয়ামত সন্নিকট হলেও বৃক্ষরোপণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا»

কিয়ামত এসে গেছে, এই সময়েও যদি তোমাদের কারও হাতে খেজুরের একটি চারাগাছ থাকে এবং সে তা রোপণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে যেন চারাটি রোপণ করে দেয়।[১৭৬]

---

১৭৪. আবু দাউদ, কিতাব : আত-তাহারাত, বাব : আল-বাউলু ফিল-মুস্তাহাম হাদিস নং ২৭, নাসায়ি, হাদিস নং ৩৬, ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩০৪।

১৭৫. বুখারি, কিতাব: আল-মুযারাআ, বাব: ফাদলুস যারা ওয়াল-গারাসি ইযা আকালা মিনহু, হাদিস নং ২৩২০।

বৃক্ষরোপণ ও ফসল ফলানোর প্রতি উৎসাহদান ও উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে শক্তিশালী কোনো হাদিস নেই। কারণ তা মুসলিম ব্যক্তির সৃষ্টিশীল ও কল্যাণসাধক ফিতরাত বা স্বভাবের পরিচায়ক, সে স্বভাবগত দিক থেকেই জীবন ও প্রাণ বিকাশে একজন উদার কর্মী। প্রবহমান প্রস্রবণের মতো। কখনো শুকায় না, কখনো থেমে যায় না। সে দিতেই থাকে, কাজ করতেই থাকে, এমনকি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত কাজ করে যায়। যদি কিয়ামত ঘটার উপক্রম হয় তাহলেও সে বৃক্ষরোপণ করে যাবে, বীজ বুনে যাবে। সে নিজে কিছুতেই তার রোপিত গাছের ফল খেতে পারবে না, সে ছাড়া পরে অন্য কেউ খেতে পারবে তাও নয়। কারণ মহাপ্রলয় তার দুন্দুভি বাজাচ্ছে অথবা এক্ষুনি তার শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। এখানে কর্মই কর্মের উদ্গাতা, কারণ তা একপ্রকারের ইবাদত এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জমিনের বুকে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্বপালনের প্রয়াস।[১৭৭]

ইসলামি ফিকহে ভূমিকে আবাদ করা-সংশ্লিষ্ট পরিভাষাটি মৃত জমিনে প্রাণ সঞ্চার করা নামে পরিচিত। মৃত জমিন হলো অনুর্বর পরিত্যক্ত ভূমি। এই ব্যাখ্যা নেওয়া হয়েছে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নবর্ণিত হাদিস থেকে,

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

যে লোক পরিত্যক্ত ভূমিতে চাষাবাদ করল তা তার।[১৭৮]

ইসলাম একদিকে পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ দিয়েছে এবং যেকোনো ধরনের অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামি থেকে বিরত থাকতে বলেছে, অন্যদিকে বৃক্ষরোপণ করতে বলেছে। এ কারণেই ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিমদের বাড়িঘর ও শহর সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার একেকটি টুকরো ছিল।

---

১৭৬. ইমাম বুখারি, *আল-আদাবুল-মুফরাদ*, হাদিস নং ৪৭৯।

১৭৭. ইউসুফ কারযাবি, *রিআয়াতুল বিআতি ফি শরিআতিল ইসলাম*, পৃ. ৬৩।

১৭৮. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-খারাজ, বাব : ইহইয়াউল মাওয়াত, হাদিস নং ৩০৭৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৪৩১০। উমর রা. থেকে ইমাম বুখারি মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং ২৩৩৫।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ
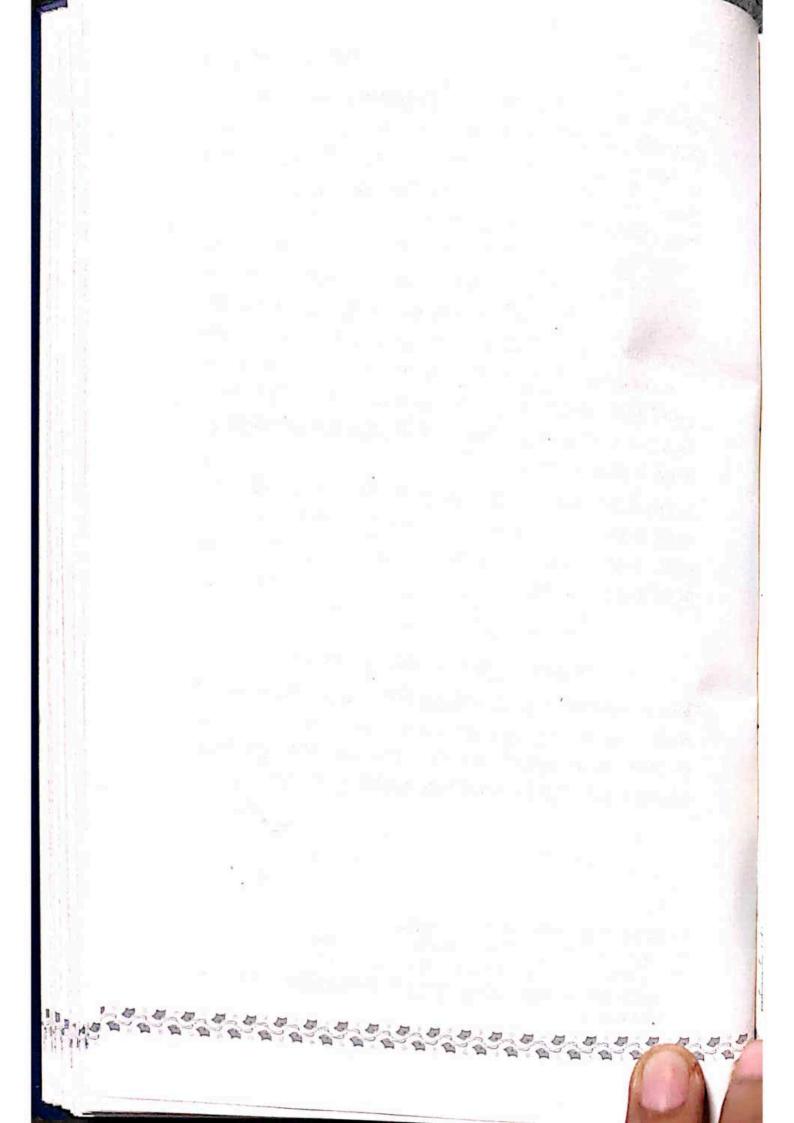
সুন্দর রুচিবোধ

রুচিবোধ বলতে বোঝায় স্বচ্ছ-নির্মল অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে, এর ফলে একজন ব্যক্তি অন্যদের অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যত্নশীল থাকে। মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণের এটাই হলো আদবকেতা। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটি সুন্দর বিদ্যা।

রুচিবোধের বিষয়টি যেমন বাহ্যিক হতে পারে তেমনই অভ্যন্তরীণ বা মানসিকও হতে পারে। এখানে রুচিবোধের কিছু বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করব। এসব ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এসব নির্দেশ দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তিনিই আমাদের আদর্শ ও নমুনা।

চলাচলের পথে ও কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

রহমান-এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।[১৭৯], [১৮০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

---

[১৭৯]. শান্তি কামনা করে, তর্কে লিপ্ত হয় না।-অনুবাদক

[১৮০]. সুরা ফুরকান : আয়াত ৬৩।

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর সংযত রাখো, নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।[১৮১]

ইবনে কাসির উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আওয়াজের ক্ষেত্রে গাধার সঙ্গে তুলনার কারণে তা নিষিদ্ধ ও চূড়ান্ত তিরস্কারের উপযুক্ত হওয়ার কথা। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»

নিকৃষ্ট উপমা দেওয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় (তবু বলতে হয়), যে দান করে ফিরিয়ে নেয় সে ওই কুকুরের মতো যে বমি করে আবার তা খায়।[১৮২], [১৮৩]

২. অন্যদের বিরক্ত না করার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

যারা ঘরের বাইরে থেকে আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে[১৮৪] তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।[১৮৫]

---

১৮১. সুরা লুকমান : আয়াত ১৮-১৯।

১৮২. *বুখারি*, কিতাব : আল-হিবাহ ওয়া ফাদলুহা, বাব : লা ইয়াহিল্লু লি-আহাদিন আন ইয়ারজিআ ফি হিবাতিহি ওয়া সাদাকাতিহি, হাদিস নং ২৪৭৯।

১৮৩. ইবনে কাসির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, খ. ৬, পৃ. ৩৩৯।

১৮৪. বনু তামিমের একটি দল নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। তখন তিনি তাঁর কামরায় অবস্থান করছিলেন। তারা কামরার পেছন থেকে চিৎকার

এই আয়াত কিছু গ্রাম্য লোকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এদের দুর্ব্যবহার ও অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাঁর রাসুলের ওপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা না জানাটা তাদের জন্য সংগত। প্রতিনিধি হিসেবে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। তারা তাকে তার ঘরে, কোনো এক স্ত্রীর কামরায় পেল। আদবও দেখাল না, ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করল না যে, তিনি নিজ থেকে বাইরে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন। বরং চিৎকার করে ডাকতে লাগল, মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ! বেরিয়ে এসো। তাই আল্লাহ তাদের বুদ্ধি-বিবেক নেই বলে নিন্দা করলেন। আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে কীভাবে আদব-তমিজ ও সম্মান দেখাতে হবে তা তারা বোঝেইনি। কারণ আদবকেতা ও সৌজন্যবোধ বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকেরই পরিচায়ক।[১৮৬]

৩. পথ ও রাস্তার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِيَّاكُمْ وَالْـجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بُدٌّ، نتحدَّث فيها. فقال: "إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْـمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قالوا: وما حقُّ الطريق يا رسول الله؟ قال: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْـمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْـمُنْكَرِ»

তোমরা রাস্তার ওপর বসা থেকে বিরত থাকো। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, আমাদের তো রাস্তার ওপর বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, রাস্তায় আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। তিনি বললেন, যদি তোমরা সেখানে বসতে একান্ত বাধ্যই হও তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললেন, রাস্তার হক কী, ইয়া

করে তাকে ডাকতে থাকে। আয়াতটি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। এতে এবং এই সুরার আরও কিছু আয়াতে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।-অনুবাদক

১৮৫. সুরা হুজুরাত : আয়াত ৪।

১৮৬. আস-সাদি, *তাইসিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান (তাফসিরে সা'দি)*, পৃ. ৭৯৯।

রাসুলাল্লাহ? তিনি বললেন, দৃষ্টি নিচু রাখা, কাউকে (পথচারীকে) কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজে নিষেধ করা।[১৮৭]

আতিথ্যগ্রহণ ও অনুমতিগ্রহণের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। তা-ই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[১৮৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اَلْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ؛ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ»

অনুমতি চাইবে তিন বার; অনুমতি দিলে তো ভালোই, অন্যথায় ফিরে আসবে।[১৮৯]

স্ত্রীর সঙ্গে সদাচারে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ»

---

১৮৭. *বুখারি*, আবু সাইদ আল-খুদরি রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : আফনিয়াতুদ দুর ওয়াল-জুলুসি ফিহা ওয়াল-জুলুসি আলাস-সুউদাত, হাদিস নং ২৩৩৩; *মুসলিম*, কিতাব : আল-লিবাস ওয়ায-যিনাহ, বাব : আন-নাহয়ু আনিল-জুলুসি ফিত-তুরুকাত ওয়া ই'তাউত তারিকি হাক্কাহু, হাদিস নং ১১৪।

১৮৮. সুরা নুর : আয়াত ২৭।

১৮৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-ইসতিযান, বাব : আত-তাসলিম ওয়াল-ইসতিযান সালাসান, হাদিস নং ৫৮৯১; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আল-ইসতিযান, হাদিস নং ৩৪।

তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা-কিছু দান করবে তার বিনিময়ে প্রতিদান পাবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দাও তার বিনিময়েও।[১৯০]

সাইয়িদা আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم فَيَضَع فَاه على مَوضِع فِي»

আমি ঋতুমতী অবস্থায় পানি পান করতাম, তারপর তা (পানির পাত্রটি) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিতাম, তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ লাগিয়েই পান করতেন। আমি ঋতুমতী অবস্থায় হাড়ের গোশত খেতাম, তারপর তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিতাম। তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই খেতেন।[১৯১]

৬. **হাঁচি দেওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :**

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন তাঁর হাত বা কাপড় মুখের ওপর রাখতেন এবং এভাবে হাঁচির আওয়াজ ছোট করতেন।[১৯২]

৭. **হাঁচিদাতার সঙ্গে আচরণে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :**

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الاخَرَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: هٰذَا حَمِدَ اللهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ»

---

১৯০. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাগাযি, বাব : হাজ্জাতুল বিদা, হাদিস নং ৪১৪৭; *মুসলিম*, কিতাব: আল-ওয়াসিয়্যাহ, বাব : আল-ওয়াসিয়্যাতু বিস-সুলুস, হাদিস নং ১৬২৮।

১৯১. *মুসলিম*, কিতাব : আল-হায়দ, বাব : জাওয়াযু গুসলি রা'সি যাওজিহা ওয়া তারজিলিহি.., হাদিস নং ৩০০; *নাসায়ি*, হাদিস নং ২৮২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৫৬৩৫।

১৯২. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফিল-উতাস, হাদিস নং ৫০২৯; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৭৪৫।

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দুই লোক হাঁচি দিলো। তিনি তাদের একজনের জবাব দিলেন, আরেকজনের জবাব দিলেন না। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই লোক আলহামদুলিল্লাহ বলেছে, আর ওই লোক আলহামদুলিল্লাহ বলেনি।[১৯৩]

৮. **হাই তোলার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :**

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ»

হাই আসে শয়তানের থেকে, তাই তোমাদের হাই আসলে সে যেন তা যথাসম্ভব রোধ করে।[১৯৪]

৯. **ঘ্রাণের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :**

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ -يُرِيدُ الثُّومَ- فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا»

কেউ এই গাছ–অর্থাৎ রসুন–খেয়ে থাকলে সে যেন মসজিদে আমাদের সঙ্গে না মেশে।[১৯৫]

মুসলিমের রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা গন্ধের কারণে। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

[১৯৩]. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, আল-হামদু লিল-আতিসি, হাদিস নং ৫৮৬৭; *মুসলিম*, কিতাব : আয-যুহ্‌দ ওয়ার-রাকায়িক, বাব : তাশমিতুল আতিস ওয়া কারাহাতুত তাসাউব, হাদিস নং ২৯৯১।

[১৯৪]. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খাল্‌ক, বাব : সিফাতু ইবলিস ওয়া জুনুদিহি, হাদিস নং ৩১১৫; *মুসলিম*, কিতাব : আয-যুহ্‌দ ওয়ার-রাকায়িক, বাব : তাশমিতুল আতিসি ওয়া কারাহাতুত তাসাউব, হাদিস নং ২৯৯৪।

[১৯৫]. *বুখারি*, কিতাব : সিফাতুস সালাত, বাব : মাজাআ ফিসসুমিন নিয়্যি ওয়াল-বাসাল ওয়াল-কুররাস, হাদিস নং ৮১৬; *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত, বাব : নাহয়ু মান আকালা সুমান আও বাসালান আও কুররাসান আও নাহওয়াহা, হাদিস নং ৫৬৪। হাদিসটি *বুখারি* থেকে উদ্ধৃত।

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا»

যে লোক এই সবজি (রসুন) খাবে, সে যেন এর গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।[১৯৬]

১০. মুসাফাহার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কারও সঙ্গে মুসাফাহা করতেন, অপর লোক রাসুলুল্লাহর হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি তার হাত ছেড়ে দিতেন না।[১৯৭]

১১. সফর থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

কোনো পুরুষ সফর থেকে ফিরে এসে হুট করে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না। কারণ সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় দেখতে পারে, যা তার পছন্দ নয়। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً، وَلا تَغْتَرُّوهُنَّ»

হে লোকেরা, তোমরা (সফর থেকে ফিরে এসে) রাতেরবেলা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে (তাদের জানান না দিয়ে) সাক্ষাৎ করো না এবং তাদের আত্মপ্রবঞ্চনায় ফেলো না।[১৯৮]

১২. বসার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের প্রকাশ :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতীত কাউকে বসতে নিষেধ করেছেন।[১৯৯]

এই হলো সুন্দর রুচিবোধের বহিঃপ্রকাশের কিছু ক্ষেত্র, এসব ব্যাপারে ইসলাম গভীর ও সূক্ষ্ম নির্দেশনা দিয়েছে। পাশাপাশি ব্যাখ্যাও রয়েছে।

---

[১৯৬]. *মুসলিম*, কিতাব : আল-মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদিউস সালাত, বাব : নাহয়ু মান আকালা সুমান আও বাসালান আও কুররাসান আও নাহওয়াহা, হাদিস নং ৫৬১।

[১৯৭]. *তিরমিযি* : সিফাতুল কিয়ামা ওয়ার-রাকায়িক ওয়াল-ওয়ারা, হাদিস নং ২৪৯০; *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৭১৬।

[১৯৮]. *দারিমি*, বাব : তাজিলু উকুবাতি মান বালাগাহু আনিন নাবিয়্যি হাদিসুন ফালাম ইয়ুআযযিমহু, হাদিস নং ৪৪৪; *আবু ইয়ালা*, হাদিস নং ১৮৪৩; *হাকিম*, হাদিস নং ৭৭৯৮।

[১৯৯]. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদব, বাব : আর-রাজুলু ইয়াজলিসু বাইনার রাজুলাইনি বিগাইরি ইযনিহা, হাদিস নং ৪৮৪৪; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৭৫২; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৬৯৯৯।

কখনোই কোনো মতবাদের উদ্গাতা, কোনো ধর্মাদর্শের প্রবর্তক বা কোনো আইন-প্রণেতা এসব বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। এটাই আল্লাহ তাআলার বিধান ও মানুষের বিধানের মধ্যে পার্থক্য, ইসলাম এবং অন্যান্য মতাদর্শ ও দর্শনের মধ্যকার ভিন্নতা। এভাবে পার্থক্য সূচিত হয় আমাদের সভ্যতার ও অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য

ইসলামি সভ্যতা চরিত্র ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বের চর্চা করেছে। ইসলামের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো জীবনাদর্শে এসব দেখা যায়নি। উত্তম চরিত্র, সহৃদয়তা, কোমলতা, মিষ্ট ও সুন্দর কথাবার্তা ইত্যাদি চারিত্রিক সৌন্দর্যের অন্তর্গত। মুচকি হাসিতেও সদকার সওয়াব মেলে! সুন্দর আচরণেও পুণ্য রয়েছে! ক্রোধ সংবরণ এবং যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের ক্ষমা করায় ইহসান বা মানবিকতার একটি স্তর এবং এতে আল্লাহর ভালোবাসা মেলে!

এগুলোই মানবচরিত্রের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার উৎকৃষ্ট প্রকাশ; আচার-আচরণের সৌন্দর্য, কথাবার্তার সৌন্দর্য, অন্য মানুষের ক্ষেত্রে মানবিকতার সৌন্দর্য, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের সৌন্দর্য এগুলোই।

এ পরিচ্ছেদে সৌন্দর্যের এই দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে এখানে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : মুচকি হাসি, উজ্জ্বল চেহারা ও সুন্দর কথা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্বচ্ছ মন ও মানবপ্রেম

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : উত্তম চরিত্র

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : অনুপম রুচিবোধ
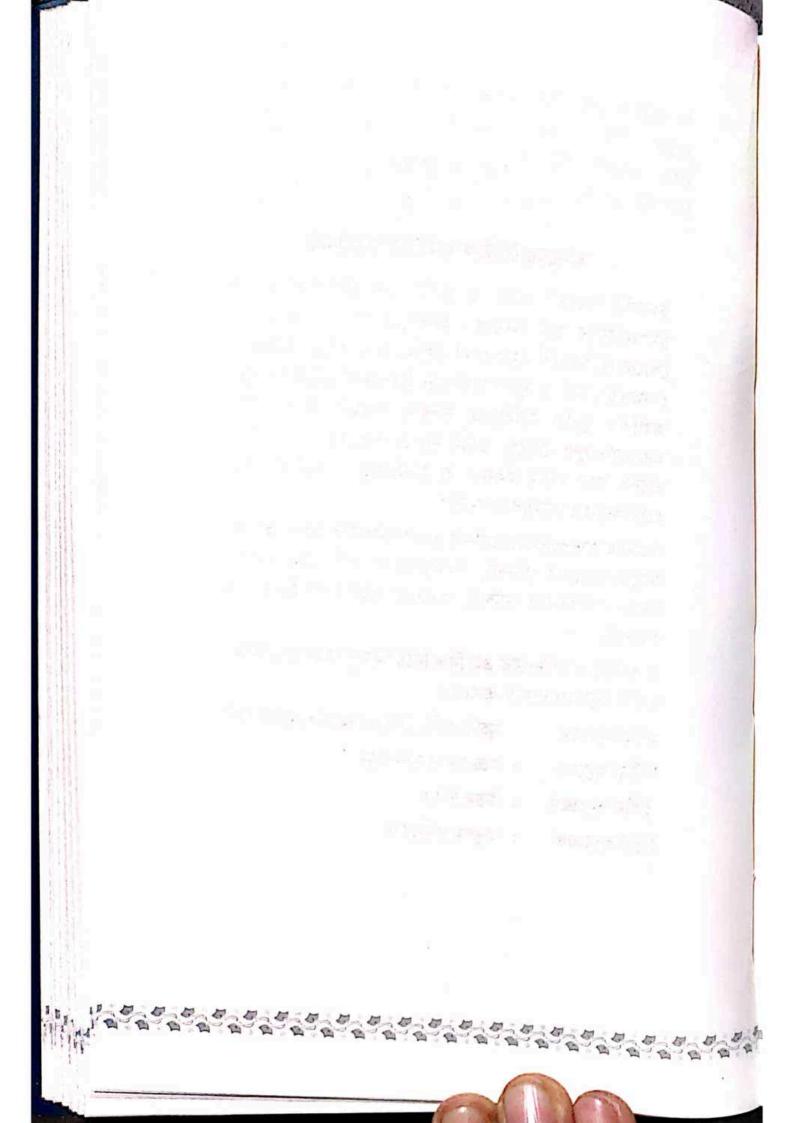
প্রথম অনুচ্ছেদ

মুচকি হাসি, উজ্জ্বল চেহারা ও সুন্দর কথা

মুচকি হাসি... গোটা বিশ্বের মানবিক ভাষা। সর্বোচ্চ সৌজন্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। গ্রহণীয়তা, স্বচ্ছতা, সহৃদয়তা, মানবিক প্রেম—সবই বোঝানো যায় মুচকি হাসি দিয়ে।

ভাষা-পণ্ডিতদের বক্তব্য অনুযায়ী মুচকি হাসি হলো, হাসির মৃদু প্রকাশ ও চেহারার উজ্জ্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ আনন্দের ফলে দাঁত প্রকাশিত হওয়া। কেবল আনন্দের বিষয় বোঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল।[২০০]

উজ্জ্বল ও সহাস্য চেহারা কেবল মানুষেরই হয়ে থাকে, অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে তা পাওয়া যায় না।[২০১] সুতরাং মুচকি হাসি মানবিক আচরণ ও চরিত্রের অন্যতম সৌন্দর্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মুচকি হাসি; গোটা দিন, গোটা জীবন তিনি মুচকি হেসেছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি মুচকি হাসতেন। তাঁর সাহাবিগণের সঙ্গে কৌতুক করতেন, হাস্যরস করতেন, কিন্তু জীবনে কখনো তিনি সত্য ব্যতীত অসত্য বলেননি। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ»

---

২০০. সুরা আবাসা : আয়াত ৩৮-৩৯।

২০১. যুবাইদি, *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস*, (ض ح ك) মূল ধাতু, খ. ২৭, পৃ. ২৪৯-২৫০।

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।[২০২]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلاَ رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي»

আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আমাকে তাঁর কাছে আসতে বাধা দেননি। তা ছাড়া যখনই তিনি আমাকে দেখতেন মৃদু মুচকি হাসতেন।[২০৩]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ হাসিই ছিল মুচকি হাসি। তিনি যখন মুচকি হাসতেন, শুভ্র মেঘের দানার মতো (তাঁর দাঁতগুলো) জ্বলজ্বল করত।[২০৪]

এই প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ বলেছেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ হাসিই ছিল মুচকি হাসি। বরং সবই ছিল মুচকি হাসি। মাড়ির দাঁত প্রকাশ পাওয়া ছিল তাঁর হাসির চূড়ান্ত। হাসির কিছু ঘটলে তিনি হাসতেন। অর্থাৎ আশ্চর্যজনক কিছু বা দুর্লভ কিছু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির দর্শন বর্ণনা করে ইবনুল কাইয়িম আরও বলেন, হাসির কয়েকটি কারণ রয়েছে। এই গেল একটি। আরেকটি হলো আনন্দের হাসি। আনন্দদায়ক কিছু দেখলে বা আনন্দের সংবাদ শুনলে মানুষ এই হাসি হাসে। তৃতীয় হলো ক্রোধের হাসি। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রচণ্ড ক্রোধের সময় এই হাসি হেসে থাকে। এখানে হাসির কারণ হলো ক্রোধের কারণ নিয়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির বিস্ময়বোধ এবং প্রতিপক্ষের ওপর তার ক্ষমতা অধিক এবং সে তার হাতের মুঠোয় এই অনুভূতি। হাসি এ কারণেও হতে পারে যে, অত্যধিক ক্রোধের সময়ও সে

---

২০২. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-মানাবিক, বাব : বাশাশাতুন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাদিস নং ৩৬৪১। *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৭৭৪০।

২০৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আত-তাবাসসুমু ওয়াদ-দিহ্‌ক, হাদিস নং ৫৭৩৯; *মুসলিম*, কিতাব : ফাদায়িলুস সাহাবাহ, বাব : ফাদায়িলু জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা., হাদিস নং ২৪৭৫।

২০৪. তিরমিযি, *আশ-শামায়িল*, পৃ. ২০।

নিজেকে সংযত রাখছে, যে তাকে রাগাচ্ছে তাকে পাত্তা দিচ্ছে না এবং তার প্রতি কোনো মনোযোগই দিচ্ছে না।[২০৫]

এ ব্যাপারটিরই জোরালো সমর্থন লক্ষ করি আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে। তিনি বলেন,

«كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قَالَ أَنَسٌ: فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ»

আমি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে হাঁটছিলাম। তখন তিনি নাজরানে প্রস্তুতকৃত মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত ছিলেন। এক গ্রাম্য লোক তাঁকে কাছে পেয়ে তাঁর চাদর ধরে প্রচণ্ড জোরে টান দিলো। আমি লক্ষ করলাম, চাদর জোরে টানার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুইন বলল, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর যে সম্পদ তোমার কাছে রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দাও। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[২০৬]

এই মানবিক সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কেবল আদর্শ ব্যক্তি হয়েই ক্ষান্ত থাকেননি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বরং তিনি এই ব্যাপারে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। আবু যর গিফারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২০৫. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, খ. ১, পৃ. ১৮২-১৮৩।

২০৬. *বুখারি*, কিতাব : আল-খুমুস, বাব : মা কানা লিন-নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ুতিল মুআল্লাফাতা কুলুবুহুম..., হাদিস নং ২৯৮০; *মুসলিম*, কিতাব : আয-যাকাত, বাব: ই'তাউ মান ইয়াসআলু বি-ফুহশিন ও গিলযাহ, হাদিস নং ১০৫৭।

«تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»

তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসাও তোমার জন্য সদকা।[২০৭]

এর অর্থ এই যে, অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুচকি হাসা, চেহারা উজ্জ্বল ও হাস্যময় রাখা। এতে তেমনই পুণ্য রয়েছে, যেমন সদকায় পুণ্য রয়েছে।[২০৮]

এসব সৌজন্যমূলক কাজ খুবই সহজ ও সাধারণ। চিন্তাও করতে হয় না, চেষ্টাও করতে হয় না, কিন্তু তা মানুষের ওপর জাদুকরী প্রভাব ফেলে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যা-কিছু আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলকে সন্তুষ্ট করে এটিও তার একটি। আবু যর গিফারি রা. আরও বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تَحْقِرَن مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ»

কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি তা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও।[২০৯] অর্থাৎ সহাস্য, সুন্দর, স্বাভাবিক উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে।

মুচকি হাসি ও উজ্জ্বল চেহারা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশের প্রথম পথ। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, কল্যাণ ও মমতা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এতে সমাজে নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক প্রেম অনুভূত হয়। এরকম সমাজই ইসলামে কাম্য ও প্রার্থিত। এর জন্যই শরিয়ত প্রবর্তিত হয়েছে। এসব সাধারণ বিষয়গুলোও ঈমানের অংশ। মুমিন তিনিই, যিনি মানুষের কাছে প্রিয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২০৭. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : সানায়িউল মারুফ, হাদিস নং ১৯৫৬। তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরিব। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৭৪, ৫২৯। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটি হাসান। *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮৯১।

২০৮. মুবারকপুরি, *তুহফাতুল আহওয়াযি বি-শারহি জামিয়িত তিরমিযি*, খ. ৬, পৃ. ৭৫-৭৬।

২০৯. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : ইসতিহবাবু তালাকাতিল ওয়াজহি ইনদাল লিকা, হাদিস নং ১৪৪; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৫৯৯৭; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৬৮।

«الْـمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ»

মুমিন তো সে-ই, যে মানুষকে ভালোবাসে এবং মানুষও তাকে ভালোবাসে। যে মানুষকে ভালোবাসে না এবং মানুষ যাকে ভালোবাসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ মানুষ।[২১০]

হাদিসটি কেবল এই ব্যাপারে উৎসাহ জোগাচ্ছে না যে মুমিন সবাইকে ভালোবাসবে এবং সকলের প্রিয় হবে, বরং ভালোবাসার বিপরীত ব্যাপারগুলোকে (হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা) নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, উপর্যুক্ত সৌজন্যমূলক বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়, এগুলো বাহুল্যও নয়, বরং জরুরি।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সুন্দর কথাবার্তা সকল মানুষের জন্য হবে এবং সকলের সঙ্গে হবে। আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে নির্দেশনাদান করে বলেন, ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾—'মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে।'[২১১]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[২১২]

---

২১০. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯১৮৭; *হাকিম*, হাদিস নং ৫৯।

২১১. সুরা বাকারা : আয়াত ৮৩।

২১২. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মান কানা ইয়ুমিনু বিল্লাহি ওয়াল-ইয়াওমিল আখিরি ফালা ইয়ুযি জারাহু, হাদিস নং ৫৬৭২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আল-হাসসু আলা ইকরামিল জার ওয়াদ-দায়ফ ওয়া লুযুমিস সামতি, হাদিস নং ৪৭।

এই হাদিসের টীকায় ইবনে হাজার আসকালনি রহ. বলেন, হাদিসটির মূলকথা এই যে, যে লোক ঈমান ধারণ করে সে অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মমতাময় হবে, কল্যাণকর কথা বলবে, খারাপ কথা থেকে চুপ থাকবে, উপকারী কাজ করবে, ক্ষতিকর কাজ পরিত্যাগ করবে।[২১৩]

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾—'মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে'[২১৪] এ আয়াতের তাফসিরে সদালাপ বা সুন্দর কথাবার্তার সারমর্ম তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় আদব ও শিষ্টাচারকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশেষজ্ঞগণ বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা হয় দ্বীনি বিষয়ে হবে, নতুবা দুনিয়াবি বিষয়ে হবে। দ্বীনি বিষয়ে কথাবার্তা হলে সেটা হয়তো ঈমানের প্রতি দাওয়াত হবে এবং তা হবে অমুসলিমদের সঙ্গে; অথবা আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলাম মানার প্রতি দাওয়াত হবে এবং তা হবে ফাসেকদের (পাপাচারীদের) সঙ্গে।

- ঈমানের প্রতি দাওয়াত হলে সেটা অবশ্যই নরম ও সুন্দর কথাবার্তার সঙ্গে হতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা মুসা ও হারুন আ.-কে নির্দেশ দিয়েছেন,

  ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾

  তোমরা তার সঙ্গে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।[২১৫]

আল্লাহ তাআলা তাদের দুইজনকে তাদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং ফেরাউনের চূড়ান্ত কুফরি, ঔদ্ধত্য ও খোদাদ্রোহিতা সত্ত্বেও তার সঙ্গে নম্র-কোমল ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

﴿وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

---

২১৩. ইবনে হাজার, *ফাতহুল বারি*, খ. ১০, পৃ. ৪৪৬।
২১৪. সুরা বাকারা : আয়াত ৮৩।
২১৫. সুরা তহা : আয়াত ৪৪।

যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।[২১৬]

- ফাসেক ও পাপাচারীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুন্দর কথাবার্তা বিবেচ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করেন হিকমত[২১৭] ও সদুপদেশের দ্বারা।[২১৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

মন্দ প্রতিহত করুন উৎকৃষ্টের দ্বারা, ফলে আপনার সঙ্গে যার শক্রতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।[২১৯]

দুনিয়াবি বিষয়ে কথাবার্তা হলে এটা অবশ্যই জানা কথা যে, কোমল ভাষা ও নম্র ব্যবহারের দ্বারা যদি কোনো উদ্দেশ্য বা কাজ হাসিল করা যায় তাহলে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন সংগত ও সুন্দর নয়।

তাহলে প্রমাণিত হলো যে, দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় আদব ও শিষ্টাচার আল্লাহ তাআলার এই বাণী, ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾–'মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে'[২২০]-এর অন্তর্ভুক্ত।[২২১]

এসব শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতিটি মুসলিমকে মুচকি হাসি, চেহারার উজ্জ্বলতা ও উত্তম কথাবার্তা সব ক্ষেত্রেই সুন্দর হতে হবে।

---

২১৬. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯।
২১৭. যাবতীয় বিষয়কে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।-অনুবাদক
২১৮. সুরা নাহল : আয়াত ১২৫।
২১৯. সুরা ফুসসিলাত : আয়াত ৩৪।
২২০. সুরা বাকারা : আয়াত ৮৩।
২২১. ফখরুদ্দিন রাযি, *আত-তাফসিরুল কাবির*, খ. ৩, পৃ. ৫৬৮।
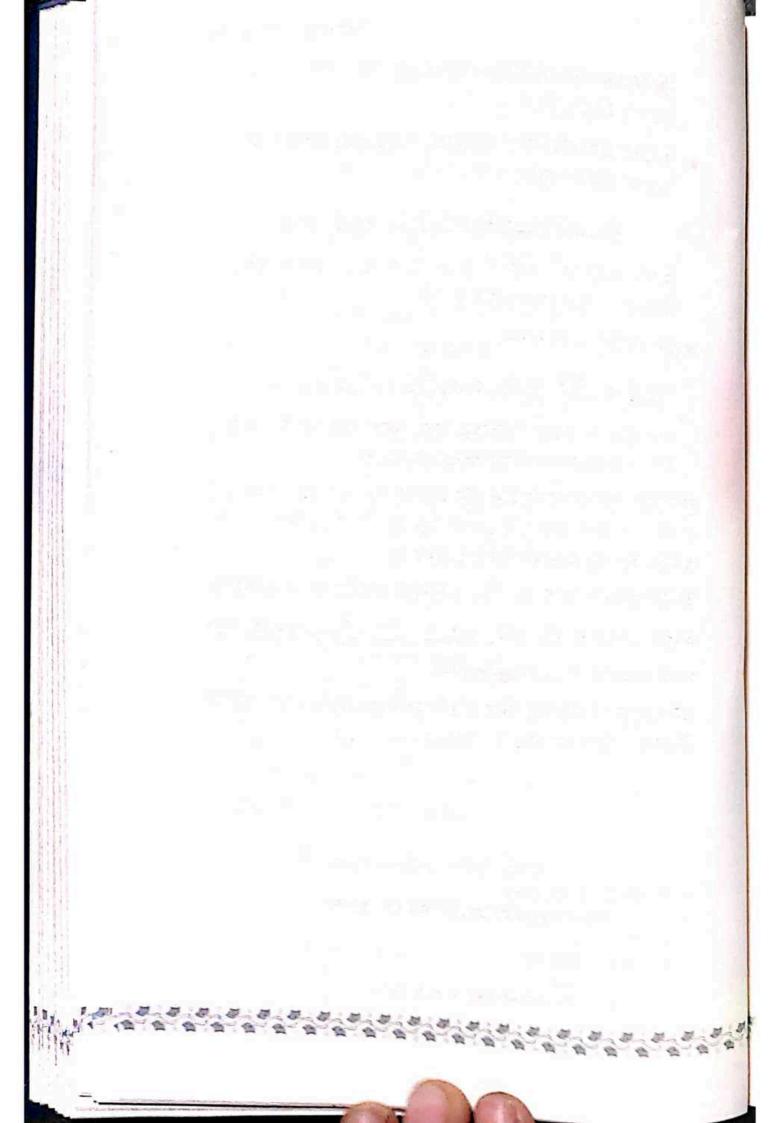
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

স্বচ্ছ মন ও মানবপ্রেম

মুচকি হাসি, চেহারার খোশভাব ও কোমল কথাবার্তার নির্দেশনাদানের ক্ষেত্রে ইসলাম একটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। তা এই যে, এসব কাজ হতে হবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে; লৌকিকতা, অভিনয়, ভণিতা বা কপটতাবশত নয়।

এখানেই অন্যান্য সবকিছু থেকে ইসলাম ও তার শিক্ষা ব্যতিক্রম। কারণ তা কোনো লাভজনক সংস্থা বা কোম্পানি নয় যে, বেশি বেশি ক্লায়েন্ট (খরিদ্দার) পাওয়ার চেষ্টায় এসব করে। ইসলাম বরং মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন যে, যার মন পরিষ্কার, অন্তর স্বচ্ছ সে শ্রেষ্ঠ মানুষ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে নিম্নরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

«قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ. قَالُوْا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ النَّقِيُّ التَّقِيُّ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মানুষ উত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার অন্তর নিষ্কলুষ এবং যে সত্যভাষী। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো 'সত্যভাষী' বুঝি, কিন্তু 'নিষ্কলুষ অন্তর' কী? তিনি বললেন, নির্মল ও পবিত্র অন্তঃকরণ, যা পাপ করেনি, জুলুম করেনি ও যা হিংসা-বিদ্বেষ হতে মুক্ত।[২২২]

---

২২২. *ইবনে মাজাহ*, কিতাব আয-যুহ্দ, বাব : আল-ওয়ারা ওয়াত-তাকওয়া, হাদিস নং ৪২১৬।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন, তবে তাকে নয় যার অন্তরে তার ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রয়েছে। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন,

«تُفْتَحُ أَبْوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ ويَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بينه وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا! أَنْظِرُوا هٰذَينِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»

প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোনোকিছু শরিক করে না। কিন্তু এমন ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হয়, এই দুজনকে আপস করার অবকাশ দাও, এই দুজনকে আপস করার অবকাশ দাও।[২২৩]

এমনকি যাদের মন স্বচ্ছ, অন্তর পবিত্র তারাই সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْـجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْـمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْـحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا»

জান্নাতে প্রথম যে দল প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না এবং পায়খানা করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে সোনার, তাদের চিরুনি হবে সোনা ও রুপার, তাদের ধূপদানিতে থাকবে

---

২২৩ *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : আন-নাহয়ু আনিশ শাহনা ওয়াত-তাহাজুর, হাদিস নং ২৫৬৫।

সুগন্ধ কাঠ। তাদের গায়ের ঘাম হবে মিশকের মতো সুবাসিত। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দুজন স্ত্রী, সৌন্দর্যের ফলে গোশতের পেছনে তাদের পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ থাকবে না, কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের হৃদয় হবে একটিমাত্র হৃদয়। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করবে।[২২৪]

মানুষের প্রতি কুধারণা থেকে মনকে পবিত্র রাখতে হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন,

«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا»

তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা অপরের গোয়েন্দাগিরি করো না, কারও পেছনে লেগো না এবং পরস্পর শত্রুতা পোষণ করো না। তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে থেকো।[২২৫]

সৃষ্টিজগতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার যে ফিতরাত তা এই যে, তিনি সবকিছু সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করেছেন। সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো মনের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা।

﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

এটাই আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সুষম।[২২৬]

এ কারণেই মনের মধ্যে যদি হিংসা-বিদ্বেষ-কলুষতা থাকে তাহলে তা মনকে ক্লান্ত করে দেয়।

---

[২২৪]. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খালকি, বাব : সিফাতুল জান্নাতি ওয়া আন্নাহা মাখলুকাহ, হাদিস নং ৩০৭৩; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জান্নাতু ওয়া সিফাতু নাইমিহা ও আহলিহা, বাব : আওয়ালু যুমরাতিন তাদখুলুল জান্নাতা আলা সুরাতিল কামার লাইলাতাল বাদ্‌র..., হাদিস নং ২৮৩৪।

[২২৫]. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মা ইয়ুনহা আনিত-তাহাসুদি ওয়াত-তাদাবুর, হাদিস নং ৫৭১৭; *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমুয যান্ন ওয়াত-তাজাসসুস ওয়াত-তানাফুস ওয়াত-তানাজুশ ওয়া নাহবিহা, হাদিস নং ২৫৬৩।

[২২৬]. সুরা নামল : আয়াত ৮৮।

ইমাম ইবনে হাযম রহ. এ ব্যাপারটিই পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি অধিকাংশ মানুষকে দেখেছি–তবে আল্লাহ যাদের রক্ষা করেন তাদের কথা ভিন্ন এবং তাদের সংখ্যা খুব কম–দুনিয়াতে তারা নিজেদের জন্য অনিষ্ট, দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তি ত্বরান্বিত করে এবং এমন বড় বড় পাপ করে, যার ফলে আখেরাতে জাহান্নামের আগুন আবশ্যক হয়ে পড়ে, অথচ এগুলোর দ্বারা তারা মূলত কোনো উপকারই লাভ করতে পারে না। তাদের নিয়ত ও মনোবাসনা অত্যন্ত খারাপ; মানুষের জন্য তারা ধ্বংসাত্মক মূল্যবৃদ্ধি[২২৭] কামনা করে, এমনকি ছোটদের জন্যও, যাদের কোনো অপরাধ নেই তাদের জন্যও; তারা যাদের অপছন্দ করে তাদের জন্য কামনা করে ভয়াবহ বিপদ। অথচ তারা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, তাদের কুৎসিত মনোবাসনা তারা যা চাচ্ছে তার কিছুই এনে দেবে না অথবা তার 'ঘটা' অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে না। যদি তারা তাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ করত, তাদের মনোবাসনা হতো চমৎকার, তাহলে তারা মনে শান্তি পেত, অন্তরে স্বস্তি আসত। এর ফলে তারা ভালো ভালো কাজ করারও সুযোগ পেত। সৎকাজের জন্য উত্তম প্রতিদানও পরকালের জন্য তুলে রাখতে পারত। যদিও তা তাদের কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয়ে পিছিয়ে দিত না এবং তার 'ঘটা'-কে বাধাগ্রস্ত করত না। এই যে অবস্থার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে তার চেয়ে বড় ক্ষতি ও লোকসান আর কী হতে পারে এবং যার প্রতি আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে তার চেয়ে বড় কল্যাণ ও সৌভাগ্য কী হতে পারে![২২৮]

মনের স্বচ্ছতার চেয়েও মহৎ ব্যাপার হলো... মানুষের প্রতি ভালোবাসা বা মানবপ্রেম। তা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার স্থান ছিল হৃদয়ের স্বচ্ছতারও উপরে। তাঁর অলংকারপূর্ণ ভাষায় এই ভালোবাসার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে; তিনি নিজের ও তাঁর দাওয়াতের প্রেক্ষিতে মানুষের অবস্থান তুলে ধরেছেন চমকপ্রদ ভাষায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২২৭. জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে দুর্ভিক্ষে মরুক!-অনুবাদক

২২৮. ইবনে হাযম, *রাসায়িলু ইবনে হাযম*, খ. ১, পৃ. ৩৪১-৩৪২।

«إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا»

আমার ও লোকদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালাল, ফলে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল, তখন পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে পড়ে সেগুলো তাতে পড়তে লাগল। ওই লোক তখন পতঙ্গ ও প্রাণীদের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য টানতে লাগল। কিন্তু সেগুলো লোকটিকে পরাজিত করে দিয়ে আগুনে পুড়ে মরল। আমি তোমাদের কোমরে ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি, অথচ তারা তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে।[২২৯]

হৃদয়ে প্রভাব-সঞ্চারী এক চিত্র! যেন তা এক যুদ্ধ... এই যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে প্রতিহত করছেন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে; কিন্তু তারা তাঁকে পরাস্ত করে, তাঁকে ডিঙিয়ে গিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এটা কেবল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া নয়, কেবল দায়িত্বপালন নয়, কেবল কল্যাণকামনা নয়... এটা যুদ্ধ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন, মানুষের কোমর ধরে রেখেছেন, কিছু মানুষ তাঁকে পরাস্ত করে আগুনে পতিত হচ্ছে।

ইমাম বুখারি নিম্নবর্ণিত হাদিস বর্ণনা করেছেন,

«أنه كانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: "الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»

---

[২২৯]. *বুখারি*, কিতাব : আর-রিকাক, বাব : আল-ইনতিহা আনিল-মাআসি, হাদিস নং ৬১১৮; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ফাদায়িল, বাব : শাফকাতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলা উম্মাতিহি ওয়া মুবালাগাতুহু ফি তাহযিরিহিম মিম্মা ইয়াদুররুহুম, হাদিস নং ২২৮৪।

এক ইহুদি বালক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করত। সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখার জন্য এলেন। তিনি বালকটির শিয়রে বসলেন এবং বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। বালকটি তার বাবার দিকে তাকাল, সে কাছেই ছিল। বাবা বলল, আবুল কাসিম যা বলছেন তা শোনো। ফলে বালকটি ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এলেন এ কথা বলতে বলতে যে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।[২৩০]

কত মহান এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!!

ওহুদের যুদ্ধে তিনি আহত হলেন, আহত হয়ে নিজের মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন,

«رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»

হে আমার প্রতিপালক, আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তারা অজ্ঞ।[২৩১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ দিনটিতে যা ঘটেছিল তা এই যে, তিনি মানুষের (কাফেরদের) ওপর তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি মমতাশীল ও দয়াপরায়ণ ছিলেন। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহুদ যুদ্ধের চেয়ে কঠিন দিন কি আপনার জীবনে কখনো এসেছিল? তিনি যা বললেন তা নিম্নরূপ—

«لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ

---

২৩০. *বুখারি*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : ইযা আসলামাস সাবিয়্যু ফামাতা হাল ইয়ুসাল্লা আলাইহি ওয়া হাল ইয়ুরাদু আলাস-সাবিয়্যিল ইসলাম, হাদিস নং ১২৯০।

২৩১. *বুখারি*, কিতাব : ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দিন ওয়াল-মুআনিদিন ওয়া কিতালুহুম, বাব : ইযা আররাদায যিম্মিয়্যু বি-সাব্বিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া লাম ইয়ুসাররিহ, হাদিস নং ৬৫৩০; *মুসলিম*, আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : গাযওয়াতু উহুদ, হাদিস নং ১৭৯২।

الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: ذٰلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

আমি তোমার কওম থেকে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা তো হয়েছিই। তাদের থেকে সবচেয়ে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছি আকাবার দিন, যখন আমি নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কালালের কাছে পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম সে ব্যাপারে সে আমাকে সাড়া দেয়নি। ফলে বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম, কারনুস সাআলিব পর্যন্ত পৌঁছার আগে আমার দুশ্চিন্তা লাঘব হয়নি। এখানে এসে আমি আমার মাথা উপরের দিকে তুললাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সেদিকে তাকালাম, দেখলাম তার মধ্যে জিবরাইল আ.। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার নিবেদনের প্রেক্ষিতে তারা যে প্রত্যুত্তর দিয়েছে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তা শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের (দায়িত্বে নিযুক্ত) ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। এদের ব্যাপারে আপনার মন যা চায় আপনি এই ফেরেশতাকে নির্দেশ দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি যা চাইবেন তা-ই হবে। আপনি চাইলে আমি এদের ওপর আখশাবাইন চাপিয়ে দেবো। জবাবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি, আল্লাহ তাদের থেকে এমন জাতি তৈরি করবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।[২৩২]

---

২৩২. *বুখারি*, কিতাব : বাদউল খাল্ক, বাব : ইযা কালা আহাদুকুম আমিন ওয়াল-মালায়িকাতু ফিস-সামা ফাওয়াফাকাত ইহদাহুমাল উখরা, হাদিস নং ৩০৫৯; *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মমতা কেবল মানুষের প্রতি নয়, অন্য প্রাণীদের প্রতিও ছিল। যা-কিছুর মধ্যে প্রাণ রয়েছে তার সেবা করাও যে ভালো কাজ তার দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গিয়েছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قالوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: "فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ"»

একদিন এক লোক চলার পথে প্রচণ্ড পিপাসার্ত হলো। একটি কূপ দেখতে পেয়ে সে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। লোকটি উপরে উঠে এসে দেখতে পেল, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসার কারণে ভেজা মাটি চেটে খাচ্ছে। তখন (মনে মনে) লোকটি বলল, এ কুকুরটির তেমনই পিপাসা পেয়েছে যেমনটা আমার পেয়েছিল। সে আবার কূপের মধ্যে নামল এবং তার মোজা ভরতি করে পানি এনে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ লোকটির এই কাজ কবুল করে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রাণিমাত্রের সেবার মধ্যেই সওয়াব রয়েছে।[২৩৩]

এ সকল শিক্ষা ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ইসলাম অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য নির্মাণ করেছে। মানুষের মধ্যে একদলকে করে তুলেছে সহৃদয়, মমতাময়, সজীব-কোমল মৃদু বাতাসের মতো; কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, মানুষের জন্য নয়, বরং গোটা জীবজগতের জন্য।

ওয়াস-সিয়ার, বাব : মা লাকিয়ান নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিন আযাল-মুশরিকিন ওয়াল-মুনাফিকিন, হাদিস নং ১৭৯৫।

২৩৩. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : আল-আবারু আলাত-তুরুকি ইযা লাম ইয়ুতাআযযা বিহা, হাদিস নং ২৩৩৪।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

উত্তম চরিত্র

উত্তম চরিত্র এমন একটি গুণ, মানবজাতি যার অনুসন্ধানে বহু যুগ ব্যয় করেছে; প্রাচীন দার্শনিকদের বিকাশকাল থেকেই উত্তম চরিত্রের পিছু ছুটেছে মানবজাতি এবং তাদের মনে হয়েছে যে তারা এই গুণটির গলায় লাগাম পরিয়ে ফেলতে পেরেছে। তারা লিখেছে পবিত্র নগর (Virtuous City) ও এরকম অন্যান্য কল্পিত জিনিস সম্পর্কে। পরে তাদের মনে হয়েছে যে এগুলো দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। ফলে বর্তমান বিশ্ব এই গুণটির নাম দিয়েছে 'মানবতা'।

পাশ্চাত্য অর্থে 'মানবতা' ইসলামি অভিধানে 'রহমত' বা 'দয়া' বলতে যা বোঝায় তার কাছাকাছি। আর ইসলামে 'দয়া' তার সবদিক নিয়ে উত্তম চরিত্রের একটি অংশমাত্র। কারণ উত্তম চরিত্র কথাটি 'দয়া' থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা সত্যের সমর্থন সবই উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। হারিস মুহাসিবি রহ. বলেছেন, উত্তম চরিত্রের নিদর্শন হলো আল্লাহর ওয়াস্তে কষ্টসহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, ক্রোধ সংবরণ করা, সত্যনিষ্ঠদের সত্যের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা, ক্ষমা করা এবং ভুলপথ এড়িয়ে চলা।[২৩৪]

ইমাম গাযালি রহ. বলেছেন, উত্তম চরিত্র কষ্ট প্রতিহত করা নয়, বরং কষ্ট সহ্য করা।[২৩৫]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের প্রশংসা করেছেন তাঁর উত্তম চরিত্রের কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

নিশ্চয় আপনি মহৎ চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।[২৩৬]

---

২৩৪. হারিস মুহাসিবি, *আদাবুন নুফুস*, পৃ. ১৫৩।
২৩৫. ইমাম গাযালি, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খ. ১, পৃ. ২৬৩।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে উত্তম চরিত্রকে ঈমানের তফাত ও কমবেশির মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন; অর্থাৎ যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো তার ঈমানই পরিপূর্ণ। ইমাম বাযযার আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَكْمَلَ الْـمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَإِنَّ حُسْنَ الْـخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ»

> ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। উত্তম চরিত্রের মর্যাদা নামায ও রোযার মর্যাদার পর্যায়ে পৌঁছে।[২৩৭]

এ কারণেই কিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিরাই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় হবে এবং মজলিসে তাঁর সবচেয়ে কাছে বসবে যাদের চরিত্র উত্তম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا»

> তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র উত্তম তারাই কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে এবং আমার সবচেয়ে কাছে বসবে।[২৩৮]

কিয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় উত্তম চরিত্র সবকিছুর চেয়ে ওজনে ভারী হবে,

«مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْـمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْـخُلُقِ»

---

২৩৬. সুরা কালাম : আয়াত ৪।

২৩৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আদ-দালিলু আলা যিয়াদাতিল ঈমান ওয়া নুকসানিহি, হাদিস নং ৪৬৮২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১১৬২। তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৩৯৬।

২৩৮. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : মাআনিল আখলাক, হাদিস নং ২০১৮; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৪৮২।

কিয়ামতের দিন মিযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী বস্তুটি হবে উত্তম চরিত্র।[২৩৯]

উত্তম চরিত্র মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে,

«أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْـجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْـخُلُقِ، وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ»

আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র—এই দুটি জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে। মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে দুটি জিনিস—জিহ্বা ও লজ্জাস্থান।[২৪০]

বরং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে তাঁর দায়িত্ব কী তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছেন এই হাদিসে,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ»

আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।[২৪১]

যে রিসালাত জীবনেতিহাসের মধ্য দিয়ে তার পথরেখা অঙ্কন করেছে, যে রিসালাতের অধিকারী তার আলো ছড়িয়ে দিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন এবং সেই আলোর চারপাশে মানুষকে সমবেত করেছেন, তা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলিকে শক্তিশালী করতে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, তাদের চোখের সামনে পরিপূর্ণতার দিগন্তকে আলোকিত করে তুলেছে, যাতে তারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির দ্বারা সেদিকে ধাবিত হতে পারে।[২৪২]

চরিত্রের সৌন্দর্য হলো যা জীবনকে নান্দনিকতায় রঙিন করে তোলে এবং যেখানে মানুষের সঙ্গে আচারব্যবহারের ভিত্তি হয় দয়া, সততা ও কল্যাণ। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। এই পথে চলতে গিয়েই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট ও যন্ত্রণা স্বীকার করেছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। চরিত্রের সৌন্দর্য রক্ষার্থেই

---

২৩৯. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বির্‌রু ওয়া আস-সিলাহ, বাব : হুসনুল খুলুক, হাদিস নং ২০০৩।

২৪০. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯০৮৫; বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৪৭১৮।

২৪১. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮৯৩৯; আল-হাকিম, হাদিস নং ৪২২১; বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ২১৩০১।

২৪২. মুহাম্মাদ গাযালি, *খুলুকুল মুসলিম*, পৃ. ৭।

ফরয বিধান ফরয করা হয়েছে এবং সুন্নত বিধানগুলো সুন্নত করা হয়েছে।

যেসব অকাট্য দলিল এই তাৎপর্য ব্যক্ত করেছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾

নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।[২৪৩]

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।[২৪৪]

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যাতে তোমরা খোদাভীতি অবলম্বন করতে পারো।[২৪৫]

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

যে লোক (রোযা রাখা অবস্থায়) মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়েনি, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহ তাআলার কোনো প্রয়োজন নেই।[২৪৬]

﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

---

২৪৩. সুরা আনকাবুত : আয়াত ৪৫।

২৪৪. সুরা তওবা : আয়াত ১০৩।

২৪৫. সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৩।

২৪৬. *বুখারি*, কিতাব : আস-সাওম, বাব : মান লাম ইয়াদা কাওলায যুর ওয়াল-আমালা বিহি ফিস-সাওম, হাদিস নং ১৮০৪; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৩৬২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ৭০৭।

তার জন্য হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহবিবাদ সংগত নয়।[২৪৭]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تؤذي جِيرَانَهَا. قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ»

একবার জনৈক লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, অমুক মহিলা অধিক নামায পড়া, রোযা রাখা ও দান-সদকা করার ব্যাপারে খ্যাতি লাভ করেছে। তবে সে তার মুখের দ্বারা তার প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামি। লোকটি পুনরায় বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, অমুক মহিলা—যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রোযা রাখে, দান-সদকাও কম করে এবং নামাযও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরো বিশেষ। তবে সে তার মুখের দ্বারা আপন প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে জান্নাতি।[২৪৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»

পানাহার ত্যাগ করা প্রকৃত রোযা নয়, প্রকৃত রোযা হলো অনর্থক কাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। কেউ তোমাকে গালি

প্রকৃত রোযার স্বরূপ

---

২৪৭. সুরা বাকারা : ১৭৯।

২৪৮. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৯৬৭৩; *হাকিম*, হাদিস নং ৭৩০৪। তিনি বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। যাহাবি তার সঙ্গে একমত। *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৫৮৫৮।

দিলে বা তোমার সঙ্গে মূর্খের মতো আচরণ করলে, তুমি বলো, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।[২৪৯]

নিচের হাদিসটিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে ও কেন তিনবার কসম খেয়েছেন তা লক্ষ করুন এবং চিন্তা করুন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম, সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা বোধ করে না।[২৫০]

এই হাদিসে এমন ব্যক্তি থেকে ঈমান নাকচ করা হয়নি যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, বরং এমন ব্যক্তি থেকে ঈমান নাকচ করা হয়েছে যার অনিষ্টের ব্যাপারে তার প্রতিবেশী নিরাপত্তা বোধ করে না। এই বক্তব্য মূলত উত্তম চরিত্রগুণ সম্পর্কে, অনিষ্ট সম্পর্কে নয়। কারণ এক প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীকে নিরাপদ মনে করবে কি করবে না তা সাধারণত নৈতিক ও চারিত্রিক একটি ব্যাপার। এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে লোক প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় তাকে উদ্দেশ করেননি, বরং এমন লোককে উদ্দেশ করেছেন যার চরিত্র তার প্রতিবেশীকে নিরাপত্তা বোধ করতে দেয় না, ফলে তারা তার অনিষ্টের ব্যাপারে আশঙ্কা করে।

মানবেতিহাসে এটা অভূতপূর্ব বাঁকবদল, এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো দেখা যায়নি, মানুষের চিন্তায়ও আসেনি। হ্যাঁ, তা হলো আল্লাহর দ্বীন, আসমান থেকে প্রেরিত ওহি।

---

২৪৯. *হাকিম*, হাদিস নং ১৫৭০। তিনি বলেছেন, এই হাদিস ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি বা ইমাম মুসলিম হাদিসটি সংকলন করেননি। বাইহাকি, *আস-সুনানুল-কুবরা*, হাদিস নং ৮০৯৬; *ইবনে খুযাইমা*, হাদিস নং ১৯৯৬।

২৫০. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসমু মান লা ইয়া'মানু জারুহু বাওয়ায়িকুহু, হাদিস নং ৫৬৭০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু তাহরিমি ইযাইল-যার, হাদিস নং ৪৬।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের এক ব্যক্তির চিত্র তুলে ধরেছেন যে নামায পড়ত, দানখয়রাত করত, রোযা রাখত; কিন্তু তার চরিত্র ভালো ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন যে, সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য নয়, বরং জাহান্নামে প্রবেশের জন্য। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ. قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْم الْقِيَامَة بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا. وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا. وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِح فِي النَّار»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি জানো দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের মধ্যে সেই তো দরিদ্র যার টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তিই (সবচেয়ে) দরিদ্র হবে, যে দুনিয়া থেকে নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওইসব লোকও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারও নামে অপবাদ রটিয়েছে, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে, কাউকে প্রহার করেছে। সুতরাং এই হকদারকে তার সওয়াব থেকে হক প্রদান করা হবে, ওই হকদারকে তার সওয়াব থেকে হক প্রদান করা হবে। এভাবে হকদারদের পাওনা পরিশোধ করার আগে যদি তার সওয়াব নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তাদের গুনাহসমূহ ওই ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২৫১]

২৫১. *মুসলিম*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল-আদাব, বাব : তাহরিমুয যুল্ম; হাদিস নং-২৫৮১, *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৪১৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৮০১৬।

না, সে চারিত্রিক গুণ অর্জন করতে পারেনি। শিশুরা কখনো কখনো নামাযের কার্যগুলো অনুশীলন করে, নামাযের কথাগুলো আওড়ায়, অভিনেতারা কখনো কখনো বিনয় প্রকাশে ও গুরুত্বপূর্ণ পালনীয় কাজ করতে সক্ষম হয়; কিন্তু শিশুদের ভাঙাচোরা অনুশীলন এবং অভিনেতার অভিনয়ের বাইরে এসে কিছু কাজ বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে কোনো ভূমিকা রাখে না।[২৫২]

এসব শিক্ষা ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ইসলামি সভ্যতা জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে, জীবনকে নান্দনিকতায় ভরিয়ে তুলেছে। এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীরা বলেছেন, সচ্চরিত্র মানুষ নিজে সুখে ও স্বস্তিতে থাকে, অন্যরাও তার থেকে নিরাপদ থাকে। অসচ্চরিত্র লোকের কারণে মানুষ বিপদে পড়ে এবং সে নিজেও থাকে যন্ত্রণায়-দুর্দশায়।[২৫৩]

---

২৫২. মুহাম্মাদ গাযালি, *খুলুকুল মুসলিম*, পৃ. ১১।
২৫৩. মাওয়ারদি, *আদাবুদ দুনয়া ওয়াদ-দ্বীন*, পৃ. ২৫২।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অনুপম রুচিবোধ

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, রুচিবোধ বলতে বোঝায় স্বচ্ছ-নির্মল অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকে, যার ফলে একজন ব্যক্তি অন্যদের অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি যত্নশীল থাকে। মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণের এটাই হলো আদবকেতা। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটি সুন্দর বিদ্যা।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সুন্দর রুচিবোধের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটে তার কিছু নমুনা তুলে ধরেছি। ইসলামি সভ্যতা এসব রুচিশীলতার প্রবর্তন করেছে। এখন আমরা কিছু শিরোনাম উল্লেখ করব যেগুলো ইসলামি সভ্যতায় চারিত্রিক সৌজন্য ও রুচিবোধের সৌন্দর্য প্রকাশ করে।

অন্যদের অনুভূতিকে আহত না করার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয়:

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে সরাসরি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা থেকে বিরত থাকতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, مَا بَالُ أَقْوَامٍ–'লোকদের কী হলো...।'[২৫৪]

---

২৫৪. ইমাম *বুখারি* হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—
আয়িশা রা. বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাজ করলেন (অর্থাৎ, সফরে রোযা ভাঙলেন) এবং তা করার জন্য অন্যদেরও অনুমতি (রুখসত) দিলেন। তা সত্ত্বেও কিছু লোক রোযা ভাঙা থেকে বিরত থাকল। এই খবর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌছল। ফলে তিনি খুতবা দিলেন, প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন, 'সে-সকল লোকের কী হলো যারা আমি যে কাজ করি তা থেকে বিরত থাকে? আল্লাহর কসম, তাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি জানি এবং তাদের চেয়ে তাঁকে বেশি ভয় করি।' (সুতরাং যে কাজ করতে আমি দ্বিধা করি না সে কাজ করতে সে দ্বিধা করবে কেন?) *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : মান লাম ইয়ুওয়াজিহুন নাসা বিল-ইতাব, হাদিস নং ৬১০১। উদাহরণ হিসেবে আরও দেখা যেতে পারে, *বুখারি*, কিতাব, কিতাব আল-বুয়ু, বাব : ইযা ইশতারাতা শুরুতান ফিল-বাইয়ি লা তাহিল্লু, হাদিস নং ২০৬০; *মুসলিম*, কিতাব : আল-ইত্‌ক, ইন্নামাল ওয়ালাউ লিমান আ'তাকা, হাদিস নং ১৫০৪।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُوْنَ الاخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ»

যখন তোমরা তিনজন একসঙ্গে থাকবে তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে চুপে চুপে কথা বলবে না–অন্য লোকদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত। এটা এ জন্য যে, তা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে।[২৫৫]

বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ এবং মানুষকে যথোপযুক্ত মর্যাদাদানে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

উবাদা ইবনে সামিত রা. বর্ণনা করেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا»

যে লোক আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[২৫৬]

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ»

যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[২৫৭]

---

২৫৫. *বুখারি*, বাব : ইযা কানু আকসারা মিন সালাসাতিন ফালা বা'সা বিল মুসাওয়াতি ওয়াল-মুনাজাতি, হাদিস নং ৫৯৩২; কিতাব : আস-সালাম, বাব : তারহিম মুনাজামুসাররাতি-ইসনাইনি দুনাস-সালিসি বিগাইরি রিদাহু, হাদিস নং ৩৮।

২৫৬. *তিরমিযি*, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ, বাব : রহমাতুস সিবয়ান, হাদিস নং ১৯১৯। তিনি বলেছেন, এটা গরিব হাদিস। *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৯৪৩; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৬৭৩৩; *হাকিম*, হাদিস নং ৪২১।

২৫৭. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : শুকরুল মারুফ, হাদিস নং ৪৮১১; *তিরমিযি*, হাদিস নং ১৯৫৪; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৪৯৫; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৩৪০৭।

কারও বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

বেড়াতে যাওয়া-সংক্রান্ত আয়াতে দুটি শর্ত দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।[২৫৮]

কারও বাড়িতে বা ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রার্থনা ইসলামের রুচিশীলতার একটি দিক। কিন্তু এই আয়াত মানুষের অভ্যন্তরীণ সৌজন্যবোধের কথাও বলছে, সেটা হলো ইসতিনাস বা যাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে তাদের আগ্রহ বোঝার চেষ্টা করা। এটি অনুমতি প্রার্থনার চেয়ে সূক্ষ্ম ব্যাপার। এর অর্থ এই যে, বাড়ির মালিক বা লোকদের আগ্রহ ও অভিপ্রায় কী—মেহমানদের বেড়াতে যাওয়া নাকি না যাওয়া—সেটা অবহিত হওয়া ও অনুধাবন করা। গিয়ে সরাসরি অনুমতি চাওয়ার চেয়ে এতে বেশি সৌজন্যবোধ প্রকাশ পায়।[২৫৯]

অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে আরেকটি রুচিবোধের পরিচয় :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এটা করেছিলেন। একজন আনসারি সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন। দাওয়াতে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে একজন লোক গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ির মালিককে বললেন,

«إِنَّ هٰذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فقال: لا، بل قد أَذِنْتُ لَهُ»

---

২৫৮. সুরা নুর : আয়াত ২৭।

২৫৯. আবু হাইয়ান, *তাফসিরুল বাহরিল মুহিত*, খ. ৬, পৃ. ৪৪৫, ৪৪৬।

এই লোকটাও আমাদের সঙ্গে এসেছে। তুমি তাকে অনুমতি দিতে চাইলে অনুমতি দিতে পারো। আর তুমি যদি চাও সে ফিরে যাক তাহলে সে ফিরে যাবে। মেযবান বললেন, না, আমি তাকে অনুমতি দিলাম।[২৬০]

খাদেম ও পরিচারকদের ডাকার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي. كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلاَمِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي»

তোমাদের কেউ যেন কখনো 'আমার বান্দা', 'আমার বাঁদি' না বলে। কারণ তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের নারীরা সবাই আল্লাহর বাঁদি। বরং তোমাদের বলা উচিত : আমার গোলাম (বেটা), আমার জারিয়া (বেটি), আমার খাদেম, আমার খাদেমা ইত্যাদি।[২৬১]

নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

আসরাম নামের একটি লোক ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী? লোকটি বলল, আমি আসরাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তুমি বরং যুরআহ।[২৬২], [২৬৩]

---

২৬০. *বুখারি*, কিতাব : আল-বুয়ু, বাব : আস-সাহুলাহ ওয়াস-সামাহহি ফিশ-শিরা ওয়াল-বায়.., হাদিস নং ১৯৭৫; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আশরিবাহ, বাব : মা ইয়াফআলুদ-দাইফ ইযা তাবিআহু গাইরু মান দাআহু.., হাদিস নং ২০৩৬।

২৬১. *বুখারি*, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-ইত্‌ক, বাব : কারাহিয়্যাতুত তাতাউল আলার-রাকিক ওয়া কাওলিহি : আবদি ওয়া আমাতি, হাদিস নং ২৪১৪; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আলফায মিনাল আদাব ওয়া গাইরিহা, বাব : হুকমু ইতলাকি লাফযিল-আব্‌দ ওয়াল-আমাত, হাদিস নং ২২৪৯।

২৬২. আসরাম অর্থ কাটা বা কর্তিত। একই ধাতু থেকে সারিম, যার অর্থ কর্তিত ফসল বা যে-ভূমির ফসল কর্তন করা হয়েছে। শব্দটি কুলক্ষণযুক্ত ও হতাশাজনক। আর 'যুরআহ' অর্থ ফসল ও শস্য। এতে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে।-অনুবাদক

২৬৩. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : তাগয়িরুল-ইসমিল কাবিহ, হাদিস নং ৪৯৫৪।

এক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? লোকটি বলল, 'হায্ন'। তিনি বললেন, তোমার নাম সাহ্ল।[২৬৪], [২৬৫]

স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

এই প্রসঙ্গে কিছু কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাহ্যিক রুচিবোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি। এখানে আমরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রা. থেকে উম্মে যারআ-এর গল্প শোনার পর তার সঙ্গে কেমন সৌজন্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তা উল্লেখ করব। উম্মে যারআ-এর গল্প নামে একটি প্রসিদ্ধ গল্প আছে। গল্পটি অনেক লম্বা। নবীজি মনোযোগ দিয়ে তা শুনলেন কিন্তু বিরক্ত হলেন না। অথচ তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের নেতা, তাঁর মাথায় বিভিন্ন চিন্তা ও সমস্যা ঘুরপাক খায়। গল্প শোনা শেষে তিনি এমন মন্তব্য করলেন যা শুনতে আয়িশা রা. ভালোবাসেন। তা ছাড়া এমন মন্তব্য ছিল সর্বোচ্চ রুচিবোধের প্রকাশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«يَا عَائِشَةُ، كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ، إِلا أَنَّ أَبَا زَرْعٍ طَلَّقَ، وَأَنَا لا أُطَلِّقُ»

হে আয়িশা, আমি তোমার জন্য তেমনই যেমন ছিলেন উম্মে যারআর জন্য আবু যারআ। তবে আবু যারআ উম্মে যারআকে তালাক দিয়েছিল, আমি তোমাকে তালাক দেবো না।[২৬৬]

মুশকিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর রুচিবোধের পরিচয় :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার পক্ষ থেকে খাদ্যভরতি একটি পাত্র এলো। আয়িশা রা. সেই পাত্র উলটে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেললেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী আয়িশার সঙ্গে কেমন প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করেছিলেন তা

---

২৬৪. হায্ন অর্থ: কঠোর, শক্ত; সাহ্ল অর্থ: কোমলতা, নম্রতা।-অনুবাদক

২৬৫. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসমুল হায্ন, হাদিস নং ৫৮৩৬; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৯৫৬; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৭২৩।

২৬৬. *বুখারি*: কিতাব; আন নিকাহ, বাব; হুসনুল মুআশারাতি মাআল আহলি, হাদিস নং ৪৮৯৩। *মুসলিম*: কিতাব; ফাদায়িলুস সাহাবা, বাব; যিকরু হাদিসি উম্মে যারআ, হাদিস নং ২৪৪৮।

এখানে উল্লেখযোগ্য। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ. ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ»

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোনো স্ত্রীর ঘরে ছিলেন। এ সময় উম্মুল মুমিনিনদের অপর একজন বড় পাত্রে করে খাবার পাঠালেন। (এতে রাগ করে) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ঘরে ছিলেন তিনি খাদেমের হাতে আঘাত করলেন, ফলে পাত্রটি পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রের টুকরোগুলো একত্র করলেন, তারপর তাতে যে খাদ্য ছিল তা জমা করতে লাগলেন এবং বললেন, তোমাদের মা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। খাদেমকে তিনি আটকে রাখলেন, যতক্ষণ না তিনি যার ঘরে ছিলেন তার থেকে একটি আস্ত পাত্র আনা হলো। তিনি আস্ত পাত্রটি তাকে দিলেন যার পাত্র ভাঙা হয়েছিল এবং ভাঙাটি তার ঘরে রেখে দিলেন যিনি তা ভেঙেছিলেন।[২৬৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদেমের সামনে তাঁর স্ত্রী আয়িশা রা.-কে ধমক দিলেন না, কোনো কড়া কথা বলে তার ব্যক্তিত্ববোধকে আহত করলেন না; বরং 'তোমাদের মা ঈর্ষান্বিত

২৬৭. *বুখারি*, কিতাব : আন-নিকাহ, বাব : আল-গাইরাহ, হাদিস নং ৪৯২৭; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৫৬৭; *নাসায়ি*, হাদিস নং ৩৯৫৫; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১২০৪৬।

হয়েছেন’[২৬৮] বলে তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করলেন। লক্ষ করুন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দচয়নেও আয়িশা রা.-এর প্রতি মূল্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে; তিনি বলেছেন ‘তোমাদের মা’, অথচ ‘এই মেয়ে তো ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে’ বা ‘আয়িশা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে’ এরকম কিছু বলেননি।

এ ছাড়াও আরও বহু বিষয় রয়েছে যেখানে ইসলামি সভ্যতা সুন্দর রুচিশীলতা ও চারিত্রিক সৌজন্যের প্রবর্তন ঘটিয়েছে। ইসলামের আগে বা পরে কোনো জীবনদর্শনেই এসব ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিল না। ইসলামি সভ্যতার মানবিকতা, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বেরই পরিচায়ক এসব বিষয়।

---

২৬৮. একটি আরবীয় বাগধারা। এ কথা বলে স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা-সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়।-অনুবাদক
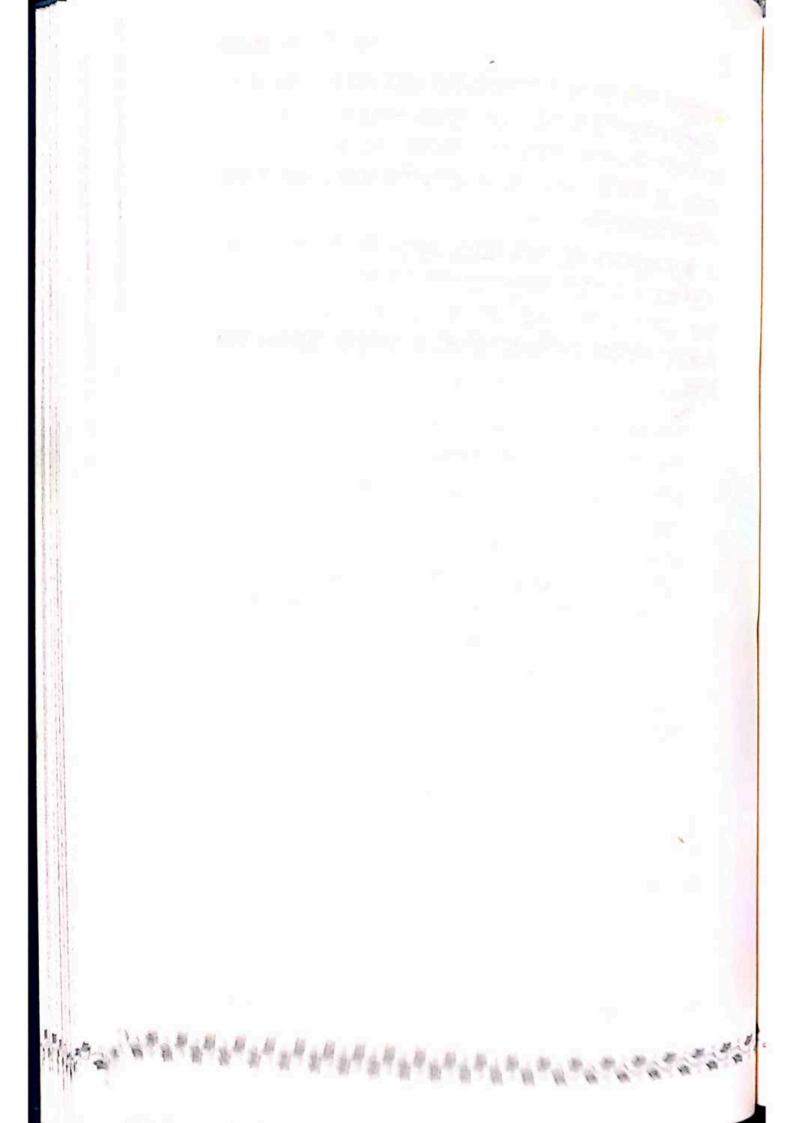
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাম, পদবি ও শিরোনামের সৌন্দর্য

মুসলিমদের মনমানস ও গোটা আবেগ-অস্তিত্বে ইসলামের সৌন্দর্যচেতনার ধারণা বদ্ধমূল ছিল। ফলে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সৌন্দর্যের আবিষ্কার ঘটে, পাশাপাশি বিদ্যমান নানান সৌন্দর্যে তাদের সংযোজনের মাধ্যমে সেগুলোর পূর্ণতা লাভ হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের কিছু অবদান মানবসভ্যতাকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের আরও চমৎকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের এই সৌন্দর্যচেতনা মানবজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। মোটকথা, ইসলামি সভ্যতায় এমন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়, নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যচেতনার মাধ্যমেই কেবল যেগুলোর ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

নিম্নবর্ণিত দুটি অনুচ্ছেদে আমরা উপর্যুক্ত বিষয়টি উপস্থাপন করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : নাম ও উপাধির সৌন্দর্য

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরোনামের নান্দনিকতা

প্রথম অনুচ্ছেদ

নাম ও উপাধির সৌন্দর্য[২৬৯]

যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল তাদের নামের সৌন্দর্যের ব্যাপারেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আগ্রহী ও উদ্গ্রীব ছিলেন। বিশুদ্ধ অনেক বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, কারও নাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সমস্যার কারণে পছন্দনীয় না হলে তিনি তা পালটে আরও ভালো নাম রাখতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ : أَنْتِ جَمِيلَةُ»

> নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আসিয়া' (অবাধ্য) (নামক এক নারীর) নাম পরিবর্তন করে বলেন, তোমার নাম জামিলা (সৌন্দর্যের অধিকারী)।[২৭০]

তিনি যাহম ইবনে মাবাদ সাদুসির যাহম (চাপ) নাম পরিবর্তন করে তার নতুন নাম রাখেন বাশির (সুসংবাদদাতা)।[২৭১]

আলি রা. প্রথমে তার পুত্র হাসানের নাম রাখেন হারব (যুদ্ধ), নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নাম পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন হাসান (উত্তম, সুদর্শন)। এরপর আলি রা. তার পুত্র হুসাইনের জন্মের

---

২৬৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আবু ইয়ালা বাইদাবি রচিত *হুসনুল মামুল বি-যিকরি মান গাইয়ারা আসমাআহুমুর রাসুল* গ্রন্থটি অধ্যয়নের পরামর্শ দেবো।

২৭০. *মুসলিম*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ইসতিহবাবু তাগয়িরিল ইসমিল কাবিহ ইলাল হাসান..., হাদিস নং : ২১৩৯; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৪৯৫২; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৮৩৮; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৪৬৮২।

২৭১. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : আল-মাশয়ু বাইনাল কুবুরি ফিন-নাল, হাদিস নং ৩২৩০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২০৮০৭; *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৭৭৫।

পর তারও নাম রাখেন হারব, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন হুসাইন (উত্তম, সুদর্শন)।[২৭২]

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরাম (কর্তিত) নাম পরিবর্তন করে রাখেন যুরআ (ফসল ও শস্য)। আবুল হাকাম (মহাবিচারক, যা আল্লাহর একটি নাম) নাম পরিবর্তন করে রাখেন আবু শুরাইহ (শুরাইহের পিতা; শুরাইহ ছিল সেই ব্যক্তির বড় ছেলের নাম)। তদ্রূপ আস (অবাধ্য), আযিয (মহাপরাক্রমশালী), আতালাহ (কঠোর), শয়তান (কল্যাণ বঞ্চিত; ইবলিসের নাম), আল-হাকাম (মহাবিচারক), গুরাব (কাক), হুবাব (সাপ) নামগুলোও পরিবর্তন করে ভিন্ন নাম রাখেন। শিহাব (উল্কা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) নাম পরিবর্তন করে রাখেন হিশাম (বদান্যতা)। হারব (যুদ্ধ) নাম পরিবর্তন করে রাখেন সালাম (শান্তি)। মুদতাজি (শায়িত) নাম পালটে রাখেন মুনবায়িস (উত্থিত)।

আফিরা (অনুর্বর ভূমি) নামক স্থানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন খাদিরা (সবুজ-শ্যামল ভূমি)। শিবুদ দলালাহ (বিভ্রান্তকারী গিরিপথ) নাম পরিবর্তন করে রাখেন শিবুল হুদা (পথপ্রদর্শনময় গিরিপথ)। বনু যিনয়াহ (জিনার বংশধর) গোত্রের নাম পালটে রাখেন বনু রিশদাহ (বৈধ বংশধর)। বনু মুগবিয়াহ (বিভ্রান্তকারীর বংশধর) গোত্রের নাম পরিবর্তন করে রাখেন বনু রিশদাহ (পথপ্রাপ্তের বংশধর)।[২৭৩]

ইমাম বুখারি রহ. সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (সাইদের) দাদা হাযন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? সে বলল, হাযন (কঠোর)। তিনি বললেন, না, তোমার নাম সাহল (কোমল), কিন্তু সে বলল, আমার বাবা আমার যে নাম রেখেছেন সেটা আমি পালটাব না। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রা. বলেন, এরপর থেকে আমাদের মধ্যে কঠোরতাভাব থেকেই যায়।[২৭৪]

---

[২৭২]. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ৭৬৯; *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮২৩; *বাইহাকি*, হাদিস নং ১১৭০৬; *ইবনে হিব্বান*, হাদিস নং ৬৯৫৮।

[২৭৩]. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মাআদ*, খ. ২, পৃ. ৩৩৪।

[২৭৪]. বুখারি, কিতাব : আল-আদাব, বাব : তাহউইলুল ইসমি ইলা ইসমিন আহসানা মিনহু, হাদিস নং ৫৮৩৬।

নিজে নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে নাম নির্বাচনের ব্যাপারে নির্দেশনাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

«أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، وَأَصْدَقُهَا : حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا : حَرْبٌ وَمُرَّةُ»

আল্লাহ তাআলার কাছে আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও আবদুর রহমান (দয়াবানের বান্দা) অত্যন্ত পছন্দনীয় নাম। (মানুষের নামসমূহের মাঝে) হারিস (অর্জনকারী) ও হাম্মাম (কর্মোদ্যোগী) অত্যন্ত বাস্তবসম্মত নাম এবং হারব (যুদ্ধ) ও মুররাহ (তিক্ত) অত্যন্ত মন্দ নাম।[২৭৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন জায়গার নামও পরিবর্তন করেছেন। যেমন, তিনি যখন হিজরত করেন তখন মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব (তিরস্কার, ভর্ৎসনা), তিনি তা পরিবর্তন করে তাইবাহ (উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) নাম রাখেন।[২৭৬]

যেসব জায়গার নাম মন্দ হতো তিনি সেগুলো অপছন্দ করতেন। সেগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়াও তিনি অপছন্দ করতেন। যেমন, একটি যুদ্ধে যাওয়ার সময় দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রমকালে তিনি পাহাড় দুটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবিগণ বললেন, ফাদিহ (লজ্জাদানকারী) ও মুখযি (অপমানকারী)। ফলে তিনি এ পথ অতিক্রম করলেন না।[২৭৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশনা দিয়েছেন, কেউ তাঁর কাছে দূত পাঠালে যেন এমন কাউকে পাঠায় যার নাম ভালো। তিনি বলেছেন,

«إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا، فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الاسْمِ»

---

২৭৫. *আবু দাউদ*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফি তাগয়িরিল আসমা, হাদিস নং ৪৯৫০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৯০৫৪; *আদাবুল মুফরাদ*, হাদিস নং ৮১৪।

২৭৬. *বুখারি*, কিতাব : আত-তাফসির, হাদিস নং ৪৩১৩; *মুসলিম*, কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : আল-মাদিনাতু তানফি শিরারাহা, হাদিস নং ১৩৮৫।

২৭৭. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মাআদ*, খ. ২, পৃ. ৩৩৪।

যখন তোমরা আমার কাছে কোনো বার্তাবাহক পাঠাবে, এমন কাউকে পাঠাবে যার চেহারা-সুরত ভালো, নাম সুন্দর।[২৭৮]

ইসলামের ইতিহাসে খলিফা, সুলতান, উজির ও আমিরদের উপাধিগুলো ছিল এমন আঙ্গিকে, যেখানে সৌন্দর্য ও শক্তির সমন্বয় ঘটত। পক্ষান্তরে পূর্বকালে–অর্থাৎ প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর–নৃপতিদের উপাধি ছিল প্রতাপ ও পরাক্রমসর্বস্ব; ভীতি ও আতঙ্ক সঞ্চারই ছিল সেসব উপাধির উদ্দেশ্য। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের উপাধি নিষিদ্ধ করেছে। যেমন হাদিসে এসেছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ»

আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত ঘৃণিত নাম বলে বিবেচিত হবে কোনো ব্যক্তির জন্য নির্বাচিত মালিকুল আমলাক (রাজাধিরাজ) নাম।[২৭৯]

এ কারণেই বিভিন্ন মুসলিম খলিফা ও সুলতান (বিনয়প্রদর্শনপূর্বক) এমনসব উপাধি ধারণ করেছেন যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার নামের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে। অষ্টম আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ (আল্লাহর আশ্রয়প্রাপ্ত) এই ধারার সূচনা করেন। তারপর অন্যরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যেমন : মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (আল্লাহর ওপর ভরসাকারী), মুসতায়িন বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী), মুনতাসির বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যে জয়লাভকারী), মুকতাদির বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যে শক্তিশালী), মুসতানসির বিল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী), মুসতাসিম বিল্লাহ (আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থী), মুসতাদিউ বি-নুরিল্লাহ (আল্লাহর আলোয় আলোকিত), নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ (আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী) ইত্যাদি।

পাশাপাশি উজির, আমির, আলেম ও সেনাপতিদের মধ্যে নিম্নরূপ উপাধি চালু ছিল : নুরুদ্দিন (দ্বীনের আলো), নাজমুদ্দিন (দ্বীনের তারকা),

---

২৭৮. তাবারানি, *আল-আওসাত*, খ. ৭, পৃ. ৩৬৭; ইবনে হাজার আসকালানি, *আল-মাতালিবুল আলিয়া*, খ. ১১, পৃ. ৬৮৫, হাদিস নং ২৬৫৮।

২৭৯. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আবগাদুল আসমা ইলাল্লাহ, হাদিস নং ৫৮৫২; *মুসলিম*, কিতাব : আল-আদাব, বাব : তাহরিমুত তাসাম্মি বি-মালিকিল আমলাক ওয়া মালিকিল মুলুক, হাদিস নং ২১৩৪।

শামসুদ্দিন (দ্বীনের সূর্য), জিয়াউদ্দিন (দ্বীনের আলো), শিহাবুদ্দিন (দ্বীনের অগ্নিশিখা), বদরুদ্দিন (দ্বীনের চাঁদ), সাইফুদ্দিন (দ্বীনের তরবারি), সালাহুদ্দিন (দ্বীনকে যথাযথ স্থানে স্থাপনকারী), কলবুদ্দিন (দ্বীনের হৃদয়), হুসামুদ্দিন (দ্বীনের ধারালো তরবারি), সদরুদ্দিন (দ্বীনের বক্ষ), ফখরুদ্দিন (দ্বীনের গর্ব), ইযযুদ্দিন (দ্বীনের মর্যাদা), রুকনুদ্দিন (দ্বীনের খুঁটি) ইত্যাদি।

মোটকথা, নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার পরিচয় প্রদান ছিল ইসলামি সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি এর মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়, এই সভ্যতা মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও ছোট-বড় সকল বিষয়কেই তার সৌন্দর্যের আচ্ছাদনে ঢেকে নিয়েছিল।
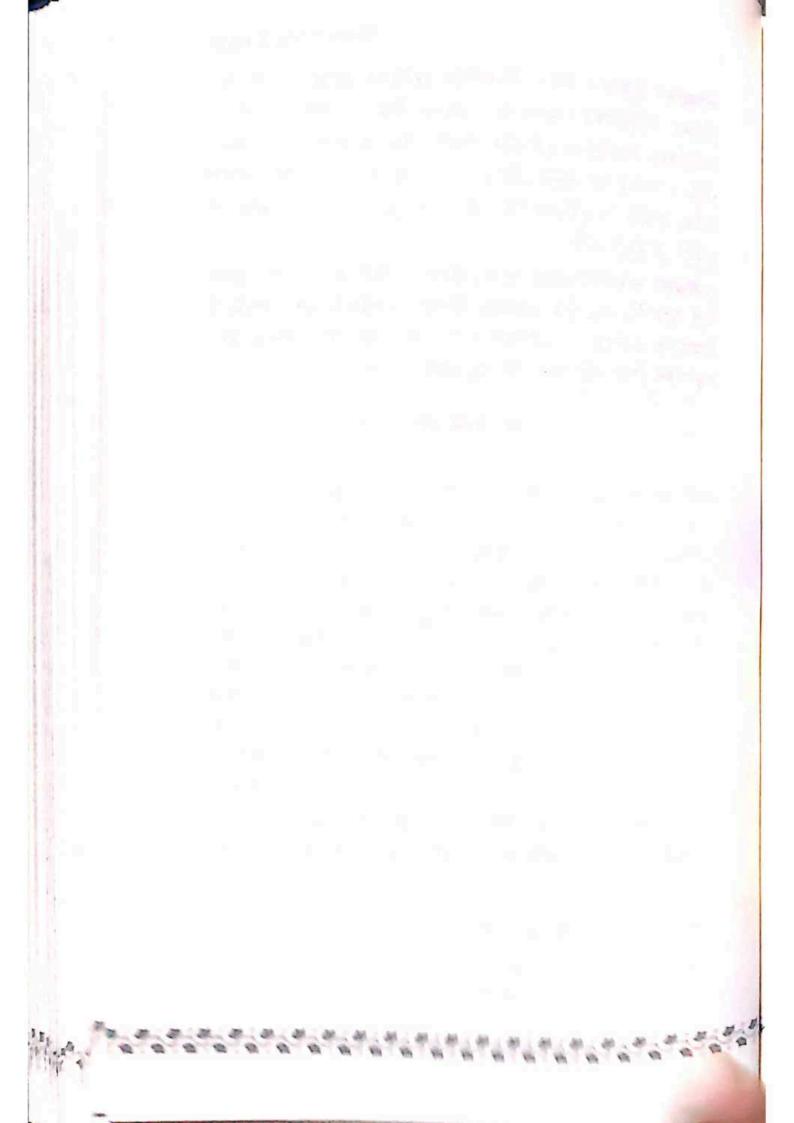
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শিরোনামের নান্দনিকতা

এই দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মানুষ তারাই যারা দ্বীন সম্পর্কে অধিক জানেন, তথা আলেম-উলামা। ফলে আমরা দেখি, ইসলামি সভ্যতার আলেমগণের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি এমন অনন্য অনুভূতি বিদ্যমান ছিল, অন্যান্য সভ্যতার জ্ঞানী লোকেরা যে স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হননি।

মুসলিম আলেম ও মনীষীদের রচিত ফিকহ, সিরাত, হাদিস, আকিদা, জীবনচরিত, স্তরবিন্যাসভিত্তিক জীবনচরিত ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থাবলির মাধ্যমে আমরা মানবেতিহাসের ব্যাপারে অবগত হতে পারছি। বস্তুত এসব গ্রন্থের শিরোনামও সৌন্দর্যের একেকটি টুকরো হয়ে উঠেছে। (মানবসভ্যতার যুগযাত্রায় আগে এমনটি কখনো দেখা যায়নি।)

ইসলামি সভ্যতার আলেম ও মনীষীগণ তাদের রচনাবলির শিরোনামেও নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটানোর প্রতি যত্নবান ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তারা শিরোনামে শব্দ-বাক্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তারা দু-ভাগবিশিষ্ট অন্ত্যমিলযুক্ত শিরোনাম তৈরি করতেন, যেগুলোর একটি অপরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, ফলে উচ্চারণের সময় একটি চমৎকার ধ্বনিসুষমার সৃষ্টি হতো। এমন শিরোনামের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। আমরা এখানে তার কিছু উল্লেখ করব। যেমন :

الصارم المسلول على شاتم الرسول (*আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল*)। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের শিরোনাম। এতে তিনি সে-সমস্ত লোকের বিধান বর্ণনা করেছেন, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়।

ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওযিয়্যাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) গুনাহের প্রকারভেদ ও তার ক্ষতি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার শিরোনাম : الجواب

الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (*আল-জাওয়াবুল কাফি লি-মান সাআলা আনিদ-দাওয়ায়িশ শাফি*)।

আন্দালুসীয় গ্রানাডা শহরের ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিব (মৃ. ৭৭৬ হি.), যার নাম الإحاطة في أخبار غرناطة (*আল-ইহাতাহ ফি আখবারি গারনাতাহ*)।

তার সামসময়িক হাকিমুত তারিখ (ইতিহাস-প্রাজ্ঞ) ইবনে খালদুন (মৃ. ৮০৮ হি.) তার ইতিহাসগ্রন্থের নাম রেখেছেন العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (*আল-ইবার ওয়া-দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি ফি তারিখিল আরাবি ওয়াল-বারবারি ওয়া মান আসারাহুম মিন যাবিশ শানিল আকবার*)।

মিশরীয় ইতিহাসবিদ মাকরিযি (মৃ. ৮৪৫ হি.) কায়রোর স্থাপত্য ও নকশাশৈলী বর্ণনা করে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (*আল-মাওয়ায়িযু ওয়াল-ইতিবার বি-যিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*)।

কালকাশান্দি (মৃ. ৮২১ হি.) রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আইনকানুন সম্পর্কে আলোচনা করে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম مآثر الإنافة في معالم الخلافة (*মাআসিরুল ইনাফাহ ফি মাআলিমিল খিলাফা*)।

হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর মধ্যে আমরা পাই, ইবনে হাজার আসকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.) কর্তৃক রচিত فتح الباري شرح صحيح البخاري (*ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি*) এবং ইমাম নববি (মৃ. ৬৭৬ হি.) কর্তৃক রচিত المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (*আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ*)। আরও পাই শামসুল হক আজিমাবাদি (মৃ. ১৩২৯ হি.) কর্তৃক রচিত عون المعبود شرح سنن أبي داود (*আউনুল মাবুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ*) এবং আবদুর রহমান মুবারকপুরি (মৃ. ১৩৫৩ হি.) কর্তৃক রচিত تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (*তুহফাতুল আহওয়াযি শারহু জামিয়িত তিরমিযি*)।

আকিদা এবং সে বিষয়ক বিতর্ক ও বাদানুবাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা পাই ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসি (মৃ. ৪৫৬ হি.) কর্তৃক রচিত الفصل في الملل والأهواء والنحل (*আল-ফাসলু ফিল-মিলাল ওয়াল-আহওয়ায়ি ওয়ান-নিহাল*), হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালি (মৃ. ৫০৫ হি.) কর্তৃক রচিত الاقتصاد في الاعتقاد (*আল-ইকতিসাদ ফিল-ইতিকাদ*); ইমাম আশআরি (মৃ. ৩২৪ হি.) কর্তৃক রচিত الإبانة عن أصول الديانة (*আল-ইবানাহ আন উসুলিদ দিয়ানাহ*)।

তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঘটে যাওয়া বিরোধ সম্পর্কে পাই ইমাম ইবনে হাজার হাইতামির (মৃ. ৯৭৩ হি.) গ্রন্থ تطهير الجنان واللسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان مع المدح الجلي وإثبات الحق لعلي (*তাতহিরুল জানানি ওয়াল-লিসান আন সালবি মুআবিয়া ইবনি আবি সুফয়ান মাআল মাদহিল জালি ওয়া ইসবাতিল হাক্কি লি-আলি*)।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোর মুসলিম আলেম ও মনীষীগণও তাদের রচিত গ্রন্থাবলিতে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

তাদের রচিত গ্রন্থাবলির শিরোনামে আরও একটি দিক সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে। বস্তুত তারা কেবল সাংগীতিক ধ্বনির ক্ষেত্রেই গুরুত্বারোপ করেননি, বরং সেখানে শব্দের অর্থগত নান্দনিক চিত্রও ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন, তাদের গ্রন্থাবলির জন্য চয়নকৃত শিরোনামের মাঝে রয়েছে সোনা-রুপা, মণি-মুক্তা, তারকা-চাঁদ-সূর্য, সাগর-নদী-নালা, বৃক্ষ-ডালপালা, ফুল-ফল ইত্যাদি নান্দনিক শব্দের ব্যবহার। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এ সমস্ত নান্দনিক শব্দ সেসব গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলোতে নিরেট তাত্ত্বিক আলোচনা ও একাডেমিক কথাবার্তা স্থান পেয়েছে; আর স্বভাবতই এ ধরনের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাঠখোট্টা ও নিরস প্রকৃতির হওয়া। এতৎসত্ত্বেও রচয়িতাদের সেই সৌন্দর্যচেতনা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুগুলোতেও ইসলাম যার প্রকাশ ঘটাতে চায়, তার প্রভাবে এসব কাঠখোট্টা আলোচনার চেহারাতেও সৌন্দর্যের ইসলামি আভিজাত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা এখানে কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করব। যথা :

সোনা ও মণিমুক্তা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে তারিখুত তাবারির পরে সবচেয়ে বড় বিশ্বকোষ হলো মাসউদি (মৃ. ৩৪৬ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ مروج الذهب ومعادن الجوهر (সোনার বাগিচা ও জহরতের খনিরূপী গ্রন্থ)।

ইমাম আবদুর রহমান সাআলিবির (মৃ. ৮৭৫ হি.) তাফসিরগ্রন্থের নাম الجواهر الحسان في تفسير القرآن (কুরআন ব্যাখ্যায় সুদর্শন মাণিক্যের সমারোহ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ইমাম ইবনে আবদুর বার (মৃ. ৪৬৩ হি.) একটি অনন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম الدرر في اختصار المغازي والسير (সংক্ষিপ্তসার যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় মণিমাণিক্যের সমারোহ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

আবদুল কাদির কুরাশি (মৃ. ৭৭৫ হি.) হানাফি মাজহাবের মনীষীদের জীবনচরিতমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية (হানাফি আলেমদের স্তরবিন্যাসমূলক চরিতাভিধানে মণিমাণিক্যের সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

মামলুকি শাসনামল সম্পর্কে ইতিহাস লিখেছেন আবু বকর দাওয়াদারি (মৃ. ৭১৩ হি.)। তার গ্রন্থের শিরোনাম চমৎকার : كنز الدرر وجامع الغرر (মাণিক্যের ভান্ডার ও সমুজ্জ্বল নিদর্শন একীভূতকারী গ্রন্থ)।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি হিজরি অষ্টম শতকের মনীষীদের নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন, যার নাম الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (অষ্টম শতাব্দীর মনীষীদের চরিতাভিধানে সুপ্ত মণি-মুক্তার সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (মৃ. ৯১১ হি.) কুরআনের তাফসির লিখে তার গ্রন্থের নাম দিয়েছেন الدر المنثور في التفسير بالمأثور (বর্ণনামূলক তাফসির রচনায় ছড়ানো-ছিটানো মণি-মুক্তার সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইবনুল ইমাদ হাম্বলি (মৃ. ১০৮৯ হি.) ইতিহাস বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম شذرات الذهب في أخبار من ذهب (বিগতদের চরিত বর্ণনায় টুকরো-টুকরো সোনা একত্রকারী গ্রন্থ)।

ইমাম সুয়ুতির অন্য একটি গ্রন্থের নাম اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (জাল হাদিস রচনায় বানোয়াট মণি-মুক্তার পরিচয় প্রদানকারী গ্রন্থ)।

সামিন হালাবির (মৃ. ৭৫৬ হি.) উলুমুল কুরআন বিষয়ে একটি গ্রন্থের নাম الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (সুরক্ষিত গ্রন্থের আলোচনায় সযত্নে রক্ষিত মোতিমালা প্রকাশকারী গ্রন্থ)।

আলাউদ্দিন মুত্তাকি হিন্দি (মৃ. ৯৭৫ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (সুন্নতের ওপর আমলকারীদের ধনভান্ডার)।

হানাফি মাজহাব বিষয়ে আবুল বারাকাত নাসাফি (মৃ. ৭১০ হি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম كنز الدقائق (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলির ভান্ডার নির্দেশক গ্রন্থ)।

মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি (মৃ. ১৯৬৮ খ্রি.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (শাইখানের[২৮০] গ্রন্থে একাত্মভাবে বর্ণিত হাদিসের উল্লেখে মণি-মুক্তা ও প্রবালের সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

আলোক, আকাশ, তারা-নক্ষত্র ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

কালকাশান্দি সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিশ্বকোষ রচনা করে তার নাম দিয়েছেন صبح الأعشى في صناعة الإنشا ([দাপ্তরিক] রচনাকার্যে ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্নের জন্য প্রভাত সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইবনে তাগরি বারদি (মৃ. ৮৭৪ হি.) ইতিহাস বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (কায়রো ও

---

২৮০. এখানে শাইখান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমাম বুখারি রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.। মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি রচিত গ্রন্থের নামটির মর্ম হচ্ছে, যে-সমস্ত হাদিস উভয় ইমাম নিজেদের গ্রন্থ তথা *বুখারি* ও *মুসলিমে* বর্ণনা করেছেন, সেগুলো চিহ্নিত করে গ্রন্থ রচনা।-সম্পাদক

মিশরের রাজন্যদের চরিত রচনায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমারোহ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

শামসুদ্দিন শিরবিনি (মৃ. ৯৭৭ হি.) কুরআনুল কারিমের যে তাফসির রচনা করেছেন তার নাম السراج المنير (সমুজ্জ্বল প্রদীপ-তুলনীয় গ্রন্থ)।

কুরআনের কেরাত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন আবু হাফস সিরাজুদ্দিন নাশশার (মৃ. ৯৩৮ হি.), যার নাম البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (মুতাওয়াতির দশ কেরাত বর্ণনায় সমুজ্জ্বল চাঁদের সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

শাফিয়ি মাজহাবের ওপর *'আল-ফাতহুল আযিয ফি শারহিল ওয়াজিয'* নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম আবুল কাসিম রাফিয়ি (মৃ. ৬২৩ হি.), এই গ্রন্থে যেসব হাদিস ও আসার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর তাখরিজ (সূত্রনির্দেশ) করতে বড় ধরনের প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হি.)। তিনি তার এই প্রচেষ্টার নির্যাস তথা গ্রন্থের নাম রেখেছেন البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (শরহুল কাবির গ্রন্থে উল্লেখিত হাদিস ও আসারের সূত্রনির্দেশে সমুজ্জ্বল চাঁদের সমাহার সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনি (মৃ. ৪৭৮ হি.) উসুলুল ফিকহ বিষয়ে *'আল-ওয়ারাকাত'* নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন, এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন ইমাম শামসুদ্দিন মারিদিনি (মৃ. ৮৭১ হি.)। তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات (ওয়ারাকাত পুস্তিকার শব্দ বিশ্লেষণে আলোকিত নক্ষত্রমালা একত্রকারী গ্রন্থ)।

ইমাম ইবনুল কাইয়াল (মৃ. ৯২৯ হি.) সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে যাদেরকে অমূলকভাবে 'ইখতিলাতসম্পন্ন' (অর্থাৎ, তারা হাদিস একটির সঙ্গে অপরটি গুলিয়ে ফেলতেন) বলা হয়েছে, তাদের নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম الكواكب النيرات في معرفة من رمي بالاختلاط من الرواة الثقات (সিকাহ বর্ণনাকারীদের মাঝে যাদের ইখতিলাতসম্পন্ন বলা হয়েছে, তাদের পরিচয় প্রদানে জ্যোতির্ময় তারকামালার সমাবেশ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি উসুলুল ফিকহকে কাব্যগ্রন্থ আকারে সংকলন করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع (জামউল জাওয়ামি গ্রন্থের কাব্যবিন্যাসে আলোঝলমল তারকার উদয় সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম সুয়ুতির আরেকটি গ্রন্থের নাম البدور السافرة في أمور الآخرة (আখেরাতের বিষয়াবলি আলোচনায় সুস্পষ্ট চাঁদের সমাবেশ সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম শামসুদ্দিন সাফফারিনি (মৃ. ১১৮৮ হি.) তার আকিদা বিষয়ক গ্রন্থের আকর্ষণীয় এক নাম রেখেছেন, لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (আদ-দুররাতুল মুদিয়্যাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় মনোরমরূপে আলোকদীপ্ত ও আসারি আকিদার দুর্বোধ্য বিষয়াবলি সুস্পষ্টকারী গ্রন্থ)।

সমুদ্র-নদী-নালা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

আমাদের ইসলামি সভ্যতায় ইলম ও জ্ঞানের প্রাচুর্য-গভীরতা বোঝানোর জন্য 'সমুদ্র' শব্দের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। জীবনচরিতের গ্রন্থাবলিতে বহু আলেম ও মনীষী ব্যক্তিকে 'সমুদ্র' বা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। যেমন, 'অমুক ইলমের সমুদ্র' বা 'অমুকের চারপাশ থেকে ইলমের ধারা উৎসারিত হয়'। এ ছাড়াও এ জাতীয় নানান নান্দনিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'ইলমের প্রস্রবণ' বা 'ইলমের ঝরনা' ইত্যাদি। এ ধরনের প্রাকৃতিক উপমার মাধ্যমে মূলত সেসব বস্তুর গভীরতা ও বিস্তৃতির অর্থটি উপমিত ব্যক্তির মাঝে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থেও এমন উপমাময় শিরোনাম ব্যবহার করে গ্রন্থের মূল বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন :

ইমাম ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ হালাবি (মৃ. ৯৫৬ হি.) হানাফি মাজহাব বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার নান্দনিক শিরোনাম দেন : ملتقى الأبحر (সাগরসমূহের মিলনস্থলসদৃশ গ্রন্থ)।

আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ শায়িখ যাদাহ (মৃ. ১০৭৮ হি.) এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন এবং তার নাম দেন مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (মুলতাকাল আবহুর গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নদনদীর সমাবেশসদৃশ গ্রন্থ)।

ইমাম বদরুদ্দিন ইবনে জামাআহ (মৃ. ৭৩৩ হি.) হাদিসশাস্ত্র বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম রাখেন المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي (উলুমুল হাদিসের সংক্ষিপ্তসার প্রচেষ্টায় তৃষ্ণানিবারক ঝরনাসদৃশ গ্রন্থ)।

আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনে তাগরি বারদি তার সমকালীন মনীষীদের জীবনচরিত সংকলন করে তার নাম দিয়েছেন المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي (ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত গ্রন্থের পর [বৈষয়িক] পরিপূর্ণতাদানকারী ও নির্মল ঝরনাতুল্য গ্রন্থ)।

ইমাম যাইনুদ্দিন ইবনে নুজাইম হানাফি (মৃ. ৯৭০ হি.) হানাফি মাজহাব বিষয়ক গ্রন্থ '*কানযুদ দাকায়িক*'-এর ব্যাখ্যা রচনা করে, তার নাম দিয়েছেন البحر الرائق شرح كنز الدقائق (কানযুদ দাকায়িক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় নির্মল সমুদ্রতুল্য গ্রন্থ)।

ইমাম আবু হাইয়ান আন্দালুসি কুরআনের তাফসির রচনা করে তার নাম দিয়েছেন البحر المحيط (মহাসাগর)। এই একই নামে ইমাম বদরুদ্দিন যারকাশিও (মৃ. ৭৯৪ হি.) উসুলুল ফিকহের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

শাইখ শানকিতির (মৃ. ১৩৯৩ হি.) তাফসিরগ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে এই নামে : العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (শাইখ শানকিতির তাফসির-মজলিস থেকে প্রাপ্ত স্বচ্ছ, সুমিষ্ট বিষয়াবলি একীভূতকারী গ্রন্থ)।

ইমাম সমরকন্দির একটি তাফসিরগ্রন্থ রয়েছে এই নামে, بحر العلوم (ইলমের সাগর)।

বাগান, ফুল, ফল ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার

ইমাম ইবনে হিব্বান (মৃ. ৩৫৪ হি.) উপদেশ বিষয়ক ও আল্লাহর প্রতি হৃদয় গলানো-উপযোগী যে গ্রন্থ লিখেছেন তার নাম, روضة العقلاء ونزهة

الفضلاء (জ্ঞানীগুণীদের জন্য বাগিচায় বিচরণ ও প্রমোদভ্রমণের অনুভূতি সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম সুহাইলি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তার নাম, الروض الأنف (অবিচরিত বাগান)।

উপদেশমূলক ইবনুল জাওযির একটি গ্রন্থের নাম, بستان الواعظين ورياض السامعين (উপদেশদানকারী এবং উপদেশ শ্রবণকারীদের জন্য বাগানসদৃশ গ্রন্থ)।

নুরি সাম্রাজ্য ও সালাহি সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন শিহাবুদ্দিন আবু শামাহ (মৃ. ৬৬৫ হি.)। তিনি সেই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন, الروضتين في أخبار الدولتين (দুই সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় দুই বাগিচা সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

ইমাম নববি (মৃ. ৬৭৬ হি.) রচিত একটি গ্রন্থে তিনি ইসলামি আমলসমূহের ফজিলত ও ইসলামি শিষ্টাচারসমূহ একত্র করার চেষ্টা করেছেন। তার এই গ্রন্থের নাম, رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين (নবীসর্দারের বাণী উল্লেখে সৎকর্মপরায়ণদের জন্য বহু বাগিচাসমন্বিত গ্রন্থ)।

এ ছাড়া শাফিয়ি মাজহাব বিষয়ে রচিত তার গ্রন্থের নাম, روضة الطالبين وعمدة المفتين (তালেবে ইলমের জন্য বাগানস্বরূপ এবং ফতোয়া প্রদানকারীদের জন্য খুঁটিতুল্য গ্রন্থ)।

আবু আবদুল্লাহ হিময়ারি (সম্ভাব্য মৃ. ৯০০ হি.) ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ লিখে তার নাম দিয়েছেন, الروض المعطار في خبر الأقطار (অঞ্চলসমূহের ইতিবৃত্ত বর্ণনায় সুবাসিত বাগান সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

আল্লাহর প্রতি মনগলানো উপদেশভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়্যাহ। তার গ্রন্থের নাম, روضة المحبين ونزهة المشتاقين ([আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের] প্রেমিকদের জন্য বাগানস্বরূপ ও [তাঁদের প্রতি] উৎসাহীদের জন্য প্রমোদভ্রমণের অনুভূতি সৃষ্টিকারী গ্রন্থ)।

এরূপ আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম ইবনুল জাযারি (মৃ. ৮৩৩ হি), যার নাম, الزهر الفاتح في من تنزه عن الذنوب والقبائح (গুনাহ ও মন্দাচার থেকে পবিত্রদের জন্য মুকুলিত পুষ্পের ন্যায় গ্রন্থ)।

খিজির আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লিখেছেন হাফিজুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি। গ্রন্থটির নাম, الزهر النضر في أخبار الخضر (খিজিরের বর্ণনায় সজীব পুষ্পতুল্য গ্রন্থ)।

ইমাম সুয়ুতি আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে নিয়ে যে পুস্তিকা রচনা করেছেন তার নাম, الروض الأنيق في فضل الصديق (সিদ্দিকের মর্যাদা বর্ণনায় মনোরম বাগিচা সৃষ্টিকারী পুস্তিকা)।

মরক্কোর মিকনাস শহরের ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন ইবনে গাজি মিকনাসি (মৃ. ৯১৯ হি.)। তিনি তার নাম দিয়েছেন, الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون (মিকনাসা যাইতুনের ইতিহাস রচনায় প্রচুর ফল-ফুলবিশিষ্ট বাগানসদৃশ গ্রন্থ)।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস (মৃ. ৯৩০ হি.) ইতিহাস বিষয়ে যে গ্রন্থ লিখেছেন তার নাম, بدائع الزهور في وقائع الدهور (যুগ-যুগের ঘটনা বর্ণনায় অপূর্ব ফুলমালায় পূর্ণ গ্রন্থ)।

আহমাদ মাক্কারি (মৃ. ৭৫৮ হি.) আন্দালুসের ইতিহাসের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম, نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (আন্দালুসের তাজা ডালপালা থেকে ছড়ানো সুবাসময় গ্রন্থ)।

হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীতে মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে কান্নান (মৃ. ১১৫৩ হি.) খলিফা ও সুলতানদের রীতিনীতি ও আইনকানুনের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম, حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين (খলিফা ও সুলতানদের আইনকানুনের উল্লেখে জেসমিন ফুলে সুশোভিত বহু বাগানতুল্য গ্রন্থ)।

মুহাম্মাদ সিদ্দিক খান কনৌজি (মৃ. ১৩০৭ হি.) কর্তৃক রচিত শিয়া যায়দি মাজহাবের ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থের নাম, الروضة الندية شرح الدرر البهية (দুরারুল বাহিয়্যা গ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাজা বাগানসদৃশ গ্রন্থ)।

উস্তাদ সাইয়িদ কুতুব তাফসিরগ্রন্থ রচনা করে তার নাম রাখেন, فِي ظلال القرآن (কুরআনের ছায়ায়)।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এমনকি শিরোনামে নান্দনিকতা চর্চার এই আধিক্য এ কথা প্রমাণ করে যে, ইসলামি জ্ঞানীগুণী সকলে এ ক্ষেত্রে প্রায় সর্বসম্মত মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। পাশাপাশি এটি জগদ্বাসী সবার মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করে যে, ইসলামি সভ্যতার মনীষীরা সৌন্দর্যচেতনায় ভাস্বর ছিলেন। বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহর সৌন্দর্যচেতনার দীপ্তিই তাদের অন্তরকে এ ক্ষেত্রে আলোকিত করে তুলেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্ডোভা : একটি নান্দনিক ইসলামি শহরের নমুনা

খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কর্ডোভা উন্নতি ও অগ্রগতির দিক দিয়ে ইউরোপের সব শহর থেকে এগিয়ে ছিল। বাস্তবিক অর্থে কর্ডোভা ছিল পৃথিবীর বিস্ময় ও আশ্চর্যের কেন্দ্র। ঠিক সেরূপ, বলকান রাষ্ট্রগুলোর চোখে ভেনিস ছিল যেরূপ। উত্তর দিক থেকে যে-সকল পর্যটক আসতেন তারা সেই শহর (কর্ডোভা) সম্পর্কে এমন কথা শুনতেন, যার দ্বারা তাদের মনে শহরটি সম্পর্কে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগত। যেমন, সেই শহরে রয়েছে সত্তরটি গ্রন্থাগার, নয়শ গণগোসলখানা ইত্যাদি। লিওন, নাভার (Navarre), বার্সেলোনা ইত্যাদি শহরের নৃপতিদের যদি শল্যচিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, দরজি অথবা সংগীতজ্ঞের প্রয়োজন হতো, তবে তারা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য কর্ডোভারই দ্বারস্থ হতেন।[২৮১] একজন ব্রিটিশ গবেষক হিজরি চতুর্থ শতকের (খ্রিষ্টীয় দশম শতক) আন্দালুসীয় কর্ডোভার সভ্যতা ও উন্নতিকে এভাবেই চিত্রায়িত করেছেন। এই গবেষকের নাম জন ব্রান্ডি ট্রেন্ড (John Brande Trend 1887-1958)।

জ্ঞানবিজ্ঞান এবং মূল্যবোধ ও আভিজাত্যের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে যে ইসলামি মানবিক সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল, তারই সুফলে উদিত হয় কর্ডোভা নামক নক্ষত্র। ইতিহাসের সে সময়ে মুসলিমদের সভ্যতা ও ইসলামের গৌরব-মর্যাদা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত হলো কর্ডোভা।

---

২৮১. *The Legacy of Islam*, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত, আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام (১৯৫৪), অনুবাদ ও টীকা সংযোজন : জারজিস ফাতহুল্লাহ, পৃ. ২৭।

অর্থাৎ হিজরি চতুর্থ শতক এবং খ্রিষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি, যখন গোটা ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

কর্ডোভা–বহুদিন যাবৎ এই নামটি বিশেষ এক ধ্বনি ও প্রভাব নিয়ে সকল মুসলমানের কানে বাজত, বরং উত্থান ও মানবসভ্যতার উন্নয়নে বিশ্বাসী প্রতিটি ইউরোপীয় ব্যক্তিও এই নামের ঝংকারে আন্দোলিত হতো। আহমাদ মাক্কারি বলেন, আন্দালুসের কোনো আলেম নিচের পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করেছেন (কবিতাটি বাহরুল বাসিত নামক ছন্দে রচিত),

بِأَرْبَعٍ فَـاقَـتِ الأَمْصَارَ قُرْطُبَـةُ ☆ مِنْهُنَّ قَنْطَرَةُ الْوَادِي وَجَـامِعُهَا

هَـاتَانِ ثِنْتَـانِ وَالزَّهْـرَاءُ ثَـالِثَـةٌ ☆ وَالْعلمُ أَعْظَمُ شَيْءٍ وَهُوَ رَابِعُهَا

চার জিনিসে সর্ব শহরের ওপর কর্ডোভার মহত্ত্ব,
গোয়াদেল কুইভার [২৮২] সেতু ও কর্ডোভা জামে মসজিদ সেথায় অন্যতম;
এ দুই ছাড়িয়ে তৃতীয় স্থানে আছে সুশোভিত ফুলের বাগান,
চারে আসে ইলম ও জ্ঞানবিজ্ঞান, যা কর্ডোভার শ্রেষ্ঠ সোপান।[২৮৩]

নিচের অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা এক সৌন্দর্যখচিত নগরী কর্ডোভা সম্পর্কে জানতে পারব।

---

২৮২. 'গোয়াদেল কুইভার' স্পেনের একটি নদীর নাম। নদীটির আরবি নাম আল-ওয়াদিউল কাবির, বর্তমান উচ্চারণটি তার অপভ্রংশ।-অনুবাদক

২৮৩. মাক্কারি, নাফহুত তিব মিন গুসনি আন্দালুসির রাতিব, খ. ১, পৃ. ১৫৩।

প্রথম অনুচ্ছেদ

এক নজরে কর্ডোভার ভূগোল ও ইতিহাস

কর্ডোভা স্পেনের দক্ষিণ অংশে গোয়াদেল কুইভার নদীর তীরে অবস্থিত। *আল-মাওরিদ আধুনিক বিশ্বকোষ* কর্ডোভার ইতিহাস বর্ণনা করে বলে, যতদূর জানা যায়, কর্ডোভা নগরীর গোড়াপত্তন করেছে কার্থেজীয়রা। পরে তা পর্যায়ক্রমে রোমান ও ভিজিগোথ (Visigoth) শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়।[২৮৪]

এরপর ৯৩ হিজরিতে (৭১১ খ্রিষ্টাব্দে) জগদ্‌বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি তারিক ইবনে যিয়াদ কর্ডোভা জয় করেন। ওই সময় থেকে কর্ডোভা নগরী নতুন পথে যাত্রা শুরু করে এবং সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে থাকে। একটি বৈশ্বিক সভ্য নগরীরূপে কর্ডোভা-নক্ষত্রের আলো দিন দিন উজ্জ্বল হতে থাকে। বিশেষ করে দামেশকে আব্বাসিদের হাতে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর (১৩৮ হিজরিতে/৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) আবদুর রহমান দাখিল[২৮৫] (মৃ. ১৭২ হি.) যখন আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

আন্দালুসে (৩১৬ হিজরিতে খেলাফত ঘোষণার পর) প্রথম উমাইয়া খলিফা আবদুর রহমান নাসির (মৃ. ৩৫০ হি.) এবং তারপর তার পুত্র হাকাম মুসতানসির বিল্লাহর (মৃ. ৩৬৬ হি.) যুগে কর্ডোভা তার উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার শিখরে পৌঁছে। বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বে নতুন মুসলিম খেলাফত শাসনের জন্য কেন্দ্রস্থল হিসেবে আবদুর রহমান কর্তৃক কর্ডোভাকে রাজধানী ঘোষণার কারণে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তিনি এই নগরীকে জ্ঞানবিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি আলোকবর্তিকারূপে গড়ে তোলেন। এমনকি কর্ডোভা নগরী একই মহাদেশে অবস্থিত বাইজান্টাইনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে, প্রাচ্যে

---

২৮৪. *মাওসুআতুল মাওরিদিল হাদিসাহ* (১৯৯৫)।
২৮৫. উপাধি : সাকরে কুরাইশ (কুরাইশের ঈগল)।

আব্বাসি খলিফাদের রাজধানী বাগদাদের সঙ্গে এবং আফ্রিকায় কায়রাওয়ান ও কায়রোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি অর্জন করে। অবশেষে কর্ডোভা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ইউরোপীয়রা একে 'বিশ্বের মধ্যমণি' নামে আখ্যায়িত করে!

বড় বড় বিষয়ের পাশাপাশি উমাইয়া খলিফারা কর্ডোভার সার্বিক জীবনযাত্রার প্রতিও মনোনিবেশ করেছিলেন। যেমন : কৃষি, শিল্প, দুর্গনির্মাণ, অস্ত্রাগার তৈরি ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন খাল খনন এবং নর্দমা তৈরি করেন। আন্দালুসে এমন নানা জাতের গাছ ও ফলের আমদানি করেন, ইতিপূর্বে যেগুলো সেখানে রোপণ করা হতো না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কর্ডোভায় অবস্থিত সভ্যতার নিদর্শন

এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিশেষত কর্ডোভা নগরী এবং ব্যাপকভাবে গোটা আন্দালুসের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সভ্যতা নির্দেশক নানা নিদর্শন সম্পর্কে জানব। বস্তুত মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইসলামের অবদান কী, এর মাধ্যমে আমরা সে ব্যাপারেও কিছুটা আঁচ করতে পারব।

কর্ডোভার সেতু

সেখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ছিল কর্ডোভা-সেতু, যা গোয়াদেল কুইভার নদীর ওপর অবস্থিত। এটি 'জিসর' (সেতু) নামে, তদ্রূপ 'কানতারাতুদ দাহর' (যুগের সেতু) নামেও পরিচিত। সেতুটির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় চারশ মিটার, প্রস্থ চল্লিশ মিটার এবং উচ্চতা ত্রিশ মিটার!

উমর ইবনে মুযাফফার ইবনুল ওয়ারদি (মৃ. ৭৪৯ হি.) এবং শরিফ ইদরিসি (মৃ. ৫৫৯ হি.) কর্ডোভা-সেতুর ব্যাপারে বলেন, এই সেতু তার নির্মাণশৈলী ও মজবুতি—উভয় দিক থেকেই সকল সেতুর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করে।[২৮৬]

এই সেতুর খিলান-সংখ্যা ছিল সতেরোটি, একেকটি খিলান থেকে অপর খিলানের দূরত্ব ছিল বারো মিটার। প্রতিটি খিলানের (এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে) প্রশস্ততা ছিল বারো মিটার এবং (নিজস্ব) প্রস্থ ছিল প্রায় সাত মিটার। নদীর জলসীমা থেকে খিলানগুলোর উচ্চতা ছিল পনেরো মিটার।[২৮৭]

উপর্যুক্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা ছিল এমন একটি সেতুর যা নির্মিত হয়েছিল হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে (১০১ হিজরি)। অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দশ বছর

---

২৮৬. ইবনুল ওয়ারদি, *খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব*, পৃ. ১২; ইদরিসি, *নুযহাতুল মুশতাক*, খ. ২, পৃ. ৫৭৯।

২৮৭. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ৪৮২।

পূর্বে![২৮৮] সেটা ছিল এমন একসময়, যখন মানুষের নিকট ঘোড়া-গাধা-খচ্চর ছাড়া পরিবহনব্যবস্থার আর কোনো মাধ্যম ছিল না। এ ছাড়া নির্মাণকাজের জন্য উন্নতমানের পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি ও উপাদানও ছিল না। ফলে এই কাঠামোতে নির্মিত সেতুটি হয়ে উঠেছিল ইসলামি সভ্যতার এক মহাগৌরবের বিষয়।

কর্ডোভার জামে মসজিদ

আল-জামিউল কাবির মসজিদটিকে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান কর্ডোভার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন ও ঐতিহাসিক চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্প্যানিশ ভাষায় এর নাম মেজকুইটা (Mezquita)। এ শব্দটি মসজিদ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। এই মসজিদ আন্দালুসের সবচেয়ে বিখ্যাত মসজিদ ছিল (বস্তুত এ কারণেই এটি এখন খ্রিষ্টান ক্যাথিড্রালরূপে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে)। পাশাপাশি এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ হওয়ারও গৌরব অর্জন করে। ১৭০ হিজরি মোতাবেক ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটির নির্মাণকাজ শুরু করেন আন্দালুসীয় উমাইয়া শাসক আবদুর রহমান দাখিল এবং নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন তার পুত্র প্রথম হিশাম। পরবর্তীকালে আন্দালুসের সব সুলতান ও খলিফাই আয়তন ও সৌন্দর্যে মসজিদটিকে সমৃদ্ধ করেন। ফলে এটি কর্ডোভার সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে সে সময়ের সবচেয়ে বড় মসজিদও।

আর-রাওযুল মিতার গ্রন্থকার আবু আবদুল্লাহ হিময়ারি (সম্ভাব্য মৃ. ৯০০ হি.) মসজিদটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, কর্ডোভায় ছিল বিখ্যাত জামে মসজিদ। সুপ্রশস্ত আয়তন, মজবুত নির্মাণ, অপূর্ব শৈলী এবং নিখুঁত কাঠামোর দিক থেকে এটি ছিল গোটা দুনিয়ার সর্বোল্লেখযোগ্য মসজিদ। মারওয়ানি খলিফাগণ মসজিদটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তারা বার বার এর আয়তন বৃদ্ধি ও এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে মসজিদটির চূড়ান্ত নিখুঁত রূপ পরিদৃষ্ট হয়। এর দিকে তাকালে চক্ষু বিস্ফারিত হতো, বর্ণনার মাধ্যমে এর সৌন্দর্য প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

---

২৮৮. এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল সামহ ইবনে মালিক খাওলানির হাতে, যিনি উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ.-এর পক্ষ থেকে আন্দালুসের গভর্নর ছিলেন।

কারুকার্য ও নকশায় এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মুসলিমদের কোনো মসজিদই এই মসজিদের সমকক্ষ ছিল না।
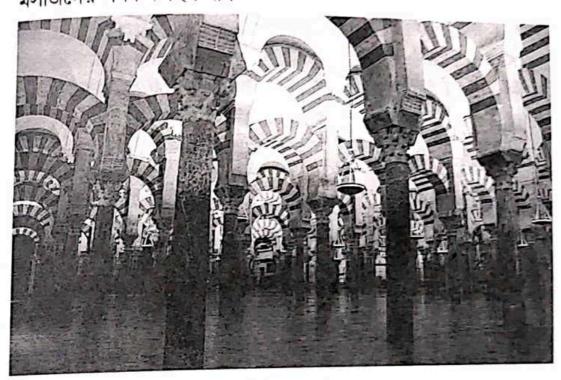
চিত্র নং-৩১
স্তম্ভ, কর্ডোভা জামে মসজিদ

মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ছিল একশ আশি 'বা'[(২৮৯)]। এর অর্ধেক ছিল ছাদযুক্ত অংশ এবং অপর অর্ধেক ছিল ছাদহীন চত্বর। ছাদযুক্ত অংশের খিলান-সংখ্যা ছিল চৌদ্দটি। ভবনসমূহের ছাদযুক্ত অংশের স্তম্ভ, ছোট-বড় গম্বুজগুলোর স্তম্ভ, বড় মিহরাবের ও তার আশপাশের স্তম্ভ—সব মিলিয়ে স্তম্ভের সংখ্যা ছিল এক হাজার। মসজিদটিকে আলোকিত করার জন্য ছিল একশ তেরোটি বাতির ঝাড়। সবচেয়ে বড় ঝাড়টি এক হাজার বাতি ধারণ করতে পারত, সবচেয়ে ছোট ঝাড়টির ধারণক্ষমতা ছিল বারোটি।

মসজিদে যেসব কাঠ ব্যবহৃত হয়েছিল তার সবই ছিল তরতুশা[(২৯০)] পাইন গাছের কাঠ। ঘরের ওপরের বিমগুলোর প্রস্থ ছিল এক বিঘত বাই তিন আঙুল কম এক বিঘত। দৈর্ঘ্যে প্রতিটি বিম ছিল সাঁইত্রিশ বিঘত। প্রতিটি বিমের মাঝে ছিল এক বিমের পুরুত্ব পরিমাণ দূরত্ব। মসজিদের ছাদে ছিল

২৮৯. ১ 'বা' = প্রসারিত দুই বাহুর পরিমাণ।-অনুবাদক
২৯০. তরতুশা (Tortosa) : তৎকালীন আন্দালুসের ও বর্তমানে স্পেনের একটি শহর। এ শহরে জন্মানো গাছের দিকে সম্পৃক্ত করে এই কাঠকে তরতুশি বলা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য ও নকশা, যেগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির কোনো মিল ছিল না। নকশা ও কারুকার্য বসানোর বিন্যাস ছিল যথাযথ। লাল, নীল, সাদা, সবুজ, সুরমা ইত্যাদি নানা রঙের মিশেলে সেগুলো অপরূপ ছিল। মসজিদটির অনন্য শোভা চোখ ধাঁধিয়ে দিত। এর অনুপম নকশা ও এতে বিভিন্ন রঙের শৈল্পিক ব্যবহার চিত্তকে মোহিত করত। ছাদের একেকটি প্রস্তরফলকের প্রশস্ততা ছিল তেত্রিশ বিঘত, এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটির দূরত্ব ছিল পনেরো বিঘত এবং প্রতিটি খুঁটির মাথা ও ভিত্তিমূলটি ছিল মার্বেল পাথরের।

এই জামে মসজিদের যে মিহরাব ছিল তার (সৌন্দর্যের) বর্ণনা দেওয়া কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এর নিখুঁত নকশা ও কারুকার্য মানুষকে হতবুদ্ধি করে দিত। মিহরাবে সোনার পাত ও স্ফটিকের মোজাইক ব্যবহার করা হয়েছিল। এগুলো দা গ্রেট কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট মুসলিম শাসক আবদুর রহমান নাসির লি-দ্বীনিল্লাহকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। মিহরাবের দুইপাশে চারটি স্তম্ভ ছিল। দুটি স্তম্ভ সবুজ রঙের, অপর দুটি যুরযুরি[২৯১] পাখির রংবিশিষ্ট; সম্পদের মাধ্যমে এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মিহরাবের শিরোভাগে ছিল মার্বেল পাথরের ব্লক, পাথরের একটি টুকরোতে সোনা ও নীলকান্তমণির[২৯২] চুমকি এবং নানা ধরনের রং ব্যবহার করে অলংকরণ করা হয়েছিল। মিহরাবটিকে ঘিরে ছিল কাঠের বেষ্টনী, এতে খোদিত ছিল অভূতপূর্ব সব নকশা। মিহরাবের ডান দিকে ছিল মিম্বার, পৃথিবীতে এমন শৈল্পিক রীতিতে নির্মিত মিম্বার আর একটিও নেই। মিম্বারটিতে ব্যবহৃত হয়েছিল আবলুস কাঠ, বক্সকাঠ (boxwood) এবং কয়লাকাঠ। কথিত আছে, মিম্বারটি তৈরি করতে সাত বছর সময় লাগে। জোগালেদের[২৯৩] হিসাব ছাড়াই ছয়জন মিস্ত্রি প্রধানরূপে এর নির্মাণকার্য সম্পন্ন করে!

মিহরাবের উত্তর পাশে ছিল একটি ঘর। সেখানে বিভিন্ন ধরনের আসবাব ও সোনা, রুপা, কীলক দিয়ে নির্মিত পট ছিল। পটগুলোতে রমজানের

---

২৯১. الزُّرْزُور (Starling) হলো প্যাসারিফর্মিস বর্গের পাখি। আকারে চড়ুই থেকে বড়। পালকগুলো সবুজাভ-বেগুনি। অথবা হালকা উজ্জ্বল বেগুনি। অথবা তা কোমল সাদা পাথর। রুসেট বা হলুদও হতে পারে। হতে পারে হালকা ধাতব রঙের।

২৯২. উজ্জ্বল নীল রঙের পাথর; আরবি শব্দ লাজাবর্দ; azurite বা lapis lazuli।-অনুবাদক

২৯৩. জোগালে, যে ব্যক্তি নির্মাণসামগ্রী হাতের কাছে এনে দিয়ে রাজমিস্ত্রিকে সাহায্য করে।-সম্পাদক

সাতাশ তারিখে মোমবাতি জ্বালানো হতো। এই সংরক্ষণাগারে একটি মুসহাফ (কুরআন মাজিদ) ছিল। এটি এত ভারী ছিল যে, তা তুলতে দুজন লোকের প্রয়োজন হতো। এতে উসমান ইবনে আফফান রা.-এর মুসহাফের চারটি পাতাও ছিল, যা তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন। সেখানে তার রক্তের ফোঁটার চিহ্ন ছিল। প্রতিদিন সকালে এ মুসহাফটি বের করা হতো। মসজিদের দায়িত্বশীল লোকদের একটি দল কাজটির তদারকি করত। মুসহাফের জন্য অদ্ভুত সব নকশা খচিত চমৎকার একটি গিলাফ এবং তা রাখার জন্য একটি তেপায়া ছিল। (মুসহাফ বের করার পর) ইমাম সাহেব অর্ধেক হিযব[২৯৪] পড়তেন, তারপর মুসহাফটি যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো।

মিহরাব ও মিম্বারের ডানদিকে একটি দরজা ছিল। মসজিদের দুই দেয়ালের ছাদের নিচে বিদ্যমান এই পথ দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করা যেত। ছাদবিশিষ্ট এই পথের দুই পাশে আটটি দরজা ছিল, চারটি দরজা প্রাসাদ থেকে বন্ধ করা যায় এবং বাকি চারটি দরজা বন্ধ করা যায় মসজিদ থেকে। মসজিদটির বিশটি ফটক ছিল। ফটকের পাল্লাগুলো ছিল পিতল দ্বারা আস্তৃত এবং এগুলোর ওপরে ছিল পিতলের তৈরি তারা। প্রতিটি ফটকে ছিল অত্যন্ত মজুবত দুটি কড়া। ফটকের ওপরের দেয়ালগাত্রে ছিল মসৃণ লাল ইটের তৈরি নানা প্রকারের বুদ্‌বুদ-চিহ্ন। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের নকশা ও কারুকার্যও ছিল।

মসজিদের উত্তর পাশে ছিল দৃষ্টিনন্দন অভূতপূর্ব নির্মাণশৈলীর এক মিনার। অসাধারণ কাঠামোর তুলনাহীন এক সৃষ্টি। গোটা মিনারটির উচ্চতা ছিল একশ হাত (প্রতি হাতের পরিমাণ ছিল তিন বিঘত করে)। যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আজান দিতেন তার উচ্চতা ছিল আশি হাত। আর সেখান থেকে এর চূড়া পর্যন্ত ছিল আরও বিশ হাত। দুটি সিঁড়ি দিয়ে এই মিনারের চূড়ায় ওঠা যেত। পশ্চিম দিক থেকে একটি সিঁড়ি, পূর্ব দিক থেকে আরেকটি সিঁড়ি। মিনারটির নিচ থেকে সিঁড়িগুলো আলাদা, তবে চূড়ায় গিয়ে সিঁড়ি দুটি একত্রে মিলিত হয়েছিল। মিনারটির চূড়া আস্তর করা হয়েছিল কাযযান (ছোট ছোট কোমনীয় পাথর) দিয়ে।

---

২৯৪. কুরআনে রয়েছে ত্রিশ পারা, প্রতি পারা দুই হিযবে বিভক্ত। অর্থাৎ কুরআনে মোট ষাট হিযব রয়েছে।-অনুবাদক

ভূমিসংলগ্ন অংশ থেকে চূড়া পর্যন্ত মিনারটিকে বিভিন্ন রকমের কারুকার্য ও চারুলিপি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

মিনারটির চতুষ্পার্শ্বে ছিল খিলানের দুটি সারি। খিলানগুলো মার্বেল পাথরের বন্ধনীর ওপর গোলাকারে নির্মিত ছিল। (মিনারের ছিল) বন্ধ চার দরজাবিশিষ্ট একটি ঘর। ঘরটিতে প্রতিদিনই দুইজন মুয়াজ্জিন রাত্রিযাপন করতেন। মিনারের চূড়ায় ছিল তিনটি সোনার আপেল, দুটি রুপার আপেল এবং আইরিস ফুলের পাতা। এখানকার সবচেয়ে বড় আপেলটিতে ষাট রিতল পরিমাণ তেল ধরত। ষাটজন লোক প্রতিনিয়ত মসজিদটির খাদেম হিসেবে কাজ করতেন। আর তাদের জন্য ছিলেন একজন তত্ত্বাবধায়ক।[২৯৫]

চিত্র নং-৩২
মেহরাবের সামনে খিলান

---

২৯৫. হিময়ারি, আর-রওযুল মিতার ফি খবারিল আকতার, খ. ১, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭।

এরই কাছাকাছি বর্ণনা দিয়েছেন ইবনুল ওয়ারদি তার *খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব* গ্রন্থে।

মসজিদ চত্বরে প্রচুর পরিমাণে কমলা ও আনার গাছ ছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্ডোভায় আগত মানুষজন ক্ষুধার্ত হলে এসব গাছ থেকে ফল খেতে পারত।

কিন্তু এ কারণে হৃদয়ে বেদনার ঝড় ওঠে এবং দুই চোখ অশ্রুতে প্লাবিত হয় যে, আন্দালুসের পতনের পরপরই মসজিদটি ক্যাথিড্রালে রূপান্তরিত হয় এবং খ্রিষ্টানদের গির্জার অনুষঙ্গ হয়ে যায়—যদিও নামটি অক্ষত থাকে। ইসলামি বৈশিষ্ট্য আড়াল করার জন্য সুউচ্চ মিনারটিকে টাওয়ারের রূপ দেওয়া হয়। তার চূড়ায় টাঙিয়ে দেওয়া হয় গির্জার ঘণ্টা। মসজিদটির মজবুত প্রাচীরগুলোতে এখনো কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণ রয়েছে, যা অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার পরিচায়ক। এটি বর্তমানে গোটা বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান।

কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ডোভা জামে মসজিদের ভূমিকা কেবল ইবাদত-বন্দেগির ওপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তখনকার দিনে এটি ছিল বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম এবং ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ জ্ঞানকেন্দ্র। এই জ্ঞানকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ইউরোপীয় দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী এর জ্ঞানবিস্তার অব্যাহত থাকে।

কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের সব শাখার পঠনপাঠন ছিল। এখানে পাঠদানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মনোনীত করা হতো। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে সমানভাবে বিদ্যার্থীরা এখানে জ্ঞান অর্জন করতে আসত। মুসলিম বিদ্যার্থী যেমন ছিল, তেমনই ছিল অমুসলিম বিদ্যার্থীও। পাঠদান ও জ্ঞানচর্চার আসরগুলো মসজিদের অর্ধেকটারও বেশি দখল করে রাখত। শিক্ষকদের জন্য মোটা অঙ্কের বেতনভাতা ছিল, যেন তারা পাঠদান ও লেখালেখির জন্য আত্মনিবেদন করতে পারেন। ছাত্রদের জন্যও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। গরিবদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হতো।

সে সময়কার পরিবেশে জ্ঞানচর্চার এরকম উন্নত ব্যবস্থা জ্ঞানচর্চামূলক সমাজ গঠনে লক্ষণীয় ভূমিকা রাখে। কর্ডোভা শহর মুসলিমদের জন্য তো

বটেই, গোটা বিশ্বের জন্য সর্ব শাখায় অসংখ্য জ্ঞানীগুণীর জন্ম দেয়। উদাহরণ হিসেবে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যায় : আবুল কাসিম যাহরাবি (৩২৫-৪০৪ হি./৯৩৬-১০১৩ খ্রি.), তিনি ছিলেন খ্যাতিমান শল্যবিদ, চিকিৎসক, ভেষজবিজ্ঞানী ও ওষুধ প্রস্তুতপ্রণালিতে বিশেষজ্ঞ। আরও আছেন (বহুশাস্ত্রজ্ঞ) ইবনে বাজাহ (১০৮৫-১১৩৮ খ্রি.); (চিকিৎসাবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক) ইবনে তুফাইল (১১০৫-১১৮৫ খ্রি.); চক্ষুবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ গাফিকি (মৃ. ১১৬৬ খ্রি.); ইবনে আবদুল বার (৯৭৮-১০৭১ খ্রি.); ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.); শরিফ ইদরিসি (১১০০-১১৬৫ খ্রি.); আবু বকর ইয়াহইয়া ইবনে সাদুন ইবনে তাম্মাম আযদি (১০৯৩-১১৭২ খ্রি.); আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ কাজি কুরতুবি নাহবি (মৃ. ৩৪৫ হি.); হাফেয কুরতুবি; আবু জাফর কুরতুবি (৫২৮-৫৯৬ হি.) এবং আরও অনেকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

কর্ডোভা : এক আধুনিক শহর

কর্ডোভা সমাজ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের অবগতির ওপর ভিত্তি করে প্রতীয়মান হয় যে, হিজরি চতুর্থ শতকের (খ্রিষ্টীয় দশম শতকের) মাঝামাঝি সময়ে কর্ডোভা একটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়েছিল, যাকে এই তৃতীয় সহস্রাব্দের আন্তর্জাতিক শহরগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। বস্তুত এতে বিস্ময়বোধ করার কিছু নেই। কেননা, জনমানুষের শিক্ষার জন্য সেখানে বিদ্যালয়ের বিস্তার ঘটেছিল। অসংখ্য ব্যক্তিগত ও গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি পৃথিবীর মধ্যে কর্ডোভাতেই তখন সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ ছিল! এ ছাড়া শহরটি পরিণত হয়েছিল সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের সম্মিলন ঘটেছিল এ শহরে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটি ছিল নেতৃস্থানীয় শহর। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বিনা খরচে পড়াশোনা করতে পারত। শাসকরা নিজেদের অর্থ থেকে তাদের খরচ বহন করত। তাই এ দাবিতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তথাকার জনগোষ্ঠী সকলেই সাক্ষর ছিল। কর্ডোভায় এমন একটি লোকও পাওয়া যেত না, যে ভালোভাবে পড়ালেখা জানত না।[২৯৬] অথচ সেই সময়ে ইউরোপে মুষ্টিমেয় ধর্মীয় পণ্ডিত ছাড়া সম্ভ্রান্ত লোকেরাও অশিক্ষিত ছিল!

উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, কর্ডোভা নগরীতে সে সময় শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতিগত বিপ্লবই সংঘটিত হয়নি, বরং তার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রশাসনিক অবকাঠামোগত বিপ্লবও। তখন রাষ্ট্রে তৈরি হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উন্নত প্রশাসনব্যবস্থা। যার মধ্যে ছিল আমিরশাসিত প্রদেশব্যবস্থা ও মন্ত্রিপরিষদ। বিচারব্যবস্থা, পুলিশবিভাগ, 'হিসবাহবিভাগ' ও অন্যান্য বিভাগেরও বিকাশ ঘটে।

---

২৯৬. মুহাম্মাদ মাহির হাম্মাদাহ, *আল-মাকতাবাত ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৯৯।

এ ছাড়া বড় ধরনের শিল্পবিপ্লবও ঘটে। বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়। সেখানকার অনেক শিল্প প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন : চামড়াশিল্প, জাহাজশিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প, ওষুধশিল্প ইত্যাদি। তা ছাড়া খনি থেকে সোনা, রুপা ও পিতল উত্তোলনেও উন্নতি ঘটে।[২৯৭]

আমরা যদি কর্ডোভার নাগরিক জীবন ও তার আধুনিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই, এই নগরী পাঁচটি ছোট ছোট শহরে বিভক্ত ছিল। যেন তা পাঁচটি বড় বড় পল্লি। মাক্কারি জানাচ্ছেন, এক শহর থেকে অপর শহরের মাঝে বৃহদায়তন দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিল। প্রতিটি শহরই ছিল আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেক শহরের শহরবাসীর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গণগোসলখানা, হাটবাজার ও শিল্প উৎপাদনব্যবস্থা ছিল।[২৯৮]

মুজামুল বুলদান গ্রন্থে উল্লেখিত ইয়াকুত হামাবির বর্ণনা অনুযায়ী কর্ডোভার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এরূপ, সেখানকার বাজারগুলো সব ধরনের পণ্য ও খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকত। আর প্রত্যেক শহরের বাজার ছিল আলাদা আলাদা।[২৯৯]

এ পর্যায়ে মাক্কারির বরাত দিয়ে কর্ডোভার স্থাপত্যকীর্তি সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি :

মসজিদ : আবদুর রহমান দাখিলের যুগে কর্ডোভার মসজিদ-সংখ্যা চারশ নব্বইয়ে উন্নীত হয়েছিল। তারপর এই সংখ্যা পৌঁছে তিন হাজার আটশ সাঁইত্রিশে।

জনসাধারণের গৃহ : দুই লাখ তেরো হাজার সাতাত্তরটি।

অভিজাত গৃহ : ষাট হাজার তিনশটি।

দোকান (স্টোর ও অন্যান্য) : আশি হাজার চারশ পঞ্চান্নটি।

গণগোসলখানা : নয়শটি।

উপশহর : আটাশটি।[৩০০]

---

[২৯৭]. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৫, পৃ. ২১৮।
[২৯৮]. মাক্কারি, *নাফহুত তিব মিন গুসনি আন্দালুসির রাতিব*, খ. ১, পৃ. ৫৫৮।
[২৯৯]. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।
[৩০০]. মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ১, পৃ. ৫৪০।

অবশ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে বা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার বিভিন্নতার কারণে এসব জিনিসের সংখ্যায় তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু এতে কিছু যায়-আসে না। কারণ এসব ভিন্নতা আভিজাত্য, গৌরব ও সৌন্দর্যের মাত্রাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে, এসব বিষয়ের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা নিয়ে নয়।

ইসলামি শাসনামলে কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লাখ।[৩০১] অথচ বর্তমানে কর্ডোভাবাসীর সংখ্যা মাত্র তিন লাখ দশ হাজারের কাছাকাছি![৩০২]

---

৩০১. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *আল-আসার [illegible] সিয়্যাতুল বাকি[illegible] ফি আসবানিয়া ওয়াল-বুরতুগাল*, পৃ. ১৯।

৩০২. http://ar.w[illegible]ia.org. (২০[illegible] জনসংখ্যা তিন লাখ পঁচিশ [illegible] অনুবাদক)
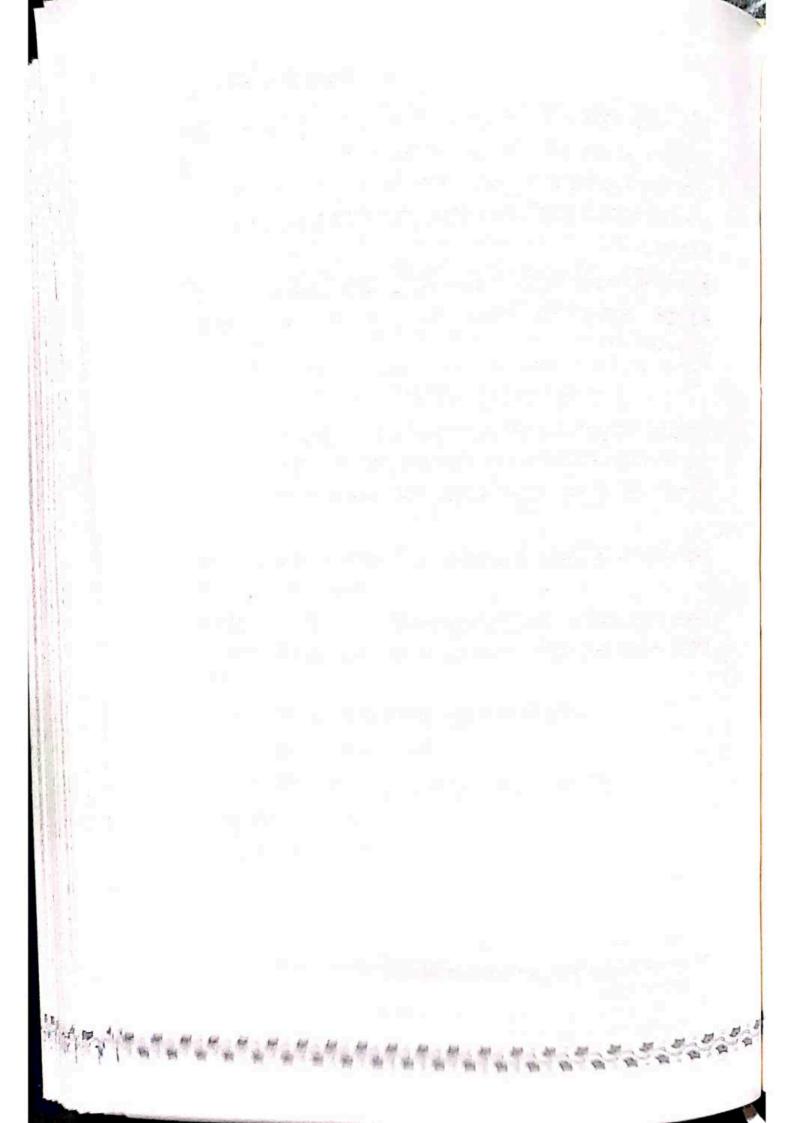
চতুর্থ অনুচ্ছেদ

আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-সাহিত্যিকদের চোখে কর্ডোভা

মসুলের ব্যবসায়ী আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে হাওকাল (মৃ. ৩৬৭ হি.) ৩৫০ হিজরি/৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কর্ডোভা ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি এভাবে তার বর্ণনা দেন, আন্দালুসের অন্যতম বড় শহর কর্ডোভা। জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে কর্ডোভার মতো শহর মাগরিব অঞ্চলে একটিও নেই। বলা হয়ে থাকে, এটি দুই পার্শ্ববিশিষ্ট বাগদাদের একটি পার্শ্বের সাথে তুলনীয়। তবে কর্ডোভা যদি সেরকম নাও হয়ে থাকে, তবু তার কাছাকাছি তো অবশ্যই! গোটা নগরীটি পাথরের দ্বারা নির্মিত মজবুত প্রাচীরে বেষ্টিত। সেই প্রাচীরের গায়ে দুটি উন্মুক্ত ফটক রয়েছে। ফটকের দরজাগুলোর পথ রুসাফা এলাকার তীরবর্তী গোয়াদেল কুইভার নদীর দিকে চলে গেছে। আর রুসাফা হলো শহরের উঁচু অংশে নির্মিত বাসস্থানময় এলাকা, যার নিচে আছে ঘন বৃক্ষমালা। রুসাফার ভবনগুলো চতুর্দিক থেকে পরস্পর সংলগ্ন। তো (প্রাচীরের সেই পথটি) চলে গেছে গোয়াদেল কুইভার নদী পর্যন্ত। পথের আশপাশে আছে বাজার ও বেচাকেনার বিখ্যাত স্থান। সাধারণ মানুষের বাসস্থান (রুসাফার নিম্নবর্তী) ঘন গাছবিশিষ্ট স্থানে। সেখানকার মানুষেরা সম্পদশালী ও বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক।[৩০৩]

কর্ডোভার নাগরিকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, মানুষের মাঝে তারা অভিজাত শ্রেণি, মর্যাদাশালী এবং আলেম-উলামা ও জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায়। এ প্রসঙ্গে শরিফ ইদরিসি বলেন, কর্ডোভায় সবসময়ই বড় বড় আলেম-উলামা ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বসবাস ছিল। এখানকার ব্যবসায়ীরা ছিল অত্যন্ত ধনবান। তারা খুবই অবস্থাসম্পন্ন এবং বিপুল পরিমাণ

৩০৩. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।

সম্পদের অধিকারী ছিল। তাদের উন্নতমানের জাহাজ ছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য।[৩০৪]

হিময়ারি বলেন, কর্ডোভা ছিল আন্দালুসের মূল ঘাঁটি এবং প্রধান শহর। উমাইয়া খেলাফতের কেন্দ্রস্থল ছিল এই শহর। তাদের নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন এখানে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার খলিফাদের কৃতিত্ব এত প্রসিদ্ধ যে তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়। তারা ছিলেন দেশের অভিজাত শ্রেণি ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। বিশুদ্ধ মতাদর্শ, হালাল উপার্জন, সুন্দর বেশভূষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আখলাক ও শিষ্টাচারের জন্য তারা ছিলেন বিখ্যাত। কর্ডোভায় বসবাস করতেন বড় বড় আলেম ও নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি।[৩০৫]

কর্ডোভা সম্পর্কে ইয়াকুত হামাবিও বলেন, কর্ডোভা ছিল আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ শহর, দেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সম্রাটের (খলিফার) আবাসস্থল ও শাসনকেন্দ্র। বনি উমাইয়ার সম্রাটগণ (খলিফাগণ) কর্ডোভাতেই বসবাস করতেন। এই শহর ছিল জ্ঞানীগুণীদের খনি ও প্রস্রবণের সাথে তুলনীয়।[৩০৬]

আবুল হাসান আলি ইবনে বাসসাম শান্তারিনি (৪৫০-৫৪২ হি.) কর্ডোভা সম্পর্কে বলেন, (আন্দালুসে) কর্ডোভা ছিল চূড়ান্ত গন্তব্য, পতাকার কেন্দ্র, প্রধান নগরী, মর্যাদাবান ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের আবাসস্থল, জ্ঞানীগুণীদের ভূমি, রাজ্যের হৃৎপিণ্ড, জ্ঞানবিজ্ঞানের অবিরাম প্রস্রবণ, ইসলামের গম্বুজস্বরূপ, মহামান্য ইমামতুল্য, সুস্থ বিবেকবুদ্ধির গন্তব্যস্থল, অন্তরের জন্য ফলবাগানতুল্য, মেধা নিঃসৃত মণিমুক্তার সাগর। কর্ডোভার দিগন্ত থেকে উদিত হয়েছে পৃথিবীর তারকারা, উড্ডীন হয়েছে জগতের নিশানতুল্য ব্যক্তিবর্গ, বিকশিত হয়েছে গদ্য ও পদ্যের যোদ্ধারা। এখানে রচিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ রচনাবলি, লিখিত হয়েছে অমূল্য গ্রন্থরাজি। এসবের– এবং প্রাচীন কালে ও বর্তমান কালে এখানকার বাসিন্দাদের অন্য মানুষদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের–কারণ এই যে, তাদের নগরী তথা কর্ডোভার দিগন্তজুড়ে সবসময়ই বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষক ও জ্ঞান-

---

৩০৪. ইদরিসি, *নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক*, খ. ২, পৃ. ৫৭৫।

৩০৫. হিময়ারি, *আর-রওযুল মিতার ফি খবারিল আকতার*, পৃ. ৪৫৬।

৩০৬. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৪, পৃ. ৩২৪।

অন্বেষকদের আবাসস্থল ছিল। মোটকথা, এই দিগন্তের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষভাবে কর্ডোভার মানুষ এবং ব্যাপকভাবে গোটা আন্দালুসের মানুষ ছিল আন্দালুসবিজয়ী প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ আরবগণ এবং এ অঞ্চলে আবাস নির্মাণকারী শাম ও ইরাকের মহান সেনাপতিবৃন্দ, এরপর তাদের অভিজাত বংশধররাই এতদঞ্চলের অধিবাসীরূপে অবস্থান গ্রহণ করে। তাই আন্দালুসে এমন কোনো শহর ছিল না, যেখানে দক্ষ লেখক বা স্বনামধন্য কোনো কবি ছিল না।[৩০৭]

ইবনুল ওয়ারদি তার *খারিদাতুল আজায়িব* গ্রন্থে কর্ডোভা ও তার অধিবাসী সম্পর্কে বলেন, কর্ডোভাবাসীরা ছিল গোটা দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ। খাদ্য-পানীয়, বাহন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সব দিক থেকে তারা ছিল অভিজাত ও সেরা। কর্ডোভাতেই ছিলেন সেরা আলেমগণ, নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ, বীর সেনাপতিগণ এবং দুঃসাহসী যোদ্ধারা। এরপর তিনি কর্ডোভার জামে মসজিদ ও সেতুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, এই শহরের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা এত বেশি যে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।[৩০৮]

মোটকথা, ইসলামি সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাম হলো কর্ডোভা, যা মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় এবং তার চাকাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। তবে বাস্তবিকতা এই যে, সেই যুগে এরূপ শহর একমাত্র কর্ডোভাই ছিল না; বরং আমরা চাইলে বাগদাদ, দামেশক, কায়রো, বসরা বা অন্যান্য শহর সম্পর্কেও এমন আলোচনা করতে পারি। সেসব শহরও কর্ডোভার মতো বিস্ময়কর ছিল অথবা বলা যায় তার চেয়েও বেশি। না, এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই! কেননা এটা হলো মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন, যা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সভ্যতা এবং দীর্ঘ মানবেতিহাসের ললাটে এক গৌরবপূর্ণ শুভ্রচিহ্ন।

---

৩০৭. আবুল হাসান ইবনে বাসসাম, *আয-যাখিরা ফি মাহাসিনি আহলিল জাযিরা*, খ. ১, পৃ. ৩৩।
৩০৮. ইবনুল ওয়ারদি, *খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব*, পৃ. ১২।

অষ্টম অধ্যায়

ইউরোপীয় সভ্যতায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

একটি সভ্যতা মানবেতিহাসে চিন্তাধারা, জ্ঞানবিজ্ঞান, নীতি-নৈতিকতার বিভিন্ন দিকে কতটুকু এগিয়েছে এবং কী অমর কীর্তি সাধন করেছে তার ভিত্তিতেই ওই সভ্যতা অমরত্ব ও অবিনশ্বরতা লাভ করে। ইসলামি সভ্যতা মানবজাতির অগ্রযাত্রার ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং যে অসাধারণ কীর্তি সাধন করেছে তা আমরা জানলাম। ইসলামি সভ্যতার এসব অবদান ও কীর্তি থেকে ইউরোপ কী গ্রহণ করেছে এবং ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ ও সভ্যতা কীভাবে লাভবান হয়েছে তার ওপর আলোকপাত করব, তা যাচাই করে দেখব। ইউরোপীয় সভ্যতা যেসব কীর্তি সাধন করেছে সেগুলো ইসলামি সভ্যতার প্রভাবের ফলেই করতে পেরেছে। কারণ, ইসলামি সভ্যতা ছিল তার চেয়ে অগ্রগামী। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ইসলামি সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষের যে যুগ অতিবাহিত হয়েছে, ইউরোপের আধুনিক ইতিহাস মূলত তারই ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রলম্বিত অংশ। দুটির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তার বিবরণ হয়তো তেমনই যেমন বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদগুলোতে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপে ইসলামি সভ্যতার পারাপারস্থল বা সেতু

খ্রিষ্টধর্মানুসারী পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ইসলামি সভ্যতার যোগাযোগ ঘটে মধ্যযুগে, যখন ইউরোপ যাপন করছিল তীব্র তমসাচ্ছন্ন সময়। ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, তিনটি প্রধান পথ দিয়ে এই যোগাযোগ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে উদ্যোগ, সক্রিয়তা ও সংস্কৃতি-প্রেরণের (Cultural transmission) পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে এই তিনটি পারাপারস্থল নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : আন্দালুস

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সিসিলি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ক্রুসেড যুদ্ধ

প্রথম অনুচ্ছেদ

আন্দালুস

আন্দালুস ইসলামি সভ্যতার অন্যতম প্রধান পারাপারস্থল এবং ইউরোপে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রেরণের গুরুত্বপূর্ণ সেতু। জ্ঞানবিজ্ঞান, চিন্তা ও দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির নানা দিক ও নানা বিষয় প্রেরণে তা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আন্দালুস ইউরোপেরই একটি অংশ। আট শতাব্দীব্যাপী তা (৯২-৮৯৭ হি./৭১১-১৪৯২ খ্রি.) সাংস্কৃতিক বাতিঘর হিসেবে সক্রিয় ছিল; মুসলিমরা যতদিন কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় ছিল ততদিন তো বটেই, দেশটির রাজনৈতিক দুর্বলতা ও তাইফ গোত্রীয় রাজ্যের আত্মপ্রকাশের সময়ও তা সক্রিয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, গ্রন্থাগার, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রাসাদ, বাগান, জ্ঞানীগুণী, কবি-সাহিত্যিক প্রভৃতি ছিল এই বাতিঘরের চালিকাশক্তি। এমনকি আন্দালুস ইউরোপীয়দের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, যে আন্দালুসের সঙ্গে তাদের দেশগুলোর ছিল নিবিড় ও বিশ্বস্ত যোগাযোগ।[৩০৯]

মুসলিমরা স্পেনে স্থায়িত্ব লাভের পরপরই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মনোনিবেশ করে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শাস্ত্রীয় বিষয়াবলির প্রতি যত্নশীল হয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। এসব ক্ষেত্রে তারা তেমনই উৎকর্ষ অর্জন করে যেমন প্রাচ্যে তাদের ভাইয়েরা করেছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় নতুন ও মহৎ কিছু উদ্ভাবন করে। যার ফলে ইউরোপের জন্য এক অনুকূল উৎসের সৃষ্টি হয়, এই উৎস থেকে তারা খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীয় রেনেসাঁস (Italian Renaissance) পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে।

গুস্তাভ লি বোঁ বলেছেন, আরবরা স্পেন বিজয় উপভোগ করতে না-করতেই সেখানে সভ্যতার চারা রোপণ করতে শুরু করে। এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে তারা বিরানভূমিগুলোকে আবাদ করে, প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত

---

৩০৯. হানি আল-মুবারাক ও শাওকি আবু খলিল, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা ফিন-নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ৫১-৫২।

শহরগুলোকে পুনর্নির্মাণ করে, বড় বড় অট্টালিকা ও ভবন তৈরি করে, অন্যান্য জাতির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। এর পরপরই তারা জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করে। গ্রিক ও লাতিন গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, এসব বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘকালব্যাপী ইউরোপে সংস্কৃতির আশ্রয়স্থল হিসেবে সক্রিয় থাকে।[৩১০]

ইসলামের উদারতানীতি ইহুদি ও খ্রিষ্টান জিম্মিদের মনে বেশ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে স্প্যানিশ নব্য আরবীয়রা আরবি ভাষা শিখতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষাকেই ব্যবহার করে। এমনকি তারা লাতিন ভাষা থেকে আরবি ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়। যেমন অসংখ্য ইহুদি তাদের আরব শিক্ষকদের শিষ্যত্ব বরণ করে নেয়।

আরবি ভাষা থেকে অনুবাদ-আন্দোলন বিপুল উদ্যোগে শুরু হয়। বিশেষ করে টলেডো শহরে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তা পুরোদমে অব্যাহত থাকে। গ্রন্থরাজি আরবি থেকে স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়, তারপর স্প্যানিশ থেকে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। অথবা আরবি থেকে সরাসরি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। জ্ঞানের সব শাখায় কেবল আরব আলেম ও বিজ্ঞানীদের রচনাবলিই যে অনূদিত হয় তা নয়, বরং যেসব গ্রিক রচনারাশি ইতিপূর্বে দুই শতাব্দীব্যাপী প্রাচ্যে (আরবিতে) অনূদিত হয়েছিল সেগুলোও স্প্যানিশ ও লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। গ্যালেন, হিপোক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড প্রমুখ গ্রিক মনীষীর গ্রন্থাবলি অনূদিত হয়।

টলেডোর বিখ্যাত অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইতালীয় মনীষী জেরার্ড অব ক্রেমোনা[৩১১]। তিনি আত-তুরাইতিলি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইতালি থেকে টলেডোতে এসেছিলেন ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দে। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি প্রায় একশটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, তার

---

৩১০. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ২৭৩।

৩১১. জেরার্ড অব ক্রেমোনা (Gerard of Cremona 1114-1187) ছিলেন ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। তিনি উত্তর ইতালির ক্রেমোনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আন্দা[illegible] টলেডোতে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তিনি আরবি থেকে লাতিন ভাষায় মে[illegible] করেন।

মধ্যে একুশটি গ্রন্থ চিকিৎসা-বিষয়ক। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া আল-রাযি (২৫০-৩১১ হি.) কর্তৃক রচিত '*আল-মানসুরি ফিত-তিব*' ও ইবনে সিনা (৩৭০-৪২৭ হি.) কর্তৃক রচিত '*আল-কানুন ফিত-তিব*'। অবশ্য তার নামে প্রচলিত কিছু গ্রন্থ তারই তত্ত্বাবধানে তার ছাত্রদের দ্বারা অনূদিত। কোনো কোনো গ্রন্থ তিনি অন্যের সঙ্গে যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন, বিশেষ করে গালিপাসের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে গালিপাসও আরবত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্প্যানিশরাও ব্যাপকভাবে অনুবাদের চর্চা করে। যারা স্পেনে এসেছিল তারাও একই কাজ করে। ক্যাস্টাইল রাজ্যের রাজা দশম আলফোনসো (Alfonso X of Castile 1221-1284) কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরবি থেকে লাতিনে অনুবাদকে উৎসাহিত করেন ও পৃষ্ঠপোষকতা দেন, কখনো কখনো আরবি থেকে ক্যাস্টাইলীয় ভাষাতে অনুবাদকেও উৎসাহিত করেন।[৩১২]

জর্জ সার্টন বলেছেন, প্রাচ্যের প্রতিভাবান মুসলিমরা মধ্যযুগে শ্রেষ্ঠ সব কীর্তি সাধন করেছেন। আরবি ভাষায় অত্যন্ত মূল্যবান, মৌলিক ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে নিয়ে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আরবি ভাষাই ছিল মানবজাতির জ্ঞানচর্চার সবচেয়ে উন্নত ভাষা। এমনকি যেকোনো ব্যক্তি সমকালীন সংস্কৃতি ও তার সর্বশেষ ঘটনাপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চাইত তার জন্য সংগত ছিল আরবি ভাষা শেখা। যাদের মাতৃভাষা আরবি নয়, এমন অসংখ্য মানুষ এই কাজটি করেছে। আমি মনে করি যে, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, ওষুধবিজ্ঞান ও ভূগোল—বিজ্ঞানের এসব ক্ষেত্রে মুসলিমরা কী অবদান রেখেছেন তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।[৩১৩]

কর্ডোভার অবস্থান বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতা স্থানান্তরে শহরটির অবদান কী ছিল তা নিয়ে মন্তব্য করেছেন জন ব্রান্ডি ট্রেন্ড (John Brande Trend)। তিনি বলেছেন, দশম শতাব্দীতে সভ্যতার ও

---

[৩১২]. মুহাম্মাদ আল-জালিলি, *তাসিরুত তিব্বিল আরাবি ফিল-হাদারাতিল উরুব্বিয়্যা*, https://bit.ly/2W9uL9b

[৩১৩]. হাসসান শামসি পাশা, *হা-কাযা কানু ইয়াউমা কুন্না*, পৃ. ৮; আহমাদ আলি মোল্লা, *আসারুল উলামায়িল মুসলিমিন ফিল-হাদারাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ১১০-১১১।

সংস্কৃতির দিক থেকে কর্ডোভা ছিল ইউরোপের সব শহর থেকে শ্রেষ্ঠ, বাস্তবিকতার বিচারে তা ছিল গোটা বিশ্বের বিস্ময় ও সমীহবোধের কেন্দ্রস্থল। বলকান রাষ্ট্রগুলোর চোখে যেমন ছিল ভেনিস। উত্তর দিক থেকে যে-সকল পর্যটক আসতেন তারা সেই শহর (কর্ডোভা) সম্পর্কে এমন কথা শুনতেন যাতে তাদের মনে শহরটি সম্পর্কে ভয়মিশ্রিত সমীহ জাগত। সেই শহরে রয়েছে সত্তরটি গ্রন্থাগার, সাতশ গণগোসলখানা ইত্যাদি। লিওন, নাভার (Navarre), বার্সেলোনা ইত্যাদি শহরের নৃপতিদের শল্যচিকিৎসকের বা প্রকৌশলীর বা স্থপতির বা দরজির বা সংগীতজ্ঞের প্রয়োজন হলে তারা তাদের দাবি নিয়ে কর্ডোভারই দ্বারস্থ হতেন।[৩১৪]

ইউরোপের রেনেসাঁস-যুগের জন্য কর্ডোভাই পথ তৈরি করে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে জোর দিয়ে চিন্তাবিদ লিওপোল্ড উইজ (Leopold Weiss)[৩১৫] বলেন, আমরা অতিরঞ্জন করব না যদি বলি, আমরা যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বসবাস করছি তা ইউরোপের শহরগুলোতে শুরু হয়নি, বরং ইসলামি কেন্দ্রগুলোতে শুরু হয়েছে—দামেশকে, বাগদাদে, কায়রোয় ও কর্ডোভায়।[৩১৬]

ইসলামি সভ্যতাকে পাশ্চাত্যে প্রেরণ ও স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে পারাপারস্থল হিসেবে আন্দালুস যে ভূমিকা পালন করেছে সেই সম্পর্কে সিগরিড হুংকে সাধারণভাবে বলেছেন, পিরেনিজ পর্বতমালাও[৩১৭] ওইসব যোগাযোগ ও

---

৩১৪. *The Legacy of Islam*, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত, আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام (১৯৫৪), অনুবাদ ও টীকা সংযোজন : জারজিস ফাতহুল্লাহ, পৃ. ২৭।

৩১৫. লিওপোল্ড উইজ (১৯০০-১৯৯৬ খ্রি.) ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত অস্ট্রীয় বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনায় দর্শন ও কলা বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তারপর সাংবাদিকতায় যোগ দেন এবং এই ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রাচ্যে ও ইসলামি দেশগুলোতে সাংবাদিক হিসেবে ভ্রমণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হয় মুহাম্মাদ আসাদ।

৩১৬. মুহাম্মাদ আসাদ, *Islam at the Crossroads* (1934), আরবি অনুবাদ, الإسلام على مفترق الطرق, অনুবাদক : উমর ফাররুখ, আরবি থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৪০। বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন সৈয়দ আবুল মান্নান এবং প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৩১৭. দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের পিরেনিজ বা পিরিনীয় পর্বতমালা ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক সীমানা গঠন করেছে। এটির সর্বোচ্চ বিন্দু ৩৪০৪ মিটার (১১১৬৮ ফুট) উঁচু আনেতো পর্বতশৃঙ্গ। পর্বতমালাটি ইবেরীয় উপদ্বীপকে ইউরোপ মহাদেশের বাকি অংশ থেকে

আদান-প্রদানের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। এখান থেকেই আন্দালুসীয় আরব সভ্যতা পাশ্চাত্যের দিকে তার পথ খুঁজে নিয়েছে।[৩১৮]

তিনি আরও বলেন, হাজার হাজার ইউরোপীয় বন্দি আন্দালুস থেকে আরব সভ্যতার মশাল বয়ে নিয়ে যায়। তারা কর্ডোভা ও জারাগোজা (Zaragoza) এবং অন্যান্য আন্দালুসীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে ফিরে যায়। এ ছাড়াও লিওন, জেনোয়া, ভেনিস ও নুরেমবার্গের বণিকেরা ইউরোপীয় শহরগুলো ও আন্দালুসীয় শহরগুলোর মধ্যে দূতিয়ালি ও মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে। সান্তিয়াগো[৩১৯] যাওয়ার পথে লাখ লাখ ইউরোপীয় খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রী উত্তর আন্দালুস থেকে আগত আরব বণিকদল ও খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের সংস্পর্শে আসে। প্রতি বছরই ইউরোপ থেকে অশ্বচালকদল, বণিকদল ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ স্পেনে আসত; তারাও আন্দালুসীয় সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলোকে তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইহুদি বণিক, চিকিৎসক ও শিক্ষিত লোকেরা আরবের সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নিয়ে যায়। তারা (ইহুদিরা) টলেডো শহরে অনুবাদকর্মেও অংশগ্রহণ করে এবং আরবি থেকে অসংখ্য গল্প, কল্পকাহিনি ও বীরত্বগাথা অনুবাদ করে।[৩২০]

এভাবেই আন্দালুস ইসলামি সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে সক্রিয় ছিল এবং ইসলামি সভ্যতাকে ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছিল গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল ও গমনপথ।

বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রায় ৪৯১ কি.মি (৩০৫ মাইল) দীর্ঘ পর্বতমালাটি পশ্চিমে বিস্কে উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।-অনুবাদক (উইকিপিডিয়া)

[৩১৮]. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৩১।

[৩১৯]. চিলির রাজধানী। খ্রিষ্টানরা চিলির Roman Catholic Archdiocese of Santiago de Chile-তে তীর্থযাত্রায় যেত।

[৩২০]. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫৩২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সিসিলি

সিসিলিও ইউরোপে ইসলামি সভ্যতা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রুট ও সংযোগস্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে তা দক্ষিণ ইতালিতেও ইসলামি সভ্যতা বিস্তার করেছে। মুসলিমরা ২১৬ হিজরি/৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলির রাজধানী পালেরমো জয় করেন এবং ৪৮৫ হিজরি/১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুইশ ষাট বছর সিসিলি শাসন করেন। এই দীর্ঘ সময়ে সিসিলিতে মানুষের জীবন ইসলামি-আরবীয় স্বভাব-প্রকৃতির ছাঁচে গড়ে ওঠে। মুসলিমরা এই সময়ে নগরায়ণ ও সমৃদ্ধির প্রতি জোর দেন, সেখানে ইসলামি সভ্যতার নিদর্শন স্থাপন করেন। মসজিদ, প্রাসাদ, অট্টালিকা, গণগোসলখানা, হাসপাতাল, বাজার, দুর্গ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পও সিসিলিতে বিকাশ লাভ করে। যেমন : কাগজ, রেশম, জাহাজ, খনিজ পদার্থ উত্তোলন ইত্যাদি। ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রচর্চায় অগ্রগতি ঘটে। ইউরোপের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়াশোনা করতে আসে। এরপর সিসিলি পাশ্চাত্যে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রেরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সিসিলিতেও আরবি থেকে লাতিনে অনুবাদের আন্দোলন শুরু হয়, আন্দালুসের যেমন অনুবাদ-বিপ্লব ঘটেছিল তেমনই।

একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই সিসিলি দ্বীপে ইসলামি শাসনের সমাপ্তি ঘটে। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের নরমান[৩২১] উত্তরসূরিদের ছত্রছায়ায়

---

[৩২১]. নরমান জাতি ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে আগত ভাইকিং দস্যুর দল। এরা নবম শতকের প্রথমভাগে উত্তর ফ্রান্সের নরমঁদিতে বাস করা শুরু করে। সেখান থেকে এরা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপ বিজয় করে। একাদশ শতকের শুরুতে একদল নরমান দক্ষিণ ইতালিতে এসে উপস্থিত হয়। তারা ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে সালের্নোর মুসলিম আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখানে যায়। আরও বেশি সংখ্যায় নরমানরা আসার পর তারা বলপ্রয়োগ করে তাদের ইতালীয় প্রতিবেশী ও চাকুরিদাতাদের জমি দখল করে নেয়। এই নরমান অভিযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওতভিলের ডিউক তঁক্রে (Tancred [illegible]uteville 980-1041), যিনি ১০৪২ সালে আপুলিয়া দখল করেন। ১০৫৩ সালে

ইসলামি সভ্যতার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানী-মনীষী তাদের কাজ চালিয়ে যান। যেমন ভূগোলবিদ মুহাম্মাদ আল-ইদরিসি। তিনি সিসিলির নরমান সম্রাট দ্বিতীয় রজারের (Roger II of Sicily 1130-1145) জন্য তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন। একটি গোলাকার সমতল রুপার চাকতিতে তিনি এই মানচিত্র আঁকেন। সম্রাট রজারের জন্যই তিনি রচনা করেন '*নুযহাতুল মুশতাক ফি ইফতিরাকিল আফাক*' গ্রন্থটি।[৩২২] এই গ্রন্থে তিনি উপর্যুক্ত মানচিত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেন। রুশ-সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ ও আরবি ভাষাবিদ ইগন্যাটি ক্র্যাচকোভ্স্কি[৩২৩] তার *তারিখুল আদাবিল জুগরাফিয়্যিল আরাবি* গ্রন্থে আল-ইদরিসির কাজ সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী মন্তব্য করেন। রজার সম্পর্কে ক্র্যাচকোভ্স্কি বলেন, তিনি একজন আরবীয় বিজ্ঞানীকে তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের বিবরণ তৈরির জন্য দায়িত্ব দেন। সেই যুগে ইসলামি সভ্যতা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল এবং তা সবাই মেনে নিয়েছিল, এই ঘটনা তার স্পষ্ট প্রমাণ। সিসিলির নরমান রাজদরবার অর্ধেকের বেশি না হলেও অর্ধেকই ছিল প্রাচ্যীয়।[৩২৪]

নরমানরা পোপ নবম লিয়ো (Pope Leo IX)-র সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। পোপ তাদেরকে আপুলিয়া ও কালাব্রিয়ার দখলকৃত জায়গাগুলো দিয়ে দেন ও শান্তি স্থাপন করেন। ১০৭১ সালে সমগ্র দক্ষিণ ইতালি নরমানদের দখলাধীনে চলে আসে। তঁক্রের এক ছেলে ডিউক রবার্ট গিস্কার্ড (Robert Guiscard 1015-1085) এ সময় ইতালির নরমানদের নেতা ছিলেন। রবার্ট গিস্কার্ডের ভাই প্রথম রজার আরবদের কাছ থেকে সিসিলি দ্বীপ দখলের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমে উত্তর-পূর্ব সিসিলির মেসসিনা শহর দখলে সক্ষম হন। কিন্তু সমগ্র সিসিলি বিজয়ে আরও প্রায় ৩০ বছর সময় লেগে যায়। দ্বিতীয় রজার দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপে নরমানদের ভূমিগুলো একত্র করেন এবং ১১৩০ সালে সিসিলির প্রথম রাজা হন। এরপর সময়ের আবর্তে নরমানরা ইতালির স্থানীয় জনগণের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যেতে থাকে এবং পরবর্তীকালে আলাদা নরমান সংস্কৃতি ধরে রাখতে পারেনি। (অনুবাদক)

৩২২. *Tabula Rogeriana* (*The Map of Roger*) নামেও গ্রন্থটি পরিচিত।

৩২৩. ইগন্যাটি ক্র্যাচকোভ্স্কি (Ignaty Krachkovsky) ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লাসিক গ্রিক ভাষাগুলো শিক্ষা করেন। এরপর নিজে নিজে আরবি ভাষা শিখতে ব্রতী হন। সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যীয় ভাষা অনুষদে ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। এখানে তার গুরু ছিলেন ইসলামি ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ ভেসিলি বারটোল্ড (Vasily Bartold)।

৩২৪. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ২৮ থেকে উদ্ধৃত। *নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক* রচনার ইতিবৃত্ত জানতে আরও দেখুন, সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪১৬-৪১৭।

নতুন ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ইউরোপীয়দের আকর্ষিত করে। নরমঁদি শাসনামলেও ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাব অব্যাহত থাকে। সিসিলির রাজকীয় জীবন—বিশেষ করে দ্বিতীয় রজার ও দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের যুগে—যে শানশওকত ও আভিজাত্যমণ্ডিত ছিল তাকে কর্ডোভার রাজকীয় জীবনের সমকক্ষ বিবেচনা করা হয়। এই সম্রাট দুজন আরবীয় পোশাক ও আরবীয় জীবনপ্রণালি অবলম্বন করেন। সিসিলির নরমঁদি শাসকদের উপদেষ্টাবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের অনেকেই ছিলেন আরব মুসলিম। তাদের ছত্রছায়ায় এসেছিলেন বাগদাদ ও সিরিয়ার অনেক আলেম ও বিজ্ঞানী। এসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, সিসিলির তিনজন নরমঁদি সম্রাট আরবি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় রজার মু'তায বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন। প্রথম উইলিয়ামের উপাধি ছিল হাদি বি-আমরিল্লাহ এবং দ্বিতীয় উইলিয়াম যে উপাধি ধারণ করেন তা হলো মুসতাইয বিল্লাহ। এসব উপাধি তাদের ব্যাজে উৎকীর্ণ ছিল।[৩২৫]

দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক[৩২৬] (১১৯৪-১২৩০ খ্রি.) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মুকুট পরিধান করেন ১২২০ সালে। কিন্তু তিনি সিসিলিতে বসবাস করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তার আলাদা কদর ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তর্কবিতর্ককে উৎসাহিত করেছেন। তিনিই ১২২৪ সালে ইতালির নেপল্স বিশ্ববিদ্যালয়[৩২৭] প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু আরবি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ইসলামি সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। কারণ প্যারিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও যথেষ্ট পরিমাণ আরবি পাণ্ডুলিপি ছিল। আরবি থেকে লাতিনে অসংখ্য গ্রন্থ অনূদিত হয়। অনুবাদকদের মধ্যে কয়েকজন হলেন স্টিফেন অব অ্যান্টিওক[৩২৮] (তিনি ১১২৭ সালে আলি ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি কর্তৃক রচিত চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ *আল-কিতাবুল মালাকি* লাতিনে অনুবাদ করেন); অ্যাডেলার্ড অব বাথ[৩২৯] (তিনি ১১০৭

---

৩২৫. আযিয আহমাদ, *তারিখু সাকলিয়া*, পৃ. ৭৬।

৩২৬. Frederick II, Holy Roman Emperor.

৩২৭. University of Naples Federico II.

৩২৮. Stephen of Antioch. Stephen of Pisa ও Stephen the Philosopher নামেও পরিচিত।

৩২৯. অ্যাডেলার্ড অব বাথ (Adelard of Bath 1080-1152) ছিলেন গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক। লাতিন, গ্রিক ও আরবি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ইউরোপে আরবি ভাষার বিস্তারে তার

সাল থেকে ১১৩৩ সালের মধ্যে তার গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকর্মগুলো সম্পাদন করেন);[৩৩০] তারপর আসেন মাইকেল স্কট[৩৩১], তিনি সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন, উল্লেখযোগ্যভাবে অনুবাদ করেন ইবনে রুশদের গ্রন্থাবলি।

নেপলসের প্রথম চার্লস[৩৩২] আরবি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থাবলিকে লাতিন ভাষায় অনুবাদের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং সেখানে সক্রিয় অনুবাদকদের যুক্ত করেন। তাদের মধ্যে রয়েছে ফারাজ বেন সালিম, মোসেস বেন সলোমোন অব সালের্নো। অনুবাদকদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রতিলিপিকার ও সংশোধকদের একটি দল। চিকিৎসাবিদ আল-রাযির '*আল-হাবি*' ও ইবনে জাযলার '*তাকউইমুল আবদান ফি তাদবিরিল ইনসান*' গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন হয় এখানেই।

সিসিলি প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারা স্থানান্তরের একটি উর্বর ক্ষেত্র ছিল। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে আরবিভাষী যেমন ছিল, তেমনই গ্রিকভাষীও ছিল। আরও কিছু সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন যারা লাতিন জানতেন। সিসিলি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল একসময়, তাই এখানে গ্রিক সংস্কৃতির কিছু নিদর্শনও ছিল। তিনটি ভাষার পাশাপাশি সহাবস্থান আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের স্থানান্তর বেশ সহজ করে দিয়েছিল। এর আগে সালের্নোর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (Schola Medica Salernitana) প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী (৯০০-১২০০ খ্রি.) চিকিৎসাবিষয়ক পড়াশোনার কেন্দ্র ছিল। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ ইতালিতে অবস্থিত এবং সিসিলির সঙ্গে এর সম্পর্ক বেশ দৃঢ়। এই মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন কনস্টান্টাইন দি আফ্রিকান[৩৩৩]। তিনি ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিউনিসে। ১০৬৫ সাল থেকে ১০৮৫ সাল পর্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি ইংল্যান্ডের বাথ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্সের তুর, আন্দালুস ও সিসিলিতে জ্ঞান অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর তাকে কাউন্ট হেনরির শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তার এই ছাত্রই পরবর্তীকালের সম্রাট দ্বিতীয় হেনরি।

৩৩০. নজিব আকিকি, *আল-মুসতাশরিকুন*, খ. ১, পৃ. ১১১।

৩৩১. মাইকেল স্কট (Michael Scot 1175-1232) ছিলেন স্কটিশ গবেষক, গণিতজ্ঞ, চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদ। অ্যারিস্টটলের কয়েকটি গ্রন্থ আরবি ও হিব্রু থেকে অনুবাদ করেন। আরবদের সঙ্গে আন্দালুসে পড়াশোনা করেন এবং সিসিলিতে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের রাজদরবারে কাজ করেন। ইবনে রুশদের গ্রন্থাবলি লাতিনে অনুবাদ করেন।

৩৩২. প্রথম চার্লস (Charles I, 1227-1285) সাধারণভাবে Charles of Anjou নামে পরিচিত।

৩৩৩. Constantine the African বা Constantinus Africanus.

তিনি সবচেয়ে উর্বর সময় যাপন করেন এবং বহু চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ আরবি থেকে লাতিনে অনুবাদ করেন। তিনি চল্লিশটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আলি ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি (মৃ. ৯৮২ বা ৯৯৪ খ্রি.) কর্তৃক রচিত *'কামিলুস সিনাআতিত তিব্বিয়্যাহ'* ও *'আল-কিতাবুল মালাকি'*-এর অনুবাদ এবং ইবনুল জাযযার, ইসহাক ইবনে ইমরান ও ইসহাক ইবনে সুলাইমানের গ্রন্থাবলির অনুবাদ। শেষোক্ত তিনজনেরই মাতৃভূমি ছিল তিউনিসিয়া।

কনস্টান্টাইন দি আফ্রিকান কয়েকটি আরবি গ্রন্থের মূল লেখকের নাম উল্লেখ করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেখাননি। এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার গুরুত্ব কমে না। কারণ তিনিই ছিলেন প্রথম অনুবাদক যিনি আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ইউরোপে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং সালের্নোর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের উন্নতি তিনিই সাধন করেছিলেন। এই মহাবিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের অন্যতম ভাষা ছিল আরবি। আরব মুসলিমদের বড় বড় লেখক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সামসময়িক ছিল এই মহাবিদ্যালয়। আবু বকর আল-রাযি (মৃ. ৯২৫ খ্রি.), ইবনুল জাযযার (মৃ. ৯৭৫ খ্রি.) ও আলি ইবনে আব্বাস (মৃ. ৯৮২ বা ৯৯৪ খ্রি.)-এর জীবৎকালে এই মহাবিদ্যালয় সক্রিয় ছিল।[৩৩৪]

অধ্যাপক কোয়েল ইয়ং সিসিলির ব্যাপারে বলেন, গ্রিক, লাতিন ও আরব বার্বারদের ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের মুক্ত সম্মিলনের ময়দান ছিল সিসিলি। ফলে এখানে সংমিশ্রিত বা যৌথ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। দ্বিতীয় রজার ও দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের উৎসাহদান ও পৃষ্ঠপোষকতার বদান্যতায় ইসলামি সভ্যতাসংস্কৃতির উৎকৃষ্ট অংশকে ইতালির পথ ধরে ইউরোপে পৌঁছে দিতে বড় ভূমিকা পালন করেছিল সিসিলি। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিসিলির পালের্মো শহরটি অনুবাদ ও আরবি গ্রন্থাবলিকে লাতিনে রূপান্তরিত করার কেন্দ্র হিসেবে দ্বাদশ শতাব্দীর টলেডো হয়ে উঠেছিল।[৩৩৫]

---

৩৩৪. মুহাম্মাদ আল-জালিলি, *তাসিরুত তিব্বিল আরাবি ফিল-হাদারাতিল উরুব্বিয়্যা*, https://bit.ly/345rcoS

৩৩৫. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ২৮ থেকে উদ্ধৃত।

নরমান শাসকেরা কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মুসলিমদেরকে পেশাগত সুরক্ষা দিয়ে তাদের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। কারণ তারা এসব মুসলমানের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন।[৩৩৬] মুসলিমরা যেসব অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেগুলোও তারা অটুট রেখেছিলেন। দিওয়ানুত তাহকিক[৩৩৭] ও দিওয়ানুল মা'মুর[৩৩৮] থেকে শুরু করে দিওয়ানুল ফাওয়ায়িদ[৩৩৯] পর্যন্ত তারা বহাল রেখেছিলেন। এসব দিওয়ান বা বিভাগের নথিপত্র লেখা হতো আরবি ভাষায়।[৩৪০]

নরমান শাসকেরা সামরিক বিভাগেও মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং কয়েকজন মুসলিমকে সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদে নিযুক্ত করেন। কেবল আরবীয় যুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিস্তার নয়, যুদ্ধের যন্ত্রপাতি, যেমন মানজানিক ও অবরোধ-দুর্গ নির্মাণের কৌশল ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে।[৩৪১]

এভাবেই সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি ইউরোপে ইসলামি সভ্যতা স্থানান্তরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুট ও গমনপথ ছিল।

---

৩৩৬. আযিয আহমাদ, *তারিখু সাকলিয়্যা*, পৃ. ২৯৮।
৩৩৭. সিসিলির অর্থ-প্রশাসন বিভাগ।
৩৩৮. অর্থ-প্রশাসন বিভাগের একটি অংশ, বাইতুল মাল বা কোষাগার-সংশ্লিষ্ট।
৩৩৯. ভূমি-বিক্রয় বিভাগ।
৩৪০. এল জিনওয়ার্দি, *আদ-দাফাতিরুন নুরমানিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ১৫৯-১৬৪।
৩৪১. আযিয আহমাদ, *তারিখু সাকলিয়্যা*, পৃ. ৭৬ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ক্রুসেড যুদ্ধ

ক্রুসেড যুদ্ধ প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী অব্যাহত থাকে। হিজরি পঞ্চম শতকের/খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের শেষের দিকে (৪৯০ হি./১০৯৭ খ্রি.) ক্রুসেডের সূচনা ঘটে এবং মামলুকদের হাতে ক্রুসেডারদের শেষ দুর্গটির পতনের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে (৬৯০হি./১২৯১ খ্রি.)। এই সময়সীমাকে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বা প্রভাব-বিস্তার, স্থানান্তর ও আহরণের গুরুত্বপূর্ণ কাল বিবেচনা করা হয়। ক্রুসেডাররা ইসলাম-শাসিত প্রাচ্যে প্রবেশ করেছিল যুদ্ধ করার জন্য, জ্ঞান আহরণের জন্য নয়। তা সত্ত্বেও তারা মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাদের অবদান ও কীর্তির যা কিছু ইউরোপে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে গেছে। ইউরোপ তখন ছিল পশ্চাৎপদ ও অধঃপতিত।

এই প্রসঙ্গে গুস্তাভ লি বোঁ বলেছেন, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দুই শতাব্দীর যোগাযোগ ইউরোপে সভ্যতা বিকাশের একটি শক্তিশালী কারণ... কেউ যদি পাশ্চাত্যের ওপর প্রাচ্যের প্রভাব কী তা অনুধাবন করতে চায় তাহলে তাকে সেই সভ্যতা-সংস্কৃতির অবস্থাও অনুধাবন করতে হবে যা যাপন করছিল এই দুই জাতি। আরবদের কল্যাণে ও বদান্যতায় প্রাচ্য তখন উন্নত সভ্যতাসংস্কৃতি উপভোগ করছিল, অন্যদিকে পাশ্চাত্য ছিল বর্বরতা ও অসভ্যতার সমুদ্রে নিমজ্জিত।[৩৪২]

এই প্রসঙ্গে মাকরিযি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[৩৪৩] তিনি জানিয়েছেন, রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক বাইতুল মুকাদ্দাসে অভিযান চালানোর পর (৬২৬ হি./১২২৮ খ্রি.) তার দেশে ফেরার পথে আক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হন। এ সময় তিনি কিছু জটিল প্রকৌশলীয় ও গাণিতিক সমস্যার মুখোমুখি হন। সম্রাট এসব সমস্যার সমাধান চেয়ে আল-কামিল

---

৩৪২. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৩৩৪।

৩৪৩. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ১, পৃ. ৩৫৪।

আল-আইয়ুবির[৩৪৪] কাছে লোক পাঠান। সুলতান আল-কামিল জ্ঞানবিজ্ঞান অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং জ্ঞানীগুণীদের তার সান্নিধ্যে নিয়ে আসতেন, তাদের পরীক্ষা করতেন এবং প্রচুর পরিমাণে উপহার-উপঢৌকন দিতেন। তিনি এসব সমস্যা তার সাম্রাজ্যের একজন বিজ্ঞানীর কাছে পেশ করেন। সেই বিজ্ঞানীর নাম শাইখ আলামুদ্দিন কাইসার[৩৪৫]। তিনি ছিলেন গণিতজ্ঞ ও প্রকৌশলী। আল-কামিল আল-আইয়ুবি সমস্যার সমাধানগুলো তার কাছ থেকে জেনে ফ্রেডেরিকের কাছে পাঠান। যেসব সমস্যা সম্রাট পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে দুটি নিম্নরূপ :

১. বর্শার কোনো অংশ পানিতে ডোবানোর পর তা সোজা না দেখিয়ে বাঁকা দেখায় কেন?

২. যাদের দৃষ্টিশক্তি কম তারা কেন তাদের চোখের সামনে মাছি বা মশার মতো রেখা দেখতে পায়?[৩৪৬]

যেসব ইউরোপীয়রা অবিশ্রান্ত তরঙ্গের মতো ইসলামি দেশগুলোতে এসেছিল, রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছিল, নিরপরাধ মানুষের রক্তে নিজেদের নিমজ্জিত করেছিল, যাদের মনে কোনো মমতা বা ভালোবাসা কাজ করেনি, তারা যখন মুসলিম সৈনিকদের মুখোমুখি হলো, দেখল যে তাদের তরবারিগুলো সুশিক্ষিত, তাদের হৃদয় দয়ার্দ্র, তাদের স্বভাব নম্র ও ভদ্র। ফলে ক্রুসেডাররা সমতা, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়গুলো অনুধাবন করল। ফলে তারা তাদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও মানুষকে হেয়জ্ঞান করার যে সংস্কৃতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। গির্জার খবরদারি ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। তারা প্রাচ্যের ঐশ্বর্যকে কতিপয় নৃপতি ও সম্রাটদের দালালদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করল। তারা প্রাচ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি যা-কিছু পেল সব আঁজলা ভরে নিয়ে গেল। ফলে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে স্থানান্তরিত হয়ে গেল

---

[৩৪৪]. আল-কামিল আল-আইয়ুবি (আল-মালিক আল-কামিল নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আল-আদিল সাইফুদ্দিন আহমাদ (৫৭৬-৬৩৫ হি./১১৭৭-১২৩৮ খ্রি.) ছিলেন মিশরের চতুর্থ আইয়ুবীয় সুলতান। পঞ্চম ক্রুসেডে তিনি খ্রিষ্টানদের পরাজিত করেন।-অনুবাদক।

[৩৪৫]. কাইসার আত-তাআসিফ নামে পরিচিত। ১১৭৮ সালে মিশরের আসফুনে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১২৫১ সালে দামেশকে। গণিতজ্ঞ ও প্রকৌশলী হওয়ার পাশাপাশি তিনি সংগীতবিদ্যাও অর্জন করেন।-অনুবাদক।

[৩৪৬]. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আর-রবিয়ি, *আসারুশ শারকিল ইসলামি ফিল-ফিকরিল উরুব্বি খিলালাল হুরুবিস সলিবিয়্যা*, পৃ. ৯৮।

নানাবিধ শিল্পসামগ্রী, উদ্ভিদ, ওষুধ, রঞ্জক পদার্থ, স্থাপত্যশিল্প, প্রকৌশলবিদ্যা, দুর্গনির্মাণকৌশল এবং আরও অনেক কিছু। তা ছাড়া পোশাক-আশাক, পানাহার, পারিবারিক শিষ্টাচার ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিমদের কিছু ঐতিহ্যও পাশ্চাত্যে গেল। ক্রুসেডাররা বজ্রাহতের মতো অন্তরে অগ্নিশিখা নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল। তারা এখন তাদের শোচনীয় অবস্থা ও চিন্তার গলদ সম্পর্কে সচেতন, তাদের সমাজের ভ্রান্তি সম্পর্কে সজাগ। ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান অন্বেষণে ব্রতী হলো, সামাজিক সংস্কার চাইল, চিন্তার ও শিল্পের এবং নীতিনৈতিকতার অগ্রগতি প্রত্যাশা করল।[৩৪৭]

গুস্তাভ লি বোঁ বলেন, পাশ্চাত্যকে সভ্য ও সংস্কৃতিমান করে তোলার ক্ষেত্রে প্রাচ্যের বিশাল অবদান রয়েছে। এটা ঘটেছে ক্রুসেড যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই প্রভাব শিল্প, কারিগরি ও ব্যবসাবাণিজ্যে যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ধারাবাহিক যোগাযোগ ও আনাগোনার ফলে বাণিজ্যিক সম্পর্কের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার দিকে যদি তাকাই এবং ক্রুসেডারদের ও প্রাচ্যের জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে শিল্পে ও মননশীল বিষয়াবলিতে যে বিকাশ সাধিত হয়েছে তার দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় যে, প্রাচ্যের জনমণ্ডলীই পাশ্চাত্যকে বর্বরতা ও অসভ্যতা থেকে বের করে এনেছে। শুধু তা-ই নয়, আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের বদান্যতায় অগ্রগতি ও উন্নতির প্রতি তাদের মনের জমিনকে প্রস্তুত করেছে। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এসবের ফলে ইউরোপে একদিন পুনর্জাগরণ ঘটে।[৩৪৮]

---

৩৪৭. তাওফিক ইউসুফ আল-ওয়ায়ি, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা মুকারানাতান বিল-হাদারাতিল গারবিয়্যা*, খ. ১, পৃ. ৫৩১-৫৩২।

৩৪৮. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৩৩৯।
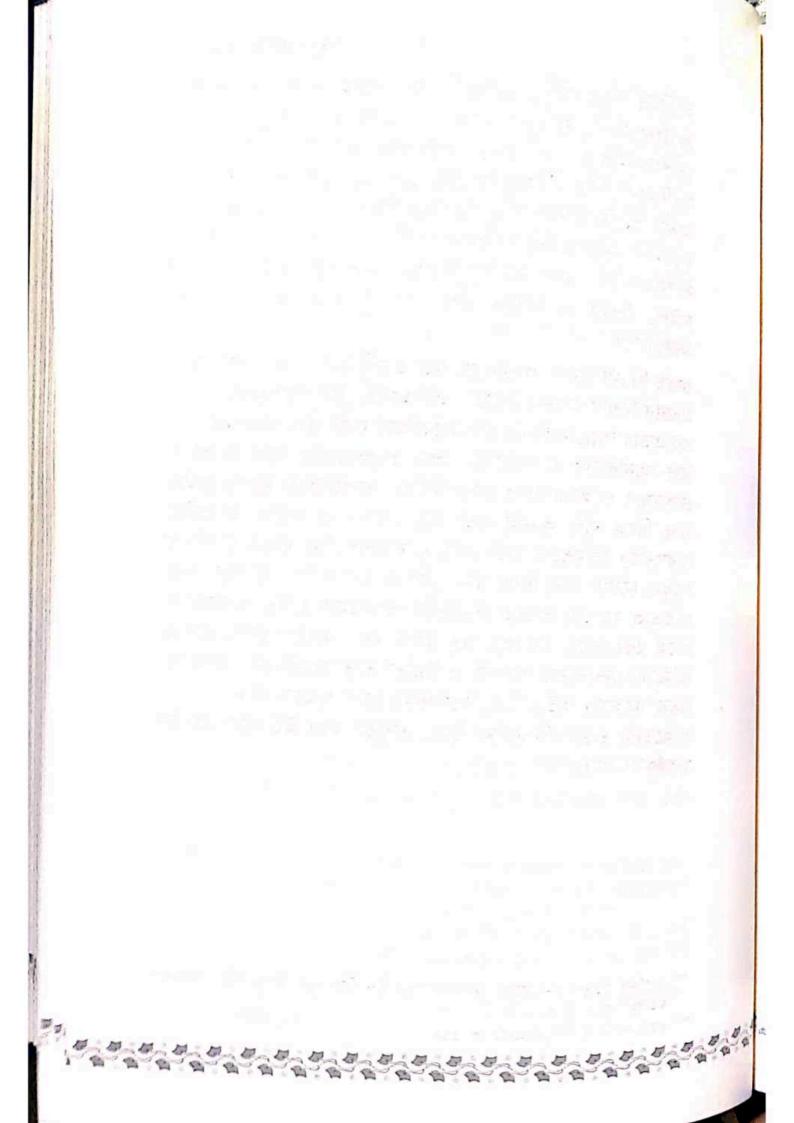
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব : কিছু নিদর্শন

সভ্যতার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা এই যে, প্রত্যেক সভ্যতার ভিত্তি তার পূর্ববর্তী সভ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কোনো সভ্যতা নেই যা শূন্য থেকে শুরু হয়েছে। তেমনই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পথচলায়ও ইসলামের অবদান রয়েছে। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে ইসলামি সভ্যতার পরে। ইউরোপের বহু ক্ষেত্রে ও বহু দিকে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান, এমনকি ইউরোপীয় জনমানুষের জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বব্যবস্থায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব রয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও চিন্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, আইনকানুন, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি ও এরূপ অন্যান্য বিষয় এগিয়ে রয়েছে।

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে ইসলামি সভ্যতার এসব অবদান ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : বিশ্বাস ও আইনের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জ্ঞানবিজ্ঞানে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : শিষ্টাচার ও আচরণে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : শিল্পকলায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিশ্বাস ও আইনের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

ইসলাম যে সমাজ ও বিশ্বের মাঝে তাওহিদের বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল তা শিরক ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইসলাম তাওহিদ বা একত্ববাদকে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠা করে। একে শিরক ও ত্রুটি থেকে পবিত্র করে। মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে সেগুলোর উপাসনা থেকে মুক্ত করে। মানুষ ও আল্লাহর মাঝে কোনো মধ্যস্থতা বা পৌরহিত্য স্থির করে না...। এরপর গোটা বিশ্বের, বিশেষ করে পুনর্জাগরণকালে ইউরোপীয় সভ্যতার এই বিশুদ্ধ আকিদার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাই প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মীয় ব্যবস্থায় শিরক বা পৌত্তলিকতার যেসব উপাদান ছিল, মূর্তিপূজার যেসব আচার ও প্রথা ছিল সেগুলোর যৌক্তিকতা তুলে ধরতে লাগল, মুখরোচক নানা কথা বলতে লাগল এবং এগুলোর ব্যাপারে ইসলামি তাওহিদ-আশ্রয়ী বা এ ধরনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল।[৩৪৯]

ড. আহমাদ আমিন বলেন, খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এমন কিছু প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছিল যেগুলোতে ইসলামের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে/হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ফ্রান্সের সেপ্টিমানিয়ায় (Septimanie)[৩৫০] যে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল তার মূল আহ্বান ছিল পুরোহিতদের সামনে অপরাধের স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না এবং এ ধরনের স্বীকৃতি গ্রহণের অধিকার নেই পুরোহিতদের। মানুষ যে ভুল ও পাপ করে তার ক্ষমা ও মার্জনার জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে নত হবে। ইসলামে পুরোহিত, যাজক ও পাদরি নেই, তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পাপস্বীকার বলতে কিছু নেই।

---

৩৪৯. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ১০৫।

৩৫০. বর্তমানে দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি ঐতিহাসিক এলাকা। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত।

একইভাবে আরেকটি আন্দোলন দানা বাঁধে যার মূলকথা ছিল ধর্মীয় চিত্র ও মূর্তি বিচূর্ণ করা (Iconoclasm বা প্রতিমাবিচূর্ণবাদ)। এসব আন্দোলন ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। খ্রিষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরেকটি খ্রিষ্টধর্মীয় মতবাদের উত্থান ঘটে, যা চিত্র ও মূর্তির পবিত্রায়ণকে অস্বীকার করে। রোমান সম্রাট তৃতীয় লিয়োঁ (Leo III)[৩৫১] ১০৮ হিজরিতে/৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফরমান জারি করেন, তাতে তিনি চিত্র ও মূর্তির পবিত্রায়ণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১২ হিজরিতে/৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আরেকটি ফরমান জারি করেন, এতে তিনি একে মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিকতা বলে আখ্যায়িত করেন। বাইজান্টাইনীয় সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইন (৭১৮-৭৭৫ খ্রি.) ও তার পুত্র চতুর্থ লিয়োঁ দা খাজারও একই কাজ করেন।

খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আরও একটি দলের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা ত্রিত্ববাদের তাওহিদ-সংলগ্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিল এবং ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালামের দেবত্ব বা ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করেছিল।[৩৫২]

যে-কেউ ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাস ও খ্রিষ্টানদের গির্জার ইতিহাস পড়লে বুঝতে পারবে যে, উৎপীড়ক বিশপীয় শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের ও সংশোধনবাদীদের আন্দোলনে ইসলামের বৌদ্ধিক প্রভাব কী পরিমাণ ছিল। মার্টিন লুথার কিংয়ের যে ব্যাপক সংস্কারমূলক আন্দোলন তা ছিল—তার কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও—ইসলাম ও ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিকেরা এটা স্বীকার করেছেন।[৩৫৩]

ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস অসংখ্য অমুসলিমের বিশ্বাসে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বহু চিন্তা ও ধারণাকে সংশোধন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যেগুলো কালের পরিক্রমায় পৃথিবীর সব ভূখণ্ডে বিকৃত হয়ে পড়েছিল।

---

৩৫১. বাইজান্টাইনীয় সম্রাট (৭১৭-৭৪১ খ্রি.) এবং রোমের পোপ।

৩৫২. ড. আহমাদ আমিন, *দুহাল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৩৮১-৩৮২।

৩৫৩. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ১০৬।

আইন ও বিধানের ক্ষেত্রে প্রভাব

আন্দালুস ও অন্যান্য এলাকায় ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে আসে। ইসলামের ফিকহি ও শরয়ি বিধানগুলোর একটি বৃহৎ অংশ তাদের সব ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে তা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ইউরোপ সেই সময় কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থার ওপর ছিল না, ইনসাফপূর্ণ আইনকানুনও তাদের ছিল না। মিশরে নেপোলিয়নের যুদ্ধ[৩৫৪] চলাকালে মালিকি ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। প্রথমদিকে যে গ্রন্থগুলো অনূদিত হয় তার মধ্যে ছিল *কিতাবুল খলিল ফিল-ফিকহিল মালিকি*। এই গ্রন্থ ছিল ফরাসি নাগরিক আইনের (নাগরিকের অধিকার-সংক্রান্ত আইন বা সিভিল ল) বীজ। ফরাসি নাগরিক আইন অনেকাংশেই ছিল মালিকি ফিকহের বিধানাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৩৫৫]

মনীষী লুইস সিডিও (Louis Sédillot)[৩৫৬] বলেন, মালিকি মাযহাবই বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যেহেতু ইফ্রিকীয় আরবদের সঙ্গে আমাদের জোরালো সম্পর্ক ছিল। ফরাসি সরকার ড. নিকোলাস পেরনকে (Dr. Nicolas Perron 1798-1876) খলিল ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াকুব আল-জুনদি রহ.[৩৫৭] কর্তৃক রচিত *আল-মুখতাসার ফিল-ফিকহ* গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করার দায়িত্ব দেন।[৩৫৮]

---

৩৫৪. ফরাসি সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৯৮ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মিশরে ও সিরিয়ায় ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষার্থে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ তিন বছর (১৭৯৮-১৮০১ খ্রি.) স্থায়ী হয়।-অনুবাদক।

৩৫৫. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০৭।

৩৫৬. লুইস সিডিও (Louis-Pierre-Eugène Sédillot, ১২২৩-১২৯২ হি./১৮০৮-১৮৭৫ খ্রি.) ছিলেন একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিক। তার অন্যতম কীর্তি হলো মরোক্কান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ভূগোলবিদ ও সূর্যঘড়িনির্মাতা আলি আল-মারাকেশি (মৃ. ৬৬০ হি./১২৬২ খ্রি.) কর্তৃক রচিত *জামিউল মাবাদিয়ি ওয়াল গায়াত ফি ইলমিল মিকাত* গ্রন্থের অনুবাদ। এটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তার পিতা জে জে সিডিও (Jean Jacques Emmanuel Sédillot)।

৩৫৭. সিদি খলিল নামে পরিচিত, মৃ. ৭৭৬ হি./১৩৭৪ খ্রি.। মিশরীয় ফকিহ। মিশরে মালিকি ঘরানার ফাতওয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন। সবসময় সৈনিকের পোশাক পরে থাকতেন বলে আল-জুনদি বলা হয় তাকে।

৩৫৮. লুইস সিডিও, Histoire des Arabes (1854), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল-আরাবিল-আম*, অনুবাদক : আদিল যুআইতার, পৃ. ৩৯৫।

ইউরোপের আইনকানুনেও ইসলামি সভ্যতার অংশগ্রহণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েলস[৩৫৯] তার *দি আউটলাইন অব হিস্ট্রি* গ্রন্থে বলেছেন, ইউরোপ তার প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক নীতিমালার একটি বড় পর্যায়েই ইসলামের একটি শহর।[৩৬০]

চিত্র নং-৩৩
সিডিওর গ্রন্থের প্রচ্ছদ

৩৫৯. হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস (Herbert George Wells 1866-1946) ছিলেন ইংরেজ সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক। তিনি তার কল্পবৈজ্ঞানিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্য সমধিক পরিচিত হলেও ইতিহাস, রাজনীতি ও সামাজিক বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। জুল ভার্নের সঙ্গে তাকেও 'কল্পবিজ্ঞানের জনক' আখ্যা দেওয়া হয়। ওয়েলস শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধকেই সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে তার রচনা বিশেষভাবে রাজনৈতিক ও নীতিবাদী চরিত্র লাভ করে। তার লেখক জীবনের মধ্যপর্বের (১৯০০-১৯২০ খ্রি.) রচনাগুলোর মধ্যে কল্পবিজ্ঞানের উপাদান কম। এই পর্বের রচনাগুলোর মধ্যে বিধৃত হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন (*দা হিস্ট্রি অব মি. পলি*), নব্য নারীসমাজ ও নারী ভোটাধিকার (*আন ভেরোনিকা*)।

৩৬০. মুহাম্মাদ উসমান উসমান, *মুহাম্মাদ ফিল আদাবিল আলামিয়্যাতিল মুনসিফা*, পৃ. ৭৬ থেকে উদ্ধৃত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জ্ঞানবিজ্ঞানে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই মুসলিমদের প্রভাব ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতায় চিকিৎসা, ওষুধবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, চক্ষুবিজ্ঞান, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই প্রভাবের নিদর্শন বিদ্যমান। বহু পশ্চিমা বস্তুনিষ্ঠ লেখকই স্বীকার করে নিয়েছেন যে মুসলিমরা ছয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউরোপের শিক্ষাগুরু ছিল!

ইসলামি সভ্যতার প্রভাবের একটি সাধারণ চিত্র ছিল এই যে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের গ্রন্থাবলি একাধিকবার অনুবাদ করা হয় এবং জ্ঞানের মৌলিক উৎস হিসেবে সেগুলোর ওপর নির্ভর করা হয়। কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব অনূদিত গ্রন্থ জ্ঞানের ভিত হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেই সময় (মধ্যযুগে) ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান উৎকর্ষের চূড়া স্পর্শ করেছিল। অথচ তখন গির্জার পক্ষ থেকে চিকিৎসাগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। কারণ তাদের কাছে অসুস্থতা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি! এরপর তারা ইবনে সিনা, আল-রাযি প্রমুখের গ্রন্থাবলি অনুবাদের পর চিকিৎসা ও আরোগ্যলাভ সম্পর্কে জানতে পারে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে ইবনে সিনার চিকিৎসা-বিষয়ক মহাগ্রন্থ *আল-কানুন*-এর অনুবাদ হয়। কয়েকবারই এটি মুদ্রিত হয়। ফ্রান্স ও ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান উৎস ছিল *আল-কানুন*।[৩৬১]

ইউনেস্কো *কুরিয়ার* (*UNESCO Courier*) সাময়িকী ১৯৮০ সালে উল্লেখ করেছে যে, ইবনে সিনার চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ '*কিতাবুল কানুন*' ১৯০৯ সাল পর্যন্তও ইউনিভার্সিটি অব ব্রাসেলসে (Université libre de Bruxelles) পাঠ্য ছিল। এই প্রবন্ধের টীকায় লেখক ও চিকিৎসক স্যার

---

৩৬১. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৪১০।

উইলিয়াম অসলারের[৩৬২] একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, *আল-কানুন* চিকিৎসাবিজ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসেবে অন্য যেকোনো গ্রন্থের চেয়ে দীর্ঘকাল পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছরে *আল-কানুন*-এর মোট পনেরোটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। অসলার আরও বলেন, ইবনে সিনা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের সক্ষম করে তুলেছিলেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা করতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কার্যকরভাবেই শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে তা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।[৩৬৩]

'আল-কানুন'-এর মতো আরও অনূদিত হয় আল-রাযির *'আল-হাবি'* ও *'আল-মানসুরি'*। এটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের ঘটনা। তার অবদানের স্বীকারোক্তি ও তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বড় বিভাগের নামকরণ করা হয় আল-রাযি নামে।

আবু রাইহান আল-বিরুনির বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) নিয়ে যে গবেষণা তাও পশ্চিমা সভ্যতার বিজ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বায়ুর ওজন ও ঘনত্ব এবং বায়ুসৃষ্ট চাপ সম্পর্কিত গবেষণায় ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী টরিসেলির তুলনায় আল-খাযিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক চাবিস্বরূপ। আল-খাযিনি একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যার দ্বারা বায়ুতে ও পানিতে বস্তুর ওজন পরিমাপ করা যেত। ইউরোপ মধ্যযুগ পর্যন্ত আল-খাযিনির আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে, তারা বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব, বায়ুর ওজন, উত্তোলন-যন্ত্র, মহাকর্ষ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মুসলিমদের সূক্ষ্ম পরিমাপের সাহায্য গ্রহণ করে।

আল-খাযিনি কর্তৃক রচিত *'মিযানুল হিকমা'* গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং তা থেকে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা প্রভূত উপকার লাভ করেন।

---

৩৬২. স্যার উইলিয়াম অসলার (Sir William Osler, 1st Baronet, 1849-1919) ছিলেন কানাডিয়ান চিকিৎসক, জন হপকিন্স হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর। তাকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক আখ্যায়িত করা হয়। চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি সংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চাও করেছেন।

৩৬৩. *ইউনেস্কো কুরিয়ার*, অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৮০ খ্রি.।

জাবির ইবনে হাইয়ান, হাসান ইবনুল হাইসাম, আল-খাওয়ারিজমির গ্রন্থাবলিও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং কয়েক শতাব্দীব্যাপী তাদের জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিরাজমান থাকে।
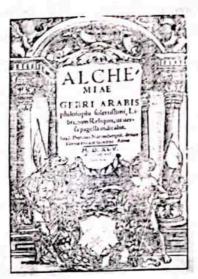
চিত্র নং-৩৪
জাবের ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ

প্রাচ্যবিদ লুইস সিডিও বলেন, শুরুর দিকে আরব থেকে লাতিন কী গ্রহণ করেছে তা অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি যে, গার্বার্ট (Gerbert of Aurillac), যিনি দ্বিতীয় সিলভেস্টার (Pope Sylvester II) নামে পোপ হন, আন্দালুসে যে গণিতবিদ্যা শিখেছিলেন তা ৩৫৯ হি./৯৭০ খ্রি. থেকে ৩৬৯ হি./৯৮০ খ্রি. সালের মধ্যে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেন; অ্যাডেলার্ড অব বাথ ৪৯৩ হি./১১০০ খ্রি. থেকে ৫২২ হি./১১২৮ খ্রি. সালের মধ্যে আন্দালুস ও মিশর ভ্রমণ করেন এবং আরবি থেকে অনুবাদ করেন ইউক্লিডের এলিমেন্টস, এই গ্রন্থ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কোনো ধারণাই ছিল না; প্লেটো তিবুরটিনাস (Plato Tiburtinus) আরবি থেকে অনুবাদ করেন থিওডোসিয়াস (Theodosius of Bithynia) কর্তৃক রচিত *আল-উকার* (Sphaerics সিরিজ) গ্রন্থের; রুডলফ অব ব্রাজেস (Rudolf of Bruges) আরবি থেকে অনুবাদ করেন *আল-জুগরাফিয়া ফিল-মামুর মিনাল-আরদ* (Ptolemy's Geographia টলেমির জিয়োগ্রাফি) গ্রন্থের; লিওনার্দো অব পিসা ৫৯৬ হি./১২০০ খ্রি. সালের মধ্যে আলজেব্রার ওপর পুস্তিকা রচনা করেন, যা তিনি আরবদের থেকে শিখেছিলেন; ক্যাম্পানুস অব নোভারা (Campanus of Novara)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবি থেকে অনুবাদ করেন ইউক্লিডের গ্রন্থের, ভালো অনুবাদের পাশাপাশি তিনি ব্যাখ্যাও দেন; গেতলিওন অফ বলঙ্গা (Getlion of Bolonga) ওই শতাব্দীতেই হাসান ইবনুল হাইসামের চক্ষুবিজ্ঞানের ওপর লিখিত *'আল-বাসারিয়্যাত'* গ্রন্থের অনুবাদ করেন; জেরার্ড অব ক্রেমোনা ওই শতাব্দীতে আরবি থেকে টলেমির *আল-মাজেস্টের* (*Almagest*), জাবির ইবনে হাইয়ানের আশ-শারহ... ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ করে বিশুদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটান। ৬৪৮ হি./১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাস্টাইলের রাজা আলফোনসো তার নামাঙ্কিত তারকা-সারণি প্রকাশের নির্দেশ দেন। সম্রাট প্রথম রজার সিসিলিতে আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন, বিশেষ করে তিনি ইদরিসির গ্রন্থরচনার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকও আরবীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যাপারে কম উৎসাহ দেননি। ইবনে রুশদের পুত্ররা এই সম্রাটের রাজদরবারে অবস্থান করতেন, তারা তাকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রকৃতি-ইতিহাস শিখিয়েছিলেন।[৩৬৪]

সিডিওর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলিমরা ইউরোপীয়দের জন্য কেবল তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানই হস্তান্তর করেননি, বরং ইউরোপীয়দের তাদের গ্রিক পূর্বপুরুষদের সঙ্গে পরিচয় লাভের ক্ষেত্রেও তারা জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন, যারা ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনই ছিল ইসলামি সভ্যতার অবদান।

ইউরোপে ইসলামি শিল্প কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। অবশ্য এ বিষয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাগজশিল্পে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, তারা সেই সময় এই শিল্পকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কাগজশিল্পের বিকাশ না ঘটলে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সামনে এগোত না, লিপিবদ্ধকরণের যে আন্দোলন তাও উদ্যম পেত না এবং ইউরোপও সভ্য হতে পারত না।

মুসলিমরা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের দিকে চীনের একদল বন্দিকে সমরকন্দে নিয়ে যান। এসব বন্দিদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যারা

---

৩৬৪. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪২ থেকে উদ্ধৃত।

কাগজ ভালো বানাতে পারত। তাদের হাত ধরেই কাগজশিল্পের সূচনা ঘটে। সমরকন্দে কাগজশিল্প বিকশিত হয় এবং এতে আরও বেশি সুন্দর ও সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। কাগজশিল্পের মৌলিক উপাদান হয়ে ওঠে কটন ও লিলেন। ফলে ফাইন পেপারের (Fine paper) উদ্ভব ঘটে, কাগজের মধ্যে এটিই উৎকৃষ্ট। তখন প্যাপিরাস[৩৬৫] ছিল অত্যন্ত দামি, তাই নতুন কাগজ কিনতে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনকি আব্বাসি খলিফা আল-মানসুর–যিনি সঞ্চয়প্রবণতা ও মিতব্যয়িতাপ্রীতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন–তার গোটা রাজ্যে প্যাপিরাস ব্যবহার না করতে নির্দেশ দিলেন এবং সাধারণ কাগজ সস্তা হওয়ার কারণে কাগজের ব্যবহার এতেই সীমাবদ্ধ রাখতে বললেন।[৩৬৬]

চিত্র নং-৩৫

'শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব' গ্রন্থের প্রচ্ছদ

---

৩৬৫. মিশরীয় সভ্যতায় নীলনদের তীরে নলখাগড়া জাতীয় গাছ পাওয়া যেত। সেই গাছ কেটে প্রাপ্ত খোলকে পাথরচাপা দিয়ে রোদে শুকানো হতো। ফলে খোলগুলো শুকিয়ে যেত এবং পাথরের চাপে সোজা হয়ে লেখার উপযোগী হতো। পরে আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে রোল আকারে সংরক্ষণ করা হতো। এভাবে তৈরি প্রাচীন লেখার উপযোগী মাধ্যমকে প্যাপিরাস বলা হয়। বর্ণমালা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মিশরীয়দের যেমন বিশেষ অবদান ছিল, তেমনই তারা আবিষ্কার করেছিলেন লেখার উপযোগী এই চমৎকার উপাদানটি।

৩৬৬. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪৬; হানি আল-মুবারাক ও শাওকি আবু খলিল, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা ফিন-নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৫৭।

খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে বাগদাদে কাগজকলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারপর দামেশক ও ত্রিপোলিতে কাগজকল চালু হয়। তারপর শুরু হয় ফিলিস্তিন ও মিশরে। কাগজশিল্প পৌঁছে যায় মরক্কোতে, সেখান থেকে পৌঁছে সিসিলিতে ও আন্দালুসে। তারপর ইউরোপ এই শিল্প সম্পর্কে জানতে পারে। বাস্তবিক অর্থেই এই শিল্প-সংস্কৃতি ও আত্মিক জীবনের একটি স্তম্ভ। এরই মধ্য দিয়ে মুসলিমরা এমন একটি যুগের সূচনা করেছিলেন যেখানে জ্ঞান মানুষের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সমাজের সকলের জন্য মশাল হয়ে উঠেছিল এবং বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে ও চিন্তাভাবনা করতে আহ্বান জানিয়েছিল। যেমন বলেছেন সিগরিড হুংকে।[৩৬৭]

পর্যটক, দর্শনার্থী, তীর্থযাত্রী, বণিকদল, বিদ্যার্থীরা তাদের ইউরোপের দেশগুলো থেকে বার্সেলোনা ও ভ্যালেন্সিয়ায় আসত। এখানে উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি হতো। ইদরিসি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এই কাগজ নিয়ে দেশে ফিরে যেত। পৃথিবীর কোথাও এই কাগজের তুলনা ছিল না।[৩৬৮]

সিগরিড হুংকে বলেছেন, কাগজের কল তৈরি করার দক্ষতা আরবদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা নিজেরাই এই দক্ষতা অর্জন করেছিল। সব ধরনের পানির ও বাতাসের কল দিয়ে তারা ইউরোপকে সাহায্য করেছিল।[৩৬৯]

কাগজশিল্প কেবল নয়, মুসলিমরা কম্পাসও আবিষ্কার করেছেন। কোনো কোনো ইউরোপীয় কম্পাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন ইতালীয় নাবিক ফ্ল্যাভিও জোয়া (Flavio Gioia)-কে। কিন্তু সিডরিড হুংকে এই মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এই ইতালীয় নাবিক মুসলিম আরবদের কাছে এই যন্ত্রের বিদ্যা শিখেছেন।[৩৭০]

গবেষকরা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, আরবরাই কি প্রথম কম্পাস ব্যবহার করেছেন, নাকি তারা চীন থেকে তা নিয়েছেন... লুইস

---

৩৬৭. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪৬।
৩৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
৩৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
৩৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

সিডিও চীনাদের পিক্সিস (Pyxis)[৩৭১] ব্যবহারের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। যদিও তারা ১৮৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বাস করত যে ভূ-গোলকে দক্ষিণতম বিন্দু বা দক্ষিণ মেরু জ্বলজ্বল করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আরবরাই প্রথম কম্পাস ব্যবহার করে। জর্জ সার্টনও তার বক্তব্যে সিডিওকে সমর্থন করেছেন। আরবরাই প্রথম কম্পাস ব্যবহার করেছে ও ইউরোপীয়রা আরবদের থেকে পিক্সিসের ব্যবহার শিখেছে বলে সবাই জোরালো মত প্রকাশ করেছেন।[৩৭২] কম্পাস যে ইউরোপীয়দের জীবনে ব্যাপক অবদান রেখেছিল তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

---

৩৭১. দক্ষিণ আকাশের একটি ছোট ও অনুজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডল। পিক্সিস হলো পিক্সিস নটিকার (Pyxis Nautica) সংক্ষিপ্তরূপ। নাবিকদের কম্পাসের লাতিন নাম এটি।

৩৭২. আনওয়ার রিফায়ি, *আল-ইনসানুল আরাবি ওয়াল-হাদারাতি*, পৃ. ৪৮৭।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

ইউরোপীয়রা–বিশেষ করে স্পেনের কবিরা–আরবি সাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আরবি সাহিত্যের বীরত্বগাথা, রূপকথা, উচ্চমার্গীয় অলংকারপূর্ণ চিত্রকল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। আন্দালুসে আরবি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি ঘটেছে প্রকটভাবে। প্রখ্যাত স্প্যানিশ লেখক ভিসেন্ট ব্লাসকো ইবনেজ (Vicente Blasco Ibáñez) বলেন, আরবদের আন্দালুসে আগমন এবং দক্ষিণের অঞ্চলগুলোতে তাদের দুঃসাহসী সেনাপতি ও বীরযোদ্ধাদের ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত ইউরোপ বীরত্ব সম্পর্কে কিছুই জানত না, এ সংক্রান্ত অপরিহার্য সাহিত্যজ্ঞানের খোঁজও তাদের ছিল না এবং সাহসিকতাপূর্ণ সম্মানবোধের আচরণও তাদের জানা ছিল না।[৩৭৩]

ইবনে হায্‌ম আন্দালুসি ও তার বিখ্যাত গ্রন্থ *তাওকুল হামামাহ ফিল-উলফাতি ওয়াল-উল্লাফ*-এর ব্যাপক প্রভাব ছিল স্পেনের ও দক্ষিণ ফ্রান্সের কবিদের ওপর। খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে এটা ঘটেছিল। আরবি হয়ে উঠেছিল আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চল ও অভিজাত শ্রেণির ভাষা। স্পেনের খ্রিষ্টান আমির-শাসিত এলাকাগুলোতে আমিরের দরবারে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী কবিদের সঙ্গে মুসলিম কবিরা একত্র হতেন। যেমন স্যাঞ্চোর[৩৭৪] রাজদরবারে উভয় ধর্মের কবিদের সম্মিলন ঘটত। তিনি তার দরবারে তেরোজন আরব মুসলিম কবি এবং বারোজন খ্রিষ্টান ও একজন ইহুদি কবি জড়ো করেছিলেন। ক্যাস্টাইলের রাজা দশম আলফোনসোর (তার পিতার) সময়ের একটি পাণ্ডুলিপিও তিনি অনুসন্ধান

৩৭৩. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪২।

৩৭৪. স্যাঞ্চো (Sancho IV of Castile) ছিলেন দশম আলফোনসো ও ইওলান্দার পুত্র এবং তাকে এল ব্রাভো নামে ডাকা হতো। তিনি ১২৮৪ সাল থেকে আমৃত্যু ক্যাস্টাইল, লিয়োঁ ও গ্যালিসিয়া শাসন করেন।-অনুবাদক।

করে উদ্ধার করেন। এই পাণ্ডুলিপিতে একটি তালিকাও পাওয়া যায়, যেখানে দুজন ভ্রাম্যমাণ কবির কথা বলা হয়েছে। এই কবিরা তার দরবারে একত্র হতেন এবং একসঙ্গে উদ[৩৭৫] বাজিয়ে গান গাইতেন। তাদের একজন ছিলেন আরব, আরেকজন ছিলেন ইউরোপীয়। আরও বিস্ময়কর হলো, সে সময়ের ইউরোপীয় কবিরা আরবি কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। এ কারণেই হেনরি মারো[৩৭৬] বলেছেন, রোমান জাতিগুলোর সভ্যতার ওপর আরবদের প্রভাব কেবল নন্দনতাত্ত্বিক বিষয়ে বা শিল্পকলায় সীমাবদ্ধ নয়, এসব ক্ষেত্রে যেমন তাদের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে তেমনই সংগীত ও কবিতাতেও প্রভাব রয়েছে।[৩৭৭]

ডোজি[৩৭৮] তার ইসলাম-বিষয়ক গ্রন্থে[৩৭৯] স্প্যানিশ লেখক আলভ্যারোর (Álvaro) পুস্তিকা থেকে যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে পশ্চিমা কবি-সাহিত্যিকেরা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা সে যুগে কী পরিমাণ প্রভাবিত হয়েছিলেন তা ভালোভাবেই বোঝা যায়। মানুষের মধ্যে লাতিন ও গ্রিক ভাষার প্রতি অবহেলা এবং মুসলিমদের ভাষার প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহ দেখে আলভ্যারো তীব্র মনস্তাপে প্রায় রোদন করে উঠেছেন, তিনি বলেছেন, আরবি সাহিত্যের গুঞ্জরণ বিচক্ষণ ও রুচিশীল ব্যক্তিদের জাদুগ্রস্ত করে ফেলেছে, ফলে তারা লাতিন ভাষাকে হেয়জ্ঞান করেছে এবং তাদের দখলদারদের ভাষায় লিখতে শুরু করেছে। ব্যাপারটি তার সামসময়িক বলে তার জন্য আরও বেশি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। তিনি স্বাজাত্যবোধের অহমিকায় যতটা গর্বিত ছিলেন তার সমকালীন লোকেরা তা ছিল না। তাই তিনি তিক্ত আফসোসে ভেঙে পড়েছেন। বলেছেন, আমার খ্রিষ্টধর্মীয় ভাইয়েরা আরবদের কবিতায় ও গল্পে মুগ্ধ-বিহ্বল হয়ে পড়ছে, তারা মুসলিম ফকিহ ও দার্শনিকদের লিখিত রচনারাশি

---

৩৭৫. উদ (oud /عود) : ছোট ঘাড়ের বীণাজাতীয় নাশপাতি-আকৃতির বাদ্যযন্ত্র।-অনুবাদক।

৩৭৬. হেনরি-ইরেনি মারো (Henri-Irénée Marrou 1904-1977) একজন ফরাসি ঐতিহাসিক ও খ্রিষ্টান মানবতাবাদী ভাবধারার চিন্তাবিদ। তার কাজের মূল ক্ষেত্র ছিল প্রাচীন কালের নিদর্শন এবং শিক্ষার ইতিহাস।-অনুবাদক।

৩৭৭. আহমদ দারবিশ, *নাযরিয়্যাতুল আদাবিল মুকারান ওয়া তাজাল্লিয়্যাতুহা ফিল-আদাবিল আরাবি*, পৃ. ১৯৪-১৯৫।

৩৭৮. রেইনহার্ট ডোজি (Reinhart Pieter Anne Dozy 1820-1883) ফরাসি বংশোদ্ভূত ডাচ পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ। প্রোটেস্ট্যান খ্রিষ্টান ছিলেন। নেদারল্যান্ডের লেইডেনে জন্ম ও মৃত্যু। আরবি ভাষা, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

৩৭৯. Spanish Islam, *A History of the Moslems in Spain* (1913).-অনুবাদক।

গলাধঃকরণ করছে। তারা এই কাজ করছে সেগুলোকে অমূলক ও সস্তা প্রতিপন্ন করার জন্য নয়, বরং বিশুদ্ধ আরবীয় আঙ্গিক ও সাহিত্যরীতি গ্রহণের জন্য। আজ ধর্মীয় লোক ছাড়া আর মানুষেরা কোথায় যারা তাওরাত ও ইনজিলের ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলো পড়বে? তারা আজ কোথায় যারা ইনজিল ও নবী-রাসুলদের পুস্তিকাগুলো পাঠ করবে? ওহ, আফসোস! খ্রিষ্টানদের উঠতি মেধাবী প্রজন্ম আরবি ভাষা ও আরবি সাহিত্য ছাড়া কোনো ভাষা ও সাহিত্যই ভালোভাবে জানে না। তারা আরবদের গ্রন্থাবলি থেকে প্রেরণা লাভ করছে। প্রচুর দাম দিয়ে তাদের বই সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারগুলো বোঝাই করছে। সব জায়গায় তারা আরবি সাহিত্যভান্ডারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছে। অথচ তারা খ্রিষ্টধর্মীয় গ্রন্থাবলির নাম শুনলে সেদিকে ফিরেও তাকায় না, আগ্রহ তো দেখায়ই না। তারা জানিয়ে দিতে চায় যে খ্রিষ্টধর্মীয় গ্রন্থাবলি তাদের মনোযোগ পাওয়ার উপযুক্ত নয়। হায় আফসোস! খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজেদের ভাষা ভুলে গেছে। আজ তুমি তাদের মধ্যে প্রতি হাজারে একজনকেও পাবে না যে তার বন্ধুকে নিজেদের ভাষায় চিঠি লেখে। বরং আরবি ভাষাতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, আরবি ভাষার ঢং ও আঙ্গিক তারা চমৎকারভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। তারা আরবি ভাষায় এমন সব কবিতা রচনা করছে যা শোভায়, সৌষ্ঠবে এবং ভাবপ্রকাশে খোদ আরবদের কবিতা থেকেও উৎকৃষ্ট।[৩৮০]

ইউরোপীয় ভাষাগুলোর ওপর আরবি ভাষার প্রভাব সম্পর্কে ডিটার মেসনার[৩৮১] বলেন, আইবেরিয়ান উপদ্বীপে কথ্য ভাষাগুলোর ওপর আরবি ভাষার—যা অ্যারাবিয়ান সুপারস্টেট ও আরব অভিজাতদের ভাষা—প্রভাব ক্যাস্তিলিয়ান, পর্তুগিজ ও কাতালান ভাষাগুলোকে রোমান্স[৩৮২]

---

৩৮০. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪৩।

৩৮১. ডিটার মেসনার (Dieter Messner) ইউনিভার্সিটি অব সালজবার্গের (Universität Salzburg) রোমান্স ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

৩৮২. রোমান্স 'Romance' নামটি প্রাকৃত লাতিন ক্রিয়াবিশেষণ romanice থেকে এসেছে, যা ধ্রুপদি লাতিনের romanicus (রোমানিকুস) শব্দ থেকে বিবর্তিত। রোমান্স বা রোমান্টিক উপন্যাসে ব্যবহৃত রোমান্স শব্দটির উৎপত্তিও একই। মধ্যযুগে ইউরোপে গুরুগম্ভীর রচনা লিখিত হতো মূলত লাতিনে; সাধারণ জনপ্রিয় প্রেমকাহিনি ও অন্যান্য লঘু রচনা রচিত হতো স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় এবং এগুলোকে রোমান্স বলে অভিহিত করা হতো। রোমান্স ভাষাসমূহ (Romance languages) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের একটি শাখা। রোমান সাম্রাজ্যের ভাষা, লাতিন থেকে উদ্ভূত সব ভাষা এই ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত। এসব ভাষায়

ভাষাশ্রেণির মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থান দিয়েছে। আরবি ভাষার প্রভাব কেবল আইবেরিয়ান উপদ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এই উপদ্বীপের মধ্যস্থতার ফলে আরবির এসব প্রভাব ফরাসি ভাষার মতো অন্যান্য ভাষাতেও ছড়িয়ে পড়ে।[৩৮৩]

ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় জীবনের নানাদিক সম্পর্কে কী পরিমাণ আরবি শব্দ প্রবেশ করেছে তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অনেক শব্দ তার আরবি মূলরূপও ধরে রেখেছে। যেমন : কুত্‌ন (Cotton), আল-হারিরুদ দিমাশকি (Damask), মিস্‌ক (Musk), শারাব (Syrup), জার্‌রা (Jar), লাইমুন (Lemon), সিফ্‌র (Medieval Latin: cifra), এমন আরও অসংখ্য শব্দ। আমাদের জন্য এখানে অধ্যাপক ম্যাকেইলের মন্তব্য উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট, ইউরোপ তার উপন্যাস-সাহিত্যে আরবীয় দেশ ও সিরিয়ান-আরব নাজদে বসবাসকারী জাতি-গোষ্ঠীর কাছে ঋণী। বিশ্ব যে প্রেরণায় বুঁদ হয়েছিল তার থেকে ভিন্ন প্রেরণায় ও কল্পনায় ইউরোপীয় মধ্যযুগকে আলাদা করে দিয়েছিল (আরব থেকে প্রাপ্ত) কিছু উদ্দীপনামূলক শক্তি। ইউরোপ অনেকাংশে বা প্রধানত এসব শক্তির কাছে ঋণী।[৩৮৪]

ইউরোপীয় গল্প-সাহিত্য বিকাশকালে প্রভাবিত হয়েছে আরবদের মধ্যযুগীয় গল্পশিল্পের দ্বারা। মাকামাত[৩৮৫], বীরত্বগাথা, মর্যাদা ও প্রণয়ের পথে দুঃসাহসী ব্যক্তিদের ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ইত্যাদি ছিল আরবদের গল্পশিল্পের বিষয়। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় *আলফু লায়লা ওয়া লায়লা (আলিফ লায়লা)*-এর অনুবাদ তাদের গল্প-সাহিত্যে

উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও বিশ্বের বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষুদ্র অঞ্চলের প্রায় ৭০ কোটি মানুষ কথা বলে থাকে। রোমান্স ভাষাগুলো প্রাকৃত লাতিন ভাষা (Vulgar Latin) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। রোমান সাম্রাজ্যের সেনা, বণিক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকালয়ের মানুষেরা এই প্রাকৃত লাতিন ভাষায় কথা বলত। প্রাকৃত লাতিন ছিল ধ্রুপদি লাতিন থেকে বেশ আলাদা।-অনুবাদক।

৩৮৩. বিস্তারিত দেখুন, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সালমা খাদরা জাইয়ুশি (সম্পাদনা), অধ্যায় : اللغة والأدب (Language and Literature), অনুচ্ছেদ : مزيد من المفردات العربية وتصنيفاتها ف اللغات الرومانسية والأيبيرية (Further Listings and Categorisations of Arabic Words in Ibero-Romance), লেখক : ডিটার মেসনার, খ. ১, পৃ. ৬৫১।

৩৮৪. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪৪।

৩৮৫. কাব্য আকারে সাহিত্যমানসম্পন্ন কাল্পনিক গল্প।-সম্পাদক

বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। ওই সময় থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত ইউরোপীয় যাবতীয় ভাষায় আলিফ লায়লার তিন হাজারেরও বেশি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এমনকি কয়েকজন ইউরোপীয় সমালোচক মনে করেন যে, জোনাথন সুইফ্‌ট রচিত গালিভারের ভ্রমণকাহিনি[৩৮৬] এবং ড্যানিয়েল ডিফো রচিত রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত[৩৮৭] *আলিফ লায়লা* ও আরব দার্শনিক ইবনে তুফাইলের *হাই ইবনে ইয়াকযান* পুস্তকটির কাছে ঋণী।[৩৮৮]

বোক্কাচ্চো[৩৮৯] ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে *দেকামেরন*[৩৯০] নামে তার গল্পগুলো রচনা করেন। গল্পগুলো লেখা হয়েছে আলিফ লায়লার অনুকরণে। উইলিয়াম শেক্‌সপিয়রও *আলিফ লায়লা* থেকে তার *All's Well That Ends Well*

---

৩৮৬. জোনাথন সুইফ্‌ট রচিত যুগান্তকারী বক্তব্যপ্রধান কাহিনি। ইংরেজি ভাষায় লেখা এই কাহিনি ভ্রমণবৃত্তান্তের আদলে রচিত। ১৭২১ সাল থেকে ১৭২৬ সালের মধ্যে সুইফ্‌ট এই লেখা শেষ করেন বলে মনে করা হয়। ১৭২৬ সালের ২৮ অক্টোবর এই বই প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে এই ভ্রমণকাহিনি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। *Gulliver's Travels* মূলত বাজারে প্রচলিত ভ্রমণকাহিনিগুলোর প্যারডি বা ব্যঙ্গাত্মক রচনা। এর প্রতিটি অসম্ভব অভিযানের অন্তরালে প্রচলিত ভ্রমণকাহিনিগুলোর এক মর্মান্তিক ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।-অনুবাদক।

৩৮৭. *রবিনসন ক্রুসো (Robinson Crusoe)* ইংরেজ ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল ডিফো রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ এবং ওই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র। রচনাকাল ১৭১৯ সাল। স্কটল্যান্ডবাসী নাবিক আলেকজান্ডার সেলকার্কের (১৬৭৬-১৭২১ খ্রি.) দুঃসাহসিক অভিযান রবিনসন ক্রুসোর গল্পের উপাদান। রবিনসন ক্রুসো সমুদ্রযাত্রা করে জাহাজডুবিতে একটি নির্জন দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা অবলম্বন করে ডিফো তিন খণ্ডে *রবিনসন ক্রুসো* রচনা সমাপ্ত করেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের শক্তির জয় এই গ্রন্থের মূল বিষয়। এই বইয়ের অনুকরণে সুইজারল্যান্ডের লেখক জোহান রুডোল্‌ফ ভিস (Johann Rudolf Wyss) লেখেন তার বিখ্যাত বই *ডের শ্‌ভাইট্‌সেরিশে রোবিন্সন্‌*; মোট চার খণ্ডে রচিত এই বই *সুইস ফ্যামিলি রবিনসন* নামে ইংরেজি অনুবাদে পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। দুটি বই-ই বাংলাভাষায় অনূদিত ও বহুল পরিচিত।-অনুবাদক।

৩৮৮. জাক সি রিসলার (Jacques C. Risler), *LA CIVILISATION ARABE*, আরবি অনুবাদ, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাহ*, অনুবাদক : গানিম আবদুন, আরবি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২২৩।

৩৮৯. জিওভান্নি বোক্কাচ্চো (Giovanni Boccaccio 1313-1375) একজন ইতালীয় লেখক ও কবি। চতুর্দশ শতকের সফলতম ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের অন্যতম।-অনুবাদক।

৩৯০. *দেকামেরোন* (*The Decameron* বা *দশ দিনের অপেরা*) হলো চতুর্দশ শতকের জিওভান্নি বোক্কাচ্চোর লেখা একশটি গল্পের সংকলন। একে চতুর্দশ শতকে রচিত ইউরোপের প্রধান সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। বইটির গল্পগুলো বর্ণনা করে একদল তরুণ-তরুণী। এই সময়ে ফ্লোরেন্সে কালোমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তিনজন তরুণ ও সাতজন তরুণী কালোমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দশদিন শহরের বাইরে অবস্থান করে। সময় কাটানোর জন্য প্রত্যেক সদস্য প্রতিরাতে একটি করে গল্প বলে। এইভাবে দশদিনে গল্প বলে একশটি।-অনুবাদক।

নাটকের প্লট গ্রহণ করেন। একইভাবে জার্মান লেখক ও নাট্যকার লেসিং (Gotthold Ephraim Lessing) তার *Nathan der Weise* নাটকের ধারণা গ্রহণ করেন *আলিফ লায়লা* থেকে। বোক্কাচ্চোর যুগে যারা তার থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইংরেজি ভাষায় আধুনিক কাব্যের জনক জেফ্রি চসার। তিনি ইতালিতে গিয়ে বোক্কাচ্চোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পরপরই *দা ক্যান্টারবেরি টেইল্স*(৩৯১) নামে তিনি তার বিখ্যাত গল্পগুলো রচনা করেন।(৩৯২)

বহু সমালোচক জোর দিয়ে বলেছেন যে, দান্তে তার *ডিভাইন কমেডিতে*(৩৯৩) পরজগৎ ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তিনি আরবি সাহিত্যের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গ্রন্থ দুটির একটি হলো কবি ও দার্শনিক আবুল আলা মাআররি (৩৬৩-৪৫৯ হি./৮৭৩-১০৫৭ খ্রি.) রচিত *রিসালাতুল গুফরান* এবং অপরটি হলো কবি ও দার্শনিক ইবনুল আরাবি (৫৫৮-৬৩৮ হি./১১৬৪-১২৪০ খ্রি.) রচিত *ওয়াসফুল জান্নাহ*।

দান্তে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের শাসনকালে সিসিলিতে অবস্থান করছিলেন। ফ্রেডেরিক ছিলেন আরবি উৎসকে ভিত্তি করে ইসলামি সংস্কৃতি ও তার জ্ঞানচর্চার প্রতি উৎসাহী। অ্যারিস্টটলের মতবাদ নিয়ে

---

৩৯১. *দা ক্যান্টারবেরি টেইল্স (The Canterbury Tales)* ইংরেজি সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এর রচয়িতা চতুর্দশ শতাব্দীর জেফ্রি চসার (Geoffrey Chaucer, আনু. ১৩৪৫-১৪০০ খ্রি.) ছিলেন অসাধারণ গুণী মানুষ। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, অনুবাদক, পণ্ডিত, যোদ্ধা, রাষ্ট্রদূত। সরকারি কর্মচারী জেফ্রি চসার মাতৃভাষা ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি এবং লাতিন ভাষা খুব ভালো জানতেন। বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন স্বদেশ ও বিদেশের নানা স্তরের নানা চরিত্রের নানান মানুষের সঙ্গে। বাস্তবিক জীবনের এই ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা তার শ্রেষ্ঠ কাব্য ক্যান্টারবেরি টেইল্স-এ প্রতিফলিত হয়েছে।-অনুবাদক।

৩৯২. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪৪।

৩৯৩. *দা ডিভাইন কমেডি (The Divine Comedy)* ইতালীয় কবি দান্তে আলেগিয়েরি (Dante Alighieri 1265-1321) রচিত মহাকাব্য। কাব্যটির মূল নাম *দিভিনা কোমেদিয়া (Divina Commedia)*; ইংরেজি পাঠক মহলে *ডিভাইন কমেডি* নামেই পরিচিত। একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা দান্তে ছিলেন মধ্যযুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক। দান্তে ঠিক কবে *দা ডিভাইন কমেডি* লিখতে শুরু করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে ১৩২১ সালে মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি এ মহাকাব্য সমাপ্ত করেন। দান্তের বেশ কিছু রচনা আছে লাতিন ভাষায়; কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি *'দিভিনা কোমেদিয়া'* মহাকাব্যটি তিনি রচনা করেন তার মাতৃভাষা ইতালীয়তে।-অনুবাদক।

ফ্রেডেরিক ও দান্তের মাঝে একাধিকবার বিতর্ক হয়। তন্মধ্যে কিছু বিতর্কের উৎস ছিল আরবি রচনাবলি।[৩৯৪]

এ ছাড়া নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী সম্পর্কে দান্তের প্রচুর জানাশোনা ছিল। এ সূত্রে রাসুলের মিরাজ ও রাত্রিকালীন ভ্রমণ (আল-ইসরা) এবং আসমানের বিবরণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন।[৩৯৫] এ ব্যাপারে সিগরিড হুংকে বলেছেন, দান্তে ও ইবনুল আরাবির মধ্যে সামঞ্জস্য বেশ ভালোভাবেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইবনুল আরাবি থেকে তার উপমাগুলো প্রায় দুইশ বছর পর গ্রহণ করেছেন দান্তে।[৩৯৬]

ইতালি ও ফ্রান্সে যখন আরবীয় সংস্কৃতির যুগ, সেই সময়টা যাপন করেছিলেন কবি পেত্রার্কা[৩৯৭]। তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় (University of Montpellier) ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরবদের রচনাবলি ও আন্দালুসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাদের ছাত্রদের ওপর ভিত্তি করে।[৩৯৮] এই কারণে পেত্রার্কা তার জাতির উদ্দেশে বলেছেন, কী আশ্চর্য! দেমোস্থিনিসের[৩৯৯] পর সিসেরো[৪০০] বাগ্মী হতে

---

৩৯৪. এখানে তথ্যগত বিভ্রাট রয়েছে। দান্তের জন্ম হয়েছে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর পর। তাই তাদের মধ্যে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।-অনুবাদক

৩৯৫. মুস্তাফা শাক্আ, *মাআলিমুল হাদারাতিল ইসলামিয়া*, পৃ. ২৬৩-২৬৫।

৩৯৬. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৫২১।

৩৯৭. ফ্রান্সেসকো পেত্রার্কা (Francesco Petrarca 1304-1374) একজন লেখক, কবি ও মানবতাবাদী। পেত্রার্কাকে 'মানবতন্ত্রের জনক' বলা হয়। পিয়েত্রো বেম্বো (Pietro Bembo) ১৬শ শতাব্দীতে পেত্রার্কা, বোক্কাচ্চো ও দান্তের কাজের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক ইতালীয় ভাষার একটি মডেল তৈরি করেন। রেনেসাঁসের যুগে পেত্রার্কার সনেটগুলো পুরো ইউরোপজুড়ে প্রশংসিত হয় এবং কবিদের অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। লিরিক কবিতার মডেলে পরিণত হয়েছিল তার সনেট। 'অন্ধকার যুগ' প্রপঞ্চটির প্রবর্তক যারা ছিলেন পেত্রার্কা তাদের অগ্রগণ্য।-অনুবাদক।

৩৯৮. মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ৪৪।

৩৯৯. দেমোস্থিনিস (Demosthenes 384-322 BC) ছিলেন প্রাচীন এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক ও বাগ্মী। তার বক্তৃতাগুলোতে সামসময়িক এথেনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা ও প্রতাপ প্রকাশ পেত। জীবনের একটি সময় তিনি পেশাদার বক্তৃতালেখক (লোগোগ্রাফার) হিসেবে কাটিয়েছেন।-অনুবাদক।

৪০০. মার্কাস টুলিয়াস সিসেরো (Marcus Tullius Cicero 106-43 BC) ছিলেন প্রাচীন রোমের বিখ্যাত বাগ্মী, কূটনীতিক, রাজনৈতিক তত্ত্ববিশারদ, আইনজ্ঞ এবং দার্শনিক। তাকে অনেকেই লাতিন ভাষার শ্রেষ্ঠ বাগ্মী এবং প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।-অনুবাদক।

পেরেছেন এবং হোমারের[৪০১] পর ভার্জিল[৪০২] কবি হতে পেরেছেন। তাহলে কেন আমাদের এই দুর্ভাগ্য যে আমরা আরবদের পর কিছু লিখলাম না। আমরা ছিলাম গ্রিকদের ও সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর সমকক্ষ এবং মাঝে মাঝে আমরা তাদের থেকে এগিয়েও ছিলাম, কেবল আরবদের ব্যতিরেকে। আফসোস নির্বুদ্ধিতার জন্য! ভ্রান্তিবিলাসিতার জন্য আফসোস! আফসোস ইতালির ক্লান্ত নিস্তেজ প্রতিভার জন্য![৪০৩]

এমনই ছিল আরবীয় ইসলামি সভ্যতার আলোকশিখা, যা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানবতার আবাসগুলো আলোকিত করে তুলেছিল।

---

৪০১. হোমার (Homer, আনু. খ্রিষ্টপূর্ব ১২-৯ শতক) প্রাচীন গ্রিক কবি ও ইউরোপের আদি কবি হিসেবে খ্যাত। গ্রিক ভাষায় তার নাম 'ওমেরোস্' হলেও আমাদের কাছে তিনি 'হোমার' নামেই পরিচিত। বিশ্বসাহিত্যের সেরা সম্পদ '*ইলিয়াড*' ও '*অডিসি*' মহাকাব্য দুটি তার রচনা। হোমারের জীবন, জন্মস্থান ও জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না। এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে হোমার নামে আসলে কেউ ছিলেনই না। আধুনিক গবেষকেরা অবশ্য হোমার এবং হোমারের সৃষ্টিকর্মকে স্বীকার করে নিয়েছেন। হোমার অন্ধ ছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে। কিন্তু তার কাব্যে পৃথিবীর রূপ-রস ও সৌন্দর্যানুভূতির এমন আশ্চর্য সজীবতার প্রকাশ ঘটেছে যে গবেষকেরা মনে করেন, হোমার শেষ বয়সে দৃষ্টি হারিয়ে থাকতেও পারেন, তবে জন্মান্ধ ছিলেন না নিশ্চয়ই। প্রাচীন গ্রিসে হোমার জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল উভয়েই তাদের রচনায় বারংবার হোমারের কাব্যরীতির উল্লেখ করেছেন।-অনুবাদক।

৪০২. ভার্জিল (Virgil, আনু. ৭০-১৯ খ্রিষ্টপূর্ব) প্রাচীন রোমক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে খ্যাত। তার অমর ও কালজয়ী মহাকাব্য *ইনিদ*-এর জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০ অব্দের ১৫ অক্টোবর ইতালির মান্তোয়ার নিকটবর্তী আন্দেস নামক গ্রামের এক অবস্থাপন্ন কৃষকপরিবারে তার জন্ম। পুরো নাম পুব্লিউস ভের্গিলিউস্ মারো (Publius Vergilius Maro) হলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সূত্রে তিনি বাংলাদেশে ভার্জিল নামেই পরিচিত। জন্মসূত্রে ভার্জিল গ্রামকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ভালোও বেসেছিলেন অকৃত্রিমভাবে। তাই প্রথম জীবনে তিনি গ্রামীণ পরিবেশ ও জীবনভিত্তিক কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘ এগারো বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভার্জিল '*ইনিদ*' মহাকাব্যটি রচনা করেন। রচনা শেষ করার পর এর গুণগত মানে তিনি পুরোপুরি তৃপ্ত হতে না পেরে কিছু দুর্বল অংশ আবার সংশোধন ও পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এই কাজ শেষ করার আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর আগে তিনি এই মহাকাব্য পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে যান। সম্রাট অগাস্টাস সিজারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত কবির এই নির্দেশ অগ্রাহ্য হয়।-অনুবাদক।

৪০৩. লুইস সিডিও, *Histoire des Arabes* (১৮৫৪), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল আরাব*, অনুবাদক: আদিল যুআইতার, পৃ. ৫৬৯।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

শিষ্টাচার ও আচরণে ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, কবিতা ও সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউরোপ ইসলামি সভ্যতা থেকে যা গ্রহণ করেছে তা স্পষ্ট ও সুবিদিত। কারণ এগুলো সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত প্রভাব, সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে এগুলোর পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাছাই সম্ভব। অন্যদিকে সামাজিক ও মানবিক প্রভাব (শিষ্টাচার ও আচরণ)-এর পর্যবেক্ষণ ততটা স্পষ্টভাবে সম্ভব নয়। কালগত দৃশ্যপট যত বিস্তৃত হয়, সামাজিক বিকাশও তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক কার্যাবলি ও ঘটনাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এগুলো এখনো পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ক্ষেত্র। তাই এই অনুচ্ছেদে আমরা বহু তুলনামূলক বিষয় উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি। আমরা বাস্তবিক অর্থেই দেখেছি যে ইসলাম যেসব বিষয় প্রতিষ্ঠিত করেছে, পাশ্চাত্যসভ্যতা এখনো তার অধিকাংশেরই নাগাল পায়নি। কারণ দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণা ও দর্শনের পার্থক্য থেকেই গেছে। আমরা এখানে পাশ্চাত্যের এমন কিছু দিক উল্লেখ করব যা পরিপূর্ণরূপে ইসলামি সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত।

ফরাসি লেখক ফ্রাঁসোয়া জোলিভেট কাস্তাও (François Jollivet-Castelot) তার '*কানুনুত তারিখ*' (*La Loi de l'Histoire*, 1933) গ্রন্থে বলেছেন, ইউরোপ ওই যুগে যে উপকারী বায়ু-প্রবাহ ভোগ করেছে তার জন্য আরবীয় চিন্তা-চেতনার কাছে ঋণী। ইউরোপ এমন চারটি শতাব্দী কাটিয়েছে যখন সেখানে আরবসভ্যতা ছাড়া আর কোনো সভ্যতার অস্তিত্বই ছিল না। ইউরোপের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরাও আরবসভ্যতার উড্ডীয়মান ঝান্ডা বহন করেছে।[৪০৪]

---

[৪০৪]. ফ্রাঁসোয়া জোলিভেট কাস্তাও, *La Loi de l'Histoire*; মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, পৃ. ৫৪৪ থেকে উদ্ধৃতি।

অত্যন্ত যৌক্তিক বিবেচনায় সমকালীন পাশ্চাত্যসভ্যতার যেকোনো দৃশ্যপটের উন্নতি ও বিকাশকে রোমান সভ্যতা থেকে আলাদা করে ওই মধ্যযুগের সঙ্গে অর্থাৎ ইসলামি সভ্যতাকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ইসলামি সভ্যতার এসব অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। অধিকার, স্বাধীনতা, আচার-আচরণ, আখলাক-শিষ্টাচার, লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামি সভ্যতার কী অবদান তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। এই অনুচ্ছেদে আমরা পাশ্চাত্যসভ্যতায় এসব অবদানের কী প্রভাব রয়েছে তা খতিয়ে দেখব। ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে আলফোনসো দা গ্রেট[৪০৫] তার পুত্র যুবরাজের জন্য একজন শিক্ষাগুরু নিয়োগ করার ইচ্ছা করেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কর্ডোভার দুইজন মুসলিমকে আহ্বান জানান। কারণ তার পুত্রকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত কোনো খ্রিষ্টান তিনি খুঁজে পাননি।[৪০৬]

মুসলিমরা যখন আন্দালুস জয় করলেন, খ্রিষ্টানদের একটি দল ইসলামি শাসনের ছায়াতলে বসবাস করতে চাইল না, তারা ফ্রান্সে চলে যাওয়াটাকেই ভালো মনে করল। টমাস আর্নল্ড[৪০৭] যে-সকল খ্রিষ্টান ইসলামি রাজ্যে সন্তুষ্টচিত্তে বসবাস করেছে তারা মুসলিমদের থেকে কী আচরণ পেয়েছে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে যারা ফ্রান্সে চলে গিয়েছিল তারা ওখানে কী আচরণের শিকার হয়েছিল সেটাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের শাসনাধীন বসবাস করার জন্য ফরাসি দেশে চলে গিয়েছিল তাদের অবস্থা বাস্তবিক বিচারে তাদের ধর্মীয় ভাইদের (যারা আন্দালুসে ইসলামি শাসনের ছায়াতলে থেকে গিয়েছিল তাদের) চেয়ে ভালো ছিল না। ৮১২ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কদের রাজা শার্লেমাইন (Charlemagne) স্পেন থেকে ফিরে

---

৪০৫. তৃতীয় আলফোনসো অব আস্তুরিয়াস (Alfonso III of Asturias 848-910), ৮৬৬ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লিয়োঁ, গ্যালিসিয়া ও আস্তুরিয়াসের রাজা।-অনুবাদক

৪০৬. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, পৃ. ৫৪৮।

৪০৭. স্যার টমাস ওয়াকার আর্নল্ড (Sir Thomas Walker Arnold 1864-1930) ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিক। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এর আরবি ভাষা ও ইসলামি শিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।-অনুবাদক

আসেন। এ সময় যেসব দেশত্যাগী লোক তার সঙ্গে জড়ো হয়েছিল তাদেরকে সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের হুমকি-ধমকি ও জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি নিজে হস্তক্ষেপ করেন। তিন বছর পর ফরাসি রাজা লুইস দা পাইয়াস (Louis the Pious) দেশত্যাগীদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য একটি ডিক্রি জারি করতে বাধ্য হন। তা সত্ত্বেও তারা অভিজাত শ্রেণির লোকদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ না করে থাকতে পারেনি; কারণ অভিজাত শ্রেণির লোকেরা দেশত্যাগীদের নামে বরাদ্দ ভূমি দখল করে নিচ্ছিল। কিন্তু এসব দুর্বৃত্তদের দমনপ্রচেষ্টা কিছুদিনের মধ্যে অকেজো হয়ে পড়ল এবং নতুন করে অভিযোগের পাহাড় তৈরি হলো। এ সকল সহায়সম্বলহীন দুর্ভাগা দেশত্যাগীদের অবস্থা ভালো করার জন্য যেসব সরকারি ফরমান ও ডিক্রি জারি হয়েছিল তার কোনো হদিসই পাওয়া গেল না। পরবর্তী সময়ে ক্যাগোট (Cagots) সংখ্যালঘুরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আচরণের শিকার হয়েছিল। যেসব স্প্যানিশ কলোনি ইসলামি শাসনব্যবস্থা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের স্বগোত্রীয় খ্রিষ্টানদের করুণার ওপর ছুড়ে দিয়েছিল তাদের কথাও পুনরায় উল্লেখ করব।[৪০৮]

মুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা ও লেনদেন যে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের স্বভাবচরিত্রকে নম্র-ভদ্র করে তুলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আন্দালুসের এক ঐতিহাসিক ইজিডোরের (Isidore of Seville) ক্রিয়াকলাপ থেকেও। টমাস আর্নল্ড বর্ণনা করেছেন যে, ইজিডোর মুসলিম বিজেতাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করতেন। অথচ তিনি আবদুল আযিয ইবনে মুসা ইবনে নুসাইর যে সম্রাট রডারিকের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন সেই ঘটনা পেশ করেছেন কোনো বিরূপ মন্তব্য ছাড়াই; এই ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি একটিও নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করেননি।[৪০৯] আর্নল্ড আরও জানাচ্ছেন, এসব বিষয় ছাড়াও বহু খ্রিষ্টান তাদের নাম রেখেছিল আরবি শব্দে। বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি পালনে তারা মুসলিম প্রতিবেশীদের অনুসরণও করত। ফলে অসংখ্য খ্রিষ্টান খতনা করিয়েছিল। খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রেও তারা মুসলিমদের সংস্কার ও রীতিনীতি মেনে চলত।[৪১০]

---

[৪০৮]. টমাস আর্নল্ড, *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*, আরবি অনুবাদ, الدعوة الى الاسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية, পৃ. ১৫৯।

[৪০৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

[৪১০]. প্রাগুক্ত।

ক্রুসেড যুদ্ধকালে যেসব ক্রুসেডার সিরিয়া (শাম ভূমি) দখল করে নিয়েছিল তারা ছিল পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এমনকি উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট[৪১১] বিস্ময় বোধ করেছেন এবং বলেছেন, ক্রুসেডে অংশগ্রহণের জন্য যারা এসেছিল তাদের ধর্ম (খ্রিষ্টধর্ম) যে শান্তির ধর্ম এটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল।[৪১২]

কিন্তু মুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশার পর তাদের মন-মানসিকতা পালটে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উইল ডুরান্ট বলেন, যে ইউরোপীয়রা এসব দেশে (সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে, ক্রুসেডের সময়) তাদের আবাস তৈরি করে নিয়েছিল তারা ধীরে ধীরে প্রাচ্যীয় বেশভূষা ও আদব-আখলাক গ্রহণ করে..। এসব (বিজিত) এলাকায় যে-সকল মুসলিম বসবাস করত তাদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক ও যোগাযোগ জোরালো হয়ে ওঠে। এতে দুটি জাতির মধ্যে যে রেষারেষি ও শত্রুতাভাব ছিল তা কমে যায়। মুসলিম ব্যবসায়ীরা পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে খ্রিষ্টীয় দেশগুলোতে প্রবেশ করতে শুরু করে[৪১৩] এবং ওখানকার বাসিন্দাদের কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করে। অন্যদিকে খ্রিষ্টান রোগীরা খ্রিষ্টান চিকিৎসকদের চেয়ে মুসলিম ও ইহুদি চিকিৎসকদের প্রাধান্য দেয়। খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতারা মুসলিমদের মসজিদগুলোতে ইমামতি ও ইবাদতের অনুমতি দেয়। খ্রিষ্টান অধ্যুষিত আন্তাকিয়ায় ও ত্রিপোলিতে অবস্থিত মাদরাসাগুলোতে মুসলিমরা তাদের সন্তানদের পাঠাতে ও কুরআন শেখাতে শুরু করে।[৪১৪]

এসব ব্যাপার খ্রিষ্টানদের মৌলিক স্বভাবজাত ছিল না। কারণ ক্রুসেডাররা স্পেনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কী নির্মম আচরণ করেছিল তা আমরা

---

[৪১১]. উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট (William Montgomery Watt 1909-2006) ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও ইসলামি স্টাডিজে বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও ইসলামশিক্ষা বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টো, কলেজ ডি ফ্রান্স এবং জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি স্কটিশ এপিস্কোপাল চার্চের ধর্মযাজক ছিলেন। ইসলামি দর্শন, তুলনামূলক ধর্ম, ইসলামি ইতিহাস ও ইসলামি সভ্যতা বিষয়ে তার ২০টি গ্রন্থ রয়েছে।-অনুবাদক।

[৪১২]. মন্টগোমারি ওয়াট, *The Influence of Islam on Medieval Europe*, আরবি অনুবাদ, فضل الإسلام على الحضارة الغربية, পৃ. ১০২।

[৪১৩]. খ্রিষ্টানরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের যেসব এলাকা দখল করে নিয়েছিল সেগুলো উদ্দেশ্য। অন্যথায় এগুলো তাদের দেশ ছিল না।

[৪১৪]. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৫, পৃ. ৩৪।

দেখেছি। ওই সময় থেকে পাঁচ শতাব্দী কেটে যাওয়ার পর স্পেনে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি বাইতুল মুকাদ্দাস স্বাধীন করার পর খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যে মানবিক আচরণ করেছিলেন তা ছিল বিস্ময়কর। আশ্চর্যজনক হলেও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির এমন আচরণের মূল্যায়নও রয়েছে, স্বীকৃতিও রয়েছে।

আমরা দেখি যে, ফরাসি মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ ম্যাক্সিম রোডিনসন[৪১৫] তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে, সবচেয়ে বড় শত্রু সালাহুদ্দিন পশ্চিমাদের মধ্যে ব্যাপক বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন। তিনি মানবিকতা ও বীরত্বের দ্বারা যুদ্ধকে অলংকৃত করলেন; অথচ তার শত্রুদের মধ্য থেকে তার সঙ্গে এমন আচরণ খুব কম লোকই করেছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড দা লায়নহার্ট।[৪১৬]

টমাস আর্নল্ড বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে, সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চারিত্রিক গুণাবলি ও তার বীরত্বপূর্ণ জীবন তার সমকালে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের মন ও মগজে জাদুকরী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। এমনকি একদল খ্রিষ্টান বীরযোদ্ধা সালাহুদ্দিন আইয়ুবির প্রতি এতটাই আকর্ষণ অনুভব করেছিল যে তারা খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে এবং স্বজাতিকে ত্যাগ করে মুসলিমদের সঙ্গে গিয়ে মিশে।[৪১৭]

খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের মধ্যে সালাহুদ্দিনের মহত্ত্ব সম্পর্কে যে বিস্ময় ছড়িয়ে ছিল তা লিপিবদ্ধ করেছেন উইল ডুরান্ট, সালাহুদ্দিন নিজ ধর্মের প্রতি সীমাহীন অনুরাগী ছিলেন। নাইটস টেম্পলার[৪১৮] ও নাইটস

---

[৪১৫]. ম্যাক্সিম রোডিনসন (Maxime Rodinson 1915-2004) একজন ফরাসি প্রাচ্যবিদ ও ধর্মের ইতিহাস বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত। ইসলাম ও আরববিশ্ব সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো, *Muhammad* (১৯৬০); *Islam and Capitalism* (১৯৬৬); *Marxism and the Muslim world* (১৯৭২); *Europe and the Mystique of Islam* (১৯৮০)।

[৪১৬]. ম্যাক্সিম রোডিনসন, *আস-সুরাতুল গারবিয়্যাহ ওয়াদ-দিরাসাতুল গারবিয়্যাতু ওয়াল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪১।

[৪১৭]. টমাস আর্নল্ড, The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith, আরবি অনুবাদ, الدعوة الى الاسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية, পৃ. ১১১।

[৪১৮]. নাইটস টেম্পলার : সুলাইমানের মন্দির এবং খ্রিষ্টের দরিদ্র সহযোগী-সৈনিকবৃন্দ (Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon) সাধারণ মানুষের কাছে নাইট টেম্পলার নামে পরিচিত। এ ছাড়া একে অর্ডার অব দা টেম্পলও বলা হয়ে থাকে। খ্রিষ্টান সামরিক যাজক সম্প্রদায়গুলোর (অর্ডার) মধ্যে এটিই সবচেয়ে বিখ্যাত এবং পরিচিত। মধ্যযুগে প্রায় দুই শতকব্যাপী এই সংগঠনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ১০৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম

হসপিটালার্স[৪১৯]-এর ওপর তীব্র কঠোরতাকে তিনি নিজের জন্য বৈধ ও সহনীয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বভাবত তিনি দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও পরাজিতদের প্রতি দয়াপরবশ ছিলেন। অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি তার সকল শত্রুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এতে খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকেরা বিস্ময় বোধ করেছেন যে, কীভাবে দ্বীনে ইসলাম–যা তাদের ধারণায় ভ্রান্ত–একজন ব্যক্তিকে এমনভাবে চারিত্রিক গুণাবলিতে ভূষিত করল যে, সে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের এই পর্যায়ে পৌছে গেল।[৪২০]

এ তো গেলই, চৌদ্দ শতাব্দী পরও ইসলামি এই বিধান এখনো অটুট রয়েছে,

«أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى»

ক্রুসেডের পরই এর সৃষ্টি হয় যার উদ্দেশ্য ছিল জেরুসালেমে আগত বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জেরুসালেম মুসলিমদের দখলে চলে যাওয়ার পর এই নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১১২৯ খ্রিষ্টাব্দে চার্চ এই সংগঠনকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করে। এরপর থেকে যাজক সম্প্রদায়টি গোটা ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এর সদস্যসংখ্যা এবং ক্ষমতা বিপুল হারে বাড়তে থাকে। স্বতন্ত্র ধরনের লাল ক্রস-সংবলিত আলখাল্লা পরিধান করার কারণে যেকোনো টেম্পলার নাইটকে সহজেই চিহ্নিত করা যেত। তারা ছিল ক্রুসেডের সময়কার সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, সর্বোচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সর্বোচ্চ শৃঙ্খলাবিশিষ্ট যোদ্ধা দল।-অনুবাদক।

৪১৯. নাইটস হসপিটালারস : নাইটস হসপিটালার (The Order of Knights of the Hospital of Saint John of Jerusalem) একটি ক্যাথলিক মিলিটারি অর্ডার। বিভিন্ন সময়ে এর হেডকোয়ার্টার জেরুসালেম, রোডস এবং মাল্টাতে ছিল। ১২শতকে great monastic reformation-এর সময় জেরুসালেমের মুরিস্তান জেলায় আমালফিটান হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত লোকদের সংঘ হিসাবে হসপিটালারদের উত্থান হয়। পবিত্র ভূমিতে আসা খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য ১০২৩ সনে জন দি ব্যাপ্টিস্ট (ইয়াহয়া)-এর প্রতি উৎসর্গিত করে জেরার্ড থম (Gerard Thom) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য কিছু বিদ্বান মনে করেন যে আমালফিটান হাসপাতাল থেকে জেরার্ড থমের অর্ডার ও হাসপাতাল ভিন্ন ছিল। প্রথম ক্রুসেড চলাকালে ১০৯৯ সনে জেরুসালেম অবরোধ সংস্থাটি একটি ধর্মীয় সংঘে এবং সামরিক সংঘে পরিণত হয় যার দায়িত্ব ছিল পবিত্র ভূমির প্রতিরক্ষা। মুসলিম শক্তি কর্তৃক পবিত্র ভূমি দখলের পর, নাইটরা রোডস থেকে তাদের কাজ পরিচালনা করত, যেখানে তাদের সার্বভৌমত্ব ছিল এবং আরও পরে মাল্টা থেকে, যেখানে তারা সিসিলির স্প্যানিশ ভাইসরয়ের অধীনে করদরাজ্য শাসন করত। হসপিটালাররা ১৭ শতকের এক সময় চারটি ক্যারিবীয় দ্বীপ দখল করেছিল যা তাদেরকে ১৬৬০ সনে ফ্র্যান্সিদের কাছে ছেড়ে দিতে হয়।-অনুবাদক।

৪২০. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৫, পৃ. ৪৫।

তোমরা আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরি। সুতরাং অনারবদের ওপর আরবদের এবং আরবদের ওপর অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, গৌরবর্ণের ওপর কৃষ্ণবর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কৃষ্ণবর্ণের ওপর গৌরবর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে।[৪২১]

আব্রাহাম লিংকন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দাসশ্রেণির মুক্তির উদ্যোগ নেন। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল এবং তিনি দাসশ্রেণির উপকারভোগী সম্প্রদায় থেকে এমন তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন যে, তিনি এই উদ্যোগ থেকে সরে আসার উপক্রম করেছিলেন। তবে তিনি এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইন জারি করে দেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, তিনি নিজেও জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

সংগত কারণেই আমরা বলব, ইউরোপে এখনো আচার-আচরণে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণবাদ (রেসিজম) ও বর্ণবাদমূলক বৈষম্য রয়ে গেছে। বিশেষ করে ফ্রান্সে ও জার্মানিতে..। গুস্তাভ লি বোঁ জানিয়েছেন, আরবদের মধ্যে সাধারণ সমতার প্রেরণা সবসময়ই ছিল। তাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোতেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। ইউরোপে সমানাধিকার-নীতির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বটে, তবে তা কাজে নয়, শুধু কথায়। এই মানবাধিকার-নীতি ইসলামি শরিয়ার স্বভাব-প্রকৃতিতে পরিপূর্ণভাবে বদ্ধমূল রয়েছে। যেসব সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্ব পাশ্চাত্যে প্রাণঘাতী বিপ্লব-বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল এবং এখনো করছে সেসব শ্রেণির প্রতি মুসলিমদের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।[৪২২]

আর চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে ইসলাম বন্দিদের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছে তা নিম্নরূপ,

﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

তারপর চাইলে (বন্দিদেরকে) মুক্তি দেবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।[৪২৩]

---

৪২১. *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ২৩৫৩৬; তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৪৪৪৪; বাইহাকি, *শুআবুল ঈমান*, হাদিস নং ৪৯২১।

৪২২. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৩৯১।

৪২৩. সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত ৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন,

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচার করো বা তাদের কল্যাণকামী হও।[৪২৪]

ইসলামের এমন নির্দেশনার চৌদ্দশ বছর পর জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ সালে বন্দিদের ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।[৪২৫] এসব নীতিমালায় বন্দিদের অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তারপরও ইসলাম বন্দিদের যে অধিকার দিয়েছে তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেনি। যুদ্ধ চলাকালে নাগরিকদের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে তা নিয়ে ১৯৪৯ সালের ১২ আগস্ট জেনেভা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।[৪২৬] কারণ চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৪২৪]. তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১৪৪৪৪; *আল-মুজামুস সগির*, হাদিস নং ৪০৯।

[৪২৫]. ইসলামের প্রাথমিক যুদ্ধগুলো থেকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ, যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। যেমন : যুদ্ধবন্দিদের পানাহার দানের বিষয়টি কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আহারের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে।' (সুরা দাহর : আয়াত ৮) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা বন্দিদের সঙ্গে কল্যাণকর আচরণ করো।' (তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ৪০৯; *কানযুল উম্মাল*, হাদিস নং ১১০৩৬) এই হাদিস ব্যাপকার্থক, বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক উভয় কল্যাণের কথা বোঝানো হয়েছে।-অনুবাদক।

[৪২৬]. ১২ আগস্ট ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের জেনেভা কনভেনশনের সঙ্গে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন যে প্রটোকল (প্রটোকল ১) বর্ধিত করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, বেসামরিক জনমণ্ডলী ও বেসামরিক বস্তুর প্রতি সম্মান ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংঘর্ষমান পক্ষগুলো বেসামরিক জনমণ্ডলী ও যোদ্ধাদের মধ্যে এবং বেসামরিক বস্তু ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চিত করবে এবং সে অনুযায়ী তাদের অপারেশন কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশে পরিচালনা করবে। (ধারা ৪৮) অথচ চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে ইসলাম কী নির্দেশ দিয়েছে দেখুন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'গির্জায় ও আশ্রমে যারা রয়েছে তাদের হত্যা করো না।' (*মুসনাদে আহমদ*, ২৭২৮; আবু ইউসুফ, *আল-খারাজ*, পৃ. ২১২)। এই হাদিস থেকে দুটি ব্যাপার বোঝা যায়,
১. ইসলাম এই গোষ্ঠীটিকে, যারা ধর্মশালায় উপাসনায় লিপ্ত, সম্মান দেখিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে দুরাচার করতে নিষেধ করেছে। যেসব যুবক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে উপাসনালয়ে রয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।
২. যুদ্ধের সময় উপাসনালয় ও ধর্মশালাকে রক্ষা করতে হবে এবং সেগুলোর ওপর আক্রমণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে মদদ জোগায়।-অনুবাদক।

«اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»

তোমরা যুদ্ধ করো কিন্তু (যুদ্ধলব্ধ সম্পদে) খেয়ানত করো না, চুক্তি ভঙ্গ করো না, শত্রুদের বিকলাঙ্গ (হাত, পা, নাক, কান কর্তন) করো না এবং কোনো শিশুকে হত্যা করো না...।[৪২৭]

আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেছেন,

«لَا تَعْصُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَجْبُنُوا، ولا تهدموا بيعة، وَلَا تعزقُوا نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقُوا زَرْعًا، وَلَا تجشروا بَهِيمَةً، وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا كَبِيرًا، وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّذِي حَبَسُوهَا فَذَرُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ».

তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খেয়ানত করো না, ভীরুতা প্রদর্শন করো না, গির্জা ধ্বংস করো না, খেজুরগাছ খুঁড়ে তুলে ফেলো না, ফসল পুড়িয়ে দিয়ো না, চতুষ্পদ জন্তুদের আটকে রেখো না, ফলদার বৃক্ষ কর্তন করো না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করো না, ছোট শিশুদের হত্যা করো না। তোমরা এমন লোকদের দেখবে যারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত রয়েছে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি), তোমরা তাদের ছেড়ে দিয়ো এবং তাদের কাজ করতে দিয়ো।[৪২৮]

তালাকের প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলাম তালাকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যদিকে ইউরোপে তালাকের বৈধতা জ্ঞাপন করে নাগরিক আইন পাশ হয়েছে মাত্র গত শতাব্দীতে। ব্রিটেনে ১৯৬৯ সালে তালাক প্রসঙ্গে নাগরিক আইন জারি করা হয়। নারীদের সঙ্গে বৈষম্য-নিরসনে যে আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র[৪২৯] স্বাক্ষরিত হয়েছে তা ইসলামি শরিয়া দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং এ ব্যাপারটি সবার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। নারীর মালিকানা, উত্তরাধিকার, আইনগত

---

[৪২৭]. *মুসলিম*, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : তামিরুল ইমামিল উমারা, হাদিস নং ১৭৩১।

[৪২৮]. ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ২, পৃ. ৭৫।

[৪২৯]. Declaration on the Elimination of Discrimination against Women (DEDAW). ১৯৭৯ সালে গৃহীত হয় Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ)।-অনুবাদক।

সক্ষমতা (legal capacity) ইত্যাদি অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামি ফিকহের গ্রন্থাবলিতে যা-কিছু রয়েছে তারই সারমর্ম ফুটে উঠেছে এই সনদের ধারাগুলোতে। আর এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর।

ইউরোপ আধুনিক যুগেও নারীর প্রতি চরম অবমাননা ও বৈষম্য প্রত্যক্ষ করেই উপর্যুক্ত ঘোষণাপত্র তৈরি করেছে। নারী অবমাননার অদ্ভুত সব ঘটনা রয়েছে এ আধুনিক যুগের। যেমন ১৭৯০ সালে গির্জা কর্তৃপক্ষ একজন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব অতিরিক্ত বোঝা মনে করে, ফলে ওই নারীকে মাত্র দুই শিলিংয়ে বিক্রি করে দেয়। উনিশ শতকের শুরুতেও (১৮০৫ সালে) স্বামীর অধিকার ছিল স্ত্রীকে নির্ধারিত মূল্যে (৬ সেন্ট) বিক্রি করে দেওয়ার, অর্থাৎ স্ত্রী ছিল স্বামীর মালিকানাধীন বস্তু। ১৯৩১ সালে একজন ইংরেজ তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয় এবং ১৮০৫ সালের পূর্ববর্তী আইনের আওতায় তাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একজন আইনজীবীও সে পেয়ে যায়। অবশেষে আদালত তাকে পনেরো মাসের কারাদণ্ড দেয়।

ইউরোপে নারী স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা-অধিকারও লাভ করে উনিশ শতকের শেষের দিকে, ১৮৮২ সালে। এমনকি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে পাগল ও শিশুদের মতো নারীদেরকেও অক্ষম ও অপরিণত বলে মনে করা হতো।[৪৩০]

---

৪৩০. আবদুল ওয়াদুদ শালবি, *ফি মাহকামাতিত তারিখ*, পৃ. ৬০ ও তার পরবর্তী।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

শিল্পকলায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব

ইসলামি সভ্যতা কীভাবে ও কোন পথে ইউরোপে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে পৌঁছেছিল তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব পথ দিয়ে ইসলামি স্থাপত্যশিল্প ও অলংকরণশিল্পও ইউরোপে পৌঁছেছিল। প্রায়োগিক শিল্পকলার অধিকাংশ শৈলীই (ফর্ম) পৌঁছে গিয়েছিল পশ্চিমা দেশগুলোতে। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলামি শিল্পকলার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় চারুশিল্পের অনেক ক্ষেত্রে দর্শন ও রূপ উভয়টিই ইসলামি উৎস থেকে নেওয়া। কতিপয় বাস্তবতা এদিকেই ইঙ্গিত করে।[৪৩১]

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, কিছু পশ্চিমা শিল্পী তাদের কাজের সঙ্গে পরিপূরকরূপে বা আলংকারিক উপায়ে ইসলামি শিল্পরূপের সংমিশ্রণ ঘটালেও আরবি লিখনের হরফসমূহের প্রতিলিপির সময় শাব্দিক অর্থ বোঝেননি এবং মুসলিম শিল্পীর উদ্দিষ্ট তাৎপর্য অনুধাবন করেননি। তারা আরবি লিপি ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ নয়; নিরর্থক বাহ্যিক আলংকারিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার দিকটি বেছে নিয়েছেন।[৪৩২]

এই প্রসঙ্গে গুস্তাভ লি বোঁ আরবি লিপিকলার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, আরবি লিপিকলা আলংকারিক নান্দনিকতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মধ্যযুগে ও রেনেসাঁসের কালে আরবি লেখার যে খণ্ড-বিশেষই খ্রিষ্টান শিল্পবোদ্ধাদের হস্তগত হতো, সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মীয় স্থাপনাসমূহে তার প্রতিলিপি স্থাপন করাতেন। এ কাজটি তারা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততা ও আবেগের সঙ্গে করতেন।

---

৪৩১. Dionisius A. Agius ও Richard Hitchcock, *The Arab Influence in Medieval Europe*, আরবি অনুবাদ : التأثير العربي في أوروبا العصور الوسطى, পৃ. ৬৪

৪৩২. ইনাস হুসনি, *আসারুল ফন্নিল ইসলামিয়্যি আলাত তাসবিরি ফি আসরিন নাহদাতি*, পৃ. ১২০।

মশিয়েঁ ল্যাংব্রিয়েদ ও মশিয়েঁ লাভোইসসহ অনেকেই ইতালিতে সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন। মশিয়েঁ লাভোইস এও দেখেন যে, মিলান ক্যাথিড্রালের মালপত্র রাখার জায়গায় পিকারিন নকশায় নির্মিত একটি দরজা, দরজার চারপাশে পাথরের কার্নিশ, কার্নিশের উপর একটি আরবি শব্দ কয়েকবার উৎকীর্ণ। সেন্ট পিটারস ব্যাসিলিকার (St. Peter's Basilica) দ্বারসমূহের উপর অঙ্কিত যিশুর মাথার চারপাশে আরবি লিপি রয়েছে। পোপ চতুর্থ ইউজিনের (Pope Eugene IV) নির্দেশে এই গির্জা নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে সেন্ট পিটার এবং সেন্ট পলের যে মূর্তি ছিল তার আলখাল্লায় দীর্ঘ কুফি লিপি উৎকীর্ণ ছিল।

এরপর তিনি বলেন, আমার আফসোস হলো, এসব আরবি লেখাগুলোর লেখক তার অনুবাদ করেনি। সম্ভবত যিশুর মাথার চারপাশের লেখাটি ছিল, لا إله إلا الله محمد رسول الله ।[৪৩৩]

আরব-ইসলামিক অলংকরণশিল্প বহু ইউরোপীয় শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈলীকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। কারণ আরবি লিপিকলা কতিপয় ইউরোপীয় শিল্পীর দর্শন ও চিত্রকর্মে প্রভাব ফেলেছিল। আরব-ইসলামি শিল্পকলার অন্যতম সৃষ্টি আরবি লিপিকলা, তার প্রকরণ ও ফর্মে রয়েছে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং বহুবিধ আঙ্গিক ও শৈলীতে তার অলংকরণ সম্ভব। ইসলামি অলংকরণশিল্পের প্রভাব-বিস্তার শুরু হয় ক্রুসেডের সময় থেকে, যখন ইউরোপীয়রা আরবদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করে। এর শৈল্পিক ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি তাদের উদ্দীপ্ত করে তোলে এবং তারা চরমভাবে আকর্ষিত হয়।

ফলে তারা তাদের শিল্পকর্মে এর ব্যবহার শুরু করে। তাদের ফলকচিত্রে আরবি লিপির ব্যবহারকারী প্রথম শিল্পীদের মধ্যে ফ্লোরেন্সীয় চিত্রকর জোত্তো দি বন্দোনে[৪৩৪] অন্যতম। ফ্লোরেন্সীয় চিত্রকর ফিলিপ্পো

---

৪৩৩. গুস্তাভ লি বোঁ, হাদারাতুল আরাব, পৃ. ৫৩১।

৪৩৪ জোত্তো দি বন্দোনে (Giotto di Bondone) জোত্তো নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রথম বড় শিল্পী হিসেবে পরিচিত। ১২৬৭ সালে ফ্লোরেন্সের কাছে কোল্লে দি ভেসপিনিয়ানোতে তাঁর জন্ম এবং ১৩৩৭ সালে ফ্লোরেন্সে মৃত্যু।-অনুবাদক

লিপ্পিও[৪৩৫] তার কর্মে আরবি লিপিকলার প্রয়োগ ঘটান। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে-সকল ব্যক্তির চিত্র অঙ্কন করেন তাদের পোশাকে দৃশ্যসজ্জা হিসেবে আরবি লিপি ব্যবহার করেন। আরেক ফ্লোরেন্সীয় চিত্রশিল্পী ভেরোচ্চিয়ো[৪৩৬] রাজাদের শ্রদ্ধার চিত্র চিত্রায়ণের ফলকে আরবি ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করে, যা ফ্লোরেনসে সংরক্ষিত রয়েছে।[৪৩৭]

মোটকথা, ইসলামি শিল্পকলা তার অনন্য নান্দনিক উপাদানগুলোর মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় শিল্পীদের শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্মে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এভাবে ইউরোপীয়দের মনোজাগতিক অনেক বিষয়কে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ আরবি লিপিকলা ও আরবি নকশা-প্রকরণ আরাবিস্কে পর্যাপ্ত ছন্দ ও গতি বিদ্যমান থাকায় ইউরোপীয় শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মের জন্য সমৃদ্ধ আঙ্গিক ও শৈলীর উৎস খুঁজে পেয়েছিল এবং নানা জুতসই প্রাণবন্ত ছন্দ ও বৈশিষ্ট্যের নিত্যনতুন আকৃতি ও চিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছিল।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও ইতিহাসের বাস্তবতা তুলে ধরার পর আমরা বলতে পারি, এমন অনন্য ও শাশ্বত অবদানের জন্য অবশ্যই ইসলামি সভ্যতাকে যথার্থ ও শ্রেষ্ঠ ঘোষণা দেওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। আর এসব চিরন্তন অর্জন ও প্রভাব আমাদের ইসলামি সভ্যতার, যা মানবতার দিগন্তে নিকষ কালো অন্ধকারের পর মানবতাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলোকিত রেখেছিল।

---

[৪৩৫]. ফিলিপ্পো লিপ্পি (Filippo Lippi) ১৪০৬ সালে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশটিরও বেশি বিশ্ববিখ্যাত চিত্র অঙ্কন করেছেন। ১৪৬৯ সালে স্পোলেতোতে তার মৃত্যু হয়।-অনুবাদক।

[৪৩৬]. ভেরোচ্চিয়ো (Andrea del Verrocchio) ১৪৩৫ সালে ইতালির ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। 'ম্যাডোনা উইথ সিটেড চাইল্ড', 'ব্যাপ্টিজম অফ ক্রিস্ট', 'তোবিয়াস অ্যান্ড দা অ্যাঞ্জেল' তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম। তিনি ১৪৮৮ সালে ভেনিসে মৃত্যুবরণ করেন।-অনুবাদক

[৪৩৭]. ইনাস হুসনি, *আসারুল ফন্নিল ইসলামিয়্যি আলাত তাসবিরি ফি আসরিন নাহদাতি*, পৃ. ১২৯
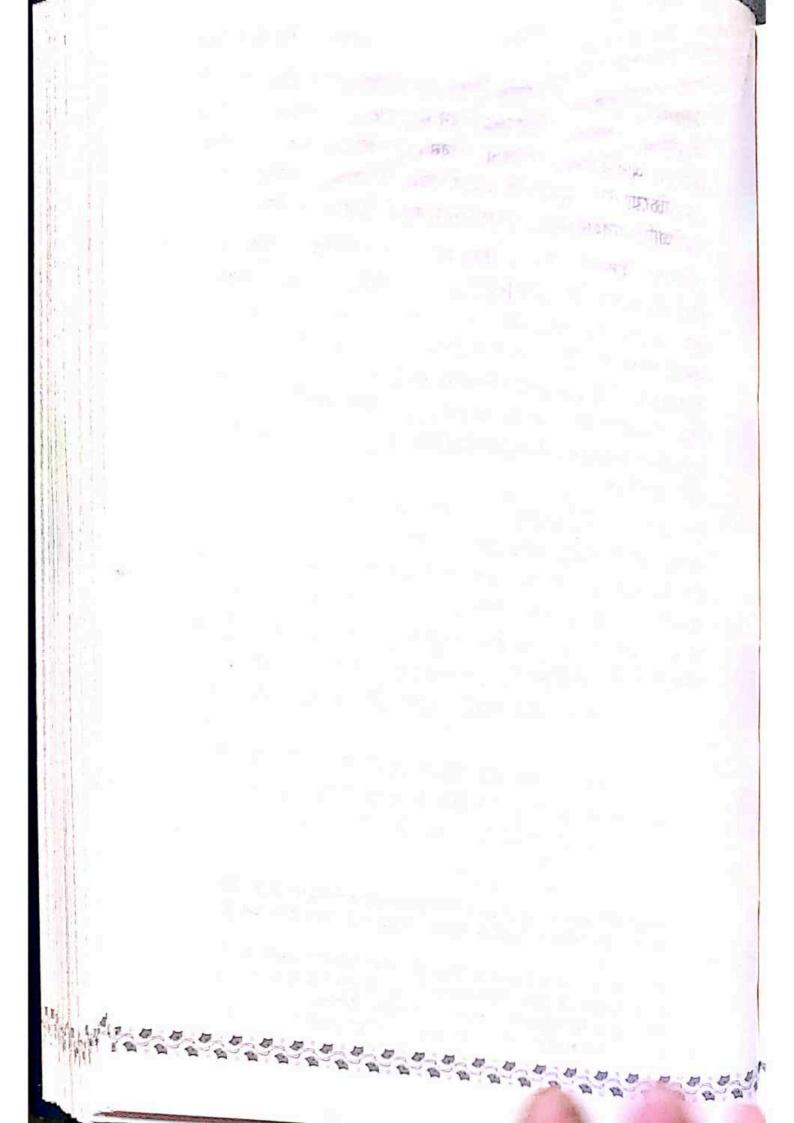
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম সভ্যতার মূল্যায়নে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

পশ্চিমারা (অত্যন্ত কৌশলে) ইসলামি সভ্যতার মাহাত্ম্য এবং মানবসভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে ইসলামি সভ্যতার অবদানকে হেয় করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তাই তাদের কেউ কেউ মনে করে মুসলিমরা শুধু পূর্ববর্তীদের সভ্যতা-সংস্কৃতির নকলকারী। আবার কেউ কেউ শুধু গ্রিক ও রোমানদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে দাবি করে যে, ইসলামি সভ্যতা সামগ্রিক দিক থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করার উপযুক্ত নয়।

তারা মুসলিমদের কীর্তি ও ভূমিকা ভুলে গিয়ে গ্রিক ও রোমানদেরকেই কেবল ইউরোপীয়দের শিক্ষক মনে করে। তারা মনে করে এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের কোনো অবদান নেই। তাদের কেউ কেউ মুসলিমদের সভ্যতার অর্জন ও প্রভাবকেও হেয়জ্ঞান করতে চায়। তাদের যুক্তি এই যে, মুসলিমরা জ্ঞানের এমনকিছু শাখায় উৎকর্ষ সাধন করেছে যেগুলোতে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করতে তেমন চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া অন্যান্য শাখায় তারা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই না করেই অন্যদের থেকে সংগ্রহ ও নকল করেছে এবং সেসব ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের কোনো অবদান নেই।

আসল কথা এই যে, মুসলিমদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যারা বিদ্বেষপরায়ণ ও হিংসুটে এবং যারা মানবতার অগ্রযাত্রায় মুসলিমদের অবদান সম্বন্ধে অজ্ঞ তাদের অবস্থা এমনই। তাদের বিপরীতে প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিকদের একটি দলের অবস্থান আমাদের বক্তব্যকে জোরালোভাবে সমর্থন করে। তারা মানবসভ্যতায় মুসলিমদের শেষ্ঠত্ব ও অনন্য অবদানকে নজর দিয়ে দেখেছেন, ফলে যা সত্য সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং

তা স্বীকার করে নিয়েছেন। শ্রেষ্ঠত্ব যার প্রাপ্য তারা তাকেই তা দিয়েছেন। তারা এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতা নিয়ে বহু গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র রচনা করেছেন। সেগুলো ঘোষণা করেছে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কীর্তির কথা, যা কখনো অস্বীকার করা যায় না। তাদের একজন বলেছেন, একটি জাতি সম্বন্ধে কথা বলার সময় এসেছে। যে জাতি পৃথিবীর নানা ঘটনাপ্রবাহে জোরালো ভূমিকা রেখেছিল এবং প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাশ্চাত্য তাদের কাছে ঋণী এবং মানবতাও তাদের কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী।[৪৩৮]

এ পরিচ্ছেদে আমরা এ সকল ন্যায়নিষ্ঠ প্রাচ্যবিদের স্বীকৃতির কিছু দিক তুলে ধরতে সচেষ্ট হব। মানবতার অগ্রযাত্রায় ও আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ইসলামি সভ্যতার মৌলিকতা, অসামান্য অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদেরকে হতবাক করে দিয়েছে। ইসলামি সভ্যতার এসব অবদান অসংখ্য ও অগণিত। মুসলিমদের সর্বাধিক অবদানের বিষয়টিকে সামনে রেখে আমরা তিনটি অনুচ্ছেদে প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি তুলে ধরব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

৪৩৮. সিগরিড হুংকে, শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব, পৃ. ১১।

প্রথম অনুচ্ছেদ

জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

ইউরোপীয় সুবিবেচকরা যেসব বিষয়ে তাদের ন্যায়পূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সম্ভবত বিজ্ঞানই এর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। এটি প্রধানত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে হয়েছে, এক. বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিমদের অবদান। দুই. পশ্চিমা সুবিবেচকদের সেসব গোঁড়া ও উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কথা প্রত্যাখ্যান করা, যারা মুসলিমদের সবরকমের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে অস্বীকার করে। তা পরীক্ষামূলক জ্ঞানের যত বড় বিষয়ই হোক না কেন। যেমন, যন্ত্রপ্রকৌশল, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি।

নিচে সুবিবেচক ইউরোপীয়দের কিছু স্বীকৃতি তুলে ধরা হলো:

মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার যেকোনো চিত্র যেকোনো দিক থেকে লক্ষ করলে কেবল মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিভাত হয়।[৪৩৯]

সিগরিড হুংকে বলেন, আরবজাতি গ্রিকদের থেকে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কাঁচামাল (তথা তথ্যসমূহকে) নিজেদের গবেষণার মাধ্যমে উন্নত করে তোলে। সেগুলোকে নতুন রূপ দান করে। প্রকৃতপক্ষে আরবজাতিই পরীক্ষাভিত্তিক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপদ্ধতি আবিষ্কার করে..। তারা যে শুধু গ্রিক সভ্যতাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করে তাকে নতুন বিন্যাসে সাজিয়ে ইউরোপীয়দের উপহারই দিয়েছে তা নয়; বরং তারা রসায়ন, পদার্থ, গণিত, বীজগণিত, প্রাণিবিদ্যা, ত্রিকোণমিতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রে নিরীক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবক। এসব ছাড়াও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা মৌলিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে অপরিসীম অবদান রাখে। তাদের অধিকাংশ কৃতিত্বই ছিনিয়ে নিয়ে অন্যদের গলায় পরানো হয়েছে।

---

[৪৩৯] রবার্ট ব্রিফল্ট, *The Making of Humanity*, আনওয়ার আল-জুনদি, *মুকাদ্দিমাতুল উলুম ওয়াল-মানাহিজ*, খ. ৪, পৃ. ৭১০ থেকে উদ্ধৃত।

আরবজাতি বিশ্ববাসীকে সবচেয়ে মূল্যবান যে উপহারে ভূষিত করেছে তা হলো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতি। যা পাশ্চাত্যের সামনে পদার্থবিদ্যার অনেক রহস্য উন্মোচনের পথ খুলে দেয় এবং পদার্থবিজ্ঞানের ওপর রাজত্ব করার সুযোগ এনে দেয়।[৪৪০]

হুংকে আরও বলেন, প্রকৃতপক্ষে রজার বেকন বা ব্যাকফন ভারলাম, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বা গ্যালিলিও—কেউই বিজ্ঞানে নিরীক্ষণপদ্ধতির আবিষ্কার করেননি। এই ক্ষেত্রে আরবরাই পথিকৃৎ। তা ছাড়া (ইউরোপীয়দের নিকট আল-হাযেন নামে পরিচিত) ইবনুল হাইসাম তার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যা-কিছুর বাস্তবরূপ দিয়েছেন তা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ছাড়া কিছু নয়।[৪৪১]

সিগরিড হুংকে আরও বলেন, পাশ্চাত্যের সর্বাধিক প্রভাবশালী আরব শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন হাসান ইবনুল হাইসাম। পশ্চিমা বিশ্বে এই প্রতিভাবান আরব বিজ্ঞানীর প্রভাব ছিল অনেক। পদার্থবিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞানে তার মতবাদ ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপর আমাদের এই আধুনিক কাল পর্যন্ত কর্তৃত্ব করেছে। ইবনুল হাইসামের *আল-মানাযির* গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ইংরেজ বিজ্ঞানী রজার বেকন থেকে শুরু করে জার্মান বিজ্ঞানী ভিটেলো পর্যন্ত আলোকবিদ্যা-সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও বিদ্যার উদ্ভব ঘটে। ক্যামেরা অবস্কিউরা (Camera obscura), নলকূপ ও লেদমেশিনের আবিষ্কারক এবং প্রথম উড়োজাহাজ তৈরির দাবিদার ইতালীয় বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সরাসরি আরবদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ইবনুল হাইসামের কীর্তি ও অবদান তাকে অনেক চিন্তা জুগিয়েছিল। গ্যালিলিও যে-সকল সূত্র ও তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বড় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অজানা তারকারাজি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে কেপলার যখন সেসব সূত্র নিয়ে গবেষণা করেন, তার ওপর ইবনুল হাইসামের দীর্ঘ প্রভাব-ছায়া ছিল। বর্তমান সময়েও এই কঠিন গাণিতিক পদার্থবৈজ্ঞানিক সমস্যা বিদ্যমান। ইবনুল হাইসাম বীজগণিতে তার গভীর দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে চতুর্ঘাত সমীকরণের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। আমরা আরও বলি,

---

[৪৪০]. সিগরিড হুংকে : *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ৪০১, ৪০২।

[৪৪১]. সিগরিড হুংকে : *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ১৪৮, ১৪৯।

আতশি কাচের (Burning Mirror) মাধ্যমে আলো প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতন কোণ ও প্রতিফলিত কোণ সর্বদা সমান হয়—এটিকে এখনো ইবনুল হাইসামের দিকে সম্বন্ধ করে 'হাইসামি তত্ত্ব' বলা হয়।[৪৪২]

চিত্র নং-৩৬
ইবনুল হাইসামের গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ

ফ্লোরিয়ান কাজোরি তার *পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস* গ্রন্থে[৪৪৩] বলেন, আরবের মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রথম যথাযথভাবে পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন। এ পদ্ধতির আবিষ্কার তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম অধ্যায়। পদার্থবিদ্যায় এর গুরুত্ব ও উপকারিতা তারাই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাদের অগ্রভাগে রয়েছেন ইবনুল হাইসাম।[৪৪৪]

ম্যাক্স ফ্যান্টিগো বলেন, সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ইসলামি আরব সভ্যতার কাছে ঋণী। গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যা কিছু অর্জন, তা স্পেনে

---

৪৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

৪৪৩. Florian Cajori, *A History of Physics in its Elementary Branches* (১৯১৭)।-অনুবাদক

৪৪৪. আলি আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমুল বাহতাহ ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩০৩।

আরব মুসলিমদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্যাণে ইসলামি জগতের সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মেলামেশা ও সংশ্লিষ্টতার ফসল।[৪৪৫]

রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে ইসলামি আরব সভ্যতার উৎকর্ষের সূচনা হয় এবং তা পুবে পারস্য ও পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সনাতন জ্ঞানবিজ্ঞানের এক বিরাট অংশের পুনরাবিষ্কার হয় এবং পদার্থ, রসায়ন ও গণিত ইত্যাদি শাখায় আবিষ্কারের নবধারা সৃষ্টি হয়। এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও আরবজাতি ইউরোপীয়দের শিক্ষকে পরিণত হয় এবং তারা এ মহাদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের রেনেসাঁসে অবদান রাখে।[৪৪৬]

জার্মান গবেষক ড. পিটার ই. পোরম্যান[৪৪৭] বলেন, বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখায় মুসলিমদের অবদান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অধিকন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে তাদের অর্জন ও অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ ব্যাপারটিই আমাকে *Medieval Islamic Medicine* শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তিনি আরও বলেন, এই গ্রন্থ রচনার আরেকটি কারণ এই যে, আমি একজন জার্মান খ্রিষ্টান হিসেবে আমার সংস্কৃতির বিরাট অংশে ইসলামি সংস্কৃতির যে অবদান রয়েছে তার কাছে ঋণী। আমি ব্যাপারটি স্পষ্ট করার এবং জোরালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যদিও কতিপয় লোক ইউরোপে ও বিশ্বে মুসলিমরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা মুছে ফেলতে তৎপর। আমি এবং আমার গবেষণা-সহকারী এমিলি স্যাভেজ স্মিথ[৪৪৮] মধ্যযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলিমদের অবদান তুলে আনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছি।

---

[৪৪৫]. ১৯৫৩ সালে ব্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইসলামি আরবসভ্যতা শীর্ষক সেমিনারে ম্যাক্স ফ্যান্টিগো এ কথা বলেন। দেখুন, শাওকি আবু খলিল, হানি মুবারক, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিন-নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, পৃ. ১২৫।

[৪৪৬]. রবার্ট ব্রিফল্ট, *নাশআতুল ইনসানিয়্যা*, পৃ. ৮৪।

[৪৪৭] পিটার ই. পোরম্যান (Peter E. Pormann) ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্রুপদি ও গ্রিক-অ্যারাবিক স্টাডিজের অধ্যাপক। তিনি ও এমিলি স্মিথ যৌথভাবে *Medieval Islamic Medicine* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। পিটা ই. পোরম্যানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *The Philosophical Works of Al-Kindi*।-অনুবাদক

[৪৪৮]. এমিলি স্যাভেজ স্মিথ (Emilie Savage-Smith) : ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট ক্রস কলেজের মহাফেজখানার তত্ত্বাবধায়ক।

তিনি আরও বলেন, ইসলামি হাসপাতালগুলো ইসলামি ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল। এসব হাসপাতালে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সব মানুষের চিকিৎসা দেওয়া হতো। ইহুদি, খ্রিষ্টান, নক্ষত্রপূজারি, জরথুস্ত্রীয় সবাই চিকিৎসাসেবা পেত। ইসলামি হাসপাতালগুলো সবাইকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করত। অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের এ এক অনন্য উদারতা।

মুসলিমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসায় অবদান রেখেছে। ড. পোরম্যান বলেন, মুসলিমরা বহু কঠিন ও জটিল রোগের চিকিৎসা উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জটিল হলো মনোরোগ মেলানকোলিয়া (melancholia, বিষাদ-বায়ু, বিমর্ষতা, দৌর্মনস্য)।[৪৪৯]

উইল ডুরান্ট বলেন, মুসলিমরাই রসায়নকে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপদান করেন। তারা এই ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই-বাছাইয়ে যত্নশীল হন। অথচ আমাদের জানামতে, এই ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবদান কিছু শিল্প-অভিজ্ঞতা ও অস্পষ্ট ধারণানির্ভর তত্ত্বে সীমাবদ্ধ ছিল।[৪৫০]

ডোনাল্ড আর. হিল বলেন, প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রসায়নের প্রধান প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আল-রাযি অনন্য ব্যক্তিত্ব। এটা তার তুলনামূলক পদ্ধতির অনুসরণ এবং আবশ্যকীয় পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিরবচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকার ফলে সম্ভব হয়েছিল।[৪৫১]

এ বিষয়ে ডোনাল্ড আর. হিলের আরও একটি স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ইউরোপীয়দের বহু আগে মুসলিমরা আপেক্ষিক ভরের রেখাচিত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। অথচ ইউরোপ সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। রবার্ট বয়েল (মৃ. ১৬৯১ খ্রি.)-এর সময়ে এসে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। তিনি দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে পারদের আপেক্ষিক ভর নির্ধারণ করেন। পদ্ধতি দুটি থেকে প্রাপ্ত ভরের মান ছিল ১৩.৭৬ এবং ১৩.৩৫৭; উভয়টি খাযিনির নির্ধারিত মানের চেয়ে

---

৪৪৯. *আল-আখবারুল মিসরিয়া* (সংবাদপত্র), ১৩ এপ্রিল, ২০০৭।

৪৫০. আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৩৫৬।

৪৫১. ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুমু ওয়াল-হানদাসাতু ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, অনুবাদ : আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১০২।

তুলনামূলক কম নিখুঁত। খাযিনির অধিকাংশ পরীক্ষাফলই ছিল চূড়ান্ত নিখুঁত।[৪৫২]

গুস্তাভ লি বোঁ বলেন, জাবির ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থাবলি থেকে একটি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ রচিত হয়। তাতে তৎকালীন আরব মনীষীরা রসায়নশাস্ত্রে যে অবদান রেখেছিলেন তার নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে। তা ছাড়া এসব বিশ্বকোষে রসায়নের অনেক যৌগিক মৌলের বর্ণনা রয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোথাও উল্লেখিত হয়নি। যেমন নাইট্রিক এসিড। জাবির ইবনে হাইয়ানকে বাদ দিয়ে আমরা রসায়নশাস্ত্রের কল্পনাও করতে পারি না।[৪৫৩]

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফ্লোরিয়ান কাজোরি বলেন, বীজগণিতে আরব এবং মুসলিমদের অবদানের প্রতি লক্ষ করলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। বীজগণিতের ওপর লেখা খাওয়ারিজমির গ্রন্থটি[৪৫৪] ছিল এক জ্ঞান-প্রস্রবণ, যেখান থেকে পরবর্তী মুসলিম ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা সমানভাবে আহরণ করেছেন, তাদের গবেষণাকর্মে এই গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল থেকেছেন এবং এখান থেকে বহু তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। অনেক মৌলিক নীতিমালা তারা এ বই থেকেই সংগ্রহ করেছেন। তাই এ কথা বলা যথার্থ যে, খাওয়ারিজমিই বীজগণিতশাস্ত্রকে তার সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪৫৫]

জাঁ ফ্রিনেট বলেন, আমরা যখন এর নিপুণতা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলাম, দেখলাম যে গণিতশাস্ত্রে মুসলিমদের বৈজ্ঞানিক বিকাশের মূলনীতির সূচনা হয়েছে কুরআনুল কারিম থেকে। মিরাস বণ্টন-সম্পর্কিত যে জটিল বিধান কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তাতে এসব মূলনীতি রয়েছে। খাওয়ারিজমিকে প্রথম মুসলিম গণিতশাস্ত্রবিদ মনে করা হয়। সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় ও মানদণ্ডের জন্য আরবিতে প্রণালিবদ্ধ পদ্ধতি প্রণয়নে তিনি যে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিরেন তার জন্য আমরা তার কাছে ঋণী। যেমন আমরা স্প্যানিশ শব্দ 'গাওয়ারিজমি'-র জন্যও তার কাছে ঋণী। যার অর্থ সংখ্যায়ন

---

৪৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
৪৫৩. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ৪৭৫।
৪৫৪. كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة (*The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing*)।
৪৫৫. আলি আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*।

(সংখ্যা, সংখ্যার স্থানীয় মান ও শূন্য)। বীজগণিত ছিল খাওয়ারিজমির দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র। এটি গণিতশাস্ত্রের একটি শাখা। এটি তখনও পদ্ধতিমূলক গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল না।[৪৫৬]

চিত্র নং-৩৭

খাওয়ারিজমির গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ

ড্রেপার বলেন, পরীক্ষানিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ আরবদের[৪৫৭] স্বভাবগত বিষয়। জ্যামিতি ও গণিতকে তারা চিন্তা ও অনুমানের উপায় মনে করত। প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যন্ত্রপ্রকৌশল, তরল পদার্থ ও আলোকবিদ্যা সম্পর্কে তারা যা লিখেছেন তাতে কেবল তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেননি; বরং পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন। এটা তাদের জন্য রসায়নশাস্ত্রকে কাজে লাগানোর পথ প্রস্তুত করে দিয়েছে।

---

৪৫৬. জাঁ ফ্রিনেট, যোসেফ শাখ্ত (Joseph Franz Schacht) ও ক্লিফোর্ড বসওয়র্থ (Clifford Edmund Bosworth) কর্তৃক সম্পাদিত The Legacy of Islam, আরবি অনুবাদ : تراث الإسلام, ৩য় অংশ, পৃ. ১৬৮।

৪৫৭. লক্ষণীয় বিষয় হলো, অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ আরব বলে মুসলিম উদ্দেশ্য নেন। এখানেও তা-ই ঘটেছে।

পরিশোধন ও বাষ্পীভবনের সরঞ্জাম এবং ভারী বস্তু উত্তোলন-যন্ত্র আবিষ্কারে তাদের পথপ্রদর্শন করেছে...। এর মাধ্যমে তাদের সামনে জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতির উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধনের বিশাল দুয়ার উন্মোচিত হয়।[৪৫৮]

ডেভিড ইউজিন স্মিথ তার *গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস*[৪৫৯] গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, ইউরোপীয়রা দাবি করে থাকে যে দোলক-নীতির আবিষ্কারক হলেন গ্যালিলিও। অথচ ইবনে ইউনুস[৪৬০] তার আগেই এই নীতি পর্যবেক্ষণ করেন। কারণ, আরবের জ্যোতির্বিদগণ তারকা পর্যবেক্ষণকালে সময়ের হিসাব রাখার জন্য দোলক ব্যবহার করতেন।

জর্জ সার্টন তার *Introduction to the History of Science* গ্রন্থে সম্পূরকরূপে আরও বলেন, ইবনে ইউনুস সন্দেহাতীতভাবে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের অন্যতম প্রতিভাবান মনীষী। তিনি মিশরের একজন মহান জ্যোতির্বিদ। তিনিই দোলকের আবিষ্কারক।[৪৬১]

ইয়োহান গ্যোটে বলেন, আরবরা আমাদেরকে গ্রন্থ রচনা শিখিয়েছে। বারুদের ব্যবহার এবং কম্পাসও আবিষ্কার করেছে। আমাদের ভাবা উচিত, আরব সভ্যতার যেসব কীর্তি আমাদের হাতে পৌঁছেছে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলে আমাদের রেনেসাঁস সম্ভব হতো না।[৪৬২]

শার্ল সেইনোবোস বলেন, আরবরা প্রাচ্যের প্রাচীন বিশ্ব (গ্রিস, পারস্য, ভারতবর্ষ ও চীন) থেকে প্রাপ্ত বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার একত্র করেছে, সমন্বয় করেছে এবং তারাই তা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। অনেক আরবি শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করেছে। এটা সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাদের থেকে বিজ্ঞানের অনেককিছু গ্রহণ করেছি। আরবদের

---

৪৫৮. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. [illegible]।

৪৫৯. David Eugene Smith, History of Mathematics.

৪৬০. ইবনে ইউনুস : আবুল হাসান আলি ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস (মৃ. [illegible] হি./[illegible] খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী। উল্লেখযোগ্য রচনা : আল-যিজুল হাকিমি, যা যিজ ইবনে ইউনুস নামে পরিচিত। মিশরের ফুসতাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন কায়রোতে। [illegible] তিনি সময় পরিমাপের জন্য [illegible] দোলক ব্যবহার করেছিলেন [illegible]। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খ. ২, পৃ. [illegible]।

৪৬১. [illegible], পৃ. [illegible]।

৪৬২. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা, খ. ১, পৃ. [illegible]।

কল্যাণেই বর্বর পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতার কাতারে প্রবেশ করতে পেরেছে। আমাদের চিন্তা এবং শিল্প ছিল সেকেলে। তখন জীবনকে সহজ ও স্বস্তিকর করার সব আবিষ্কার আরবদের থেকে আমাদের কাছে এসে হাজির হয়। ইউরোপীয়রা আরবদের থেকে অনেক শিল্পকৌশল শিখে নিয়েছিল; এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বস্ত্রশিল্প। ইতালির পিসার অধিবাসীরা আলজেরিয়ার বেজায়া শহরে যাত্রাবিরতি করত। সেখান থেকে তারা মোমবাতি বানানোর বিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। পরে এই বিদ্যা তারা নিজ দেশে ও ইউরোপে সরবরাহ করে।[৪৬৩]

রেসন বলেন, আবাদি এলাকায় আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমান দ্রুততায় তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটে। তা আমাদের আরব সভ্যতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই উন্নত সভ্যতা মধ্যযুগে ছিল বাইজান্টাইনীয় এবং পারস্যসভ্যতার মিশ্রিতরূপ। সভ্যতার এ ধরনের মিশ্রণ পরিপূর্ণতা পায় দুটি কারণে : **এক.** আরবদের ব্যবসাপ্রীতি; **দুই.** নগরায়ণের প্রতি তাদের অনুরাগ। তীক্ষ্ণ মেধা এবং প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সহজাত প্রেরণা তাদেরকে পদার্থবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। পৃথিবীর সকল জাতির ওপর আরবদের অশেষ অবদান রয়েছে। বিশেষ করে আরবি সংখ্যা, বীজগণিত উদ্ভাবন এবং জ্যামিতির সুষম রূপদানের ক্ষেত্রে।[৪৬৪]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে, সত্য কথা এই যে, বর্তমান সময়ে প্রচলিত অনেক ওষুধের নাম, ওষুধের উপাদান এবং ওষুধ প্রস্তুকরণপ্রণালি আরবদের সৃষ্টি; বরং বাস্তবতা এই যে, আধুনিক রাসায়নিক পরিবর্তন ও সংশোধন (Chemical modifications) ছাড়াও আধুনিক ওষুধবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছেন আরবরা।[৪৬৫]

---

৪৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৩-২৩৪।
৪৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।
৪৬৫. *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*, খ. ১৮, পৃ. ৪৬, ১১তম সংস্করণ।
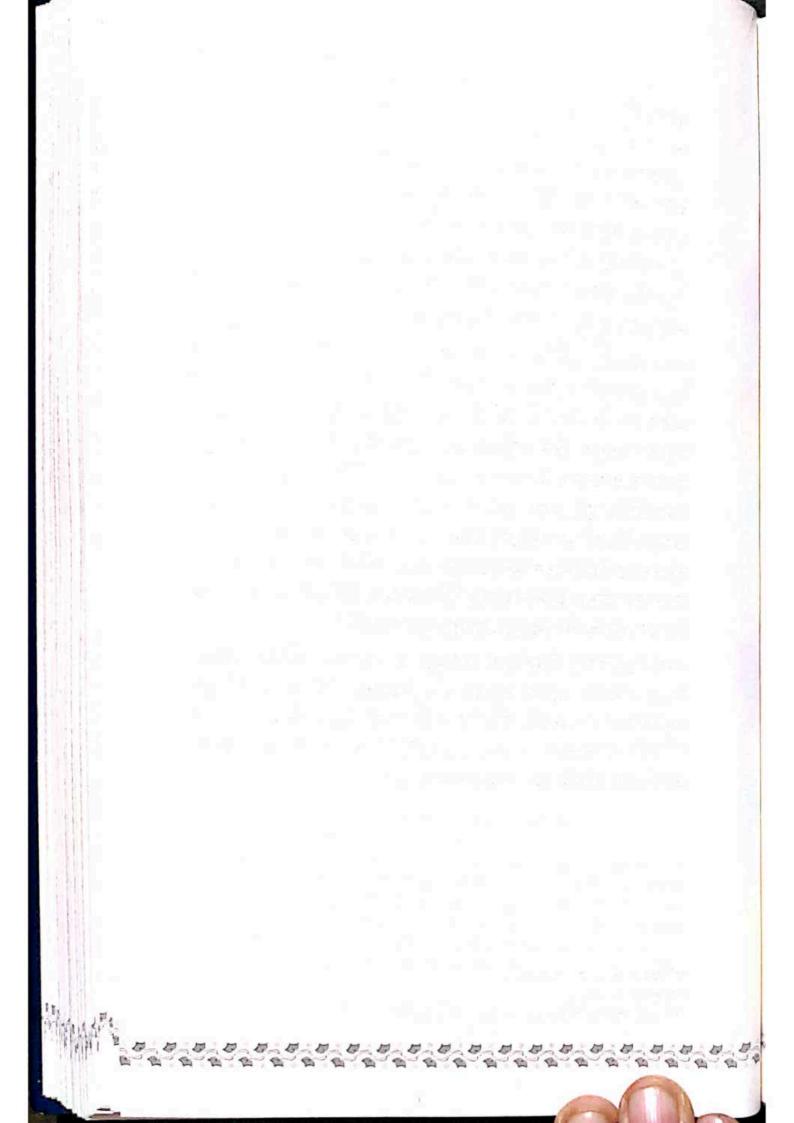
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

নৈতিকতা ধর্ম থেকেই উৎসারিত। যে ধর্ম নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে, নৈতিক গুণাবলিতে ভূষিত হওয়ার আহ্বান জানায় এবং চারিত্রিক কদর্যতাকে ঘৃণিত করে তোলে, এমন ধর্মের বন্ধন না থাকলে নীতিমান হওয়া যায় না। ইসলামি সভ্যতায় নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রাচ্যবিদদের যে প্রশংসা ও স্বীকৃতি রয়েছে তার অধিকাংশ মূলত সামগ্রিক অর্থে ইসলামধর্মেরই প্রাপ্য।

পাশ্চাত্যের নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সেরকম কিছু স্বীকৃতি ও প্রশংসাবাণী এখানে উল্লেখ করা হলো :

গ্লেন লিউনার্দ বলেন, ইসলামি বিধিবিধান মেনে চললে ইউরোপের অবস্থা আজ এমন জটিল সমীকরণ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকত এবং চরম অকৃতজ্ঞতা ও হেয়জ্ঞান করার নীচু মানসিকতার পরিবর্তে চিরকৃতজ্ঞতার পরিবেশ তৈরি হতো। অথচ আজ পর্যন্ত ইউরোপ সত্যিকার অর্থে ও নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে মহান ইসলামধর্মের স্বীকৃতি দেয়নি, অথচ তারা ইসলামি শিক্ষা ও আরব সভ্যতার জন্য এই ধর্মের কাছে ঋণী। তবে তারা নিতান্ত অনাগ্রহ ও শৈথিল্যের সঙ্গে এই ধর্মের ঋণ স্বীকার করেছে শুধু সেই অন্ধকার যুগের জন্য যখন সমগ্র ইউরোপ হাবুডুবু খাচ্ছিল বর্বরতা ও অজ্ঞতার মহাসাগরে। ইসলামি সভ্যতায় আরবরা জ্ঞান ও নাগরিক সমৃদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছেছে এবং ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থাকে জীবন দিয়েছে, তাকে অধঃপতনের কবল থেকে রক্ষা করেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির শীর্ষ অবস্থানে থেকে আমাদের আত্মোপলব্ধি এই যে, যদি ইসলামি সংস্কৃতি ও আরব সভ্যতা এবং নাগরিক সমস্যা সমাধানে তাদের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উত্তম ব্যবস্থাপনা না থাকত, তাহলে আজ পর্যন্ত ইউরোপ মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত।[৪৬৬]

---

৪৬৬. মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, পৃ. ৮২।

ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ. জি ওয়েলস বলেন, যে ধর্ম নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, তাকে দেয়ালে ছুড়ে মারো। আমি যে সত্যধর্মকে নাগরিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তাল মিলিয়ে চলতে দেখেছি তা হচ্ছে ইসলামধর্ম।

কেউ প্রমাণ চাইলে কুরআন পড়ুক এবং কুরআনে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের ধারা, সামাজিক রীতিনীতি লক্ষ করুক। সর্বোপরি এটা ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি সর্বজ্ঞানের এক কিতাব। কেউ যদি আমার কাছে সংক্ষেপে ইসলামের সংজ্ঞা চায়, তাহলে এক কথায় বলব, 'ইসলাম মানেই হলো সভ্যতা'।[৪৬৭]

রবার্ট ব্রিফল্ট বলেন, রজার বেকন[৪৬৮] ছিলেন ইসলামি জ্ঞান ও রীতি-পদ্ধতিকে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন দূত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলতে কখনো দ্বিধা করেননি যে, আরবি ভাষা ও আরবদের জ্ঞানবিজ্ঞান হলো সত্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ..।[৪৬৯]

ইসলামি সভ্যতা স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের শিক্ষা থেকেই উৎসারিত। আর ইসলামি সভ্যতা যেভাবে ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং একত্ববাদের বিচারে থেকে মানবেতিহাসের অন্য সকল সভ্যতা থেকে ভিন্ন, তেমনই সহিষ্ণুতা, মানবিকতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দিক থেকেও এই সভ্যতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।[৪৭০]

আর গুস্তাভ লি বোঁ বলেন, নিঃসন্দেহে আরবীয় মুসলিম সভ্যতাই ইউরোপের বর্বর জাতিগুলোকে মানবিক জগতে প্রবেশ করিয়েছে। নিশ্চয় আরবরা আমাদের শিক্ষক। ...আর এটা সত্য যে পাশ্চাত্যের

---

৪৬৭. আবদুল মুনয়িম নিমর, *আল-ইসলাম ওয়াল-মাবাদিউল মুসতাওরিদা*, পৃ. ৮৪।

৪৬৮. রজার বেকন (১২১৪-১২৯২ খ্রি.) মধ্যযুগের ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে প্রথম পথিকৃৎ। রজার বেকন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি নানাভাবে নিগ্রহের শিকার হন। তাকে ধর্মদ্রোহীও ঘোষণা করে তারা। তিনি গ্রিক দার্শনিক ও আরব চিন্তাবিদদের চিন্তারাজিকে অধ্যয়ন করেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধর্মযাজকের বাণীর চেয়ে গ্রিক ও আরব দার্শনিকদের যুক্তি বেশি মূল্যবান ঘোষণা করায় যাজক সম্প্রদায় তার উপর ভীষণ ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তাকে দশ বছরেরও বেশি সময় নজরবন্দি করে রাখা হয়। সরদার ফজলুল করিম কৃত *দর্শনকোষ* অবলম্বনে, পৃ. ৭৪-৭৫।-অনুবাদক

৪৬৯. রবার্ট ব্রিফল্ট, *বিনাউল ইনসানিয়্যাহ*, আনওয়ার জুনদি রচিত *মুকাদ্দিমাতুল উলুম ওয়াল-মানাহিজ*, খ. ৪, পৃ. ৭১০ থেকে উদ্ধৃত।

৪৭০. আবদুল মুতি আদ-দালাতি, *রাবিহতু মুহাম্মাদান ওয়া লাম আখসার আল-মাসিহ*, পৃ. ১২৮।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবদের রচনাবলি ছাড়া জ্ঞানচর্চার জন্য অন্য কোনো উৎস খুঁজে পায়নি। সুতরাং বলা যায় আরবরাই ইউরোপকে সুসভ্য করেছে। সেটা বৈষয়িক দিক থেকে যেমন, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিক ও নীতি-নৈতিকতার দিক থেকেও। বিশ্ব-ইতিহাস আরবদের ন্যায় এমন স্বর্ণপ্রসবা জাতি আর প্রত্যক্ষ করেনি।... সভ্যতার ক্ষেত্রে ইউরোপ আরবদের কাছে ঋণী।... প্রথম আরবরাই বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়েছে যে, কীভাবে ধর্মের ওপর অবিচলতা এবং চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।... তারাই খ্রিষ্টান জাতিকে শিক্ষিত করে তুলেছে, বরং চাইলে বলতে পারো যে, তারাই খ্রিষ্টানজাতিকে মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণ সহিষ্ণুতা ও উদারতা শিক্ষাদানের প্রয়াস পেয়েছে।... ইসলামের শুরুর যুগে মুসলিমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক গুণাবলি বিশ্বের অন্য সকল জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল।[৪৭১]

এন্ড্রু ডিকসন হোয়াইট[৪৭২] বলেন, হযরত উমরের যুগ ও তার পরবর্তী সময় থেকে মুসলিমবিশ্বে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে অত্যন্ত মমতাপূর্ণ ও মানবিক আচরণ করা হয়। কিন্তু গোটা খ্রিষ্টীয় জগতের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রায় আট শতাব্দীব্যাপী এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। সে সময়ে ইউরোপে মানসিক রোগীদের শয়তানের আছরগ্রস্ত মনে করা হতো। যে কারণে তাদের সঙ্গে চরম নিষ্ঠুর ও বর্বর আচরণ করা হতো।

তিনি আরও বলেন, পাদরি জন হার্ড অষ্টাদশ শতকে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পাদরি ও পরিব্রাজকেরা সে সময়ে এবং তারও পূর্বে পর্যবেক্ষণ করেন যে, মুসলিমগণ মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য অত্যন্ত মানবিকতাপূর্ণ উপায় অবলম্বন করেন। এ ধরনের কোনো দৃষ্টান্ত তারা খ্রিষ্টীয় ইউরোপ-ভূমিতে দেখতে পাননি। সত্য এটাই যে মানসিক রোগীদের সঙ্গে দয়ার্দ্র ও মানবিকতাপূর্ণ আচরণের ক্ষেত্রে মুসলিমরা বহু পূর্বেই সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, অথচ ইউরোপে এর সূচনা ঘটেছে অষ্টদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে।[৪৭৩]

---

৪৭১. গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, পৃ. ২৬, ২৭৬, ৪৩০, ৫৬৬।

৪৭২. এন্ড্রু ডিকসন হোয়াইট (Andrew Dickson White 1832-1918) : আমেরিকান সিনেটর ও লেখক। তাকে নিউইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৪৭৩. দেখুন, A. D. White, *A history of the warfare of science with theology in Christendom*, খ. ১১, পৃ. ১২৩।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু[৪৭৪] তার বিখ্যাত গ্রন্থ *ডিসকভারি অব ইন্ডিয়াতে* বলেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মুসলিম বিজেতাদের আগমন ও ইসলামের প্রবেশ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতীয় সমাজে যে ব্যাধি ও পচন ছড়িয়ে পড়েছিল, ইসলাম তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যে বর্ণভেদ, অচ্ছুত প্রথা ও বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রবণতা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ইসলামই তা চিহ্নিত করেছে। ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিমজাতি লালন করে ভারতীয়দের জনমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাব সেসব দুর্ভাগা জনগোষ্ঠীর ওপরই ছিল সর্বাধিক, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা যাদের সাম্য ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।[৪৭৫]

প্রফেসর হকিং বলেন, জ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোর প্রতি অনির্বাণ তৃষ্ণা ছিল আরবদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে প্রবলভাবে শাণিত করে তোলে। তারা ছিল স্বাধীনচেতা। সকল ধরনের স্থবিরতা ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে সবসময় তারা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম আদর্শের অভিলাষী ছিল।... অচিরেই আমরা দেখতে পাব, যে অগ্নিময় ঝাঁপটা ও আত্মবিস্মৃতির ঘোর আরবদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা কেটে গেলে, জ্ঞানবিপ্লব ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের সুপ্ত উপাদানসমূহের উদ্‌গিরণ ঘটবে। ফলে আরবরা পুনরায় বিশ্বের বুকে তাদের মর্যাদাপূর্ণ আসন দখল করতে পারবে। প্রথম রেনেসাঁসের সময় আরবদের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাদের রেখে যাওয়া অবিস্মরণীয় সব কীর্তি ও জ্ঞানভান্ডারই আমার কথার প্রমাণ।[৪৭৬]

---

৪৭৪. জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

৪৭৫. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ১০৭ থেকে উদ্ধৃত।

৪৭৬. *মাবাদিউস সিয়াসাতিল আলামিয়্যা*, পৃ. ২৫; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাউরুল ফিকরিল আলামিয়্যি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৯ থেকে উদ্ধৃত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমা সুবিবেচকদের স্বীকৃতি

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে চিন্তা হলো এই দ্বীনের প্রতি ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। ইসলামি সভ্যতা যেসব স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এটি তার অন্যতম। আল্লাহ তাআলার চিন্তাযোগ্য কিতাবের মূল বক্তব্য এটিই, এটিই গোটা সৃষ্টিজগতের মূলকথা। পঠিত কিতাব (আল-কুরআনুল কারিম) তার বহু আয়াতে এই কিতাবে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছে...। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতকিছু সত্ত্বেও এমন লোকদেরও আবির্ভাব ঘটেছে যারা চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মের প্রতি ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে চায়!

তাদের অন্যায় দাবির খণ্ডনে স্বয়ং পাশ্চাত্যের কিছু ন্যায়বান মনীষীর সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি জেনে নেওয়া যাক :

এতেইন্নে দিনেত (Etienne Dinet)[৪৭৭] বলেন, ইউরোপে চিন্তার স্বাধীনতা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে প্রধান কৃতিত্ব যার তিনি হলেন আন্দালুসীয় মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ (১১২০-১১৯৮ খ্রি.)। অবশ্য আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও নাস্তিক্যবাদের মধ্যে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ইবনে রুশদ অ্যারিস্টটলের চিন্তা ও দর্শনের যে ব্যাখ্যা হাজির করেন তার প্রতি মধ্যযুগের ইউরোপের স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তার এসব ব্যাখ্যা শক্তিশালী ইসলামি ভাবপ্রবাহে ছিল। ইবনে রুশদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণের ফলে ইউরোপে যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাই পরবর্তী সময়ে তাদের ধর্মীয় সংস্কারের পথ উন্মুক্ত করার পাশাপাশি আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তাধারার উৎস ছিল। আমরা সত্যিকার অর্থে এভাবেই বিচারবিবেচনা করতে পারি।[৪৭৮]

---

৪৭৭. এতেইন্নে দিনেত (Etienne Dinet 1861-1929) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ, চিত্রকর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক।

৪৭৮. এতেইন্নে দিনেত, *মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ*, পৃ. ৩৪৩।

সিগরিড হুংকে বলেন, আরবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ এবং তাদের হাতে নানান জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিমার্জন, বিন্যাস ও নিরীক্ষণ গোটা পাশ্চাত্যে জোয়ার সৃষ্টি করে...। বস্তুত সে সময়কার ইউরোপীয় জ্ঞানী মহলে এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন না যিনি আরবীয় জ্ঞানভান্ডারে হাত বাড়াননি। সেখান থেকে তারা যা খুশি গ্রহণ করেছেন এবং সুমিষ্ট পানির ঝরনা থেকে পিপাসার্ত যেভাবে জলপান করে সেভাবে জ্ঞান আহরণ করেছেন।... তৎকালীন ইউরোপে রচিত এমন কোনো গ্রন্থ ছিল না যার পৃষ্ঠাসমূহে আরবীয় ঝরনাধারার প্রবল প্রবাহ পরিলক্ষিত হয় না। ইউরোপীয় প্রতিটি গ্রন্থই ছিল আরব জ্ঞানপ্রাচুর্যের মুখাভিনয়। সেগুলোতে আরবীয় প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। শুধু আরবি শব্দ (ইউরোপীয় ভাষায়) অনুবাদের ছাপই নয়, বরং বিষয়বস্তু ও চেতনা প্রকাশেও সেই প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়।[৪৭৯]

তিনি আরও বলেন, শূন্য থেকে শুরু করে সভ্যতার ক্ষেত্রে আরবরা যে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে মানবেতিহাসের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে তা উল্লেখযোগ্য বিষয়। জ্ঞানের ময়দানে ধারাবাহিক বিজয় তাদের সকল সভ্যতার নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে; অন্যান্য সভ্যতার বিবেচনায় তা তুলনাহীন। আরবদের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি আমাদেরকে অবাক করে দেয় যে ইতিহাসে তা কীভাবে ঘটল![৪৮০]

লুইস সিডিও বলেন, ইউরোপ যে ধরনের বিবেকহীনতা, চিন্তাগত দৈন্য, আত্মিক কলুষতা, জ্ঞান ও জ্ঞানীর সঙ্গে নির্দয় আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে ইসলামি সভ্যতা তা প্রত্যক্ষ করেনি। ইতিহাস এটাও সাক্ষ্য দেয় যে ইউরোপে বত্রিশ হাজার জ্ঞানীগুণীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এতে কোনো মতভেদ নেই যে, চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামি ইতিহাস এরকম জঘন্য অত্যাচারের সম্মুখীন হয়নি। বরং সে অন্ধকার যুগে একমাত্র মুসলিমরাই জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা করত। এমনটি কখনো ঘটেনি যে কোনো ধর্ম-রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণ করেছে, আর আকিদা-বিশ্বাসে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দিয়ে সহায়তা করেছে, অথচ

---

৭৯. সিগরিড হুংকে, শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব, পৃ. ৩০৫, ৩০৬।
৮০. সিগরিড হুংকে, শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব, পৃ. ৩৫৪।

ইসলামি সভ্যতা সর্বদাই জনগণকে সব রকমের স্বাধীনতা প্রদান করেছে।[৪৮১]

ফরাসি প্রাচ্যবিদ ব্যারন কারা ডি ভো[৪৮২] বলেন, আরবরা বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন এবং জ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণায় সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছেছে এমন সময়ে যখন খ্রিষ্টজগৎ বর্বরতার করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করছে (যা পনেরো শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে)। আরবরা নবম এবং দশম শতাব্দীতে তাদের উৎকর্ষ ও উন্নতির শীর্ষে পৌছে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে প্রত্যেক বিজ্ঞানমনস্ক পশ্চিমা ব্যক্তির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে মারাকেশ এবং মধ্যপ্রাচ্য। আর এ সময়ে ইউরোপীয়রা আরবদের জ্ঞানভান্ডার অনুবাদ করতে শুরু করে। যেভাবে আরবরা গ্রিকদের জ্ঞানভান্ডার অনুবাদ করেছিল।[৪৮৩]

মরিস বুকাইলি তার *The Bible, The Qur'an and Science* গ্রন্থে বলেন, আমরা জানি, ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম এবং বিজ্ঞান জমজ দুই সন্তানের মতো। বিজ্ঞানকে পরিমার্জন করা শুরু থেকেই ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিধি প্রয়োগের ফলে ইসলামি সভ্যতার যুগে আশ্চর্যজনক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব রেনেসাঁসের পূর্ব থেকেই তার দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।[৪৮৪]

হিন্দুস্তানি জাতিসত্তা এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলের উপর ইসলামি একত্ববাদী বিশ্বাসের ভূমিকার কথা আলোচনা করতে গিয়ে মিশরে নিযুক্ত ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত কে. এম. পানিক্কর (১৮৯৫-১৯৬৩ খ্রি.) বলেন, এটা সুস্পষ্ট যে, এই (ইসলামি) যুগে হিন্দুধর্মের ওপর ইসলামের গভীর প্রভাব ছিল। হিন্দুদের মধ্যে যে আল্লাহর ইবাদতের (ঈশ্বরের উপাসনার) চিন্তা তা ইসলামের ভাবধারাপ্রসূত। এই যুগে চিন্তা ও ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা সত্ত্বেও এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে

---

৪৮১. হাসসান শামসি পাশা, *হাকায়া কানু ইয়াওমা কুন্না*, পৃ. ৮৩।

৪৮২. ব্যারন বার্নার্ড কারা ডি ভো (Baron Bernard Carra De Vaux) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। ফরাসি ভাষাতেই লিখেছেন। তার আগ্রহের বিষয় ছিল আরবের জ্ঞানভান্ডার। মুসলিম বিজ্ঞানীদের কয়েকটি রচনা তিনি পুনর্নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা করেছেন।

৪৮৩. বার্নার্ড কারা ডি ভো : টমাস আর্নল্ড সম্পাদিত *তুরাসুল ইসলাম* গ্রন্থে আল-ফালাক ওয়ার-রিয়াদিয়্যাত শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃ. ৫৬৪।

৪৮৪. ওয়াহিদুদ্দিন খান, *আল-ইসলাম ইয়াতাহাদ্দা*, পৃ. ১৪।

ইবাদতের উপযুক্ত উপাস্য একজনই, কেবল তারই কাছে মুক্তি ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করা যায়। ইসলামি যুগে ভারতে যেসব ধর্মান্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে সেগুলোর ওপর ইসলামি চিন্তাধারার প্রভাব ছিল স্পষ্ট। যেমন ভক্তি আন্দোলন এবং কবীর পরমেশ্বর আন্দোলন।[৪৮৫]

ফরাসি ঐতিহাসিক লুইস সিডিও ইসলামি সভ্যতার মৌলিক দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই করেন এবং অবশেষে এ কথা বলে তার বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন, আধুনিক ইউরোপের ওপর ইসলামি সভ্যতার প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট।[৪৮৬]

যাই হোক, ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে এসব বক্তব্য ন্যায়নিষ্ঠ ও ইনসাফপরায়ণ পশ্চিমা ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদদের।

ব্রিটেনের প্রিন্স চার্লসের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে এ অধ্যায়ের ইতি টানছি[৪৮৭]। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রে (Oxford Centre for Islamic Studies) 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শীর্ষক এই বক্তব্য দিয়েছিলেন। বক্তব্যটির চুম্বকাংশ নিচে দেওয়া হলো :

> ইসলামের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে পাশ্চাত্যে ব্যাপক ভুল ধারণা রয়েছে। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামি বিশ্বের কাছে যে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কারণে ঋণী সে সম্পর্কেও আমাদের মধ্যে অপরিমাণ অজ্ঞতা রয়েছে। মুসলিম শাসনামলে স্পেন শুধু রোমান ও গ্রিক সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ঐশ্বর্যকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণই করেনি, বরং সেই সভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটিয়েছে ব্যাপকভাবে। সে সময় স্পেন তার নিজের পক্ষ থেকে মানব-গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, আলজেব্রা—শব্দটি মূলত আরবি—আইনবিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসা, ভূগোলবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, কৃষি ও স্থাপত্যশিল্পে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি রয়েছে।

---

[৪৮৫] A Survey of Indian History, পৃ. [illegible]।

[৪৮৬] লুইস সিডিও, [illegible], পৃ. [illegible]।

[৪৮৭] [illegible]

দশম শতকে কর্ডোভা জ্ঞানবিজ্ঞানে ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। এখন আধুনিক ইউরোপ যেসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ববোধ করে সেগুলো মূলত স্পেনে মুসলিম শাসনামলের গৌরব ও অবদানের স্মারকচিহ্ন। কূটনীতি, স্বাধীন ব্যবসানীতি, উন্মুক্ত সীমানা, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা-পদ্ধতি, নৃবিজ্ঞান, শিষ্টাচার, পোশাকশিল্পের বিকাশ, বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা (Alternative medicine) এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা–এ সবকিছু সেই সমৃদ্ধ নগরী (কর্ডোভা) থেকেই প্রাপ্ত।

এগুলোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, ইসলাম আমাদের পৃথিবীতে সমঝোতার সঙ্গে জীবনযাপনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। এ ব্যাপারগুলো খ্রিষ্টধর্মে নেই এবং তা এই ধর্মকে দুর্বলতম স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। সৃষ্টিজগতের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অনুসারেই পৃথিবীকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। কেননা ইসলাম মানুষ ও প্রকৃতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান, বিবেক ও জড়বস্তুর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরিকে প্রশ্রয় দেয়নি; বরং এগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে জোরালো করেছে। একত্বের প্রতি এবং আমাদের চারপাশের পৃথিবীর পবিত্র ও আত্মিক প্রকৃতির সুরক্ষার প্রতি এমন প্রগাঢ় অনুভূতি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ইসলাম থেকে আমরা নতুন করে শিখতে পারি।[৪৮৮]

আধুনিক ইউরোপের রেনেসাঁসে ইসলামি সভ্যতার অবদান সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানতে লুইস সিডিও রচিত '*তারিখুল আরাবিল আম*'[৪৮৯] গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'ওয়াসফুল হাদারাতিল আবাবিয়্যাহ' শীর্ষক আলোচনা দেখুন। আরও দেখতে পারেন গুস্তাভ লি বোঁ-র *হাদারাতুল আরাব* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় এবং সিগরিড হুংকের '*শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*' গ্রন্থটি। এসব গ্রন্থগুলোতে পাশ্চাত্যসভ্যতার ওপর ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু জর্জ সার্টন (George Sarton,

---

৪৮৮. 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য' শীর্ষক বক্তৃতা, প্রিন্স চার্লস ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবর অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ-এ এই বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর ব্রিটিশ দূতাবাস এই বক্তৃতার অনূদিত কপি দামেশকে বিতরণ করে। পরবর্তী সময়ে প্রিন্স চার্লসের অর্থায়নে তা একটি ছোট পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

৪৮৯. Histoire des Arabes (১৮৫৪), ফরাসি থেকে আরবি অনুবাদ করেছেন আদিল যুআইতার।

1884-1956) রচিত '*মুকাদ্দামাতুন ফি তারিখিল উলুম*'[৪৯০] গ্রন্থে যত উৎস ও তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো দেখা যেতে পারে।

এসব বর্ণনা সন্দেহাতীতভাবে ইসলামি সভ্যতার মৌলিকত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি, সামগ্রিকতা ও ক্রমবিকাশ, বাস্তবতা ও উদারতা এবং মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার গোড়াপত্তনে বিরাট অবদানের প্রমাণ বহন করে।

সময় হয়েছে এখন নবজাগরণের প্রত্যাশায় ইসলামি সভ্যতার সেসব অবদান অনুধাবন করার।

---

৪৯০. *Introduction to the History of Science.*

পরিশিষ্ট

আমরা ইসলামি ইতিহাসের অন্তস্তলে ও আমাদের অনন্য সভ্যতার পথে-প্রান্তরে দ্রুত ভ্রমণ করে এলাম, এখন আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মান্বেষার জায়গায় দাঁড়াতে হবে...এসব বিষয়ে জ্ঞানলাভের পর কাজেকর্মে আমাদের আকাঙ্ক্ষা কী? নিজ উম্মাহর প্রতি আত্মমর্যাদাশীল এবং তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন মুসলিম হিসেবে কী হবে আমাদের দায়িত্ব?

এই উম্মাহর মুক্তি ও সফলতা রয়েছে কেবল কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে—প্রায়োগিক অর্থে এ কথা অনুধাবনই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হওয়া উচিত। এটা কোনো আবেগপ্রসূত প্রমাণশূন্য কথা নয়, নিজেদের সত্যিকারের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর হতাশাগ্রস্ত লোকদেরও কথা নয় এটা; বরং এটাই বিবেকী, যৌক্তিক, দালিলিক ও প্রমাণসিদ্ধ কথা...। আমরা এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি। এই উন্নতি ও উৎকর্ষ নামাজের মিহরাবে বা জিহাদের ময়দানে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং মানবজীবনের ছোট-বড় প্রতিটা ক্ষেত্রেই তা আমরা দেখেছি। ইসলামি সভ্যতার অনুশীলন-অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পরেও আর কোনো সভ্যতা এতটা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। চিন্তা ও বিশ্বাস, শিল্প ও সাহিত্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও ব্যবস্থাপনা, শান্তি ও যুদ্ধ... সবকিছুতে তা অনন্য ও অনুপম। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অসাধারণ অনুশীলন-অভিজ্ঞতার ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

জীবনের এই উজ্জ্বল পরম্পরায় ফিরে যেতে চাইলে আমাদের জন্য ইসলামি শরিয়ার কোনো বিকল্প নেই, আল্লাহর দ্বীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

> আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।[৪৯১]

সম্ভবত আমরা বুঝতে পারছি যে, উপর্যুক্ত আয়াতে যে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার কথা বলা হয়েছে তা সভ্যতার বিপরীত; তা মূলত বিভ্রান্তি ও বিনাশের অবস্থা। এই অবস্থার উৎস হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা, অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ পরিত্যাগ করা। আমাদের এই বোধের সমর্থনে রয়েছে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী,

«تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابُ اللّٰهِ وَ سُنَّتِيْ»

> তোমাদের মাঝে আমি দুটি বিষয় রেখে গেলাম, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।[৪৯২]

তাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো একনিষ্ঠভাবে লৌকিকতামুক্ত থেকে সামগ্রিক অর্থে দ্বীনে ইসলামে প্রত্যাবর্তন। এই প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য ভ্রষ্টতার পর সত্যপথ, দাসত্বের পর নেতৃত্ব এবং অসভ্যতার পর সভ্যতার নিশ্চয়তা দেবে। একইভাবে নিশ্চয়তা দেবে দুনিয়ার সাফল্য তো বটেই, আখেরাতের সাফল্যেরও। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

---

৪৯১. সুরা আহযাব : আয়াত ৩৬।

৪৯২. *মুয়াত্তা মালেক*, কিতাবুল কদর, হাদিস নং ১৫৯৪; *আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি*, হাদিস নং ২০৮৩৩; *সুনানে দারাকুতনি*, হাদিস নং ৪৫৬৫; *মুসতাদরাকে হাকেম*, হাদিস নং ৩১৯।

মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে, কেউ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয় পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে দেবো তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।[৪৯৩]

আমাদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো আমাদের শেকড় ও ভিত্তিভূমি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করা...। এর জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা বা নির্ধারিত কিছু পৃষ্ঠা যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয় কোনো ভলিউম বা বড় কোনো গ্রন্থ...। এই গৌরবময় ইতিহাস পাঠ করতে এবং তার সকল পর্ব ও দিক নিয়ে অধ্যয়ন করতে আমাদের বিপুল পরিমাণ সময়–বরং জীবনের একটি বড় অংশ ব্যয় করতে হবে। আমরা এই বইয়ে সামান্য কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এরপর আমাদের মহান চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞ আলেমদের রেখে যাওয়া জ্ঞানসমুদ্রে ডুবে যাওয়া উচিত। আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে পরিবার, মানবাধিকার, রাজনীতি, চিন্তা ও দর্শন, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, শিল্পকলা, নন্দনতত্ত্ব এবং অন্যান্য সব বিষয়ে...। আমাদের অনন্য, মহান মনীষীদের জীবনচরিত্রও আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে; তাদের জীবনযাপন কেমন ছিল, দ্বীন সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি কেমন ছিল, কীভাবেই-বা তারা দ্বীনের মাধ্যমে পৃথিবী শাসন করেছেন। ইতিহাসের রয়েছে অঢেল ভান্ডার। যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। রয়েছে অশেষ জ্ঞান-ঐশ্বর্য। সব ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ কথা যখন সত্য, তখন ইসলামি ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা অধিকতর সত্য, সূক্ষ্ম ও গভীর।

আমাদের পরবর্তী তৃতীয় দায়িত্ব হলো আমাদের এই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও যাবতীয় তথ্যভান্ডার পৃথিবীবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সফলতার উপাখ্যান পৃথিবীর মানুষ কমই জানে। বরং তারা আমাদের ব্যাপারে জানে কতগুলো মনগড়া বিষয় আর বিকৃত ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবেই এগুলো উৎকণ্ঠা আর ভয় সঞ্চার করে। বয়ে আনে উপহাস আর বিদ্রূপ। উপরন্তু, কখনো কখনো এগুলো যুদ্ধবিগ্রহের ও শত্রুতারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অজানা বিষয়কে শত্রু মনে করে থাকে। তাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা কেন শুধু শুধু শত্রুতা টেনে আনব। তাদের তরফ থেকে আমাদের প্রতি কোনো শত্রুতা

৪৯৩. সুরা নাহল, আয়াত ৯৭।

না পেলেও কি আমরা তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করব না? ইসলামের বহুবিধ কল্যাণের কথা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরব না?

শাশ্বত ইসলামি রিসালাত কেবল আরব উপদ্বীপবাসীর জন্যই আসেনি, সেই শুরুর দিন থেকেই তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾

আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।[৪৯৪]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»

অন্যান্য নবী কেবল তারই জাতির উদ্দেশে প্রেরিত হতেন। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের উদ্দেশে।[৪৯৫]

আমাদের কাছে কুরআনের আয়াত ও রাসুলের বাণী এই দাবি রাখে যে, আমরা এই শাশ্বত দ্বীন ও অনুপম সংস্কৃতি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, সন্দেহপূর্ণ ইতিহাস খণ্ডন করে তা থেকে অসত্য বিষয়গুলো মুছে ফেলব, জনসাধারণের কাছে মানবজীবনের উন্নয়নে আমাদের অবদানগুলো তুলে ধরব, খুলে খুলে বর্ণনা করব। তখন সবাই বুঝবে যে, এই মহান ধর্মই হলো এই উন্নতি ও উৎকর্ষের কারণ। এভাবেই চলতে থাকবে দাওয়াতের ধারাবাহিকতা। ধাপে ধাপে পরিবর্তন হবে মানুষের চিন্তাধারা।

বুডলি[৪৯৬] কী বলেন এবার তা দেখে নেওয়া যাক। মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নের পর তিনি হতবাক হয়ে বলেন,

---

৪৯৪. সুরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭।

৪৯৫. *বুখারি*, অধ্যায় : তায়াম্মুম, হাদিস নং ৩২৮; *মুসলিম*, হাদিস নং ৫২১ (শামেলা)।

৪৯৬. রোনাল্ড ভিক্টর বুডলি (R. V. C. Bodley) : ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও সেনা অফিসার। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ধাপে ধাপে কর্নেল পদে উন্নীত হন। যথাক্রমে ইরাকে ও ১৯২২ সালে উত্তর জর্ডানে ব্রিটিশ সেনা ইউনিটে কর্মরত থাকেন। এরপর ১৯২৪ সালে ওমানের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৩০-১৯৩১ সালে 'আর-রাবউল খালি' মরুভূমি পাড়ি দেন ও তার অজানা রহস্যসমূহ উদ্‌ঘাটন করেন। রাষ্ট্রীয় পদ থেকে অব্যাহতির পর আরব মরুবাসীদের সঙ্গে বসবাস করতে চলে যান এবং নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে মরুভূমি ও প্রাচ্য

মুসলিমজাতি ছিল বৃষ্টির মতো। যে ভূমিতেই বর্ষিত হয় সে ভূমিকে উর্বর করে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে প্রধান ভূমিকা ছিল নবী-সাহাবিদের পৌত্রদেরই। তারাই উঁচিয়ে ধরেছিল সুস্থ সংস্কৃতির মশাল। তখনও ইউরোপ ডুবে ছিল মধ্যযুগীয় অন্ধকারে।[৪৯৭]

এই সাক্ষ্য বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা মুসলিমরা যে কল্যাণে ভূষিত ছিলেন তার প্রশংসা করছে, তাদের সাধনা ও কীর্তি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করছে। মুসলিমরা সর্বশেষ আসমানি পয়গামের ধারকবাহক হিসেবে তাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা উপলব্ধি করেছেন এবং সব জায়গায় কল্যাণের বিপ্লব ঘটিয়েছেন। উপর্যুক্ত সাক্ষ্য এ ব্যাপারটিও তুলে ধরছে। তুলে ধরছে মুসলিম সভ্যতার তুলনায় অন্যান্য সভ্যতার ফলশূন্যতার ব্যাপারটিও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর উপলব্ধির ব্যাপার এই যে, বুডলির সাক্ষ্য ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃতিত্ব বলে ঘোষণা করেছে, যিনি তাঁর সাহাবিদের এসব নীতি ও মূল্যবোধ এবং ইলম শিখিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তা উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের সন্তান ও বংশধরদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে।

নিশ্চয় এটি মূল্যবান ও অসাধারণ সাক্ষ্য, বিশেষত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন,

«مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ السَّمَاءُ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأُ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ السَّمَاءُ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسُ؛ فَشَرِبُوْا، وَسَقُوْا، وَزَرَعُوْا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ...»

সম্পর্কে নানা বিষয়ে লেখালেখি করেন। আরবি থেকেও অনুবাদ করেন তিনি। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ : الرسول: حياة محمد, *Wind in the sahara*, *The soundless Sahara*.

৪৯৭. R. V. C. Bodley, আর-রসুল : হায়াতু মুহাম্মাদ, পৃ. ১৪৭।

> আল্লাহ তাআলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো ভূমির উপর বর্ষিত প্রবল বৃষ্টি। কোনো ভূখণ্ড ছিল উর্বর যা বৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাশি উৎপন্ন করেছে। কোনো ভূখণ্ড ছিল কঠিন ও গভীর যা পানি (শোষণ করেনি, কিন্তু) আটকে রেখেছে, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকার সাধন করেছেন—মানুষ তা পান করেছে, (পশুপালকে) পান করিয়েছে এবং এর দ্বারা চাষাবাদ করেছে। কিছু বৃষ্টি ভূমির এমন অংশে পড়েছে যা ছিল সমতল ও কঠিন, তা পানিও আটকে রাখে না বা (পানি শোষণ করে) ঘাস-লতাপাতাও উৎপন্ন করে না। এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা তার উপকার করেছে—সে তা শিক্ষা করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে..।[৪৯৮]

কিন্তু নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন.. ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা না করে বা না জেনে বুডলি কীভাবে এই সাক্ষ্য দিতে পেরেছিলেন? নিজেকে আবারও জিজ্ঞেস করুন, কতজন অমুসলিম তা জানে যা জানতেন বুডলি?!

এই সাক্ষ্যের কি কয়েকটি সাক্ষ্য হওয়া সম্ভব নয়?!

এই সাক্ষ্যগুলোর দৃষ্টান্ত কি অমুসলিমদের বিবেক ও অন্তরের জট খুলে দেওয়ার জন্য চাবিকাঠি হতে পারে না?!

নিঃসন্দেহে এই উপলব্ধি আমাদের কাঁধে একটি গুরুদায়িত্ব এবং একটি মহান আমানতের ভার অর্পণ করে। তা এই যে, আমরা এই দ্বীনকে নিয়ে পুরো বিশ্ববাসীর কাছে ছুটে যাব। কারণ আমরা সর্বশেষ রাসুলের অনুসারী এবং তাঁর পরে আমাদেরকেই দেওয়া হয়েছে তাঁর পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার আমানত। কেননা,

«فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»

> কোনো কোনো মুবাল্লাগ (যার কাছে হাদিস বা দ্বীনের কথা পৌছানো হয়েছে) শ্রবণকারী (যে হাদিস বা দ্বীনের কথা

---

৪৯৮. *বুখারি*, হাদিস নং ৭৯; *মুসলিম*, হাদিস নং ২২৮২।

পৌঁছিয়েছে) থেকে কখনো কখনো অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।[৪৯৯]

«فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»

অনেকে এমন রয়েছে যারা (নিজেরা জ্ঞানী হলেও) নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (তার জন্য তা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত)।[৫০০]

সুতরাং এই কিতাবের পরিশিষ্টে যে বিষয়টির প্রতি আমি ইঙ্গিত করতে চাই তা এই যে, আমরা বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করব, কারণ তিনি আমাদের মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

এটা আমাদের জন্য চিরকাল গৌরব ও মহিমার বিষয় যে আমরা এই দ্বীনকে ধারণ করেছি এবং রাসুলদের নেতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের অনুসারী হয়েছি। তেমনই আমাদের জন্য অনন্ত গৌরবের বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের আলোকিত ইতিহাস ও উজ্জ্বল সংস্কৃতি দান করেছেন। আমাদের এখনই সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর এবং পুরো সৃষ্টিজগতের সামনে তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে এ কথা ঘোষণা করার : আলহামদুলিল্লাহ! আমরা মুসলিম।

আমি খুবই দুঃখিত হই ও আফসোস করি যখন দেখি কিছু মুসলিম যুবক সমাজ থেকে লুকিয়ে থাকছে, যেন বোঝা না যায় সে মুসলিম; সে আদর্শহীন পশ্চিমাদের বা প্রাচ্যীয়দের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে, তা হতে পারে তাদের পোশাকে, হতে পারে তাদের ভাষায়, এমনকি তাদের খেলাধূলা ও বিনোদনে। যেন সে নিজের চামড়া খুলে ফেলতে চাইছে এবং পালিয়ে যেতে চাইছে নিজের বাস্তবতা থেকে।

আমি খুবই আফসোস করি যখন এই তিক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হই। প্রথম মুহূর্তেই আমি ধরতে পারি যে, এই সমস্ত যুবক তাদের ইতিহাসের কিছুই

---

৪৯৯. *বুখারি*, অধ্যায় : হজ, হাদিস নং ১৬৫৪

৫০০. *আবু দাউদ*, অধ্যায় : ইলম, হাদিস নং ৩৬৬০; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৬৫৬; *ইবনে মাজাহ* হাদিস নং ২৩০; *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং ১৬৭৮৪।

জানে না এবং তারা তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এক পৃষ্ঠাও পড়েনি। তা না হলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটত এবং পরিস্থিতি ভিন্ন হতো।

নষ্টরা কখনো সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে না...।

হতাশাগ্রস্তরা কখনো জাতির সংশোধন করতে পারে না...।

দৃঢ় মনোবল, আত্মসম্মানবোধ, উচ্চ মানসিকতা, অহংকারমুক্ত আত্মসম্মানবোধ, স্বেচ্ছাচারমুক্ত শক্তিমত্তা ব্যতীত আমরা কিছুতেই আমাদের সোনালি সভ্যতা ফিরিয়ে আনতে পারব না..

কবি বলেছেন,

> যা সমৃদ্ধ করেছে আমার সম্মান ও মর্যাদা, যেন আমি পায়ের তলায় মাড়িয়েছি কৃত্তিকা নক্ষত্ররাশি..
>
> (তা এই যে, হে আমরা রব,) আমি তোমার বাণী 'হে আমার বান্দা, এর অন্তর্ভুক্ত এবং তুমি আহমদকে বানিয়েছ আমার নবী।[৫০১]

এই মনোবল ও প্রেরণাই এই বার্তা ধারণ করতে সক্ষম। এই মানসিকতাই এই সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশ্বনেতৃত্বে মুসলিমদের প্রত্যাবর্তন অচিরেই বাস্তবে পরিণত হবে এবং দূরের ও কাছের সকলেই তা প্রত্যক্ষ করবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমরা যেন সোনালি সভ্যতার এ বিশাল প্রাসাদ বিনির্মাণে অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত হই।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের এ বাণীটি উল্লেখ করা যেতে পারে,

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾

> এবং তারা বলবে কখন তা ঘটবে? বলে দিন, সম্ভবত তা ঘটবে শীঘ্রই।[৫০২]

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেন।

---

৫০১. কবি মুহাম্মাদ আল-ফিলালি, আল-আবইয়াত।

৫০২. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৫১।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম : কুরআনুল কারিম

দ্বিতীয় : তাফসিরুল কুরআন ও উলুমুল কুরআন

- ইবনে কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসির আল-কুরাশি আদ-দিমাশকি, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, নিরীক্ষণ : সামি ইবনে মুহাম্মাদ সালামাহ, দারু তাইবিয়া লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।
- মাশকি, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, নিরীক্ষণ : সামি ইবনে মুহাম্মাদ সালামাহ, দারু তাইয়িবা লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।
- আবু হাইয়ান, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-আন্দালুসি, *তাফসিরুল বাহরিল মুহিত*, নিরীক্ষণ : আদিল আহমাদ আবদুল মাওজুদ ও অন্যরা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।
- বদরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আদুল্লাহ আয-যারকাশি, *আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবুল ফজল ইবরাহিম, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৯১ হি.।
- আর-রাযি, ফখরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে উমর, *আত-তাফসিরুল কাবির আও মাফাতিহুল গাইব*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ২০০০ খ্রি.।
- আস-সাদি, আবদুর রহমান ইবনে নাসির ইবনে আবদুল্লাহ, *তাইসিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান (তাফসিরুস সাদি)*, নিরীক্ষণ : আবদুর রহমান ইবনে মুআল্লা আল-লুওয়াইহিক, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, কায়রো, প্রথম মুদ্রণ, ১৪২০ হি.।

- সাইয়িদ কুতুব, *ফি যিলালিল কুরআন*, দারুশ শুরুক, কায়রো, একাদশ মুদ্রণ, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.।
- সুয়ুতি, *লুবাবুন নুকুল ফি আসবাবিন নুযুল*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- তাবারি, *জামিউল বায়ান ফি তাবিলি আয়িল কুরআন*, নিরীক্ষণ : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম মুদ্রণ, ২০০০ খ্রি./১৪২০ হি.।
- কুরতুবি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-আনসারি, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল-আরাবি, লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.।
- মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনুল আরাবি, *আল-আহকামুস সুগরা*, দারুত তাকরিব বাইনাল মাযাহিবিল ইসলামিয়্যা, প্রথম মুদ্রণ, ২০০১ খ্রি.।
- আল-ওয়াহিদি, *আসবাবু নুযুলিল কুরআন*, নিরীক্ষণ : কামাল বাসয়ুনি যগলুল, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯১ খ্রি.।

তৃতীয় : আকিদা ও ধর্ম

- ইবনে হায্ম আল-আন্দালুসি, আবু মুহাম্মাদ আলি ইবনে আহমাদ, *আল-ফাস্ল ফিল-মিলালি ওয়াল-আহওয়ায়ি ওয়ান-নিহাল*, মাকতাবাতুল-খানজি, কায়রো।
- শাহরাসতানি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কারিম, *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ সাইয়িদ কিলানি, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪১৪ হি.।

চতুর্থ : সুনান ও আসার

- ইবনে আবি শাইবা, আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুফি, *আল-মুসান্নাফ ফিল-আহাদিসি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : কামাল ইউসুফ আল-হুত, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৯ হি.।

- ইবনে হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ তামিমি, *সহিহ ইবনে হিব্বান বি-তারতিবি ইবনে বালবান*, নিরীক্ষণ : শুআইব আরনাউত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।
- ইবনে খুযাইমা, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আবু বকর সালামি নিশাপুরি, *সহিহ ইবনে খুযাইমা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ মুস্তাফা আযমি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৩৯০ হি./১৯৭০ খ্রি.।
- ইবনে মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ আবু আবদুল্লাহ আল-কাযবিনি, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- আবু জাফর তাহাবি, *মুশকিলুল আসার*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআস সিজিস্তানি আযদি, *সুনানে আবু দাউদ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, দারুল ফিকর।
- আবু নুআইম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানি, *হিলয়াতুল আওয়ালিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.।
- আবু ইয়ালা, আহমাদ ইবনে আলি ইবনুল মুসান্না মুসিলি তামিমি, *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, নিরীক্ষণ : হুসাইন সালিম আসাদ, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দামেশক, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৪ খ্রি./১৪০৪ হি.।
- বুখারি, *আত-তারিখুল কাবির*, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৬ খ্রি.।
- বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আবু আবদুল্লাহ জুফি, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.।

- বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আবু আবদুল্লাহ জুফি, *সহিহ বুখারি*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা দিব আল-বুগা, দারু ইবনে কাসির, আল-ইয়ামামাহ, বৈরুত, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- বাযযার, আহমাদ ইবনে আমর, *মুসনাদুল বাযযার*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৩ খ্রি.।
- বাইহাকি, *মারিফাতুস সুনানি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : আবদুল মুতি আমিন কালআজি, দারুল ওয়াফা, মিশর, ১৪১২ হি.।
- বাইহাকি, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন, *দালায়িলুন নুবুওয়া*, নিরীক্ষণ : আবদুল মুতি আমিন কালআজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.।
- বাইহাকি, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন, *সুনানুল বাইহাকিল-কুবরা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আতা, মাকতাবা দারুল বায, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি./১৪১৪ হি.।
- বাইহাকি, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন, *শুআবুল ঈমান*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ সাইদ বাসইয়ুনি যগলুল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১৪ হি.।
- তিবরিযি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবিহ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.।
- তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আবু ঈসা সালামি, *জামে তিরমিযি*, নিরীক্ষণ : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যরা, দারু ইহয়ায়িত-তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- আল-হারিস ইবনে আবু উসামা, *বুগয়াতুল বাহিস আন যাওয়ায়িদি মুসনাদিল হাসির*, যাওয়ায়িদু হাফিয নুরুদ্দিন হাইসামি, নিরীক্ষণ : হুসাইন আহমাদ সালিহ বাকিরি, মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস-সিরাতিন নাবাবিয়্যা, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.।
- হাকিম, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরি, *মুসতাদরাকে হাকেম*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা আবদুল কাদির আতা,

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.।

- দারাকুতনি, আলি ইবনে উমর আবুল হাসান বাগদাদি, *সুনানুদ দারাকুতনি*, নিরীক্ষণ : সাইয়িদ আবদুল্লাহ হাশিম ইয়ামানি মাদানি, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.।
- দারিমি, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আবু মুহাম্মাদ, *সুনানুদ দারিমি*, নিরীক্ষণ : ফাওয়ায আহমাদ যামরালি ও খালিদ আস-সাবউল ইলমি, দারুল কুতুবিল আরাবি, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৭ হি.।
- সুলাইমান ইবনে দাউদ ফারিসি বিসরি তয়ালিসি, *মুসনাদু আবি দাউদ তয়ালিসি*, দারুল মারিফা, বৈরুত।
- তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, নিরীক্ষণ : হামদি ইবনে আবদুল মাজিদ সালাফি, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল-হিকাম, মসুল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি.।
- তাবারানি, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমাদ *আল-মুজামুল আওসাত*, নিরীক্ষণ : তারিক ইবনে আওদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ও আবদুল মুহসিন ইবনে ইবরাহিম হুসাইনি, দারুল হারামাইন, কায়রো, ১৪১৫ হি.।
- তাবারানি, সুলাইমান ইবনে আহমাদ ইবনে আইয়ুব, *মুসনাদুশ শামিয়্যিন*, নিরীক্ষণ : হামদি ইবনে আবদুল মাজিদ সালাফি, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.।
- আবদুর রাযযাক কিলানি, *মিন মাওয়াকিফি উযামায়িল মুসলিমিন*, দারুন নাফায়িস লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.।
- আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু মুহাম্মাদ ইবনে নাসর কাসসি, *আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদি আবদি ইবনে হুমাইদ*, নিরীক্ষণ : সুবহি বাদরি সামরায়ি ও মাহমুদ মুহাম্মাদ খলিল সায়িদি, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, প্রথম মুদ্রণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।

- মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আমের আসবাহি মাদানি, *মুআত্তা মালেক*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- আল-মুত্তাকি আল-হিন্দি, আলি ইবনে হুসামুদ্দিন, *কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল-আফআল*, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আবুল হুসাইন কুশাইরি নিশাপুরি, *সহিহ মুসলিম*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকি, দারু ইহয়ায়িত-তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- নাসায়ি, আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব, *সুনানুন নাসায়িল-কুবরা*, নিরীক্ষণ : আবদুল গাফফার সুলাইমান বান্দারি ও সাইয়িদ কাসুরি হাসান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.।
- হাইসামি, নুরুদ্দিন আলি ইবনে আবু বকর, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১২ হি.।

পঞ্চম : শুরুহুল হাদিস ওয়া উলুমুহু

- ইবনে আবি হাতিম, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস রাযি, *আল-জারহু ওয়াত-তাদিল*, দারু ইহয়ায়িত- তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- ইবনুল জাওযি, আবদুর রহমান, *কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সাহিহাইন*, নিরীক্ষণ : আলি হুসাইন বাউয়াব, দারুল ওয়াতন, রিয়াদ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম মুহাম্মাদ বুস্তি, *আল-মাজরুহিন*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ ইবরাহিম যায়াদ, দারুল ওয়ায়ি, আলেপ্পো।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *আত-তালখিসুল হাবির ফি তাখরিজি আহাদিসির রাফিয়িল কাবির*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.।

- ইবনে হাজার আসকালানি, *তাজিলুল মানফাআত বি-যাওয়ায়িদি রিজালিল আইম্মাতিল আরবাআ*, নিরীক্ষণ : ইকরামুল্লাহ ইমদাদুল হক, দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *ফতহুল বারি শরহু সাহিহিল বুখারি*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৭৯ হি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আহমাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি, *আল-মাতালিবুল আলিয়া বি-যাওয়ায়িদিল মাসানিদিস সামানিয়া*, নিরীক্ষণ : গুনাইম আব্বাস গুনাইম এবং ইয়াসির ইবরাহিম মুহাম্মাদ, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, ১৪১৮ হি.।
- আবুল হাসানাত লাখনভি হিন্দি, *আর-রাফউ ওয়াত-তাকমিল ফিল-জারহি ওয়াত-তাদিল*, নিরীক্ষণ : আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, দারুস সালাম লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কায়রো, ২০০০ খ্রি.।
- আহমাদ ইবনে হাম্বল আবু আবদুল্লাহ শাইবানি, *মাসায়িলে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, রিওয়ায়াতু ইবনিহি আবদুল্লাহ*, নিরীক্ষণ : যুহাইর শাবিশ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.।
- আলবানি, *তামামুল মিন্নাহ ফিত-তালিক আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, দারুর রায়াহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯ হি.।
- আলবানি, *সহিহু ওয়া যয়িফুল জামিয়িস সগির ওয়া যিয়াদাতুহু*, আল-মাকতাবুল ইসলামি।
- আলবানি, *সহিহু ওয়া যয়িফু সুনানি আবি দাউদ*, মারকাযু নুরিল ইসলাম লি-আবহাসিল কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ছাপানো সংস্করণ।
- আলবানি, *গায়াতুল মারাম ফি তাখরিজি আহাদিসিল হালালি ওয়াল-হারাম*, আল-মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৫ হি.।

- আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন, *ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরিজি আহাদিসি মানারিস সাবির*, আল-মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।
- আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন, *আস-সিলসিলাতুস সাহিহা*, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ।
- বাজি আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান ইবনে খালাফ, *আত-তাদিল ওয়াত-তাজরিহ লিমান খাররাজা লাহুল বুখারি ফিল-জামিয়িস সহিহ*, নিরীক্ষণ : আবু লুবাবা হুসাইন, দারুল লিওয়া লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, রিয়াদ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
- জাযারি, আবুস সাআদাত মুবারক ইবনে মুহাম্মাদ, *আন-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : তাহের আহমাদ যাবি এবং মাহমুদ মুহাম্মাদ তানাহি, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৩৯৯ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- যাহাবি, শামসুদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *আত-তালখিস*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- যামাখশারি, মাহমুদ ইবনে উমর, *আল-ফায়িক ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবুল ফযল ইবরাহিম এবং আলি মুহাম্মাদ বাজাবি, দারুল মারিফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত।
- সাখাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান, *ফাতহুল মুগিস শরহু আলফিয়্যাতিল হাদিস*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ১৪০৩ হি.।
- সুয়ুতি, *মিফতাহুল জান্নাহ ফিল-ইহতিজাজি বিস-সুন্নাহ*, আল-জামিআতুল ইসলামিয়্যা, তৃতীয় সংস্করণ, মদিনা মুনাওয়ারা, ১৩৯৯ হি.।
- শরিফ হাতেম ইবনে আরেফ আওনি, *খুলাসাতুত তাসিল লি-ইলমিল জারহি ওয়াত তাদিল*, দারু আলামিল ফাওয়াইদ, মক্কা মুকাররমা, ১৪২১ হি.।

- তাহাবি, আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামা, *শরহু মাআনিল আসার*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ যাহরি নাজ্জার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৯৯ হি.।
- আযিমাবাদি, মুহাম্মাদ শামসুল হক আবুত তাইয়িব, *আওনুল মাবুদ শরহে সুনানে আবু দাউদ*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৫ হি.।
- মুবারকপুরি, আবুল আলা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহিম, *তুহফাতুল আহওয়াযি বি শারহি জামিয়িত তিরমিযি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- মুনাবি, মুহাম্মাদ আবদুর রউফ ইবনে আলি, *ফয়যুল কাদির শরহুল জামিয়িস সগির*, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, প্রথম সংস্করণ, মিশর, ১৩৫৬ হি.।
- নববি, আবু যাকারিয়্যা ইয়াহয়া ইবনে শারাফ ইবনে মুরি, আল-মিনহাজ শরহু সহিহি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৯২ হি.।

ষষ্ঠ : ইতিহাস, সিরাত এবং শামায়েলের কিতাব

- ইবনুল আসির আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ জাযারিঃ *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- ইবনুল ইখওয়া, যিয়াউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *মাআলিমুল কুরবাতি ফি তালাবিল হিসবাতি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০১ খ্রি.।
- ইবনুল জাওযি, *মানাকিবুল আমিরুল মুমিনিন* উমর ইবনু আবদিল *আযিয*, দারু ইবনে খালদুন, আলেকজান্দ্রিয়া।
- ইবনুল জাওযি, আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ, *আল-মুনতাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল-উমাম*, দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৫৮ হি.।

- ইবনুয যিয়া, আবুল বাকা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ হানাফি, *তারিখু মাক্কাতিল মুকাররামাতি ওয়াল-হারামিশ শারিফ*, নিরীক্ষণ : আলা ইবরাহিম এবং আইমান নসর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।
- ইবনুত তাকতাকা, *আল-ফাখরি ফিল-আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ-দুওয়ালিল ইসলামিয়্যা*, দারু সাদির, বৈরুত।
- ইবনুল আবারি ইউহান্না ইবনে আহরুন, *মুখতাসারু তারিখিদ দুওয়াল*, নিরীক্ষণ : অ্যান্টন আবদুল্লাহ সালিহানি, দারুর রায়িদ, লেবানন, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.।
- ইবনুল আদিম কামাল উদ্দিন, *বুগইয়াতুত তলাব ফি তারিখি হালব*, নিরীক্ষণ, সুহাইল যাকারিয়া, দারুল ফিকরিল আরাবি, বৈরুত।
- ইবনুল কালবি, হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ, *কিতাবুল আসনাম*, নিরীক্ষণ : আহমাদ যাকি পাশা, মাতবাআতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯২৪ খ্রি.।
- ইবনুন নাজ্জার বাগদাদি মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আবুল হাসান, *যাইলু তারিখি বাগদাদ*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা আবদুল কাদের আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- ইবনুল ওয়ারদি, *খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ ফাখুরি, দারুশ শারকিল আরাবি, বৈরুত, ১৯৯৬ খ্রি.।
- ইবনুল ওয়ারদি, যাইনুদ্দিন উমর ইবনে মুযাফফার, *তারিখু ইবনিল ওয়ারদি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.।
- ইবনে বুদরান আবদুল কাদের ইবনে আহমাদ, *তাহযিবু তারিখি দিমাশকিল কাবির লি-ইবনে আসাকির*, আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯১০ খ্রি.।

- ইবনে বাসসাম, আবুল হাসান আলি, *আয-যাখিরা ফি মাহাসিনি আহলিল জাযিরা*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারুল গারবিল ইসলামি, ২০০০ খ্রি.।
- ইবনে তাইমিয়া, আহমাদ ইবনে আবদুস সালাম, *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ রাশাদ সালেম, মুআসসাসাতু কুরতুবা, প্রথম সংস্করণ।
- ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান বুস্তি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : আবদুস সালাম আলুশ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *ইনবাউল গুমার বি-আবনায়িল উমার ফিত-তারিখ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবদুল মুইদ খান, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
- ইবনে হাজার, *তাওয়ালিত তাসিস বি-মাআলি ইবনে ইদরিস*, নিরীক্ষণ : আবুল ফিদা আবদুল্লাহ কাজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
- ইবনে হাযম, *জাওয়ামিউস সিরাহ*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস প্রমুখ, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- ইবনে হাইয়ান কুরতুবি, হাইয়ান ইবনে খালাফ ইবনে হাইয়ান, *আল-মুকতাবাস ফি তারিখিল আন্দালুস*, দারুল আফাকিল জাদিদা, বৈরুত।
- ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দামা*, নিরীক্ষণ : আলি আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি, মাতবাআ দারুশ শিআব।
- ইবনে খালদুন আবদুর রহমান মাগরিবি, *আল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল-খাবার ফি আইয়ামিল আরাবি ওয়াল-আজমি ওয়াল-বারবারি ওয়া মান আসারাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবার*, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত।

- ইবনে দুকমাক : আল জাওহারুস সামিন ফি সিয়ারিল খুলাফাই ওয়াল মুলুকি ওয়াস সালাতিন। জামিয়াতু উম্মুল কুরা, সৌদি আরব ১৪০৩ হি.।
- ইবনে দুকমাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ঈদমার, *আল-ইনতিসার লি-ওয়াসিতাতি আকদিল আমসার*, দারুল আফাকিল জাদিদা, বৈরুত।
- ইবনে সাদ আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানি, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৬৮ খ্রি.।
- ইবনে সাইদ আন্দালুসি, *আল-মাগরিব ফি হুলিয়্যিল মাগরিব*, নিরীক্ষণ ও টীকা সংযোজন : শাওকি যাইফ, আল-হাইআতু মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো।
- ইবনে আবদুল হাকাম আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ, ফুতুহ *মিসর ওয়া আখবারুহা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ হুজাইরি, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.।
- ইবনে আযারি মারাকেশি, *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল-মাগরিব*, দারুস সাকাফা, বৈরুত।
- ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক ওয়া যিকরু ফাযলিহা ওয়া তাসমিয়াতু মান হাল্লাহা মিনাল আমাসিলি আও ইজতাযা বি নাওয়াহিহা মিন ওয়ারিদিহা ওয়া আহলিহা*, নিরীক্ষণ : আলি শেরি, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.।
- ইবনে ফাদলুল্লাহ উমারি, মাসালিকুল আবসার ফি মামালিকিল আমসার, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ নায়িফ দাইলামি, আলিমুল কুতুব লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, বৈরুত।
- ইবনু কাইয়িম জাওযিয়্যা, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব যারয়ি, *যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, নিরীক্ষণ, মুস্তাফা আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

- ইবনে কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, নিরীক্ষণ : আলি শেরি, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।
- ইবনে কাসির, আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে উমর কুরাশি দিমাশকি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা আবদুল ওয়াহিদ, দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯৬ হি./১৯৭১ খ্রি.।
- ইবনে মাসকুয়াহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *তাজারুবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম*, নিরীক্ষণ : সাইয়েদ কারবি হাসান দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ বৈরুত ২০০৩ খ্রি.
- ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক মাআফিরি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মদ ফাহমি সারজানি, আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যা, কায়রো।
- ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বানি আইয়ুব*, দারুল কলম, কায়রো।
- আবুল আব্বাস নাসিরি আহমাদ ইবনে খালেদ, *আল-ইসতিকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, নিরীক্ষণ : জাফর নাসিরি, দারুল কিতাব, আদ-দারুল বাইযা, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- আবু শামাহ, শিহাবুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, *আর-রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, মাতবাআতু ওয়াদিন নিল, কায়রো, মিশর, ১২৮৭ হি.।
- আযদি, আবুল ওয়ালিদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইউনুস, *তারিখুল উলামা বিল-আন্দালুস*, নিরীক্ষণ : ইযযত আত্তার হুসাইনি, মাতবাআতুল মাদানি, কায়রো, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.।
- তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, *আশ-শামায়িল*, মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১২ হি.।
- তানুখি, আবু আলি মুহসিন ইবনে আবুল কাসিম, *আল-ফারজু বা'দাশ শিদ্দাহ*, মাকতাবাতুল খানজি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.।

- জাহশিয়ারি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস, *আল-ওয়াযারা ওয়াল-কিতাব*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা সাকা প্রমুখ, মাতবাআতুল-বাবিল-হালাবি, কায়রো, ১৯৩৮ খ্রি.।
- হালাবি, আলি ইবনে বুরহানুদ্দিন, *আসসিরাতুল হালাবিয়্যা*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৪০০ হি.।
- হুমাইদি, *আল-মুকতাবাস ফি তারিখি উলামায়িল আন্দালুস*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম ইবারি, দারুল কিতাবিল মিসরি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৮ খ্রি.।
- খতিব বাগদাদি, আবু বকর মুহাম্মাদ, *তারিখে বাগদাদ*, নিরীক্ষণ : মুস্তফা আবদুল কাদের, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- যাহাবি, *আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ সাইদ ইবনে বাসয়ুনি দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
- যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, মুস্তাফা আবদুল কাদের, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- সুহাইলি, আবুল কাসেম আবদুর রহমান, *আর-রওযুল উনুফ ফি শারহি সিরাতি ইবনে হিশাম*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- সুয়ুতি, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, *তারিখুল খুলাফা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, মাতবাআতুস সাআদাহ, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- সায়িদ আন্দালুসি, সায়িদ ইবনে আহমাদ, তাবাকাতুল উমাম, নিরীক্ষণ : হুসাইন মুনিস, দারুল মাআরিফ, প্রথম সংস্করণ কায়রো: ১৯৯৮ খ্রি.।
- তাবারি, মুহাম্মাদ ইবনে জারির আবু জাফর, *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৭ হি.।

- আবদুল কাদের নুআইমি, *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম শামসুদ্দিন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.।
- আবদুল কাদের বুদরান, *মুনাদামাতুল আতলাল ওয়া মুসামারাতুল খিয়াল*, নিরীক্ষণ : যুহাইর শাবিশ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.।
- ফাসাবি, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, নিরীক্ষণ : খলিল মানসুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- আল-কিন্দি, উমর মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ, *আল-উলাতু ওয়াল-কুযাত*, মাকতাবাতুল আবায়িল ইয়াসুয়িয়্যিন, বৈরুত।
- মুহাম্মাদ ইবনে তাকিউদ্দিন আইয়ুবি, *মিযমারুল হাকাইক ওয়া সিররুল খালাইক*, নিরীক্ষণ : হাসান হাবশিন, আলামুল কুতুব, কায়রো।
- মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক আল-হামাযানি, *তাকমিলাতু তারিখিত তাবারি*, নিরীক্ষণ : আলবার্ট ইউসুফ সামআন, আল-মাতবাআতুল কাসুলিকিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৫৮ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালিহি শামি, *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ*, নিরীক্ষণ : আদিল আহমাদ আবদুল মাউজুদ এবং আলি মুহাম্মাদ মিওয়ায, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।
- মারাকেশি, *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ২০০৬ খ্রি.।
- মাক্কারি, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খাতিব, *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুসির রাতিব*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।

- মাকরিযি, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি, *ইত্তিআযুল হুনাফা বি-আখবারিল আয়িম্মাতিল খুলাফা*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।
- মাকরিযি, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- নাবলুসি, উসমান ইবনে ইবরাহিম সাফাদি, *লামউল কাওয়ানিনিল মুজিয়্যাহ ফি দাওয়াবিনিদ দিয়ারিল মিসরিয়্যাহ*।
- ইয়াফেয়ি, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান ফি মারিফাতি মা ইয়ুতাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান*, টীকা সংযোজন, খলিল মানসুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.।
- ইয়াকুবি, *তারিখুল ইয়াকুবি*, দারু সাদির, লেবানন।

সপ্তম : কুতুবিত তারাজিমি ওয়াত-তাবাকাত

- ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, নিরীক্ষণ : আমের নাজ্জার, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।
- ইবনু আবিল ওফা কুরাশি, আবু মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মাদ, *আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ*, নিরীক্ষণ : আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ আল-হালব, মাকতাবাতু হাজার লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./১৯৯৩ খ্রি.।
- ইবনুল আবার, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ কুযায়ি, *আত-তাকমিলা লি-কিতাবিস সিলাহ*, নিরীক্ষণ : আবদুস সালাম হারাস, দারুল ফিকরিল আরাবি, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.।
- ইবনুল জাওযি, আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনে আলি, *সিফাতুস সাফওয়াহ*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ ফাখুরি এবং মুহাম্মাদ রুওয়াস

কিলআহ জি, দারুল মারিফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.।

- ইবনুল খতিব, লিসানুদ্দিন, *আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আনান, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭৭ খ্রি.।
- ইবনুল ইমাদ হাম্বলি, আবদুল হাই ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আকারি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, নিরীক্ষণ : আবদুল কাদির আরনাউত ও মুহাম্মাদ আরনাউত, দারু ইবনে কাসির, দামেশক, ১৪০৬ হি.।
- ইবনু নাদিম, আবুল ফারজ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, *আল-ফিহরিসত*, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৯৮ হি./১৯৮৯ খ্রি.।
- ইবনে বিশকাওয়াল, খালাফ ইবনে আবদুল মালিক, *আস-সিলাহ*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম ইবয়ারি, দারুল কিতাবিল মিসরি। প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *তাকরিবুত তাহযিব*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আওয়ামা, দারুর রশিদ, প্রথম সংস্করণ, সিরিয়া, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আলি, *তাহযিবুত তাহযিব*, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আবুল ফযল, *আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবা*, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত।
- ইবনে হাজার আসকালানি, আবুল ফযল আহমাদ ইবনে আলি, *রাফউল ইসর আন কুযাতি মিসর*, নিরীক্ষণ : হামেদ আবদুল মাজিদ, আল-মাতবাআতুল আমিরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৫৭ খ্রি.।
- ইবনে হাজার আসকালানি, *লিসানুল মিযান*, নিরীক্ষণ : দায়িরাতুল মাআরিফিন নিযামিয়্যা বিল-হিন্দ, মুআসসাসাতুল আলামি লিল মাতবুআত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

- ইবনে খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর, *ওফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবায়ি আবনায়িয যামান*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি.।
- ইবনে খাইয়াত, খলিফা, *কিতাবুত তাবাকাত*, নিরীক্ষণ : সুহাইল যাক্কার, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৩ খ্রি.।
- ইবনে আবদুল বার, আবু উমর ইউসুফ, *আল-ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব*, (ইসাবাহর সাথে ছাপানো), দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত।
- আবুত তাইয়িব লুগাবি, *মারাতিবুন নাহবিয়্যিন*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবুল ফযল ইবরাহিম, দারুন নাহদা, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো ১৯৭৪ খ্রি.।
- আবু নুআইম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানি, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, দারুল কিতাবিল আরাবি, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৫ হি.।
- আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ফাসাবি, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, নিরীক্ষণ : খলিল মানসুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- আজিরি, মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন, *আখবারু আবি হাফস উমর ইবনে আবদুল আযিয*, নিরীক্ষণ : আবদুল্লাহ আবদুর রহিম আইলান, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.।
- বাবানি, ইসমাইল পাশা বাগদাদি, *হাদিয়্যাতুল আরিফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, ইস্তাম্বুলের ওয়াকালাতুল মাআরিফিল-জালিলা, এর সহায়তায় প্রকাশিত, ১৭৫১ খ্রি.।
- বালাযুরি, আহমাদ ইবনে ইয়াহয়া, *আনসাবুল আশরাফ*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
- হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল-ফুনুন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯২ খ্রি.।

- হুসাইনি, আবুল মাহাসিন মুহাম্মাদ ইবনে আলি, *যাইলু তাযকিরাতিল হুফফায*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.।
- খুশানি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস, *কুযাতু কুরতুবা*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম ইবারি, দারুল কুতুবিল লুবনানি, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি।
- যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, নিরীক্ষণ : হুসাইন আসাদ, *মুআসসাসাতুর রিসালা*, নবম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.। • যাহাবি, মারিফাতুল কুররায়িল কিবার আলাত-তাবাকাতি ওয়াল আছার নিরীক্ষণ : শুআইব আরনাউত ও অন্যরা মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ। বৈরত ১৪০৪ হি.।
- যুবাইরি, মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসআব ইবনে সাবেত ইবনে আবদুল্লাহ, *নাসাবু কুরাইশিন*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৫৩ খ্রি.।
- সুবকি, তাজুদ্দিন ইবনে আলি, *তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ মুহাম্মাদ তানাহি ও আবদুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ হুলুব, হাজার লিত-তাবাআতি ওয়ান-নাশরি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪১৩ হি.।
- সাখাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান, *আদ-দাওউল লামি লি-আহলিল কারনিত তাসি*, দারুল জাইল, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১২হি./১৯৯২ খ্রি.।
- সুয়ুতি, *বুগয়াতুল উআত ফি তাবাকাতিল লুগাবিয়্যিন ওয়ান-নুহাত*, নিরীক্ষণ : মুস্তাফা আবদুর কাদির আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.।
- শামসুদ্দিন ইবনে তুলুন, *কুযাতু দিমাশক*, আস-সাগরুল বিসাম ফি যিকরি মান উল্লিয়া কাযায়িশ শাম। নিরীক্ষণ : সালাহুদ্দিন মুনজিদ,

দারুন নাওয়াদির লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ ২০০৬ খ্রি.।

- শাহরাযুরি, শামসুদ্দিন, তারিখুল হুকামা, নিরীক্ষণ : আবদুল করিম আবু শুওয়াইরিব, মাকতাবাতু বিবলিয়ুন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.।
- সাফাদি, সালাহুদ্দিন খলিল ইবনে আয়বাক, আল-ওয়াফি বিল-ওফায়াত, নিরীক্ষণ : আল মাহাদুল আলমানি, ১৯৯৭ খ্রি.।
- আল খাতিবুল বাগদাদি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে খালাফ ইবনে হাইয়ান, আখবারুল কুযাত, নিরীক্ষণ : আবদুল আযিয মুস্তফা মারাগি, আল-মাকতাবাতুত তুজ্জারিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৪৭ খ্রি.।
- কাফতি, আলি ইবনে ইউসুফ, ইখবারুল উলামা বি ইখবারিল হুকামা, দারুল আসার, বৈরুত।
- কন্নৌজি, সিদ্দিক ইবনে হাসান, আবজাদুল উলুমিল ওয়াশিল মারকুম ফি বায়ানি আহওয়ালিল উলুম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৭৮ খ্রি.।
- কুতুবি, মুহাম্মাদ ইবনে শাকের, ফাওয়াতুল ওফায়াত, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত ১৯৭৪ খ্রি.।
- কাহহালা, উমর রেজা, মুজামুল মুআল্লিফিন, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।
- মিযযি, ইউসুফ ইবনে যাকি আবদুর রহমান আবুল হাজ্জাজ, তাহযিবুল কামাল, নিরীক্ষণ : বাশার আওয়াদ মারুফ, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.।
- নাবাহি, আবুল হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল মালিকি আল-আন্দালুসি, আল-মারাকাবাতুল উলয়া ফি মান ইয়াহিক্কুল কাযা ওয়াল-ফুতয়া, নিরীক্ষণ : লাজনাতু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, দারুল আফাকিল জাদিদা, পঞ্চম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।

- ইয়াকুত আল-হামাবি আর-রুমি, *মুজামুল উদাবা ইরশাদুল আরিব ইলা মারিফাতিল আদিব*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৩ খ্রি.।

অষ্টম : মুজাম এবং সাহিত্যের কিতাবসূচি

- ইবনুল মুকাফফা, আবু আবদুল্লাহ, *আল-আদাবুস সগির*. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- ইবনে কুতাইবা আদ্দিনাওরি, *উয়ুনিল আখবার*, নিরীক্ষণ : দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.।
- ইবনে মানযুর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম আল-আফরিকি আল মিসরি, *লিসানুল আরাব*, দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- ইবনু নুবাতা আল-মিসরি, *সারহুল উয়ুন ফি শারহি রিসালাতি ইবনে যাইদুন*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবুল ফযল ইবরাহিম, দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো, ১৯৬৪ খ্রি.।
- আবু ইসহাক আল-কায়রাওয়ানি, *যাহরুল আদাবি ওয়া সামারুল আলবাবি*, নিরীক্ষণ : ইউসুফ আত-তাবিল এবং অন্যান্য দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- বাগদাদি, আবদুল কাদির ইবনে উমর, *খিযানাতুল আদাবি ওয়া লুব্বু লিসানিল আরাবি*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ নাবিল তারিফি এবং অন্যান্য, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রি.।
- জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, নিরীক্ষণ : ফাওযি আতাবি, দারু সাব, বৈরুত, ১৯৬৮ খ্রি.।
- হারেস আল-মুহাসেবি, *আদাবুন নুফুস*, নিরীক্ষণ : আবদুল কাদির আহমাদ আতা, দারুলজিল, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৪ খ্রি.।
- খতিব বাগদাদি, আহমাদ ইবনে আলি ইবনে সাবিত, *আল-জামি লি-আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি*, নিরীক্ষণ : মাহমুদ আত-তাহহান, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১৪০৩ হি.।

- খতিব তিবরিযি, *আল-ওয়াফি ফিল-আরুয ওয়াল-কাওয়াফি*, নিরীক্ষণ : ফখরুদ্দিন কাবাওয়া, দারুল ফিকরিল মুআসির, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৬ খ্রি.।
- খলিল ইবনে আহমাদ, আবু আবদির রহমান ইবনে আমর ইবনে তামিম আল-ফারাহিদি, কিতাবুল আইন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
- সামআনি, আবু সায়িদ আবদুল কারিম ইবনে মুহাম্মাদ, *আদাবুল ইমলা ওয়াল-ইসতিমলা*, নিরীক্ষণ : ম্যাক্স ফায়সফায়লার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.।
- সাইয়িদ আহমাদ আল-হাশেমি, *মিযানুয যাহাবি ফি সিনাআতি শারিল আরাবি*, দারুল ঈমান, কায়রো, ১৯৭০ খ্রি.।
- গাযালি, আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, দারুল মারিফা, বৈরুত।
- গাযালি, আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *আল-মুনকিয মিনাদ দালাল*, নিরীক্ষণ : আবদুল হালিম মাহমুদ, দারুল কুতুবিল হাদিসা, কায়রো, ১৯৭৯ খ্রি.।
- ফিরুযাবাদি, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব, *আল কামুসুল মুহিত*, মাতবাআতু দারিল মামুন, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৫৭ হি.।
- কুদামা ইবনে জাফর, *আল-খারাজ ওয়া সিনাআতুল কিতাবা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যুবাইদি, দারুর রশিদ, ইরাক।
- কালকাশান্দি, আহমাদ ইবনে আলি, *সুবহুল আ'শা ফি সিনাআতিল ইনশা*, দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, দামেশক, ১৯৮৭খ্রি.
- মুরতাযা আয-যাবিদি, আবুল ফাইয মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রাযযাক, *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিল কামুস*, দারুল হিদায়া।
- *আল-মুজামুল ওয়াসিত : মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যা*, মাকতাবাতুশ শুরুকিদ দুওয়ালিয়া, চতুর্থ সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

- নুওয়াইরি, শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, *নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব*, নিরীক্ষণ : মুফিদ কামহিয়্যাহ ও একদল গবেষক দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।

নবম : কুতুবুল বুলদান ওয়ার-রিহলাত

- ইবনু বতুতা, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ, *রিহলাতু ইবনি বাতুতা*, দারুন নাফায়িস লিত-তিবয়োতি ওয়ান-নাশরি, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- ইবনে জুবায়ের, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ, *রিহলাতু ইবনি জুবায়ের*, দারু সাদির, বৈরুত।
- ইবনে হামদুন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে সাদ, *আত-তাযকিরাতুল হামদুনিয়্যা*, নিরীক্ষণঃ ইহসান আব্বাস ও বকর আব্বাস, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- ইবনে খারদাদবেহ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, *আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক*, দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- ইদরিসি, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, *নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক*, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রি.।
- হামাবি, আবু আবদিল্লাহ ইয়াকুত ইবনে আবদিল্লাহ, *মুজামুল বুলদান*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- হিময়ারি, *আর-রওযুল মিতার ফি খাবারিল আকতার*, মাকতাবাতু লুবনান নাশিরুন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.।
- হিময়ারি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদিল মুনয়িম, *সিফাতু জাযিরাতিল আন্দালুস*, দারুল জিল, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- শাবুশতি, আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ, *আদ-দিয়ারাত*, নিরীক্ষণ : কুরকিস আওয়াদ, দারুর রয়িদিল আরাবি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.।

- কাযবিনি, যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ, *আসারুল বিলাদি ওয়া আখবারুল ইবাদ*, দারু বৈরুত, বৈরুত, ১৯৭৯ খ্রি.।
- মাকরিযি, আবুল আব্বাস তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবার বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ যেননুহুম ওয়া মাদিহাতুশ শারকাবি, মাকতাবাতু মাদবুলি, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।

দশম : আল-ফিকহু ওয়াস-সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যা

- ইবনু আবির রবি, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *সুলুকুল মালিক ফি তাদবিরিল মামালিক*, নিরীক্ষণ : হামিদ রবি, দারুশ শাব, কায়রো, ১৯৭৯ খ্রি.।
- ইবনুল আযরাক, *বাদায়িউস সিলক ফি তাবায়িয়িল মুলক*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল কারিম, আদ-দারুল আরাবিয়া লিল-কিতাব।
- ইবনুল হাজ, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবদারি, *আল-মাদখাল*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪০১ হি., ১৯৮১খ্রি.।
- ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা ফিস সিয়াসাতিশ শারয়িয়্যা*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ জামিল গাজি, মাতবাআতুল মাদানি, কায়রো।
- ইবনে তাইমিয়া : শায়খুল ইসলাম তকিউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ আল হিররানি (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) : আসসিয়াসাতুস শারইয়্যা ফি ইসলাহির রায়ি ওয়ার রায়িয়্যা : নিরীক্ষণ, মুহাম্মদ শাবরাকি দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ২০০৮ হি.
- ইবনে হাযম, *আল-মুহাল্লা*, দারুল ফিকরি লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি।

- ইবনে যানজুয়া, *আল-আমওয়াল*, নিরীক্ষণ : আবু মুহাম্মাদ আল-আসয়ুতি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৬ খ্রি.।
- ইবনে সুহনুন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদিস সালাম, *আদাবুল মুআল্লিমিন*, নিরীক্ষণ : হাসান হাসানি আবদুল ওয়াহহাব, দারুশ শারকিয়্যাহ-তিউনিসিয়া, ১৯৮২ খ্রি.।
- ইবনে আবিদিন, *হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, দারুল ফিকরি লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, বৈরুত, ১৪২১ হি. ২০০০ খ্রি.।
- ইবনে ফারহুন আল-মালিকি, ইবরাহিম ইবনে আলি, *তাবসিরাতুল হুককাম ফি উসুলিল আকযিয়াতি ওয়া মানাহিজিল আহকাম*, টীকা সংযুক্তি : জামাল মারআশলি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.।
- ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওরি, *আল-ইমামা ওয়াস-সিয়াসা* (*তারিখুল খুলাফা* নামে প্রসিদ্ধ), নিরীক্ষণ : তহা মুহাম্মাদ আয-যাইনি, মুআসসাসাতুল হালাবি, কায়রো, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.।
- ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আবুল ফারাজ শামসুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *আশ-শারহুল কাবির আলা মাতানিল মুকনি*, দারুল কিতাবিল আরাবি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি।
- ইবনে কুদামা, মুয়াফফাকুদ্দিন আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল মাকদিসি, *আল-মুগনি*, দারুল আলামিল কুতুব লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ।
- ইবনে মুফলিহ আল-মাকদিসি, *আল-আদাবুশ শারইয়্যা ওয়াল-মিনাহুল মারইয়্যা*, দারুল ওয়াফা লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.।
- আবু উবাইদ, কাসেম ইবনে সাল্লাম, *আল-আমওয়াল*, নিরীক্ষণ : খলিল হাররাস, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি.।

- আবু ইউসুফ, ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম, *আল-খারাজ*, আল-মাতবাআতুস সালাফিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৩৫২ হি.।
- আহমাদ ইবনে আবদিল্লাহ আল-কালকাশান্দি, *মাআসিরুল ইনাফা ফি মাআলিমিল খিলাফা*, নিরীক্ষণ : আবদুস সাত্তার আহমাদ ফাররাজ, মাতবাআতু হুকুমাতিল কুয়েত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কুয়েত, ১৯৮৫ খ্রি.।
- আল-খতিবুশ শারবিনি শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *মুগনিল মুহতাজ ইলা মারিফাতি মাআনি আলফাযিল মিনহাজ*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- শাফিয়ি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস, *আল-উম*, দারুল ফিকরি লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।
- শাওকানি, *আস-সাইলুল জাররুল মুতাদাফফিক আলা হাদায়িকিল আযহার*, দারু ইবনে হাযম, প্রথম সংস্করণ।
- শাইযারি, আবদুর রহমান ইবনে আবদিল্লাহ, *আল-মানহাজুল মাসলুক ফি সিয়াসাতিল মুলুক*, নিরীক্ষণ : আলি আবদুল্লাহ আল-মুসা, মাকতাবাতুল মানার, আয-যারকা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- তরতুশি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল অলিদ, *সিরাজুল মুলুক*, নিরীক্ষণ : জাফর আল-বায়াতি, রিয়াদুর রইস লিল-কুতুবি ওয়ান-নাশরি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- কারাফি, শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে ইদরিস, *আয-যাখির*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ হাজ্জি, দারুল গারবি, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি.।
- কালয়ি, আবু আবদুল্লাহ, *তাহযিবুর রিয়াসা ওয়া তারতিবুস সিয়াসা*, নিরীক্ষণ : ইবরাহিম ইউসুফ মুস্তাফা আজউ, মাকতাবাতুল মানার, প্রথম সংস্করণ, জর্দান।
- কাসানি, আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল-হানাফি, বাদায়িউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.।

- কাত্তানি, আবদুল হাই, *আত-তারাতিবুল ইদারিয়্যা ফি নিযামিল হুকুমাতিন নাবাবিয়্যা*, নিরীক্ষণ : ইমাদুদ্দিন খলিল, মারকাযুর রায়াহ লিত-তানমিয়াতিল ফিকরিয়্যা, দামেশক, ২০০৫ খ্রি.।
- মাওয়ারদি, আবুল হাসান আলি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.।
- মাওয়ারদি, *আদাবুল কাযি*, নিরীক্ষণ : মুহি হিলালুস সারহান, মাতবাআতুল ইরশাদ, প্রথম সংস্করণ, বাগদাদ, ১৯৭১ খ্রি.।
- মাওয়ারদি, আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবিব, *আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দিন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৭ হি./১৯৭৮ খ্রি.।
- নিযামুল মুলুক, হুসাইন আত-তুসি, *সিয়াসাতনামা আও সিয়ারুল মুলুক*, নিরীক্ষণ : ইউসুফ হুসাইন বাক্কার, দারুস সাকাফা, কাতার, ১৪০৭ হি.।
- নববি, মুহিউদ্দিন ইবনে শারাফ, *আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব লিশ-শিরাযি*, নিরীক্ষণ, টীকা সংযুক্তি ও অসমাপ্ত অংশটুকুর সমাপ্তি : মুহাম্মাদ নজিব আল মুতিয়ি, মাকতাবাতুল ইরশাদ, জিদ্দা।

একাদশ : সাধারণ উৎসগ্রন্থসমূহ

- ইবরাহিম আন-নাজ্জার, *আল-ফাননুল ইসলামি ওয়া আসারুহু আলাত-তাজরিদ ফিত-তাসবিরিল আরাবিয়্যিল মুয়াসির*, (তুলনামূলক পর্যালোচনা) পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, শিল্পকলা অনুষদ, ফটোগ্রাফি বিভাগ, হুলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭ খ্রি.।
- ইবরাহিম হারাকাত, *আন-নিযামুস সিয়াসিয়্যু ওয়াল-হারবিয়্যু ফি আহদিল মুরাবিতিন*, মাকতাবাতুল ওয়াহদাতিল আরাবিয়্যা, আদ দারুল বাইযা, (মুদ্রণ তারিখ উল্লেখ নেই)।
- ইবরাহিম আলি আল-কাল্লা, *নিযামুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা*, দারুন নাশরুদ দুয়ালিয়্যি, প্রথম সংস্করণ, সৌদি আরব, ২০০৩ খ্রি.।

- ইবরাহিম মাদকুর, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল মাআরিফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৬৮ খ্রি.।
- ইবনুল হাইসাম, আবু আলি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-মিসরি, *আল-মানাজির*, নিরীক্ষণ : ড. আবদুল হামিদ সবরুহু, আল-মাজলিসুল ওয়াতানি লিস-সাকাফাতি ওয়াল-ফুনুনি ওয়াল-আদাবি, ১৯৮৩ খ্রি.।
- ইবনে হাযম, *রসায়িলু ইবনে হাযম*, নিরীক্ষণ : ইহসান আব্বাস, আল-মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ লিদ-দিরাসাতি ওয়ান-নাশরি, ২০০৭ খ্রি.।
- ইবনে রুসতা, আহমাদ ইবনে উমর, *আল-আ'লাকুন নাফিসা*, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রি.।
- ইবনে সিনা, *আল-কানুন ফিত-তিব*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আদ-দান্নাওবি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রি.।
- ইবনে আবদুল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি*, নিরীক্ষণ : ফাওয়াজ আহমাদ যামারলি, দারু ইবনে হাযম, প্রথম সংস্করণ।
- আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাযলুহু আলাল ইনসানিয়্যা*, দারু ইবনে কাসির, দামেশক, ১৯৯৯ খ্রি.।
- আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, কায়রো, ১৪১০ হিজরি/১৯৯০ খ্রি.।
- আবুল আলা আফিফি, *আত-তাসাউফ : আস-সাওরাতুর রুহিয়্যা ফিল-ইসলাম*, দারুশ শাব, বৈরুত, (মুদ্রণ তারিখ উল্লেখ নেই)।
- আবুল ওয়াফা তাফতাজানি, *দিরাসাত ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতুল কাহিরা আল-হাদিসা, কায়রো, ১৯৯৪ খ্রি.।
- আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, একাদশ সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৫ হিজরি/২০০৪ খ্রি.।

- এটিয়েন ডিনেট, *মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ*, অনুবাদ, আবদুল হালিম মাহমুদ, দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.।
- ইহসান আব্বাস, শাযারাত মিন কুতুবিন মাফকুদাহ, দারুল গারবিল ইসলামিয়্যি, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি.।
- আহমাদ আহমাদ গালওয়াশ, *আন-নিযামুস সিয়াসিয়্যু ফিল-ইসলাম*, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।
- আহমাদ আমিন, দুহাল ইসলাম, *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৭ খ্রি.।
- আহমাদ আমিন, *ফাজরুল ইসলাম*, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ১৯৬২ খ্রি.।
- আহমাদ দারবিশ, *নাযরিয়্যাতুল আদাবিল মুকারান ওয়া তাজালিয়্যাতুহা ফিল-আদাবিল আরাবি, দারু গারিবুন লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি*, কায়রো, ২০০২ খ্রি.।
- আহমাদ যাকি বাদাবি, *মুসতলাহাতির রিয়ায়াতি ওয়াত-তানমিয়াতিল ইজতিমাইয়্যা*, দারুল কিতাবিল লুবনানি, প্রথম সংস্করণ, লেবানন, ২০০১ খ্রি.।
- আহমাদ শালবি, *তারিখুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, পঞ্চম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭৪ খ্রি.।
- আহমাদ শালবি, *মুকারানাতুল আদয়ান*, দারুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ১৯৯৯ খ্রি.।
- আহমাদ শালবি, *মাওসুআতুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা*, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ১৯৯৩ খ্রি.।
- আহমাদ আদিল কামাল, আতলাসু তারিখিল কাহেরা, দারুল সালাম, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ২০০৪ খ্রি.।

- আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যুল ইসলামিয়্যু.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, দারুল ফিকরিল আরাবিয়্যি, কায়রো, ২০০২ খ্রি.।
- আহমাদ ফরিদ আল-মাজিদি, *রসায়িলু জাবির ইবনে হাইয়ান ওয়া সালাসুনা কিতাবান ওয়া রিসালাতান ফিল-কিমিয়া ওয়াল-ইকসির ওয়াল-ফালাকি ওয়াত-তবিয়াতি ওয়াল-হাইয়াতি ওয়াল ফালসাফাতি ওয়াল-মানতিকি*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৬ খ্রি.।
- আহমদ ফিকরি : *ফিল-ইমারাতি ওয়াত তুহাফিল ফান্নিয়্যা*, পরিচ্ছেদ, আসারুল আরব ওয়াল ইসলাম ফিন নাহদাতিল উরুবিয়্যা আল হাদিসা, তত্ত্বাবধান, মারকাযু কিয়ামিল সাকাফিয়্যা ও ইউনেসকো আল হাইয়াতুল আম্মা লিল কিতাব, কায়রো ১৯৮৭।
- আহমাদ মাহমুদ শাকের, *আল-বায়িসুল হাসিস শরহু ইখতিসারি উলুমুল হাদিস লি-ইবনে কাসির*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮২ খ্রি.।
- আহমাদ মুখতার উমর, *আল-বাহসুল লুগাবি ইনদাল আরব*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৭১ খ্রি.।
- আহমাদ ইউসুফ আল-হাসান, *তাকিউদ্দিন ওয়াল-হানদাসাতুল মিকানিয়্যাতু মাআ কিতাবি আত-তুরুকুস সানিয়্যা ফিল-আলাতির রুহানিয়্যা মিনাল-কারনিস সাদিসু আশারা*, হালাব বিশ্ববিদ্যালয়, মাআহাদুত তুরাসিল ইলমিয়্যিল আরাবিয়্যি, ১৯৭৬ খ্রি.।
- ইখওয়ানুস সফা, *রসায়িলু ইখওয়ানুস সফা ওয়া খুল্লানুল ওয়াফা*, দারু সাদির, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.।
- ইখওয়ানুস সফা, *রসায়িলুল আসারিল উলবিয়্যা*, দারু সাদির, বৈরুত।
- অ্যাডাম মেজ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যাতু ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরিয়্যি*, অনুবাদ, মুহাম্মাদ আবদুল হাদি আবি রিদা, মাতবাআতু লাজনাতিত তালিফি ওয়াত-তরজামাতি ওয়ান-নাশরি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৩৭৭ হি./১৯৫৭ খ্রি.।

- এডওয়ার্ড ফেনডেক, *ইকতিফাউল কানু বিমা হুয়া মাতবু*, তাসহিহ্ মুহাম্মাদ আল-বাবলাবি, দারু সাদির, বৈরুত।
- আর্থার ক্রিস্টেনসেন, *ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন*, অনুবাদ, ইয়াহইয়া আল-খাসসাব, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, ২০০৬ খ্রি.।
- ইরিক ভোন ডানিকে, *আরাবাতুল আলিহাতি*, অনুবাদ ও নিরীক্ষণ, আদনান হাসান, দারুল মাদা লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, দামেশক, ১৯৯৫ খ্রি.।
- ইসমাইল রাজি আল-ফারুকি ও লুস লামিয়া আল-ফারুকি, *আতলাসুল হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতুল উবাইকান, রিয়াদ, ১৯৯৮ খ্রি.।
- আকরাম জিয়া আল-উমারি, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদা*, মাকতাবাতুল উবিকান, রিয়াদ।
- আকরাম আবদুল ওয়াহহাব, *মিয়াতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াযহাল আলাম*, দারুত তলায়ি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, ২০০০ খ্রি.।
- আকমালুদ্দিন ইহসান উগলি, *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যা তারিখ ওয়া হাদারা*, অনুবাদ, সালেহ সাইদাবি, মারকাযুল আবহাসি লিত-তারিখি ওয়াল-ফুনুনি ওয়াস-সাকাফাতিল ইসলামিয়্যা, ইস্তাম্বুল, ১৯৯৯ খ্রি.।
- অ্যালেক্সিস ক্যারেল, *আল-ইনসান যালিকাল মাজহুল*, অনুবাদ, শফিক আসাদ ফরিদ, মুয়াসসসাতুল মাআরিফ লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, ২০০৩ খ্রি.।
- আমিন ইউসুফ ও আলি হুসাইন আন-নাহবান, *আশহারু মুহাকামাতিত তারিখ*, দারুত তুরাস, বৈরুত, ১৯৭২ খ্রি.।
- আনওয়ার আল-জুনদি, *বিমাযা ইনতাসারাল মুসলিমুন*, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

- আনওয়ার আল-জুনদি, *মুকাদ্দিমাতুল উলুম ওয়াল-মানাহিজ*, মুহাওয়াতুন লিবিনায়ি মানহাজিন ইসলামিয়্যিন মুতাকামিলিন, দারুল আনসার, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭৯ খ্রি.।
- আনওয়ার আর-রিফায়ি, *আল-ইনসানুল আরাবি ওয়াল-হাদারাহ*, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- ইনাস হুসনি, *আসারুল ফন্নিল ইসলামিয়্যি আলাত তাসবিরি ফি আসরিন নাহযাতি*, দারুল যিল, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ২০০৫ খ্রি.।
- বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাবুল হিয়াল*, নিরীক্ষণ, আহমাদ ইউসুফ আল হাসান ও অন্যান্যরা, মাআহাদুত তুরাসিল ইলমিয়্যিল আরাবিয়্যি, ১৯৮১ খ্রি.।
- বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাবু মারিফাতি মাসাহাতিল আশকাল*, পরিমার্জন, নাসিরুদ্দিন তুসি, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, প্রথম সংস্করণ, হিন্দ, ১৩৫৯ হি.।
- আল-বিরুনি, *তাহকিকু মা লিল হিন্দি মিন মাকুলাতিন মাকবুলাতিন ফিল-আকলি আও মারযুলাতিন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৩ খ্রি.।
- আল-বিরুনি, আবু রায়হান *তাহদিদু নিহায়াতিল আমাকিন লিতাসহিহি মাসাফাতিল মাসাকিন*, জামেউল ফাতেহ ইস্তাম্বুলের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হস্তালিখিত পাড়ুলিপি থেকে গ্রন্থটিকে প্রাচ্যবিদ ক্রেনকো একটি স্মরকগ্রন্থ উপস্থাপন করেন।
- বায়ুমি ইসমাইল, *আন-নুযুমুল মালিয়্যাতুয় ফি মিসর ওয়াশ-শামি যমানা সালালিতিনিল মামালিক*, আল-হাইয়াতুল আম্মাতুল মিসরিয়্যাতু লিল-কিতাব, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- তাওফিক ইউসুফ আলওয়ায়ি, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা মুকারানাতান বিল-হাদারাতিল গারবিয়্যা*, মাকতাবাতুল মানারিল ইসলামিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কুয়েত, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

- টমাস আর্লন্ড, *আদ-দাওয়াতু ইলাল ইসলাম*, আনুবাদ, হাসান ইবরাহিম হাসান ও অন্যান্যরা, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ১৯৮০ খ্রি.।
- সারওয়াত উকাশা, *আল-কিয়ামুল জামালিয়্যা ফিল-ইমারাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল মাআরিফ, মিশর।
- জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাবুত তাজরিদ*, গ্রন্থটিকে হুলিয়াম কর্তৃক অনূদিত ও নিরীক্ষণকৃত 'মুসান্নাফাত ফি ইলমিল কিমিয়া লিল হাকিম জাবের বিন হাইয়ান'- এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্যারিস, ১৯২৮ খ্রি.
- জ্যাক রেসলার, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, অনুবাদ, গুনিম আবদুন, আদ-দারুল মিসরিয়্যা লিত-তালিফ ওয়াত-তরজমা।
- জাফর আবদুস সালাম, *নিযামুদ দাওলা ফিল-ইসলাম*, রাবিতাতুল জামিআতিল ইসলামিয়্যা, কায়রো, ২০০২ খি.।
- জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৭৪ খ্রি.।
- প্রাচ্যবিদদের একটি দল, থমাস অর্নল্ড। তুরাসুল ইসলাম, জারজিস ফাতহুল্লাহ, দারুত তলিয়া, দ্বিতীয় প্রকাশনা।
- জাওয়াদ আলি, *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, দারুস সাকি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।
- জর্জ সার্টন, *তারিখুল ইলম*, অনুবাদ, ইবরাহিম বাইয়ুমি মাদকুর ও অন্যান্যরা, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৯১ খ্রি.।
- গুস্তাভ লি বোঁ, *হাদারাতুল আরাব*, অনুবাদ, আদিল যায়িতার, মাতবাআতু ঈসা আলবাবি আল-হালাবি।
- হামেদ তাহের, *মাদখাল লিদিরাসাতিল ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যাতি*, হাজার লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি, কায়রো, ১৯৮৫ খ্রি.।
- হাসসান শামসি পাশা, *হাকাযা কানু ইয়াওমা কুন্না*, দারুল মানার, জেদ্দা, আল-মামলাতুল আরাবিয়্যাতুস সুয়ুদিয়্যা।

- আল-হাসান আস-সায়িহ, *আল-হাদারাতুল মাগরিবিয়্যা*, মাতবা'তুন নাজাহিল জাদিদা, প্রথম সংস্করণ, আদ-দারুল বাইযা, ১৯৯৬ খ্রি.।
- হাসান আস-সাআতি, *ইলমুল ইজতিমায়িল খালদুনি*, দারুল মাআরিফ, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭২ খ্রি.।
- হাসান ইবনে আবদুল্লাহ, *আসারুল উওয়াল ফি তারতিবিদ দুওয়াল*, মাতবাআতু বুলাক, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯২৫ খ্রি.।
- হাসান আবদুল আল, আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি, দারুল ফিকরিল আরাবি, বৈরুত ১৯৭৮ খ্রি.।
- হাসান আলি হাসান, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-মাগরিব ওয়াল-উন্দুলুস আসরুল মুরাবিতিন ওয়াল-মুওয়াহহিদিন*, মাকতাবাতুল খানজি, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৮০ খ্রি.।
- হুসাইন মুনিস, আতলাসুত তারিখিল ইসলাম, আজযাহরা লিল ইলামিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪০৭ হি., ১৯৮৭ খ্রিঃ।
- হুসাইন মুনিস, *মাওসুআতু তারিখিল উন্দুলুস*, মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দ্বীনিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৭হি./২০০৬ খ্রি.।
- হিকমত আবদুল কারিম ফারিহাত ও ইবরাহিম ইয়াসিন আল-খতিব, *মাদখাল ইলা তারিখিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুশ শুরুক, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ২০০০ খ্রি.।
- খালেদ আহমাদ হারবি, *উলুমু হাদারাতিল ইসলাম ওয়া দাওরুহা ফিল-হাদারাতিল ইনসানিয়্যা*, ওজারাতুল আওকাফিল কাতারিয়্যা, দোহা, ২০০৪ খ্রি.।
- খাদিজা আন-নাবরাবি, *মাওসুআতু হুকুকিল ইনসান ফিল-ইসলাম*, দারুস সালাম, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।
- খিজির আহমাদ আতাউল্লাহ, *বাইতুল হিকমা ফি দাওরিল আব্বাসিয়্যিন*, দারুল ইশআ লিত-তিবাআ, প্রথম সংস্করণ, কায়রো।

- ড্যানিয়েল ব্রিফল্ট, *নাশআতুল ইনসানিয়্যা*, অনুবাদ, সুহাইল হাকিম, ওজারাতুস সাকাফাতিস সুরিয়া, দামেশক।
- ডোলান্ড আর. হিল, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা লাবিনাতুন আসাসিয়্যা ফি সারহি হাদারাতিল ইনসানিয়্যা*, অনুবাদ, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, সিলসিলাতু আলমিল মারিফা।
- ডোলান্ড হিল, জাযারি রচিত 'আল জামে বাইনাল ইলমি ওয়াল আমাল আল নাফি ফি সিনায়াতিল হিয়াল' এর অনুবাদ।
- ভেটার মেসনার, *আল হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ফিল-আন্দালুস*, সম্পাদনা, সালমা আল জাইয়ুছি। মারকাযু দিরাসাতিল ওয়াহদাতিল আরাবিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রি.।
- Dionysius, Richardhitch Cock : *আত তাছিরুল আরাবি ফিল-উসুরিল উসতা*, অনুবাদ, কাসেম আবদুহু কাসেম। গ্রন্থটিতে মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৯ খ্রি.।
- আর-রাযি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে যাকারিয়া, *আল-হাবি ফিত-তিব*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৪২২ হি./২০০৬ খ্রি.।
- রাগিব সারজানি, *কিসসাতুত তাতার মিনাল-বিদায়াতি ইলা আইনি জালুত*, মুয়াসসাসাতু ইকরা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.।
- রিবহি মুস্তাফা ইলাইয়ান, *আল-মাকতাবাত ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, দারু সফা লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, জর্দান, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.।
- রিহাব আকাবি, মুহাম্মাদ আমিন ফারসুখ, *মাওসুআতুল আবাকিরাতুল ইসলাম*, দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো, ১৯৯৬ খ্রি.।
- রহিম কাযেম মুহাম্মাদ আল-হাশেমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, আদ-দারুল মিসরিয়্যাতুল লুবনানিয়্যা, (মুদ্রণ তারিখ উল্লেখ নেই)।

- রজার জারুদি, *মিন আজাল্লি হিওয়ারিন বাইনাল হাদারাত*, অনুবাদ-যুকান কারকুত, দারুন নাফায়িস, বৈরুত, ১৯৯০ খ্রি.।
- জাহরানি, আলি মুহাম্মাদ, *নিযামুল ওয়াকফি ফিল-ইসলাম হাত্তা নিহায়াতিল আসরিল আব্বাসিল আওয়ালি*, পিএইচডি থিসিস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা, ১৪০৭ হি.।
- সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরাব তাসতাউ আলাল গারব*, জার্মান থেকে আরবিতে অনুবাদ, ফারুক বাইযুন, দারু সাদির, দশম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.।
- সামেরায়ি, *আল-মুআসসাসাতুল ইদারায়িয়্যা ফিদ-দাওলাতিল আব্বাসিয়্যা*, মাকতাবাতুল ফাতহ, দামেশক, ১৯৭১ খ্রি.।
- সাদ যাগলুল আবদুল হামিদ ও আহমাদ মুখতার আল-ইবাদি, *দিরাসাতুন ফি তারিখিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, জাতুস সালাসিল, কুয়েত, ১৯৮৬ খ্রি.।
- সাইদ আহমাদ হাসান, *আনওয়াউল মাকতাবাত ফিল-আলামাইন আল-আরাবি ওয়াল-ইসলামি*, দারুল ফুরকান লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, জর্দান, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.।
- সুলাইমান ইবনে আবদুর রহমান আল-কিল, *হুকুকুল ইনসান ফিল-ইসলাম*, মাতবাআতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়্যা, সৌদি আরব, ১৯৯৭ খ্রি.।
- সানহুরি, আবদুর রাযযাক আহমাদ, *ফিকহুল খিলাফাতি ওয়া তাতাওয়ুরুহা লিতুসবিহা উসবাতা উমামিন শারকিয়্যাতিন*, নিরীক্ষণ : তাওফিক মুহাম্মাদ আশশাবি ও নাদিয়া আবদুর রাযযাক আস-সানহুরি, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।
- সুহাইল হুসাইন আল-কাতলাবি, *দাবলুমাসিয়্যাতুন নাবিয়্যি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিরাসাতুন মুকারানাতুন বিল-কানুনিদ দুওয়ালিয়্যিল মুআসির*, দারুল ফিকরিল আরাবিয়্যি, ২০০১ খ্রি.।

- সিডিও, *তারিখুল আরাবিল আম*, অনুবাদ, আদিল যা'য়িতা, দারুল ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৬৯ খ্রি.।
- শাহিন মেকারিওস, *তারিখু ইরান*, দারুল আফাকিল আরাবিয়্যা, কায়রো, ২০০৩ খ্রি.।
- শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, দারুল ফিকরিল মুআসির, দ্বিতীয় সংস্করণ, দামেশক, ২০০২ খ্রি.।
- সালেহ আহমাদ শামি, *আল-ফননুল ইসলামি ইলতিযাম ওয়া ইবদা*, দারুল কলম, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৯০ খ্রি.।
- সালেহ ইবনে আবদুর রহমান হুসাইন, *আল-আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাতু বাইনা মানহাজিল ইসলাম ওয়াল মানহাজিল হাদারিয়্যিল মুআসির*, মাকতাবাতুল উবিকান, প্রথম সংস্করণ, রিয়াদ, ২০০৮ খ্রি.।
- সুবহি সালেহ, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা নাশআতুহা ওয়া তাতওয়ুরুহা*, দারুল ইলম লিল-মালায়িন, তৃতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি.।
- যাফের কাসেমি, *আল-জিহাদ ওয়াল-হুকুকুল দুওয়ালিয়্যা ফিল-ইসলাম*, দারুল ইলম লিল-মালায়িন, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- যাফের কাসেমি, *নিযামুল হুকম ফিশ-শারিআতি ওয়াত-তারিখিল ইসলামিয়্যি*, দারুন নাফায়িস, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.।
- আমের আন-নাজ্জার, *তারিখুত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৯৪ খ্রি.।
- আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, *আল-আমালুল কামিলা*, দারুল কিতাব, বৈরুত।

- আবদুল হালিম মুনতাসির, *তারিখুল ইলম ওয়া দওরুল উলামায়িল আরব ফি তাকাদ্দুমিহি*, দারুল মাআরিফ, দশম সংস্করণ, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।
- আবদুল হামিদ সবরুহ, *আবকারিয়্যাতুল হাদারাতিল আরাবিয়্যা মানবাউন নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, পরিমার্জন, আর.বি বিনদার, আদ-দারুল জামাহিরিয়্যা লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি ওয়াল ইলান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.।
- আবদুল হাই যালুম, *ইমবারাতুরিয়্যাতুশ শাররিল জাদিদা আল-ইরহাবুদ দুওয়ালিয়্যু দিদদাল ইসলাম*, আল-মুআসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ লিদ-দিরাসাতি ওয়ান-নাশরি, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.।
- আবদুর রহমান হাসান হানবাকাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, দারুল কালম, প্রথম সংস্করণ, দামেশক, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।
- আবদুর রহমান হামিদা, *আলামুল জুগরাফিয়্যিনিল আরব ওয়া মুকতাতফাতুন মিন আসারিহিম*, দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, দামেশক, ১৯৮৪ খ্রি.।
- আবদুর রহমান আমিরা, *আল-ইসতিরাতিজিয়্যাতুল হারবিয়্যাহ ফি ইদারাতিল মাআরিক ফিল-ইসলাম*, আল-হাইআতুল আম্মাতুল মিসরিয়্যাহ লিল-কিতাব, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।
- আবদুল আল আহমাদ আবদুল আল, *আত-তাকাফুলুল ইজতিমায়ি ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা*, দারু হিবাতিন নিল, কায়রো, ১৯৯৫ খ্রি.।
- আবদুল আযিয দুরি, *আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা*, মারকাজু দিরাসাতিল ওয়াহদাতিল আরাবিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ২০০৮ খ্রি.।
- আবদুল গনি মাহমুদ আবদুল আতি, *আত-তালিমু ফি মিসরা যামানাল আইয়ুবিয়্যিনা ওয়াল-মামালিক*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৮৪ খ্রি.।

- আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান রবিয়ি, *আসারুশ শারকিল ইসলামি ফিল-ফিকরিল উরুব্বি খিলালাল হুরুবিস সলিবিয়্যা*, রিয়াদ, ১৪১৫ হি.।
- আবদুল্লাহ উলওয়ান, *মাআলিমুল হাদারাহ ফিল-ইসলাম ওয়া-আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্যিয়্যাহ*, দারুস সালাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.।
- আবদুল মুতি দালাতি, *রাবিহতু মুহাম্মাদ ওয়া-লাম আখসারিল মাসিহ*, দারুশ শিহাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.।
- আবদুল মুনয়িম নিমর, *আল-ইসলামু ওয়াল-মাবাদিউল মুসতাওরাদাহ*, দারুল কিতাবিল মিসরিল লুবনানি, কায়রো, ১৯৯৫ খ্রি.।
- আবদুল মুনয়িম সফউ, *তালিমুত তিব্বি ইনদাল আরব*, আবহাসুন নাদওয়াতিল ইলমিয়্যাহ লিল-জাময়িয়্যাতিস সুরিয়্যাহ লি-তারিখিল উলুম, দারুল জামিআ, আলেপ্পো, ১৯৮০ খ্রি.।
- আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, মাকতাবাতুল আনজালু, কায়রো, ২০০৪ খ্রি.।
- আবদুল হাদি তাযি, *আহাদা আশারা কারনান ফি জামিআতি কাযবিন*, মাতবাআতু ফুদালাতা আল মুহাম্মাদিয়্যা, ১৯৬০ খ্রি.।
- আবদুল হাদি মুহাম্মাদ রিদা, *নিযামুল মুলক আল-হাসান ইবনু আলি আত-তুসি কাবিরুল উযারা ফিল-উম্মাতিল ইসলামিয়্যা : দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ফি সিরাতিহি ওয়া-আহাম্মি আমালিহি খিলালা ইসতিযারিহি*, আদ-দারুল মিসরিয়্যাতুল লুবনানিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৯ খ্রি.।
- আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি, *দিরাসাতু মুকাদ্দিমাতি ইবনি খালদুন*, দারুন নাহদতি মিসরা, কায়রো, ১৯৫৬ খ্রি.।
- আবদুল ওয়াদুদ শালবি, *ফি মাহকামাতিত তারিখ*, দারুশ শুরুক, কায়রো, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।

- আদদান খতিব, *আল-মুজামুল আরাবি বাইনাল মাযি ওয়াল-হাযির*, মাহাদুল বুহুস ওয়াদ-দিরাসাতিল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৬ খ্রি.।
- আরনুস মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ, *তারিখুল কাযা ফিল-ইসলাম*, মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আযহারিয়্যা, কায়রো।
- আযিয আহমাদ, *তারিখু সাকলিয়্যা*, অনুবাদ, আমিন তিবি, আদ-দারুল আরাবিয়্যা লিল-কিতাব, ১৯৮০ খ্রি.।
- আফিফ আবদুল ফাত্তাহ তইয়ারাহ, *রুহুদ্দীনিল ইসলামি*, দারুল ইলমি লিল-মালায়িন, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- ইকরিমা সায়িদ সাবরি, *আত-তামরিদু ফিত-তারিখিল ইসলামি*, দারুস সাকাফা, রামাল্লা, ফিলিস্তিন, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.।
- ইকরিমা সায়িদ সাবরি, *আল-ওয়াকফুল ইসলামি বাইনান নাযরিয়্যাতি ওয়াত-তাতবিক*, দারুন নাফায়িস, প্রথম সংস্করণ, জর্ডান, ১৪২৮ হি./২০০৮ খ্রি.।
- আলি ইবনু আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমু বাহতাহ ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, মুআসসাসাতুর রিসালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৮৩ খ্রি.।
- আলি ইবনু আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িয়ুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, আলামুল কুতুব লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ, ১৯৯১ খ্রি.।
- আলি ইবনু আবদুল্লাহ দাফফা, *রুওয়াদু ইলমিত তিব্বি ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।
- আলি ইবনু নায়িফ শাহুদ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া-আমালিল মুসতাকবাল*, মাজমুআতুম মিনাল আবহাসিল মুজাম্মাআহ লি-কিবারি আসাতিযাতিত তারিখ ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা।
- আলি সামি নাশশার, *নাশআতুল ফিকরিল ফালসাফি ফিল-ইসলাম*, দারুল মাআরিফ, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৫ খ্রি.।

- আদ দাওলাতুল উমাবিয়্যা আওয়ামিলুল ইযাদিহার ওয়া তাদাইয়া-তুল ইনহিয়ার, মুআসসাসা ইকরা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৬ হি. ২০০৫ খ্রি.
- আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া-আসবাবুস সুকুত*, দারুত তাওযি ওয়ান-নাশরিল ইসলামিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.।
- আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুল মুরাবিতিন*, দারুত তাওযি ওয়ান-নাশরিল ইসলামিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো।
- উমর আসআদ, *মাআলিমুল আরুদ ওয়াল-কাফিয়াহ*, মাকতাবাতুল উবিকান, তৃতীয় সংস্করণ, রিয়াদ, ১৯৯৬ খ্রি.।
- গানিম মুহাম্মাদ সালিহ, *আল-ফিকরুস সিয়াসিয়্যুল কাদিমু ওয়াল-ওয়াসিত*, জামিআতু বাগদাদ, বাগদাদ, ১৯৮৮ খ্রি.।
- ফুয়াদ সুযকিন, *তারিখুত তুরাসিল আরাবি*, মাকতাবাতু দারিয যামান, মদিনা মুনাওয়ারা।
- ফারুক মাজদালাবি, *আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যা ফি আহদি উমার ইবনিল খাত্তাব*, রাওয়ায়িয়ু মাজদালাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, লেবানন, ১৪১১ হি./১৯১১ খ্রি.।
- ফাতহিয়্যাতুন নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল ফিকরিল আরাবি, চতুর্দশতম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.।
- ফ্রাঞ্জ রোসেনথাল, *ইলমুত তারিখ ইনদাল মুসলিমিন*, অনুবাদ, সালিহ আহমাদ আলি, মুআসসাসাতুর রিসালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরুত, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.।
- ফোরবস সি. জি. এবং ডিকেসটরহুজ এ. জি., *তারিখুল ইলমি ওয়াত-তিকনুলুজিয়া*, আরবি অনুবাদ, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো, ১৯৬৬ খ্রি.।
- ফাওি[illegible] আহমুদ, *মা[illegible]লাতুন ফি আসালাতিল ফিকরিল মুসলিম*, দা[illegible] আর[illegible]৭৬ খ্রি.।

- কাসিম আবদুহু কাসিম, *আর-রুয়াতুল হাদারিয়্যাহ লিত-তারিখ*, দারুল মাআরিফ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো।
- কাদরি হাফিজ তুকান, *আল-উলুমু ইনদাল আরব*, মাকতাবাতু মিসর, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- কাদরি হাফিজ তুকান, *উলামাউল আরব ওয়া-মা আতাওহু লিল-হাদারাহ*, দারুল কিতাব আরাবি।
- কাদরি তুকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির-রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল-ফালাক*, দারুশ শুরুক, কায়রো।
- কাদরি তুকান, *মাকামুল আকলি ইনদাল আরাব*, আল-মুআসসাসাতুল আরাবিয়্যা লিদ-দিরাসাতি ওয়ান-নাশর, বৈরুত।
- কুসাই হুসাইন, *মিন মাআলিমিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, আল-মুআসসাসাতুল জামিয়িয়্যাহ লিদ-দিরাসাতি ওয়ান-নাশর, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।
- কুতব মুস্তাফা সানু, *আন-নুযুমুত তালিমিয়্যাতুল ওয়াফিদাহ ফি ইফরিকিয়া-কিরাআতুন ফিল-বাদিলিল হাদারি*, ওয়াযারাতুল আওকাফি ওয়াশ-শুউনিল ইসলামিয়্যা, দুহা, ১৪১৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.।
- ক্র্যাচকোভ্স্কি, *তারিখুল আদাবিল জুগরাফিয়্যিল আরাবিয়্যি*, অনুবাদ, সালাহুদ্দিন হাশিম, দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, ১৯৮৭ খ্রি.।
- কামাল ইনানি ইসমাইল, *দিরাসাতুন ফি তারিখিন নুযুমি ওয়াল-হাদারাহ*, দারুল আন্দালুস লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, হায়েল সৌদি আরব ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।
- কিনদি আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইসহাক, *রাসায়িলুল কিনদিয়্যিল ফালসাফিয়্যাহ*, নিরীক্ষণ : মুহাম্মাদ আবদুল হাদি আবু রিদাহ, দারুল ফিকরিল আরাবি, কায়রো, ১৯৫০ খ্রি.।
- আবদুল্লাহ মাশুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, মাকতাবাতুল মানার, জর্ডান, ১৪০৩ হি.।

- লথ্রোপ স্টোডডার্ড, *হাদিরুল আলামিল ইসলামি*, অনুবাদ, আজাজ নুওয়াইহিদ, টীকা : শাকিব আরসালান, দারুল ফিকর, বৈরুত।
- সফিউর রহমান মুবারকপুরি, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, দারুল ওয়াফা, মানসুরা, সতেরোতম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আবু যাহরা, *আল-আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যা ফিল-ইসলাম*, দারুল ফিকরিল আরাবি, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আবু যাহরা, *মুহাদারাতুন ফিল-ওয়াকফ*, দারুল ফিকরিল আরাবি, নসর, কায়রো, ১৪২৫ হি., ২০০৫ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আহমাদ ইসমাইল মুকাদ্দাম, *আল-মারআতু বাইনা তাকরিমিল ইসলামি ওয়া-ইহানাতিল জাহিলিয়্যা*, দারুল ঈমান, ২০০৫ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আসাদ, *আল-ইসলাম আলা মুফতারাকিত তুরুক*, অনুবাদ, উমর ফাররুখ, দারুল ইলমি লিল-মালায়িন, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ দুসুকি, *আল-ওয়াকফু ওয়া-দাওরুহু ফি তানমিয়াতিল মুজতামায়িল ইসলামি*, সিরিজ : কাদায়া ইসলামিয়্যা, সংখ্যা : ৪৬, প্রকাশক : আল-মাজলিসুল আলা লিশ-শুউনিল ইসলামিয়্যা, প্রথম অংশ, মুহাম্মাদ যুহাইলি, তারিখুল কাদা ফিল-ইসলাম, দারুল ফিকর, দ্বিতীয় সংস্করণ, দামেশক, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *আল-ইসলামু ওয়াল-আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যা*, দারুর রায়িদিল আরাবি, বৈরুত।
- মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৭৭ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ গাযালি, *খুলুকুল মুসলিম*, দারুর রাইয়ান, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ গাযালি, রাকায়িযুল ঈমান বাইনাল আকলি ওয়াল-কালব, দারুশ শুরুক, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।

- মুহাম্মাদ মুখতার সুসি, *সুসুল আলিমাহ*, মাতবাআতু ফুদালাতাল মুহাম্মাদিয়্যা, ১৯৬০ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ মুখতার সুসি, *মাদারিসু সুসিল আতিকাহ*, তবআতু তনজাহ, মরক্কো (প্রকাশকাল ও সংস্করণ নম্বর অজ্ঞাত)।
- মুহাম্মাদ মানুনি, *হাদারাতুল মুওয়াহহিদিন*, দারু তুবকাল, প্রথম সংস্করণ, আদ-দারুল বাইদা, ১৯৮৯ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সালিহ, *হুকুকুল ইনসান ফিল-কুরআনি ওয়াস-সুন্নাহ ওয়া-তাতবিকাতুহা ফিল-মামলাকাতিল আরাবিয়্যাতিস সুয়ুদিয়্যা*, ওযারাতুল আওকাফ সৌদি আরব, ২০০৫ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ ইবনু উসমান হাশায়িশি, *তারিখু জামিয়িয যাইতুনাহ*, নিরীক্ষণ : জিলানি ইবনু আলহাজ ইয়াহয়া, দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, ১৯৮২ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাসিনাহ, *আদওয়াউন আলা তারিখিল উলুমি ইনদাল মুসলিমিন*, দারুল কিতাবিল জামিয়ি, প্রথম সংস্করণ, আল আইন (সংযুক্ত আরব-আমিরাত), ২০০১ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ রশিদ রেজা, *আল-খিলাফা*, আয-যাহরাউ লিল ইলামিল আরাবি, কায়রো (প্রকাশকাল ও সংস্করণ নম্বর অজ্ঞাত)।
- মুহাম্মাদ রাওয়াস কালআজি ও হামিদ সাদিক কুনাইবি, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, দারুন নাফায়িস, বৈরুত।
- মুহাম্মাদ দইফুল্লাহ বাত্তানিয়্যাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, দারুল ফুরকান, প্রথম সংস্করণ, জর্ডান, ২০০২ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *আল-আসারুল আন্দালুসিয়্যাতুল বাকিয়াহ ফি আসবানিয়া ওয়াল-বুরতুগাল*, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৬১ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আবদুল মুনয়িম খাফাজি ও আবদুল আযিয শারাফ, *আল-উসুলুল ফান্নিয়্যাহ লি-আওযানিশ শিরিল আরাবি*, দারুল জিল, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত।

- মুহাম্মাদ আবদুহু, আল-ইদতিহাদ ফিন-নাসরানিয়্যাতি ওয়াল-ইসলাম, প্রবন্ধ : *মাজাল্লাতুল মানার*, পঞ্চম খণ্ড।
- মুহাম্মাদ আলি শাওয়াবিকাহ ও আনওয়ার আবু সুওয়াইলিম, *মুজামু মুসতালাহাতিল আরুদি ওয়াল-কাফিয়া*, দারুল বাশির, ওমান, ১৯৯১ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ আলি উসমান, *মুসলিমান আল্লামুল আলাম*, মাকতাবাতু মারুফ, কায়রো।
- মুহাম্মাদ কুরদ আলি, *আল-ইসলামু ওয়াল-হাদারাতুল আরাবিয়্যা*, মাতবাআতু লাজনাতুত তালিফ ওয়াত-তারজামাহ ওয়ান-নাশর, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৬৮ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ মাহির হাম্মাদাহ, *আল-মাকতাবাতু ফিল-ইসলাম*, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৯৭৮ খ্রি.।
- মাহমুদ ইবরাহিম সাদানি, *মাআলিমু তারিখি রুমাল কাদিম*, আদ-দারু দুওয়ালিয়্যা লিল-ইসতিসমারাতিস সাকাফিয়্যা, ২০০৭ খ্রি.।
- মাহমুদ আলহাজ কাসিম, *আত-তিব্বু ইনদাল আরাবি ওয়াল-মুসলিমিনা : তারিখুন ওয়া-মুসামাহাতুন*, আদ-দারুস সুয়ুদিয়্যা লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, জেদ্দা, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.।
- মাহমুদ তহহান, *তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস*, মারকাযুল হুদা লিদ-দিরাসাত, সপ্তম সংস্করণ, ১৪০৫ হি.।
- মাহমুদ হামদি যাকযুক, আল-ইনসানু খালিকাতুল্লাহ্ : আত-তাফকিরু ফারিদাতুন, প্রবন্ধ : *জারিদাতুল আহরাম*, পয়লা রমজানসংখ্যা, ১৪২৩ হি./নভেম্বর ২০০২।
- মাহমুদ হামদি যাকযুক হাকায়িকু ইসলামিয়্যা ফী মুওয়া-জাহাতি হামালাতিল আশকিক, সুপ্রীম কাউন্সিল ফর ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স কায়রো।
- মাহমুদ শালতুত, *আল-ইসলামু আকিদাতান ওয়া-শারিআতান*, দারুশ শুরুক, কায়রো।

- মাহমুদ মুহাম্মাদ হুওয়াইরি, *রুয়াতুন ফি সুকুতিল ইমবারাতুরিয়্যাতির রুমানিয়্যা*, দারুল মাআরিফ, তৃতীয় সংস্করণ, মিশর, ১৯৯৫ খ্রি.।
- মুস্তাফা সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, দারুল ওয়াররাক ও দারুস সালাম, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।
- মুস্তাফা শাকআ, *আল-আয়িম্মাতুল আরবাআ*, দারুল কিতাবিল মিসরি, চতুর্থ সংস্করণ, কায়রো, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি.।
- মুস্তাফা শাকআ, *আল-উসুসুল ইসলামিয়্যা ফি ফিকরি ইবনি খালদুন ওয়া-নাযারিয়্যাতিহ*, দারুল কুতুবিল হাদিসাহ।
- মুস্তাফা শাকআ, *মাআলিমুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, দারুল ইলমি লিল-মালায়িন, লেবানন, ১৯৮৮ খ্রি.।
- ম্যাক্সিম রোডিনসন, *আস-সুরাতুল গারবিয়্যাহ ওয়াদ-দিরাসাতুল গারবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, এটি তুরাসুল ইসলাম গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ তত্ত্বাবধান : শাখত ও বসওয়ার্থ অনুবাদ, হুসাইন মুনিস ও অন্যান্য, কুয়েত, ১৯৮৫ খ্রি.।
- মানসুর যাবিদ মাতিরি, *আস-সিয়াগাতুল ইসলামিয়্যা লি-ইলমিল ইজতিমা : আদ-দাওয়ায়ি ওয়াল-ইমকান*।
- মানসুর মুহাম্মাদ সারহান, *আল-মাকতাবাতু ফিল-উসুরিল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতু ফাখরাবি, ১৯৯৭ খ্রি.।
- মুনির আজলানি, *আবকারিয়্যাতুল ইসলাম ফি উসুলিল হুকম*, দারুন নাফায়িস লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি.।
- মুনির হাসান আবদুল কাদির, *মুআসসাসাতু বাইতিল মাল ফি সাদরিল ইসলাম*, পিএইচডি থিসিস, দেশীয় সম্পর্ক অনুষদ, ফিলিস্তিন, ২০০৭ খ্রি.।
- *এনসাইক্লো পিডিয়া অব ব্রিটানিকা*, একাদশতম সংস্করণ।
- *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ*, ইলেকট্রনিক ডিজিটাল সংস্করণ, সৌদি আরব, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

- *মাওসুআতুল মাওরিদিল হাদিসাহ* (১৯৯৫ খ্রি.)।
- *আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল-আদয়ানি ওয়াল-মাযাহিবি ওয়াল-আহযাবিল মুআসিরাহ*, প্রস্তুত : আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ-শাবাবিল ইসলামি।
- মন্টেগোমারি ওয়াট, *ফাদলুল ইসলাম আলাল হাদারাতিল গারবিয়্যাহ*, আরবি অনুবাদ, হুসাইন আহমাদ আমিন, দারুশ শুরুক, কায়রো।
- নাজি যাইনুদ্দিন, *মুসাওয়ারুল খাত্তিল আরাবি*, মাকতাবাতুন নাহদাহ, বাগদাদ, ১৯৬০ খ্রি.।
- নাদিয়া হুসনি সকর, *আল-ইলমু ওয়া মানাহিজুল বাহসি ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.।
- নাসির আনসারি, *তারিখু আনজিমাতিশ শুরতাহ ফি মিসর*, দারুশ শুরুক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.।
- নাজিব আকিকি, *আল-মুসতাশরিকুন*, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।
- নুমান আবদুর রাযযাক সামিরায়ি, *নাহনু ওয়াল-হাদারাতু ওয়াশ-শুহুদ*, কিতাবুল উম্মাহ, কাতার, ২০০১ খ্রি.।
- নিকুলা যিয়াদাহ, *আল-হিসবাতু ওয়াল-মুহতাসিব ফিল-ইসলাম*, বৈরুত, ১৯৬৩ খ্রি.।
- হানি মুবারক ও শাওকি আবু খলিল, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিন-নাহদাতিল উরুব্বিয়্যা*, দারুল ফিকর, দামেশক, ১৯৯৬ খ্রি.।
- ওয়াহিদুদ্দিন খান, *আল-ইসলামু ইয়াতাহাদ্দা*, মুআসসাসাতুর রিসালা।
- *আল-মাওসুআতুল ইসলামিয়্যাতুল আম্মাহ*, ওযারাতুল আওকাফিল মিসরিয়্যা।

- উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, অনুবাদ, যাকি নাজিব মাহমুদ ও অন্যান্য, আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।
- উইল ডুরান্ট, *মাবাহিজুল ফালসাফা*, অনুবাদ, আহমাদ ফুয়াদ আহওয়ানি, মাকতাবাতুল আনজলুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৫৫ খ্রি.।
- ইয়াহয়া হুওয়াইদি, *মুকাদ্দিমাতুন ফিল-ফালসাফা*, দারুস সাকাফাতি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.।
- ইয়াহইয়া ওয়াযিরি, *আল-ইমারাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-বিআহ*, আলামুল মারিফাহ, কায়রো, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।
- ইউসুফ ইশ, *তারিখু আসরিল আব্বাসিয়্যা*, দারুল ফিকরিল মুআসির লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি, আল-ইসলাম হাদারাতুল গাদ, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্কারণ, কায়রো, ২০০১ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি : আল ওয়াল হায়াতু, মাকতাবাতু ওয়াহবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, কায়রো, ১৯৭৮ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি, *তারিখুনাল মুফতারা আলাইহ*, দারুশ শুরুক, তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো, ২০০৬ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি, *রিয়ায়াতুল বিআহ ফি শারিআতিল ইসলাম*, দারুশ শুরুক, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৪২১ খ্রি.।
- ইউসুফ কারযাবি, *মাদখারুন লি-মারিফাতিল ইসলাম*, মুআসসাসাতুর রিসালা, কায়রো।
- ইউসুফ কারযাবি, *মালামিহুল মুজতামায়িল মুসলিমিল্লাজি নানশুদুহ*, মুআসসাসাতুর রিসালা, প্রথম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৬ খ্রি.।

- জোহান হুয়িযিনগা, *ইদমিহলালুল উসূরিল উসতা*, অনুবাদ, আবদুল আযিয তওফিক, আল-হাইআতুল আম্মাতুল মিসরিয়্যা লিল-কিতাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রি.।
- জোহান ভেলার্জ, *কুনুযু ইলমিল ফালাক*, আল-মাতহাফুল কওমিয়্যুল আলমানি, নুরেমবার্গ, ১৯৮৩ খ্রি.।

দ্বাদশ : অন্যান্য ভাষার গ্রন্থপঞ্জি

- *A Survey of Indian History.*
- A. D. White: *A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom.*
- *Emotions as The Basis of Civilization.*
- F. Yahya: *Inventaire archéologique des carvanserail de Damas*, Thèse dactylographiée, Aix-en-Provence, 1979.
- *The History of Decline and Fall of the Roman Empire.*
- Turan (Osman), Celâleddin Karatay, *Vkiflari ve Vakfiyeleri,* Belleten, cilt: XII, Sayi: 45, 46, 47, 48 Türk Tarih Kurumu Basimevi, Ankara, 1948

ত্রয়োদশ : ওয়েবসাইট লিংকসমূহ

- http://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php?t=60832
- http://www.alargam.com/general/arabsince/7.htm
- http://www.arabicmagazine.com/artDetails.aspx?id=56
- http://balagh.com/deen/ya1dbf66.htm
- http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=26850
- http://www.islamset.com/arabic/aislam/civil/civill/algalely.html
- http://www.islamset.com/arabic/aislam/civil/civill/algalely.html
- http://www.islamset.com/arabic/asc/fangryl.html
- http://www.islamtoday.net/toislam/11/11.3.cfm.
- http://www.nooran.org/Default.asp
- http://www.osrty.com/main/?a=4044&c=352

চতুর্দশ : পত্রিকা ও সাময়িকী

- আবদুল বাকি খলিফা, আল-আসারুত তারিখিয়্যাহ ফিল-বুলকান, *আশ-শারকুল আওসাত* পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ, ২৫/১১/২০০৮ খ্রি.।
- তাওফিক আলি ওয়াহবা, আল-মুআহাদাত ফিল-ইসলাম, *মাজাল্লাতুল জামিআতিল ইসলামিয়্যা*, সংখ্যা : ২০।
- জাদুল হক, *মাজাল্লাতুল আযহার*, ডিসেম্বর, ১৯৯৩ খ্রি.।
- জুমআ আলি খাওলি, আল-মিসালিয়্যা ওয়াল-ওয়াকিয়িয়্যা ফিল-ইসলাম, *মাজাল্লাতুল জামিআতিল ইসলামিয়্যা বিল-মাদিনাতিল মুনাওয়ারা*, সংখ্যা : ৪৪।
- জোয়ান ভার্নেট (Vernet), আল-ইনজাযাতুল মিকানিকিয়্যা ফিল-গারবিল ইসলামি, *মাজাল্লাতুল উলুমিল আমরিকিয়্যা*, আরবি অনুবাদ, কুয়েত, অক্টোবর-নভেম্বর, খণ্ড : ১০, ১৯৯৪ খ্রি.।
- সুহাইলা যাইনুল আবিদিন, নাযারিয়্যাতুদ দাওলাহ ইনদা ইবনি খালদুন, *মাজাল্লাতুল মানার*, সংখ্যা : ৭৫, ৭৬, ৭৭, বর্ষ : ১৪২৪ হি.।
- আদিল ইওয়াজ, আল-মাদিনাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-মাদিনাতুল উরুব্বিয়্যা, *মাজাল্লাতুল ইলম ওয়াত-তিকনুলুজিয়া*, মাহাদুল ইনমায়িল আরাবি, বৈরুত, লেবানন, সংখ্যা : ২৭, ১৯৯২ খ্রি.।
- আবদুল কারিম যাইদান, আশ-শারিআতুল ইসলামিয়্যা ওয়াল-কানুনুদ দুওয়ালিল আম, *মাজাল্লাতুল উলুমিস সিয়াসিয়্যা ওয়াল-কানুনিয়্যা*, তৃতীয় পর্ব, কায়রো, ১৯৭৩ খ্রি.।
- আলি আবদুল্লাহ দাফফা, মুবতাকিরু ইলমিল জাবর মুহাম্মাদ ইবনু মুসা আল-খাওয়ারিযমি, *মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যা*।
- ফুয়াদ ইয়াহইয়া, প্রবন্ধ : জারদুন আসারিয়্যুন লি-খানাতি দিমাশক, *মাজাল্লাতুল হাওলিয়্যাতিল আসারিয়্যা*, সংখ্যা : ৩১।

- *আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যা*, সংখ্যা : ৩৩৪, বর্ষ : ২৯, যিলকদ, ১৪২৫ হি./জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রি.।
- *মাজাল্লাতুল মুসলিমিল মুআসির*, সংখ্যা : ২৫, বর্ষ : ১৪০১ হি.।
- *মাজাল্লাতু বারিদিল ইউনেস্কো*, অক্টোবর-সংখ্যা, বর্ষ : ১৯৮০ খ্রি.।
- মুহাম্মাদ খাইর মাহমুদ বিকায়ি, আত-তালিফ ফি তবাকাতিল মালিকিয়্যা ফিত-তুরাসিল আরাবি দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়াসফিয়্যাতুন, *মাজাল্লাতু মাকতাবাতিল মালিক ফাহদিল ওয়াতানিয়্যা*, রজব, ১৪২৫ হি.।
- ওয়ালিদ আহমাদ সাইয়িদ, ইনয়িকাসাতুন ফালাকিয়্যাতুন ফিল-ইমারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা, প্রবন্ধ : সৌদি *জাযিরাতুল আরব* পত্রিকা।
- *মুলহাকুল* (অতিরিক্ত পাতা) *আনবাউল কুয়েতিয়্যা*, সংখ্যা : ৫১৭, তারিখ : ১৬/৭/১৯৮৬ খ্রি.।
- *আখবারুল মিসরিয়্যা* পত্রিকা, তারিখ : ১৩/৪/২০০৭ খ্রি.।
- *আশ-শারকুল আওসাত* পত্রিকা, তারিখ : ২৫/১১/২০০৮ খ্রি.।

।। চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।।

।। সমাপ্ত।।

মাকতাবাতুল হাসান-এর ইতিহাস-প্রকাশনা পরিকল্পনা

❖ বৃহৎ কলেবরের সমৃদ্ধ ইসলামি ইতিহাস বিশ্বকোষ।

❖ সংক্ষিপ্ত কলেবরের ইসলামি ইতিহাসকোষ।

❖ এক মলাটে ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।

❖ রাজনীতি, সমরনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস।

❖ অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস।

❖ রাজপরিবার-কেন্দ্রিক ইতিহাস।

❖ জীবনীকেন্দ্রিক ইতিহাস।

❖ জাতি-দল-শ্রেণিকেন্দ্রিক ইতিহাস।

❖ স্থাপনা-প্রতিষ্ঠাননির্ভর ইতিহাস।

❖ ইসলামি ইতিহাসের প্রাতঃস্মরণীয় বিভিন্ন ঘটনানির্ভর গ্রন্থ।

❖ শিশুতোষ ইতিহাসগ্রন্থ।

❖ ইতিহাসনির্ভর মানচিত্র, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি।

আমাদের প্রথম কর্মপন্থা হবে প্রকৃতার্থে এ কথা অনুধাবন করা যে, নিশ্চয়ই এ জাতির সফলতা, মুক্তি কেবল কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণেই নিহিত। এটি কোনো আবেগপ্রসূত, অপ্রমাণিত কথা নয়। তেমনই নিজের সত্যিকারের অবস্থান সম্পর্কে বেখবর হীনম্মন্য কারও কথা নয়। বরং এটা দলিলসমৃদ্ধ যৌক্তিক কথা। আমরা এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় দেখেছি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার অনন্য চিত্র। আর এই অনন্যতা নামাযের মেহরাবে কিংবা জিহাদের ময়দানে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তা মানবজীবনের ছোট-বড় প্রতিটা ক্ষেত্রেই ছিল। ইসলামি সভ্যতার অনুশীলন অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে, আর আমরাও এ ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাসী যে, ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি অবিমিশ্রিত ও অনন্য এক দৃষ্টান্ত। যা ধর্মবিশ্বাস, চিন্তাধারা, সাহিত্য-শিল্পকলা, চরিত্র ও মূল্যবোধ, রীতিনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, শান্তি ও সংঘাত ইত্যাদিতে চিরভাস্বর। প্রতিটি শাখাতে এই বিশেষ অনুশীলনের ভিত্তি স্থাপিত কুরআন-সুন্নাহের সুস্পষ্ট মূলনীতির উপর।

মাকতাবাতুল হাসান